মানবতাবিরোধী অপরাধ
বিচার ও রাজনীতি

মুনতাসীর মামুন

মানবতাবিরোধী অপরাধ নিয়ে রাজনীতি শুরু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর। জিয়াউর রহমান মানবতাবিরোধীদের অপরাধ মার্জনা করে রাজনীতি নিয়ে আসেন। সেই থেকে মানবতাবিরোধীদের অতীত, বর্তমান কর্মকান্ড নিয়ে দেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজনের মধ্যে প্রতিনিয়ত আলাপ আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে। লেখালেখির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লেখকরা জনগণ ও নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেছেন হানাদার পাকিস্তানি বাহিনি ও তাদের সহযোগীদের গণহত্যা ও নিষ্ঠুরতার কথা।

বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি ফ্যাসিস্ট পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্ভরযোগ্য সহযোগী হিসাবে যারা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের নির্বিচার নৃশংস হত্যাকান্ডের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধ করেছে এ দেশের নিরস্ত্র নিরীহ জনগণের বিরুদ্ধে তাদের সম্পর্কে তথ্য দিয়ে, যুক্তি দিয়ে ক্ষুরধার লেখনীর সাহায্যে নিরন্তর লিখে চলেছেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। সুদীর্ঘ তিন দশক ধরে তাঁর অসংখ্য লেখা থেকে মাত্র ১০০ টি লেখা নিয়ে এই বইটি প্রকাশিত হলো। দীর্ঘ ভূমিকাতে লেখক মানবতা বিরোধী অপরাধ বিচারের ইতিহাস আলোচনা করেছেন।

স্বভাবত: এই লেখাগুলি বুঝতে সাহায্য করবে তিন দশকে আমরা কতটা কন্টকাকীর্ণ পথ ও সময় অতিক্রম করেছি। এই সব ঘটনার কুশীলব কারা ছিলো। বলা যেতে পারে এই সংকলন তিন দশকের রাজনীতির একটি প্রামাণ্য দলিল।

বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।

মুনতাসীর মামুন এখন বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহাসিক, সুপরিচিত লেখক এবং জনপ্রিয় রাজনৈতিক ভাষ্যকার। তার গবেষণার বিষয়, উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ সংস্কৃতি, বিশ শতকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ ও ঢাকা শহর। একসময় পরিচিত ছিলেন ছোট গল্পকার হিসেবে। লিখেছেন কিশোরদের জন্য, করেছেন অনুবাদ, বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন অজস্র। গবেষণা ও সাহিত্য বিষয়ক (সম্পাদনা সহ) তার গ্রন্থের সংখ্যা দুশোরও বেশি। ড. মামুন শুধু সাহিত্য নয়. ছাত্র জীবন থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জড়িত ছিলেন এবং আছেন। মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচারে তাঁর ভূমিকা অবদিত।

সমসাময়িককালে মুনতাসীর মামুনের মত পাঠক নন্দিত লেখক কম। গবেষণা ও সাহিত্য কর্মের জন্য তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন যার মধ্যে উল্লেখ্য একুশে পুরস্কার (২০১১), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৯৩) এবং প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৩)

বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট এবং মুনতাসীর মামুন-ফাতেমা ট্রাস্টের সভাপতি।

মানবতাবিরোধী অপরাধ
বিচার ও রাজনীতি

মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার ও রাজনীতি

মুনতাসীর মামুন

মানবতাবিরোধী অপরাধ : বিচার ও রাজনীতি
মুনতাসীর মামুন

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রকাশক : আহমেদ মাহফুজুল হক।
সুবর্ণ। বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স। রুম নং ২৩৫
৩৮/৩ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০। কম্পোজ : পারফর্ম কম্পিউটার ১০৫ ফকিরাপুল
ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স। গোপাল সাহা লেন, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন।

মূল্য : ৮০০.০০ টাকা

ISBN-978-984-91105-8-3

উৎসর্গ

ডা. শেখ বাহারুল আলম

লড়াই চলছে, চলবে
জয় পরাজয় বড় কথা নয়
লড়াই করে যাওয়াটাই আসল

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখকের অন্যান্য বই

মুক্তিযুদ্ধ কোষ (১-১২ খণ্ড)
কিশোর মুক্তিযুদ্ধ শেষ
বীরাঙ্গনা '৭১
শান্তি কমিটি ১৯৭১
আলবদর ১৯৭১
পাকিস্তানী জেনারেলদের মন
মুক্তিযুদ্ধে ১৩নং সেক্টর
ঢাকা ১৯৪৮–১৯৭১ (এ্যালবাম)
৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ভাষণ
মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র ১–২ খণ্ড
গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ (২, ৬, ৭, ৮, ১১, ১৩, ১৪
১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ খণ্ড)
মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্র
মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১
যেসব হত্যার বিচার হয়নি
বলে যেতে হবে মুক্তিযুদ্ধের গাথা
সেই সব পাকিস্তানী
পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর

সূচিপত্র

অভিশাপ দিচ্ছি

না, আমি আসিনি
ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রাচীন পাতা ফুঁড়ে,
দুর্বাসাও নই,
তবু আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধূলিতে
অভিশাপ দিচ্ছি।
আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ দিয়েছিলো সেঁটে,
মগজের কোষে কোষে যারা
পুঁতেছিলো আমাদেরই আপনজনের লাশ
দগ্ধ, রক্তাপ্লুত,

যারা গণহত্যা
করেছে শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেত ও খামারে,
আমি অভিশাপ দিচ্ছি নেকড়ের চেয়েও অধিক
পশু সেই সব পশুদের।

ফায়ারিং স্কোয়াডে ওদের
সারিবদ্ধ দাঁড়
করিয়ে নিমেষে ঝাঁ ঝাঁ বুলেটের বৃষ্টি
ঝড়ালেই সব চুকে বুকে যাবে তা আমি মানি না।
হত্যাকে উৎসব ভেবে যারা পার্কে মাঠে
ক্যাম্পাসে বাজারে
বিষাক্ত গ্যাসের মতো মৃত্যুর বীভৎস গন্ধ দিয়েছে ছড়িয়ে,
আমি তো তাদের জন্যে অমন সহজ মৃত্যু করি না কামনা।
আমাকে করেছে বাধ্য যারা
আমার জনক জননীর রক্তে পা ডুবিয়ে দ্রুত
সিঁড়ি ভেঙে যেতে
ভাসতে নদীতে আর বনবাদাড়ে শয্যা পেতে নিতে,

অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেই খানে দজ্জালদের।
অভিশাপ দিচ্ছি ওরা চিরদিন বিশীর্ণ গলায়
নিয়ত বেড়াক বয়ে গলিত নাছোড় মৃতদেহ,
অভিশাপ দিচ্ছি
প্রত্যহ দিনের শেষে ওরা
হাঁটু মুড়ে এক টুকরো শুকনো রুটি চাইবে ব্যাকুল,
কিন্তু রুটি প্রসারিত থাবা থেকে রইবে
দশ হাত দূরে সর্বদাই।
অভিশাপ দিচ্ছি
ওদের তৃষ্ণায় পানপাত্রে প্রতিবার
কানায় কানায় রক্তে উঠবে ভরে, যে রক্ত বাংলায়
বইয়ে দিয়েছে ওরা হিংস্র
জোয়ানের মতো
অভিশাপ দিচ্ছি
আকণ্ঠ বিষ্ঠায় ডুবে ওরা অধীর চাইবে ত্রাণ
অথচ ওদের দিকে কেউ
দেবে না কখনো ছুঁড়ে একখন্ড দড়ি।
অভিশাপ দিচ্ছি
স্নেহের কাঙাল হয়ে ওরা
ঘুরবে ক্ষ্যাপার মতো এপাড়া ওপাড়া,
নিজেরই সন্তান
প্রখর ফিরিয়ে নেবে মুখ, পারবে না
চিনতে কখনো;
অভিশাপ দিচ্ছি এতটুকু আশ্রয়ের জন্যে, বিশ্রামের
কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে
দ্বারে দ্বারে ঘুরবে ওরা প্রেতায়িত
সেই সব মুখের ওপর
দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে পৃথিবীর প্রতিটি কপাট।
অভিশাপ দিচ্ছি।
অভিশাপ দিচ্ছি,
অভিশাপ দিচ্ছি...

শামসুর রহমান

ভূমিকা

৪২ বছর আগে রৌদ্রোকরোজ্জ্বল এক দিনের কথা মনে পড়ছে আজ এ বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে। শহীদ মিনারে জড়ো হয়েছি আমরা অনেকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে মাস দু'য়েক হলো। তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২। আমাদের দাবি যুদ্ধাপরাধের বিচার, সমাবেশের উদ্যোক্তা জহির রায়হান ও শহীদুল্লাহ কায়সারের বোন নাফিসা কবির। তিনি থাকেন যুক্তরাষ্ট্রে। শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার, ডাঃ আলীম চৌধুরী স্ত্রী শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীসহ অনেকেই আছেন। আরো আছেন তরুণদের অনেকেই। নাফিসা কবিরের ভাই শাহরিয়ার কবিরও আছেন। ছিলাম আমিও। আমাদের বয়স তখন ২১-২২।

সেই থেকে ২০১০ পর্যন্ত কতোটা পথ পেরিয়ে এলাম। যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তাতে শহীদ পরিবারের সায় অবশ্য ছিল, কিন্তু সক্রিয় ছিল কয়েকজন। তারপর ৩৮ বছর আন্দোলনের পর শুরু হয়েছে বিচার প্রক্রিয়া। এ দীর্ঘপথ যাত্রায় আমাদের সঙ্গে অনেকেই ছিলেন, এখনও আছেন। তবে অনেকে আফসোস নিয়ে প্রয়াত হয়েছেন। বয়সের বা পেশাগত কারণে অনেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন। তবে সেই পুরোনদের মধ্যে এখনও তুমুল সক্রিয় শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী ও শাহরিয়ার কবির। নির্মূল কমিটির আন্দোলনের পর গত এক দশকে যারা যোগ দিয়েছেন তারা এখনও সক্রিয়। শাহরিয়ার ও আমার বিচার প্রক্রিয়ায় সাক্ষী দেওয়ার পর মনে হলো একটি পর্যায় আমরা পেরিয়েছি সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু লড়াইটা অব্যাহত আছে, রাখতেও হবে। কারণ যুদ্ধাপরাধীদের এখন মানবতাবিরোধী অপরাধী বলা হয়, ১৯৭৫ সালে তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় যে রাজনীতি জড়িত সে রাজনীতির থেকে উত্থিত হয়েছে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, সেনাবাদ। সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে এরা হুমকিস্বরূপ। এদেরও সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে না পারলে মানবতা বিরোধী অপরাধ আবারও সংঘটিত হতে পারে। ১৯৭১ সালের জেনারেশন অর্থাৎ আমরা চেয়েছিলাম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র।

এটি অস্বীকারের উপায় নেই ১৯৭৫ সালের অর্থই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যয়টি অস্বীকার। এর বিপরীত প্রত্যয় হচ্ছে পাকিস্তান বা পাকিস্তানবাদ যার অন্তর্গত জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, জঙ্গি মৌলবাদ, সেনা কর্তৃত্ব, সাম্প্রদায়িকতা, গরীবদের অস্বীকার কিন্তু ব্যবহার, ভায়োলেন্স, দুর্নীতি। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এগুলি উৎখাতের জন্য। কিন্তু সেগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর একটি কারণ, মুক্তিযুদ্ধের দুটি

মৌলিক বৈশিষ্ট্য যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। একটি হলো গণহত্যা নির্যাতন অন্যটি শরণার্থী যা নির্যাতন প্রত্যয়ের অন্তর্গত। গুরুত্ব পেয়েছে বীরত্ব। ইউরোপে ফ্যাসিবাদ/নাজিবাদ পুনরুত্থিত না হওয়ার কারণ, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা বীরত্ব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন গণহত্যা ও নির্যাতনের ওপর। রাজনীতিবিদরা আইন করেছেন। বিচার করেছেন যাতে কর্তৃত্বমূলক ঐ দুটিই ব্যবস্থা গড়ে না ওঠে। আর শিল্পী সাহিত্যিক চলচ্চিত্রকার, অনেক তারকাখচিত শিল্পী, সাংবাদিক তাদের নিজ নিজ কর্মের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন গণহত্যা নির্যাতনের অপমান, বেদনা, অশ্রু, মনুষ্যত্বহীনতা। ফলে পরবর্তী প্রজন্ম আর কখনও চায়নি নাজিবাদ বা ফ্যাসিবাদ আবার ফিরে আসুক। আমাদের এ দেশে যদি রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা শুরু থেকেই গুরুত্ব দিতেন গণহত্যা নির্যাতনের ওপর তাহলে ১৯৭৫ টিকে থাকা কষ্টকর হতো।

গণহত্যা নির্যাতনের বিষয়ে যে সরকার একেবারে গুরুত্ব দেয়নি তা নয়। গণহত্যার ওপর সরকার ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের আগেই গুরুত্ব দিয়েছিল। ৩ ডিসেম্বর এদের বিচারের জন্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরবর্তী সরকারও কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল কিন্তু যথাযথ গুরুত্ব কখনও আরোপিত হয়নি। গণহত্যার মধ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল বেশি। অবশ্য এক হিসেবে বলা যায় বুদ্ধিজীবী হত্যা গণহত্যারই অন্তর্গত। নির্মূল কমিটির একটি অবদান আমি মনে করি, নির্দিষ্টভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে গণহত্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।

আমি প্রায় ক্ষেত্রে গণহত্যার বিষয় আলোচনা করতে গেলে হামিদা রহমানের একটি লেখার কথা বলি, পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও কারণ গণহত্যার ভয়াবহতা যাতে বোঝা যায়—

"আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত-পা বাঁধা।"

"আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। মুখ ও নাকের কোনো আকৃতি নেই। কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটি অংশ কাটা।... মেয়েটি সেলিনা পারভীন। শিলালিপির এডিটর।"

"মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি ফলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যস্থ কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোক-যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।"

ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমি দেখে এসে এই প্রতিবেদন লিখেছিলেন অধ্যাপিকা হামিদা রহমান। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী একবছর

খবরের কাগজের পাতা ওল্টালে এ-ধরনের প্রচুর বধ্যভূমির খবর জানা যাবে। সংবাদ সাময়িক পত্রে সংকলিত 'বধ্যভূমির অভিজ্ঞতা'— একটি উদাহরণ। এ উদাহরণটি অবশ্য অনন্য কারণ, বধ্যভূমি থেকে কেউ ফিরে আসে না আসে নি। ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমি, যেখানে আমাদের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল তা বাংলাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেক বধ্যভূমির প্রতিক। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল স্বাধীনতাবিরোধী যাদের প্রধান অংশ ছিল জামায়াতে ইসলামের কর্মীরা। এদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল রাজাকার বাহিনী, ডেথ স্কোয়াড নামে খ্যাত আলবদর ও আল শামস বাহিনী। এখনো ত্রিশ বছর পেরোয়নি ঐসব নৃশংস ঘটনার। কিন্তু, বাংলাদেশ যেন এসব মনে রাখে নি।

ভুলে যাওয়ার এক অসম্ভব ক্ষমতা আছে বাঙালির। অনেকে বলেন, বাঙালি ক্ষমাশীল। আমি মনে করি, না, তা-সুবিধাবাদ, নিষ্ঠুরতা। আমার সামনে ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকার বিবর্ণ কিছু সংখ্যা। প্রতিটি পাতায় পাতায় হারিয়ে যাওয়া, খুন হওয়া মানুষের খবর, খুনিদের তালিকা, বিচারের দাবি আর সরকারি প্রতিশ্রুতি। তৃতীয় বছর থেকে এসব খবর কমতে থাকে এবং একসময় তা সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে ২৫ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায়। হয়ত, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু, স্বাভাবিক নয়, খুনীদের বিচার না-হওয়া, সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা করা, তাদের মিত্র করা।

বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের ওপর নির্মিত ডেভিড বার্গম্যানের [যিনি এখন মানবতাবিরোধী অপরাধে বিশ্বাসী নন] 'ডেসপ্যাচ' তথ্যচিত্রটির কথা হয়ত আপনাদের অনেকের মনে আছে। তথ্যচিত্রের প্রথমেই দেখা যায়, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সলে রায়ের বাজার বধ্যভূমির সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ সাংবাদিক এনায়েত উল্লাহ খান রায়ের বাজারের স্মৃতিচারণ করছেন। এর মাঝে ৪৩টি বছর পার হয়ে গেছে। জে. জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সাল থেকে যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতাবিরোধীদের নিয়ে সমন্বয়ের রাজনীতি শুরু করলেন। আরো অনেকের মতো ক্রুদ্ধ এনায়েতউল্লাহ খানও ক্রোধ ভুলে সমন্বয়ের রাজনীতিতে যোগ দিলেন। এভাবে পিঠে ছুরি মেরে অনেকে আমাদের ক্রোধ দমনে বাধ্য করেছিলেন। ক্রোধ দমন করা যায় কিন্তু বেদনা? অপমান? আসলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা কথা বলি, বলতে ভালোবাসি কিন্তু খুব কম সময়ই ব্যয় করি তাদের জন্য যারা আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।

১৪ ডিসেম্বর কেন আলাদাভাবে বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয় তা নিয়েও যে গোড়া থেকেই প্রশ্ন ওঠে নি তা নয়। উঠেছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগীরা যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে তারই একটি অংশ বুদ্ধিজীবী হত্যা। পার্থক্য শুধু একটি থাকতে পারে। তা হলো, সাধারণ মানুষদের যত্রতত্র বধ করা হয়েছে, বুদ্ধিজীবীদের খবর নিয়ে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছে। দুটো প্রক্রিয়াই

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। তবে ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য আরো জোরদার ব্যবস্থা নেয়া হয়, পরিকল্পিত উপায়ে তাদের তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশকে বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর তাই বুদ্ধিজীবী হত্যাদিবস, গণহত্যাকে স্মরণ করেই।

বুদ্ধিজীবী কারা? বাংলা একাডেমী, *'শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ'* নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছে তাতে বুদ্ধিজীবীদের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। 'বুদ্ধিজীবী' অর্থ লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সকল পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবী।"

পাকিস্তানিরা বুদ্ধিজীবীদের টার্গেট করেছিল কেন? এর একটি কারণ পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ও প্রভাবকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের ধারণা ছিল, এ শ্রেণির প্রেরণাদাতা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীরা। জেনারেল ফজল মুকিম খান ১৯৭৩ সালে লিখেছিলেন, বাঙালিদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ষাটের দশকে সারা পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে প্রভাবিত করে তোলে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে। এ কথাগুলো সত্যি যে, ১৯৫২ থেকে ১৯৭১, এমনকি ১৯৭১ থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংস্কৃতিসেবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমাদের অনেকের চোখে তা এড়িয়ে গেছে। পাকিস্তানিরা তা ঠিকই পর্যবেক্ষণ করেছে। ফলে, এক ধরনের বিশেষ ক্রোধ ছিল বুদ্ধিজীবীদের ওপর।

অপর আরেকটি কারণ হলো, যদি বাঙালিরা জিতেই যায় তারা যেন নেতৃত্বহীন থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে *কোষগ্রন্থ* এ যে যুক্তিটি দেয়া হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত– 'এটা অবধারিত হয় বুদ্ধিজীবীরাই জাগিয়ে রাখেন জাতির বিবেক, জাগিয়ে রাখেন তাদের রচনাবলীর মাধ্যমে, সাংবাদিকদের কলমে, গানের সুরে, শিক্ষালয়গুলোতে পাঠদানে, চিকিৎসা প্রকৌশল রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সান্নিধ্যে এসে। একটি জাতিকে নিবীর্য করে দেবার প্রথম উপায় বুদ্ধিজীবী শূন্য করে দেয়া। ২৫ মার্চ রাতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অতর্কিতে, তারপর ধীরে ধীরে শেষে পরাজয় অনিবার্য জেনে ডিসেম্বর ১০ তারিখ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দ্রুতগতিতে।"

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আমাদের অনেকের ধারণা ডিসেম্বরেই বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যা করা হয়েছিল। আসলে তা নয়। ২৫ মার্চ থেকেই তা শুরু হয়েছিল। এর প্রমাণ, ২৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যা করা হয়। সারা বছর ধরেই এ অপহরণ ও হত্যা চলেছে। আল-বদর আল-শামস গঠিত হবার পর এ হত্যাকাণ্ড জোরদার হয়ে ওঠে মাত্র। অনেকে

ডিসেম্বরের আগেই অপহৃত হয়েছেন কিন্তু তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগী আল-বদর ও আল-শামসরা কতজন বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছে? এর সঠিক হিসাব কিন্তু এখনো পাওয়া যায়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়নে আমরা ব্যস্ত থেকেছি। কিন্তু কারা শহীদ হলেন, খুনি কারা তাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয় নি। এখনো সে চেষ্টা নেয়া হয় নি। এসব যখন মনে হয় তখন আমাদের পুরো শ্রেণিটির প্রতি ধিক্কার জানানো ছাড়া করার কিছুই থাকে না। একবার ভেবে দেখেছেন কি প্রত্যেক জাতির জাতীয় বীর থাকে আমাদের নেই। থাকলেও স্বীকার করি না। আমরা স্বীকার করি তাদের যাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, এবং তারা বিজাতীয়। পৃথিবীর সব দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর প্রথম যে কাজটি করা হয় তাহলো জাতীয় বীরদের প্রতি স্মৃতিতর্পণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ একমাত্র ব্যতিক্রম। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে *দৈনিক বাংলায়* আবেগময়ী এক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছিল– "পরাজয়ের প্রাক-মুহূর্তে বর্বর সামরিক জান্তার আল-বদর ঘাতকচক্র নারকীয় বীভৎসতার যে স্বাক্ষর রেখে গেছে ফ্যাসিস্ট হিংস্রতার ইতিহাসেও তার কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। পঁচিশে মার্চের বিভীষিকাময় রাতে দেশের বুদ্ধিজীবীদের যে অবশিষ্ট অংশটি এদের নৃশংসতা থেকে কোনোমতে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তারাও এই হায়েনাদের মত্ততার নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হলেন। রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে জল্লাদদের বধ্যভূমিতে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গলিত বিকৃত সবগুলো মানবীয় বিবেককে প্রতিমুহূর্তে এক নিদারুণ যন্ত্রণায় রক্তাক্ত করেছে। সভ্যতার অনুশাসনে যারা বিশ্বাসী, বিশ্বাসী যারা নৈতিক মূল্যবোধে এই বর্বরতাকে কিছুতেই তারা ক্ষমা করতে পারবে না।" কিন্তু ক্ষমা করা হয়েছে। এখানে যুদ্ধাপরাধী, আল-বদরদের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, এমপি করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগে স্বাধীনতা-জাদুঘর হয় নি কিন্তু তিনদশক আগে সামরিক জাদুঘর হয়েছে এবং বিএনপি সরকারের আমলে শহরের সবচেয়ে দামী এলাকায় তা স্থানান্তরিত হচ্ছে। এ জাতি এসবই মেনে নিয়েছে।

এ-সমস্ত কর্মকাণ্ড হয়েছে আমাদের একাংশের সহযোগিতার কারণে। এর ফলে দেশে দীর্ঘদিন কায়েম থেকেছে প্রগতিবিরোধী শাসন, থাবা বিস্তৃত হয়েছে মৌলবাদের। প্রায় সময় আমাদের নিশ্চুপ থাকার কারণ, আমাদের অনেকে এর বিনিময়ে ইউনিফর্মধারী ও ইউনিফর্মহীন বা ইউনিফর্ম-প্রভাবিত শাসকের কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছি। তবে একথা বলা ভুল হবে যে, নিরস্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ এতে অপমানিত বোধ করে নি। তাদের ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছিল জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে।

২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, হিটলার জার্মানিতে সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের নিধন করেছিলেন। এরপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশেই প্রথম বৃহৎ আকারে গণহত্যা ও সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। এই প্রকল্পের পরিকল্পক পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এবং পোগ্রাম কার্যকর করার দায়িত্বে ছিল স্থানীয় অবাঙালি ও বাঙালিরা যারা ছিল আল-বদর বা আল-শামসের সঙ্গে যুক্ত।

সামরিক জান্তার পক্ষে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ছিলেন বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক। এ অনুমান আমাদের তো বটেই, বাইরের অনেকেরও। রাওয়ালপিন্ডিতে এক সাক্ষাৎকারে আমি ফরমান আলীকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন তবে একপর্যায়ে স্বীকার করেন ৯ কি ১০ তারিখ তিনি পিলখানা গিয়েছিলেন এবং সেখানে বেশ কিছু গাড়ি পার্কিং করা অবস্থায় দেখেছিলেন। তার একটি নোটে লেখা আছে– 'আল-বদরদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা'। তাতে মনে হয় ৯ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত আল-বদরদের বিভিন্ন গ্রুপকে গাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা তিনিই করেন এবং আলবদররা এসব গাড়িতে করে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ করে। যাদের অপহরণ করা হয়েছিল তাদের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, অপহরণ করার জন্য গাড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ সময় যানবাহনের অভাব ছিল। এসব গাড়ি না-পাওয়া গেলে হত্যা-পরিকল্পনা সম্পন্ন করা যেত না। আলতাফ গওহর ইসলামাবাদে এক সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন, কবি সানাউল হকের নাম ছিল তালিকায়। তবে এক বন্ধুর মারফত রাও ফরমান আলীকে অনুরোধ করায়, তার ভাষায় "ফরমান ড্রয়ার থেকে একটি তালিকা বের করে তার নামটি কেটে দেন।"

এ-বিষয়ে ১৯৭১ সালে গঠিত বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান খানিকটা আলোকপাত করেছিলেন। ভারতের সাপ্তাহিক *নিউ এজ* পত্রিকায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে এক সাক্ষাৎকারে জানান–

"আল বদরদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করতে যেয়ে আমরা একই সাথে অপরাধীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে যখন নিহত বাবা ও ভাইয়ের দেহের অবশেষ ঢাকার বধ্যভূমিতে খুঁজে ফিরছিলেন তখন আমাদের ধারণা ছিল যে দখলদার পাকিস্তানি শাসকদের নিশ্চিত পরাজয় উপলব্ধি করে সন্ত্রস্ত গোড়া ধর্মধ্বজী পশুরা ক্রোধান্ধ হয়ে কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছে। কিন্তু পরে বুঝেছি ঘটনা তা ছিল না। কেননা এই হত্যাকাণ্ডের শিকার যারা হয়েছেন তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি স্থানীয় এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

আল-বদরবাহিনীর ধর্মান্ধ ও মুর্খ লোকদের কাছ থেকে সব লেখক ও অধ্যাপকই এক রকম ছিলেন। জহির রায়হান বলছিলেন এরা নির্ভুলভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবীদেরকে বাছাই করে আঘাত হেনেছে। এ থেকে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় যে, আল-বদরের এই স্বেচ্ছাসেবকরা 'অপরের ইচ্ছা কার্যকরী করার বাহন ছিল মাত্র।' কিন্তু কারা এই খুনিদের পেছনে ছিল?

সংগৃহীত দলিল ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায়, শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তানদের হত্যার কাজে নিয়োজিত অন্ধ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত গুন্ডাদেরকে আল-বদর বাহিনীতে যারা সংগঠিত করে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে জড়িত।

পূর্বে উল্লেখিত পাকিস্তানি জেনারেলের (বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলী) ডায়রিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, দুজন আমেরিকান নাগরিক ঢাকা সফর করে। এরা হল হেইট (Height) ও ডুসপিক (Dwespic)।

এদের নামের পাশে ছোট ছোট অক্ষরে ইউএস.এ (U.S.A) ও ডি.জি.আই.এস (D.G.I.S) অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেল অব ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস লেখা ছিল। আর লেখা আছে– 'রাজনৈতিক ৬০-৭২, ৭০। অপর এক জায়গায় লেখা আছে– এ দুজন আমেরিকান পি.আই.এ-এর একটি বিশেষ বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে।'

হেইট ও ডুসপিক কে? ঢাকার দৈনিক বাংলার রিপোর্টে দেখা যায়, হেইট ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। সে ১৯৪৬-৪৯ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে চাকরি করত। ১৯৫৩ সাল থেকে সে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাথে যুক্ত ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে সে আমেরিকান দূতাবাসের রাজনৈতিক কূটনীতিবিদ হিসেবে বহুদেশ ভ্রমণ করেছে। সে কলকাতা এবং কায়রোতেও ছিল। সি.আই.এ এজেন্ট ডুসপিকের সাথে গতবছর সে ঢাকায় ফিরে আসে এবং রাও ফরমান আলীর সাথে তিন হাজার বুদ্ধিজীবীর একটি তালিকা তৈরি করে। জেনারেলের শোবার ঘরে এই তালিকা পাওয়া গেছে।

নিহত বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, আল-বদরবাহিনীর পরিকল্পিত হত্যার কাজে বিদেশী মুখোশ, ছদ্ম পোশাক ও ছোরা ব্যবহার করা হয়েছে। গণহত্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

স্বভাবতই পাকিস্তানি সেনাপতি ও সি.আই.এ-চরদের মধ্যেকার এই যোগাযোগ গোপন ব্যাপার ছিল। আল-বদরবাহিনীর সাধারণ কর্মীরা এ-সম্পর্কে কিছুই জানত না। আবার এই সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হোতারা এবং জামাতে ইসলামী দলের নেতারা অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর আশায় আমেরিকা ও পিকিং নেতাদের সাথে পাকিস্তানের সামরিক একনায়কের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা প্রচার করত। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় জামাতে ইসলামীর সম্পাদক

প্রকাশিত এক প্রচার পত্রের ভাষা হলো ঃ বিদেশে আমাদের বন্ধুরা আছেন। চীন ও আমেরিকা আমাদের সমর্থক বন্ধু-দেশ।"

[*একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়* থেকে উদ্ধৃত]

বুদ্ধিজীবী হত্যায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল আল-বদরবাহিনী। সারা পাকিস্তান আল-বদরবাহিনীর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। আল-বদর হাইকমান্ডের যারা এখন স্বচ্ছন্দে টাকা-পয়সা করে রাজনীতি করছে তাদের মধ্যে নিজামী ছাড়াও ছিলেন এবং আছেন জামাতের আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসেম আলী, মোহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, আশরাফ হোসাইন, মোহাম্মদ শামসুল হক, আ শ ম রুহুল কুদ্দুস, সরদার আবদুস সালাম, আবদুল জাহের, মোহাম্মদ আবু নাসের প্রমুখ। জেনারেল জিয়া ওদের পুনর্বাসিত করেন।

এদের চেলাচামুণ্ডাদের মধ্যে ছিল খালেক মজুমদার, 'মওলানা' মান্নান, আবদুল আলীম, চৌধুরী মঈনুদ্দিন প্রমুখ। সারাদেশে, বিশেষ করে ঢাকায় এরকম অনেক ছোট আলবদর ছিল। আল-বদরদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি। জানা বা তালিকা প্রণয়নের প্রচেষ্টাও করা হয় নি। ১৪-৯-৭১ তারিখে জামাতের মুখপত্র *সংগ্রামে* একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যাতে লেখা ছিল–

"আল-বদর একটি নাম! একটি বিস্ময়! আল-বদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আল-বদর সেখানেই। যেখানেই দুষ্কৃতকারী আল-বদর সেখানেই, ভারতীয় চর কিংবা দুষ্কৃতকারীদের কাছে আল-বদর সাক্ষাত আজরাইল।"

আল-বদর ও আল-শামস গঠিত হয়েছিল প্রধানত জামাতে ইসলাম ও ছাত্র শিবিরের কর্মী ও সমর্থকদের দ্বারা। সারা বছর ধরে তারা হত্যাকাণ্ড চালালেও, পরাজয় আসন্ন জেনে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তারা মরণ কামড় দেয়। এ-সম্পর্কে সে-সময়কার *দৈনিক বাংলায়* ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল একটি প্রতিবেদন–

"এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে গত সপ্তাহ ধরে জামাতে ইসলামীর আল-বদর।

'শহরের কয়েকশ' বুদ্ধিজীবী ও যুবককে এরা ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিকভাবে হত্যা করেছে।

গতকাল রায়ের বাজার ও ধানমন্ডি এলাকার বিভিন্ন গর্ত হতে বহু সংখ্যক লাশ উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের লাশও রয়েছে। এ-পর্যন্ত কতিপয় ব্যক্তির লাশ শনাক্ত করা গেছে। অনেক লাশই বিকৃত হয়ে গেছে, চেনার উপায় নাই। গত একসপ্তাহে যতজন নিখোঁজ হয়েছেন অনুমান করা হচ্ছে যে, এদের একজনকেও আল-বদর রেহাই দেয় নি।

"ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামীর ছাত্রসংস্থা ইসলামী ছাত্রসংঘের সশস্ত্র গ্রুপ আল-বদর এই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরী মুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একসপ্তাহে শহরের কয়েকশত বুদ্ধিজীবী ও যুবককে ধরে নিয়ে যায়।"

সমন্বয়ের রাজনীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের হয়ত এ বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য না-ও মনে হতে পারে। কারণ তা প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে একটি দৈনিকে। সে-জন্য তৎকালীন বিখ্যাত সাংবাদিক নিকোলাস টোমালিনের একটি বিবরণ (বঙ্গানুবাদ)–

'...বধ্যভূমিটি হচ্ছে ঢাকা শহরের মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা ধানমন্ডির কাছে একটি ইটখোলা। এটি একটি অদ্ভুত নির্জন জায়গা, যদিও নীলচে-শাদা এঁদো জলাশয়গুলোতে কচুরিপানা ভেসে বেড়ায়।

শত শত ঢাকাবাসী আজ এখানে এসেছিলেন। মৃতদেহ গুলো দেখার জন্য কাদামাটির পাড় ধরে হাঁটতে থাকা লোকদের অনেকেই নিজেদের আত্মীয় স্বজনের লাশ খুঁজছিলেন।

...এখানে এই বুদ্ধিজীবীরা এখনো শুয়ে আছেন ঃ তাদের শরীরের ওপর জমেছে ধুলো-কাদা, দেহগুলো গলতে শুরু করেছে। একটি বাধের ওপর একটি কংকাল পড়ে রয়েছে ঃ ঢাকার কুকুরগুলো নাটকীয়ভাবে দেহটিকে মাংসমুক্ত করে ফেলেছে।

বাঙালি জনতা এই ডোবাগুলোতে এক অদ্ভুত শান্ত ভঙ্গিমায় চলাচল করছে। এখানে তাদেরকে ক্রোধান্বিত মনে হয় না। অন্যত্র তারা ক্রোধোন্মুক্ত। কিন্তু ঐখানে তারা হাঁটছে, মৃদু ফিসফিস করে কথা বলছে, তারা যেন গীর্জা পরিদর্শনরত পর্যটক।

আল-বদর, আল শামসদের ওপর বিস্তারিত লেখা হয়নি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়েও কোনো সরকার মাথা ঘামায় নি। তবে, আমাদের লজ্জা দিয়ে বৃটেনে নির্মিত হয়েছে একটি তথ্যচিত্র যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

তথ্যচিত্রটির মূল প্রতিপাদ্য ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গণহত্যার সঙ্গে জড়িত তিন ব্যক্তি– চৌধুরী মঈনুদ্দিন, লুৎফর রহমান ও আবু সাঈদ এখন লন্ডন ও বার্মিংহামে বসবাস করছেন। ইংল্যান্ডের বাঙালি সমাজে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠান করেছেন এবং বৃটিশ নাগরিক হিসেবে মৌলবাদী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে নানা উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন। সুতরাং ১৯৫৭ সালের জেনেভা চুক্তি অনুসারে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বৃটেনে তাদের বিচার হওয়া উচিত।

'ডেসপ্যাচ' থেকে যে-বিষয়টি আমাদের এবং নির্মূল কমিটির শিক্ষণীয় তা হলো অভিযোগ উত্থাপনের পদ্ধতি। ডেভিড বৃটেনে বসবাসরত যে তিন জনকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে শনাক্ত করেছেন তাদের মধ্যে একজন ছিল ঢাকায় আল-বদরের

অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দিন। অপর দুজন সিলেটের লুৎফর রহমান ও আবু সাঈদ। তিনি এদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণাদি যোগাড় করে এমনভাবে মামলা দাঁড় করিয়েছেন যে, এদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বর্তমান যা অবস্থা তাতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না। কিন্তু শহীদ পরিবাররা বিচার চায়। বৃটেনে যুদ্ধাপরাধীদের স্থান নেই। ঐ তিন জন যুদ্ধাপরাধী এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। মঈনুদ্দিন বলেছে, "আমি কখনো আল-বদর ছিলাম না। গণহত্যার সঙ্গে জড়িত নই"। প্রশ্ন জাগে, যদি তা না-ই হয় তা হলে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের পর পর কেন দেশ ত্যাগ করেছিল? এবং ডেসপ্যাচ প্রদর্শিত হওয়ার পর কেনই-বা গা ঢাকা দিয়েছে?

বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়ে চিহ্নিত অনেকের বিচার চলছে কয়েকজন সাজাও পেয়েছেন। আগেই উল্লেখ করেছি বরং তাদের সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল। এ রকম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

৩

বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের বিচার কি দাবি করা হয় নি? ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকেই বিচার দাবি করা হয়েছে। নিবন্ধের শেষে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কিছু সংবাদাবলী সংকলন করা হয়েছে। এ সব সংবাদ তুলে ধরে যুদ্ধাপরাধীদের কার্যাবলীর বিবরণ যার অনেক কিছুই আমরা ভুলে গেছি। শুধু তাই নয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যে সব সময় দাবি করে আসা হচ্ছে সংকলিত সংবাদগুলিই তার প্রমাণ। শুধু তাই নয় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল 'চারুকলা ও সাহিত্য-সংক্রান্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন করা হবে।' তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, হত্যার বিচার হবে। বঙ্গবন্ধুও তো স্বপ্ন দেখেছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের।

বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জোরালো হয়ে উঠলে ২৫ ডিসেম্বর (১৯৭১) *দৈনিক বাংলা* লিখেছিল–

"আল-বদরবাহিনীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। এই কমিটিকে সরকারের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। তাদের তদন্তের ভিত্তিতেই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পশুদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জেনেভা কনভেনশনের অছিলায় যাতে তারা নিষ্কৃতি না পায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যদি এসব দুর্বৃত্ত রেহাই পেয়ে যায়, তবে এদেশের নিহত নিরপরাধীদের আত্মা কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না।"

অবশেষে বুদ্ধিজীবীরা নিজেই তদন্ত কমিশন গঠন করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির আশ্বাসে কাজ শুরু করেন। কমিটির আহ্বায়ক জহির রায়হান নিজেই এরপর নিখোঁজ হয়ে যান।

এরপরের ঘটনা উদ্ধৃত করছি।' *একাত্তরের ঘাতক দালাল কে কোথায়* থেকে– "৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির উদ্যোগ থামিয়ে দেয়া হয়। কমিটি ইতোমধ্যে যে-সমস্ত তথ্য প্রমাণ উদ্ধার করেছিল কলকাতার একটি পত্রিকার একজন সাংবাদিক ভারতে নিয়ে চলে যান।

২১ ডিসেম্বর তারিখে আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিশিষ্ট সমর্থক বৃটেনের সাবেক মন্ত্রী জন স্টোনহাউজ বলেন যে, বাংলাদেশের শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার ব্যাপারে পাকিস্তানি বাহিনী যে জড়িত ছিল তার প্রমাণ তার কাছে রয়েছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন এই হত্যাকাণ্ড চলছিল তখন মি. স্টোনহাউজ ঢাকাতেই ছিলেন। সাক্ষাৎকারে মি. স্টোনহাউজ বলেন, বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন থেকে জেনারেল পদমর্যাদার দশ জন সামরিক অফিসারকে তিনি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই অফিসারদের নাম প্রকাশে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি এ-বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করার জোর দাবি জানান। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত মুখ্য দালালদের নামও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন বলে তিনি জানান।

এই দশ জন অফিসারের পরিচয় এবং বুদ্ধিজীবী হত্যা-সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলপত্র আর কখনই আমাদের হস্তগত হয় নি। এদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ সরাসরিভাবে পরিচালনাকারী দুই অফিসার জেনারেল নিয়াজী এবং জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ২০ ডিসেম্বর একটি বিশেষ বিমানে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পর কড়া সামরিক প্রহরায় কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত অন্যান্য অফিসারকেও অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়।

২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ৩৯ জন বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচারের দাবি করেন। ঐ একই দিন বাংলাদেশ বেতার জানায় বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী–

Murder of Intellectuals

...Including those who were killed on the 25th March. They urged upon the government to provide all facilities including free education-to the members of the bereaved families.

The signatories to the statement were Poet Shamsur Rahman,

Mr. Abdul Aziz Senior advocate, Supreme Court, Mustafa Kamal. Barrister, Hasan Hafizur Rahman, Ahmed Rafique Editor Nagraik, Begum Ferdousi Rahman, Sardar Jainuddin, Mr. Ahmed Humayun, Neamul Bashir, Fazal Shahabuddin. Aminul Islam Bedu, Mr. Anwar Husain Khan and Mr. Mustafa Jaman Abbasi.

Bangladesh Observer 28.12.1971

হত্যাকারী কারা?
৩৯ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি
খুনীদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গণ্য করতে হবে

গতকাল সোমবার মুজিবনগরে ৩৯ জন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীদের দানবীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কোনরূপেই ক্ষমা করা যায় না।

বিবৃতিতে তারা বলেন, উক্ত ব্যক্তিদের যুদ্ধবন্দি নয়, বরং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী অন্যদের মধ্যে রয়েছেন, সিকান্দার আবু জাফর, জনাব শওকত ওসমান, ড. আনিসুজ্জামান, ড. এ আর মল্লিক, জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী, ড. সরওয়ার মুর্শেদ, মিসেস সনজিদা খাতুন, রণেশ দাশগুপ্ত ও জনাব কামরুলহাসান।

বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে উপরোক্ত বিষয় প্রচার করা হয়।

রাও ফরমান আলীই দায়ী

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ বেতার ও ভারতীয় বেতারের এক খবরে বলা হয় যে, বাংলাদেশে সম্প্রতি ৩৪০ জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যার পেছনে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত গভর্নর ডঃ মালেকের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীসহ অন্যান্য সামরিক অফিসারের হাত রয়েছে। এতে বলা হয় যে এই ঘৃণ্য নারকীয় হত্যালীলার জন্য দায়ী অন্যান্য সামরিক অফিসারদের নামও শিগগিরই প্রকাশ করা হবে।

গতকাল সোমবার ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারের একজন বিভাগীয় সেক্রেটারি উপরোক্ত বিষয় জানান বলে বেতারে উল্লেখ করা হয়।

দৈনিক বাংলা ২১.১২.১৯৭১

অন্যদিকে সংবাদপত্রগুলিতেও আলবদরদের খবরাখবর বেরুচ্ছিল। কিন্তু কেউ সেগুলি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিল বলে মনে হয় না। যদি নেয়া হতো, অন্তত যাদের নাম ছিল তাদের গ্রেফতার করা হতো। বা মুক্তিবাহিনীর যদি সুশৃঙ্খল গোয়েন্দা

বাহিনী থাকত যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পার্টিজানদের ছিল ইউরোপে তা হলে তারাই ব্যবস্থা নিতে পারতো। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য সে রকম কোন ব্যবস্থা ছিল না বা ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি সংবাদের উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

এরাই হলো নরপিশাচ আলবদর

[স্টাফ রিপোর্টার]

ফ্যাসিস্ট পাকিস্তানী বাহিনী স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের নির্বিচার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য যে খুনী বাহিনী গড়ে তুলেছিল, যারা তাদের পাকিস্তানী প্রভুদের রক্তলোলুপতা ও জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার পৈশাচিক উল্লাসে অসংখ্য নিরীহ বাঙালির রক্তে হোলি খেলেছে, নিষ্ঠুর নির্যাতন করে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে, ঘর-বাড়িতে আগুন দিয়েছে, নারী নির্যাতন করেছে, দুধের শিশুকে বেয়নেটের খোঁচায় আর বুটের তলায় পিষে মেরেছে সম্প্রতি সেই আলবদর পশুবাহিনীর একটি দলের নেতা ও তাদের রক্তপিপাসু সহচরদের নাম জানা গেছে।

গতকাল মঙ্গলবার রমনা থানায় এহেন একটি দল সম্পর্কে এজাহার দেয়া হয়েছে। আলোচ্য দলটির সদস্যরা সকলেই ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার বিশেষ একটি দলের সদস্য। এদের নেতা হচ্ছে আলিয়া মাদ্রাসা ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নুরুল হক।

এই দলটিতে মোট কতজন সদস্য আছে তা জানা যায়নি, তবে বকসিবাজার অঞ্চলের জনসাধারণ অনেকেই তাদের নৃশংস কার্যক্রম সচক্ষে দেখেছেন। বস্তুতপক্ষে আলবদর বাহিনীর ঐ দলটি উক্ত অঞ্চলে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন দুর্বহ করে তুলেছিল।

উপরের ছবিতে [ছবি ছাপা হলো না] এই খুনীদের নেতাকে দেখা যাচ্ছে। এদের একটি গ্রুপফটোও আমাদের হস্তগত হয়েছে। রমনা থানায় এ সম্পর্কীয় জিডি নম্বর হচ্ছে ১৪৮২।

আলিয়া মাদ্রাসা বদর বাহিনী ইউনিটের অন্যান্য সদস্য হচ্ছে সাঈদ আহমদ, সাব্বির আহমদ, হেলাল উদ্দীন, আলতাফুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, জোবায়ের, শফিকুল্লাহ খান, হাবিবুর রহমান ও আবদুল্লাহ।

দৈনিক বাংলা ২২.১২.১৯৭১

এদের ধরিয়ে দিন। জল্লাদ বদর বাহিনীর সদস্যদের আরো কয়েকটি নাম

[স্টাফ রিপোর্টার]

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের নির্মূল করার জন্য বাংলার জঘন্যতম শত্রু ফ্যাসিস্ট জামাতে ইসলামী যে মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল এবং যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আলবদর নামে জল্লাদ বাহিনী গঠন করেছিল। তাদের সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

আমাদের হাতে এসেছে।

এই জল্লাদদের ট্রেনিং কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত লালমাটিয়ার শরীর চর্চা কেন্দ্র থেকে উদ্ধার করা এইসব তথ্যে বদর জল্লাদদের আরো কয়েকজনের নাম পরিচয় ঠিকানা পাওয়া গেছে।

নিচে এই নাম ঠিকানা প্রকাশ করা হলো। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য বলে উল্লেখিতদের সবারই স্থানীয় ঠিকানা দেয়া হয়েছে ১৫ পুরানা পল্টন। এটি ছিল ইসলামী ছাত্রসংঘের কার্যালয়।

প্রথম চৌদ্দজনের নাম ঠিকানা ও বিবরণ সাইক্লোস্টাইল করা ফরমে পাওয়া গেছে। এদের ধরে থানা বা মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে পৌছে দেবেন। কেউ নিজের হাতে এদের শাস্তি দেবেন না। কারণ এদের কাছে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।

১। মোঃ শাহজাহান ভূইয়া, দ্বিতীয় বর্ষ বিএ অনার্স, ২৬০ মহসীন হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঠোঁটে বসন্তের দাগ আছে। পিতা মৃত হাজী মোঃ আফসারউদ্দিন ভূইয়া, গ্রাম খলাপাড়া, পোঃ বাজার হাসনাবাদ, থানা ঃ রায়পুর, টঙ্গী, ঢাকা।

২। মোঃ আক্তারুজ্জামান, পিতা মুন্সী এ আলী, দশম শ্রেণীর ছাত্র। ডান হাতে একটি কালো দাগ আছে। পোঃ ও গ্রাম ঃ তারাগাঁও, থানা কাপাসিয়া, ঢাকা। ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্য।

৩। ওসিউদ্দিন আহমেদ, পিতা মোঃ সামসুল হক, শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি, বাম হাতের কনুইয়ের বিপরীত দিকে একটি কাটা দাগ আছে। গ্রাম ঃ ভাওয়ার ভিটি, পোঃ বাঘের, থানা কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্য।

৪। মোঃ মোমদেদুজ্জামান, পিতা সাজেদুল মোনায়েম, এসএসসি পরীক্ষার্থী, গ্রাম উজুলী, পোঃ টুকনয়ন বাজার, থানা-কাপাসিয়া, ঢাকা, বাঁ হাতে একটি কাটা দাগ। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য।

৫। ফিরোজ মাহবুব কামাল, পিতা মোঃ শাহাবুদ্দীন, দ্বিতীয় বর্ষ এমবিবিএস পরীক্ষার্থী, চোখের দুই ভুরুর মাঝখানে একটি কালো চিহ্ন। গ্রাম কাদিরপুর, পোঃ খোকসা, জেলা কুষ্টিয়া। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য।

৬। এসএম জহুরুল ইসলাম, পিতা কফিলুদ্দীন, এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম বেলদি, পোঃ পুতিনা, স্থানীয় ঠিকানা গ্রাম, পোঃ ও থানা জয়দেবপুর ঢাকা।

৭। মোঃ আবুল হোসেন, বয়স ১২ বছর। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। পিতা মোঃ আবদুল হামিদ হাওলাদার, স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম ঘাটাশিয়া, পোঃ গাবুয়া, থানা মির্জাগঞ্জ, জেলা পটুয়াখালী। স্থানীয় ঠিকানা ৪/২৫ ডিআইটি ভবন,

নারায়ণগঞ্জ। বাঁ হাতের অনামিকায় একটি কাটা দাগ।

৮। মোঃ কবিরুদ্দীন, পিতা মোঃ আবুল হাশেম, পোঃ ও গ্রাম সারিফল, থানা গৌরনদী, জেলা বরিশাল, ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য, বাঁ হাতের আঙ্গুলে একটি তিল।

৯। মোঃ শামসুল ইসলাম খান, পিতা মোঃ সোবেদার আলী খান, আইএ পরীক্ষা দিয়েছে। মুখে স্মল পক্সের দাগ ও ডান হাতের তিন আঙ্গুলে পোড়া দাগ। স্থানীয় ঠিকানা ১০৯, হাজী ওসমান গনি রোড, ঢাকা-১। স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম সোনাতলা, পোঃ শিকারীপাড়া, থানা নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা।

১০। মোঃ আবদুল মতিন, পিতা নূর মোহাম্মদ, চতুর্থ বর্ষ এমবিবিএস ছাত্র, ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য, ডান চোখের ভুরুতে একটি কাটা দাগ। গ্রাম তুলাছরা, পোঃ গোপালপুর, জেলা নোয়াখালী।

১১। মোঃ নসরত-এ খুদা, পিতাঃ ডাঃ নওশের আলী, ২য় বর্ষ এমবিবিএস, ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য, বাঁ পায়ে একটি কাটা দাগ। গ্রাম নাসিমপুর, পোঃ সিরাজগঞ্জ বাজার, পাবনা।

১২। এমএম আবদুল হাই, পিতা এফ এম আনোয়ারুল্লাহ, ঢাকা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এমএম। স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম মহম্মদপুর, পোঃ থানারহাট, জেলা নোয়াখালী, স্থানীয় ঠিকানা ঃ আলিয়া মাদ্রাসা হোস্টেল, বক্সীবাজার, ঢাকা।

১৩। মোঃ মাজেদ আলী (বিবাহিত), পিতা মোঃ ওয়েজউদ্দীন হাওলাদার, বিকম প্রথম বর্ষ। গ্রাম ও পোঃ এনায়েতনগর থানা কালকিনি, জেলা ফরিদপুর। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য। উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, পাতলা গড়ন।

১৪। খোন্দকার নজমুল হুদা, পিতা খোন্দকার আবদুল মান্নান, ১ম বর্ষ এমবিবিএস, বাঁ হাতের অনামিকায় পাতার দিকে একটি দাগ আছে। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য। গ্রাম শোসালিয়া, পোঃ সাহাবপুর, জেলা-নোয়াখালী।

নারায়ণগঞ্জের আল-বদরের তালিকা

১৫। মোঃ মুইনুদ্দীন পিতা মোঃ আবদুল হাকিম, ৪/২৫ ডিআইটি ভবন, নারায়ণগঞ্জ। স্থায়ী ঠিকানা ঃ পোঃ ও গ্রাম কুকুটিয়া, থানা ঃ শ্রীনগর, ঢাকা।

১৬। মোঃ নাসিরুদ্দীন, পিতা মোঃ নসিরুদ্দীন, ৪/২৫ ডিআইটি ভবন নারায়ণগঞ্জ। পোঃ ও গ্রাম ঃ গোয়ালমারি, থানা ঃ দাউদকান্দি, জেলা ঃ কুমিল্লা।

১৭। মোঃ জামালউদ্দীন, পিতা আবদুল গনি সিকদার, ৪/২৫ ডিআইটি ভবন, নারায়ণগঞ্জ। স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম ঈশ্বরকাটি, পোঃ ও থানা নরিয়া, ঢাকা।

১৮। জালালউদ্দীন মোঃ মনসুর আলম, পিতামৃত এম এ সালাম ৭৪ উত্তর চাষাড়া,

পোঃ নারায়ণগঞ্জ, থানা-ফতুল্লা।

১৯। মোঃ সোলায়মান, পিতা মোঃ আজিজউল্লাহ, বর্তমান ঠিকানা পোঃ ও গ্রাম নবীগঞ্জ, থানা-নারায়ণগঞ্জ।

২০। মোঃ বোরহানউদ্দীন, পিতা আবদুল বারিক মিয়া, গ্রাম সিঙ্গাপাড়া, পোঃ কোলা, থানা ঃ শ্রীনগর জেলা ঢাকা।

২১। মোঃ রিজওয়ান আলী, পিতা মোঃ মনসুর হিলাল, গ্রাম ও পোঃ নবীনগর, থানা নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

দৈনিক বাংলা, ২৯-১২-১৯৭১

এ লোকটিকে এখনও ধরা যায়নি

[পূর্বদেশ রিপোর্ট]

বধ্যভূমি শিয়ালবাড়ির জল্লাদদের একজন এই এস. খান। তার আসল নাম এখনও জানা যায়নি। তবে এ কথা সত্যি যে, শিয়ালবাড়ির বধ্যভূমিতে বাঙালিদের নিধন করার জন্য হানাদার বাহিনী যে ক'জন জল্লাদকে নিযুক্ত করছিল তার অন্যতম প্রধান ছিল এই এস খান।

বড়ই দুর্ভাগ্য, এই নরঘাতক পশু এখনও ধরা পড়েনি। অথচ এস, খানের অত্যাচার অনুচারের কথা জানে না এমন লোক মিরপুর এলাকায় নেই।

এস, খান জীবিত আছে এবং নিরাপদে মিরপুরের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ কথা শুনে শিয়ালবাড়ির লোকজন আতঙ্কিত সন্ত্রস্ত। এই খুনীকে কয়েকদিন আগে ১২ নম্বর সেকশনে দেখা গিয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'পূর্বদেশে'ই প্রথম মিরপুরের খুনীদের আড্ডাখানার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এরপর বাংলাদেশ বাহিনী খুনীদের বিভিন্ন আড্ডাখানায় তল্লাশি চালিয়ে বহু অস্ত্রসহ তাদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন।

কিন্তু এই নরঘাতক পশুটি ধরা পড়েনি।

পূর্বদেশ, ১-৩-১৯৭২

হোসেনের হত্যাকারী কি এ লোকটি?

[সালেহউদ্দিন প্রদত্ত]

নাম তার মোহাম্মদ ইসরাইল খান। পেশায় রেলগাড়ির চালক। বাসা ছিল শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনি। হয়ত বছরখানেক আগেও সে ছিল আর দশজন শ্রমজীবী মানুষেরই একজন। কিন্তু আজ তার পরিচয় ভিন্ন। আজ সে বিগত ন মাস ব্যাপী ত্রাসেরই প্রতিচ্ছবি।

ইসরাইলের পালকপুত্র এবং তার কুকীর্তির অন্যতম সহযোগী খলিল

জানিয়েছে, পিতার অনুচরদের কাছে সে শুনেছে, তারাই ইত্তেফাক পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দীন হোসেনকে হত্যা করেছে। এ কাজে প্রধান উদ্যোক্তা নাকি ছিল ইত্তেফাকের এককালীন দারোয়ান এবং ইসরাইলের ভায়রা ভাই সানাউল্লাহ। জনাব হোসেনকে নাকি নটরডেম কলেজের কাছে হত্যা করা হয়।

মার্চ মাসে পাক বাহিনী বাংলার উপর ঝাপিয়ে পড়ার পর ইসরাইল তাদের সাথে ভিড়ে যায়। পরে রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে শাহজাহানপুর এলাকায় অসংখ্য হত্যা, লুণ্ঠন আর নারী নির্যাতনের নায়কে পরিণত হয়। এককালের শ্রমজীবী ইসরাইল হয়ে ওঠে মুর্তিমান ত্রাস।

গত সোমবার ইসরাইল ফকিরাপুলে রক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। শাহজাহানপুর এলাকার দায়িত্ব নাকি ছিল হানাদার বাহিনীর কাপ্তান আবদুল কাইয়ুমের হাতে। রাজাকার নেতা ইসরাইল ছিল সেই নারীলোলুপ নরপশুর দক্ষিণ হস্তবিশেষ। সে পাশের বস্তি এলাকা থেকে মেয়েদের জোর করে কলোনিতে আটকে রাখতো তার পাকিস্তানি প্রভুদের ভোগের জন্য। এ কাজে ইসরাইলের বাঙালি পত্নীও নাকি ছিল সহযোগী– সে নিরাপদ আশ্রয়ের প্রলোভনে কলোনিতে টেনে এনে অসংখ্য মেয়ের সর্বনাশ করেছে।

ইসরাইলের পালকপুত্র মোহাম্মদ খলিল পিতা-মাতার এসব কীর্তির সাক্ষ্য দেয়।

ইসরাইল ও তার সঙ্গীরা বহু লোককেই হত্যা করেছে। তার মাঝে রেলওয়ে স্কুলের শিক্ষক মীর মোশাররফ হোসেন, রেলওয়ের ইলেকট্রিক্যাল চার্জম্যান আনওয়ার হোসেন ও বেবিট্যাক্সি চালক আবদুস সোবহানের নাম জানা গেছে।

গত ৬ই ডিসেম্বর বিকেলেও ইসরাইল কলোনি এলাকায় ব্যাডমিন্টন খেলারত কয়েকজন তরুণ এবং উপস্থিত দর্শকদের গুলি করে হত্যা করে।

ইসরাইল ও তার সঙ্গীরা হত্যা আর নারী নির্যাতন ছাড়াও লুণ্ঠনের এবং ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়ের অপরাধে অপরাধী।

ওরা মীর মোশাররফ হোসেনকে হত্যার দু'দিন আগে তার অফিসে গিয়ে তাকে জানায়, "আপকা দিন খতম হো রাহা হ্যায়।"

বদর বাহিনীর কমান্ডার

ঢাকায় বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞের অন্যতম নেতা শওকত ইমরান গত ১৬ই ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ রয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাকে খুঁজছেন। সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বর্ষের ছাত্র।

প্রসঙ্গত, বলা যায় যে কুখ্যাত জামাতে ইসলামীর ঢাকা শহর অফিস সেক্রেটারী আবদুল খালেক পুলিশের কাছে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যে বিবরণ দেয়, তাতে শওকত ইমরানের নামও রয়েছে। তার বর্ণনা অনুযায়ী এই নরপশু ধানমন্ডিস্থ সিটি নার্সিং হোমে অবস্থিত তৎকালীন আলবদরের ক্যাম্প কমান্ডার ছিল।

তার বাড়ি ফেনী শহরে। পিতার নাম ডাঃ বশীর। সে ছাত্র জীবনের শুরু থেকে ইসলামী ছাত্র সংঘের একজন সক্রিয় কর্মী এবং পরে নরঘাতকদল আলবদরের সদস্য। শওকত ইমরান বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রধান হোতা ও অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দিনের প্রধান সহকারী হিসেবে কাজ করেছে। এই খুনী জল্লাদ এখনো ফেরার এবং একে ধরা গেলে তার কাছ থেকে আরো তথ্য জানা যাবে।

আবু হানিফা আফ্রাদ

আবু হানিফা আফ্রাদ নামক রাজাকার বাহিনীর এই সদস্যটিও ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল। এই খুনীও বর্তমানে ফেরার।

পূর্বদেশ ১.৩.১৯৭২

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ২৪ তারিখ আবারও দেশের বিশিষ্ট জন বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার দাবি করেন।

৫২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতি

বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অধ্যাপক, সাংবাদিক ও শিল্পী এক যুক্ত বিবৃতিতে সম্প্রতি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত বুদ্ধিজীবীদের জঘন্যভাবে হত্যার পর পূর্ণ তথ্য উদঘাটনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বেগম সুফিয়া কামাল ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনসহ মোট ৫২ জন স্বাক্ষর করেছেন।

তারা আরো বলেন যে, যারা এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে তাদের জেনেভা কনভেনশনের আওতার মধ্যে না ধরে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাক্ষরকারীগণ ভিয়েতনামের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য পরলোকগত লর্ড বার্ট্রান্ড রাসেল, জা পল সাঁত্রে ও আঁদ্রে মালরোর নেতৃত্বে যেমন আন্তর্জাতিক বিচারকদের সমন্বয়ে কমিশন গঠন করা হয়েছিল, বাংলাদেশে সংঘটিত বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তেমনি কমিশন গঠন করার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক বাংলা ২৫-১২-১৯৭১

জহির রায়হান ২৮ তারিখে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি দেন এবং ২৯ তারিখে বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাই একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। পরদিন তারা অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেন ও আল বদর বা গণহত্যাকারীদের সম্পর্কে তথ্য জানানোর অনুরোধ করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন। ২৮ ডিসেম্বর প্রেসক্লাবের এক অনুষ্ঠানে এনায়েতুল্লাহ খান ও গিয়াস কামাল চৌধুরী একই দাবি জানান। উল্লেখ্য এর চার বছর পর এরা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজনীতিতে সক্রিয় হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ রাজনীতিতে সক্রিয় থেকে বাঙালি রাষ্ট্রের ক্ষতি করে গেছেন–

বুদ্ধিজীবী হত্যা ষড়যন্ত্র উদঘাটনের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদদের হত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আটক এবং তাদের গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য উদঘাটন করার জন্য একটি সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার ঢাকা প্রেসক্লাবে ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী।

গঠিত কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জনাব জহির রায়হান, জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এমএনএ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, জনাব এনায়েত উল্লাহ খান, জনাব হাসান ইমাম ও ডঃ সিরাজুল ইসলাম।

জনাব জহির রায়হান কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

সভায় বক্তৃতা করেন, জনাব জহির রায়হান, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ডাঃ সিরাজুল ইসলাম, জনাব এনায়েত উল্লাহ খান, জনাব আলী আশরাফ, হাসান ইমাম, সরদার জয়েনউদ্দিন, বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব আতাউস সামাদ ও জনাব খোন্দকার আবদুল কাদের।

সভায় আলোচ্য কমিটিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিকেলে প্রেসক্লাবে কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এক সভায় কমিটির নাম 'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি' রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই কমিটি হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধার ত্বরান্বিত করার তাগিদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং দায়িত্বে মুক্তিবাহিনী, মিত্র বাহিনী এবং সরকারি বেসরকারি সদস্য সমবায়ে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সার্বক্ষণিক সংগঠন অনতিবিলম্বে চালু করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যে সমস্ত মৃতদেহ এখনও রায়েরবাজারের বধ্যভূমি ও অন্যান্য স্থানে পড়ে রয়েছে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে দাফন করার জন্য কমিটি আবেদন জানিয়েছে।

এছাড়া যে সমস্ত মৃতদেহ এলোপাতাড়িভাবে মাটিচাপা পড়ে আছে সেগুলোকে উপযুক্ত স্থানে দাফনের ব্যবস্থা করার জন্য এবং প্রয়োজনবোধে এলাকাকে গোরস্তানে পরিণত করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে।

কমিটি জানিয়েছেন যে, প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রেসক্লাবে এই হত্যাকাণ্ডের খবরাখবর কমিটিকে দেয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

এছাড়া নিখোঁজ ব্যক্তি ও নির্যাতন সম্পর্কে কমিটিকে তথ্য জানানোর জন্য

'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি' প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, ঢাকা-২, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে কমিটির কাছে বক্তব্য পেশ করতে চান তাহলে উপরোল্লিখিত সময়ের মধ্যে কমিটির সাথে দেখা করতে পারবেন।

পূর্বদেশ, ৩০-১২-১৯৭১

বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হত্যাকাণ্ড তদন্তের আশ্বাস

ঢাকা, ৩০শে ডিসেম্বর (এপিবি)।- 'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি'র একটি প্রতিনিধি দল আজ বিকেলে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করেছেন। প্রতিনিধি দলটি পাক বাহিনী এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদী আল-বদর কর্তৃক সংঘটিত বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যাপারে তদন্ত চালানোর জন্য মুক্তিবাহিনী, মিত্রবাহিনী, সরকারি এবং বেসরকারি সদস্য নিয়ে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন।

ফ্যাসিবাদী নরঘাতকদের দালাল এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আটক এবং জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে অবিলম্বে এই কমিটির কাজ শুরু করার জন্য এই প্রতিনিধিদলটি জোর দাবি জানান।

প্রতিনিধি দলটি প্রেসিডেন্টের কাছে এখনও রায়েরবাজার এবং অন্যান্য এলাকায় পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোর সৎকারের ব্যবস্থা করার জন্যও দাবি জানান।

তথ্যানুসন্ধান কমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট প্রতিনিধি দলটির দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে অবিলম্বে 'কার্যকরী ব্যবস্থা' গ্রহণ করার আশ্বাস প্রদান করেন।

এখনও যে এসব কুখ্যাত ব্যক্তি জনগণের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেজন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তার উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন এবং জাতির এই শত্রুদের নির্মূল করার জন্য কমিটি যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে সেজন্যে তিনি তাদেরকে অভিনন্দন জানান।

যারা এই কুখ্যাত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন তাদের প্রতিও তিনি গভীর সমবেদনা জানান।

পূর্বদেশ, ৩১-১২-১৯৭১

এরপর জহির রায়হান তাঁর বড় ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের খোঁজে মিরপুরে গিয়ে তিনি নিজেই নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ছিল। তারপরও জহির রায়হানের নিখোঁজ হওয়া কেউ রুখতে পারেনি। মনে রাখা দরকার, মিরপুর তখন ছিল আলবদর কাদের মোল্লার দখলে।

আগেই উল্লেখ করেছি বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তের কাজ জহির রায়হানের অর্ন্তধানের পর থেমে যায়। তিনি যে সব নথিপত্র যোগাড় করেছিলেন সেগুলোরও আর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। তবে, বুদ্ধিজীবী/গণহত্যার বিচারের দাবি থামানো যায়নি। ১৯৭২ সাল থেকেই এই দাবি তোলা হয়েছিল এবং তৎকালীন সরকারও এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং আন্তর্জাতিকভাবেও দাবি উঠেছিল বিচারের। এ সম্পর্কিত কয়েকটি উদাহরণ–

১. ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক জুরি সম্মেলন রায় দিয়েছিল বাংলাদেশের গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি হওয়া উচিত *(দৈনিক ইত্তেফাক* ৭.৯.১৯৭২)।
২. মুসলিম দেশগুলোর প্রতি তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছিলেন 'ইসলামের নামে গণহত্যা দেখিয়া যান' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬.২.১৯৭২)
৩. সরকার গঠন করে গণহত্যা তদন্ত কমিশন ৫.৪.১৯৭২
৪. ড. কামাল হোসেন ঘোষণা করেছিলেন, গণহত্যার বিচার বাংলাদেশেই হবে।

দালাল আইন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গণহত্যা বা বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার চেয়ে সভা-সমাবেশ অব্যাহত ছিল। দালাল আইন হওয়ার একমাস আগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এ কারণে একটি বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়–

বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার চাই। শহরে বিক্ষোভ সভা ও মিছিল

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব কবীর চৌধুরী গতকাল রোববার বলেন যে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার জন্য দায়ী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিচার করা না হলে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের বিচারের দাবিতে গতকাল বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত বিরাট বিক্ষোভ সভায় জনাব কবীর চৌধুরী একথা বলেন। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের বিক্ষুব্ধ পরিবারবর্গের উদ্যোগে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে।

এর আগে বিক্ষুব্ধ পরিবারবর্গের সদস্য-সদস্যাগণ রাজপথে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।

অশ্রুসজল ও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বাংলাদেশের মানস সম্পদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যার আশু বিচার ও হত্যাকারীদের শাস্তিদানের দাবি জানিয়ে বক্তৃতা দেন বেগম লিলি চৌধুরী, বেগম শহীদুল্লা কায়সার, বেগম সুচন্দা রায়হান, বেগম আলতাফ মাহমুদ,

বেগম সাইদুল হাসান, বেগম আলীম চৌধুরী, চিত্রনায়িকা ববিতা, বেগম শামসুদ্দিন প্রমুখ এবং নিহত বুদ্ধিজীবীদের বিক্ষুব্ধ পত্নী ও প্রিয়জন।

তাদের এ দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বক্তৃতা দেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল, কবি জসীমউদ্দীন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কমরেড অনীল মুখোপাধ্যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জনাব আসম আবদুর রব, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব হায়দার আনোয়ার খান জুনো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আহসানুল হক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির পক্ষে ডক্টর আলী হায়দার, বাংলাদেশ স্থপতি সমিতির জনাব মাজহারুল ইসলাম, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসান ইমাম, বাংলাদেশ চিকিৎসা সমিতির সভাপতি ডাঃ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষে কাজী মমতা হেনা, 'পূর্বদেশ' সম্পাদক জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, প্রাক্তন ছাত্রনেতা জনাব রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আকসাদ, ছায়ানটের অধ্যাপিকা সনজীদা খাতুন, সাহিত্যিক জনাব বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সাংবাদিক জনাব শওকত আনোয়ার, সাংস্কৃতিক মুক্তি শিবিরের পক্ষে জনাব আলী নকী ও এ সভার আহ্বায়িকা শহীদ শহীদুল্লা কায়সার-জহির রায়হানের বোন বেগম নাফিসা কবীর।

সভাপতির ভাষণে জনাব কবীর চৌধুরী বলেছেন যে, স্বাধীনতা-উত্তরের তিন মাস পরেও নিহত বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্যগণ কেন আজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন, বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই তার কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। বুদ্ধিজীবী হত্যার পেছনে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও দেশের বাইরে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে।

কমরেড অনীল মুখোপাধ্যায় বলেন যে, বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য দায়ী জামাতে ইসলামীর কুখ্যাত আল-বদর বাহিনী মূলত এখানে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের স্বার্থেই কাজ করেছে।

সংগ্রামী ছাত্রনেতা জনাব আ স ম আবদুর রব বলেন যে, বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার চাইতে আজ সরকারের কাছে দাবি জানাতে হবে কেন? বাংলাদেশ সরকার জনগণেরই সরকার। এটা সরকারেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি বলেন, নিহত বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। তাই তাদের পরিবারবর্গের পাশে আমরাও রয়েছি।

ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম বলেন যে, বুদ্ধিজীবী ও গণহত্যার জন্য দায়ী বদর বাহিনীর লোকেরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে আত্মগোপন

করে রয়েছে। এদের খুঁজে বের করে বিচার করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে অনেক আগেই আরো সক্রিয় হয়ে উঠা উচিত ছিল।

সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন যে, বুদ্ধিজীবী হত্যার পেছনে দখলদার পাক বাহিনী ও কুখ্যাত বদর বাহিনী ছাড়াও অনেকে জড়িত রয়েছে বলে তথ্যাদি পাওয়া গেছে।

দৈনিক বাংলা, ২৮-২-১৯৭২

সরকার অবশ্য চেয়েছে পাকিস্তানী দালালদের বিরুদ্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি, সরকার ঘোষণা করে 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ, ১৯৭২।' এ আইনে শাস্তির মেয়াদ ছিল দু'বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। এ ধরনের আইনের প্রয়োজন ছিল শুধু তাই নয়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্যও প্রয়োজন ছিল এর যথাযথ প্রয়োগ। ২৮ মার্চ সারাদেশে দালাল বিচারের জন্য গঠন করা হলো ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল। কিন্তু, এ আইনে একটি ফাঁক ছিল। ৭ম ধারায় বলা হয়েছিল "থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি যদি কোনো অপরাধকে অপরাধ না বলেন তবে অন্য কারও কথা বিশ্বাস করা হবে না। অন্য কারও অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার হবে না ট্রাইব্যুনালে। অন্য কোনো আদালতেও মামলা দায়ের করা হবে না।"

অবিলম্বে এই আইন কার্যকর করা হয়। ২৯ আগস্টের আগে তিনবার আইন সংশোধনের পর তা চূড়ান্ত হয়। এই আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয় এর কারণ সম্পর্কে "কতিপয় ব্যক্তি অথবা কোন সংগঠন বিশেষের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগীরূপে গণহত্যা, নির্যাতন, নারী ও শিশু নিধন, বাংলাদেশের জনগণের সম্পত্তি ও সম্মান হরণের জন্য পাকিস্তানী বাহিনীকে সাহায্য করেছিল। এ ধরনের ব্যক্তিরা তাদের ঘৃণ্য তৎপরতা দিয়ে বাংলাদেশে একটি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল এবং মানবতার বিরুদ্ধে তারা এমন জঘন্য অপরাধ করেছে যে, বাংলাদেশের জনগণ এবং বিশ্altবিবেকের কাছে তা এত জঘন্যতম তৎপরতা হিসেবে পরিচিত হয়েছে। সে জন্য তাদের কর্মধারার যথার্থ এবং কার্যকর প্রতিবিধান এবং তাদের তৎপরতা অনুসারে আইনের ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান করতে একটি অবশ্য পালনীয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।"

দালালদের যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিল তা বর্তমানে মানবতাবিরোধীদের যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে তার কাছাকাছি। যেমন–

১. যারা বাংলাদেশে অবস্থানরত হানাদার বাহিনীকে তাদের অবৈধ অবস্থানে সহায়তা, সমর্থন, সংরক্ষণ এবং জোরদার করণে সাহায্য করেছে।
২. যারা তাদের প্রতিশ্রুতি, আকার, ইঙ্গিত বা আচরণের মাধ্যমে হানাদার বাহিনীকে যে কোনোভাবে বৈষয়িক সহায়তা দিয়েছে।
৩. যারা বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হয়েছে অথবা যুদ্ধরত হতে

সহায়তা করেছে।

৪. যারা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণের প্রচেষ্টা প্রতিহত কিংবা ধ্বংস সাধন করেছে এবং

৫. যারা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশে তাদের অবৈধ অবস্থান সুদৃঢ়করণে সহায়তা করতে গিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি দিয়েছে কিংবা দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহায়তা করেছে এবং হানাদার বাহিনীর কোন প্রতিনিধি দলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন বা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচালিত উপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে।”

[আবু সাইয়িদ, *যুদ্ধাপরাধ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*]

সেই সময় প্রবীণ আইনজীবী সবিতা রঞ্জন পাল এবং সিরাজুল হক চিফ প্রসিকিউটর নিযুক্ত হয়েছিলেন। খন্দকার মাহবুব হোসেনও একজন প্রসিকিউটর ছিলেন। আজ তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধীদের পক্ষে।

এই আইনের একটি সীমাবদ্ধতা ছিল অপরাধী ঔপনিবেশিক আমলে করা সাক্ষ্য আইন। এই সাক্ষ্য আইনের ফলে দালালদের ছাড়া পাওয়া সম্ভব ছিল।

বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত দাবি করে ৭২ সালের ১৭ মার্চ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারবর্গ শহীদ মিনারে গণজমায়েত করেন। এরপর মিছিল করে বঙ্গভবনে যান। মিছিলকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করেন। পরে মিছিলকারীরা বঙ্গভবনের ফটকে অবরোধ করে বসে পড়লে অনেকক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী এসে তাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং মিছিলকারীদের সঙ্গে তার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে তিনি জানান যে, তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হবে। ইতোপূর্বে ৮ ফেব্রুয়ারি জহির রায়হানের পরিবার সদস্যদেরও তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, জহির রায়হানের অন্তর্ধানসহ বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিন সপ্তাহের ভেতর তাকে রিপোর্ট করা হবে। সেই তদন্তের ফলাফল দেশবাসী কখনো জানতে পারেন নি।

১৯৭২ সালে বিচার হচ্ছিল। দু'একজনের ফাঁসির দন্ডাদেশ দেয়া হচ্ছিল। অনেককে কয়েক বছরের কারাদন্ড। দুএকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ১৯৭২ সংবাদপত্র অনুসারে জানতে পারি ১৯৭২ সালে ড. আজাদকে হত্যার দায়ে দু'জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর এ মামলার কী হলো তা জানি না। ড. আলীম চৌধুরীর হত্যাকারী হিসেবে প্রয়াত আল বদর আবদুল মান্নানকে ('মওলানা' ও 'ইনকিলাবের' একজন মালিক) ধরা হয়েছিল। তিনি ছাড়া পেয়ে যান। শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত খালেক মজুমদারকে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ সাত বছরের কারাদন্ড দেয়। হাইকোর্ট সে রায় বাতিল

করে। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ও সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী তাঁদের রায়ের উপসংহারে বলেন– "In the Circumstances therefore, the opinion is that doubt has crept into the prosecution case and this doubt goes in favour of the accused and we accordingly give benefit of doubt."

বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর একটি আর্গুমেন্ট লক্ষ্য করুন– (f) "Circumstances showing that Abdul Khaleque was a member of Jamat-e-Islami dominated the mind and judgement of the prosecution witnesses because impression was created that jamat-e-Islami was against the movement of the Liberation. Be that as it may, this impression was responsible for influencing the inductive reasonings of the witness."

মনে হয় বিচারকরা সব স্বর্গে ছিলেন। যেখানে জামায়াতে ইসলাম চোখের সামনে এত বড় হত্যাকাণ্ড ঘটালো সেখানে কি ইমপ্রেসন হবে আওয়ামী লীগ দায়ী ছিল। বিচারকরা অবসর নেয়ার পর আজকাল অনেক উপদেশ দেন। বদরুল হায়দারও দিয়েছেন। শুধু তাই নয় এই বিচারক প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের কাছে দোয়া মাঙতে গিয়েছিলেন। একই ধরনের আর্গুমেন্টে গোলাম আযমকে নাগরিকত্বও দেয়া হয়েছিল। এতে যে ন্যাচারাল জাস্টিস লঙ্ঘিত হয়েছে তা কারো মনে হয় নি। আমরা এগুলি মেনে নিয়েছি কারণ আমরা সেই আইনের ফ্রেমে বাস করি। কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় শুধু উল্লেখ করতে চাই– বাংলাদেশে যত বিতর্কমূলক নির্বাচন হয়েছে তার প্রত্যেকটির প্রধান (নির্বাচন কমিশন) ছিলেন একজন বিচারপতি। বাংলাদেশে যতগুলো অগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রতিটির প্রধান ছিলেন একজন বিচারপতি। ১৯৭৮ সালে এক রায়ে বিচারপতিরা রায় দিয়েছিলেন সামরিক আইন সংবিধানের ওপর। অথচ, পৃথিবীতে সামরিক আইন জংলি আইন হিসেবে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সমস্ত কাজকর্ম ঐ ভাষায় সম্পাদনের নির্দেশ দেয়া হয়। অধিকাংশ বিচারপতি সেই আইন না-মেনে ইংরেজিতে রায় লিখেছেন।

১৯৭৩ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এই অধ্যাদেশ বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ৩৭,৪৭১ জনকে। মামলা নিষ্পত্তি হয়েছিল ২,৮৪৮ জনের। দন্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল মাত্র ৭৫২ জন। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

এ সাধারণ ক্ষমা সমাজে এমন অভিঘাত হানবে যা বাংলাদেশকে বিভক্ত করে দেবে, তা যদি ঐ সময় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতেন তাহলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার আগে তাঁদের চিন্তা করতে হতো। এখনও বাঙালি জাতিকে এই সাধারণ ক্ষমা নিয়ে তর্ক করতে হচ্ছে। শেখ মুজিব ও তাঁর সরকার সম্পর্কে বলা

হচ্ছে, তিনি বা তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি এবং মানুষকে কি যাতনার মধ্যে থাকতে হয়েছে তাও তারা অনুধাবন করেননি। করলে তাঁদের পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব হতো না। যেমনটি বলেছেন শহীদ সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার–"আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোনো নেতা যুদ্ধে আপনজন হারাননি। ফলে স্বজন হারানোর ব্যথা তাদের জানা ছিল না। ঘাতকদের তারা সহজেই ক্ষমা করে দিতে পেরেছিলেন।" অন্যদিকে এ পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের বক্তব্য, যা শেখ হাসিনা বলেছিলেন জাতীয় সংসদে, সেই সময় প্রায় চার লক্ষ বাঙালি পাকিস্তানের বন্দী অবস্থায়। তাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্য রাস্তায় নেমেছিল, বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিল আমাদের কাছে এসেও তাদের আত্মীয়স্বজন অনেক কান্নাকাটি করেছেন। এই রকম একটা অবস্থায় সেই সব বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্যই এই Clemency (ক্ষমা) দেয়া হয়েছিল। ...(মুক্তিযুদ্ধে) অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বাড়ির একজনকে কোনো একটা পদে রেখে সেই বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং এই ধরনের যে সমস্ত কেস ছিল, যারা প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেই বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা করেছিলেন।

কিন্তু যারা সত্যিকার যুদ্ধ অপরাধী, বিশেষ করে যারা গণহত্যা চালিয়েছে, যারা লুটতরাজ করেছে, যারা নারী ধর্ষণ করেছে, যারা অগ্নিসংযোগ করেছে তাদেরকে কিন্তু ক্ষমা করা হয়নি।'' তা সত্ত্বেও এ অভিযোগ একেবারে নাকচ করা যায় না যে, সাধারণ ক্ষমা ছিল ঠিক সিদ্ধান্ত। কারণ এ অধ্যাদেশ ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ যার সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং আত্মপরিচয়। এ ঘোষণা পরবর্তীকালে সংসদীয় গণতন্ত্রতো বটেই, অন্যান্য ঘটনাবলীও নিয়ন্ত্রণ করেছে।

৪

এই সব খুনীকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন জেনারেল জিয়া। বঙ্গবন্ধু রাজাকারদের বিচার শুরু করেছিলেন, দুই বছরের মধ্যে ৭৮০ জনেরও বেশি দালালকে দন্ড দেয়া হয়েছিল। এই সময় নিজামী-মুজাহিদদের মধ্যে ওপর দিকের পরিকল্পক ও খুনীরা পাকিস্তানে পালিয়ে ছিলেন। একটি যুক্তি দেয়া হয় আলবদর ও তাদের সমর্থক বিএনপির পক্ষ থেকে যে, নিজামী, মুজাহিদ, কাদের, কামারুজ্জামানরা, দোষী হলে বঙ্গবন্ধু সরকার তাদের গ্রেফতার করল না কেন? এর কারণ, তারা পালিয়ে ছিলেন।

এই খুনীদের যদি পুনর্বাসন না করা হতো তা হলে বাংলাদেশের রাজনীতি এত কলুষিত হতো না। খুনী সমর্থক এসব রাজনীতিবিদের উত্থান হতো না। বাংলাদেশ এখন বিভক্ত হতো না [মানসিক দিক থেকে]। কিন্তু জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন

দেশটিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে। তাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য করা হয়েছিল, এ কারণে তার প্রতিশোধ তিনি নিতে চেয়েছিলেন। একজন সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা কি পারেন নিজ দেশ তছনছ করতে? আলবদরদের বিচারকালে এ ইতিহাসটুকু মনে রাখা দরকার। এ কারণে, অনেক আগে লিখেছিলাম– মুক্তিযুদ্ধ করাটা যত সহজ ছিল, অন্তিমে মুক্তিযোদ্ধা থাকাটা সহজ ছিল না।

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ একসময় বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ও ক্ষমতা দখলকারী প্রেসিডেন্ট লে. জে. জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান ও তাঁর অনুসারী সামরিক কর্মকর্তাদের পরবর্তীকালে আচরণ দেখে এই প্রতীতি জন্মেছে যে, তাদের অধিকাংশ বাধ্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়। তৎকালীন ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম বা মেজর খালেদ মোশাররফরা আগে থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। জিয়াউর রহমান ২৫ মার্চ রাতেও *সোয়াত* জাহাজ থেকে অস্ত্র উদ্ধারে গিয়ে বাধা পেয়ে বলেছিলেন, 'আই রিভোল্ট।'

জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা দখলের সঙ্গে আলবদরদের একটি সম্পর্কও আছে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর, আমরা দেখেছি আলবদররা পালাচ্ছে। আলবদরদের বৃহৎ অংশ মিশে গেল সাধারণ মানুষের ভিড়ে। যারা পরিচিত তারা চলে গেল পাকিস্তানে। আলবদররা ছিল সংঘবদ্ধ, শত্রুদের শায়েস্তা করার বিষয়ে তাদের একটা পরিকল্পনা ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা ছিল অসংগঠিত সংঘবদ্ধ, তাদের ওপর কমান্ড থাকলেও তা ছিল শিথিল আর শত্রুদের নিয়ে কী করা হবে সে সম্পর্কে তাদের কোন পরিকল্পনা ছিল না। আলবদরদের আশ্রয় দিয়েছেন অনেকে, টাকার বিনিময়ে ছাড়াও পেয়েছে অনেকে। অনেককে গ্রেফতারে শৈথিল্য দেখান হয়েছে। দালাল আইনে কিছু আলবদর ধরা পড়লেও বৃহৎসংখ্যক ধরা পড়েনি। এরা চুপচাপ বসে ছিল না। এরা সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের সংঘবদ্ধ ও সংহত করছিল। জামায়াতের নেতা গোলাম আযম লন্ডন থেকে তাদের নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। পাকিস্তান, সৌদি আরব ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী অনেক দেশ তাদের সহায়তা করছিল, ফলে তারাও একটি শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

এই ধারণার কারণ, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর জিয়াউর রহমান যে কাজগুলো করেছিলেন তা ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিপরীত। মুক্তিযুদ্ধের সময় আলবদররাও একই কাজ করছিল। শুধু তাই নয়, যেসব হীন অপরাধের জন্য শাস্তি হিসেবে আলবদরদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল মৃত্যুদন্ড। দন্ডত নয়ই তাদের বরং করা হয় পুরস্কৃত।

জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখল করে সংবিধান সংশোধন করেছিলেন প্রথম। বাংলাদেশে সংবিধানের ওপর প্রথম হামলাকারী তিনি, দ্বিতীয় লে.জে. এরশাদ। সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন করেছিলেন তারা। আলবদররা

যেমন খুনের রাজনীতি করেছে এরাও তেমন খুনের রাজনীতি করেছেন।

জিয়াউর রহমান সংবিধান সংশোধন করে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিলেন। বঙ্গবন্ধু পৃথিবীর প্রথম স্টেটসম্যান, যিনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিরোধিতা করে ধর্ম ব্যবসায়ীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। রাজাকার বন্ধু জিয়া দালাল আইনেও যারা দন্ড ভোগ করছিলেন তাদের সসম্মানে মুক্তি দিলেন। অনেক আলবদর ছাড়া পেল। নেতৃস্থানীয় আলবদররা পাকিস্তান থেকে ফেরত আসা শুরু করল। গোলাম আযম ফিরে এলেন। আলবদররা জামায়াতে ইসলামী নাম ঠিক রেখে শুধু ছাত্রসংঘের নাম বদল করে ছাত্রশিবির করল। জিয়াউর রহমানের এইসব সংশোধনী আলবদর রাজাকারদের এত খুশি করেছিল যে, 'বামপন্থী' নেতা কাজী জাফর আহমদ যিনি পরে জিয়ার দলে এবং আরও পরে এরশাদের দলে যোগ দিয়ে বিভিন্ন সময় সিভিল সমাজের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, তিনি পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'মওলানা সিদ্দিক [স্বাধীনতাবিরোধী] বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার যে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন তার সুযোগ সরকারই করে দিয়েছেন। সংবিধানের ৩৮ ধারা বাতিলের ফলেই এরা রাজনীতিতে আসতে পেরেছে।... এরা জাতি ও গণস্বার্থবিরোধী... সংবিধানের ৩৮ ধারা বাতিল করে এ সকল জাতীয় দুশমনকে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়া একটি অন্তবর্তীকালীন সরকারের উচিত হয়নি।" [*দৈনিক সংবাদ*, ৪.১১.১৯৭৬]

আলবদররা ১৯৭১ সালে খুনের পর খুন করেছিল। জিয়াউর রহমান তাদের অপরাধ শুধু মাফ করা নয়, তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দিলেন। এতদিন যেসব আলবদর ঘাপটি মেরে বসেছিল তারা প্রকাশ্যে বেরিয়ে জামায়াতকে সংগঠিত করতে লাগল। ছাত্রশিবির বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে স্বাধীনতাপক্ষের ছাত্রদের রগ কাটতে লাগল। রাষ্ট্রে জামায়াতের রাজনীতি 'রগকাটা রাজনীতি' হিসেবে পরিচিত হয়ে গেল। জিয়া রাজাকার আলবদরদের সচিব, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ করলেন।

সামরিক শাসন জারি করে লে. জে. জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর করা যে সব আইন বাতিল করে আলবদরদের রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো হলো–

১. ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর Ordinance No 63 of ১৯৭৫ এর মাধ্যমে 'দালাল আইন' বাতিল করা।

২. ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর second proclamation order No. 3 of ১৯৭৫ প্রথম তফসিল থেকে দালাল আইনের যে সুরক্ষা দেয়া হয়েছিল তা বাতিল।

৩. ১৯৭৬ সালে second proclamation order No. 3 of ১৯৭৬- এর মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তাদি রহিতকরণ।

৪. ১৯৭৭ সালে second proclamation order No. 3 of ১৯৯৭ জারি করে সংসদে আলবদরদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের কিছু অংশ রহিতকরণ।

৫. ১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারি যাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছিল, নাগরিকত্ব ফেরত পাওয়ার জন্য তাদের আবেদনের অনুরোধ।

৬. ১৯৭৭ সালে Proclamation order No. 3 of ১৯৭৭ দ্বারা সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ রহিতকরণ।

এক কথায় জেনারেল জিয়াই আলবদর-রাজাকারদের শুধু ক্ষমা নয়, ঘরের ভিতর আশ্রয় দিয়েছিলেন। একইভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের খুনের 'দায়মুক্তি' দেয়া হলো এবং তাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেয়া হলো। সুতরাং বলা যেতে পারে, জিয়ার নীতিতে ধারাবাহিকতা আছে। বঙ্গবন্ধু খুনীদের শাস্তি দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। আলবদরবন্ধু জিয়া খুনীদের দন্ড মওকুফ করে সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। এভাবে আলবদর-রাজাকারদের ক্ষমা করে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন জিয়াউর রহমান। আলবদরদের মতো তিনিও বাংলাদেশকে পাকিস্তান করতে চেয়েছিলেন।

আলবদররা তার ক্ষমতার উৎস ছিল। আলবদররা তাকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল দেখে তিনি আলবদরদের ঐভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন।

একইভাবে অপারেশন সার্চলাইটে অংশগ্রহণকারী লে.জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও বেগম খালেদা জিয়া আলবদর রাজাকারদের ক্ষেত্রে জিয়ার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া আলবদর-রাজাকারদের ক্ষমতায় এনেছেন এবং ১৯৭১ সালের আলবদর প্রধান ও উপপ্রধানকে মন্ত্রী করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। এভাবে নতুন শতকের শুরুতে দেখি আলবদররা আবার ক্ষমতায়।

প্রচলিত আইনে, খুনীকে হেফাজত করারও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও বেগম খালেদা জিয়া খুনীদের হেফাজত করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। শহীদদের পরিবারের ন্যায্যবিচার থেকে বঞ্চিত করেছেন এই তিনজন ও তাদের সমর্থকরা। মুক্তিযুদ্ধের, শহীদদের, বাংলাদেশের কেউ যদি অবমাননা করে থাকেন তাহলে তারা হলেন জিয়া, এরশাদ ও খালেদা। তারা বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। অস্ত্রবাজ এই তিনজন একটি জাতির এবং সে জাতির গৌরবময় ইতিহাসের যে অবমাননা করেছেন তার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল।

খালেদা জিয়া বেছে বেছে দু'জন আলবদরকে মন্ত্রী করেছিলেন– নিজামী ও মুজাহিদকে। অন্য স্বাধীনতাবিরোধীদেরও মন্ত্রী করতে পারতেন, করেননি। কেন?

সেটিও ভেবে দেখা দরকার। অপরাধমূলক রাজনীতিতে অভ্যস্ত জামায়াতে ইসলামী, তার সহযোগী হিসেবে বিএনপিও। সে কারণে, ২০০১ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ অপরাধমূলক, বিশেষ করে অস্ত্র চোরাচালান ও শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে আলবদরদের পুরনো সংগঠন যা এদের গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছিল এই দুজনের নিয়ন্ত্রণে। এরা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে, প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে কথা বলতে এরা কসুর করেননি।

৫.

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চরিত্র নির্ধারণে এই বিষয়গুলি মনে রাখা জরুরি। খুনিরা যখন শাসক তখন তাদের বিরুদ্ধে বিচার চাওয়া দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দেশের রাজনীতিতে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, সে সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীলরা শক্তি সঞ্চয় করছিল। তার ওপর জিয়া ৩১ ডিসেম্বর (১৯৭৫) দালাল আইন বাতিল করে আটঘাট বেধেই নেমেছিলেন।

১৯৭৮ সালে ১১ জুলাই অসুস্থ মাতাকে দেখার অজুহাতে পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে ৩ মাসের ভিসায় ঢাকা আসেন। মাতাকে দেখতে আসাটা ছিল অজুহাত, পাকিস্তানের নির্দেশেই তিনি আসেন এবং নিশ্চয় জিয়াকে তা জানানো হয়েছিল না হলে তিনি ভিসা পেতেন না। তিনি এসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পুনর্গঠন করেন। আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীর করা হয় তিনি ছিলেন ছায়া আমীর। আর রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা একে ইউসুফকে জেনারেল সেক্রেটারি করেন। গোলাম আযম ভিসা শেষ হলেও থেকে যান। এর আগে ১৯৭৭ সালে আলবদর বাহিনীর কমান্ডাররা ইসলামী ছাত্র শিবির গঠন করে। সিভিল সমাজের ক্ষোভ এ সময় প্রকাশিত হয় সেক্টর কমান্ডার কর্নেল নুরুজ্জামান বীর উত্তমের মাধ্যমে।

১৯৭৯ সালে তিনি *পদধ্বনি/নয়া পদধ্বনি* নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন যার প্রকাশে শাহরিয়ার কবির সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি ছিল সোচ্চার। দীর্ঘদন নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে ব্যস্ত থাকার পর ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ঘোষণা করে তারা যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতকে কোথাও সভা করতে দেবো না। স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতা রোধে ১৯৮১ সালের মার্চে গঠিত হয় 'সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক কমিটি।' ড. আহমদ শরীফ এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন ও নাগরিক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

কর্নেল নুরুজ্জামান ছিলেন তখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি। তিনি ঘোষণা করেন ১লা মে (১৯৮১) থেকে সপ্তাহব্যাপী 'রাজাকার আলবদর প্রতিরোধ সপ্তাহ'

পালন করা হবে এবং সর্বপ্রথম গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের কথা ঘোষণা করেন। এভাবে জিয়ার আমলেই আবার যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে জনমত সংঘটনের কাজ শুরু হয়।

১৯৮৪ সালে কাজী নুরুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির, আহমদ শরীফ প্রমুখের উদ্যোগে গঠিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র'। মূল লক্ষ্য ছিল ঘাতকদের পরিচয় নতুনভাবে তুলে ধরা। জাহানারা ইমামও তখন ধীরে ধীরে 'শহীদ জননী' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয় তার *একাত্তরের দিনগুলি* যা পাঠকদের আপ্লুত করে। চেতনা বিকাশ কেন্দ্র ১৯৮৭ সালের বইমেলায় প্রকাশ করে *একাত্তরের ঘাতকরা কে কোথায়।* সাত দিনে এই বইয়ের ৫০০০ কপি বিক্রি হয়। এরপর থেকেই সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বইপত্র প্রকাশের প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। আর এ সমস্ত মিলেই ঘাতকদের বিরুদ্ধে জনমত সংহত হতে থাকে।

১৯৯২ সালের ১৮ জানুয়ারি কর্নেল নুরুজ্জামান ও শাহরিয়ার কবিরের উদ্যোগে গঠিত হয় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। জাহানারা ইমাম হন এর আহ্বায়ক। এর একমাস পর ১১ ফেব্রুয়ারি ৭২টি রাজনৈতিক/সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল সমন্বয় কমিটি'। একটি মাত্র লক্ষ্যই স্থির হয়– জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা। আওয়ামী লীগ এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সাহায্য সহায়তা প্রদান করে।

সমন্বয় কমিটি তিনটি বড় কাজ করেছিল–

১. আদালতে গোলাম আযমের প্রতীকী বিচার (২৬ মার্চ, ১৯৯২)

২. গণ তদন্ত কমিশনের দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ (১৯৯৪, ১৯৯৫)।

৩. দেশ জুড়ে যুদ্ধাপরাধী বিচারের দাবিতে জনমত সংগঠন। বিশেষভাবে গণআদালত সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় সারাদেশে জামায়াত বিরোধী এক প্রচন্ড আবেগের সৃষ্টি হয়।

১৯৯৪ সালে জাহানারা ইমামের মৃত্যু হলে ২০০০ সাল পর্যন্ত আন্দোলনে ভাটা পড়ে। ২০০০ সালে কবি শামসুর রাহমানকে সভাপতি করে নির্মূল কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। সেই থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত নির্মূল কমিটি সারা দেশ জুড়ে সংগঠন গড়ে তোলে, বিভিন্ন সভা করে, পুস্তিকা প্রকাশ করে জনমত জাগ্রত করে। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক জোটসহ অনেক সংগঠনও এগিয়ে আসে। মিডিয়াও প্রবল ভূমিকা রাখে। বিএনপি জামায়াত একত্রে ২০০১ সালে সরকার গঠন করলে যুদ্ধাপরাধের দাবি আরো গতি পায়। সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও এই দাবি সোচ্চার ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি জামায়াত জোট ছাড়া সব দল যুদ্ধাপরাধী বিচারের দাবি সমর্থন করে। আওয়ামী লীগ ও তার

মিত্ররা নির্বাচনে জয়ী হয় এবং ২০১০ সালে যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করে।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনাল) আইন অনুসারে বিচারের উদ্যোগ নেয়া হয়। আইনটিকে সময়োপযোগী করার জন্য কিছু সংশোধনও করা হয়। সংবিধান একমাত্র এই আইনটিকেই সুরক্ষা প্রদান করেছে।

৬

মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচারের জন্য যখন ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়, তখন থেকে তাদের বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের সব পক্ষ থেকেই বিদ্যমান ফৌজদারী মামলার ধারণা দূর করতে সময় লেগেছে। বিচার যতই এগিয়ে চলেছে ততই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। বিএনপি সরাসরি যুদ্ধাপরাধী মানবতাবিরোধী দল জামায়াতকে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে ট্রাইব্যুনাল বানচাল ও অভিযুক্তদের মুক্ত করার জন্য। ফৌজদারি আইনেও অপরাধীকে কেউ আশ্রয় দিলে সেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে। এখন আইন কর্তৃক স্বীকৃত ১৯৭১ সালের খুনীদের দল জামায়াতকে নিয়ে মানবতাবিরোধী বিচারের বিরোধিতা করলে তার বিচার হবে না কেন? এ প্রশ্নও জাগছে।

জিয়াউর রহমান ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন বাতিল করলেন না কেন? হয়ত তিনি এর গুরুত্ব বোঝেননি, বা ভুলে গেছেন বা ভেবেছেন, জামায়াতীরা তো এখন মুক্ত, সুতরাং এর গুরুত্ব আর কী? অনেকে বলতেন এবং বিএনপির অনেকে এখনও বলেন, ঐ সব ব্যক্তির অপরাধের বিচার তো ফৌজদারি দন্ডবিধি অনুযায়ীই করা যায়। আমরা তখন এর বিরোধিতা করেছি। কারণ ঐ ধরনের বিচার হতো ইতিহাসকে অস্বীকার করা। সামগ্রিক অপরাধের বিচার তো হতো না এবং হয়েছিলও তাই। অনেকে মামলা করেছিলেন। কোন নিষ্পত্তি হয়নি। আরেকটি বিতর্ক উত্থাপন করা হয় এভাবে যে, এত বছর পর এ মামলা হবে কিভাবে? তামাদি কি হয়ে গেল না তা? বিবাদী পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল এ বলে যে, এই আইনে অপরাধ যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি। ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে রায়ে এসব প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছে। বিচারপতিরা বলেছেন, এ সব প্রশ্নের কোনটিই যথার্থ নয়, গণহত্যা কখনও পুরানো হয় না। আর এর বিচারের সময়ের সীমাবদ্ধতা নেই।

"In absence of any statutory limitation as a procedural bar, only the delay itself does not preclude prosecutiral action to adjudicate the culpability of prepetrator of core international crimes."

এমনকি রোম চুক্তি স্ট্যাটুটও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। রোম সনদের কথা তোলা হয় এ কারণে যে, বাংলাদেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবাইকে বড় বড় উপদেশ দেয়। এই রায় হবার পরও বিএনপির মতো স্বচ্ছতা ও মানদন্ডের কথা তুলেছে। তারা কিন্তু ঐ সনদ স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছে। ট্রাইব্যুনাল পরিষ্কার ভাষায় এগুলো নাকচ করে দিয়েছে। "The Rome Statute is not binding upon this tribunal for resolving the issue of elements requirement."

এবার আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩-এর কথা বলি। যখন এটি আইনে পরিণত হয় তখন বলা হয়েছিল, নুরেমবার্গ বিচারের জন্য প্রণীত আইনের পর এত ভাল আইন আর তৈরি হয়নি। বঙ্গবন্ধু এই আইনের খসড়া করতে বলেন। তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ও ড. কামাল হোসেনকে এর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। খসড়া তৈরি করেছিলেন বিচারপতি মুনীম, এ্যাটর্নি জেনারেল ফকির শাহাবুদ্দিন, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ব্যারিস্টার হারুনুর রশীদ, মাহমুদুল ইসলাম প্রমুখ। খসড়াটি প্রস্তুত হলে তা পরীক্ষার জন্য দেয়া হয় আয়ান ম্যাকডরমাটকে, যিনি জেনেভার আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। অধ্যাপক অটোফন ট্রিফটারারকেও খসড়া দেখানো হয়, যিনি নুরেমবার্গ বিচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সংবিধানে এটি সুরক্ষা পায় কীভাবে? সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে বলা হয় "এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করিবার বিধান সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা, কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।"

৪৭ক ধারায় এই আইনের সুরক্ষা দেয়া হয়েছে এইভাবে "(১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের ৩১ দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না। (২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীনে কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীমকোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।"

পরবর্তীকালে যখন যুদ্ধাপরাধ বিচারে আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠার রূপরেখা তৈরি হয় তখন এই আইনের সহায়তা নেয়া হয়েছিল। অন্যান্য যুদ্ধাপরাধ বিচারের আইনে গণহত্যা আছে, কিন্তু আমাদের আইন আরো এক ধাপ এগিয়ে আছে। কারণ এখানে ধর্ষণকেও অপরাধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং আইনটি রাতারাতি গজায়নি এবং এটি আন্তর্জাতিক মানের যে কোন আইনের সেরা একটি আইন। আসলে আমরা না জেনে কথা বলি এবং মূর্খদের কথাগুলোই সত্য বলে মনে করি।

আরো আছে। আমরা দিব্যি ভুলে গেছি, ১৯৭৩ সালের মার্চে জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের ২৯ অধিবেশনে বাংলাদেশের গণহত্যা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাস হয়েছিল, বিচারপতি গোলাম রাব্বানী এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেনঃ

"যে হাজার হাজার বাঙালি নির্যাতন কক্ষে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, নির্যাতনে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের লক্ষ লক্ষ বিধবা ও এতিম সন্তান এবং যারা বেঁচে গেছেন তাদের এটা আশা করার অধিকার রয়েছে যে, যারা এসব ঘৃণ্য অপরাধের জন্য দায়ী, তারা যেন বিচার থেকে রেহাই না পায়।" এই অধিবেশন নিম্নোক্ত ঘোষণা দেয়–

১. যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ যখন যেখানে সংঘটিত হবে তার তদন্ত করতে হবে এবং সে অপরাধে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হলে শাস্তি দেয়া যাবে।
২. উপরোক্ত অপরাধীদের বিচার যে দেশে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে দেশে সে দেশের বিধানমতো হবে।
৩. উপরোক্ত নীতিদ্বয়ের প্রেক্ষিতে যেসব ব্যক্তি গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, সুপরিকল্পিত হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগসহ মারাত্মক অপরাধ করেছে বলে প্রমাণ আছে তাদের বিচার করার অধিকার ও কর্তব্য বাংলাদেশের আছে।"

সুতরাং এ বিষয় নিয়ে কারও কোন এমনকি বিদেশী কোন রাষ্ট্রের কথা বলার অধিকার নেই। মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচারের জন্য ৪০ বছর আগে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে ম্যান্ডেট দিয়ে রেখেছে।

এই পূর্ব ইতিহাস বিবেচনা করে ট্রাইব্যুনাল এই বিচার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, প্রচলিত আইন অমান্য করে যে সব অপরাধ করা হয়েছে তার বিচারের জন্য আইনগত প্রচেষ্টা সঠিক তো বটেই, বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার প্রক্রিয়াও সাহসী এক প্রচেষ্টা।

"In Bangladesh, the efforts initiated under a lawful legislation to prosecute, try and punish the prepetrators of crimes committed in violation of customary international law are an indicia of valid and courgeious endeavour to come out from the culture of impunity"

এই বিচার কেন এখন হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে, বিশেষ করে বিএনপি প্রেমিকরা। কয়েকদিন আগে এক টেলিভিশন আলোচনায় বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার মাহবুব প্রশ্ন করেছিলেন, আওয়ামী লীগ কেন আগে এ বিচার করল না। এখন কেন করছে? প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। বিএনপির তরিকুল ইসলাম বলেছেন, আওয়ামী লীগ একটি এজেন্ডা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

খন্দকার মাহবুবকে বলেছিলাম ১৯৭৩ সালে এই আইন করার জন্য পাকিস্তানপন্থীরা যার নেতৃত্ব দিয়েছেন জেনারেল জিয়া, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। না হলে বিচার হতো। কিন্তু এরপর দীর্ঘদিন বিএনপি শাসন করেছে। জিয়া আবার 'মুক্তিযোদ্ধা' ছিলেন তো তিনি করলেন না কেন? এর উত্তর তিনি দিতে পারেননি। আর এই ইস্যু রাজনৈতিক কোন ইস্যু নয়। জাতিসংঘের ম্যান্ডেট কি রাজনৈতিক ইস্যু? এটি জাতীয় ইস্যু। আর এই জাতীয় ইস্যু সরকারকে এই শুভ প্রচেষ্টায় সমর্থন না জানিয়ে বিএনপি তার রাজনৈতিক এজেন্ডা কার্যকর করতে চাচ্ছে যা বাধা দেয়া সওয়াবের কাজ।

বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে জামায়াত সব সময় বিরোধিতা করেছে। ইতিহাসের সত্য অবলেপনের চেষ্টা করেছে। এ সত্য বহাল থাকলে তাদের অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়তে হয়। পাকিস্তানবাদ যেহেতু বিএনপিরও আদর্শ সে জন্য জামায়াতকে ত্যাগ করা তাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে রাখার জন্য তারা খানিকটা সতর্কতা অবলম্বন করে, বলছে তারা বিচার চায় তবে তা হতে হবে স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিক মানের। খন্দকার মাহবুব হোসেন সেই টিভি আলোচনায় বলেছিলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, এখানে অন্য দেশের বিচারক নেই (মানে শ্বেতাঙ্গ)। তাহলে এটি আন্তর্জাতিক হলো কিভাবে?

প্রথমে দেখা যাক ট্রাইব্যুনালের আইনে মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহ কিভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে

"(ক) বেসামরিক জনসমষ্টির যে কাহারো বিরুদ্ধে কৃত নরহত্যা, উচ্ছেদ, ক্রীতদাসতুল্য জবরদস্তি, বিতাড়ন, কয়েদ, অপহরণ, আটক শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, কিংবা অপর মানবিক কার্যসমূহ কিংবা রাজনৈতিক গোষ্ঠীগত, উপজাতিগত বা ধর্মীয় কারণে শাস্তি প্রদান যেখানে অপরাধ সংঘটন হইয়াছে তাহা সে স্থানে প্রচলিত আইন বিরুদ্ধ হোক কিংবা না হোক...

(খ) গণহত্যা ঃ ইহার অর্থ ও ইহার অন্তর্ভুক্ত নিম্নবর্ণিত যে কোন কার্য করা যাহার উদ্দেশ্য একটি জাতি, উপজাতি, নরগোষ্ঠী, ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তি সমষ্টিকে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক হত্যা করা। যেমন....

(গ) আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে যে কোন অপরাধসমূহ...."

১৯৪৮ সালের জেনেভা কনভেনশনের ধারা ৩৫, ৭০ ও ৭৫-এ এইসব অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালে বার বার যে আন্তর্জাতিক অপরাধের কথা বলা হয়েছে তা উল্লিখিত এইসব অপরাধ। এই অপরাধ কী? গণহত্যা, ধর্ষণ, প্রভৃতি। যেহেতু এগুলো আন্তর্জাতিক অপরাধ সে জন্য এগুলো বিচারের জন্য আইন করা হয়েছে যার নাম আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ আইন/ট্রাইব্যুনালস। এখানে আন্তর্জাতিক বিচারকের প্রশ্ন অবান্তর। সুপ্রীমকোর্টে শ্বেতাঙ্গ বিচারক দিলে বোধহয় মাহবুব হোসেনরা কৃতার্থ বোধ করবেন, কৃষ্ণাঙ্গ আইনবিদদের সম্মান বাড়বে। এমন হীনমন্যতাবোধ পৃথিবীতে বিরল।

আন্তর্জাতিক মানের কোন সংজ্ঞা প্রশ্নকারীরা দিতে পারেননি। ড. তুরিন আফরোজ লিখেছেন "যে কোন আইন সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক বিশ্বে গ্রহণযোগ্য কি না, নাকি ওই আইন আন্তর্জাতিক বিশ্বের মৌলিক ধ্যান ধারণা ও নৈতিকতার পরিপন্থী। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, ১৯৭৩ সালের আইনটি মোটেও আন্তর্জাতিক বিশ্বের মৌলিক ধ্যান-ধারণা বা নৈতিকতার পরিপন্থী নয়।"

এছাড়া ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইসরাইল পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স নিজস্ব আইনে যুদ্ধাপরাধ বিচার করেছে। ফ্রান্স এবং ইসরাইল এখনও নিজস্ব আইনে করছে। সেসব দেশে তরিকুল বা ফখরুলরা আছে। কিন্তু তাদের নৈতিকতা বোধ আছে খানিকটা। তারা এ নিয়ে কখনও প্রশ্ন তোলেনি। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি।

খন্দকার মাহবুব হোসেন রুয়ান্ডার অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে আন্তর্জাতিক বলেছেন, কারণ বাংলাদেশ থেকে এডভোকেট টিএইচ খানকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রুয়ান্ডা বা কম্বোডিয়ায় বিচারক ছিলেন না, তাই তাদের নিতে হয়েছে। বাংলাদেশের সৌভাগ্য, এখানে ঘাটতি সেই নেই। এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় এখানে কখনও কবি, রাজনীতিবিদ, এডভোকেটের ঘাটতি হবে না। আর স্বচ্ছতা?

পৃথিবীর কোন যুদ্ধাপরাধ/মানবতাবিরোধী আইনে জামিনের বন্দোবস্ত নেই। বাংলাদেশের আইনে আছে এবং মানবতাবিরোধী আব্দুল আলীম জামিনে ছিলেন। গোলাম আযমের মতো লোককে ভিআইপি কেবিনে রাখা হয়েছিল। গ্রেফতারকৃত সবাইকে জেলে তো নয়, মামার বাড়িতে রাখা হয়েছে। পৃথিবীর কোন দেশের আইনে আপিলের বন্দোবস্ত নেই। এখানে এক মাসের মধ্যে আপিলের বিধান আছে। এরপর স্বচ্ছতা চাইলে, ঐ বিষয়টি আমদানিযোগ্য পণ্য হলে আমদানি করতে হবে।

৭

ট্রাইব্যুনালের কাজ চলছে। ১১ জন শীর্ষ অপরাধীর রায় দেয়া হয়েছে। [অন্যদের রায়ও দেয়া হচ্ছে]। বিচার চলাকালীন কয়েকজন অপরাধী মারা গেছেন। আরো অনেককে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে। একজনের দন্ড কার্যকর করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক চাপ ও শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ট্রাইব্যুনাল কাজ করেছে। অন্যদিকে সিভিল সমাজও এ ক্ষেত্রে জনমত সংগঠনে ভূমিকা রেখেছে। এখানে সংক্ষেপে যাদের রায় দেয়া হয়েছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করছি।

আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু রাজাকার ১৯৭১ সাল থেকেই পরিচিত। ১৯৭২-৭৫ সাল একটু পালিয়ে বেড়ালেও ১৯৭৫ সাল থেকে আবার জাঁকিয়ে বসেন বাংলাদেশে।

বাচ্চু রাজাকার *এটিএন বাংলার* কল্যাণে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নামেই পরিচিত হয়ে উঠছিলেন। তখন প্রাইভেট চ্যানেলের সংখ্যা কম। সুতরাং মৌলানা আজাদের নাম ব্যাপক আকারে প্রচারিত হচ্ছিল। অথচ তার পূর্ব ইতিহাস অন্যান্য রাজাকার আলবদরদের মতো। আমরা শুধু জিয়াউর রহমানকে দোষ দিই কিন্তু আমাদের সমাজের একটি বড় অংশও যে এর জন্য দায়ী তা বলি না।

আজাদের জন্ম ১৯৪৭ সালে ফরিদপুরের সালথা নানার বড়খারাদিয়ায়। রাজেন্দ্র কলেজে পড়তেন। ফরিদপুরের আরেক আলবদর নেতা মুজাহিদের ছিলেন তিনি ঘনিষ্ঠ সহচর। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এরা দু'জনই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ফরিদপুর স্টেডিয়ামে রাজাকারদের সঙ্গে তিনিও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তার অনুরোধে পাকিস্তানী বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের ধরে এনে স্টেডিয়ামে হত্যা করে সেখানেই মাটি চাপা দিয়ে রাখত। ফরিদপুরে তার নেতৃত্বে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। তার দলে রাইফেল ছিল এক ডজনের মতো। এদের নিয়ে বাচ্চু রাজাকার [তখন এ নামেই পরিচিতি হয়ে ওঠেন] ফরিদপুর শহর বোয়ালমারি, সালথা নগরকান্দার বিভিন্ন গ্রামে হিন্দুদের বাড়িঘর লুটপাট, হত্যা ও মেয়েদের ধর্ষণ শুরু করে।

মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তার কার্যকলাপের বিবরণ ধোঁয়াটে। ১৯৭৫ সালের পর মসজিদ ভিত্তিক একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন। পরে আরো চারটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন। ভালো ওয়াজও করতে পারতেন। ক্রমে ১৯৭১ সালের ফরিদপুরের আল বদর ও রাজাকার প্রধান বাচ্চু রাজাকার, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নামে সমাজে একজন ধনাঢ্য ও ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নজরে বিষয়টি আসে। তারাই প্রথমে

*এটিএন বাংলা*কে স্মারকলিপি দেয় এবং বাচ্চু রাজাকারকে 'ইসলাম প্রচার' থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানায়। তখন আবার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বাচ্চু রাজাকার হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকেন এবং এটিএন তাকে নিয়মিত অনুষ্ঠান করানো থেকে বিরত থাকে।

২০১১ সালের ১০ এপ্রিল তদন্ত সংস্থা বাচ্চু রাজাকারকে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। এবং এক বছর পর ২০১২ সালের ২ এপ্রিল বাচ্চু রাজাকারকে গ্রেফতারের জন্য ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদন করে। পরদিনই ট্রাইব্যুনাল তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়। গ্রেফতার করতে গেলে জানা যায় বাচ্চু পালিয়েছেন। পুলিশের অসাবধানতা বা যোগসাজশের কারণে রাজাকার আলবদর বাচ্চু পালাতে পেরেছিলেন। পরে জানা যায় তিনি পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়ে ভারত হয়ে পাকিস্তান পালিয়ে যান।

যাইহোক ২০১২ সালের ২৬ আগস্ট ট্রাইব্যুনালে তদন্ত সংস্থা তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রসিকিউশন ২২ অভিযোগের ভিত্তিতে ৮টি চার্জ উত্থাপন করে ২৬.১১.২০১২ সালে ধর্ষণ, হত্যা, গণহত্যা, অপহরণ, আটকে রাখা, ধর্মান্তর করাসহ ৮টি চার্জ গঠন করা হয়। যার বিচারে লাগে ৫৩ দিন। রায় দেয়া হয় ২০১৩ সালের ২১ জানুয়ারি। তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন মোঃ নুর হোসেন।

প্রথম চার্জে বলা হয় রঞ্জিতনাথকে আটক করে নির্যাতন করে। রঞ্জিতনাথ পালাতে সমর্থ হন।

দ্বিতীয় চার্জও আবু ইউসুফ পাখিকে অপহরণ ও নির্যাতন। তাকে ফরিদপুর স্টেডিয়ামে রাখা হয়েছিল। সেখানে তিনি ৪/৫ শ নারী পুরুষকে আটকরত অবস্থায় পেলেন।

প্রতিদিন নির্যাতন করে হত্যা করার পর কয়েকজনকে স্টেডিয়ামের পুকুরে পুতে ফেলত। বাচ্চু একদিন ৩৯ জন নারীকে পাকিস্তানী মেজরের কাছে হস্তান্তর করে। তারা দেড় মাস নির্যাতিত হওয়ার পর মুক্তি পায়।

৩ নম্বর চার্জ হলো বোয়ালখালীর কলারন গ্রামের জমিদার সুধা মোহন রায়কে হত্যা ও তার ছেলে মনিময়কে আহত করে।

চতুর্থ চার্জে বলা হয়েছে বাচ্চু মাধব চন্দ্র বিশ্বাস ও জানেন্দ্র মঞ্জুকে গুলি করে হত্যা করে এবং সারা গ্রামে এমন ত্রাসের সঞ্চার করে ৪/৫০০ মানুষ ভারতে পালিয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ৮ জুন বোয়ালখালীর নতিদিয়া গ্রামে দেবী রাণী বিশ্বাস, শোভা রাণী বিশ্বাসসহ আরো কয়েকজনকে বাচ্চু রাজাকার ও তার ৪/৫ জন সঙ্গী ধর্ষণ করে। এটি ছিল ৫ম চার্জ।

৩ জুন বাচ্চু তার সঙ্গীসহ নগরকান্দা থানার ফুলবাড়ীয়া গ্রামে প্রবেশ করে চিত্ত রঞ্জন দাস ও বাদল দেবনাথকে হত্যা করে। এটি ছিল ৬ নম্বর চার্জ।

সপ্তম চার্জে বলা হয় ৫ মে বাচ্চু রাজাকার তার বাহিনী ও ৩২ জন পাকিস্তানীসহ হাসামদিয়া হিন্দু গ্রামে ঢুকে আগুন লাগিয়ে দেয়। ১০টি দোকান লুট করে ও শরৎ চন্দ্র পোদ্দার, সুরেশ পোদ্দার, শ্যামানন্দ সাহা, হিতেন্দ্র মোহন সাহা, নীলরতন সমাদ্দার, সুবল কয়াল ও মল্লিক চক্রবর্তীকে হত্যা করে।

অষ্টম চার্জে বলা হয়েছে ১৮ মে বাচ্চু উজিরপুর বাজারপাড়া গ্রামে হামলা করে ও অঞ্জলি দাসকে ধর্ষণ করে।

প্রসিকিউশন এটাও জানায় জেলা প্রশাসনের কাছে রাজাকার ও আলবদরের তালিকায় বাচ্চু রাজাকারের নাম আছে ১ নম্বরে। রায়ে বিচারকদ্বয় বাচ্চু রাজাকারকে ৩,৪, ৬ ও ৭ নম্বর [গণহত্যা] অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মৃত্যুদন্ড প্রদান করে।

কাদের মোল্লার জন্ম ১৯১৮ সালে ফরিদপুরের সদরপুরে, কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হলো ১৯৬১ সালে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন। ১৯৬৮ সালে রাজেন্দ্রপুর কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করে ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যা বিভাগে এমএ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৬৬ সালে রাজেন্দ্র কলেজে ডিগ্রি পড়ার সময় ছাত্র ইউনিয়ন ছেড়ে ইসলামী ছাত্রসংঘে যোগ দেন এবং কলেজ শাখার সভাপতি হন।

১৯৭০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল ছাত্রসংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে আলবদর বাহিনী গঠন করেন। তার এলাকা ছিল মিরপুর। তার হত্যাযজ্ঞ ও নিষ্ঠুরতার কারণে অচিরেই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠে কসাই কাদের নামে।

হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে কসাই কাদের অন্যান্য আলবদর কমান্ডারদের মতো কাঠমুন্ডু হয়ে পাকিস্তান চলে যান। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তিনি ফিরে এসে ছাত্রসংঘ সংগঠনে কাজ শুরু করেন। ১৯৭৭ সালে ছাত্রসংঘ ছাত্রশিবির নামে আত্মপ্রকাশ করে, তিনি শিবিরের কার্যকরী সদস্য হন। তবে সে মাসেই তিনি জামায়েত ইসলামীতে যোগ দেন।

১৯৭৮ সালে তিন রাইফেল পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮০ সালে 'মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি এক বছর কাজ করার পর দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান। পরে জামায়াতে ইসলামীর সহকারি জেনারেল ও প্রচার সম্পাদক হন। বলা যেতে পারে জামায়াতের প্রথম সারির সেক্রেটারী প্রভাবশালী নেতাদের একজন ছিলেন আবদুল কাদের মোল্লা।

১৯৭১ সালে 'কাদের মোল্লা ছিলেন মিরপুর এলাকার আলবদর কমান্ডার। পুরো মিরপুর এলাকায় কাদের মোল্লার আলবদর বাহিনী ত্রাসের সঞ্চার করে। তার নাম হয়ে যায় কসাই কাদের।

কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে ২০০৭ সালে কেরানীগঞ্জ থানায় ও ২০০৮ সালে পল্লবী থানায় মামলা হয়। ২০১০ সালের ১৩ আগস্ট তাকে গ্রেফতার করা হয়। ২৮মে ২০১২ সালে ৬টি অভিযোগ আনা হয় এবং চার্জ গঠন করা হয়।

তার বিরুদ্ধে প্রথম চার্জ ছিল বাংলা কলেজের ছাত্র পল্লবকে হত্যা। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় হত্যা করা হয়েছে তা আলবদর প্রক্রিয়া। দৈনিক জনকণ্ঠে এ বিষয়ে প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল– "পল্লবকে জোরপূর্বক ধরে এনে মিরপুর ১২ নম্বর থেকে ১ নম্বর এবং ১নং শাহ আলী মাজার থেকে হাতে দড়ি বেঁধে টেনে হিঁচড়ে পুনরায় মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনে ঈদগাহ মাঠে নিয়ে এসে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে। পল্লবের দেহ দু'দিন ঝুলিয়ে রেখে তার সহযোগী আলবদর বাহিনীর সদস্য ও অবাঙালি দ্বারা পল্লবের আঙ্গুলগুলি কেটে ফেলে এবং ৫ এপ্রিল কাদের মোল্লার নির্দেশে ও উপস্থিতিতে তার প্রধান সহযোগী আলবদর আক্তার গুন্ডা পল্লবের বুকে পর পর ৫টি গুলি করে হত্যা করে। হাতের আঙ্গুল কেটে দেয়।"

দ্বিতীয় চার্জ– কবি মেহেরুননেসাকে হত্যা। তৃতীয় চার্জ– সাংবাদিক খন্দকার আবু তালেবকে হত্যা। চতুর্থ চার্জ–পাকিস্তানী বাহিনীকে নিয়ে ভাওয়াল খানবাড়ি ও ঘাটারতরে ১১ জনকে হত্যা। পঞ্চম চার্জটি ছিল ভয়ানক। কসাই কাদের ৫০ জন সদস্য ও পাকিস্তানী বাহিনীকে নিয়ে তুরাগ নদীর পাশে আলোকদি গ্রাম ঘিরে ফেলে এবং ৩৪৪ জনকে হত্যা করে। ষষ্ঠ চার্জটিও হচ্ছে একজনকে হত্যা ও এক নাবালিকাকে ধর্ষণ। এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন মোঃ রাজ্জাক খান ও মনোয়ারা বেগম।

ট্রাইব্যুনাল দু'নাম্বার বাদে বাকী অভিযোগগুলিতে শাস্তি প্রদান করে। সে শাস্তি ছিল যাবজ্জীবন কারাদন্ড। এর প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে তুমুল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় গণজাগরণ মঞ্চের। সুপ্রিমকোর্টে-এর আগে বাদী পক্ষের আপিলের বিধান ছিল না। সেই আইন সংশোধন করার পর, বাদী পক্ষ সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করে। সুপ্রিমকোর্ট কসাই কাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয় এবং তা কার্যকর হয়।

ট্রাইব্যুনালের তৃতীয় রায়টি ছিল দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর।

২০০৯ সালের আগস্ট মাসে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে দুটি মামলা করা হয় এবং ২৯ জুন ২০১০ সালে তাকে গ্রেফতার করে ২ নভেম্বর মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেফতার দেখান হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় ৩ অক্টোবর ২০১১ সালে। রায় দেয়া হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে।

সাঈদী পিরোজপুরে মুদির ব্যবসা করতেন। সাইড বিজনেস ছিল তাবিজ বিক্রি করা। ১৯৭০ সালে ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্য হিসেবে জামায়াত ইসলাম প্রার্থীর পক্ষে প্রচার চালান। মুক্তিযুদ্ধের সময় লুটপাট করে নিজের আর্থিক ভিত্তি গড়েন। ১৯৭১ সালের মে মাসে রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার হন ও পাড়েরহাট বন্দরে ফকির দাসের একটি অট্টালিকা জোর করে দখল করে রাজাকার ক্যাম্প স্থাপন করেন। তিনি ঐ সময় পাঁচ তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করেন যেখানে লুটপাটের সমস্ত জিনিসপত্র রাখা হতো। মুক্তিযুদ্ধের পর সাঈদী পালিয়ে যশোরে আশ্রয় নেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর ফিরে আসেন পিরোজপুর।

তারপর তিনি যোগ দেন জামায়াতে ইসলামীতে। এবং কালক্রমে জামায়াতের নায়েবে আমীর নির্বাচিত হন। সাঈদী যতটা না রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তার চেয়ে বেশি ওয়াজ মাহফিল করে পরিচিতি লাভ করেন। আদি রসাত্মক মন্তব্য করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজনকে বিদ্রুপ করাই ছিল ওয়াজের মূল বিষয়। সেগুলি ক্যাসেট আকারে প্রচারিত হতে থাকার ফলে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। জাতীয় সংসদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারী করার কারণে স্থানীয় মানুষজনের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন দেইল্লা রাজাকার নামে।

সাঈদীর বিরুদ্ধে ২০টি অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগ ১-১৯৭১ সালের ৪ঠা মে মাহিমপুর বাসস্ট্যান্ডে ২০ জনকে হত্যা করা হয়। এরা মেজর জিয়ার সাব সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানি বাহিনীকে রাজাকার কমান্ডার হিসেবে নিয়ে আসেন।

অভিযোগ-২-মাছিমপুর হিন্দু পাড়ায় সাঈদীর নির্দেশে ২৩ জনকে হত্যা করা হয় সেই একই দিন।

অভিযোগ-৩- ঐ একই দিন মাছিমপুর গ্রামের ঘরবাড়িতে আগুন দেয়া।

অভিযোগ-৪ ঃ ঐ একই দিন আরেকটি হিন্দু পাড়ায় পাকিস্তানি বাহিনীকে নিয়ে ৪ জনকে হত্যা।

অভিযোগ-৫- পিরোজপুর মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাইফ মিজানুর রহমান, এসডিপিও ফয়জুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত এসডিও আবদুর রাজ্জাককে বলেশ্বর নদীর পাড়ে সাঈদীর নির্দেশে ও উপস্থিতিতে গুলি করে হত্যা। অভিযোগ-৬-৭মে সাঈদীর নেতৃত্বে পাকিস্তানী বাহিনী পাড়েরহাট আসে এবং দোকানপাট লুট করে।

অভিযোগ-৭-৮মে সাঈদী পাকিস্তানী সৈন্যদের নিয়ে বাদুরিয়া গ্রামে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামকে পাকিস্তানীদের হাতে তুলে দেয়। তাদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।

অভিযোগ-৮ ঐ একই দিন চিথোলিয়া গ্রামে মানিক পসারীর বাড়ি আক্রমণ

করা হয় এবং আগুন দেয়া হয় ও সাঈদীর প্ররোচনায় ইব্রাহীম নামে একজনকে সেনা ক্যাম্পে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।

অভিযোগ- ৯ ঃ ২ জুন ইন্দুরাকনী গ্রামে আবদুল হামিদ বাবুলের বাড়ি লুটপাট।

অভিযোগ ১০ ঃ মাহবুবুল আলম নামে এক মুক্তিযোদ্ধার বাড়িতে আগুন ও লুটপাট। মাহবুবুলের বাড়ি ছিল টেংরাখালি।

অভিযোগ ১২- লবেরহাট বাজার থেকে ১৪ জন হিন্দুকে ধরে পাকিস্তানী সেনা ক্যাম্পে হস্তান্তর করা হয়। পাকিস্তানীরা তাদের গুলি করে হত্যা করে।

অভিযোগ-১৩ ঃ সাহেব আলী নামে একজনকে হত্যা।

অভিযোগ ১৪ ঃ শেফালী ঘরামীকে ধর্ষণ।

অভিযোগ ১৫ ঃ ঐ একই দিন হোগলাবুনিয়া গ্রামে ১০ জনকে ধরে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয়। পাকিস্তানীরা তাদের হত্যা করে লাশ ফেলে দেয় নদীতে।

অভিযোগ-১৬ ঃ পাড়ের হাট বন্দরের গৌরাঙ্গ সাহার তিন বোন, মহামায়া, অভয়রানী ও কমলারানীকে সেনাক্যাম্পে নিয়ে ৩ দিন ধরে ধর্ষণ। এরপর পাড়ের হাট বন্দরের কৃষ্ট সাহাকে হত্যা।

অভিযোগ-১৭ ঃ পাড়েরহাটের বিপদ সাহার মেয়ে বানু সাহাকে ধর্ষণ ও জোর করে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।

অভিযোগ ১৮ ঃ মুক্তিযোদ্ধা ভগিরথীকে ধরিয়ে দেন।

অভিযোগ ১৯ ঃ ২৫ থেকে ৩১ জুন প্রায় ১৫০ জনকে জোর করে ধর্মান্তরিত।

অভিযোগ ২০ ঃ নভেম্বরে শরণার্থীদের আটক ও লুটপাট।

বিচারকরা ১-৪ ও ১৩নং অভিযোগ থেকে সাঈদীকে খালাস দেন। ৫নং অভিযোগ থেকেও মুক্তি দেয়া হয়। ৬, ৭, ৮, ১০, ১৪, ১৬ ও ১৯নং অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। বাকী অভিযোগগুলো থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ৮ ও ১০নং অভিযোগে বর্ণিত অপরাধে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

সাঈদী রায় প্রকাশিত হওয়ার পর জামায়াত-বিএনপি একযোগে সারাদেশে তান্ডব শুরু করে। গুজব ছড়ায় যে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে। পরে সাঈদী আপিল করেন উচ্চ আদালতে। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ তার সাজা কমিয়ে আমৃত্যু কারাদন্ড দেয়। শুধু বিচারক শামসুদ্দীন চৌধুরী মৃত্যুদন্ড বহাল রাখেন। বিচারপতি ওহাব মিয়া তাকে সব অপরাধ থেকে খালাস দেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মোহাম্মদ কামারুজ্জামান ছিলেন জামালপুরের আশেক

মাহমুদ কলেজের ছাত্র। জন্ম তার শেরপুরে। ১৯৬৭ সালে এসএসসি পাশ করে আশেক মাহমুদ কলেজে ভর্তি হন। স্কুলে থাকতেই ছাত্রসংঘের সদস্য হন। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ ছাত্রসংঘের সভাপতি। ২২ এপ্রিল তার কলেজের কিছু অনুগত কর্মীকে নিয়ে তিনি প্রথম আলবদর বাহিনী গঠন করেন। ময়মনসিংহের ছাত্রসংঘের সবাই আলবদর বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এবং তারা সারা ময়মনসিংহে গণহত্যা চালায়।

১৯৭১ সালে ১৩ ডিসেম্বর অন্যান্য আলবদর নেতাদের মতো পালিয়ে যান খুব সম্ভব পাকিস্তান। ফিরে আসেন ১৯৭৫ সালের পর। জামায়াতের মুখপাত্র *সোনার বাংলার* তিনি ছিলেন সম্পাদক এবং *সংগ্রামের* একসময় নির্বাহী সম্পাদক। গ্রেফতারের আগে ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল।

২০১০ সালের ২৯ আগস্ট ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার জন্য কামারুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয় ৫ ডিসেম্বর ২০১১ সালে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ৭টি। মামলা রায় ঘোষণা করা হয় ২০১৩ সালে। কামারুজ্জামান তারপর আপীল করেন।

তার বিরুদ্ধে প্রথম চার্জ ছিল মুক্তিযোদ্ধা বদিউজ্জামানকে আহমদনগর ক্যাম্পে রেখে নির্যাতন ও পরে রাস্তায় গুলি করে হত্যা। দ্বিতীয় অভিযোগ মে মাসে শেরপুর কলেজের শিক্ষক সৈয়দ আবদুল মান্নানকে মাথা ন্যাড়া করে গায়ে মুখে চুনকালি মেখে গলায় জুতার মালা পরিয়ে শেরপুর শহর প্রদক্ষিণ।

তৃতীয় চার্জটি ছিল গুরুতর। ২৫ জুলাই কামারুজ্জামানের অনুরোধে বা প্ররোচনায় আলবদর, সেনাবাহিনী ও রাজাকাররা নলিতাবাড়ীর সোহাগপুর গ্রাম ঘিরে ১২০ জনকে হত্যা করে। এ গ্রাম পরে পরিচিত হয়ে উঠে বিধবাপল্লী গ্রামে। চতুর্থ চার্জ অনুযায়ী ২৩ আগস্ট গোলাম মোস্তফাকে হত্যা। কামারুজ্জামান রোজার মাসে ৪/৫ জনকে ধরে রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের ৪ দিন আটকের পর আরো ১১ জন সহ আহমদনগর আর্মি ক্যাম্পে চালান দেয়। সেখানে কামারুজ্জামানের উপস্থিতিতে ৭ জনকে হত্যা করা হয়। এটি ছিল ৫নং অভিযোগ। ষষ্ঠ চার্জ ছিল কয়েকজনকে গ্রেফতার ও নির্যাতন ও ২৭ রোজার দিন কামারুজ্জামানের নির্দেশে ৫ জনকে হত্যা। সপ্তম চার্জ ছিল টেনামিয়াকে হত্যা।

রায়ে বিচারকদ্বয় উল্লেখ করেন যে 'মৌলিক ও দালিলিক প্রমাণ সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করেছে– অভিযুক্ত কামারুজ্জামান গুরুত্বপূর্ণ আলবদর নেতা ছিলেন। তার নেতৃত্বে ভয়ঙ্কর ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল। অভিযুক্ত সচেতনভাবে এইসব ভয়ঙ্কর অপরাধ সংঘটিত করেন। অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ৫ ও ৬ নম্বর অভিযোগ ব্যতিরেকে বাকী অভিযোগগুলিতে তাকে

দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ৩ ও ৪ নম্বর অভিযোগে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

কামারুজ্জামান সুপ্রীমকোর্টে আপীল করেন। এবং উচ্চ আদালতও ট্রাইব্যুনালের রায় বহাল রাখে।

গোলাম আযমের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয় ৩১ অক্টোবর ২০১১ সালে। তাকে গ্রেফতার করা হয় পরের বছর ১১ জানুয়ারি। ১০ জুন ২০১২ সালে মামলা শুরু হয়। ১৭ এপ্রিল ২০১৩ সালে মামলার শুনানি শেষ হয়। রায় দেয়া হয়।

গোলাম আযমের জন্ম ১৯২২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানায়। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করেন রাষ্ট্র বিজ্ঞানে। তারপর যোগ দেন রংপুরে কারমাইকেল কলেজে। তারপর থেকে তিনি নামের পাশে অধ্যাপক লেখা শুরু করেন। একসময় বলা হতো তিনি ভাষা সৈনিকও ছিলেন। কারণ ১৯৪৭-৪৯ সালে তিনি ডাকসুর ভিপি ছিলেন। কিন্তু কোন দলিলপত্রে দেখা যায় না যে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি অস্বীকার করেন যে, ভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন।

যৌবনেই তিনি জামায়াতে যোগ দেন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামের সম্পাদক ও ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ জামায়াতের আমীর ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা কী ছিল তা নতুন করে বলার কিছু নেই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, লুণ্ঠন সব কিছুতে তার দল অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর ঢাকার পতন আসন্ন জেনে তিনি পাকিস্তান পালিয়ে যান। ১৯৭২ সালের ১৮ এপ্রিল তার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। ১১ আগস্ট ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানী পাসপোর্টে ঢাকা আসেন। তখন থেকেই আবার নতুন ভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজন সংগঠিত হতে থাকে।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নিয়ে মামলা হলে হাইকোর্ট গোলাম আযমের বাংলাদেশী নাগরিকত্ব বহাল রাখে। গোলাম আযম আবার জামায়াতে ইসলামের আমীর পদে আসীন হন। এ পরিপ্রেক্ষিতে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয়।

গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ৬১টি ঘটনায় ৫টি চার্জ আনা হয়। এর মধ্যে চারটিই ছিল কমান্ড রেস্পনসিবিলিটির। পঞ্চমটি ছিল সিরু মিয়া দারোগা ও তার ছেলেসহ ৩৮ জনের নিহত হওয়ার পেছনে তার নির্দেশনা।

বিচারকদ্বয় যুক্তিতর্ক বিবেচনা করে প্রতিটি অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করেন যা দাঁড়ায় ৯০ বছর কারাদন্ডে। বিচারকরা এও বলেন যে, তাকে মৃত্যুদন্ডই দেয়া উচিত ছিল কিন্তু বয়স বিবেচনায়

তাকে কারাদন্ড দেয়া হলো। গোলাম আযম আপীল করেন।

আপীল শুনানির পূর্ব পর্যন্ত তিনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিজন সেলে আরাম আয়েসেই দিন কাটান। তার আপিল শুনানির কার্যক্রম শুরুর মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রেফতারের আগে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল। তার জন্ম ফরিদপুরের খাবাসপুর। জন্ম ১৯৪৮।

১৯৬৪ সালে এসএসসি পাশ করে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে পড়ার সময় তিনি ইসলামী ছাত্রসংঘে যোগ দেন। ১৯৬৮-৭০ ফরিদপুর ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭১ সালের শুরুতে ঢাকা জেলা ছাত্রসংঘের সভাপতি হন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সেক্রেটারি এবং অক্টোবরে সভাপতি মনোনীত হন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন ছাত্রসংঘকে আলবদর বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয় তখন তিনি নিজামীর ডেপুটি বা আলবদর বাহিনীর ডেপুটি নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালে আল-বদর বাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতার কথা সবার জানা।

১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণের আগে আলবদর সদর দফতরে মুনাজাত পরিচালনা করে মুজাহিদ কাঠমুন্ডু ভেগে যান এবং ১৯৭৫ সালের পর ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে মাতৃসংগঠন জামায়াতে ইসলামে কাজ শুরু করেন। ১৯৮৬ ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়ান এবং প্রত্যেকবারই পরাজিত হন।

মুজাহিদকে গ্রেফতার করা হয় ২৯.৬.২০১০ সালে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় ১৬.১.২০১২ সালে। রায় ঘোষণা করা হয় ১৭ জুলাই ২০১৩ সালে। মুজাহিদের বিরুদ্ধে সাতটি অভিযোগ গঠন করা হয়।

প্রথম অভিযোগ, ইত্তেফাকের নির্বাহী সম্পাদক সিরাজউদ্দিন হোসেনকে অপহরণ করে তার নিয়ন্ত্রিত ৭/৮ যুবক। দ্বিতীয় অভিযোগ মে মাসে মুজাহিদের নেতৃত্বে চরভদ্রাসন গ্রামে ৩০০/৩৫০ হিন্দু বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় ও হত্যা করা হয় ৫০/৬০ জনকে। তৃতীয় চার্জ রণজিৎ নাথের ওপর নির্যাতন। চতুর্থ চার্জ আবু ইউসুফকে নির্যাতন।

১৯৭১ সালে ৩০ আগস্ট নিজামীসহ মুজাহিদ পুরানো এমপি হোস্টেলে যান। সেখানে সুরকার আলতাফ মাহমুদ, বদি, রুমি, জুয়েল ও আজাদকে দেখিয়ে বলে প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমার আগে তাদের হত্যা করতে।

চার্জ- ৬ঃ আলবদর নেতা হিসেবে মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট [আলবদর সদর দফতর] গণহত্যার কমান্ড রেস্পন্সিবিলিটি। শেষ অভিযোগ হলো

ফরিদপুরের কোতোয়ালি থানার বকচর গ্রামে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যা।

বিচারকরা তাদের রায়ে ১, ৩, ৫, ৬ ও ৭ নং অভিযোগেও ১ ও ৬ নামে অভিযোগে কমান্ড রেসপনসিবিলিটির দায়ে অভিযুক্ত করেন ৬ ও ৭ নং অভিযোগের কারণে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মুজাহিদ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল দায়ের করেন।

সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ওরফে সাকা চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় ২৬ জুলাই ২০১০ সালে। গ্রেফতার করা হয় ১৬ ডিসেম্বর। তার বিরুদ্ধে হত্যা, গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটসহ ২৪টি অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগ গঠন করা হয় ৪ এপ্রিল ২০১২ সালে। বিচার শেষ হয় ১৪ আগস্ট ২০১৩ সালে।

সাকা চৌধুরী আরেক মানবতাবিরোধী অপরাধী ফজলুল কাদের চৌধুরী বা ফকা চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ সন্তান। জন্ম ১৯৪৯ সালে। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি নিজেকে ব্রিগেডিয়ার হিসেবে ঘোষণা করে চট্টগ্রাম বিশেষ করে রাঙ্গুনিয়ায় ত্রাসের রাজত্বের সৃষ্টি করেন। ১৯৭১ সালে ২০ সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেনেড হামলায় আহত হয়ে দেশ ত্যাগ করেন। ১৯৭৫ সালে গোপনে দেশে ফেরেন এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার পর স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং রাজনীতিতে সক্রিয় হন।

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত মুসলিম লীগের হয়ে রাঙ্গুনিয়া থেকে নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য হন। ১৯৮৪ সালে এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হন।

১৯৮৮ সালে জাতীয় পার্টি ত্যাগ করে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বা এনডিপি গঠন করেন। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এনডিপির পক্ষে সংসদ সদস্য ছিলেন। ১৯৯৬ সালে এনডিপি বিলুপ্ত করে জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপিতে যোগ দেন। ২০০১ সালে বিএনপি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, ২০০৮ সালের নির্বাচনেও জয়লাভ করেন।

তার বিরুদ্ধে প্রথম চার্জ ৪/৫ এপ্রিল রাতে সাকার এক অনুসারী সাকাকে খবর দেয় ৬/৭ জন হিন্দু একত্রিত হয়ে রাজনৈতিক আলোচনা করছে। সাকা পাকিস্তানী সৈন্য নিয়ে ঐ বাসা ঘিরে ফেলে ও তাদের আটক করে গুডস হিলে তার বাসায় নিয়ে যায়। ঐ ছয়জনের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

১৩ এপ্রিল সাকার নেতৃত্বে পাকিস্তানী সৈন্যরা গহিরার এক হিন্দু অধ্যুষিত পাড়া ঘিরে কয়েকজনকে আটক করে হত্যা করে। তৃতীয় অভিযোগে বলা হয় ঐ দিন সাকা এরপর কুন্ডেশ্বরী ঔষধালয়ে আসেন নূতন চন্দ্র সিংহকে হত্যা করে।

একই দিন, চতুর্থ অভিযোগ অনুসারে সাকা পাকিস্তানী সৈন্যদের নিয়ে গহিরার জগৎমল্ল পাড়ায় ৩২ জন হিন্দুকে একত্রিত করে তাদের হত্যা করে। ৫ম অভিযোগ

একই দিন রাউজানের সুলতানপুরে চারজন হিন্দুকে হত্যা করে। ষষ্ঠ অভিযোগ হলো, ঐ একই দিন বিকেলে রাউজানের উনসত্তর পাড়ায় ৫০ জনকে হত্যা করে। ১৩ এপ্রিল সাকার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানী বাহিনী মোট ৯১ জনকে হত্যা করে।

৭নং অভিযোগ হলো, পরের দিন অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল দুপুরে সাকা আবার পাকিস্তানী সৈন্যদের নিয়ে রাউজানে সতীশ চন্দ্র পালিতের বাসায় যায় ও তাকে হত্যা করে। ৮নং অভিযোগ হলো ১৭ এপ্রিল চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মোজাফফর আহমদ তার পুত্র শেখ আলমগীরসহ বাড়ি যাচ্ছিলেন। সাকার সঙ্গে পাকিস্তানী সৈন্যরা গাড়ি থামিয়ে তাদের নিয়ে যায়। তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

নবম অভিযোগ ঃ এফিলের মাঝামাঝি সাকা ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বোয়ালখালি রাজাকার ক্যাম্পে আসে। সেনাবাহিনী ও রাজাকাররা বনিক পাড়া ও কদুরখিল হিন্দু পাড়ার বাড়ি ঘর লুট করে ও শান্তি দেব নামে একজনকে হত্যা করে। ১৩ এপ্রিল সাকা পাকিস্তানী বাহিনীসহ ডাংয়া গ্রামের মানিক ধরের ধানভাঙ্গার কল লুট করে। এটি হলো দশম অভিযোগ।

একাদশ অভিযোগ হলো ২০ এপ্রিল সাকার নির্দেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও রাজাকাররা বোয়ালখালী থানার হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম শাকপুরা গ্রামে ৬১ জনকে হত্যা করে। পরবর্তীকালেও শাকপুরা গ্রামে প্রায় ৩০০ জনকে হত্যা করা হয়। দ্বাদশ অভিযোগ হলো ৫ মে রাউজান থানার জ্যোতিমল্ল গ্রামে তিনজন হিন্দুকে হত্যা।

১৫ মে ঘাসিমামির পাড় এলাকার বাড়িঘরে ঢুকে লুটপাট, ছয়জনকে হত্যা পাঁচজনকে ধর্ষণ করে। এটি হলো ১৩নং অভিযোগ। চতুর্দশ অভিযোগ হলো ওডস হিলে মোঃ হানিফকে হত্যা। পঞ্চদশ অভিযোগ হলো মে মাসে শেখ মায়মুন আলীকে গুডস হিলে নিয়ে নির্যাতন। ৭ জুন ওমর ফারুককেও গুডস হিলে এনে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। এটি ছিল ষোড়শতম অভিযোগ।

১৭তম অভিযোগ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন সংগঠককে গুডস হিলে নিয়ে নির্যাতন। ১৮তম অভিযোগ হলো গুডস হিলে জুলাই মাসে সালেহউদ্দীনকে নিয়ে নির্যাতন। উনবিংশতম অভিযোগ হলো নুর মোহাম্মদ ও নুরুল আলমকে অপহরণ ও মুক্তিপণের মাধ্যমে মুক্তি। ২০তম অভিযোগ হলো ২৭ জুলাই আখলাক মিয়াকে ধরে গুডস হিলে নির্যাতন। নির্যাতনের কারণে তার মৃত্যু হয়। ৫/৭ আগস্ট বিনাজুরি গ্রামের ইউপি চেয়ারম্যানকে গুডস হিলে নিয়ে নির্যাতন। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নুরুল আনোয়ারকে অপহরণ, নির্যাতন ও ৬০০০ টাকার বিনিময়ে মুক্তি। এটি ছিল ২২তম অভিযোগ। শেষ অভিযোগ হলো এক হিন্দু কর্মচারীকে নির্যাতন।

বিচারে ৩, ৫ ৬ ও ৮ নং অভিযোগ সাকা দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ২ ৪, ৭ নং অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২০ বছরের কারাদন্ড ও ১৭-১৮ অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ৫ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়। বাকী ১৪টি অভিযোগ থেকে তাকে খালাস দেয়া হয়।

মোহাম্মদ আবদুল আলীমের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হুগলির পান্ডুয়া গ্রামে। ১৯৫০-৫১ সালে পরিবারসহ চলে আসেন জয়পুরহাটে। এমএ, এলএলবি করে তিনি যোগ দেন আইন পেশায়। ১৯৫৮ সালে যোগ দেন মুসলিম লীগে। ১৯৬২ সালে বিভাগীয় সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন বগুড়া জেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার যে নির্বাচন করে তাতে তিনি প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন করেন।

১৯৭১ সালে জয়পুরহাটে পাকিস্তান বাহিনীর সেনা কর্মকর্তারা ছিলেন কর্নেল এসএন ইকবাল, মেজর আফজাল, মেজর মোস্তাক প্রমুখ। তাদের এবং আলবদর রাজাকারদের সহায়তায় আবদুল আলীম জয়পুরহাটে প্রচন্ড ত্রাসের সৃষ্টি করেন। জয়পুরহাট মহকুমার তিনি শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, দেশত্যাগে বাধ্য করা– সব ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৭২ সাল থেকে তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। জেনারেল জিয়া আলবদর পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করলে আলীম আবার আবির্ভূত হন এবং বিএনপিতে যোগ দেন ও সংসদ সদস্য 'নির্বাচিত' হন। মুক্তিযুদ্ধে তার নিষ্ঠুরতার পুরস্কার হিসেবে জিয়া ১৯৭৯ সালে রেলমন্ত্রী করেন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি রেলমন্ত্রী ছিলেন।

২০১১ সালের ২৮ মার্চ আলিমকে গ্রেফতার করা হয়। ২৭ মার্চ ২০১২ সালে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেয় ট্রাইব্যুনাল। প্রসিকিউটররা ২৮টি চার্জ এনেছিলেন, বিচারকরা আমলে নেন ১৭টি। মামলার সময়টুকু অসুস্থতা হেতু আলীমকে জামিন দেয়া হয়। তার বিচার শেষ হয় সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৩ সালে। রায়ে তার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করা হয়। তিনি আপীল করেন। আপিলের শুনানির আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আলিমের বিরুদ্ধে হত্যা গণহত্যার চার্জগুলি ছিল–

১. কড়ই কাছিপুর গ্রামে ৩৭০ জনকে হত্যা।

২. ১৮ জুন জুমার নামাজের পর তার পরামর্শে শান্তি কমিটির সদস্য ও হানাদার বাহিনী ৫০০ জনকে আটক করে। আলীম তাদের মধ্যে ২৮ জনকে বাছাই করেন পাকিস্তান বিরোধী হিসেবে। তাদের মধ্যে ২২ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

৩. আলীমের পরামর্শে পাকিস্তানী সেনারা কয়েকটি গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয়, লুটপাট, হত্যা ও ধর্ষণ করে।

৪. আলীমের পরামর্শে পাকিস্তানী বাহিনী ৯ থেকে ১৫ মের মধ্যে পাহুনা মিশন স্কুলে ৬৭ জন হিন্দুকে হত্যা করে।
৫. মে মাসের প্রথম দিকে দেশ ত্যাগের সময় ১০ জনকে আটক করে শান্তি কমিটির মানুষজন। এদের মধ্যে ৯ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়।
৬. ২৬ মে নওদা গ্রামের ৪ জনকে অপহরণ করে হত্যা।
৭. মে মাসের শেষের দিকে ক্ষেতলালে এক সভার আয়োজন করা হয় এবং নির্দেশ দেয়া হয় হিন্দুদের বাড়িঘর লুট করতে আগুন লাগানোর জন্য। সেখানে হত্যা করা হয় ১৩ জনকে।
৮. ১৪ জুন আলীমের নির্দেশে ১৫ জন যুবককে আটক করে। নির্যাতন করে হত্যা করা হয়।
৯. জুন মাসে শান্তি কমিটির বৈঠক করে ২৬ জন যুবককে আটক করে হত্যা করা হয়।
১০. জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ২৬ জন গাড়োয়ানকে খঞ্জনপুর কুঠি বাড়ি ব্রিজের কাছে গুলি করে হত্যা করা হয়।
১১. ২৬ জুলাই ডা. আবুল কাশেমকে একই জায়গায় হত্যা।
১২. আলীমের নির্দেশে পাকিস্তানী বাহিনী সেপ্টেম্বর মাসে ১১ জনকে খুন করে।
১৩. ৭ অক্টোবর ৩ জনকে হত্যা।
১৪. জয়পুরহাটে চিনিকলে ২৫ অক্টোবর থেকে নভেম্বরের প্রথম পর্যন্ত ২৫ জনকে হত্যা ও ৪ জনকে আহত করা।
১৫. ২৩ জনকে হত্যার পর আরো ৪ জনকে হত্যার অনুরোধ যা পাকিস্তানী কর্নেল প্রত্যাখ্যান করেন।
১৬. ইপিআর সুবেদার জম্বল হোসেনকে হত্যা।

আদালত ১.২.৬,৭,৮, ৯, ১০ ১২ নং ১৪নং অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পায় এবং বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড প্রদান করে। আদালত বলেন, তার সর্বোচ্চ দন্ড পাওয়া উচিত কিন্তু শারীরিক কারণে মৃত্যুদন্ড না দিয়ে আমৃত্যু কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। এই রায়ের পরই আলীম মারা যান।

বুদ্ধিজীবী হত্যার অন্যতম নায়ক ছিলেন আলবদর বাহিনীর অপারেশন ইনচার্জ আশরাফুজ্জামান খান। জন্ম তার গোপালগঞ্জে। ১৯৭১ সালে তিনি কাজ করতেন পূর্বদেশে। তার জন্ম ১৯৪৮ সালে। ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি ইসলামী ছাত্রসংঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

চৌধুরী মাঈনুদ্দিনের আসল নাম মাঈনুদ্দীন চৌধুরী। ডাক নাম মজনু চৌধুরী।

বাড়ি ফেনী। মাইনুদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পড়াশোনা করেন। পূর্বদেশে চাকরি করতেন। জড়িত ছিলেন ছাত্রসংঘের সঙ্গে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বদরবাহিনীর নেতা ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ দু'জনই পালিয়ে যান, প্রথমে পাকিস্তান পরে আশরাফুজ্জামান খান আমেরিকা আর মাঈনুদ্দিন লন্ডন। জেনারেল জিয়া ও এরশাদের আমলে মাঈনুদ্দিন দুবার ঢাকা আসেন। তাদের অনুপস্থিতিতে ২০১৩ সালের ২৭ মে বিচার শুরু হয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের আইনজীবী নিয়োগ করা হয়। ১১টি অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে। বিচার শেষ হয় ২০১৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি ছিল–

১. সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেনকে অপহরণ ও হত্যা।
২. সাংবাদিক সৈয়দ নাজমুলকে অপহরণ ও হত্যা।
৩. সাংবাদিক গোলাম মোস্তফাকে অপহরণ ও হত্যা।
৪. সাংবাদিক নিজামউদ্দিন আহমদকে অপহরণ ও হত্যা।
৫. সাংবাদিক সেলিনা পারভীনকে অপহরণ ও হত্যা।
৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত জন অধ্যাপক ও একজন চ্যান্সেলরকে অপহরণ ও হত্যা।

    এরা ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আহমদ, সিরাজুল হক, ফয়জুল মহি, রশিদুল হাসান, আনোয়ার পাশা ও সন্তোষ ভট্টাচার্য, আবুল খায়ের ও ডাঃ মোঃ মোর্তজা।

৭. অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে অপহরণ ও হত্যা।
৮. অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে অপহরণ ও হত্যা।
৯. সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ ও হত্যা।
১০. ডাঃ ফজলে রাব্বীকে অপহরণ ও হত্যা।
১১. ডাঃ আলীম চৌধুরীকে অপহরণ ও হত্যা।

তাদের বিরুদ্ধে প্রতিটি অভিযোগই প্রমাণিত হয় এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

মতিউর রহমান নিজামীর জন্ম পাবনায়। আসল নাম মতিউর রহমান। মাদ্রাসায় পড়ার সময় সহপাঠীরা তাকে 'নিজামী' উপাধি দেন। সে থেকে নিজের নামের সঙ্গে নিজামী ব্যবহার শুরু করেন। জন্ম ১৯৪৩ সালে পাবনার সাথিয়ায়।

১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করেন। ছাত্র জীবন থেকেই ছাত্রসংঘের সঙ্গে জড়িত। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ইসলামী সংঘের সভাপতি ছিলেন। ছাত্রসংঘকে তিনিই বদর বাহিনীতে পরিণত করেন এবং বদর বাহিনীর প্রধানে পরিণত হন। তার নিজের এলাকাতে বটেই সারা বাংলাদেশে তার নেতৃত্বে

বদর বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটে অংশ নেয়। এলাকায় তখন তিনি পরিচিত ছিলেন 'মইত্যা রাজাকার' নামে।

১৫ ডিসেম্বর তিনি ঢাকা থেকে পালান নেপালে। সেখান থেকে চলে যান পাকিস্তান। জিয়াউর রহমানের আল বদর পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় চলে আসেন বাংলাদেশে এবং জামায়াতে যোগ দেন। কালক্রমে তিনি গোলাম আযমের ডান হাতে পরিণত হন এবং জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল থেকে আমীর পদে উন্নীত হন। ২০০১ সালে বিএনপি জামায়াত জোট নির্বাচনে জিতলে তাকে শিল্পমন্ত্রী করা হয়। ১০ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালান মামলারও আসামী ছিলেন তিনি এবং সে মামলার রায়ে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

নিজামীকে গ্রেফতার করা হয় ২৯শে জুন ২০১০ সালে। ২০১১ সালের ২৮মে তার বিরুদ্ধে চার্জশীট গঠন করা হয়। বিচার শেষ হয় ২৪ জুন ২০১৪ সালে। রায় ঘোষণা করা হয় ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ১৬টি–

১. ১৬ জুন মওলানা কছিমউদ্দিনসহ দুইজনকে হত্যা।
২. ১৪ মে শুক্রবার নিজামীর নির্দেশে ও রাজাকারদের সহায়তায় হানাদার বাহিনী বাউশগাড়ি ও ডেমরা গ্রামে ৪৫০ জনকে হত্যা করে।
৩. বদর বাহিনীর প্রধান হিসেবে মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট বদর বাহিনীর অঘোষিত সদর দফতর স্থাপন ও গণহত্যার পরিকল্পনা।
৪. ৮ মে করমচা গ্রামে লুট, ধর্ষণ ও হত্যা।
৫. আড়পাড়া ও ভূতের গাড়ি গ্রামে ১৩ এপ্রিল ১৯ জনকে হত্যা।
৬. ধুলাউড়া গ্রামে লুটপাট, ধর্ষণ ও ৩০ জনকে হত্যা।
৭. ২ ডিসেম্বর বৃশালিকা গ্রামে সোহরাব আলীকে হত্যা।
৮. বদি, রুমি, জুয়েল প্রমুখকে হত্যার জন্য প্ররোচনা।
৯. ডিসেম্বরে বৃশালিকা গ্রামের ৭০ জনকে হত্যা।
১০. সোনাতলা গ্রামের বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ।
১১. বাঙালি জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার ঘোষণা।
১২. ইসলাম রক্ষার্থে বাঙালিদের নিধন করার নির্দেশ।
১৩. বাঙালিদের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টিকরণ।
১৪. বাঙালিদের হত্যার প্ররোচনা
১৫. নগরবাড়ি মহাসড়কের দু'পাশে ৩০০ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ
১৬. কমান্ড রেসপনসিবিলিটি।

বিচারকরা ১, ৩, ৭ ও ৮ নম্বর অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে যাবজ্জীবন ও ২,

৪, ৬ ও ১৬ নম্বরের ভিত্তিতে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে।

মীর কাশেম আলীর জন্ম ১৯৫২ সালে মানিকগঞ্জে। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে একই কলেজে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সে ভর্তি হন।

১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

কলেজে পড়াকালীন ১৯৬৭ সালে তিনি ছাত্রসংঘের সঙ্গে যুক্ত হন ও কলেজ শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে ছাত্রসংঘের সাধারণ সম্পাদক হন।

১৯৭১ সালে ছাত্রসংঘ আলবদর বাহিনীতে রূপান্তরিত হলে তিনি চট্টগ্রামের আলবদর কমান্ডারের দায়িত্ব পান। ঐ সময় চট্টগ্রামে ডালিম হোটেলে নির্যাতন কেন্দ্র তৈরি করে নির্যাতন, গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজ চালান। ১৬ ডিসেম্বর পালিয়ে যান। জিয়াউর রহমানের সময় ফিয়ে আসেন ও ১৯৭৭ সালে ছাত্রসংঘকে ছাত্র শিবিরে পরিণত করে এর সভাপতি হন তারপর স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হন জামায়াতের সঙ্গে। জামায়াতের শুরার সদস্য ১৯৮৫ থেকে। তিনি এখন বাংলাদেশের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি। জামায়াতের খরচ অধিকাংশ তার কোষাগার থেকে আসে বলেই অনুমিত। ইসলামী ব্যাংক, ইবনে সিনা হাসপাতাল থেকে শুরু করে দিগন্ত পত্রিকা টেলিভিশন প্রভৃতির মালিক তিনি। মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার যেন না হয় তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের লবিষ্ট ফার্মকে ২৫ মিলিয়ন ডলার দিয়েছেন। কিন্তু বিচার বন্ধ হয়নি। ২০১২ সালের ১৭ জুন তাকে গ্রেফতার করা হয়। চার্জগঠন করা ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে। বিচার শেষ হয় ২০১৪ সালের ৫ মে। রায় দেয়া হয় অক্টোবর ২০১৪ সালে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি ছিল–

১. ওমর উল ইসলাম চৌধুরীকে আটক ও নির্যাতন।
২. লুৎফর রহমান ফারুখকে আটক ও নির্যাতন।
৩. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীকে আটক ও নির্যাতন।
৪. সাইফুদ্দিন খানকে আটক ও নির্যাতন।
৫. আবদুল জব্বার মেম্বারকে আটক ও নির্যাতন।
৬. হারুন অর রশীদ খানকে আটক ও নির্যাতন।
৭. মোঃ সানাউল্লাহ চৌধুরীসহ দু'জনকে আটক ও নির্যাতন।
৮. নুরুল কুদ্দুস সহ ৪ জনকে আটক ও নির্যাতন।
৯. সৈয়দ মোঃ এমরানসহ ৬ জনকে আটক ও নির্যাতন।
১০. মোঃ জাকারিয়াসহ ৪ জনকে আটক ও নির্যাতন।
১১. জসিমসহ ৬ জনকে হত্যা ও লাশ গুম।
১২. নাতু ও টুন্নু সেনকে হত্যা।
১৩. সুনীল কান্তি বর্ধনকে আটক ও নির্যাতন।

১৪. নাসিরউদ্দিন চৌধুরীকে অপহরণ ও নির্যাতন।

বিচারকগণ ৪, ৬, ৭, ৯, ১০ ও ১৪ নং অভিযোগে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড, ১১ ও ১২নং অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ১, ৫, ৮ ও ১৩ নং অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

৮

মানবতাবিরোধী অপরাধ নিয়ে রাজনীতির শুরু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর। জিয়াউর রহমান মানবতাবিরোধীদের অপরাধ মার্জনা করে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। এই রাজনীতির মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করতে চান ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে বিচ্যুত। মূল ধারা পাকিস্তানবাদ। সে কারণে জন্ম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের। যে কারণে শুরু থেকেই জামায়াত-বিএনপির মধ্যে মিত্রতা গড়ে ওঠে। জিয়া প্রথম যুদ্ধাপরাধী বা মানবতাবিরোধীদের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী করেন। জেনারেল এরশাদ ও খালেদা জিয়াও একই ধারা অনুসরণ করেন।

এর বিপরীতে ছিল আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা। শেখ হাসিনা প্রথম থেকেই মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তিনি তা করতে না পারলেও দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে ২০১০ সালে বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করেন।

১৯৭৫ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত ও তাদের মিত্ররা, এক কথায় বাঙালি পাকিস্তানিরা প্রশাসন, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তাদের আসন দৃঢ় করে। জঙ্গি মৌলবাদীকে তারা প্রশ্রয় দেয়। এবং তাদের প্রশ্রয়ে এক সময় বাংলাদেশ জঙ্গিদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়। শেখ হাসিনা এখন এই মৌল জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

জামায়াত বিএনপির এই দর্শনের বিরুদ্ধে লেখার মাধ্যমে আমরা লড়াই শুরু করেছি তিন দশক থেকে। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা শুরু করি যা আজও অব্যাহত। এই লেখাগুলির মূল বিষয় একটিই– পাকিস্তানবাদ বা জঙ্গী মৌলবাদ বা বিএনপি জামায়াতের রাজনীতি প্রতিরোধ ও বিনাশ করতে না পারলে বাঙালি সুস্থ মানসের অধিকারী হবে না এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে বিএনপি জামায়াত সৃষ্ট ভায়োলেন্স ও সাম্প্রদায়িকতার বিনাশ হবে না। এবং তা হলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে না এবং উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। ফলে ১০০টি সংকলিত লেখাগুলির বক্তব্য একই। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে একটি লেখাইতো যথেষ্ট ছিল। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলতে হয়, তাহলে তিন দশকে রাজনীতির ধারাটা অস্পষ্ট থেকে যেতো। তিন দশকে বহু ঘটনা ঘটেছে যা আমাদের অনেকের মনে নেই এবং লেখাগুলি সে সব ঘটনার প্রতিক্রিয়া। এই লেখাগুলি বুঝতে সাহায্য করবে তিন দশকে আমরা কতোটা কন্টাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছি। এই সব ঘটনার কুশীলব কারা ছিল। বলা যেতে পারে এই সংকলন তিন দশকের রাজনীতির একটি প্রামাণ্য দলিল।

বক্তব্য যেহেতু এক সেহেতু ভূমিকা থেকে অনেক রচনাতেই পুনরাবৃত্তি আছে। সংকলনের সময় তা কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় বক্তব্য জোরদার করতে পুরনো ঘটনা মনে করিয়ে দেয়ার জন্যই পুনরাবৃত্তি। প্রতিটি লেখা এককভাবে বিচার করলে বিষয়টি প্রতিভাত হবে। লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন পত্রিকায়। তবে, বেশির ভাগ লেখাই প্রকাশিত হয়েছিল *দৈনিক জনকণ্ঠ* ও *দৈনিক ভোরের কাগজে*। কিছু লেখা আমার আগে প্রকাশিত কয়েকটি বইয়েও সংকলিত হয়েছিল। তবে অধিকাংশ লেখাই আর কোন গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। শীর্ষস্থানীয় অপরাধীদের বিচার শেষে ধরে নিতে পারি আমাদের লড়াইয়ের প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে বিএনপি-জামায়াতের অশুভ রাজনীতি প্রতিরোধ ও বিনাশ। লড়াই চলছে, চলবে।

এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনায় সহায়তা করেছেন চৌধুরী শহীদ কাদের। শব্দসূচি করে দিয়েছেন তপন পালিত। পান্ডুলিপি থেকে গ্রন্থপ্রকাশের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছেন বন্ধু আহমেদ মাহফুজুল হক। তাদের ধন্যবাদ জানাই।

মুনতাসীর মামুন

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০১৫

মানবতাবিরোধী অপরাধ
বিচার ও রাজনীতি

যে দেশে রাজাকার বড়

এ দেশে, যে দেশের নাম বাংলাদেশ, সে দেশে এখন রাজাকার বড়, মানুষ নয়। রাজাকার আর মানুষে তফাত আছে। মানুষ এ দেশে হাজার বছর ধরে ছিল, হয়তো থাকবে আরও হাজারবছর। 'হয়তো' শব্দটি ব্যবহারে যুক্তি আছে। কারণ, এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মতো রাজাকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, আরও পাবে। হয়তো, এক সময় সারাদেশের মানুষকে হতে হবে রাজাকার, ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়।

কিন্তু একটা সময় ছিল যখন এ দেশে রাজাকার ছিল না। রাজাকার বিষয়টি দূরে থাকুক, শব্দটি ছিল অপরিচিতি। নতুন ফসলের মতো, এই শব্দটির বীজ বোনা হয়েছিল ১৯৭১ সালের সেইসব ভয়াবহ দিনগুলাতে। 'রাজাকার' শব্দটির অর্থ স্বেচ্ছাসেবী। কিন্তু সুন্দর একটি শব্দের অর্থ কীভাবে বদলে ভয়ংকর হয়ে যায় তার উদাহরণ এই শব্দটি। না, ভুল বললাম, বাংলাদেশে বদলে গেছে আরেকটি শব্দের অর্থ। সেটি হচ্ছে– ইনকিলাব। আসলে, এর অর্থ বিপ্লব। আলবদর গোত্রীয় কেউ যখন তা ব্যবহার করে তখন এর অর্থ যে কী ধারণ করে তা সচেতন কারো অজানা নয়।

১৯৭১ সালে, মুক্তিযুদ্ধের মরণপণ দিনগুলোতে রাজাকার কিসের স্বেচ্ছাসেবী ছিল? সে ছিল হানাদারবাহিনীকে বাঙালি রমণী ধর্ষণে সহায়তা করার স্বেচ্ছাসেবী। সে ছিল আলবদর ও পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বাঙালিনিধনে সহায়তাকারী। সে ছিল এইসব লুটেরার লুট করতে সাহায্য করার স্বেচ্ছাসেবী।

তবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী থেকে এদের অবস্থান ছিল অধস্তন। মূলত, এদের কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দেয়া ও হানাদার পাকিস্তানি 'মোছুয়াদের' ক্রীতদাস হিসেবে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। 'রাজাকার'দের পাশাপাশি ছিল সে-সময় 'আল-শামস', 'আলবদর'– যাদের সরাসরি উল্লেখ করা যায় 'ডেথ-স্কোয়াড' হিসেবে। রাজাকার যদি এ দেশে বড় না হয়, তাহলে দেশের সর্বোচ্চ পদে বা ১৯৭১ সালের খুনি বাহিনীর নেতা কীভাবে সংসদে নির্বাচিত হন? তখন, অবশ্য রাজাকার ও আলবদরে খানিকটা পার্থক্য ছিল। আল-বদর, আল-শামস হানাদার-বাহিনীর ক্রীতদাস হলেও রাজাকারদের থেকে তাদের ক্ষমতা ছিল বেশি। এরা যাকে খুশি ডেকে নিয়ে হত্যা করতে পারত। সে অর্থে তখন রাজাকারের ক্ষমতা ছিল সীমিত।

স্বাধীনতার পর রাজাকার শব্দটির অর্থ বদলাতে থাকে। 'আলশামস', 'আলবদর' থেকে 'রাজাকার' শব্দটি উচ্চারণ করা যায় সহজে। তাছাড়া যুদ্ধের সময় 'আলবদর' 'আলশামস' থেকে রাজাকারের সংখ্যা ছিল বেশি এবং তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত রাজাকার সৃষ্টি করায়, শব্দটি পরিচিত ছিল বেশি। ফলে আস্তে আস্তে শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। প্রাকস্বাধীনতা পূর্বে 'রাজাকার' শব্দটি ব্যবহৃত হত সংকীর্ণ অর্থে। এখন শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যাপক অর্থে।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় রাজাকারকে কেউ মানুষ মনে করত না। জানোয়ার ও মানুষে তফাত আছে। সে তফাত শিল্পী কামরুল হাসান দেখিয়েছিলেন ১৯৭১ সালে একটি পোস্টারে। ওই পোস্টারটিতে হানাদার পাকসেনাদের তুলে ধরা হয়েছিল জানোয়ার হিসেবে, যাদের মুখের আদল ছিল ইয়াহিয়া-দানবের মতো। পোস্টারটিতে মানুষকে আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছিল—তারা মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি। তাই দেখি, স্বাধীনতার কুড়ি বছরের মধ্যে হত্যাকারী, দালাল, আলবদর, দেশদ্রোহী, জামায়াতি, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহনকারী শব্দগুলো একীভূত হয়ে গেল রাজাকারে। এখন তাই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিকৃতকারী, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বা ওই বিরোধীর সঙ্গে আঁতাতকারীকে অনায়াসে আখ্যা দেয়া হয় রাজাকার হিসেবে। এখন রাজাকার বললে বোঝায় মূলত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হননকারীকে।

স্বাধীনতাযুদ্ধের পর স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল 'মুক্তিযোদ্ধা' শব্দটির। কিন্তু পৃথিবীর একমাত্র সব-সম্ভবের দেশ বাংলাদেশে দেখা গেল গুরুত্ব হারিয়েছে 'মুক্তিযোদ্ধা' শব্দটি। বরং পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে 'রাজাকার' শব্দটি। স্বাধীনতার পর এ শব্দটি ফের গুরুত্ব পেয়েছিল জেনারেল জিয়াউর রহমানের সময়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন একজন সেক্টর কমান্ডার, স্বাধীনতার পাঁচবছরের মধ্যে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা। ক্ষমতা করায়ত্ত করে তিনি গুরুত্ব সহকারে দুটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। একটি হল খালকাটা, অপরটি রাজাকার পুনবার্সন। প্রতীকী অর্থে অনেকে মনে করতেন বস্তুত দুটি প্রকল্পের মধ্যে ফারাক খুব কমই, কারণ খাল কেটেই কুমির আনা হয়।

জেনারেল জিয়াউর রহমান যত্রতত্র খাল কাটার সঙ্গে সঙ্গে রাজাকারদেরও ধরে আনতে লাগলেন। অনেকে খালে বেনোজলের মতো ভেসেও এল। মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ বছর পেরুতে-না-পেরুতে দেখা গেল, রাজাকার শাহ্ আজিজুর রহমান প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিত্ব লাভ করলেন আবদুল আলীম ও আবদুল মান্নান। শেখ মুজিবের হত্যা মানুষকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। এসব ঘটনা মানুষকে স্তব্ধ করে দিল। রাজাকার শব্দটির পুনঃপ্রবর্তন, সমাজে রাজাকারকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা এবং পরিণামে সমাজকে সংঘাতময় করে তোলার ক্ষেত্রে জেনারেল

জিয়াউর রহমানের অবদান ভোলার মতো নয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে জেনারেল জিয়াকে বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণার পাঠকের চেয়ে শেষোক্ত ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য উল্লেখ করা হবে। জেনারেল জিয়া এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় প্রমাণ করেছিলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য যা গুরুত্ববহ তা হলো– মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সহজ, মুক্তিযোদ্ধা থাকাটাই কঠিন।

জেনারেল জিয়া সবসময় কালো চশমা পরে থাকতেন এবং বলতেন, রাজনীতিকে তিনি ডিফিকাল্ট করে তুলবেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। রাজনৈতিক দলগুলো খন্ড-বিখন্ড হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর সমন্বয়ের রাজনীতির নামে চরম ডানপন্থীর মিলন, অর্থের দেদার ব্যবহার, বাংলাদেশের রাজনীতির ধারাই পাল্টে দিয়েছিল। জেনারেল জিয়ার এ অবদানও ভোলার মতো নয়।

শেখ মুজিব জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। জেনারেল জিয়া সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছিলেন। এভাবে তিনি রাজাকারের ভিত্তি ঠিক করে দেবার পর, জামায়াত ও চরম বামপন্থীদের মিলিত যৌথ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল রাজাকারিকে একটি তাত্ত্বিক ফ্রেমে দাঁড় করানো। এই নূতন তত্ত্ব হল রাজাকারবাদ। এই ফ্রেমের ভিত্তি জামায়াতি দর্শন ও ধ্যানধারণা। তাদের উদ্দেশ্য বা প্রধান লক্ষ্য ধর্ম ও ধর্মরাষ্ট্র করা। এটি বেছে নেবার কারণ অশিক্ষিত সমাজে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া সহজ, সহজ ধর্মের নামে প্রতারণা করা। সে কারণে দেখি খাঁটি আলেমরা বলছেন, জামায়াতের ইসলাম ও প্রকৃত ইসলামে পার্থক্য আছে। জামায়াতের ইসলামকে 'রগকাটা ইসলাম' বলা হয়। অর্থাৎ জামায়াতি বা রাজাকারি ধ্যানধারণার বিপরীত হলে রগ কেটে হত্যা করতে হবে। জামায়াতি ইসলামের অর্থ মানুষ বা প্রকৃত ইসলামকে দমন করতে হলে কোরান শরিফ পোড়াতে হবে। ১৯৭১ সালে তারা কোরান পুড়িয়েছিল, কয়েকদিন আগেও আমহদিয়াদের কোরানসংগ্রহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জামায়াতের অর্থ– রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িক করে তুলতে হবে, সংখ্যালঘুকে জিম্মি রেখে ফায়দা লুটতে হবে, নারীদের ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করতে হবে। জামায়াতে ইসমলামের অর্থ সৌদি আরবের আনুকূল্য পেতে হবে, পাকিস্তান না চাইলেও তার সঙ্গে মিলিত হতে হবে, সেটি সম্ভব না হলে পাকিস্তানি ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে হবে; নায়েব, আমির এসব নামে মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যযুগীয় শেখদের মতো 'রুলিং এলিট' তৈরি করতে হবে।

একটি বিষয় লক্ষ করুন, নেতাদের পদের নামকরণ এভাবে করা হয়েছে যাতে মানুষ ভয় পায়। কারণ বাঙালির ওপর এসব নামধারী লোক যুগযুগ ধরে অত্যাচার করে আসছে। এক কথায়, মানুষকে পাথরচাপা দিয়ে রাখতে হবে।

গণতন্ত্রের বিপরীতে রাজাকারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে, দ্বিতীয় পর্যায় হল

রাজাকারবাদকে সমাজ ও বাইরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দেওয়া। এজন্য রাজাকাররা নানা কৌশল গ্রহণ করেছিল এবং আজও করছে। তাদের এ কৌশল কার্যকর করার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে সামরিক শাসকরা। গত দেড় দশকে সামরিক শাসকরা পুত্রবৎ স্নেহে রাজাকারদের লালন করেছে। উভয়ের মধ্যেই অলিখিত একটি সমঝোতা আছে, কারণ উভয়েই প্রগতির বিরোধী। মানুষ প্রগতির দিকে এগুলে তো আর রাজাকার বা সামরিক শাসক থাকে না। সে কারণে দেখুন, চট্টগ্রাম নৌবাহিনী যে নির্মম তান্ডবলীলা সংঘঠিত করেছে সে বিষয়ে সবাই প্রতিবাদ করলেও জামায়াত প্রায় নিশ্চুপ। সামরিক শাসকদের এহেন পুত্রবৎ স্নেহের কারণ মানুষের স্পিরিটকে দমন করা, রাজাকাররাও তা-ই চায়। সুতরাং সামরিক শাসকদের ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করতে আপত্তি কী?

এতসব কিছুর পরও নব্বইয়ের গণআন্দোলনের পর সবাই ভেবেছিলেন, ফের নতুন করে শুরু করা যাক। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম আকাঙ্খা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। বিএনপির উৎস এবং রাজাকার প্রতিষ্ঠায় তার অবদান সত্ত্বেও অনেকে আশাবাদী ছিলেন যে অবস্থার পরিবর্তন হবে।

এখানেই আমরা ভুল করেছিলাম। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আজীবন ক্যান্টনমেন্টে থেকে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে সামরিকতন্ত্র ও রাজাকারতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বর্জন করা অসম্ভব। সে কারণে জামায়াতের প্রায় দাবির কাছে তিনি মাথা নত করেন। পত্রিকায় দেখেছি কয়েকদিন আগে, আহমদিয়ারা মুসলমান কি না তা পরীক্ষার জন্য বায়তুল মুকাররমের খতিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি করা হয়েছে। এ দাবিটা ছিল জামায়াতের এবং পত্রপত্রিকায় দেখেছি এই ইমাম জামায়াতের সভায় বক্তৃতা দিতে পছন্দ করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিএনপি ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার রাজাকারবাদ প্রতিষ্ঠা করার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আর রাজাকারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে বেশ কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীও প্রকাশ্যে যুক্ত হয়েছেন প্রথমবারের মতো। এর মধ্যে আছে সাংবাদিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশ। তাঁরা বলেন, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী। তাঁরা আওয়ামী লীগ পছন্দ করেন না, সে কারণে বিএনপি করেন। জামায়াত যদি বিএনপিকে সমর্থন করে তাঁদের কী করার আছে? অনেকটা স্ত্রী অপছন্দ-কঁরা দাসীকে পছন্দ করার মতো। জামায়াতিদের সাহায্য নেব, জামায়াতি আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করব অথচ মুক্তিযোদ্ধা বলব, এরকম তত্ত্ব বাংলাদেশেই সম্ভব। আসলে এরা মূলত সুবিধাবাদীতন্ত্রে বিশ্বাসী, মিরপুরের বিগত চেয়ারম্যান আবদুল খালেকের মতো সরকারকে এরা ভালোবাসেন। সুতরাং এখন বিএনপি ও জামায়াতকে ভালোবাসায় আর দোষ কী?

রাজাকাররা এভাবে সুবিদাবাদীদের নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে এগুচ্ছে।

মরণকামড় দেবার জন্য তারা এখন প্রস্তুত। ১৯৭১ সালে তারা যেভাবে হত্যা করেছিল প্রয়োজনে তারা এখন তাও করবে এবং আরও ব্যাপকভাবে। সে আলামতগুলো কি দেখা যাচ্ছে না? রাজশাহীতে জামায়াত-শিবির কী করেছে? ভালোবাসার প্রতিদান তারা এভাবেই দেবে। ছাত্রদলের সদস্যদের একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই– তাদের ওপর যখন শিবিরবাহিনী হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল তারা, যাদের তারা শত্রু মনে করে– যাদের তারা মিত্র মনে করে তারা নয়। না হলে, হত্যাকাণ্ড হয়তো আরও ব্যাপক হত।

এতকিছু সত্ত্বেও সবশেষে উল্লেখ করব, রাজাকারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপরীতে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুজ্জীবনে একটি ক্ষীণ আলোও দেখা যাচ্ছে। প্রধানত নির্মূল কমিটি ও সমন্বয় কমিটির কর্মকাণ্ডের দরুণ রাজাকারতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। সাম্প্রতিক পৌরসভা নির্বাচনে জামায়াত একটি আসনও পায়নি। স্বয়ং আইন প্রতিমন্ত্রী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজশাহীতে নেতৃত্ব দিয়েছে সর্বদলীয় মিছিলে। এ ঘটনার পর সংসদে মতিউর রহমান নিজামী বক্তৃতা দিতে উঠলে সর্বদলীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির এম.পি.-রা একত্রে রাজাকার রাজাকার ধ্বনি দিয়ে তাঁকে বসিয়ে দিয়েছেন।

আমরা যারা নিজেদের মানুষ মনে করি, তাদের বেছে নিতে হবে বিএনপি-জামায়াতের রাজাকারতন্ত্র আমরা চাই না গণতন্ত্র চাই। রাজাকারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেও দেশে শান্তি আসবে, সে প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে রাজাকাররা কিন্তু তা হবে কবরের শান্তি। আর মানুষ যদি মানবেতর হতে না চায়, তাহলে গণতন্ত্রের উষ্ণতার জন্য সব ভুলে, রাজশাহীর সেই সর্বদলীয় মিছিলের মতো রাজাকারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হতে হবে। আর ক্রীতদাস হতে চাইলে মেনে নিতে হবে রাজাকারতন্ত্র, মেনে নিতে হবে এদেশে রাজাকার বড়, মানুষ নয়। এখন যার যা ইচ্ছে।

১১ ফাল্গুন, ১৩৯৯/১৯৯২

মুরতাদ জামাতি ও পাকিস্তানি দালালদের প্রতিরোধ করুন

দুটি ছবি, প্রায় একই রকম। তবে, ঘটনার ব্যবধান প্রায় একুশ বছর। প্রথম ছবিটি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের। রাতে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আগুন ধরিয়ে দিয়েছে চকবাজারে। হত্যা, লুণ্ঠন ছাড়াই তারা পুড়িয়ে দিয়েছে পবিত্র কোরান শরিফ। এ সব কিছুই করেছে তারা ইসলাম রক্ষার নামে। ছবিটি সংকলিত হয়েছে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ও ঢাকা নগর জাদুঘর সংকলিত 'ঢাকা ১৯৭১'-এ।

ওই ১৯৭১ সালে, পাকিস্তানি ও হানাদার ইসলামরক্ষীদের অন্যতম সহযোগী ছিল গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন জামাতে ইসলাম। হানাদার বাহিনীর সঙ্গে হত্যা-ধর্ষণ লুটতরাজে তারাও পিছপা হয়নি। পাকিস্তানিরা নেই, কিন্তু জামাতিরা আছে। ধর্মের নামে যাবতীয় দুষ্কর্ম করে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এখনও তাদের অব্যাহত। গ্রামে যেমন বলে রক্তের দোষ। এর প্রমাণ, কয়েকদিন আগে বাচ্চা জামাতিদের বখশিবাজারে আহমদিয়া মসজিদ আক্রমণ লুটপাট। অবশ্য ধর্ষণের জন্য কোনো মহিলা তারা পায়নি। শুধু তা-ই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত কোরান শরিফের দুর্লভ সংগ্রহ তারা পুড়িয়ে দিয়েছে। পুড়ে যাওয়া কোরান শরিফের ছবি ছাপা হয়েছে ভোরের কাগজে।

জামাতের কথিত মাওলানা ড. আহমদ শরীফকে মুরতাদ বলেন, ফাঁসি দাবি করেন। কোরান শরিফ পোড়ানো মানে আল্লাহ রাসুলের গায়ে হাত দেয়া। ড. আহমদ শরীফ কি গত চল্লিশ বছরে কোনো কোরান শরিফ পুড়িয়েছেন? না। জামাতিরা গত চল্লিশ বছরে কয়েকবার কোরান শরিফ পুড়িয়েছে, ভবিষ্যতেও পোড়াবে। তাহলে মুরতাদ কে? প্রতিটি জামাতি মুরতাদ। এই মুরতাদরা বাংলাদেশে এখনও কীভাবে বসবাস করছে? সরকারই-বা কীভাবে এই মুরতাদদের রক্ষা করছে? নাকি সরকারও পরিচালিত হচ্ছে মুরতাদদের প্রভাবে? আমাদের স্লোগান হওয়া উচিত 'কোরআন পোড়ানো মুরতাদদের নির্মূল করো।'

বখশিবাজারে যে আহমদিয়া মিশন আছে তা-ই অনেকের জানা ছিল না। তাঁরা নিরিবিলি তাঁদের ধর্মকর্ম করে যাচ্ছেন। এরকম আরও অনেক সম্প্রদায় আছে বাংলাদেশে যারা নিরিবিলি নিজ-নিজ ধর্ম পালন করেন ও দেশগঠনে অংশ নেন, যেমন বাহাই ইসমাইলিয়া। গত চার দশকে এঁদের হামলার কথা কেউ ভাবেনি। পাকিস্তানে যখন জামাতিদের পিতা মওদুদীর নেতৃত্বে কাদিয়ানিদের ওপর আক্রমণ

চালানো হয়, তখনও এ অঞ্চল মুক্ত ছিল সে সন্ত্রাস থেকে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছে মাঝে মাঝে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা থামানো হয়েছে। এগুলো পুরনো বিষয়। কিন্তু গত কয়েক মাসের ঘটনা লক্ষ্য করুন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হামলা হচ্ছে, ইসলাম রক্ষায় কিছু সাংবাদিক ও তাদের পত্রিকা এবং কথিত মাওলানারা সক্রিয় হয়ে উঠছে। এগুলো কি 'স্বতঃস্ফূর্ত' নাকি পূর্বপরিকল্পিত?

এসব ঘটনা শুরুর সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করুন। গত কয়েক মাসে দ্রুত কিছু ঘটনা ঘটছে যা শাসকদল ও জামাতিদের অনুকূলে নয়। এগুলো হল– নির্মূল কমিটির আন্দোলন, জোর করে সন্ত্রাস দমন আইন পাস ও বিরোধী দলের সংসদ বর্জন, ইনডেমনিটি আইন বাতিল, রোহিঙ্গা শিবিরে ঝামেলা, পুশইন বা পুশব্যাক ইত্যাদি।

অতীতের অভিজ্ঞতা বলে, দেশে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে একটি মহল নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সরানোর জন্য অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। উপরে যে আন্দোলনগুলোর উল্লেখ করলাম এগুলো জামায়াত ও সরকারের বিরুদ্ধে। ফলে জামাত তাদের থেকে মনোযোগ ফেরাতে চাইছে অন্যদিকে। আর সরকার তো তাদের সহযোগী শক্তি। এখানে বলে রাখা ভালো, জামাতের সব সময় একজন পিতার দরকার হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রে তা হয় সরকারই। ইংরেজ আমলে ছিল ইংরেজ, পাকিস্তানি আমলে ছিল পাক সামরিক সরকার, এখন বিএনপি। তবে, বর্তমানে কে যে কার পরিকল্পনা কার্যকর করছে তা বোঝা মুশকিল হয়ে উঠছে। ফলে এ কথা বলা যেতে পারে যে, এখন ঘটছে তার অনেকটাই পূর্বপরিকল্পিত।

সেনা কর্মকর্তা যারা বাংলাদেশ শাসন করেছেন গত পনের বছর, তাঁরাই স্বাধীনতাবিরোধী ও প্রকৃত ধর্মবিরোধীদের বড় একটি অংশকে সংহত করেছেন ধর্মের নামে। সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এরা শক্তি জুগিয়েছিল। এরা একই শক্তি, পরিচিত বিভিন্ন নামে– যেমন জামাত, ফ্রিডম পার্টি, দৈনিক ইনকিলাব প্রভৃতি। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক তোষণে এরা গোকূলে বেড়েছে।

নির্মূল কমিটিই গত দু-দশকে প্রথমবারের মতো তাদের কার্যকরভাবে চ্যালেঞ্জ করেছে। প্রথমে নির্মূল কমিটিকে হালকাভাবে নিলেও এসব শক্তি এখন আর নির্মূল কমিটিকে হালকাভাবে নিচ্ছে না, বিশেষ করে গোলাম আযমের গ্রেফতারের পর। তারা বুঝেছে নির্মূল কমিটিকে ঠেকাতে না পারলে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। যার ফলে হঠাৎ দেখি, শুধু হিন্দু-মুসলমানই নয়, সুন্নি-কাদিয়ানী, হিন্দু-খ্রিস্টান সব রকমের দাঙ্গার শুরু, আহমদ শরীফকে মুরতাদ ঘোষণা। এবং সমস্ত স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিই এক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ। ঐক্যবদ্ধ নয় শুধু বিপক্ষের মানুষেরা।

সরকার এদের মদদ দিচ্ছে এ কারণে যে, তাদের ধারণা সাধারণ মানুষের মনে ইনডেমনিটি বা সন্ত্রাস দমন আইন বা দু-জন মন্ত্রীর প্রতিটি বক্তব্য নিয়ে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে তা হ্রাস করা। না হলে, সন্ত্রাস দমনের নামে কিশোররা গ্রেফতার হয়, কিন্তু আহমদিয়া কমপ্লেক্স আক্রান্ত হওয়ার পরও বাচ্চা জামাতিদের সন্ত্রাসী হিসেবে গ্রেফতার করা হয় না কেন? গণআদালতের ২৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা প্রত্যাহারের চুক্তি সত্ত্বেও তা মানা হয় না কেন? বরং গোলাম আযমকে শ্বশুরবাড়ির আদরে রাখা হয় যখন তিনি ছিলেন জেলে।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে এসব শক্তি প্রগতির পক্ষের সবাইকে 'ভারতীয় দালাল' বলা শুরু করেছে। ভারতবিরোধী একটি প্রচারণা গত চল্লিশ বছর ধরে এদেশে বর্তমান। এ বিরোধিতার ভিত্তি কী, তা যারা বিরোধিতা করেন তারাই বলতে পারেন। পাকিস্তান বা অন্য কোথাও মুসলমান নিগৃহীত হলে তারা যতটা না আপ্লুত হন তার চেয়ে বেশি হন ভারতে কিছু হলে। এর মনস্তাত্ত্বিক দিক থাকতে পারে, কিন্তু কিছু কিছু ইন্ধনের সূত্রও আছে যা স্বার্থান্বেষীরা ব্যবহার করে। লক্ষণীয় যে, 'ভারতীয় দালাল' তাঁদেরই বলা হয় যাঁরা বিএনপি জামাতের বিরুদ্ধে বা সউদি পাকিস্তানি স্বার্থের বিরুদ্ধে। যাঁরা প্রগতির পক্ষে বা উগ্র জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে তাঁরাও আখ্যায়িত হন 'ভারতীয় দালাল' নামে। এ প্রচারে কয়েকটি পত্রিকা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিক বা এলিট মহলের একাংশ সোচ্চার। কিন্তু 'ভারতীয় দালাল' কারা? যাদের সময় অবাধে ডিম আসে তারা, না প্রগতির পক্ষে যাঁরা তারা? যুক্তির খাতিরে ধরে নিলাম প্রগতির পক্ষে যাঁরা তাঁরা। তাহলে যারা এ প্রচার চালাচ্ছে তারা নিশ্চয় পাকিস্তানি দালাল। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সুতরাং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে আমাদের এখন শ্লোগান হবে– 'পাকিস্তানি দালালদের নির্মূল করুন, বাংলাদেশ রক্ষা করুন।'

কিন্তু 'ভারতীয় দালাল' প্রত্যয়টির যথেচ্ছ ব্যবহারে মনে হয় এখন এর ধার কমে গেছে তাই জামাত ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নিয়ে এসেছে 'মুরতাদ আহমদ শরীফ' প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে আবদুল মান্নানের 'ইনকিলাব'। পত্রিকাটি এরশাদের আমলে দাঙ্গা লাগিয়েছিল। দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্টের ব্যাপারে এ পত্রিকার ভূমিকা প্রবল। শুধু তা-ই নয়, এরশাদের সবচেয়ে বড় সহযোগী ছিল এ পত্রিকা ও এর মালিক। লক্ষণীয় যে, সবচেয়ে বেশি সরকারি বিজ্ঞাপন পায় এ পত্রিকাই। এর অর্থ আশা করি কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। সাংবাদিকদের একাংশও চমৎকারভাবে তাদের সাহায্য করছে। আমাদের দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও এলিট এবং 'শিক্ষিত' বলে চিহ্নিত সাংবাদিকদের একটি অংশকে দেখুন। 'ইনকিলাব' ও 'মিল্লাত' বারবার মিথ্যা খবর ছাপায়, সমাজে

অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে এবং বিপদে পড়লে মাপ চায়। এ সাংবাদিকেরা এদের ভর্ৎসনা পর্যন্ত করেন না। বরং দেখেছি, ব্যক্তিবিশেষ এ কারণে প্রতিকার চেয়ে আইনের আশ্রয় নিলে তাঁরা নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন। একই সঙ্গে এদের অনেকে আলবদরের নিমক খেয়ে বাইরে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। সমাজের আরেকটি প্রভাবশালী অংশ এলিট বলে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ (যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের) বাইরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লেখেন, বলেন ও ভেতরে এইসব রাজাকারকে নিয়ে দল করেন। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, জামাত-ফ্রিডম পার্টি বা সাংবাদিক-শিক্ষক ব্যবসায়ীদের একাংশ সবাই মিলে একই সূত্রে গাঁথা, ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে সচেষ্ট।

এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করেও সরলভাবে প্রশ্ন করতে পারি– ইসলামে মসজিদে হামলা বা কোরান পোড়ানো জায়েজ কি না? তা যদি না হয় তাহলে যারা এগুলো করে তারা মুরতাদ কি না? এবং যারা তাদের প্রশ্রয় দেয় তারাও মুরতাদ কি না? উত্তর হবে– হ্যাঁ। দুঃখের বিষয়, আমরা যারা এসব মুরতাদের বিরোধী তারা কখনও ঐক্যবদ্ধ ছিলাম না এবং এসব মুরতাদ পাকিস্তানি দালালদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুখেও দাঁড়াইনি। কিন্তু এখন বোধহয় সময় ফুরিয়ে আসছে। এরা সবাই এখন হাত মিলিয়ে মরণ-কামড় দিতে উন্মুখ। কারণ, লক্ষ করুন তাদের দাবিনামা কীভাবে বাড়ছে ঃ

১. বিভিন্ন দাঙ্গার পর এখন জামাতি ও তাদের সহযোগীরা দাবি করছে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করার। সঙ্গে গোলাম আযমের মুক্তির জন্যও সভা করছে। [গোলাম আযম তারপর মুক্তি পেয়েছে]
২. সংসদে বিএনপি এমপিদের কেউ কেউ 'মুরতাদ শরীফ' সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু দাঙ্গাকারী জামাত সম্পর্কে নিশ্চুপ।
৩. বিএনপি এমপি এখন বিদেশে নিজেকে পরিচয় দেন পাকিস্তানের পার্লামেন্টের এমপি হিসেবে।
৪. মাওলানা বলে কথিত সাঈদী এখন ফতোয়া দিয়েছে ড. আহমদ শরীফের বই পোড়ানোর ও আহমদ শরীফের মতো সবাইকে নির্মূলের জন্য।
৫. সরকারের মন্ত্রীরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অসত্য বক্তব্য রাখছেন যা প্রকারান্তরে পাকিস্তানি পক্ষই সমর্থন।

খুব শিগগিরই হয়তো তারা বলবে, জামাতি এবং বিএনপি ও ফ্রিডম পার্টি ছাড়া সবাই অমুসলিম। আর এদেশে তারাই রাজনীতি করতে পারবে যারা সউদি আরব ও পাকিস্তানের পক্ষে।

বিএনপিতে নাকি মুক্তিযোদ্ধারা আছেন? যদি থাকেন, তাহলে তাদের এমপি-

রা কেন পাকিস্তানের পার্লামেন্ট সদস্য বলে পরিচিত হতে চান বা সংসদে জামাতের বা মুরতাদদের সহযোগী হয়ে কাজ করেন বা তাদের মন্ত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস কেন প্রচার করেন? তাঁরা কি সাংবাদিক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সেই অংশের মতো যাঁরা সামান্য রুটির টুকরোর জন্য আত্মা বিকিয়ে দেন? মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতিবিদরা তো এ আচরণ করতে পারেন না। কারণ, অন্তিমে তাঁরাও তো রক্ষা পাবেন না।

বাংলাদেশে এখন সময় এসেছে নির্ণয় করার যে কারা এদেশে থাকবে। মুরতাদ বা পাকিস্তানি দালালরা না অন্যরা? অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক এরা। আমাদের বেছে নিতে হবে আমরা কী চাই। এবার যদি কোরান-পোড়ানো এই মুতরাদ ও পাকিস্তানি দালালদের আমরা রুখতে না পারি তাহলে আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে। আমাদের প্রতিপক্ষ শুধু বাঙালি জাতীয়তাবাদ কেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও বিরোধী। যদি কেউ ভেবে থাকেন যে, মুরতাদ বা পাকিস্তানি দালালদের সঙ্গে যুদ্ধে আমি নিরপেক্ষ তাহলে ভুল করবেন। যাঁরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ছিলেন তাঁরা জানেন জামাতি মুরতাদ ও পাকিস্তানি দালালরা কী জিনিস। তারা কি আবার ভুল করবেন? যদি করেন তাহলে আমি আপনি যারা মুক্তিযুদ্ধের, গণতন্ত্রের প্রগতির, সামাজিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ন্যায়বিচারের পক্ষে তাদেরকে হয় নির্বংশ হতে হবে নয়তো নির্বাসনে যেতে হবে। হয়তো ভাববেন, না হয় নির্বাসনেই যাব। কিন্তু জানেন কিনা জানি না, শেকড়হীন মানুষের চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কেউ নেই। না হলে তিন চারশো বছর পরও আলেক্স হ্যালিকে লিখতে হয় কিনটা কুনটির গাঁথা?

১৯৯২

আমার মৃত্যুও যেন না হয় সেই বাংলাদেশে

সারাটা বছর তাদের হাতে ছুরিটা লকলক করে। ছুরিটা এত চকচকে যে রোদে ধরলে তা বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এই চকচকে ছুরি দিয়ে তারা বাংলাদেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের পায়ের রগ কেটে দেয়, ফটিকছড়ি, রাউজান থেকে রংপুর বা এক কথায় টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ধর্মপ্রাণ সাহসী ও সংগ্রামী মানুষের পিঠে বিঁধিয়ে দেয় সেই ছুরি।

শুধু একটি মাস তাদের হাতের ছুরি গোঁজা থাকে ট্যাকে। এই ডিসেম্বরে তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। একটু ভুল বললাম। ফেব্রুয়ারি, মার্চেও তারা ঝিম মেরে থাকে। তবে আজকাল ফেব্রুয়ারিতেও 'ভাষা সৈনিক গোলাম আযম' এ ধরনের দু-একটি চিকা মারে দেয়ালে, মার্চেও যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু ডিসেম্বরে একবারে চুপ। কেন? কারণ, এই ডিসেম্বরেই হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে যায় বাংলাদেশের, মানুষগুলো সব নড়েচড়ে ওঠে। এই ঘুম ভাঙা মাসে, দেশের রাজনীতিবিদরাও ভয়ে থাকেন জামাতি পক্ষের সরকার বিমর্ষ বোধ করে আর পাকিস্তানি দালালরা সন্ত্রস্ত থাকে। আবার হবে নাকি একাত্তর? আবার সারা বাংলাদেশ জুড়ে কি স্লোগান উঠবে 'জয় বাংলা বাংলার জয়- হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয়'। সারা বছর পাকিস্তানি দালাল ও জামাতিরা যা অর্জন করে, এক ডিসেম্বরে তার সব ভেসে যায়। এ প্রক্রিয়া চলছে গত সতের বছর। তবে, এতে খুশি হওয়ার কিছু নেই। সব ভেসে যাওয়ার অর্থ একবারে সব ভেসে যাওয়া নয়। প্রতি বছর শতকরা একভাগ রক্ষা করতে পারলেও সতের বছরে সে অর্জন করেছে সতের ভাগ। এই সতের ভাগের বিরুদ্ধে আজ আমাদের নতুন করে আন্দোলন করতে হচ্ছে।

জামাত বা পাকিস্তানি দালালদের এ অর্জনের পিছে আমাদের অবদানও কম নয়। আমরা বলতে আমি বাংলাদেশের বিশাল জনসমষ্টি এবং শহুরে নাগরিকদের একটি অংশ, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতার অংশীদার নয় অথচ প্রতিটি আন্দোলনে আত্মাহুতি দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত করছি না। তাদের ঈমান আমাদের থেকে পাকা। আমি আমাদের কথা বলছি, যাদের অধিকাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র ও ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত– যারা স্বাধীনতার পর কোটিপতি হয়েছি পত্রিকার মালিক-সাংবাদিক হয়েছি। এদের মধ্যে সামরিক শাসক এবং সামরিক

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যারা, তারাই সবচেয়ে বেশি মদদ দিয়েছে পাকিস্তানি দালাল ও জামাতিদের। এদের মধ্যে ১৯৭৫ সালের কর্নেল ফারুক-রশীদ থেকে জেনারেল এরশাদ সবাই আছেন। আজ প্রচারমাধ্যম এবং বিএনপির নেতারা জেনারেল জিয়ার কথা বলার সময় অজ্ঞান হয়ে যান। কিন্তু পাঠক, আপনারা কি ভুলে গেছেন বাংলাদেশে 'আলবদর' হিসেবে খ্যাত আবদুল মান্নান ও আব্দুল আলীমকে এবং রাজাকার শাহ আজিজকে কে প্রথম মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন? আপনারা কি ভুলে গেছেন এখানকার প্রখ্যাত বাম রাজনীতিবিদরা এরশাদের হাতে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানি দালালদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? বিএনপি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে। তাতে কারো আপত্তি নেই। কিন্তু তার মানে কি জামাতের সঙ্গে যোগ দিতে হবে? আওয়ামী লীগ-বিরোধিতা মানে কি পাকিস্তানি দালালদের প্রতিষ্ঠা করা? এ মাত্রাটা রাজনীতিতে বিএনপিই যুক্ত করেছে। দুর্ভাগ্য মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ এ দলে থেকে সারা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করছে। তাদের শুধু বলতে চাই, মানুষকে এত বোকা ভাবার কারণ নেই। একই সঙ্গে রাজাকার-আলবদরদের কর্মসূচি কার্যকর করা হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত বলা হবে এবং মানুষ তা বিশ্বাস করবে, সে সময় বোধহয় এখন আর নেই।

এসবের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ বা কমিউনিস্ট পার্টি সাধারণ মানুষকে তেমনভাবে মবিলাইজ করেনি। একটি উদাহরণ দিই। এরশাদের আমলে, বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কর্মসূচির সমান্তরালে জামাতও একই কর্মসূচি দিতে থাকে এবং নিজেদের স্বৈরাচারের বিরোধী হিসেবে প্রমাণে সচেষ্ট থাকে। বিরোধী দলগুলো তখন তা উৎসাহিত করেছে। ওই সময় একজন সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরই এর বিরুদ্ধে লিখেছিলেন, যার মাশুল তাঁকে আজ দিতে হচ্ছে। কিন্তু তখন যা ভুল হওয়ার তা হয়ে গেছে। রাজনীতিবিদরা বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন হরিণ মাংস খায় না, আর বাঘ খায় না ঘাস। রাজনীতিবিদরা যদি মানুষকে সচেতন করে তুলতেন তাহলে আজ আমাদের এ অবস্থা হতো না।

আমাদের অধিকাংশই প্রো-স্টাবলিশমেন্ট বা ক্ষমতাবানের পক্ষে। আমি যে কমিউনিটির সদস্য বা যে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি। সেখানে অধিকাংশ শিক্ষক প্রো-স্টাবলিশমেন্ট নয় এমন কথা বলা যাবে না। শুধু তা-ই নয়, দেখেছি আমাদেরই শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও সহকর্মীরা ক্ষুদ্র স্বার্থ ও স্বল্প ক্ষমতার লোভে বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাতি শিক্ষকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দল করছেন। শুধু তা-ই নয়, গত তিন বছর দেখা গেছে, প্রবলভাবে জামাতি ঝোঁকসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ। ভোটের জন্য জামাতি শিক্ষকদের তোয়াজ করতে করতে তারা অস্থির করে ফেলেছেন। শুনেছি, একজন মেধাবী ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিয়োগ পেয়েও জয়েন করতে না পেরে আক্ষেপ করে বলেছিলেন–বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন শিক্ষক রিক্রুট করা হয় না, ভোটার রিক্রুট করা হয়। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না, এসব কারণেই সুযোগ পেয়ে একজন শিক্ষক জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিল।

সাংবাদিকরা প্রায় সব সময় সরকার-বন্দনা করেছেন। শেখ মুজিবের আমল থেকে এ পর্যন্ত পত্রিকাগুলো পড়ে দেখুন, তাহলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যার ফলে, গত সতের বছরে সরকারসমূহ যখন জামাত ও পাকিস্তানি দালালদের শক্তিশালী করছে তখন সংবাদপত্রগুলোও তাতে সোৎসাহে অংশ নিয়েছে। কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা তাদের প্রথম সংখ্যা থেকেই বিরোধিতা করে আসছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ও অসাম্প্রদায়িকতার। আলবদরের নিমক খান, কিন্তু বাইরে মুক্তিযুদ্ধের ও স্বৈরাচারবিরোধিতার কথা বলেন এমন নেতা সাংবাদিক ইউনিয়নে কম নয়। গাড়ি বাড়ি তাঁদের হয়েছে, তাঁদের অনুসারীদের নয়। অতি সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দিই। বিচিত্রার নির্বাহী সম্পাদক শাহরিয়ার কবিরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তিনি নির্মূল কমিটির সঙ্গে যুক্ত বলে। কিন্তু সাংবাদিক ইউনিয়ন তার প্রতিকার চায়নি বা তেমন সচেষ্ট হয়নি প্রতিবাদে। কবি শামসুর রাহমান যখন এরশাদের স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে চাকরিতে ইস্তফা দেন, তখন সাংবাদিকরা তাঁকে অভিনন্দনও জানাননি।

রাষ্ট্রের সঙ্গে সারাসরিভাবে যুক্ত যাঁরা, সবচেয়ে ক্ষমতাধর বা দেশের নীতি নির্ধারণের কাণ্ডারি– সেই আমলা, সামরিক বাহিনীর কর্তা এবং পুলিশ সব সময় নির্যাতন করেছে সাধারণ মানুষকে। ঢাকা নগর জাদুঘরের একটি প্রদর্শনী ও এরশাদ আমলের আরেকটি প্রদর্শনীতে দেখেছি ১৯৪৮ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ের বৈশিষ্ট্য রাজপথে নিরস্ত্র জনতা, অন্যদিকে সশস্ত্র পুলিশ তাদের পেটাচ্ছে। অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ দিই। জামাত ও নির্মূল কমিটির সমাবেশ হলে দেখি পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মূল কমিটির কর্মীদের ওপর আর ঘিরে রাখে জামাতিদের। সমষ্টিগত এই নির্যাতনের জন্য কর্তাব্যক্তিরা সব সময় পার পেয়ে যান এবং সরকারে যাঁরা থাকেন তাঁরাই তাদের সাহায্য করেন। সাম্প্রতিক আরেকটি উদারহণ দেয়া যাক। স্বৈরাচারের দোসর হিসেবে খ্যাত উচ্চপর্যায়ের আমলাদের পুনর্বাসন কে করেছে?

তবুও কেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ গণআন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও পরে রাজনীতিবিদদের দিকে তাকিয়ে থাকেন? এদেশের ইতিহাসে একটি অদ্ভুত ব্যাপার হল, যে-কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন প্রথমে শুরু করেন লেখক-সাংস্কৃতিক কর্মী ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ। পরে যোগ দেন রাজনীতিবিদরা। সাংস্কৃতিক কর্মীরা সবচেয়ে কম আত্মা

বিক্রি করেছেন এদেশে এবং তাই এক অর্থে তাঁরা মাইনোরিটি। ছাত্রদের একটি অংশের কথা বলেছি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দশ থেকে পনের ভাগ সক্রিয়ভাবে অংশ নেন আন্দোলনে। বাকিরা নিষ্ক্রিয়, তবে হয়তো সমর্থক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার প্রযোজ্য। এঁরাও মাইনোরিটি। সাংবাদিকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ, বিশেষ করে তরুণরা সোচ্চার। বাকিরা যা যা করার তা করে নিয়েছে। সাংবাদিকরা মাইনোরিটি। লেখক-শিল্পীদের বেলাও একই বিষয় প্রযোজ্য। এই মাইনোরিটির জন্যই সাধারণ মানুষ এখন বিশ্বাস করে শিল্পী-সাহিত্যিক, ছাত্র-শিক্ষক ও সাংবাদিকদের।

এই মাইনোরিটি বাংলাদেশে সব সময় গণবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে। মার খেয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে থেকেছে, আস্তে আস্তে সাধারণ মানুষ তাদের কথা উপলব্ধি করেছে। তাদের মিছিল স্ফীত হয়েছে, তারপর রাজনীতিবিদরা এসেছেন সম্পন্ন করেছেন আন্দোলন। মেজোরিটি হয়ে তাঁরা ক্ষমতায় বসার পর আবার মাইনোরিটির ওপর নেমে এসেছে খড়্গ।

এই মাইনোরিটির একটি আদর্শ আছে। সেটির ভিত্তি সততা, ইনটেগ্রেটি, তারা সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে, তারা বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিতে। আর এ সবই হচ্ছে কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। এই ধারাটি প্রকৃত অর্থে ১৯৭১ সালে মেজোরিটিতে পরিণত হয়েছিল।

এই মাইনোরিটিতে প্রবলভাবে ভয় করে সামরিক শাসক, মুরতাদ জামাতি এবং পাকিস্তানি দালালরা। তাদের এই ভয়ের বহিঃপ্রকাশ। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর যা এখন শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস নামে পরিচিত। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি, অনেকে প্রশ্ন তোলেন, সারা দেশে অগণিত শহীদ হয়েছেন, কিন্তু এদের বাদ দিয়ে বিশেষভাবে ১৪ ডিসেম্বর পালনের অর্থ কী? কাউকে বাদ দিয়ে কিছু পালন করা হয় না। ১৬ ডিসেম্বর তো সেই নাম-না-জানা শহীদদের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। ১৪ ডিসেম্বরটি প্রতীক সেই মাইনোরিটি ধারা যাদের ওপর শাসকরা সব সময় ক্রুদ্ধ। এই ধারাটিকেই ১৯৭১-এ পাক হানাদার বাহিনী ও জামাত হত্যা করতে চেয়েছিল আলবদর-নেতা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে। এখনও যে তারা তা করতে চাচ্ছে না তা বলি কীভাবে? এর আলামত কি চারদিকে নজরে পড়ছে না?

দুই

গত সতের বছরে নির্মূল কমিটিই প্রথম মুরতাদ জামাতি ও পাকিস্তানি দালালদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। ওই যে সেই মাইনোরিটি তাঁরাই শুরু করেছিলেন আন্দোলন। অনেকেই তখন এ নিয়ে হাসাহাসি করেছেন, বলেছেন এটি বালখিল্যতা। কিন্তু গণআদালতের দিন দেখা গেল এটি হয়ে গেছে বেগবান একটি ধারা। তখনই প্রমাদ গুণেছে মুরতাদ জামাতি, আলবদর ও পাকিস্তানি দালালরা।

গত এক বছর এ ধারা যত বেগবান হচ্ছে, ততই এরা চাইছে বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতে। রগকাটা, ছুরি বসিয়ে দেয়া ছাড়াও তাদের পত্রিকাগুলো ক্রমাগত অসাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ব্যক্তিত্বদের চরিত্র হনন করছে। ড. আহমদ শরীফ তাদের কাছে মুরতাদ, কারণ প্রকাশ্যে তিনি ধর্মান্ধতার সমালোচনা করেন। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতিদিনই কিছু না কিছু লেখা হবে, কারণ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় এবং বাংলা একাডেমীতে থেকে জালেমদের কাছে তিনি মাথা নোয়াননি। ফয়েজ আহমদ শামসুর রাহমান সবাই ভারতীয় দালাল, কারণ তাঁদের কবিতা, কর্মকাণ্ড সবই জামাতি এবং পাকিস্তানি চেতনার বিরুদ্ধে। আজকে 'দালাল' সৈয়দ শামসুল হক, কারণ তিনি মুক্তিযুদ্ধের ওপর 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' ও 'নীল দংশন' নামে দুটি অসামান্য কাব্যনাটক ও উপন্যাস লিখেছেন। শুধু তাই নয়, কতটা জালেম হলে জাহানারা ইমামকে জামাতি নেতারা বলতে পারে, একুশ বছর পর কোন্ মা কাঁদে তার পুত্রের জন্য। যদি জামাতি বা পাকিস্তানি দালালদের সন্তানদের হত্যা করা হতো, তাঁদের স্ত্রী ও কন্যাকে তাঁদের সামনে ধর্ষণ করা হতো সেই ১৯৭১ সালে, তখন তারা এ কথা বলতেন কি না তা জানার ইচ্ছা রইল। এতেও মানুষের দৃষ্টি ফেরাতে না পেরে জামাতি ও পাকিস্তানি দালালরা আহমদিয়াদের দুটি মসজিদ ও কোরআন পোড়াল, দাঙ্গা বাধাল।

আমাদের দুঃখ এই যে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কেউ রাজনৈতিক দল হোক, আর নির্মূল কমিটি হোক- এ প্রচারের বিরুদ্ধে তুমুলভাবে এটা তুলে ধরল না যে ড. আহমদ শরীফ মধ্যযুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান তুলে ধরেছেন, যা ছিল অবিকৃত এবং যা নিয়ে শুধু মুসলমানরাই গর্ববোধ করে না, মৌলবাদীরাও তা ব্যবহার করে। আপনারা কি জানেন যে, তিনি সম্পাদনা করেছেন 'রসুল বিজয়'? এ কথাও তারা বলল না যে, কোরান পোড়ানো আর ইসলাম ধর্ম গুড়িয়ে দেয়া একই ব্যাপার।

ভারতের বাবরি মসজিদের ঘটনা জামাতিদের ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জন্য বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিল মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর জন্য। বাবরি মসজিদের ঘটনা যে ভারত সরকারের শৈথিল্যের কারণে ঘটেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং তা যে কত বড় অন্যায়, ধর্মপরায়ণ সবাই তা স্বীকার করবেন। কিন্তু ভারতে কিছু ঘটলে দায়দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে পড়বে কেন? খবরের কাগজে দেখেছি, সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে ব্যাপকভাবে মন্দির নষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং লুটপাট করা হয়েছে, তাতে জামাত ও পাকিস্তানি দালালদের হাত ছিল। ইসলাম কি বলে প্রতিবেশীর বাড়ি চড়াও হতে? ইসলাম কি বলে অন্যের উপাসনালয় ভাঙতে? ইসলাম কি বলে প্রতিবেশীর বাড়ি লুটপাট করতে? হ্যাঁ,

জামাতিদের মওদুদীবাদী ইসলাম তা বলে। সে ইসলামে বলে ১৯৭১ সালের মতো গণহত্যা করতে, ধর্ষণ করতে। আমার আপনার ধর্মপ্রাণ মুসলমানের, রসুলের ইসলাম এগুলো করতে বলে না, আসল ইসলাম বলে এগুলো নাফরমানি কাজ। কিন্তু ধর্মের নামে গত কয়েকদিনে আমাদের দেশে এসব অধার্মিক কাজ হয়েছে।

ভারতে বিজেপি চেয়েছিল অস্থিতিশীলতা এনে ক্ষমতায় যেতে। জামাতের নেতারা বিজেপির নিন্দা করেনি, নিন্দা করেছে কংগ্রেসের। তাদের সঙ্গে বিজেপির আঁতাতটা পরিষ্কার। অর্থাৎ আমরা ভারতে, তোমরা বাংলাদেশে গণ্ডগোল করো, গোলাম আযমের বিচার তা হলে হবে না, দাঙ্গা বাধাও, তাহলে ভারত থেকে কয়েক কোটি অবাঙালি মুসলমান পাঠিয়ে দেয়া যাবে তাতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও নাজুক হবে। আর সরকার তো তোমাদের পক্ষে।

কিন্তু বিজয় দিবসের আগে একটি অসামান্য হরতাল ও অভূতপূর্ব মানববন্ধন প্রমাণ করেছে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ফেরানো যায়নি। এখানে মন্দির ধ্বংস হয়েছে সত্যি, কিন্তু প্রতিবেশীকে বাঁচাতে প্রতিবেশী এগিয়ে এসেছে এটাও সত্য। প্রাণহানি প্রায় হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা ও বিশ্বাস এখনও আছে আমাদের মধ্যে। এখন তা শুধু প্রজ্বলিত করার সময়। হরতাল ও মানববন্ধন আমরা জানি জামাতকে থমকে দাঁড় করিয়েছে।

আগেই বলেছি, ডিসেম্বরে জামাতি ও পাকিস্তানি দালালদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। এ ডিসেম্বরে তারা আরও মরিয়া হয়ে উঠবে। এ বছরটি তারা মনে করেছে তাদের জন্য সুসময়। চারদিকে অস্থিরতা, সরকার পক্ষে, অতএব যেভাবে হোক বাংলাদেশ নাম মুছে ফেলতে হবে। এজন্য আরও দাঙ্গা, রায়ের বাজারের মতো হত্যা হতে পারে। আমি মনে করি আমাদের জন্যও এটি সুসময়, কারণ দেশে এখন দুটি পক্ষ– মুক্তিযুদ্ধ পক্ষ ও রাজাকারপক্ষ। কে কোন পক্ষের সে বিষয়েও আর কোনো অস্পষ্টতা নেই। এতদিন রাজাকার পক্ষের অনেককে আমরা মুক্তিযুদ্ধ পক্ষ মনে করে ভুল করেছি। এখন আর সে কুয়াশা নেই। আমরা শুধু রাজনৈতিক দলগুলোকে সমস্ত অস্পষ্টতা ঝেড়ে এগিয়ে আসতে বলব মুক্তিযুদ্ধের পক্ষকে এগিয়ে নিতে। এটাই তাদের শেষ সুযোগ। কারণ রাজাকারপক্ষ এলে দেশে আর মুক্তিযুদ্ধপক্ষ বলে কিছু থাকবে না।

আমাদের সময় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। রাজাকারপক্ষকে রোখার দায়িত্ব এখন টগবগে তরুণদের। ১৯৭১ সালে তারাই রাজাকার আলবদর পক্ষকে রুখেছিলেন। আজকের তরুণদের শুধু বলব– হে যুবক, তুমি একবার স্মরণ করো তোমার পিতার কথা, যাকে রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে বা যশোরের গণকবরে পাওয়া গেছে। হে যুবক, তুমি একবার স্মরণ করো তোমার মার কথা, যিনি তোমার ছোট ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে বেয়নেটবিদ্ধ হয়েছেন। হে যুবক, একবার স্মরণ করো তোমার

বড়বোনের কথা, যাকে এই রাজাকাররা খানসেনাদের হাতে তুলে দিয়েছিল ভোগের জন্য। আজ এ চৌদ্দ ডিসেম্বর রায়ের বাজারের বধ্যভূমি দেখেও কি তুমি বলবে, সেই সাংবাদিকের মতো, যে রাজাকারের হাতে আর শহীদ পিতার কথা ভুলে প্রেসক্লাবে ঘোষণা করেছিল– গোলাম আযমের বিচারের জন্য আমরা যুদ্ধ করিনি। যদি তা-ই বল যদি আমরা আর না-ই পারি রাজাকারপক্ষের পরাক্রমের কাছে, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে বলব– আমার মৃত্যুও যেন না হয় সেই বাংলাদেশে।

১৯৯২

জোরালো বিশ্বাস নেই যাদের

গোলাম আযম মুক্তি পেয়েছেন। এটা কোনো বিস্ফোরণমূলক খবর না। এ ধরনের একটি প্রক্রিয়া গত দেড় দশক ধরে চলছিল, যা এখন পূর্ণরূপ পেয়েছে। প্রয়াত জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা করায়ত্ত করে মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকারী ও হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর অন্যতম সহযোগী জামাতে ইসলামীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। একত্রিশ ভাগ ভোট পেয়ে 'জনগণের ম্যান্ডেট' নিয়ে বেগম খালেদা জিয়া যেদিন জামাতকে সাথি করে ক্ষমতায় গেলেন, সেদিন সবাই এ ধারণাই করেছিল যে, বিএনপি তাজিমের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকারী দলকে পুনর্বাসিত করে। করেছেও। আর দল পুনর্বাসিত হলে দলপতি বাদ যাবে কেন?

অন্য আরেকটি দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। জেনারেল জিয়ার সময় গোলাম আযম বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তখন থেকে তিনি এ দেশে আছেন। বাসায় থাকতেন, মাঝে মাঝে গোপনে গোপনে এদিক সেদিক সফরও করতেন। কিছুদিন ধরে ছিলেন জেলে। বাংলাদেশের বাইরে তো আর যাননি। ফলে অবস্থার খুব একটা হেরফের হয়নি। আদালত টেকনিক্যাল কারণে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দিয়েছে। আইনের এই ত্রুটি (যদি হয়ে থাকে) ১৯৭৩ সালেও ছিল। এখনো তা রয়ে গেছে। তাঁকে ছেড়েছেও আদালত টেকনিক্যাল পয়েন্টে। গোলাম আযম ও তার দল যে মুক্তিযোদ্ধা হত্যা করেনি এবং বাংলাদেশ চায়নি তা কিন্তু অপ্রমাণিত হয়নি। আর আমাদের মূল বক্তব্যও তার সঙ্গে জড়িত। আমরা যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোলাম আযমের বিচার চেয়েছি। তাঁর নাগরিকত্ব ও মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে আমরা বিচলিত নই। বরং দেশী যুদ্ধাপরাধী হিসেবে মামলা আরো জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা। এ দাবি থেকে আমরা নড়িনি। নড়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই।

তবে, অবস্থার সামান্য হেরফের হয়েছে। কারণ, মুক্তি পেয়ে গোলাম আযম যা বলেছেন, বা গোলাম আযম মুক্তি পাওয়ার পর জামাত যা করছে তা ১৯৭১ সালের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সেটাই আশঙ্কার কারণ।

গোলাম আযম যেদিন ছাড়া পেলেন সেদিন জামাত কর্মীরা নাজিমউদ্দিন রোড দখল করে রেখেছিল। সন্ধ্যায় দেখি মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গোলাম আযমকে। তার বাসার গলিতে বসেছিল জামাত কর্মীরা। হাতে লাঠি তাতে আবার পেরেক পোঁতা। বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাদের। ভোরের কাগজের রিপোর্ট

অনুযায়ী 'গজারি লাঠির সঙ্গে পবিত্র জাতীয় পতাকা বেঁধে তারা ওই জাতীয় পতাকা কখনো দুমড়ে-মুচড়ে রাস্তায় ফেলে রাখে। আবার কখনো ওই জাতীয় পতাকাকে ব্যবহার করে বসবার কাপড় হিসেবে।'

বিশেষ আদালত গঠনের প্রশ্নে বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে গোলাম আযম বলেছেন, 'তাঁরা আগে গঠন (বিশেষ আদালত) করুক না কেন। তারা যদি আদালত গঠন করতে পারে করুন। করলে পরে দেখা যাবে তারা আমাকে নেয়ার ক্ষমতা রাখে কিনা?'

একই কাগজের সূত্রে জানা গেছে রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজের শিক্ষক নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'গোলাম আযমের মুক্তিই প্রমাণ করেছে আমরা একাত্তরে ভুল করিনি। একাত্তরের ভূমিকার জন্যই আজ এ দেশে গোলাম আযমের এত জনপ্রিয়তা। শুধু তাই না, পরের দিন জামাত কর্মীরা হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নির্মূল কমিটির কর্মীদের ওপর। সেই ছবিও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে, ১৯৭১ সালের স্থান থেকে গোলাম আযমরা খুব একটা নড়েননি। প্রয়োজনে ১৯৭১ সালের জামাত যা করেছে এখনো তাই করবে। উপরোক্ত ঘটনা/বক্তব্য তার সামান্য প্রমাণ।

গোলাম আযমের মুক্তি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে যারা দাবি করেন তাদের একটি মূল প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে। আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে রাজনৈতিক দলগুলোকে দাঁড় করিয়েছে। এ প্রশ্নের সুরাহা না করে তাদের পক্ষে রাজনীতি নিয়ে এগোনো কতটা সম্ভব হবে জানি না, অন্তত আমাদের জেনারেশন বেঁচে থাকতে।

এর সঙ্গেই জড়িত রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা। ১৯৪৭ থেকে এ পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের মৌল বৈশিষ্ট্যটি হল বিশ্বাসহীনতা অর্থাৎ কোনো কিছুর প্রতি জোরালো বিশ্বাসের অভাব।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত, দেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ, সিভিল সমাজ গড়ার জন্য সাধারণ মানুষ রাজনীতিবিদদের সহায়তা করতে চেয়েছে। রাজনীতিবিদরাও সে মতো কাজের অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই অংশ হয়ে গিয়েছেন। ক্ষমতায় যারা যাননি তারা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন। এ. কে. ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান কেউ এর ব্যতিক্রম নন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বা সিভিল সমাজ গড়ার স্বার্থে নিজেদের সামান্য স্বার্থ বিসর্জন দিতেও কেউ রাজি হননি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত রাজনীতিবিদদের আগে এগিয়ে গেছেন ছাত্র, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্তও একই

ঘটনা ঘটেছে। জে. এরশাদ নয় বছর যথেচ্ছাচার চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন রাজনীতিবিদদের জোরালো বিশ্বাসের অভাবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধীদের ক্ষমা করে সঠিক কাজটি করেছিলেন এ-কথা কেউ বলবে না। কিন্তু জামাতকে নিষিদ্ধ করে সঠিক কাজ করেছিলেন। এ কথা জামাতের বর্তমান রগকাটা রাজনীতি দেখলেই বোঝা যায়। পরবর্তীকালে সামরিক শাসকরা যেমন জে. জিয়া বা জে. এরশাদ জামাতকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ছাড়া, বাংলাদেশে জামাতের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন এখনো। পূর্বসূরিদের মতো খালেদা জিয়াও একই কাজটি করছেন জোরালোভাবে। সে কারণেই গোলাম আযম এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য দিতে পারেন। বেগম জিয়া বারবার একটি কথা বলেন, জনগণের ম্যান্ডেটের কথা। জনগণ কি তাঁকে ম্যান্ডেট দিয়েছিল বিতর্কিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি করার বা জামাতকে তাজিমের সঙ্গে পুনর্বাসন করার? জামাত কখনো সিভিল সমাজের পক্ষে নয়। হলে তারা সামরিক শাসকদের সহায়তা গ্রহণ করত না। ইসলামের পক্ষে তো নয়ই– যতই বলুক- না তারা ইসলামের পক্ষে। জামাত বলেছে, গোলাম আযম বিশ্বের নেতৃত্ব দেবেন এ জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। সবার কথা বাদ দিই, মুসলিম বিশ্বই কি মুখিয়ে আছে তার নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে? ইন্দোনেশিয়ার ইসলামি রীতিনীতি ও সৌদি রীতিনীতি এক নয়। এক নয় বাংলাদেশ ও আলজিরিয়ার। তবে হ্যাঁ, ইসলাম যদি হয় হত্যাকারীর, ধর্মব্যবসায়ীর, উন্মত্ততা ও প্রতিশোধের, রগকাটা ও ধর্ষণের, তবে অবশ্যই তারা নেতৃত্ব দেবেন। তবে, এ ধরনের ইসলাম অন্য ইসলামি দেশগুলো মেনে নেবে কিনা সন্দেহ।

গোলাম আযম যেদিন মুক্তি পান, সেদিন নাজিমুদ্দিন রোড মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের দখলে থাকত, যদি তাদের বিশ্বাস জোরালো হতো। লক্ষ্যে পৌছার বিশ্বাস থাকলে, জামাত কর্মীরা তোপখানা রোডে হামলা চালাতে সাহস পেত না। বিশ্বাস জোরালো হলে– কেউ প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে বলার সাহস পেত না '৭১ সালে ভুল করিনি। এসব দলের রাজনীতিবিদরা এখনো মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তাই, যদি বলি, এখনও কোনোকিছুর প্রতি তাদের তেমন কোনো জোরালো বিশ্বাস নেই তাহলে কতটুকু ভুল হবে? যদি থাকতই গোলাম আযমের কথা বাদ দিই, তথ্যমন্ত্রী বেতার-টিভি সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তাতেই লংকাকাণ্ড বেঁধে যেত।

গত দু'দিন, আমি ও আমার এক বন্ধু সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষজনের সঙ্গে আলাপ করেছি যারা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। তারা বিএনপি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। কারণ তাদের অনেকেই এখন বিএনপিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে মনে করেন না। অবশ্য দুর্বলভাবে অনেকে বলেছেন,

বিএনপিতেও মুক্তিযোদ্ধা আছেন। থাকতে পারে। তবে, একজন সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা তো মুক্তিযোদ্ধার মতোই আচরণ করবেন। যারা তেমন আচরণ করেন না, তাদের কী বলা হয়? মানুষজনের অনেকের আশঙ্কা, বিএনপি জামায়াত এখন পুরনো দিনের ন্যাপ-সিপিবির মতো হয়ে যাবে। জামাতের কর্মীরা বিএনপিতে আর আর বিএনপির কর্মীরা জামাতে হয়তো যোগ দেবেন। ইতিমধ্যে রাজশাহীতে বেশ কিছু জামাতকর্মী যোগ দিয়েছে বিএনপিতে। তখন হয়তো বিএনপির মুক্তিযোদ্ধা অংশ জামাতের মুক্তিযোদ্ধা অংশ বলে পরিচিত হবে। সুতরাং এ বলে সান্ত্বনা পাওয়ার কিছু নেই। বরং জামাত ও যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোলাম আযমের বিচারের প্রশ্নের প্রয়োজনে লড়াইটা করতে হবে বিএনপি জামাতের বিরুদ্ধে।

মানুষজনের ক্ষোভ তাই বিএনপির প্রতি নয়, ক্ষোভ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল বলে পরিচিত শক্তির ওপর। কেননা, গোলাম আযম ও জামাত প্রশ্নে শর্তহীন কোনো জোরালো বিশ্বাসের পরিচয় তারা দিতে পারছে না। আর বিএনপিতো রাজনৈতিক বিশ্বাসই ভঙ্গ করেছে।

রাজনৈতিক দলগুলো মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। মানুষের মনে তারা বিশ্বাসের ভিত গড়তে পারছে না। বরং বিশ্বাসহীনতা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে একটা সময় আসবে যখন বাংলাদেশ পরিচিত হবে বিশ্বাসহীনদের দেশ হিসেবে। আর যে-জাতির কোনো কিছুতে বিশ্বাস নেই জোরালো বিশ্বাস নেই, সে-জাতি জগতে কোনো স্বীকৃতি পায় না।

১৯৯২

যুদ্ধক্ষেত্রে চুপ করে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়

অনেকে মনে করেন মাটিই সব, মানুষ নয়। দেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে কিছু মাটি। যারা এটি মনে করেন, তাদের কাছে মানুষ তেমন বিষয় নয়, মাটি থাকলেই হল। যেমন ১৯৭১ সালে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর জেনারেলরা বলেছিলেন– মানুষ চাই না, মাটি চাই। গোলাম আযমও নাকি একবার বলেছিলেন, দেশ কী? যে দেশের মাটিতে থাকি সেটিই দেশ। এটি অবিকল উদ্ধৃতি নয়।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়া জনমত মেরুকরণে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশ বিরোধী, পাকিস্তানপন্থী ও জামাতিরা বিলক্ষণ খুশি হয়েছে। তাদের কাছে মনে হয়েছে এটি তাদের নৈতিক জয়। বাকিরা যে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। হাইকোর্ট যখন এ বিষয়ে রায় দিয়েছিল তখনই একটি ধারণা জন্মেছিল যে, আইনের ফাঁক আছে এবং সে ফাঁক দিয়ে গোলাম আযম গলে যাবেন। আর আমাদের দেশে যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত খুব একটি জরুরি তা হয়তো অনেকের মনে হয় না। সুপ্রিমকোর্ট রায় দিয়েছে। আমরা মেনে নিয়েছি। সে বিষয়ে মন্তব্য করছি না। এটর্নি জেনারেল বলেছিলেন, 'গোলাম আযম যিনি রাজাকার এবং আলবদর বাহিনী গঠন করে এদেশের মুক্তিযুদ্ধে নরহত্যা, ধর্ষণের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে আজ নাগরিকত্ব পেলেন।' আমরাও তাই মনে করি।

প্রেস কমিশনের বিচারপতি সুলতানুজ্জামান বলেছেন, আদালতে রায় নিয়ে যে নানা কথা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। এতে আদালতের সম্মানহানি হয়। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ড. কামাল হোসেন যিনি সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা এবং মুজিব আমলে আইনমন্ত্রী ছিলেন, বলেছেন– 'ঘাতক গোলাম আযম স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারে না। স্বাধীনতার শত্রু ও গণহত্যার নায়ক নরপিশাচ গোলাম আযমের বিষয়টি এদেশের কোটি জনতার কাছে মীমাংসিত সত্য, আদালতের রায় জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, দেশের একজন নাগরিক হিসেবে যে কেউ এটা ভাবতে পারে। এরকম চিন্তা করার অধিকার রয়েছে।... আদালত সামরিক শাসনকে বৈধ বলে রায় দিয়েছে। কিন্তু জনগণ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। সফলভাবে সামরিক শাসন হটিয়েছে।'

এ মামলায় নিজ থেকে ড. কামাল হোসেন বা ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম

উপস্থিত হয়ে সে সময়ের ও আইন প্রণয়নের পটভূমি বলার অবকাশ ছিল কিনা জানি না। তাদের ব্যাখ্যা হয়তো এ মামলায় নতুন মাত্রা যোগ করত।

বিচারকদের রায় নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার নিশ্চয় মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত।

আইন মানুষের তৈরি, মানুষ আইনের তৈরি নয় এবং আইনে ত্রুটিও থাকতে পারে। রায় যিনি দেন তিনিও মানুষ। এ কারণে, সামরিক শাসনামলে, সামরিক শাসন যে অবৈধ এ কথা বলার সাহস তাদের থাকে না, কিন্তু পরে তা নিয়ে সোচ্চার হন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, পাকিস্তানের প্রখ্যাত বিচারপতি মুনির তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছিলেন তমিজউদ্দিন খানের মামলায় সরকার পক্ষে যে রায় হয়েছিল সেটি খানিকটা প্রভাবিত স্ট্যানলি ওলপোর্ট ভুট্টোর ওপর বই লিখতে গিয়ে ভুট্টোর বিচারকদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। বিচারকরা সবাই ছিলেন পাঞ্জাবি এবং সবাই ভুট্টোকে প্রথমেই সিন্ধি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শুধু তাই নয় প্রধান বিচারপতি মিয়া তোফায়েল ছিলেন জামাতপন্থী, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল তার ভুট্টোর প্রতি। এ সমস্ত রায় নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। আসলে দেশকে যদি নিছক মাটি হিসেবে কল্পনা করি তাহলে চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে এমনই হবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন, দেশ মানে মাটি ও মানুষ, তখন নিছক আইন নয়, সামগ্রিকভাবে দেশটি উঠে আসে। ১৯৭১ সালের পরিপ্রেক্ষিতে বাদ দিয়ে গোলাম আযমের ব্যাপারে কোনো মীমাংসা হতে পারে না। এটর্নি জেনারেল তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, 'গোলাম আযমকে বিচার করতে হবে নিছক আইন প্রয়োগের কথা ভেবে নয়, ১৯৭১ সালের পরিস্থিতির কথা ভেবে। কয়েকদিন আগে গ্রিস তাদের প্রাক্তন রাজা কনস্টানটাইনের নাগরিকত্ব বাতিল করেছে। কারণ, তাদের অভিযোগ, প্রাক্তন রাজা প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রের পক্ষে উস্কে ছিলেন কয়েকদিন আগে। রাজা বলেছেন, বংশানুক্রমে তিনি গ্রিক নাগরিক। এটি বাতিল করা যায় না। কিন্তু তা বাতিল করা হয়েছে এবং তার পক্ষে কেউ কোনো কথা বলেনি।

আমরা মনে করি গোলাম আযম নাগরিকত্ব পাওয়ায় পরিস্থিতির কোনো বদল হয়নি। বরং ভালো হয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তার বিচার করাটা বরং সহজ। বিদেশী নাগরিক হলে তাতে জটিলতা হতো। আর জনদাবি তো গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নয়, গণদাবি হল তার বিচার। দুটি বিষয় পুরোপুরি আলাদা। পত্রপত্রিকায় এখনো যে সব প্রতিক্রিয়া নজরে পড়ছে তাতেও এমতই প্রতিফলিত হয়েছে। রাজনীতিবিদরা যথার্থই বলেছেন, কোনো আদালতের রায়ে বাংলাদেশ হয়নি।'

গোলাম আযম যে দেশকে নিছক মাটি মনে করেন তা বোঝা যায় বিবিসির বাংলা বিভাগের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। তিনি বলেছেন, বাংলাটা ঠিক নয়,

ইংরেজিতেই বলবেন। বাঙালি সংস্কৃতি, মানুষের প্রতি মনোভাব এতেই প্রতিফলিত। অথচ, জামাত দেয়ালে স্লোগান লিখে- ভাষা সৈনিক গোলাম আযম। ভন্ডামি আর কাকে বলে!

আওয়ামী লীগের চিফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, 'গোলাম আযম নাগরিক কি নাগরিক না-এটা আমাদের বক্তব্য নয়। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তার বিচার করতে হবে। সুপ্রিমকোর্টের রায়ে একাত্তরে গণহত্যা, নারী ধর্ষণের অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।'

বিএনপির মেজর আখতারুজ্জামান (অব). বলেছেন, 'স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

এটাই মূল বিষয়। এবং বিষয়টি আরো সামনে চলে এসেছে ধর্ম ব্যবসায়ীদের কোরআনের ইজ্জত রক্ষার জন্য হরতাল আহ্বানে। দৈনিক ইনকিলাব এ বিষয়ে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

বিষয়টি কাকতালীয় কোনো ঘটনা নয়। পূর্বপরিকল্পিত। আর এতে ইন্ধন যোগাতে সাহায্য করেছেন তসলিমা নাসরিন। লেখক হিসেবে যদি তার দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা থাকত তাহলে যত্রতত্র যাতা তিনি বলে বেড়াতেন না। বিশেষ করে, আরবি না জেনে, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা মন্তব্য অর্বাচীনরাই করে। তসলিমাকে পুঁজি করে ধর্মব্যবসায়ীরা পরিকল্পিতভাবে এগিয়েছেন। বিভিন্ন কারণে তাদের ইস্যু দরকার। ইস্যু তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তারা তো ইসলামকে অশান্তিময় ধর্ম করে তুলছে। ইসলাম তো শান্তি আর যুক্তির ধর্ম। আর ইসলামের একটি মূল বিশ্বাস বিচারের মালিক আল্লাহ, মানুষ নয়। তাহলে দৈনিক ইনকিলাব পরিচালিত সহিংস এই 'মুরতাদ বিরোধী' আন্দোলনে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে সহিংস সব মন্তব্য তুলে ধরেছেন, তসলিমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন- এই যে বিচারের ভার নিজের হাতে তুলে নেওয়া- এটি আবার আমাদের অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। কারণ, আমরা তো ইসলামকে ন্যায় ও শান্তির ধর্ম বলি। কোরআন থেকে বিতর্কের উদ্দেশ্যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু যারা ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা করেছেন, তারা জানেন কোরানকে সামগ্রিকভাবে নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হয়। এক্ষেত্রে তসলিমা আর ধর্মব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি মৌলিক মিল আছে। সামগ্রিকভাবে কোরআনকে তারা দেখেননি। প্রশ্ন আরো আছে। ইসলামের মওদুদী ব্যাখ্যা কি বাংলাদেশের সবাই মানেন? আলেমরা তো অনেকে বলেছেন ওই ব্যাখ্যা ইসলামপন্থী নয়। ইনকিলাবও মওদুদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে খবরকে প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু, এখন দুপক্ষই এক। কারণ, তারা একটি ইস্যু নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে চায়। এভাবে ইনকিলাব, জামাত, ফতোয়াবাজ, মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা একত্রিত হয়েছে এবং বিষয়টিকে রাজনৈতিক করে তুলেছে।

এ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতিও। ইনকিলাব ও তার সমর্থকদের আক্রমণের লক্ষ্য তিনটি– প্রগতিশীল মানুষ বা পত্রপত্রিকা, যেমন আহমদ শরীফ, সুফিয়া কামাল বা দৈনিক জনকণ্ঠ। এনজিও যেমন ব্র্যাক। তাদের অর্থের পথে এরা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এনজিওরা (দান হিসেবে) কর রেয়াত হিসেবে ক্যাপিটাল গুডস পান। যেমন প্রেস। এ প্রেস দিয়ে যখন ব্যবসা করা হয় তখন অন্যান্য প্রেস প্রতিযোগিতায় হটে যেতে বাধ্য হয়। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এটি ঠিক নয়। ইনকিলাব বা অন্যান্য যাদের প্রেস আছে এবং মার খাচ্ছে তারা এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নয়। কারণ, অন্যদের ব্যাংক ঋণ নিয়ে প্রেস বা মুদ্রণ ব্যবসা করতে হয়। এছাড়া এনজিওর তৃণমূল পর্যায়ে নারীকে আধিপত্য মুক্ত হতে সাহায্যে করছে, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছে। এই সচেতনতা ও শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা মোটেই যুগোপযোগী নয়। এবং হিসাব নিলে দেখা যাবে একটি প্রাথমিক স্কুল একটি মাদ্রাসা চালানোর গড় খরচ বেশি। মাদ্রাসার ছাত্রও কমে যাচ্ছে। ধর্মান্ধ যুক্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করেন এটি তাদের পছন্দ হওয়ার কথা নয়। ফলে, ইনকিলাবের পক্ষে এদের ও এনজিওদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করা সহজ হয়েছে। তাদের ডাকা হরতাল উপলক্ষে সাপুড়েদের মিছিল বেশ চমক সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের ঘটনা প্রথম। গ্রামাঞ্চলে জরিবুটির চিকিৎসা করে যারা উপার্জন করছিল, এনজিওদের সেবামূলক কার্যক্রমের কারণে সেগুলো উঠে যাচ্ছে। জনকণ্ঠ এর বিরুদ্ধে বিপুল জনমত সৃষ্টি করেছে। ফরে, জরিবুটিঅলারা কেন মিছিল করেছে তা বোধগম্য। ইনকিলাব-জনকণ্ঠের দ্বন্দ্বের আরেকটি কারণ সার্কুলেশন। জনকণ্ঠ এখন সার্কুলেশনের দিক থেকে দ্বিতীয়। স্বাভাবিকভাবেই ইনকিলাবের তা পছন্দ নয়। আর জামাত এদের সঙ্গে মিলে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। কারণ প্রগতিশীল লোক, সংগঠন তাদের প্রধান শত্রু।

ইনকিলাব ও ধর্মব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ বিষয়টিকে রাজনৈতিক করে তাদের পক্ষে জনমত সংগঠন ও ক্ষমতা সংহত করছে। এভাবে তারা ক্ষমতার দিকে এগোতে চাচ্ছে। এবং এ উপলক্ষে আগামী ৩০ জুন হরতাল আহ্বান করা হয়েছে। গত দু'সপ্তাহ ধরে এ পরিপ্রেক্ষিতে মিটিং মিছিল চলছে।

অন্য কোনো সময় হরতাল ডাকা হবে খোদ প্রধানমন্ত্রী থেকে প্রতিমন্ত্রী সবাই হরতালকে বিনিয়োগবিরোধী বলে আখ্যা দিতে থাকেন। যেন একদিনের হরতালে অর্থনীতি বিনষ্ট হয়ে যাবে, হরতালের সঙ্গে বিনিয়োগের সম্পর্ক নেই। এখন প্রশ্ন ইনকিলাব ও অন্যদের হরতাল তাহলে বিনিয়োগবিরোধী নয়? বিনিয়োগবিরোধী হলে তো সরকার প্রতিক্রিয়া জানাত। চেম্বার অফ কমার্স প্রতিনিধিরাও এ বিষয়ে একই পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু এবার তারাও চুপ তাহলে চেম্বারের প্রতিনিধিরাও

মনে করেন যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কেউ হরতাল ডাকলে বিনিয়োগবিরোধী। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কেউ ডাকলে তা বিনিয়োগবিরোধী নয়। এদের উদ্দেশ্য করেই সম্প্রতি জাপানি বিনিয়োগকারীরা বলেছিলেন, নিজের দেশে যদি স্বদেশীরা বিনিয়োগ না করে তাহলে তারা কীভাবে আশা করবে যে, বিদেশীরা বিনিয়োগ করবে?

সরকারের নিশ্চুপ থাকার অনেক কারণ আছে। বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে। এখন ফতোয়াবাজরা যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু ও বিরোধীদের পার্লামেন্ট বর্জন ইস্যু থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নেয় তাহলে মন্দ কী? এটি কি বিশ্বাস্য যে বাংলাদেশে যে কেউ, যে কাউকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিতে পারে এবং সরকার চুপ থাকে? এটি কীভাবে সম্ভব হল যে মহিলা বিষয়ে ইউএনডিপি রিপোর্ট সম্পর্কে মহিলা মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য ও ফতোয়াবাজদের মন্তব্যে তেমন কোনো তফাৎ নেই? আরো লক্ষণীয়, ইনকিলাব সবচেয়ে বেশি সরকারি বিজ্ঞাপন পায়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য। মুজিব আমলে দাউদ হায়দারের দায়িত্বহীন এক কবিতার জন্য যখন ধর্মব্যবসায়ীরা সুযোগ পেয়েছিল এক হওয়ার, সরকার তখনই বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। ফলে ধর্মব্যবসায়ীরা একত্রিত হওয়ার সুযোগ আর পায়নি। বর্তমান সরকার তা করেনি এবং করবেও না। কারণ তারা চায় এ ধরনের ইস্যুগুলো জীবন্ত থাকুক। এতে তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো তাদের কিছুটা লাভ হচ্ছে কিন্তু তারাই এ আগুনে জ্বলবে। কারণ পরিস্থিতি ক্রমশ সংঘাতের দিকে যাচ্ছে এবং একবার সংঘাত শুরু হলে তা বিপদজনক হবে। শুধু তাই নয়, আমাদের মনে রাখা উচিত, মালয়েশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া, যেসব মুসলিম প্রধান দেশে উন্নতি হয়েছে, সেসব দেশে সরকার সব সময় ধর্মব্যবসায়ীদের দমন করেছেন। একটি বিষয় শুধু বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ কেন পিছু হটছে। আমরা তো তাঁকে নির্বাচিত করেছিলাম দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সচেতন ও সাধারণ মানুষের মনে তাই প্রশ্ন জেগেছে, এই যে এতদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফতোয়াবাজরা হরতাল ডেকেছে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ তা প্রতিরোধ করছে না কেন? রাজনৈতিক দলগুলো তেমন সরব নয় কেন?

১৯৪৮ সাল থেকে গত গণআন্দোলন পর্যন্ত যা দেখা গেছে তা হল–গণবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ সব সময় প্রথমে করে সংস্কৃতিকর্মী ও ছাত্ররা। তা তাদের সংখ্যা যত মুষ্টিমেয়ই হোক না কেন। কারণ তারা ক্ষমতাপ্রত্যাশী নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর লড়াই ক্ষমতার জন্য, সুতরাং তাদের অনেক অঙ্ক কষতে হয়। যদি তাতে ভোটের প্রশ্ন জড়িত থাকে তাহলে তো কথাই নেই।

প্রশ্নটি উঠেছে মূলত আওয়ামী লীগকে নিয়ে। বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক

সবচেয়ে বড় দল আওয়ামী লীগ। সিভিল সমাজ গঠনে যারা প্রধান ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। আর কেউ না আসুক, তারা কেন এ ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতিরোধ এগিয়ে আসছে না বা সৈয়দ শামসুল হকের ভাষায় দৃশ্যমান কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না? তারা কি কৌশলগত কারণে জামাত ও জাতীয় পার্টিকে হাতে রাখতে চায়? যদি চায়ই তাহলে বিএনপির আর দোষ কী? এক কথায় আওয়ামী লীগের ভূমিকা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এতে প্রগতিবাদীরা হতাশ বোধ করছেন, হতাশ বোধ করছেন আওয়ামী লীগ কর্মীরাও।

এসব প্রশ্নের উত্তর শেখ হাসিনাই দিতে পারবেন। শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছা আমার পক্ষে সহজ কাজ নয়। তবুও ভাগ্যক্রমে একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা এবং সাহস সঞ্চয় করে, নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে দু'একটি প্রশ্ন করতে পারি কিনা? সহাস্যে তিনি বললেন, অবশ্যই।

আমি বললাম, দেশের পরিস্থিতি আপনি অবগত আছেন। ধর্মব্যবসায়ীদের উত্থান কি আমাদের জন্য শুভ? শোনা যাচ্ছে আওয়ামী লীগ জামাত ও জাতীয় পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধেছে। এবং জামাতকে যেহেতু আওয়ামী লীগ চটাতে চায় না সেহেতু হরতালের বিরুদ্ধে কিছু বলছে না।

শেখ হাসিনা ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, সবসময় আপনারা আমার সমালোচনা করেন। হরতাল প্রতিরোধের জন্য যে সব কমিটি হয়েছে তাতে কি আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি নেই? (কথাটা অবশ্য ঠিক। ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন মায়া ঘোষণা করেছেন হরতালের দিন প্রতিরোধ করবেন এবং সবাই যাতে তাতে যোগ দেন। আমি তো কয়েকদিন আগেও বলেছি 'সময় এসেছে স্বাধীনতা সপক্ষের সকল শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। তা না হলে মুক্তিযুদ্ধ করাটাই অন্যায় হবে। গোলাম আযম সম্পর্কেও আমি নির্দিষ্ট বক্তব্য দিয়েছি। তাহলে আঁতাত করলাম কোথায়?

তিনি আরো ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'নির্বাচনের আগে বেগম জিয়া গোলাম আযমের সঙ্গে সিট ভাগাভাগি করে পার্লামেন্টে গেছেন, খবরের কাগজে এ বিষয়ে রিপোর্ট উঠেছিল। তখন তো আপনারা কিছু বলেননি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বলে তো তারাও দাবি করে।'

আমি বললাম, 'বিএনপিকে মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার পক্ষের শক্তি বলে মনে করলে তো আপনাকে আর এই প্রশ্ন করতাম না।'

তিনি বলেন, 'আপনাদের কী মনে হয়, জেনারেল জিয়া এদের পুনর্বাসন করেছেন, সংবিধান সংশোধন করে তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছেন। একই ধারা অনুসরণ করেছে বেগম জিয়া। ফলে, দেশ সংঘাতের দিকে এগুচ্ছে।'

'পার্লামেন্ট জামাত, জাতীয় পার্টির সদস্যরা তো ভোটে নির্বাচিত হয়েছে।

সংসদে কি জনপ্রতিনিধি হয়ে আমরা বসিনি? পার্লামেন্টে যদি জামাত না থাকত, জাতীয় পার্টি না থাকত তাহলে না হয় হতো। আমি বিরোধীদলীয় নেত্রী। পার্লামেন্টের প্র্যাকটিস তো আমাকে মানতে হবে। ফলে, এ কারণে কিছু আমাদের গলাধকরণ করতে হচ্ছে। পার্লামেন্টের প্র্যাকটিস অস্বীকার করতে পারছি না। কিন্তু আমাদের যে নীতি আদর্শ যে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি তাতে আমরা অটল। এ প্রশ্নে বা মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো আপোষ নেই। আমি কখনই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সমর্থন করি না এবং তা জাতির জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আনে না। জিয়া এটার গোড়াপত্তন করে স্বাধীনতাবিরোধীদের নিয়ে আসার ফলে এ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস এক জিনিস। রাজপথের রাজনীতি হচ্ছে বাস্তবতা। আমাদের নীতি আদর্শ পরিস্কার।'

অনেকে বলেছেন, জাতীয় পার্টি যাদের বিরুদ্ধে এত রক্তক্ষয় করলেন এখন তাদের সঙ্গে আবার দহরম মহরম চলছে?

'এ বিষয়টিতে আমি সবাইকে দৃষ্টি দিতে বলব' বললেন শেখ হাসিনা 'গত নির্বাচনে অনেক সিটে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টির কনটেস্ট হয়েছে, বিএনপির সঙ্গে জাতীয় পার্টির নয়। জাতীয় পার্টির অনেককে নমিনেশন দিয়ে বিএনপি তাদের পুনর্বাসিত করেছে। রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে। আমরা তা করিনি। তবুও বলবেন জাতীয় পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধেছি? জাতীয় পার্টির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক হওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি এবং আমরা তা করিনি। বরং বিএনপি যাদের সঙ্গে আমরা জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি তারাই আজ আমাদের ওপর হামলা করছে, নির্বাচনী জয় ছিনিয়ে নিচ্ছে। সন্ত্রাস দমন মামলায় হয়রানি করছে। বিএনপির হত্যা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আজ বাধ্য করেছে আমাদের আন্দোলনে যেতে। তাই কারো আদর্শের সঙ্গে আমাদের মিল না-থাকা সত্ত্বেও ভোটের অধিকার রক্ষা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য একত্রে বসতে বাধ্য হয়েছি। নিশ্চয় আরো লক্ষ্য করেছেন, বিএনপি তার বক্তব্য স্বৈরাচারকে যতটা না আক্রমণ করে আওয়ামী লীগকে করে তার চেয়ে বেশি। আগে তো আমরা বিএনপির সঙ্গেই ছিলাম। এখন বাধ্য হয়েছি অন্যদের সঙ্গে বসতে। এর জন্য বিএনপি দায়ী।'

'কিন্তু' বললাম আমি, 'আপনিও তো বিএনপিকে এখন যতটা আক্রমণ করছেন, স্বৈরাচারকে ততটা করছেন না।'

'কারণ' বললেন শেখ হাসিনা, স্বৈরাচারকে যে যে কারণে আক্রমণ করতাম বিএনপি এখন তাই করছে এবং কোনো কোনো বিষয়ে এরশাদকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নির্বাচিত কোনো সরকার যদি স্বৈরাচারী রূপ পরিগ্রহ করে তাহলে তা ভয়ঙ্কর হয়। গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে সত্যিকার চেষ্টা না করে যে বিকৃত মানসিকতা দেখাচ্ছে তাতে গণতন্ত্রের ওপরই অনেকের আস্থা চলে যাচ্ছে।'

হরতাল যে কেউ ডাকলেই হয়। এবারও হবে। ইনকিলাবে যতবার জনকণ্ঠ পোড়াবার কথা উদ্ধৃত হয়েছে, ইনকিলাবের বিরুদ্ধে কোথাও তা হয়নি। প্রগতিবাদীরা কারো ফাঁসিই চায়নি। কিন্তু যদি আমরা মনে করি– শুধু মাটি নয়, মানুষও এবং যে কারণে দেশের অন্য নাম মায়াবতী, তাহলে এই হরতাল প্রতিরোধের হরতাল হিসেবে পালন করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে চুপ করে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

যে একবার রাজাকার সে সবসময় রাজাকার

বেশ কিছুদিন আগে বায়তুল মোকাররমের সামনের রাস্তায় ভর দুপুরে, খররোদ মাথায় নিয়ে রিকশার দরদাম করছি। সঙ্গে এক মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু। রিকশা ভাড়া পোষাচ্ছে না। এমন সময়, চকচকে একটি গাড়ি এসে থামল সামনে। নামল একজন। পরনে সফেদ পাজামা পাঞ্জাবি। মুখে কলপ মাখা ছোট করে ছাটা কালো দাড়ি। তাকে দেখে দৌড়ে এল কয়েকজন মুর্গিঅলা। লোকটি জবেহ্ করে খাওয়ার জন্য হেলাভরে কয়েকটি মুর্গি তুলে নিল্

চর্বিতে আসল চেহারা ঢাকা পড়ে গেলেও মনে হল এ লোকটিকে যেন কোথায় দেখেছি। মনে করতে পারছি না। বন্ধুর দিকে তাকাই। শীর্ণ চেহারা, জ্বলজ্বলে চোখ, হাত মুষ্টিবদ্ধ। দাঁতে-দাঁত পেষার শব্দ পাচ্ছি।

'চিনিস নাকি'? জিজ্ঞাসা করি আমি।

'ওটি ' কথা শেষ হয় না। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বন্ধুটি বলল, 'মৌলানা মান্নান।'

ও তাইতো! আমার স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল 'দৈনিক বাংলা'য় স্বাধীনতার পর এ লোকটির ছবি ছাপিয়ে শিরোনাম দিয়েছিল– 'এই নরপিশাচকে ধরিয়ে দিন।' তখন এই লোকটির চেহারা এত তেলতেলে ছিল না। তবে, চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্যটি বদলায়নি– এখন যেভাবে জবেহ করার জন্য হেলাভরে তুলে নেয় আধ-ডজন মুরগি। কথিত আছে, ১৯৭১ সালে তেমনিভাবে হেলা ভরে সে তুলে নিয়ে যেত বা তুলে নিতে সাহায্য করত বাঙালিকে জবেহ করার জন্য। শহীদ ড. আলীম চৌধুরী এর উদাহরণ। মুরগি বা মানুষে তার কাছে তেমন পার্থক্য নেই, যদি তা সাহায্য করে নিজ চর্বির স্ফীতিতে। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশকে কী দিয়েছে তার ছবিও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল একজনের মুর্গিকেনা ও আরেকজনের ফুটপাতে কররোদে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যে। স্বাধীনতার পর-পর পাকবাহিনীর সহযোগি আব্দুল মান্না পালিয়েছিল। আলীম চৌধুরীর স্ত্রী শ্যামলী চৌধুরীর বইয়ে তার বর্ণনা আছে। শুধু সে নয়, তার সহযোগী আরও অনেকে তখন পালিয়েছিল। আজ তারা রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছেঃ মুক্তিযোদ্ধারা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দেখছে।

বর্তমান জামায়াত-নেতা মতিউর রহমান নিজামী মুক্তিযুদ্ধের সময় আলবদরদের প্রধান ছিল, কিন্তু আলবদরদের গণহত্যার প্রতীক হয়ে আছে

'মৌলানা' আবদুল মান্নান। এই ব্যক্তিটির নামের আগে মৌলানা শব্দটি ব্যবহার করা কি উচিত? মৌলানা শব্দটি তাজিমের সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। আর তাজিম তাদেরই করা যায় যারা তাজিমের যোগ্য। মৌলানা তারাই যাদের গভীর বুৎপত্তি আছে ইসলামি শাস্ত্রে, আর যারা মেনে চলেন ধর্মের অনুশাসন। ভন্ড, খুনি, ধর্ম ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতদের নামে আগে 'মৌলানা' শব্দটি ব্যবহারের অর্থ ধর্মকে অপমান করা। জামায়াত নেতা নিজামী নাকি কয়েকদিন আগে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, টুপি-দাঁড়ি দেখলে লোকে আজকাল প্রহার করতে আসে। এ কারণটা, নিজামীরা কি একেবারেই বোঝেন না? টুপি-দাঁড়ি রেখে যদি কেউ আলবদরের প্রধান হয়, খুন-ধর্ষণে সহায়তা করে, তাহলে লোকে প্রহার করবে নাতো কি আদর করবে? দোষ টুপি-দাঁড়ির নয়। সাধারণ মানুষের আক্রোশও টুপি-দাড়ির বিরুদ্ধে নয়। যারা টুপি-দাড়ির ইজ্জত রক্ষা করতে পারে না তাদেরই মানুষ ভালে চোখে দেখে না, তাদেরই মানুষ তাড়া করে।

যারা ভূষণ বদল করে পালায়, তাদের ভেসে থাকার ক্ষমতা অসীম। এর প্রমাণ, আবদুল মান্না। আইয়ুব আমলে মাদরাসাকে ভিত্তি করে মান্নানের রাজনৈতিক জীবনের শুরু। মাদরাসা বা ধর্মকে যথভাবে ব্যবহার করা যায় ততভাবে মান্নান তা করেছে। মাদরাসা শিক্ষকদের সংগঠন 'জমিয়াতুল মুদাররেসিনে'র কথা ধরা যাক। এই সংগঠনকে ব্যবহার করেছে মান্নান তার ওপরে-ওঠার সিঁড়ি হিসেবে। তার কাছে নিজের স্বার্থ ছাড়া আর সব কিছুই গৌণ। এমন একজন ব্যক্তির নেতৃত্ব কি মেনে চলা উচিত? আর যে ব্যক্তি সৎ নয়, ধার্মিক নয়, ধর্মের ব্যাখ্যা তার থেকে শোনা মানে তো ধর্মকে অবমাননা করা। অথচ 'মৌলানা' মান্নানের মতো লোক মাদরাসা শিক্ষকদের সংগঠনের নেতা হয়ে আছেন। এতে করে কি মাদরাসা শিক্ষকদের সম্পর্কেই মানুষের ধারণা খারাপ হয় না? গ্রামপর্যায়ে সৎ-বিবেকবান সব মানুষের এসব প্রশ্ন তোলা এখণ ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মান্নানকে রাজাকার থেকে মানুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন আমাদের সেই বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল জিয়াউর রহমান। একই সঙ্গে দুটি বিপরীতধর্মী কাজ করার যোগ্যতা তাঁর ছিল। সে-যোগ্যতার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন তাঁর শাসনামলে– যার মর্মান্তিক অভিঘাত আজ দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে।

মান্নানকে মানুষের মর্যাদা দেয়ার পর মান্নান আর ফিরে তাকায়নি। অর্থ সঞ্চয় করেছে। টাকার তো আর কলঙ্ক নেই! জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর মান্নান এরশাদ বন্দনা শুরু করলেন। তার আর কী দোষ? সে তো সরকার সমর্থক সবসময়। সরকার বদলালে তার কী করার আছে? এ সময়ই নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধির

জন্য আবদুল মান্নান প্রকাশ করলেন 'ইনকিলাব'

এক সময় 'ইনকিলাব' শব্দের একটা ভদ্র অর্থ ছিল বিপ্লব। এখন শব্দটির অর্থ বদলে গেছে। এখন 'ইনকিলাব' অর্থ আলবদরীয় বিপ্লব। 'ইনকিলাব'-কে শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করাতে সাহায্য করেছে এরশাদের সেনা সরকার। পত্রিকাটির পুঁজি নিয়ে নানা কথা তখন প্রকাশিত হয়েছিল পত্রপত্রিকায়। সরকার সে-ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়নি। এখনো তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, যে দুতিনটি পত্রিকা সবচেয়ে বেশি সরকারি বিজ্ঞাপন পায় তারমধ্যে অন্যতম 'ইনকিলাব'। কিন্তু বিজ্ঞাপন পায় না 'ভোরের কাগজ' 'আজকের কাগজ' বা 'সংবাদ'। সরকার কোন্ পক্ষের তা নিশ্চয় বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

'ইনকিলাব' কী ছাপে? পুরো পত্রিকাটিতে একটি 'ইসলামি লেবাস' থাকে। তাই মাদরাসা শিক্ষক থেকে ধর্মভীরু মধ্যবিত্ত অনেকেই পত্রিকাটি কেনেন। কিন্তু পত্রিকাটিতে অধিকাংশ সময় থাকে অতিরঞ্জন বা তথ্য বিভ্রাট ও চরিত্র হনন। এ থেকে ডা. বদরুদ্দোজা বা শেখ হাসিনা কেউ বাদ যান না। বাদ যান আনোয়ার জাহিদ বা গোলাম আযম। এ পর্যন্ত মিথ্যা খবর ছাপিয়ে 'ইনকিলাব' অসংখ্যবার ক্ষমা চেয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এ ধরনের পত্রিকা সাংবাদিক-পাঠকদের চাপে এতদিন পটল তুলত। কিন্তু বাংলাদেশে তা হয়নি। কারণ, এটি পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ, যেখানে তেল-ঘি'র মূল্য সমান, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তেলের মূল্য বেশি।

ইনকিলাব কী ধরনের তথ্য পরিবেশন করে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক-

১. বাবরি মসজিদ সৃষ্ট দাঙ্গার সময় তথ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, উসকানিমূলক কিছু ছাপলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু ৭ ডিসেম্বর ('৯২) থেকে 'ইনকিলাব' প্রায় প্রতিদিন প্ররোচণামূলক কিছু না কিছু ছেপেছে। যেমন ১২ ডিসেম্বর পত্রিকায় শিরোনাম 'পুলিশ মুসলমানদেরক ঘর থেকে টেনে এনে গুলি করে হত্যা করেছে' নিচে ছোট হরফে ইমাম বোখারী। তথ্যমন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিতে হয়তো এ শিরোনাম উসকানিমূলক নয়। কিন্তু সংখ্যালঘু দেশত্যাগের সংবাদ ছাপলে তা হয়ে যায় উসকানিমূলক।

২. সেই দাঙ্গার সময়, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে কিছু পাকিস্তানি ও বাঙালি ফেরত পাঠানো হয়েছিল উসকানি সৃষ্টির অপরাধে। বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক পত্রিকা এই খবর ছেপেছে, 'ইনকিলাব' নয়।

৩. পাকিস্তানি নাগরিক ফয়সল বেআইনি অস্ত্র আমদানি করতে গিয়ে ধরা পড়লে, অন্যসব পত্রিকা শিরোনাম করেছে ইনকিলাম করেনি। একবার কল্পনা করুন, যদি কোনো অন্যদেশের নাগরিক এ কাজটি করতেন তাহলে ইনকিলাম

কীনা-করত!

৪. গোলাম আযমের বিচার নিয়ে আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ইনকিলাবের প্রথম শিরোনাম 'ভারতের কালো থাবাকে আড়াল করার জন্য নতুন করে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা–ফারাক্কার ক্রুদ্ধ হিংস্র ছোবলের মুখে ঘাদানিকের রহস্যময় নীরবতা।' (২০ চৈত্র ১৩৯৯)। সংবাদে লেখা হয়েছে 'নতুন করে বাংলাদেশের দশজন বিশিষ্ট বক্তি ও সম্মানিত নাগরিকের বিরুদ্ধে তথাকথিত গণতদন্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে একদিকে ঘাদানিকের মুখোশ খসে পড়ছে। অন্যদিকে গণআদালতী প্রেতাত্মারা নারকীয় উল্লাসে নৃত্য শুরু করেছে।' একাত্তরের রাজাকারেরা ইনকিলাবের চোখে বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তি আর যারা জীবনবাজি রেখে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে তারা হল অন্য দেশের দালাল!

৫. 'রাজনৈতিক রঙ্গালয়' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে গোলাম আযমের মামলা চলাকালীন এটর্নি জেনারেলের বক্তব্যকে 'সংবেদনশীল' ও 'অত্যন্ত বিতর্কিত বলে উল্লেখ করেছে এবং সরকারকেও কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে। এর অর্থ বাংলাদেশ যে হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, আলবদর-রাজাকাররা যে খুন-ধর্ষণ করেছে এসব তথ্য 'সংবেদনশীল; ও 'বিতর্কমূলক'। বাংলাদেশ স্বাধীনতায় যারা বিশ্বাস করে না, একমাত্র তাদের পক্ষেই এসব কথা বলা সম্ভব্

৬. ১৩ এপ্রিল '৯৩ সালে 'শেখ মুজিব শতাব্দীর মহামানব : ওসমানী-জিয়ার নাম নেই' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– ১৪০০ সাল উদযাপন পরিষদ যে ১৩৮ জনের নাম ঘোষণা করেছে শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে, সে-তালিকায় 'অধিকাংশই হিন্দু মণিষী।' আমি গুনে দেখেছি সেখানে ৮৪ জন মুসলমান। সত্যকথা বলা তো ঈমানের অঙ্গ বলেই জানতাম।

৭. রাজশাহীর বুধপাড়ায় শিবিরের অস্ত্রাগার আটকের খবর সব পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়েছে। ইনকিলাব এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চুপ।

৮. সবশেষে ১৫ বৈশাখের পত্রিকার শিরোনাম 'আর্জিতে হুমকি প্রয়োগ সমীচিন নয়– বিচারপতি মোস্তফা কামাল; এটা এক ধরনের জবরদস্তি– বিচারপতি এটিএম আফজাল'– এ শিরোনাম দেখে সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে বিচারালয় সম্পর্কে (পরের দিন আদালত এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে) এবং হয়নি যে এ-কথা বলা যাবে না। কিন্তু'ইনকিলাব'-কে কেউ কিছু বলতে পারে নি।

এসব উদাহরণ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে– যে একবার রাজাকার সে সবসময় রাজাকার। বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকারে সে নারাজ এবং স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধের একটি মূলনীতি অসাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। এ কারণে মিথ্যাচার, ধর্মের ব্যবহারে তাদের আপত্তি নেই।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, এক কপি ইনকিলাব কেনা মানে চার টাকা

দিয়ে আলবদরীয় তত্ত্বকে সমর্থন এবং ইসলাম ও বাংলাদেশের শত্রুতা করা। আপনি যদি প্রকৃত ইসলাম ভালোবাসেন, বাংলাদেশ ভালোবাসেন তাহলে আলবদরীয় তত্ত্বের মুখপাত্রকে প্রতিহত করা আপনারই কর্তব্য। বিশিষ্ট সাংবাদিক আতাউস সামাদ লিখেছেন, বাংলাদেশে সবার ওপর মুক্তিযুদ্ধ। দেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষও তাই মনে করেন। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধ ও ইনকিলাবের সহঅবস্থান হতে পারে কি?

১৮ এপ্রিল, ১৯৯৩

জামায়াত, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং বিএনপি ও আওয়ামী লীগ

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মতিউর রহমান নিজামীর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে তিনি খানিকটা নার্ভাস বোধ করছেন। ১৯৭১ সালের আলবদরের নেতার এহেন নার্ভাস বোধের কারণটা কী? পাকিস্তানে জামায়াত একটি সিটও পায়নি বা সৌদিআরব মৌলবাদীদের অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিচ্ছে- এসব খবরই কি নার্ভাস হওয়ার কারণ? সরাসরিভাবে এসব খবর নার্ভাসের কারণ নয়। মূল কারণ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে এবং সংসদে জামায়াত বাদে সব এমপি এ বিষয়ে ইতিবাচক মত রেখেছেন, সমস্যাটা সেখানেই। জামায়াত কারো সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। অনেকটা পরগাছার মতো। পাকিস্তানে এতদিন সরকারি দল ও সেনাধ্যক্ষরা জামায়াতকে সমর্থন দিয়েছিল। নির্বাচনে তাই তারা দু-একটি আসন পেয়েছিল। সাম্প্রতিক নির্বাচনে কেউ সমর্থন দেয়নি সুতরাং তারা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এটিও তাদের নার্ভাসনেসের পরোক্ষ কারণ। ১৩ অক্টোবর এ পরিপ্রেক্ষিতে ভোরের কাগজ-এর প্রতিবেদকে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী মহাসচিব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান খান যা বলেছেন তা থেকে এ বিষয়ে কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, 'ওই নির্বাচন বাংলাদেশের জামায়াতের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। যদিও আমাদের নেতা-কর্মীরা কিছুটা আশাহত হয়েছেন। তাছাড়া এখানে পাকিস্তানি নির্বাচন সম্পর্কে ইনফরমেশন গ্যাপ ছিল। ইনফরমেশন গ্যাপের সঙ্গে আশাহতের ব্যাপারটা বোঝা গেল না।

গত দেড় দশকে বাংলাদেশে জামায়াতকে পুনর্বাসিত করেছেন জেনারেলরা, সাধারণ মানুষ নয় এবং সে কারণে এতদিন জামায়াত যা খুশি তা করতে পেরেছে। এখনো পারছে, কেননা সরকারি দল প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন জানাচ্ছে।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করলেই জামায়াত মুখ থুবড়ে পড়বে। বিএনপি এমপিদের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জামায়াতকে তাই নার্ভাস করে তুলেছে। সে কারণে ২২ অক্টেবর চট্টগ্রামে মতিউর রহমান নিজামী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন– 'ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি পরিহার করলে কারো সাথেই শিবিরের সংঘাত হবে না, এ গ্যারান্টি দিতে পারি।' এর অর্থ,

এতদিন যেসব সংঘাত হয়েছে তাতে শিবিরের ভূমিকা ছিল।

বাংলাদেশ জামায়াত বা নকল ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রবক্তাদের কথা মনে হলে কিছু দৃশ্য ভেসে ওঠে। এসব দৃশ্য মনোহার নয় মোটেই। তাদের কথা মনে হলেই ভেসে ওঠে, ছুরি হাতে একটি লোক ইতি-উতি শিকার খুঁজছে বা লোহার রড বা গজারির লাঠি হাতে অন্য ধর্মাবলম্বীয় উপাসনালয় ভাঙতে চলছে বা ফতোয়া দিয়ে কোনো নারীকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। এক্ষেত্রে একজন জামায়াতি. ফতোয়াদানকারী ইমাম আ 'ছাহাবা পরিষদ' একই কাতারের লোক এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতের সঙ্গে এদেরও এ কাতারে ফেলে দেখতে হবে। কারণ, ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবি জোর হয়ে উঠছে। এর বিরুদ্ধে জামায়াতের সঙ্গে এরাও জোট বাঁধবে। আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না বাবরি মসজিদ ভাঙার পরের দিন ঢাকা শহরে মন্দির ও হিন্দু মালিক দোকানগুলোতে হামলা করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল কিছু মাদরাসার ছাত্র। ঢাকায়ই নয়, সারাদশেই এবং সবখানেই হামলাকারীরা ছিল একটি রকম। বাংলাদেশে মাদরাসাগুলোতে কি এ ধরনের শিক্ষা দেয়া হয় যে, ছাত্ররা উপাসনালয় ভাঙবে রাজনৈতিক দলের অফিস জ্বালাবে?

আসলে আমাদের জোরালোভাবে বলা উচিত, বাংলাদেশের মুসলামানত্ব ও ইসলাম রক্ষার একচেটিয়া ইজারা জামায়াতে ইসলামী, এসব মাদরাসার ছাত্র ও কিছু সাম্প্রদায়িক এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দেয়া হয়নি। মুসলমান আমরাও এবং ধর্মকর্ম আমরাও জানি। ধর্মের নামে অধর্ম, হানাহানি, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা এবং বিকৃতায়ন শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক রাজাকারদের ক্ষমা ঘোষণার পর; সামরিক শাসনজাত কারণে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবাদী ও প্রগতিবিরোধী সংগঠনের পুনরুজ্জীবন এবং আমাদের ও বড় রাজনৈতিক দল ও নেতাদের দায়িত্বহীনতার কারণে।

মাদরাসায় যদি ধর্মের নামে এই শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে মাদরাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার করে সত্যিকারের ইসলাম শিক্ষার শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। যারা ইসলামকে মানবতার ধর্মের বিপরীতে হানাহানির ধর্ম হিসেবে তুলে ধরে, তারা ইসলামদ্রোহী মুরতাদ, যুক্তি-তর্ক দিয়ে বা বোঝা মুরতাদী নয়।

ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি বেশ কিছুদিন ধরে জানিয়ে আসলে নির্মূল কমিটি, আওয়ামী লীগ এবং এখন বিএনপির সব এমপি। এর পক্ষে জনমতও গড়ে উঠেছে। এ দাবি যত জোরদার হয়ে উঠবে সাম্প্রদায়িক শক্তির তত মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করবে এবং করছেও। যেমন, গত এক বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিবিরের হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে, আহমদীয়াদের দুটি মসজিদ পোড়ানো হয়েছে, পবিত্র কোরআন পোড়ানো হচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

মধ্যে দাঙ্গা বাধাবার উসকানি দেয়া হয়েছে। কয়েকদিন আগে, ছাহাবা পরিষদ তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে সমাবেশের ডাক দিয়েছে। আহমদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি করা হচ্ছে। দৈনিক ইনকিলাব-এ দাবি করা হয়েছে। মসজিদে ডিশ অ্যান্টেনা বসিয়ে ধর্মবিরোধী কাজকর্ম চালানো হচ্ছে। আহমদীয়ারা বলছেন, ডিশ অ্যান্টেনার মাধ্যমে তারা লন্ডন থেকে তাদের নেতার খুতবা শোনেন মাত্র। প্রশ্ন হচ্ছে– যারা অনবরত ইসলামের কথা বলে, ইসলামের ধ্বজাধারী মনে করে, তারা কেন আরবীতে উটের দৌড়ে বাঙালি দুধের বাচ্চাকে ব্যবহারের কারণে বা পাকিস্তানের পতিতালয়ে বাঙালি নারী পাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে না। মানুষ আশরাফুল মখলুকাত। উপাসনালয়ের চেয়েও বড়। কোরআন পুড়িয়ে বা রগকেটে কীভাবে তারা ইসলামের কথা বলে? প্রশ্ন আরো আছে, আরব, আফ্রিকা, এশিয়ার অন্যান্য মুসলমানপ্রধান দেশে বাবরি মসজিদ ভাঙার কারণে অন্য ধর্মাবলম্বীর উপাসনালয় ভাঙা হয়নি বা মানুষের ওপর হামলা হয়নি। কারণ, সেখানে সরকার এসব ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ প্রশ্রয় দেয়নি। শুধু তাই নয়, ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী শক্তিকে কেন অন্যান্য মুসলামান দেশে এখন দমন করা হচ্ছে? কারণ, ধর্মান্ধতা মানুষকে পিছিয়ে দেয়। বাঙালি মুসলমানদের এ কথাগুলো ভেবে দেখা উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আরো একটি কথা বলা যায়। বাংলাদেশে, বাংলা ভাষায় কোরআনের এখন পর্যন্ত ভালো একটি সঠিক অনুবাদ বের হয়নি। যারা প্রকৃত ইসলামকে ভালোবাসেন তাঁদের এ কাজে এগিয়ে আসা উচিত। শিশু-কিশোরদের জন্যও প্রাঞ্জল ভাষায় কোরআনের একটি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহলে সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারবেন প্রকৃত ইসলাম ও জামায়াতের ইসলামের মধ্যে তফাৎ কী। ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য এটিও হতে পারে একটি কৌশল।

ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হলেই ইসলামত্ব রক্ষা পায় না, সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র কল্যাণ বয়ে আনে না। নেপালের কথা বিবেচনা করুন। পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র। গত ৩০ বছর চলেছে সেখানে স্বৈরশাসন। ৮০ ভাগ মানুষ সেখানে বাস করে দারিদ্র সীমার নিচে। পশ্চিম এশিয়া তো ৮৫ ভাগ মুসলমান। কিন্তু সেখানকার শাসকদের স্বৈরশাসন, বিলাশ অবিচারের কথা কি কারও অজানা? শুধু তাই নয়, মৌলবাদ এক সময়ে চরম সাম্প্রদায়িকতার রূপ নেয় এবং তা পথ করে দেয় ফ্যাসিবাদের।

নিজামী বলেছেন সেই সাংবাদিক সম্মেলনে, 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলেও ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারবে না..... । এজন্যই তারা বিএনপির কাঁধে ভর করে এ আইন করতে চাচ্ছেন। ধর্মপ্রাণ মানুষের এই দেশে তা খুবই কঠিন।' শুধু তাই নয়, দেশের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসের জন্য বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে তিনি যৌথভাবে দায়ী করেন।

তাঁর এই উক্তি বিশ্লেষণ করা যাক। আওয়ামী লীগকে সন্ত্রাসী বলার কারণ

আছে। কারণ তারা জামায়াতবিরোধী। কিন্তু তাদের দোস্ত বিএনপি? হয় নিজামী মরিয়া হয়ে এখন হুমকি দিচ্ছেন বিএনপিকে, নয়তো বিএনপির ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে তিনি বিএনপির সন্ত্রাসী কার্যকলাপের গোপন কথা জানেন। প্রিয় দোস্তদের এ ধরনের অভিযোগ বিএনপি'র জন্য সুনাম হানিকর। এখন বিএনপিকে হয় জামায়াতের এই হুমকি মেনে নিতে হবে, নয় এ অপমানের উত্তর দিতে হবে। এর জবাব বিএনপি কীভাবে দেয় আমরা তা দেখতে চাই।

নিজামী বলেছেন, ধর্মপ্রাণ মানুষ এই নিষিদ্ধকরণ দাবি মেনে নেবে না। জামায়াত যদি মানুষের কাছাকাছিই হত বা জামায়াতের ইসলাম যদি মানুষের পছন্দসই হত তাহলে বিএনপি-আওয়ামী লীগ নয়, জামায়াতই হচ্ছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। শুধু তাই নয়, পৌরসভা নির্বাচনে কমপক্ষে একটি আসন হলেও তারা পেত। নিজামী আরো বলেছেন, আওয়ামী লীগ ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারবে না। তার থেকে এক পা এগিয়ে কামারুজ্জামান বলেছেন, 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি কোনো বাপের বেটা নিষিদ্ধ করতে পারবে না। বিএনপি-আওয়ামী লীগও বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার মুখে নিয়ে নির্বাচনে জিতেছে।'

বিসমিল্লাহ্ মুখে নেয়ার সঙ্গে নিষিদ্ধকরণের কী সম্পর্ক? জামায়াতও তো বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার মুখে নিয়ে নির্বাচন করেছিল। তাহলে তারা জেতেনি কেন? তাছাড়া তারা বোধহয় ভুলে গেছেন যে, ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগই ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিল। তবুও আমরা মনে করি, নিজামীদের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া উচিত যে, ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগ ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের বিল সংসদে পেশ করবে। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের বক্তব্যের জন্য আমরা অপেক্ষা করব।

সবশেষে, আমরা শুধু একটি কথা বলতে চাই, এ ধরনের শক্তিসমূহের সঙ্গে যে কোনো ধরনের আপস আমাদের জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে পারে।

২ নভেম্বর, ১৯৯৩

বড় আল বদরদের কী হবে?

'আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত-পা বাঁধা।..."

"আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির টিবিটা তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। মুখ ও নাকের কোনো আকৃতি নেই। কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটা অংশ কাটা। ....মেয়েটি সেলিনা পারভীন। শিলালিপির এডিটর।....'

"মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি জলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির টিবির মধ্যে মৃত কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোক যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।"

রায়েরবাজারের বধ্যভূমি দেখে এসে এই প্রতিবেদন লিখেছিলেন অধ্যাপিকা হামিদা রহমান। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী এক বছর খবরের কাগজের পাতা ওল্টালে এ ধরনের প্রচুর বধ্যভূমির খবর জানা যাবে। ঢাকার রায়েরবাজার বধ্যভূমি যেখানে আমাদের বরণীয় বুদ্ধিজীবীদের পাশে পাওয়া গিয়েছিল তা এই সমস্ত বধ্যভূমির প্রতীক। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মূলত জড়িত ছিল স্বাধীনতাবিরোধীরা, যাদের প্রধান অংশ ছিল জামাতে ইসলামী কর্মীরা। এদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল রাজাকার বাহিনীর, ডেথ-স্কোয়াড নামে খ্যাত আলবদর বাহিনী ও আল শামস বাহিনী। আলবদরদের হাতে নিহত হয়েছিলেন এ দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা। মাত্র পঁচিশ বছর। কিন্তু বাংলাদেশ এসব ঘটনা মনে রাখেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ পঞ্চাশ বছর। গত এক মাস ধরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নানাভাবে স্মরণ করা হচ্ছে নাৎসীদের কর্মকাণ্ড ও বিজয়ী যোদ্ধাদের। এ কথাই ঐসব স্মরণসভায় বারবার মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে, ইউরোপ কেন, বিশ্বের যেন ঐ নাজিবাদ আবার প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যেসব চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে সেগুলোতে নাৎসি সহযোগীদের প্রতি সাধারণ মানুষের আচরণও দেখানো হচ্ছে। সেসব পুরোনো কথা। এখনো বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের খুঁজে বের করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। মানবতার প্রতি ঘৃণ্য অপরাধ যেন আর সংঘটিত না হয় তারই

পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৭ সালের জেনেভা চুক্তি করা হয়েছে এবং ইউরোপে যে কোনো যুদ্ধাপরাধীকে পাওয়া গেলে সে আইনের আওতায় তার বিচার হচ্ছে। আর এ পটভূমিকায়ই বাংলাদেশের তিনজন যুদ্ধাপরাধীকে সম্প্রতি শনাক্ত করা হয়েছে।

ব্রিটিশ রিপোর্টার ডেভিড বার্গম্যান বাংলাদেশে ছিলেন বেশ কিছুদিন। উদ্দেশ্য, ব্রিটেনে বসবাসরত বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের শনাক্ত করে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা। তাঁর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ব্রিটেনের টেলিভিশন সংস্থা 'টুয়েন্টি টুয়েন্টি' ডেসপ্যাচেস' সিরিজে বাংলাদেশের তিনজন যুদ্ধাপরাধীকে নিয়ে ৫০ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছে। হাওয়ার্ড ব্রাডবার্ন এর পরিচালক। কয়েকদিন আগে ইংল্যান্ডের চ্যানেল ফোরে এই তথ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হলে ব্যাপক আগ্রহ ও আলোচনার সৃষ্টি হয়।

তথ্যচিত্রটির মূল প্রতিপাদ্য ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যার সঙ্গে জড়িত তিন ব্যক্তি– চৌধুরী মঈনুদ্দীন, লুৎফর রহমান ও আবু সাঈদ এখন লন্ডন ও বার্মিংহামে বসবাস করছে। ইংল্যান্ডের বাঙালি সমাজে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে মৌলবাদী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে নানা উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। সুতরাং ১৯৫৭ সালের জেনেভা চুক্তি অনুসারে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ব্রিটেনে তাদের বিচার হওয়া উচিত।

ডেসপ্যাচের প্রথমেই দেখা যায়, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে রায়েরবাজার বধ্যভূমির সামনে দাঁড়িয়ে তখনকার তরুণ সাংবাদিক এনায়েতউল্লাহ খান ক্রুদ্ধস্বরে প্রতিশোধ কামনা করছেন। আরো পরে দেখা যায়, প্রবীণ এনায়েতউল্লাহ খান রায়েরবাজারের স্মৃতিচারণ করছেন। এর মাঝে চব্বিশটি বছর পার হয়ে গেছে। জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালে যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতাবিরোধীদের নিয়ে সমন্বয়ের রাজনীতি শুরু করলেন। আরো অনেকের মতো ক্রুদ্ধ এনায়েতউল্লাহ খানও ক্রোধ ভুলে সমন্বয়ের রাজনীতিতে যোগ দিলেন। এভাবে পিঠে ছুরি মেরে অনেকে আমাদের ক্রোধ দমনে বাধ্য করেছিলেন। ক্রোধ দমন করা যায়। কিন্তু বেদনা? অপমান?

আগামী ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের ২৫ বছর পূর্ণ হবে। এবং আমরা দেখব, ১৯৭১ সালে আমরা যেসব স্বপ্ন দেখেছিলাম তার অধিকাংশই পূরণ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা অনেক কথা বলি। কিন্তু খুব কম সময়ই ব্যয় করি তাদের জন্য, যারা আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।

প্রত্যেক জাতির জাতীয় বীর থাকে। আমাদের নেই। থাকলেও স্বীকার করি না। পৃথিবীর সব দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর প্রথম যে কাজটি করা হয় তা হল জাতীয় বীরদের প্রতি স্মৃতিতর্পণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ একমাত্র ব্যতিক্রম। এখানে যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতাবিরোধীদের সম্মানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতি করা

হয়, এ জাতি তা মেনে নিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে স্বাধীনতা জাদুঘর হয়নি, কিন্তু সামরিক জাদুঘর হয়েছে।

এ সমস্ত কর্মকাণ্ড হয়েছে আমাদের বা মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের নেতৃত্বেই। এর ফলে কায়েম হয়েছে প্রগতিবিরোধী শাসন। মৌলবাদের থাবা ক্রমেই বিস্তৃত হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই আমরা নিশ্চুপ থেকেছি। কারণ, আমাদের অনেকে এর বিনিময়ে ইউনিফর্মধারী ও ইউনিফর্মহীন বা ইউনিফর্ম প্রভাবিত শাসকের কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছি। তবে এ কথা বলা ভুল হবে যে, নিরস্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ এতে অপমানিত বোধ করেনি, বেদনাবোধ করেনি। অপমান ও বেদনাবোধের কারণ, যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, গণহত্যা ও গণধর্ষণ করেছে তাদেরকেই সম্মানের সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাহলে ১৯৭১ সালে লড়াইটা হয়েছিল কার বিরুদ্ধে এবং কেন?

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন জাহানারা ইমাম। সরকারের অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই এর বিরুদ্ধে। ১৯৭১ সালে যারা পরাজিত হয়েছিল তারা, তাদের এজেন্ট ও ভাবশিষ্যরা ১৯৭৫ সালের পর থেকে চাইছে বিভিন্নভাবে ১৯৭১ সালের পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে এবং এ কাজে তারা সফলও হচ্ছে।

গত ২৫ বছরে স্বাধীনতাবিরোধীরা যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্য কোনো দেশে তা সম্ভব হয়নি। অনেক কিছু আমরা ভুলে গেছি। কৃতঘ্ন জাতি হিসেবে ইতোমধ্যে আমরা পরিচিত হয়েছি। 'ডেসপ্যাচ' দেখে মনে হল এবার লজ্জাহীন জাতি হিসেবেও আমরা পরিচিত হবো। গত ২৫ বছরে একজন যুদ্ধাপরাধীর কেশমাত্র আমরা স্পর্শ করতে পারিনি। অথচ, অন্য দেশে আমাদের দেশের যুদ্ধাপরাধীদের শনাক্ত করে বিচারের আয়োজন চলছে। ইতোমধ্যে ব্রিটেনের অগ্রগণ্য রাজনীতিবিদরা এই তিনজনের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি তুলেছেন। এটর্নি জেনারেল স্যার লয়েলের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে।

'ডেসপ্যাচ' থেকে যে বিষয়টি আমাদের এবং নির্মূল ও সমন্বয় কমিটির শিক্ষণীয় তা হল অভিযোগ উত্থাপনের পদ্ধতি। ডেভিড ব্রিটেনে বসবাসরত যে তিনজনকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে শনাক্ত করেছেন– তাদের মধ্যে একজন ছিল ঢাকায় আল বদরের অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দীন। অপর দুজন সিলেটের লুৎফর রহমান ও আবু সাঈদ। তিনি এদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণাদি যোগাড় করে এমনভাবে মামলা দাঁড় করিয়েছেন যে, এদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বর্তমান যা অবস্থা তাতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না। কিন্তু শহীদ পরিবাররা বিচার চায়। ব্রিটেনে যুদ্ধাপরাধীদের স্থান নেই। ঐ তিনজন যুদ্ধাপরাধী এসব অভিযোগ

অস্বীকার করেছে। মঈনুদ্দীন বলেছে, 'আমি কখনো আল-বদর ছিলাম না। গণহত্যার সঙ্গেও জড়িত নই।' প্রশ্ন জাগে, যদি তা নাই হয় তাহলে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের পর পর কেন দেশ ত্যাগ করেছিল? এবং ডেসপ্যাচ প্রদর্শিত হওয়ার পর কেনই বা গা ঢাকা দিয়েছে?

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, ডেপুটি স্পিকার ছিলেন স্বাধীনতাবিরোধী। পার্লামেন্টে জামাতের সদস্যের সংখ্যা ২০। এবং যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম এখন মুক্ত নাগরিক। শুধু তাই নয়, লন্ডনের একটি পত্রিকায় খবর এসেছে চৌধুরী মঈনুদ্দীনকে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্বও দেওয়া হয়েছে। আল বদরের হাইকমান্ডের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তারা এখন স্বচ্ছন্দে রাজনীতি করছে। এদের মধ্যে আছে মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসেম আলী, মোহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, আশরাফ হোসাইন, মোহাম্মদ শামসুল হক, আ.শ.ম রুহুল কুদ্দুস, সরদার আবদুস সালাম, আবদুল জাহের, মোহাম্মদ আবু নাসের প্রমুখ।

লন্ডনে যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে এদের তুলনায় তারা তুচ্ছ। ছোট আল বদরদের বিচার হয়তো শুরু হবে। কিন্তু ঢাকার এই বড় আল বদরদের কী হবে?

প্রজন্ম '৭১-এর ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা লন্ডনে ডেসপ্যাচের প্রদর্শনী উপলক্ষে বলেছেন, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যেন এ কারণে ইতস্তত বোধ না করে।...গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নামে জামাত বাংলাদেশে শক্তিশালী সংগঠন হয়ে উঠছে এবং এ দলের অনেক সদস্যই যুদ্ধাপরাধী হিসেবে পরিচিত। দুঃখের বিষয় ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন এদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায়। গণতন্ত্রের নামে এ ধরনের আচরণ এ ব্যবস্থার প্রতিই হুমকি হয়ে উঠবে।' এখানে উল্লেখ্য, মার্কিন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'স্পেশাল ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামের' আওতায় কোলাবরেটর হিসেবে খ্যাত অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান ও দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল আসাদকে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। অথচ, মানবাধিকারের এখন একজন প্রধান প্রবক্তা যুক্তরাষ্ট্র।

অনেকে বলেন, এত বছর পর আজ এসব প্রশ্ন কেন? যারা এ কথা বলেন, ধরে নিতে হবে তারা স্বজনহারা হননি, বাংলাদেশের অগণিত শহীদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ নেই এবং তারা পরোক্ষভাবে যুদ্ধাপরাধী ও বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে যে উগ্র মৌলবাদী 'আন্দোলন' চলছে তার সমর্থক। যুদ্ধাপরাধী তো বটেই, এদের প্রতিরোধও বাঞ্ছনীয়। এক ব্রিটিশ মন্ত্রী বলেছেন, যে জাতি তার অতীত ভুলে যায় তার কোনো ভবিষ্যত নেই, কারণ সে তার আত্মপরিচয় হারায়। ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা সুন্দর একটি কথা বলেছেন, বাংলাদেশের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি হবে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি উপায়।

আমরা মনে করি বাংলাদেশে, সমাজে রাষ্ট্রে শান্তি স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। শুধু তাই নয়, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে হলে, মৌলবাদীদের অন্ধকার যুগ ফিরিয়ে আনার এ চেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি। সারা বিশ্বে আবার মানবতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আহ্বান হবে, বাংলাদেশে বড় আল-বদরদের বিচারের দাবি তোলা। রাজনৈতিক দল যদি আমাদের সমর্থন না দেয় নিরস্ত্র আমরা কিছু করতে না পারি, ঐসব অপরাধী ও তাদের সঙ্গে যারা রাজনীতি করছে বা সহায়তা করছে অন্তত তাদের পথে থুতু তো ফেলতে পারি।

৯ মে, ১৯৯৬

সাঈদী বচন ও এক বিধবার আর্তি

ইসলামী ছাত্রশিবির গত ৩ অক্টোবর পল্টন ময়দানে সীরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিলের আয়োজন করেছিল। এর আগে একবার তা বাতিল করা হয়েছিল। হয়তো উদ্যোক্তারা ভেবেছিল ঢাকা শহরের কেন্দ্রে তাও আবার পল্টনে এ ধরনের মাহফিল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারে। কারণ, সেখানে বক্তৃতা করবে জামাত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী।

উল্লেখ্য, নবপর্যায়ে আওয়ামী লীগের জনসভার পর এবার সাঈদীর জনসভা বা মাহফিল হল পল্টনে। আরো উল্লেখ্য, পল্টনের সভাটিতে আওয়ামী লীগের নেতারা অগ্নিঝরা কণ্ঠে ১৯৬৬, '৬৯, '৭১-এর কথা শুনিয়েছেন। এরপর হল সাঈদীর। ১৯৬৯-৭০ (সালটা ঠিক মনে নেই) এই পল্টনে আওয়ামী লীগের সভার পর জামাত, মুসলিম লীগ সভা করতে চেয়েছিল। পারেনি। অবশ্য, তখন কেউ ভাবেনি, ইত্তেফাকের পাশে শহীদ পরিবারের জমি কিনে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের ঘাতক বলে অভিযুক্ত ব্যক্তি পত্রিকা প্রকাশ করবে। সাঈদীর ঘটনাটাও সে রকম।

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর নামের আগে সংবাদপত্রে 'মাওলানা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কী কারণে? যারা শব্দটি ব্যবহার করেছেন সাঈদী কি তাদের ইমাম? 'মাওলানার' অর্থ কী? যত্রতত্র অপাত্রে এ সম্মানিত শব্দটি ব্যবহার করা উচিত নয়। সাঈদী কোন বিদ্যায়তন থেকে সার্টিফিকেট পেয়েছেন যে, এ শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে তার নামের আগে?

সাঈদী যা বলেছেন তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। জামাত বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়– এ কথা আমরা বললে অনেকে এর বিরোধিতা করে বলতেন, কথাটি ঠিক নয়। সাঈদীর বক্তব্য প্রমাণ করেছে আমাদের বক্তব্যই ঠিক। তিনি তার মহফিলে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যয়, ২১ ফেব্রুয়ারি নাকচ করে দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন "মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষের কথা বলছে মুরতাদরা"। জামাত বা সাঈদীর মতো ব্যক্তি কেন এ কথা বলবে না? সরকারে যারা আছেন এবং আগে যারা ছিলেন, সবাই তাৎক্ষণিক কিন্তু লাভের আশায় জামাতের প্রতি নমিত আচরণ করেছেন। তাদের ধারণা এই রাজনৈতিক কৌশল। জামাতের ভোটের সংখ্যা কত? জামাতের জনপ্রিয়তা বা ভোটের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাসের পিছনে রাজনৈতিক কৌশলের তেমন অবদান নেই। যেমনটি আছে নির্মূল কমিটি, জাহানারা ইমাম বা কিছু লেখক/সাংবাদিকদের, যারা গত এক দশক ধরে এদের মুখোশ উন্মোচন করে বলছেন বা নতুন প্রজন্মের কাছে এদের কীর্তিকলাপ তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক দল এ সত্য স্বীকারে কুণ্ঠাবোধ করতে পারে

কিন্তু তাই সত্য। সুতরাং রাজনৈতিক প্রশ্রয়ের কারণে, আজ সাঈদী পল্টনের মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কটুক্তি করতে পারেন। খতিব মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে প্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের 'গাদ্দার' বলতে পারেন। এবং তার এ ধরনের বক্তব্য এখনো অব্যাহত। মিলাদুন্নবীর সভায় প্রেসিডেন্টকে ইসলামী ঐক্যজোটের কর্মীরা (অভিযোগ করা হয়েছে খতিবের প্ররোচনায়) জুতা ছুঁড়ে মারে। প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্য সভায় তারা 'কুলাঙ্গার' বলে, যা বিএনপিও বলেনি। উল্লেখ্য, মফস্বলে সাঈদী বা গোলাম আযম প্রায়ই মহফিল বা সভা করতে বাধাপ্রাপ্ত হন বা উল্লেখিত ঘটনাগুলি কম ঘটে। ঢাকার হয় যেখানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিস। এমনও হতে পারে এসব বিষয় বা বক্তব্যের প্রতি নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি একরকম, কর্মীদের অন্যরকম।

সাঈদী বলেছেন, "দেশে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হিসেবে মূর্তি নির্মাণ বরদাশত করা হবে না। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআনের পাশাপাশি গীতা-বাইবেল পাঠ করা চলবে না। একদল মুরতাদ ও নাস্তিক টিভিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষের কথা বলে জাতিকে বিভক্ত করছে। না এসব বক্তব্যে বিচলিত নই, এগুলি তাদের গৎবাধা বক্তব্য। আমরা বিচলিত তার অন্যান্য বক্তব্যে যা দেশের প্রগতিবাদ, মননশীলতা, মূল্যবোধ সম্পর্কে মানুষকে নতুন করে ভাবাবে। সাঈদী আরো বলেছেন–

১. "গত বছরের ১২ জুন নির্বাচনের সময় অনেক মুক্তিযোদ্ধা আমার জন্য কাজ করেছে।" (*জনকণ্ঠ* ৪.১০.৯৭)

পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধারা বলুন এটি কি সত্য? মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান আহাদ চৌধুরী কী বলেন? যদি সত্যি হয় তাহলে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? আর যদি সত্য না হয় তাহলে তারা কী ভূমিকা নেবেন? না কি আ লীগ এ সবে নীরবতা পালন করে দেখে তারাও নীরবে থাকবেন? যদি অবিলম্বে এ বিষয়ে তারা কোনো বক্তব্য না দেন তাহলে ধরে নিতে হবে আমাদের শেষোক্ত উপসংহারই সঠিক।

২. নির্বাচনের সময় "এমনকি স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাও আমার মঞ্চে উঠেছেন।" (ঐ)

আ.লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে অবশ্যই এ বিষয়ে আমরা বিশদ জানতে চাই। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের দল হিসেবে আমরা অনেকে গত নির্বাচনে আ. লীগকে সমর্থন করেছি। যদি এ বিষয়ে তারা নিশ্চুপ থাকেন তাহলে বুঝতে হবে বিষয়টি সত্যি এবং স্থানীয় আ.লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে তারা কোনো ব্যবস্থা নেননি এবং তা যদি সত্য হয় তাহলে অবশ্যই এ ব্যর্থতা নিন্দনীয়।

৩. 'সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের বাবার হত্যার সঙ্গেও নাকি আমি জড়িত।... আর হুমায়ুন আহমেদ আমার সন্তানের বিয়েতে উপহার পাঠিয়েছেন।... {ঐ}

এটি পড়ার পর জনাব আহমেদকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছি, পাইনি। এম

আর আখতার মুকুল কয়েকদিন আগে এই জনকণ্ঠের জনাব আহমেদকে জাসাসের প্রাক্তন সহ-সভাপতি হিসেবে কটাক্ষ করেছেন। আমি মনে করি এতে কটাক্ষের কিছু নেই। সবাইকে আ.লীগ সমর্থন করতে হবে এমন কোনো মানে নেই। কিন্তু তাই বলে জামাত? এবং সাঈদী? হুমায়ুন আহমেদ এ দেশের জনপ্রিয় লেখক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস লিখেছেন, চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন প্রকাশ্যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বলেন, তিনি সাঈদীর সন্তানের বিয়েতে উপহার পাঠাবেন তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তিনি এমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারেন- এ কথা ভেবেই বেদনা হয়। শুধু আমি নই, বাংলাদেশের অগণিত হুমায়ুনভক্ত একই প্রশ্ন করবেন 'একি সত্যি?' আমি মনে করি এটি সত্য নয় এবং তাই জনাব আহমেদকে অনুরোধ জানাব এর প্রতিবাদ করে আদালতে মামলা দায়ের করতে। যদি তিনি তা না করেন তাহলে ধরে নিতে হবে সাঈদীর বক্তব্য সত্য। এবং তখন এই নন্দিত লেখক অবশ্যই নিন্দিত হবেন এবং অনেক ভক্ত-পাঠক হারাবেন, বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য।

৪. 'ঘাদানিকের লোকেরা আমার এলাকায় গিয়ে বলেছে যে, আমি নাকি মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৩ জন হিন্দুকে হত্যা করেছি।... আমি এত মানুষ মেরে থাকলে পিরোজপুর থানায় আমার নামে কোনো মামলা হল না কেন।" (ঐ)

মামলা কেন হয়নি? কারণ, এতদিন যে সব সরকার ছিল সেসব সরকার মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের প্রতি অসম্ভব মমতাবান ছিল। যে কারণে, ১৯৭৫ সালের বঙ্গবন্ধু ও চার নেতা হত্যা বা বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলা হয় নি এবং যে কারণে এখন হচ্ছে।

নির্মূল কমিটির একজন প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা শাহরিয়ার কবির গত বেশ কিছুদিন ধরে মুক্তিযোদ্ধাদের ও শহীদ পরিবারের তথ্যচিত্র তুলছেন। এরকম একটি চিত্রের খানিকটা আমি দেখেছি। সেখানে এক প্রৌঢ় মহিলা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জানিয়েছেন– তার স্বামীকে হত্যা করেছেন সাঈদী এবং এতদিন বিচার চেয়েও বিচার পাননি। কারণ, সাঈদীর সঙ্গে এখন যোগাযোগ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের। সাঈদীর বক্তব্যেও তাই প্রমাণিত। তার সঙ্গে বিএনপি-জামাত তো বটে, আ. লীগ, হুমায়ুন আহমেদের মতো সাহিত্যিকেরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের আর কী করার থাকতে পারে। এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে হত্যাকারী হিসেবে সাঈদীকে অভিযুক্তকারী সে মহিলার ক্রুদ্ধকণ্ঠ। এ ধরনের পরিস্থিতি দেখে সেই গ্রাম্য অজ্ঞ প্রৌঢ় মহিলা বলেছেন– "এ দেশে থাকতে ঘেন্না হয়, ঘেন্না হয়। কিন্তু উপায় নেই তাই থাকি।" আমরাও কি তাই বলব?

৬ অক্টোবর, ১৯৯৭

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলে কি সম্পূর্ণ হবে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়?

২৭ বছর আগে ১৬ ডিসেম্বর আমরা সমস্ত শোক ভুলে রাস্তায় নেমে এসেছিলাম, মুখে হাসি নিয়ে স্বাধীনতা বরণ করতে। কারণ এ স্বাধীনতার জন্য কবি শামসুর রাহমানের ভাষায়– 'সকিনা বিবির কপাল ভাঙলো সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর' আর 'ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।' তখনও দগদগ করে জ্বলছে বুক, রক্তক্ষরণ হচ্ছে অনবরত। কারও স্বামী বেয়নেট বিদ্ধ, সন্তান নিখোঁজ, বোন ধর্ষিত। প্রতিশোধে যে চোখ জ্বলে ওঠেনি, হাত নিশপিশ করেনি তা নয়। সেটিই স্বাভাবিক। তবে প্রায় ক্ষেত্রে সবাই সংযত করেছে নিজেকে। অনেক খুনীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল, মাত্র স্বাধীন হয়েছে দেশ। হবে. সবই হবে, ন্যায্য বিচার হবে। ১৯৭৩ সালে বিশাল এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাংলার মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্ন কি অপূর্ণ থাকবে? পৃথিবীতে বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে স্বাধীনতাবিরোধী নামে একটি পক্ষ আছে। অনেক বিদেশী আমাকে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে স্বাধীনতাবিরোধী আবার থাকে কি করে? পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশে কেন এই শ্রেণীর উদ্ভব হলো? অনেকে বলবেন, বাঙালীরা ক্ষমাশীল, তাই এটি সম্ভব। আমি বলব, না, এটি বাঙালীর সুবিধাবাদ, নিষ্ঠুরতা।

আমার সামনে এখন গত কয়েক দিনের এবং ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকার ফাইল। সাম্প্রতিক পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় বিজয় দিবসকে বরণের সংবাদ। পুরনো পত্রিকাগুলোর পাতায় পাতায় হারিয়ে যাওয়া, খুন হওয়া মানুষের নাম, ছবি। খুনীদের তালিকা তাদের ধরিয়ে দেবার আহ্বান ছবিসহ। বিচারের দাবি আর বিচারের সরকারী প্রতিশ্রুতি। ১৯৭৩-৭৪ থেকে এসব খবর কমতে থাকে এবং এক সময় তা সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে ২৫ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বরে সুবিধাবাদটি কি? তা হলো ১৯৭১-এর পর কিছু মুক্তিযোদ্ধা ও প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের সম্পদের বিনিময়ে বিচারের দাবি ত্যাগ। সুবিধাবাদ হলো ১৯৭৫ থেকে খুনীদের বিচারের সব পথ রুদ্ধ করে দেয়া। সমাজে, রাষ্ট্রে যুদ্ধাপরাধীদের প্রতিষ্ঠা করা, তাদের মিত্রে পরিণত করা। নিষ্ঠুরতা হলো, স্বজনহারাদের কান্না দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হয়ত এর কারণ এই যে, যারা ক্ষমতায় ছিল তাদের ৯০ ভাগের স্বামী মারা যায়নি, সন্তান

হারায়নি, বোন ধর্ষিত হয়নি, স্ত্রী নিঃস্ব হয়নি। যার যায়নি সে বুঝবে কি করে হারানোর বেদনা। এই হচ্ছে বাংলাদেশ-আমাদের সোনার বাংলা।

বাংলাদেশ যে আজ অস্থিতিশীল তার প্রধান কারণ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়া। সমাজ, রাজনীতিকে এরা দ্বিখন্ডিত করেছে। সমাজে, রাষ্ট্রে এ ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে যে, খুন করলে কি হয়? কিছু না। লুট করলে কি হয়? কিছু না। ধর্ষণ করলে কি হয়? কিছু না। এসব বোধ পরতে পরতে মানুষের মনে জমা হয়, হিংস্রতা বাড়ে। তারপর কি হয়? তার প্রমাণ আজকের বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি থেকে কখনও বিরত থাকেনি। কখনও উচ্চগ্রামে, কখনও নিচুগ্রামে তা উচ্চারিত হয়েছে। ১৯৯২ সালে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটি তা তীব্র করে তোলে। এখন তা আরও জোরদার। জোরদার আরও হবে এ কারণে যে, পৃথিবীর রাজনীতির অবস্থাটা-বদলেছে। অপরাধ করে, লুট করে, ধর্ষণ করে কোথাও আশ্রয় নেয়া আজ অসম্ভব হয়ে উঠছে। চিলি পিনোশে এর উদাহরণ। সুহার্তোকেও দাঁড়াতে হবে কাঠগড়ায়। স্লাভ নেতাদের বিচার চলছে। বাংলাদেশে তা হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না কেন?

সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা সব সময় বলেছেন, সব রাজনৈতিক হত্যার, খুনের বিচার হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও দাবি করেছিলেন এক সময়। গণহত্যা কি রাজনৈতিক হত্যা নয়? বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পর এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে। অনেকে বলছেন, শহীদ পরিবারের কেউ মামলা দায়ের করলে প্রচলিত আইনে বিচার হবে। আমরা বলি, তা হবে না। কেন হবে না তা বলছি।

১৯৭২ সালের একটি সংবাদে দেখি ডঃ আবুল কালাম আজাদকে হত্যার দায়ে দু'জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দিয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর এ মামলার কি হলো তা জানি না। ডাঃ আলীম চৌধুরীর হত্যাকারী হিসাবে আলবদর আব্দুল মান্নানকে (বর্তমানে 'মাওলানা' হিসাবে পরিচিত ও 'ইনকিলাব' নামক মুক্তিযুদ্ধবিরোধী পাকিপন্থী পত্রিকার একজন মালিক) ধরা হয়েছিল। সেও ছাড়া পেয়ে যায়। শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী হিসাবে পরিচিত খালেক মজুমদারকে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের জজ সাত বছরের কারাদ দেন। হাইকোর্ট সে রায় বাতিল করে। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর একটি আর্গুমেন্ট বিচার করুন এ প্রসঙ্গে–"Circumstances showing that about Khaleque was member of Jamat-e-Islami nominated the mind and judgement of the prosecution witnesses becuase impression was created that Jamat-e-Islami was aganist the movement of the liberation.

But that as it may, this impression was responsible for influencing the inductive reasoning of the witness.” তাছাড়া ধরে নেয়া যাক খালেক ধরে নিয়ে গেছে শহীদুল্লাহ কায়সারকে হত্যার জন্য, কিন্তু হত্যা করেছে তার প্রমাণ কি? এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ও সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী রায় দিলেন, “In the circumstances therefore, the opinion is that doubt has crept into the prosecution case and this doubt goes in favour of the accused and we accordingly give benefit of doubt...”

১৯৭১ সালে জামায়াত মানুষ খুন করেছে সেখান কি ইমপ্রেশন হবে আওয়ামী লীগ খুন করেছে? তা হলে ন্যাচারাল জাস্টিস বলে কিছু থাকবে দেশে?

আমরা এগুলো মেনে নিয়েছি কারণ আমরা সেই আইনের ফ্রেমে বাস করি কিন্তু সেই আইনের ব্যাখ্যাও কি বাস্তবতা বিবর্জিত হবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। বাংলাদেশে যত বিতর্কমূলক নির্বাচন হয়েছে তার প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি। বাংলাদেশে যতগুলো অগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রায় প্রতিটির প্রধান ছিলেন একজন বিচারপতি। ১৯৭৮ সালে বিচারপতিরাই রায় দিয়েছিলেন সামরিক আইন বৈধ যা সভ্য দেশে জংলী আইন নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে পরিগণিত হয় এবং সরকারী সমস্ত কাজকর্ম ঐ ভাষায় সম্পাদনের নির্দেশ দেয়া হয়। অধিকাংশ বিচারপতি সে আইন মেনেছেন কি?

তাই বলি, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য দায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রচলিত আইনে সম্ভব নয়। 'মাওলানা' মান্নান যদি বলে ডাঃ আলীম আত্মহত্যা করেছে, তখন কি হবে? বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রচলিত আইনে সম্ভব হয়েছে, কারণ হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে তা স্বীকার করেছিল। মান্নানরা কি তা করেছে? যদিও আমরা জানি সংবাদপত্রে তখন এ সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছাপা হয়েছে এ ধরনের বিচারের জন্য সব সময় স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। সংবিধানেও তার বিধান আছে। সুতরাং স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বাধা কি? এবং তাতে সরকারকেই বাদী হতে হবে। শহীদ পরিবারগুলো আজ নিঃস্ব। প্রচলিত আদালতে মামলা করলে তাদের মৃত্যু হবে কিন্তু আদালতের রায় শুনে যেতে পারবে না।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন সহজ, কারণ, বাংলাদেশের তিনটি দলই নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে দাবি করে। জেনারেল এরশাদকে তো এ কারণে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ 'রণবীর' উপাধিও দিয়েছিল। এ বিষয়ে জাতীয় সংসদে যদি ঐকমত্য না হয় তাহলে আন্তরিকতা ও ভণ্ডামির সংজ্ঞা নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে।

আমরা মনে করি, বাংলাদেশের সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। শুধু তাই নয়, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে হলে, মৌলবাদীদের অন্ধকার যুগ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা প্রতিরোধ করতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে এবং আমরা আজ সেই ৩০লাখ মানুষের পক্ষ থেকে বিচার চাইছি– যাঁরা তাঁদের বর্তমান বিসর্জন দিয়েছিলেন আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আজ সবাই বিজয় দিবসের উৎসবে মগ্ন। একবার কি ভেবেছেন, ত্রিশ লাখের স্বজনের কথা যারা কান্না চেপে দেখছে এ উৎসব। আপনার কি মনে হয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলে সম্পূর্ণ হবে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়?

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৮

এখনো বলছি ভবিষ্যতেও বলব তুই রাজাকার!

'আরেকটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত-পা বাঁধা।...'

'আরেকটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির টিবিটা তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। মুখ ও নাকের কোনো আকৃতি নেই। কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটা অংশ কাটা।... মেয়েটি সেলিনা পারভীন। শিলালিপির এডিটর।....'

'মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে, প্রতিটি জলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির টিবির মধ্যে মৃত কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোক যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।'

এসব চিত্র চকিতে ভেসে উঠল সকালের এ খবরটা দেখে– 'সরকার ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে গোলাম আযমের মামলা। উপরে যে প্রতিবেদনটির উল্লেখ করেছি তা লিখেছিলেন অধ্যাপিকা হামিদা রহমনা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ঢাকার রায়েরবাজার বধ্যভূমি দেখে এসে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী সময়ের পত্রিকা ওল্টালে এ-ধরনের প্রচুর বধ্যভূমির খবর জানা যাবে। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মূলত জড়িত ছিল স্বাধীনতাবিরোধী, যাদের প্রধান অংশ জামায়াতে ইসলামের কর্মীরা। এদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল রাজাকারবাহিনী, ডেথ স্কোয়াড নামে খ্যাত আলবদরবাহিনী ও আল শামস বাহিনী। আর আলবদরদের হাতে নিহত হয়েছিলেন এ দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা। বাংলাদেশ কি এসব ঘটনা মনে রাখেনি? দু'দিন আগে খবরের কাগজ দেখে সে-কথাও মনে হলো। গো. আযম গং গত ৯ মার্চ প্রথম সাবজজ আদালতে আবেদ খান সরকার, ইমপ্রেস ভিডিও এবং আরো কয়েকজনের বিরুদ্ধে ১৭ কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছে। কারণ গত বছরের ৩১ মার্চ রাত সাড়ে ৯টায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'ঘটনার আড়ালে' শীর্ষক বিষয়ভিত্তিক প্যাকেজ ধারাবাহিকে 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি' নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এই অনুষ্ঠানে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে জাতীয় গণতদন্ত কমিশন এ পর্যন্ত যে ১৭ ব্যক্তির অপরাধের তথ্য উদঘাটন করেছে তাদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। [প্রথম আলো ১.৫.৯৯] বাদীরা হলেন গো. আযম, নিজামী, সাঈদী, কাদের মোল্লাসহ ১০ জন।

এরা প্রত্যেকে বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত আলবদর বা রাজাকার হিসেবে। আবেদ খান অনুষ্ঠানটি করেছিলেন মানুষের জন্য। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের কিছু মানুষ কীভাবে পশু হয়ে গিয়েছিল। কীভাবে খুন করেছিল। তারা ছিল অমানুষ। এ অমানুষদের মধ্যে অবশ্য শ্রেণীভেদ ছিল রাজাকার, আল শামস, আলবদর। এদের মান বা মর্যাদা আছে এটা কারো মনে হয়নি। মনে হলে ইমপ্রেস বা আবেদ খান এ অনুষ্ঠান করতেন না। রাজাকারের আবার মান-মর্যাদা কী? সঙ্গত কারণেই গো. আযমরা এটা মানতে পারেনি। তারা মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি চায়। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। গো. আযমকে আদালত স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু মানুষ তো দিচ্ছে না। তারা রাজাকার, আলবদর বলেই যাচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার। মামলা জিতলেই কি মানুষ হওয়া যাবে? গো. আযমকে সবাই রাজাকারই বলবে। মতিউর রহমান নিজামীকে আলবদরই বলা হবে। আবদুর রহমান বিশ্বাস দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে ছিলেন সে-পরিচয় তো মুছতে পারেননি, বরং প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর যেন সে পরিচয় বড় হয়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে আজ ত্রিশ বছর পর এই রাজাকার আলবদররা মামলা করল কেন? কী-ইবা তাদের যুক্তি? আরজিতে সম্মিলিতভাবে এই রাজাকার আলবদররা বলেছে জামায়াতে ইসলামী আইনসিদ্ধ একটি রাজনৈতিক দল। জামায়াতে ইসলামী ১৯৭১ সালে অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। সেটা ছিল তাদের রাজনৈতিক অবস্থান। কিন্তু কোনো আধাসামরিক বাহিনীর কার্যকলাপের সঙ্গে জামায়াত কোনোভাবে জড়িত ছিল না।' *[জনকণ্ঠ]*।

১৯৭১ সালের পর জামায়াত চিল বাংলাদেশে নিষিদ্ধ দল। কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল? কারণ তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করেছিল। জে. জিয়াউর রহমান বন্দুকের জোরে ক্ষমতা দখল করে, মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের দিয়ে নিজের সমর্থন বৃদ্ধির জন্য সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। সামরিক আইন অবৈধ হলে সেই নিষেধাজ্ঞা ওঠানোও আইনসিদ্ধ নয়। সেটি মানলেও কথা থাকে। সংবিধানে মুক্তিযোদ্ধাদের দায়মুক্ত করা হয়েছে। রাজাকারদের নয়। সংবিধানে বলা হয়েছে– 'এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোনো অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোনো কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন....' সংবিধানে আছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শই মূলনীতি হবে। ঘোষিত মূলনীতি বদলালেও এ বাক্যটির বদল হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সেটি এখনো সেই হিসেবে বলবত।

জামায়াত জনমন থেকে রাজাকার শব্দটি মুছতে না-পারায় নতুন এক লাইন নিয়েছে। ১৯৭১ সালে রাজাকাররা অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। এটা রাজনীতি। আর এ কারণেই তো সে রাজাকার। হিটলার তো আর্য রক্ত বিশুদ্ধ করার স্ট্যান্ড নিয়েছিল, তা হলে তাকে মানবতার শত্রু বলা হয় কেন? পিনোশে বিরুদ্ধবাদীদের হত্যার রাজনৈতিক লাইন নিয়েছিল। আজ তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দাঁড়াতে হচ্ছে কেন? ১৯৭১ সালে তারা পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল দেখেই তো বাংলাদেশে তখন দুটি শব্দের উদ্ভব হয়েছিল–মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার।

জামায়াতে ইসলামী কোনো আধা সামরিকবাহিনীর কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিল না? আল বদরবাহিনী কি ছিল? এ বাহিনীর প্রধান তো ছিল মতিউর রহমান নিজামী। খালেক মজুমদারকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুনের দায়ে। গোলাম আযম এত নিষ্পাপ হলে মুক্তিযুদ্ধের পর দীর্ঘদিন গা-ঢাকা দিয়েছিল কেন? জিয়াউর রহমানের প্রকেটশনে তার দেশে ফেরা। তারা যদি কোনোকিছুর সঙ্গে জড়িত না-ই থাকে তা হলে তাদের অনেক সহযোগী এখনো কেন বিদেশে?

আজ ৩০ বছর পর তারা সাহস পেয়েছে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে। বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের কারণেই তারা বাংলাদেশে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পেরেছে এবং সারাদেশের মুখে লাথি মেরেছে। কাজী শাহেদ আহমদের ভাষায় 'আসামি হলো মুক্তিযোদ্ধারা। আসামি হলো মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান আসামি মুক্তিযুদ্ধ।' তিনি আরো লিখেছেন যা আমরা সবাই জানি– 'যেদিন আওয়ামী লীগ এরশাদের পার্টি জামায়াতের সঙ্গে বসল এবং সেই ব্যর্থতা আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পরিণত হচ্ছে যখন খালেদা জিয়া সেই এরশাদের পাশে ও গো. আযমের পাশে বসতে যাচ্ছেন। এবার বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও তার আদর্শের ওপর আঘাত হলো। বঙ্গবন্ধুর নামে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ফলক না-বসিয়ে এ আদর্শগুলো প্রতিষ্ঠা করাই হতো বঙ্গবন্ধুর নাম প্রতিষ্ঠা করা।

জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এই দশ জন বাদীকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে বিচারের দাবি তোলে যা ব্যাপক আন্দোলনে রূপ নেয়। সে বিচারের দাবি থেকে আমরা সরে দাঁড়াইনি। আজ ৫০/৬০ বছর পরও নাজিদের বিচার হতে পারলে, দু'যুগ পর পিনোশোর বিচারপ্রক্রিয়া যদি শুরু হতে পারে তাহলে এদেরও হবে। কারণ একবার যে রাজাকার সে সব সময়ই রাজাকার।

রাজাকাররা মানহানির মামলা করেছে। করুক আরো করুক। চামচিকের চামড়া বদলে ফেললেও কি গন্ধ দূর হবে? মামলায় জিতলেও বলা হবে– 'তুই রাজাকার'। আমরা অনেকদিন ধরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করে আসছি। এটি ন্যায্য দাবি। কোনো রাজনৈতিক দল তা মানে নি। রাজনৈতিক দলের কর্মী থেকে

বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখনো যদি তারা রাজাকারদের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায় এত বড় অপমানের পরও, তাহলেও তাদের ভুলে যান আমরা আর কিছু না পারি রাস্তাঘাটে রাজাকারদের দেখলে তো বলতে পারব– 'তুই রাজাকার'। এ ঘটনার পরও মুক্তিযুদ্ধের দল বলে পরিচিত দলের নেতাকর্মীরা যদি বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের জন্য না এগিয়ে আসে, ভয় পাবেন না। রাজাকারকে 'তুই রাজাকার' বলার অধিকার থেকে তারা আমাদের বিরত রাখতে পারবে না। 'মুক্তিযোদ্ধা সংসদ' বলে একটি সংসদ আছে। যারা স্লোগান দেয়– 'মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার'। সেই হাতিয়ার আর কখন গর্জাবে জানি না। ঘাবড়াবেন না। আপনার ছেলেকে শেখান– গো. আযম নিজামী এরা রাজাকার। এদের নাম উঠলেই যেন তারা বলে– ঐ রাজাকার। আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়িয়ে যাব তখন এদের বলব– 'তুই রাজাকার।' আ. লীগ জা. পার্টি, বিএনপি যদি একত্রে মিলে গো. আযমকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টও করে আমরা বলব –'তুই রাজাকার।' নিজামী যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাও শুরু করে, আমরা বলতে থাকব– তুই রাজাকার, তুই আলবদর। কিছু রাজনৈতিক নেতাকর্মী বাদে সারাদেশ এদের বলে এসেছে তুই রাজাকার, এখনো বলছে তুই রাজাকার, ভবিষ্যতে বলবে 'তুই রাজাকার'।

৪ মে, ১৯৯৯

গোলাম আযমদের অর্জন এক খেলাতেই শেষ

মহানন্দার তীরে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের এক গরিব গ্রাম গোবরাতলা। গ্রামের ধূলিধূসর রাস্তা দিয়ে আলম বাগানে যাওয়ার পথে চোখে পড়ে জীর্ণ এক দেয়াল, তাতে গোটা গোটা হরফে লেখা– '৭১-এ করেছি যুদ্ধ জয়, '৯৯তে ক্রিকেট জয় - জয় বাংলা।'

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রিকেট জয় এখন পুরনো খবর। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মিছিলের ঢল নামবে তা ধারাভাষ্যকাররা বলছিলেন। কিন্তু তাই বলে গোবরাতলা গ্রামে এ শ্লোগান দেখব তা ভাবিনি। ঢাকা বা চট্টগ্রামের সঙ্গে গোবরাতলার মানসিক ও ভৌগোলিক দূরত্ব তো দুস্তর। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মানসিক স্পিরিটটা এক। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতাই নেই। কয়েকদিন আগের ক্রিকেট জয় এ বিষয়টাই আবার প্রমাণ করল।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলায় বাংলাদেশ আগেও জিতেছে। কয়েক মাস আগে সাফ ফুটবলে পাকিস্তানকে চার গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সেটি বড় খবর হয়ে ওঠেনি। অবশ্য এরকারণও আছে। তরুণরা ক্রিকেটে উৎসাহী। আর টিভি ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে বিশ্বকাপ ক্রিকেট উপমহাদেশে বিশেষ খবরে পরিণত হয়েছে। বিশ্বকাপে নিজ গ্রুপের খেলায় পাকিস্তান ছিল অপরাজেয়। ধরে নেয়া হচ্ছে পাকিস্তানকে শোচনীয়ভাবে হারিয়েছে। কিন্তু তাই বলে এই জয় পুরো জাতিকে কেন প্রায় উন্মাতাল করে তুলল বা কেন অন্যমাত্রা পেল? কেন গোবরাতলার মতো অজপাড়াগাঁয়ে শ্লোগান-১৯৭১-এর জয়ের মতো ১৯৯৯-এর জয়?

খেলার দিনটা পর্যালোচনা করা যাক। টিভিতে দুর্দান্ত থ্রিলার চলছে। সবাই টিভির সামনে। উইকেট পড়ছে পাকিদের, তবুও জয় করে আমাদের ভয় যেন যায় না। শেষ উইকেট পড়ল আর বাংলাদেশ হয়ে উঠল মিছিলের দেশ। এ-সংক্রান্ত প্রচুর ঘটনা পাঠক নিশ্চয় ইতোমধ্যে জেনেছেন, তবুও দু'একটি বলি।

নোয়াখালীতে পাকিস্তানকে মৃদু সমর্থন করায় এক ব্যক্তিকে দিগম্বর করিয়ে দৌড়াতে বাধ্য করা হয়েছে। ঢাকায় একজন জানালেন তাদের মেসের পাশে এক লোক, খেলার সময় বাংলাদেশের প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য করেছিল। খেলা শেষে

পাকিস্তানি হিসেবে তাকে নাজেহাল করা হয়। ঢাকায় টিএসসির সামনেও পাকি সমর্থকরা নাজেহাল হয়েছে। শ্লোগান উঠেছে হৈ হৈ রৈ রৈ রাজাকাররা গেলো কই? হৈ হৈ রৈ রৈ গোলাম আযম গেল কই? জামাত কার্যালয় নিজামী এবং গোলাম আযমের বাসায় পুলিশ প্রহরা দেয়া হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলো এ বিজয়ের আনন্দকে ১৯৭১-এর যুদ্ধজয়ের আনন্দের সঙ্গে তুলনা করেছে। অবশ্য আইসিসি ট্রফি জয়ের পর এসব ঘটনা ঘটেনি এ ধরনের শ্লোগান দেয়া হয়নি। এবারের জয়ের বৈশিষ্ট্য এটিই যা নতুন মাত্রা দিয়েছে পুরো ঘটনায়।

স্কটল্যান্ডের সঙ্গেও বাংলাদেশ জিতেছে। এরকম হয়নি। এবার হয়েছে। অর্থাৎ ভারত-পাকিস্তান খেলা যেমন অন্তিমে আর খেলা থাকে না, জাতিগত মান-সম্মানের প্রশ্ন হয়ে ওঠে তেমনি বাংলাদেশ-পাকিস্তানের খেলাও তাই হয়ে উঠছে, যুক্ত হয়ে পড়ছে ইতিহাস না চাইলেও। খেলা একেবারে রাজনীতিমুক্ত, কে বলে? এবং কী সব ঘটনা এ মনোভঙ্গি তৈরি করে? দেখা যাক।

১৯৭১-এর আগে পাকিরা বাঙালিদের যথেষ্ট অপমান করেছে। এই খেলার আগেও পাকিরা বাঙালিদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে, ঢাকায় তো রীতিমতো অপমান করেছিল। গণহত্যার আগে পাকিস্তানের আশা ছিল ৭২ ঘন্টার মধ্যে করজোড়ে মাপ চেয়ে বাঙালিরা ফিরে আসবে। আকরামও ঠিক করেছিল হয়ত ১০ ওভারে বাঙালিদের ৫০ রানে অলআউট করে ৫ ওভারে নিজেরা ৫১ করে খেলা শেষ করে দেবে। মুক্তিযুদ্ধ ৭২ ঘণ্টায় শেষ হয় নি। এ খেলা ১০ ওভারে শেষ হয়নি। পুরো ৫০ ওভার চলেছে। মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ্য ছিল এক নেতা ছিল এক, ঐক্যবদ্ধ হয়ে মরিয়া হয়ে লড়াই করেছিল সবাই অপমানের প্রতিশোধ নিতে। খেলাতেও তাই হয়েছে। ১৯৭১-এর মতো পাকিরা আগে কখনো হাঁটু গেড়ে বসেনি। খেলার মাঠে পাকিস্তানি দলকে এ রকম সাজাও আর কেউ দেয় নি। নতুন প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছে, তাদের কাছে তাই খেলার ঘটনাটা এ রকমই মনে হয়েছে।

পরাজয়ের পর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রবল ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল শাসক ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। ক্রিকেট খেলায় পরাজয়ের পরও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে পাকিস্তানে। রেস্তোরাঁয় কাপ-পিরিচ ভাঙা হয়েছে। বলা হচ্ছে ওয়াসিম আকরামরা পয়সা খেয়েছে। পাকিরা বলছে, খেলায় হারজিত আছে, তাই বলে বাঙালিদের কাছে হারতে হবে। ১৯৭১ সালেও তারা তাই বলেছিল। এখন পুরো মুশকিল হচ্ছে, পাকিস্তান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হলেও বাঙালিরা বলতে পারবে ওহ, তাতে কী হয়েছে তারা তো বাংলাদেশের কাছে হেরেছে। এ ভাবেই সামান্য ক্রিকেট খেলা হয়ে ওঠে দুই জাতির মান-সম্মানের লড়াই, যুক্ত হয়ে পড়ে ইতিহাস এবং ভবিষ্যতেও তা হবে।

এ খেলা আরো কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেছে–

১. পৃথিবীর সব দেশে বাঙালি মাত্রই বাংলাদেশের জয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছে। খবরে দেখেছি, বাংলাদেশ-সীমান্তের ওপারেও রাত ১১টায় পটকা ফুটেছে, মিছিল বেরিয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ক্রমেই পৃথিবীর সব দেশের সব বাঙালির কেন্দ্র হয়ে উঠছে। মানসিক জন্মভূমি হয়ে উঠছে। ফলে বাঙালি খেলোয়াড়, সংস্কৃতিসেবী, রাজনীতিবিদ এখন শুধু আর বাংলাদেশের নয়, বাঙালিরও প্রতিনিধিত্ব করবেন। বাঙালির দায়িত্ব বাড়ছে।

২. জয়ের পর রাজাকারবিরোধী স্লোগান, পাকিস্তানের সমর্থক হলেই তাকে রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত করে নাজেহাল করা–এসব কিছুর অর্থ মুক্তিযুদ্ধ এখনো আছে বাংলাদেশের কেন্দ্রে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি উপড়ে ফেলা যায় নি। পরাণের গহীনে তা আছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রাজনীতির ভন্ডামি রাজাকারদের কর্মকাণ্ড সব কিছুই ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে সাধারণের মনে। সে সমস্ত ক্ষোভ প্রকাশের উদাহরণই ঐ ঘটনাগুলো। এ জয় নিয়েও রাজনীতি করার নমুনা অধ্যাপক বি. চৌধুরী বলেছেন 'দেশে আজ ক্রিকেটের যে সাফল্য এসেছে এটা জিয়াউর রহমানেরই অবদান।' তাহলে বলতে হয় ক্রিকেটে যে অসাধারণ দুটি জয় তা শেখ হাসিনারই অবদান। এর অর্থ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক বিরাট শক্তি যা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এগিয়ে নিতে পারে। সঠিক নেতৃত্ব পেলেই হলো।

৩. গো. আযম মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছে। মূল প্রতিপাদ্য মামলা দুটির যে-তারা রাজাকার নয়। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা বানোয়াট। তারা শ'খানেক রিট করুক মামলায়ও জিতুক তাতে মুক্তিযুদ্ধের কিছুই আসে যাবে না। তারা এখনো পরিচিত পাকিস্তানের প্রতীক হিসেবে খেলা শেষ হওয়ার পর যে কারণে তাদের জন্য বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং বাংলাদেশের শত্রু হিসেবে বিশেষ সময়ে তাঁদের প্রকেটশনেই রাখতে হবে। তাঁদের একদশকের অর্জন এক খেলাতেই শেষ।

জেনারেল, আলবদর ও ধর্ম

পত্রিকায় উত্তেজক খবরের অভাবে বোধহয় প্রাক্তন জেনারেল ও স্বৈরশাসক হু. মু এরশাদের খবর গত দু'দিন ধরে পত্রিকায় আসছে। শুক্রবার জনকণ্ঠ-এ প্রাক্তন এই জেনারেল, প্রাক্তন আলবদর প্রধান নিজামী ও প্রাক্তন ভিসি এমজাউদ্দিনের রঙ্গিন ছবিসহ সংবাদ প্রকাশ করেছে। প্রাক্তন জেনারেল ফরমায়েছেন– "যদি দু'টি দল (অর্থাৎ বিএনপি ও জামায়াত) জাতীয় পার্টিকে টার্গেট না করে 'ইসলামের শত্রু" আওয়ামী লীগকে টার্গেট করত তাহলে দেশের এ অবস্থা হতো না।"

তা দেশের অবস্থা কী ছিল এরশাদ আমলে? ১৯৯০ তাঁর স্বৈরশাসন উৎখাতের পর, তাঁর বর্তমান পরম মিত্র বেগম জিয়ার সরকার "এইচ.এ. এরশাদ সরকারের আমলে সংঘটিত আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম, দুর্নীতি, অপচয় ও ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কিত" ৫৩২ পৃষ্ঠার শ্বেতপত্র (তাও খসড়া) প্রকাশ করে। কেন করেছিল? তাঁর শাসনামলে দেশে দুর্নীতি ও অরাজকতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। সাবেক রাষ্ট্রপতি, তাঁর স্ত্রী বেগম রওশন এরশাদ, তাঁর মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদ সদস্যগণ থেকে আরম্ভ করে অনেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীও দুর্নীতি, অনিয়ম, অপচয় ও ক্ষমতার অপব্যবহারে জড়িয়ে পড়ে।'

এই ছিল সেই জেনারেলের আমল। এখন কি অবস্থা তার থেকে খারাপ? তাঁর আমলে দেশের অবস্থা যা হয়েছিল এর চেয়ে খারাপ আর দেশের অবস্থা কখনো হবে না। সুতরাং এসব বিষয়ে এই বৃদ্ধ প্রাক্তন জেনারেল কোনো বক্তব্য দিলে ৫৩২ পৃষ্ঠার শ্বেতপত্রের কথা মনে রাখবেন এবং এও মনে রাখবেন তিনি যদি আবারও কখনো ক্ষমতায় আসেন তাহলে দেড় হাজার পাতার শ্বেতপত্র হয়ত প্রকাশ করতে হতে পারে।

এরশাদ এখন আবারও ধর্ম নিয়ে কথা বলছেন। তিনি নারীদের যেভাবে ব্যবহার করেছেন ধর্মকেও সেভাবে ব্যবহার করেছেন। ঐ সময়ের বিভিন্ন দেশী বিদেশী পত্রপত্রিকার রিপোর্ট এর প্রমাণ। সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংযোজনের কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন "এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার মধ্য একটি দেয়াল তৈরির উদ্দেশে তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি আলাদা দেশ হিসেবে পরিচিত হয়। এছাড়া এ দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশ মুসলমান হওয়ার কারণেও তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেন।"

এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে দেয়াল তুলে তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে মিল ঘটাতে। এ কারণেই হয়ত পাকি সরকার তাঁকে 'নিশান-ই-হায়দার' উপাধি দিয়েছিল। জেনারেল তাঁর বক্তব্যের দ্বিতীয় বাক্যটির মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করেছেন। অথচ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করে রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র পাল্টানো হয়েছে যা দেশদ্রোহিতামূলক অপরাধ এবং যার বিচার এখনো হয়নি [হাইকোর্টে এ বিষয়ক মামলার নিষ্পত্তি হয়নি এখনও]। এরশাদ আটরশির পীরকে 'জাতীয় পীর' করে তুলেছিলেন এবং ঘন ঘন সেখানে যেতেন এ কথা প্রমাণের জন্য যে তিনি ধর্মভীরু এক মুসলমান। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর সেখানে আর কখনো পা দেননি কেন? মানুষ ও ধর্মের প্রতি এই তাঁর বিশ্বাস? একটা সময় প্রায় তিনি স্বপ্ন দেখতেন বিভিন্ন মসজিদে নামাজ পড়ার এবং সেখানে হাজির হয়ে তা বলতেন এখনো রাষ্ট্রপ্রধান হঠাৎ ইচ্ছা করলেই কি কোথাও যেতে পারেন? এক সপ্তাহ আগে থেকেই নিরাপত্তা জনিত ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তিনি আরো ধারণা দিয়েছিলেন বড় পীরের মাজার জিয়ারত করে ফেরার পর তিনি পুত্রসন্তান লাভ করেন। ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সালে *জনকণ্ঠ* এরশাদের 'দ্বিতীয় স্ত্রী' মেরির সাক্ষাতকারের একটি অনুবাদ প্রকাশ করে, সেখানে মেরি বলেছিলেন– "এরশাদের আপন ভাই আমাকে বলেছিল ময়মনসিংহের কোনো এক গ্রামের এক গরিব লোকের কাছ থেকে ৩ লাখ টাকার বিনিময়ে ঐ শিশুটিকে কেনা হয়েছিল।" এরশাদের প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান লিখেছিলেন, বেগম এরশাদকে তিনি কখনো অন্তসত্ত্বা অবস্থায় দেখেননি।

বাংলাদেশে ধর্ম নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছেন ও ব্যবসা করেছেন এরশাদ তাঁদের অন্যতম। আলবদর নিজামী "ক্ষমতাসীন দলকে অপশক্তি" বলে অভিহিত করেন এবং অপশক্তির হাত থেকে জাতিকে রক্ষার জন্য ও জাতীয়তাবাদী শক্তির মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানান। ইসলামের নাম করে বিশেষ করে মুসলমান হত্যায় বিশ্বাসী নিজামী ১৯৭১ সালে তৈরি করে আলবদর বাহিনী। বর্তমানে বিএনপি মিত্র নিজামী ১৯৯৪ ঘোষণা করেছিল– "বিএনপি সরকার ও ছাত্রদল কসাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে" (*সংগ্রাম*, ২৪.২.৯৪) এবং আরও দুই বছর পর ঘোষণা করে "৫ বছরের (বিএনপির) দুঃশাসনে জনগণের মধ্যে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বিএনপি কোনো বিশ্বস্ত রাজনৈতিক শক্তি নয় [*সংগ্রাম* ২০.৩.৯৬]। তাহলে জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্গে কোন ভিত্তিতে ঐক্য হচ্ছে? বিএনপির কর্মীদের জিজ্ঞাসা, যারা লাথি দেয় তাদের পা ধরে রাখতে যদি ভালো লাগে তাহলে ছোট দল জামায়াতকে না ধরে বড় দল আওয়ামী লীগকে ধরলেই হয়। আফটার অল জেনারেল জিয়া তো বঙ্গবন্ধু সরকারের অধীনে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ

করেছিলেন। এই নিজামীদের বিরুদ্ধেই।

প্রাক্তন জেনারেল ও আলবদর প্রধান যে ইসলাম আনতে চাচ্ছেন সে ইসলাম এলে দুর্নীতি হবে নীতি, নারী ও ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে এবং যারা এর বিরোধিতা করবে তাদের রগকাটা শুরু হবে। তাছাড়া এ দুজনের যে উদ্ধৃতি দিলাম তারপরও কি অভিধানে 'মিথ্যাবাদী' 'ভন্ড' মোনাফেক, 'নির্লজ্জ' 'সুবিধাবাদী' শব্দগুলোর অর্থ খোঁজার দরকার আছে? "ইসলামের শত্রু আওয়ামী লীগ?' মানুষজন বরং আওয়ামী লীগের অতি ধর্মপ্রীতিতে শঙ্কিত। আওয়ামী লীগ থেকে না দলটি আওয়ামী মুসলিম লীগে পরিণত হয়।

১ জুলাই, ২০০০

তারা সোচ্চার আমরা নিশ্চুপ

তারা এখন সোচ্চার। আমরা নিশ্চুপ। একটা সময় ছিল যখন আমরা ছিলাম সোচ্চার তারা নিশ্চুপ। আর তার ফলে বলি হচ্ছে মূল বিষয়। এটিই বোধহয় রাজনীতি, আর এক কারণেই বোধহয়ঃ একটা সময় মানুষ রাজনীতিকে ঘৃণা করতে থাকে। অথচ রাজনীতি থেকে মুক্তি পাবারও উপায় নেই, তা আমাদের জড়িয়ে থাকে জীবনের সব পর্যায়ে।

বিষয়টি হচ্ছে, হামুদুর রহমান কমিশন। এ কমিশনে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দায়ী করা হয়েছে কিন্তু পাক সামরিক কর্তাকে। পাকিস্তানীরা এখন তাদের বিচার চাচ্ছে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য। আমরা আবার সেসব কর্মকর্তাকে দায়ী করছি যুদ্ধাপরাধী হিসাবে এবং তাদের বিচার চাইছি তিন দশক ধরে। সুতরাং এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে তাদের যে কোনো রকম বিচার হলে আমরা অন্তত সান্ত্বনা পাব। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আমাদের অনেকে, বিশেষ করে সরকার নিশ্চুপ।

১৯৭২ সালে হামুদুর রহমান কমিশন করেছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো নিজের চামড়া বাঁচাতে। বছর দু'য়েক আগে, পাকিস্তান সফরের সময় অনেকে আমাকে বলেছিলেন যে, ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর হানাদারবাহিনীর আত্মসমর্পণের দৃশ্যটি পাকিস্তানী টেলিভিশনে একবার দেখানো হয়। এতে দর্শকরা যাতনায় উন্মাদপ্রায় হয়ে ওঠে। তার পর থেকে এ পর্যন্ত নাকি টেলিভিশনে সে দৃশ্য আর কখনও দেখানো হয়নি। তখন এই রকম যখন সেন্টিমেন্ট তখন এ ধরনের কমিশন করা ভুট্টোর জন্য ছিল লাভজনক। কমিশন হলো, রিপোর্ট জমা দেয়া হলো, কিন্তু তা আর প্রকাশ করা হলো না। যদিও কমিশনের অনেক সিদ্ধান্ত মুখে মুখে ফিরছিল।

ভুট্টোর পক্ষে এ রিপোর্ট প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না, যদিও কমিশন ভুট্টো ও তাঁর পক্ষাবলম্বী সামরিক কর্মকর্তাদের ছাড় দিয়েছিল। কারণ পাকিস্তান চালায় আইএসআই। তারা নিজেদের স্বার্থেই রিপোর্ট প্রকাশিত হতে দিতে পারে না। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে পাকিস্তানীদের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে, এ রিপোর্ট প্রকাশ করার। ১৯৭১ সালের ঢাকার শেষ পাকিস্তানী কমিশনার আলমদার রাজাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন– "হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হলে অনেক কিছু জানা যেত। ঐ রিপোর্টে আবার এও বলা হয়েছিল, এর

কিছু অংশ প্রকাশ করা যাবে না। এতই সংবেদনশীল ছিল তা।"

"শুনেছি রিপোর্টটি প্রকাশের জন্য হাইকোর্টে আপনি রিট করেছিলেন?"

"করেছিলাম, তবে শুধু রিপোর্ট প্রকাশের জন্যই নয়। আমি আরও দাবি জানিয়েছিলাম, যারা এসব অত্যাচার, ধর্ষণ, নারকীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী তাদের বিচার হতে হবে। বাংলাদেশের কাছে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী তাদের বিচার হতে হবে। বাংলাদেশের কাছেই এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী ২০০ লোকের তালিকা আছে। যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের যদি অপরাধের দায় থেকে মুক্তি দেয়া হয় তাহলে তাদেরও অপরাধী ঘোষণা করতে হবে।"

শোষকদের চাপে বিচারক এ রিট নিষ্পত্তি করতে পারেননি। একই প্রশ্ন করেছিলাম করাচীতে বেনজীর ভুট্টোকে। রিপোর্ট প্রকাশ না করার কারণ হিসাবে তিনি বললেন, কেউ তেমন দাবি জানায়নি।'

"হৈ চৈ হলে কি প্রকাশ করতেন?"

"ক্ষমতায় যাওয়ার পর কমিশনের রিপোর্টের কোনো কপি পাইনি। আমার বাবা রিপোর্টটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জেনারেলরা আপত্তি করেন।" তিনি আরও বলেছিলেন, "প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে জনগণের একটি বোঝাপড়া হওয়া দরকার। রিপোর্টটি প্রকাশ না করা ঐতিহাসিকদের জন্য এক ধরনের বিপর্যয়।"

এখন যে রিপোর্ট নিয়ে হৈ চৈ চলছে তা মূল রিপোর্ট নয়। সম্পূরক রিপোর্ট। পাকিস্তানে এই রিপোর্ট নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। বাংলাদেশের প্রতিটি পত্রিকা রিপোর্টের অনুবাদ ছাপছে। পাকিস্তানের এলিট মহলে যে বিষয়টি অজানা ছিল তা নয়, কিন্তু এখন দলিলাকারে তা প্রকাশিত হয়েছে। একজন পাকিস্তানী গবেষক আমাকে বলেছিলেন, "পাকিস্তানের লোকেরা তখন বিবিসির খবর শুনলেও বলত যে মিথ্যা। পিপল হ্যাড টোটালি ক্লোজড মাইন।" বাঙালি বিদ্বেষী ভুট্টোর ঘনিষ্ঠজন রফি রাজা আমাকে বলেছিলেন ১৯৭১ সম্পর্কে "উই ডিড নট ওয়ান্ট টুনো আর উই ডু নট নো-যেভাবেই নিন। পিপলস পার্টির লোকরা ভেবেছিল, আমি এ্যাকশনের পর সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। বেঙ্গলিজ কুড বি সর্টেড আউট। কিন্তু হয়নি এবং এ ঘটনায় নো বডি ইন দ্যা আর্মি রিগ্রেটেড। উই হ্যাড এ ভেরি ব্রুটালাইজড সোসাইটি আফটার দ্যাট।"

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি ১৯৭২ সাল থেকেই করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুয়ালালামপুরে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। হয়নি। কিন্তু কেন হয়নি তা কেউ ব্যাখ্যা করেননি। হয়ত বলার প্রয়োজন মনে করেনি কেউ। ক্ষমতায় থাকলে মানুষ তো আর মানুষ হিসাবে বিবেচ্য হয় না, বিবেচ্য হয় ভোটার হিসাবে।

নির্মূল কমিটির আন্দোলনের পর আবার জোরদার হয়ে উঠেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি। এ দাবিতে এখন অধিকাংশ মানুষ সোচ্চার। তখন শেখ হাসিনাসহ অনেকেই বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর অনেকের মনে হয়েছে কই এ রকম কথা বলেছিলাম নাকি। আবার যখনই গাড্ডায় পড়ে সরকার তখনই হঠাৎ জামায়াতবিরোধী হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশ ও চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ নেতারা খুন হওয়ার পর কয়েকদিন আগে আবার আওয়ামী লীগের সমস্ত অঙ্গ ও উপ অঙ্গ সংগঠন, নেতা-নেত্রীরা রাজপথ প্রকম্পিত করে তুললেন জামায়াতবিরোধী সমাবেশে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতেও সোচ্চার হয়ে উঠলেন। পাকিস্তানীরা ছিল নিশ্চুপ। আজ পাকিস্তানে মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠছে তাহলে। হে ছাত্র, যুব, প্রৌঢ় লীগ নেতৃবন্দ। আপনারা কেন নিশ্চুপ? গাড্ডা কি পেরিয়ে গেছেন? আগামী এক বছর কি গাড্ডায় পড়ার কোনো সম্ভবনা নেই?

মুক্তিযুদ্ধের পার্টি আওয়ামী লীগ এখন নিশ্চুপ। কারণ আছে বোধহয় একটি পত্রিকায় দেখেছি, পররাষ্ট্র সচিব হন্তদন্ত হয়ে খালি পাকি সামরিক প্রশাসকের কাছে ছোটাছুটি করছেন দু'পক্ষের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য। হয়ত সরকার পাকি সামরিক সরকারকে দোস্ত করে এখানকার পাকি প্রেমিদের গাড্ডায় ফেলতে চায়। জানি না! যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে, যেভাবে জীবন চালাতে চাই সেভাবে কি আর চলে? আজ ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে পাকিস্তানীদের সিভিল সমাজ যেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠছে সেভাবে আমাদের সরকার না হোক, সরকারি দল তো সোচ্চার হয়ে উঠতে পারত। চারদলীয় জোট তো আর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাইবে না। দু'দেশে সিভিল সমাজ সোচ্চার হলে হয়তবা এক ধরনের বিচার হতো।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কোনো দেশের একার পক্ষে করা সম্ভব হবে না বিদ্যমান অবস্থায় এবং কোনো সরকার তাতে উৎসাহীও হবে না। কিন্তু একটি উপায় আছে দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি দেশের সিভিল সমাজের সোচ্চার হয়ে ওঠা। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের এখানে যুদ্ধাপরাধীদের যে (শাহরিয়ার কবিরের গ্রন্থ, নির্মূল কমিটির রিপোর্ট ইত্যাদি) তালিকা বিভিন্ন অপরাধ সম্পর্কে যে বিবরণ আছে তা পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের কাছে পাঠান। প্রবাসে যাঁরা আছেন তাঁরা আন্তর্জাতিক ফোরাম ও পাকিস্তানে মানবাধিকার কমিশনের কাছে তথ্য পাঠান, তথ্য বিনিময় করুন, বিচারের দাবি তুলুন। পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশে যাঁরা যুদ্ধাপরাধের বিচার চান তাঁরা অভিন্ন একটি প্ল্যাটফরম গড়ে তুলুন। একমাত্র দক্ষিণ এশিয়ার সিভিল সমাজ চাইলে ও আন্তর্জাতিক ফোরামগুলো সরকারদ্বয়কে চাপ দিলে যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্ভব।

সিয়াটলে কি শুধু তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে রাস্তায় লোক জড়ো করে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন বানচাল করে দেয়া হয়নি?

সব কথার শেষ কথা, হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে পাকিস্তানের মানুষ সোচ্চার হচ্ছে। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল, সে দলের সরকার এ ব্যাপারে নিশ্চুপ, তা অতীব দুঃখজনক। এ নীরবতা আওয়ামী লীগ ভোট বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে না।

২৭ আগস্ট, ২০০০

ইনকিলাবকে কেন সবাই প্রশ্রয় দিয়েছে, আশ্রয় দেয়?

খবরের কাগজ খুললেই এখন দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা চোখে পড়ে। আদালত ও দৈনিক ইনকিলাব। তবে, দুঃখের বিষয় দৈনিক ইনকিলাব যেদিন থেকে মাদ্রাসা শিক্ষকদের থেকে জোর করে চাঁদা তুলে বের করা হলো সেদিন থেকে বিতর্কিত হয়ে পড়ল। আদালত বা বিচারপতিরা বিতর্কিত ছিলেন না। এখন খবরের কাগজে দুটি প্রসঙ্গই এক সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে, এটিই দুঃখের।

দৈনিক ইনকিলাবের কথা মনে হলে আমি কয়েক বছর আগের ঘটনাটি ভুলতে পারি না। বায়তুল মোকাররমের সামনের রাস্তায় ভর দুপুরে, খররোদ মাথায় নিয়ে রিক্সার দরদাম করছি। সঙ্গে '৭১-এর গেরিলা এক বন্ধু। এমন সময় চকচকে একটি গাড়ি এসে থামল সামনে। নামল একজন পরনে সফেদ পাজামা-পাঞ্জাবি। মুখে কলপ মাখা ছোট করে ছাঁটা কালো দাড়ি। তাকে দেখে দৌড়ে এল কয়েকজন মুরগিঅলা। লোকটি জবেহ করে খাওয়ার জন্য হেলাভরে কয়েকটি মুরগি তুলে নিল।

চর্বিতে আসল চেহারা ঢাকা পড়ে গেলেও মনে হলো এ লোকটিকে যেন কোথায় দেখেছি। মনে করতে পারছি না। বন্ধুর দিকে তাকাই। শীর্ণ চেহারা, জ্বলজ্বলে চোখে, হাত মুষ্টিবদ্ধ। দাঁতে দাঁত পেষার শব্দ।

ক্যারিকেচারটি কে? জিজ্ঞাসা করি আমি।

হ্যাঁ তাই তো, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের দৈনিক বাংলায় এ লোকটির ছবি ছাপিয়ে শিরোনাম দিয়েছিল– 'এই নরপিশাচকে ধরিয়ে দিন।' তখন লোকটির চেহারা এত তেলতেলে ছিল না। তবে, চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্যটি বদলায়নি– এখন যেভাবে জবেহ করার জন্য হেলাভরে তুলে নেয় আধডজন মুরগি, কথিত আছে, ১৯৭১ সালে তেমনিভাবে হেলাভরে নিয়ে যেত বা তুলে নিতে সাহায্য করত বাঙালিকে জবেহ করার জন্য। শহীদ ড. আলীম চৌধুরী এর উদাহরণ। মুরগি বা মানুষে তার কাছে তেমন পার্থক্য নেই যদি তা সাহায্য করে নিজের মেদ বৃদ্ধিতে। মুক্তিযুদ্ধে আসলে বাংলাদেশকে কী দিয়েছে তাও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল একজনের মুরগি কেনা আরেকজনের খররোদে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যে।

আলবদর হিসেবে পরিচিত আব্দুল মান্নানকে আলবদর থেকে মানুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন আমাদের সেই বিখ্যাত

মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল জিয়াউর রহমান। একই সঙ্গে দুটি বিপরীতধর্মী কাজ করার যোগ্যতা তাঁর ছিল। সে যোগ্যতার স্বাক্ষর তিনি রেখেছিলেন তাঁর শাসনামলে, যার মর্মান্তিক অভিঘাত আজ দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে।

আলবদরকে মানুষের মর্যাদা দেয়ার পর আব্দুল মান্নান আর ফিরে তাকায়নি। অর্থ সঞ্চয় করেছে [তার বিরুদ্ধে গম চুরির মামলার কোনো বিচার এখনো হয়নি। হয়ত আদালতে ঝুলে আছে।] টাকার তো আর কলঙ্ক নেই। জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর মান্নান এরশাদ বন্দনা শুরু করলেন। তার আর কী দোষ? সে তো সরকার সমর্থক সবসময়। সরকার বদলালে তার কী বলার আছে? আওয়ামী লীগের জনাকয়েক মন্ত্রী কি যান নি ইনকিলাব-এ? প্রখ্যাত লেখক, মুক্তিযুদ্ধের প্রবক্তা হুমায়ূন আহমদ কি লেখেননি ইনকিলাব গ্রুপের পত্রিকায়? নাকি সাক্ষাতকার দেননি। সুতরাং মান্নান যদি বলে, ভারি আমার মুক্তিযোদ্ধা আর মুক্তিযুদ্ধ? ঢাকাইয়া ভাষায় হলে 'ভারি' শব্দটি ব্যবহার না করে অন্য শব্দ ব্যবহার করত। হয়ত মান্নান তাই করে।

আলবদর, পাকি পক্ষের শক্তি সংহত করার জন্য মান্নান প্রকাশ করে 'ইনকিলাব'। ব্রিটিশ আমলে এর একটা ভালো অর্থ ছিল বিপ্লব। ব্রিটিশবিরোধী স্লোগান হলে বলা হতো, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ইনকিলাব যে অর্থে 'ইনকিলাব' শব্দটি ব্যবহার করে তার অর্থ আলবদরীয় বিপ্লব। 'ইনকিলাব'কে শক্ত ভিত্তিতে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে এরশাদের সেনা সরকার। পত্রিকাটির পুঁজি নিয়ে শুরু থেকে নানা বিতর্কমূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু কোনো সরকার তার ব্যবস্থা নেয়নি। সেনাপতিরা সবসময় সাহায্য সহায়তা করেছে ইনকিলাবকে। কয়েকদিন আগে ছয় সাবেক ডিজিএফআই ও এনএসআই প্রধান 'ইনকিলাব'-এ দীর্ঘ সাক্ষাতকার দিয়ে পত্রিকাটির সঙ্গে একমত হয়েছেন যে বাংলাদেশে সিআইএ বা কেজিবি (এখন অন্য নাম) কোন ছার পাকি আইএসআইয়েরও কোনো এজেন্ট নেই। এজেন্ট আছে ভারতীয় 'র'-এর এবং সাংবাদিক (অবশ্যই ইনকিলাব-এর ছাড়া) শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে 'র'-এর এজেন্ট গিজগিজ করছে।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের দিন প্রাক্তন ছাত্রনেতা ইসমত কাদির গামার সঙ্গে মিছিলের পিছে হাঁটছিলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনারা এরশাদের বিরুদ্ধে এত আন্দোলন করলেন। মিছিল সমাবেশ করলেন কিন্তু এরশাদের মুখপত্র ইনকিলাবের ব্যাপারে নিশ্চুপ কেন?' তিনি বললেন, 'আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আর ইনকিলাব এর চরিত্র উন্মোচিত হওয়ার পর সাংবাদিকরাও তো কখনও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি। আমরা তো কোন ছার! আসলে আমরা ও সাংবাদিকরা তো অনেকের সম্পর্কে লিখি, বিবৃতি দিই,

'ইনকিলাব'-এর অপকর্মের বিরুদ্ধে তো কখনো কেউ বিবৃতি দেইনি। এটিও এক ধরনের ভন্ডামি।

'ইনকিলাব' এভাবে সামরিকতন্ত্রে এবং গণতন্ত্রে বিকশিত হয়েছে। সব সরকারের আমলে এ পত্রিকা তুলনামূলকভাবে যেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে অন্য কোনো পত্রিকা পায়নি। বর্তমানে তথ্যপ্রতিমন্ত্রী শুধু প্রকাশ্যে পত্রিকাটির সমালোচনা করেছেন এবং বিজ্ঞাপনের নীতিমালা ঠিক করেছেন, যার ফলে 'ইনকিলাব' এ আমলেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের পত্রিকাগুলোর তুলনায় কম বিজ্ঞাপন পেয়েছে। কিন্তু পেয়েছে এবং পাচ্ছে।

'ইনকিলাব' কী ছাপে? প্রতিদিন ভারত বিরোধী একটি সংবাদ/রচনা যাতে সাম্প্রদায়িকতা যুক্ত থাকে। মুক্তিযুদ্ধের পত্রিকা তাদের কাছে 'র' কণ্ঠ। আরেকটু 'ইসলামী লেবাস' ও থাকে। মাদ্রাসা শিক্ষক থেকে ধর্মভীরু মধ্যবিত্ত, ফন্দিবাজ ও পাকিপন্থীরা এই পত্রিকাটি কেনে। কিন্তু পত্রিকাটিতে অধিকাংশ সময় থাকে অতিরঞ্জন বা তথ্য বিভ্রাট ও চরিত্র হনন। এ থেকে শেখ হাসিনা বা ডা. বদরুদ্দোজা বা সাইফুর রহমান বা সাদেক হোসেন খোকা কেউ বাদ যান না। কিন্তু চরিত্র হনন করা হয় না খালেদা জিয়া, গোলাম আযম (এখন এরশাদও অন্তর্ভুক্ত) নিজামী, সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বা আনোয়ার জাহিদদের। যে জন্য দেশদ্রোহিতার ঘটনার পর বেগম জিয়া পত্রিকাটির নিন্দা করতে নারাজ। কারণ, 'ইনকিলাব' এখন জাতীয় পার্টির নয়, বিএনপির মুখপত্র। তবে পুরো বিএনপির নয় বিএনপির অধিক পাকিপন্থী বা যাদের গায়ে রাজাকার বা আলবদরের সিলছাপ্পড় আছে তাদের। অথচ দেখুন, পত্রিকাটি ছাপে নাকি ভারতীয় মেশিনে। পত্রিকার খবরে অনুমান করলাম, ভারতীয় তামিল নাগরিককে ভিসা প্রদান না করায় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেও পিছপা হয়নি এ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ। অথচ আবার দেখুন, 'রাজনৈতিক রঙ্গালয়' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে গোলাম আযমের মামলা চলাকালীন এ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যকে 'সংবেদনশীল' ও 'অত্যন্ত বিতর্কিত' বলে উল্লেখ করেছে এবং সরকারকেও কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে। এর অর্থ বাংলাদেশ যে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, আলবদর রাজাকাররা যে খুন-ধর্ষণ করেছে এসব তথ্য 'সংবেদনশীল' ও 'বিতর্কমূলক'। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় যারা বিশ্বাস করে না, একমাত্র তাদের পক্ষেই এসব কথা বলা সম্ভব। একি অদ্ভুত নয় যে, পাকি বিশ্বাস প্রতিফলিত হয় পত্রিকায় কিন্তু ভারতীয় পণ্য বা ব্যক্তির প্রতি নমনীয়তা গোপনে!

দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যখন কয়েক বছর আগে 'ইনকিলাব' এর বিরোধিতা করে বক্তব্য দিয়েছিলেন তখন আওয়ামী লীগের অনেক নেতা আমাদের বলেছিলেন, আমরা একটি পত্রিকার বিরুদ্ধে লিখে বাড়াবাড়ি করছি। আমরা

বলেছিলাম ও লিখেছিলাম যে, ইনকিলাব কোনো পত্রিকা নয়। পত্রিকার এথিকস না থাকলে কি পত্রিকা? ইনকিলাব স্বাধীনতাবিরোধীদের একটি প্লাটফর্ম। আজ দেরিতে হলেও অনেক রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী সচেতন হয়েছেন এবং দেখছেন আরে কথাটা তো সত্যি! আসলে, গণতন্ত্রেরও একটি সীমা থাকে। গণতন্ত্র মানে এই নয় স্বাধীনতাবিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা জাতীয় মূল্যবোধকে অস্বীকার করা, সহ্য করা। ইনকিলাবে এর আগে অনেক প্রবন্ধে কি লেখা হয়নি, জাতীয় সঙ্গীত বদলানো হোক? আজ দেখলাম, কিছু সাংবাদিকও বলছেন, জাতীয় সঙ্গীত ধর্মগ্রন্থ নয় যে বদলানো যাবে না। একদম ঠিক। বাবা-মাও ধর্মগ্রন্থ নয় যে প্রয়োজনে তাদের বদলানো যাবে না। ইনকিলাব কি সব সময় লেখে না মোনায়েম খান শহীদ। এ ধরনের উদাহরণ কত দেব! এ পর্যন্ত মিথ্যা খবর ছাপিয়ে ইনকিলাব অসংখ্যবার ক্ষমা চেয়েছে। এই হাইকোর্টও তাকে সতর্ক করে দিয়েছে (যদি স্মৃতি প্রতারণা না করে থাকে)।

অন্য কোনো দেশ হলে এ পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রাখা সম্ভব হতো না। কিন্তু এ দেশে সম্ভব হয়েছে। কারণ, সেনাশাসনের দু'দশক *ইনকিলাব* জেনারেলদের সমর্থন পেয়েছে। কোনো জজ আজ পর্যন্ত পত্রিকাটিকে সুয়োমোটো করেছেন কিনা জানি না। দেশদ্রোহী বা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধবিরোধী কোনো সংবাদ/রচনার জন্য অন্য যাদের ক্ষেত্রে সুয়োমোটো করা হয়েছে তাদের অপরাধের মাত্রা কি ইনকিলাব সম্পাদক থেকে বেশি? এ প্রশ্নও আজ চলে আসছে। কোনো এ্যাটর্নি জেনারেলও পত্রিকার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেননি। কোনো পত্রিকা সম্পাদকও মধ্যরাতে জামিন পাননি। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এবং জনাব খসরুর মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিচারকদের বিজ্ঞাপন এখনো ছাপা হয় *ইনকিলাব*-এ। সত্যি ঈর্ষাযোগ্য ভাগ্য।

'ইনকিলাব' কেন সবার আশ্রয় পায়? তার একটি কারণ, আমাদের মূল্যবোধ খানিকটা পরিবর্তিত হয়েছে। সমাজে বা রাষ্ট্রের যে কেউ যে কোনো উপায়ে অর্থ ও পেশী শক্তি অর্জন করেছে, সমাজ রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগ তাকে আশ্রয় দিয়েছে। হ্যাঁ রাজনীতিবিদরাও। এখানে অন্য কোনো প্রশ্ন আসেনি, জনগণ খুব কম ক্ষেত্রেই সে রকম আশ্রয় পেয়েছে। মাঝরাতে জামিন দেয়াটা ব্যাপার নয়। বড় ব্যাপার হলো, একমাত্র *ইনকিলাব* যার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয়েছে তাকেই জামিন দেয়া হয়েছে। মাঝরাতে অন্য কাউকে জামিন দিলে হৈ চৈ হয়ত হতো না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে রাষ্ট্রদ্রোহিতা কি প্রমাণিত হয়েছে যে উনি জামিন পাবেন না? এ কারণেই ইনকিলাব-এর সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত তুলে ধরা হলো। প্রতিদিন যা দৃশ্যমান তা প্রমাণ করতে হবে কেন আমাদের? এতে কি আদালতের কোনো দায়িত্ব নেই? আর একটি বিষয় উল্লেখ্য আজকাল দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে কোনো আলোচনা হলেই

সে সম্পর্কে আদালত প্রশ্ন রাখছে। আদালত অবশ্যই তা পারে। আদালত অবমাননার কথা আসছে। সংবিধানের কোথায় লেখা আছে একজন নাগরিক তার মতামত প্রকাশ করতে পারবে না? অবস্থাটা এমন দাঁড়াচ্ছে যে, ভয়েই কিছু লেখার সাহস পাই না যদি আদালতে দাঁড়াতে হয়। কারণ, এ পর্যন্ত আদালত অবমাননার মামলায় কতবার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের পত্রিকাকে দাঁড়াতে হয়েছে আর কতবার দাঁড়াতে হয়েছে স্বাধীনতাবিরোধী পত্রিকাকে। অবশ্য কোনো নাগরিক যদি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও বিপক্ষের লোক চিহ্নিত করতে না পারেন সে অন্য কথা। রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচারালয় বা ব্যবস্থা একটি। অন্য দু'টি কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করার অধিকার আমার থাকবে, অন্যটির থাকবে না, সংবিধানে এমন কোনো বাক্য নেই। অবশ্য আদালত যদি এখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার ব্যাখ্যা চান তবে নিরুত্তরই থাকব। ইনকিলাব যখন পাকিমনের ঝান্ডা উড়িয়ে চলছে তখন সমাজের অধিকাংশ আমরা তো নীরবই থেকেছি। কারণ ভেবেছি সব শক্তিশালী কেন্দ্র যাকে আশ্রয় দেয় তার বিরুদ্ধে কলিমদ্দি ছলিমদ্দি কী করবে? তাছাড়া ঐ যে '৭১-এ যারা জবেহ করেছিল, তারা ও তাদের ভক্তরা যে শুধু সমাজ নয়, রাষ্ট্রের সব জায়গায়ই আছে এ কথা এখন অনেকেই বিশ্বাস করছে। '৭১-এর পরও তারা জবেহ করেছে এবং জবেহ করা পার্টিদের নিয়েই তো চারদল গঠিত হয়েছে।

শুধু তাই নয় মানুষ পাকিমনের ব্যক্তিরা দেখছে টেবিল চাপড়ালেই হয়। সবাই বিব্রত বা নিশ্চুপ হয়ে যায়। তবে সবশেষে বলব যে, সুস্থ রাজনীতিতে যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি সমর্থন বা নমনীয়তা যে অন্তিমে ফলদায়ক নয় তা আওয়ামী লীগ যেমন মনে হয় এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছে তেমনি বিএনপির সাদেক হোসেন খোকা ও তাঁর কর্মীরাও অনুধাবন করছেন। এঁরা সবাই যদি স্থির থাকেন তবে সমাজ রাষ্ট্রে অনেকটা স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। পৃথিবীর ইতিহাসে নেই যে অশুভ কখনো শুভ-এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তাহলে তো সমাজ রাষ্ট্র থাকত না। আর সব সময় টেবিল চাপড়িয়ে পার পেলে মুক্তিযুদ্ধও হতো না এবং হ্যাঁ, তা না হলে আমরা অনেকে যেমন অধ্যাপক, পত্রিকা মালিক বা সম্পাদক হতাম না তেমনি অনেকে জর্জও হতেন না।

২০ নভেম্বর, ২০০০

বিজয়ের মাসে পাকি বাংলা সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ

শুরু হলো বিজয়ের মাস। বিজয়ের ত্রিশ বছর পুরো হতে চলল। মাসটি আনন্দের হলেও বারবার মনে পড়ে এ মাসে হত্যা করা হয়েছিল অগণিত বাঙালি পেশাজীবীকে, যাঁদের মধ্যে ছিরেন দেশের অনেক বরেণ্য সন্তান। আমাদের অনেকের শিক্ষক।

১৯৭১ সালে বিজয়ের মাসের কিছুদিন আগে পাকিদের সহযোগী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামের সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে গঠিত হয় আলবদর বাহিনী। উদ্দেশ্য, বাঙালি পেশাজীবীদের নিধন, যাতে নবীন রাষ্ট্র মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। আলবদর বাহিনী গঠিত হওয়ার পর তাদের কাজ শুরু করে এবং ডিসেম্বরে তাদের হত্যাযজ্ঞ তুঙ্গে উঠে। এ মাসেই ঢাকার রায়ের বাজার, মিরপুরে শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের হত্যা করা হয়। এই বাহিনীর প্রধান ছিল তৎকালীন জামায়াতের তরুণ নেতা মতিউর রহমান নিজামী। সেই নিজামী আজ জামায়াতের নতুন আমির। সংবাদপত্রে দেখেছি ৭ ডিসেম্বর নিজামী নতুন আমির হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বিজয়ের ত্রিশ বছর পর পাকিদের দোসর জামায়াত আবার বাঙালিদের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিল নতুন চ্যালেঞ্জ– আলবদর নেতাকে প্রধান করা হয়েছে এই বিজয়ের মাসে এবং সে আমিরী গ্রহণও করবে এই মাসে। দেখি তোমাদের মুরোদ। কই? বিবৃতি পর্যন্ত। তাই বিজয়ের মাসেও নিতান্ত নিরানন্দ মন নিয়ে এই লেখা লিখছি। প্রতি ডিসেম্বর আমার শিক্ষকদের স্মরণে একটি লেখা লিখি। এঁদের খুন করেছিল নিজামীর নেতৃত্বে আলবদর বাহিনী। এই নিজামী আজ শুধু জামায়াতের আমীরই নয় চারদলীয় জোটেরও একজন নেতা। এখন জোটে বস্তুত বেগম জিয়ার সেকেন্ড ইন কমান্ড। বেগম জিয়া আবার মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন। আমি বলব, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বস্তুত তামাশাই করছেন। নয়ত 'ইনকিলাব' সম্পর্কে বেগম জিয়া কীভাবে বলেন, 'ইনকিলাবের বিরুদ্ধে আক্রমণ আমাদের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ।" [*ইনকিলাব*, ৫ জুন, ১৯৯৭] পাকিপন্থীদের প্লাটফর্ম, দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত *'ইনকিলাব'* হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষে! কয়েকদিন আগে পাকি ডেপুটি হাইকমিশনার যে বাঙালিদের গালিগালাজ করল তার বিরুদ্ধে সবাই প্রতিবাদ জানালেও বিএনপি-জামায়াত চুপ। সব পত্রিকা সোচ্চার হলেও 'ইনকিলাব' নিশ্চুপ। এ ধরনের ঘটনা বাংলাদেশেই সম্ভব এবং

বাঙালিদের একাংশই এর জন্য দায়ী। বাঙালির বহু অর্জন এসব মানুষের জন্যই নিষ্প্রভ হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। বাংলাদেশে যখন এভাবে পাকি বাঙালের সৃষ্টি হয় তখন দেশের নামকরণই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে।

১৯৭১-এর পর যাদের জন্ম তাদের বয়সও এখন ত্রিশের কোঠায়। একাত্তরের অনেক ঘটনা হয়ত তারা জানেন না বা আমল দিতে চান না। তাদের কাছে পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানার খন্দকার লুৎফর রহমানের পুত্র মতিউর রহমান নিজামী হয়ত নিছক একজন রাজনৈতিক নেতা, রাজনীতিবিদ। কিন্তু কেমন রাজনীতিবিদ? সে পরিচয়ও আমি তুলে ধরব। মতিউর রহমান নিজামী আপাদমস্তক পাকিস্তানি। ১৯৭১ সালে আলবদর প্রধান হওয়া শুধু এর প্রমাণ নয়। এখনো তিনি যা বলেন তাতেও পাকি পাকি ভাবটা চরম মাত্রায় থাকে। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে খুনীদের বাহিনী আলবদরের প্রধান নিজামী ঘোষণা করেছিলেন—"আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে, পাক বাহিনীর সহযোগিতায় এ দেশের ইসলামপ্রিয় তরুণ সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আলবদর বাহিনী গঠন করেছে। সেদিন আর খুব বেশি দূরে নয় যেদিন আলবদরের তরুণ যুবকরা আমাদের (অর্থাৎ পাকি) সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে (অর্থাৎ ভারতীয়) পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্তানের অস্তিত্বকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।" তা সারা বিশ্ব বাদ যাক, হিন্দুস্তানের অস্তিত্ব দূরে থাকুক, পাকিস্তানের অস্তিত্বই শেষ হয়ে গেল। 'হিন্দু বাহিনী'র ডাণ্ডা খেয়ে নিজামীরা তখন বাপ বাপ বলে গর্তে লুকিয়েছিল এবং লুকোবার আগে পাকিদের কাছে থেকে পাওয়া অস্ত্র দিয়ে নিরীহ বাঙালিদের খুন করেছিল। এ জন্য আলবদর আর মানুষে পার্থক্য আছে। এই আলবদরদের গর্ত থেকে টেনে এনে নিজের দোস্ত বলে ঘোষণা করেছিল আজকের বিএনপির স্রষ্টা অব. লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান। যে কারণে বিএনপি-জামায়াত আবার জোট বেঁধেছে। গণতদন্ত কমিশন, অনুসারে—"মতিউর রহমান নিজামীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তার এলাকাবাসীও হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, নির্যাতন ইত্যাদি অভিযোগ এনেছেন।

পাবনা জেলার বেড়া থানার বৃশালিকা গ্রামের আমিনুল ইসলাম ডাবলু গণতদন্ত কমিশনকে জানিয়েছেন, তাঁর পিতা মোঃ সোহরাব আলীকে একাত্তরে নিজামীর নির্দেশেই হত্যা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, নিজামীর নির্দেশেই তাঁদের এলাকার প্রফুল্ল (পিতা ঃ নয়না প্রামাণিক), ভাদু (পিতা ঃ ক্ষিতীশ প্রামাণিক), মুন (পিতা ঃ ফেলু প্রামাণিক) এবং ষষ্ঠী প্রামাণিক (পিতাঃ প্রফুল্ল প্রামাণিক)কে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার কয়েকজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীও রয়েছে বলে তিনি জানান।" এ রকম আরো অনেক বিবরণ আছে গণতদন্ত কমিশনে।

বিএনপি জোটের সেকেন্ড ইন কমান্ড একজন ঘাতক হতেই পারে, তাতে আমাদের বলার কিছু নেই। সাধারণের কাছে প্রশ্ন, একজন রাজনীতিবিদের কাছে আপনারা কী চান? নিশ্চয় আশা করেন, তিনি যা বলেন, তাই করেন, ওয়াদার বরখেলাপ করেন না। অর্থাৎ মোনাফেক নন। বিএনপি কর্মীরা না হয় একজন ঘাতককে মেনে নিল নেতা হিসেবে, কিন্তু তারা কী এমন একজনকে মানবে যে অহরহ বিএনপিকে গালিগালাজ করে। আলবদর নিজামী যে ভাষায় বিএনপিকে গালিগালাজ করেছে আর কেউ তা করেছে কিনা জানি না। আজ নিজামী আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যে ভাষায় কথা বলছে কয়েক বছর আগেও ঠিক একই ভাষায় কথা বলেছে বিএনপির বিরুদ্ধে, যা হয়ত অনেকের জানা নেই। কয়েকটি উদাহরণ দেই–

১. "মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, এ সরকারকে অক্সিজেন দিয়ে আর কতদিন বাঁচানো যাবে? জাতি আজ চরম হতাশায় ভুগছে।" *(দৈনিক জনতা* ১৬-১১-৯১)।

২. "ক্ষমতায় গিয়ে বিএনপি দলীয় নেতাকর্মীদের আর্থিক সুবিধা দেয়ার জন্য দুর্নীতিকে দ্বিগুণ গতিতে চালিত করেছে।" (*ভোরের কাগজ,* ১১.৭.১৯৯৩)।

৩. "বর্তমান বিএনপি সরকার ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের তৎপরতা চালাচ্ছে।" (*দৈনিক মিল্লাত,* ২৫.৯.১৯৯৩)।

৪. "সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্রদল ফ্যাসিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ"। (ঐ, ২৬.১০.১৯৯৩)।

৫. "বিএনপি সরকার ও ছাত্রদল কসাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।" (*দৈনিক সংগ্রাম,* ২৪.২.১৯৯৫)।

৬. "সন্ত্রাসীদেরকে যে আগুন জ্বালানোর সুযোগ দিয়েছেন সে আগুনেই তারা আপনাদের ও দেশবাসীকে জ্বালিয়ে মারবে।" (দৈনিক জনতা ২৮.১১.৯৫)।

চারদলীয় জোটের সেকেন্ড ইন কমান্ড বলছে, কমান্ডার অর্থাৎ বেগম জিয়া ক্ষমতায় এলে–

১. ইসলামবিরোধী অনৈতিক কাজকর্ম শুরু হবে,

২. ছাত্রদল ফ্যাসিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে,

৩. দেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে যাবে,

৪. ছাত্রদল ও বিএনপি কসাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। নিজামীর এসব বিষয়ে ভালো জানার কথা। কারণ ১৯৭১ সালে জামায়াত ইসলামবিরোধী ও ফ্যাসিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আলবদরদের ভূমিকা ছিল কসাইয়ের। না, এখানেই শেষ নয়, নিজামী আরো ঘোষণা করেছিল, "আমরা বর্তমান সন্ত্রাসী সরকারের জানাজা পড়তে চাই।" (দৈনিক বাংলার বাণী, ২৪.১০.৯৫) এবং "৫

বছরের দুঃশাসনে জনগণের মধ্যে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বিএনপি কোনো বিশ্বস্ত রাজনৈতিক শক্তি নয়।" (সংগ্রাম, ২৪.৩.৯৬)।

যে বিএনপির জানাজা পড়তে উদগ্রীব নিজামী, যে বিএনপিকে নিজামী মনে করে বিশ্বস্ত নয়, সে বিএনপির সঙ্গে যাওয়া কেন? মোনাফেক শব্দটির অর্থ দেখার দরকার আছে? ত্রিশের কোঠার তরুণ-তরুণীদের জিজ্ঞাসা, এ ধরনের রাজনীতিবিদেরই কি আপনারা ক্ষমতায় দেখতে চান? বা এদের নেতৃত্বে চলতে চান?

যদি চারদলীয় জোটকে আপনারা ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসান তা হলে জোটের সেকেন্ড ইন কমান্ড নিজামী হয়ত দায়িত্ব পাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। তার যে মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরলাম তাতে অনুমান করুন কী ঘটতে পারে এদেশে। নতুন নামে আলবদর বাহিনী তৈরি হবে, ভিন্নমতাবলম্বী সবাইকে খুন করা হতে পারে। বিএনপির নেতাকর্মীদের জেলে যেতে হবে (দ্রষ্টব্য) ঃ পূর্বোল্লিখিত তার মন্তব্যসমূহ)। মুনীরুজ্জামান ঠিকই লিখেছেন, জামায়াতের আমীর যেই হোক, নীতিটা হবে গোলামের। অর্থাৎ প্রভু পাকিদের। কিছুদিন আগেও নিজামী পাকিপন্থী কাগজ ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বলেছে, "যারা '৪৭ পূর্ব সীমানায় ফিরে যেতে চায়, তারা ইনকিলাবের বিরোধিতা করে।" নিজামীরা চায় '৪৭-এর পাকিস্তান। তারা যে নতুন পাকি-বাংলা জাতি সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে, ক্ষমতায় গেলে তা সফল করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

এ কারণে নিজামী আমীরত্ব গ্রহণ করবে ৭ ডিসেম্বর। এই কারণেই বিজয়ের মাসের শুরুতেই পাকি ডেপুটি পাকিদের কথা আবার বলেছে প্রকাশ্যে। এ কারণেই বিজয়ের মাসের আগেই ইনকিলাব বিকৃত প্যারোডি ছাপিয়েছে জাতীয় সঙ্গীতের। আর পাকিস্তান বলেছে পুরনো কথা ভুলে যেতে, যা সব সময় বলে বিএনপি এবং জামায়াত। আর এ কারণেই পাকি ডেপুটির আচরণের কোনো প্রতিবাদ করেনি চারদলীয় ঐক্যজোট। বিজয়ের মাসেই তারা পাকি-বাংলা আন্দোলনের শুরু করছে। বিজয়ের মাসে বাঙালিদেরই তাই নির্ধারণ করতে হবে তারা কী করবে?

১ ডিসেম্বর, ২০০০

তাহলে কি বাংলাদেশ হয়নি?

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, সাধারণত সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাদের সম্পর্কিত কোনো সংবাদ/রচনার প্রতিবাদ করে না। হয় তারা মনে করে, সংবাদপত্রের এসব বিষয় উপেক্ষা করা উচিত অথবা প্রকাশিত সংবাদ সত্য। তাই জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক যখন জামায়াতের একটি প্রতিবাদলিপি আমার হাতে তুলে দিলেন তখন বিস্মিত হলাম। জামায়াতের প্রচার সম্পাদক যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার প্রতিবাদ। *জনকণ্ঠে* ১ ডিসেম্বর প্রকাশিত আমার লেখা ভাষ্য 'পাকি-বাংলা সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ'-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদটি পাঠানো হয়েছে।

জামায়াত মনে করেছিল, গোলাম আযমের পরিপ্রেক্ষিতে নিজামীকে আমীর করলে হত্যাকারী বা ঘাতকদের দল হিসেবে জামায়াতের যে ইমেজ তার পরিবর্তন হবে। কিন্তু প্রতিবাদলিপিটি পড়ে মনে হলো, তারা এখন এ বিষয়ে শঙ্কিত। কারণ, বোঝা যাচ্ছে, নিজামীকে আমীর করেও জামায়াতের ইমেজের কোনো পরিবর্তন হবে না।

বৃহস্পতিবার গোলামের নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজামী জামায়াতের আমীরত্ব গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয় সে সূত্রে চার দলে বেগম জিয়ার পর সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবেও তিনি অভিষিক্ত হলেন। কিন্তু নিজামী যে ঘাতক সে পরিচয় মোছা যাবে কীভাবে? শুধু ঘাতক নয়, আলবদর। তার নতুন পরিচয় হবে জামায়াতের আমীর আলবদর নিজামী। কারণ, আলবদর আর মানুষের পার্থক্য আছে। মওলানা শব্দটি মানুষের নামের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

আমার লেখাটির দু'টি অংশ ছিল। একটিতে আলবদর নিজামীর ঘাতক জীবনের বর্ণনা। অন্যটি বিএনপি সম্পর্কে তার বিষোদগার। কাদের মোল্লা প্রথম অংশটিকে শুধু 'ভিত্তিহীন অসত্য বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, গণতদন্ত কমিশনে নিজামীর বিরুদ্ধে যে সব হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ তোলা হয়েছে সেগুলো হত্যা নয় এবং 'মুনতাসীর মামুনের শিক্ষকদের হত্যার' সঙ্গে নিজামীর কোনো সম্পর্ক নেই।

কাদের মোল্লা লিখেছেন, "এ ব্যাপারে আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো– ১৯৭১ সালে আলবদর বাহিনী গঠিত হয়েছিল তদানীন্তন পাকিস্তান সামরিক সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এখানে বেসামরিক কোনো ব্যক্তির কোন ধরনের কোনো

কর্তৃত্ব ছিল না। কাজেই মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর আলবদর প্রধান হওয়ার ও তার নেতৃত্বে.... কোনো হত্যাকাণ্ডের প্রশ্ন আসে না। আলবদর কী ছিল, আমাদের জেনারেশনের কারো অজানা নয়। নতুন প্রজন্মের জন্য শুধু উল্লেখ করছি আলবদররা ছিল ডেথ স্কোয়াড। রাজাকার বাহিনীর পর পরই এটি গঠিত হয়। তবে রাজাকার অধ্যাদেশের মতো কোনো আইনগত বিধান এর ভিত্তি নয়। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনীর প্রেরণায় এরা সংগঠিত হয় এবং হানাদার বাহিনীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল গভীর। বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনে যানবাহন যুগিয়েছে হানাদার বাহিনী। রাও ফরমান আলীর নোটে আলবদরদের উল্লেখ আছে এবং নিজামী ছিলেন সারা পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর প্রধান।

সুতরাং কাদের মোল্লারা তা অস্বীকার করেছেন কীভাবে? নিজামী ১৪ নভেম্বর ১৯৭১ সালে এ বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে পরিস্কারভাবে এ সবের উল্লেখ আছে। কাদের মোল্লা কেন তা উল্লেখ করলেন না?

নিজামী যে নিষ্পাপ তার উদাহরণ দিয়ে কাদের মোল্লা বলেছেন– ১৯৮৬, '৯৬ সালে নিজামী সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু কেউ তার বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগ তোলেনি। '৮৬ সালে দেশের শাসক ছিলেন এরশাদ যিনি রাজাকারদের পক্ষের লোক। '৯১ সালে বিএনপি জিতেছে। নিজামীও জিতেছে। এরশাদ ও বিএনপির ভয়ে কেউ এসব অভিযোগ ওঠায়নি। কিন্তু বিএনপির পতনের পর এলাকার মানুষ আলবদরভীতি থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে নিজামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে প্রচারপত্র বিলি করে। নতুন প্রজন্মের ভোটাররাও তাতে প্রভাবিত হন। ফলে ১৯৯৬ সালে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ জয়লাভ করেন। সুতরাং কাদের মোল্লার অভিযোগ এক্ষেত্রে সত্যি নয়। রাজাকারদের সঙ্গে আলবদরদের খানিকটা তফাত ছিল। রাজাকাররা সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতা করেছে। সংঘর্ষ হলে খুন হয়েছে, লুটপাট ও ধর্ষণ করেছে। অনেকে যুদ্ধকালীন দুরবস্থার কারণে বাধ্য হয়েও রাজাকার হয়েছে। কিন্তু আলবদরদের লক্ষ্য ছিল স্থির। পাকিস্তান ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব তারা স্বীকার করেন না। প্রকৃতিতে তারা ছিল অতীব হিংস্র ও নিষ্ঠুর। তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছে। কারণ তারা অনুমান করেছিল, যে শাসন তারা করতে চায় বুদ্ধিজীবীরা হয়ে উঠবে তার প্রধান প্রতিবন্ধক। সামনের নির্বাচনে চার দল ক্ষমতায় এলে, নিজামীর নেতৃত্বে যে '৭১-এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? কারণ, '৭১-এর জামায়াতের অবদান হত্যা ধর্ষণ ও লুট, '৭১-এর পর অবদান রাজনীতিতে রগ কাটার প্রচলন– যা এক ধরনের হত্যা। আমাদের আরো মনে রাখা দরকার '৭১ সালে আলবদর ছাত্ররাই তাদের শিক্ষকদের নিয়ে হত্যা করেছিল।

নিজামী যদি আলবদর এবং আলবদরপ্রধান হয়ে না থাকেন তাহলে আমাদের

বিশ্বাস করতে হবে বাংলাদেশ হয়নি। আর প্রমাণ? বাস্তবে যা ঘটেছে তার আবার কী প্রমাণ দিতে হবে? আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে যে বাংলাদেশ হয় নি? আমাদের ভাষা যদি মিথ্যা হয় তাহলে নিজামী আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করুক।

এখানে আরো উল্লেখ্য, আমার ভাগ্যে উল্লেখ করেছিলাম, নিজামী বিএনপিকে ইসলামবিরোধী, দুর্নীতিবাজ, ফ্যাসিবাদী দল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো ঘোষণা করেছিলেন, "বিএনপি সরকার ও ছাত্রদল কসাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।" কাদের মোল্লা এসবের কোনো প্রতিবাদ করেননি। তাহলে এসব সত্যি? সুতরাং আমাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কসাই ও রগ কাটাদের দল? বাংলাদেশের ভবিষ্যত কী অনুধাবন করতে পারছেন, প্রিয় পাঠকবৃন্দ?

৮ ডিসেম্বর, ২০০০

গিকা চৌ এটা কী বললেন!

গিয়াস কামাল চৌধুরী অনেকদিন পর মুখ খুলছেন। অনেকের ধারণা তিনি মুখ খুললেই একটা না একটা ঘটনা ঘটে যায়। অবশ্য কথাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তিনি মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ এ কারণে যে, বিএনপি 'থিংক ট্যাঙ্ক' কী চিন্তাভাবনা করছে, গত শুক্রবার খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তিনি তা প্রকাশ করেছেন। পরদিন শত নাগরিক কমিটির বুদ্ধিজীবীরাও প্রস্ফুটিত হয়ে তাঁদের দলের চরিত্রটি স্পষ্ট করে তুলেছেন। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকার আর কোনো যৌক্তিকতা নেই।

গি.কা. চৌধুরী বলেছেন, "পৃথিবীর কোথাও মুসলমানদের পরাজয়ের চিহ্ন নেই। ছিল শুধু এই দেশে। সেই চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য রাষ্ট্রপতি জিয়া এখানে শিশু পার্ক তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন।" (*যুগান্তর* ৯.১২)।

এটি যে পিলে চমকানো কোনো তথ্য তা নয়। জিয়া যখন এখানে শিশু পার্ক করেন তখনই এই প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু সেনা সামন্ত নিয়ে তখন তিনি ক্ষমতায়, এসব প্রশ্ন ওঠানোর সাহস কারো হয়নি। আরেকটি বিষয় সমাজের এটা বড় অংশ এ ধরনের ধারণায় বিশ্বাস করেনি। কারণ জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে একটি সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। তাঁরা কেউ তখন উল্লেখ করেননি, শিশু পার্ক নির্মাণ এখানে জরুরি হয়ে পড়ল বিজয়স্তম্ভ নয় কেন?

কয়েক বছর আগে শেখ হাসিনার উদ্যোগে যখন স্বাধীনতাস্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে, তখন এর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এক অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় এ প্রসঙ্গ উঠেছিল। শুধু তাই নয়, বিজয়স্তম্ভের পাশে এ ধরনের শিশু পার্ক হয় না। আর নিয়াজীর আত্মসর্ম্পণের জায়গাটি বোঝা যায় জোর করে পার্কের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যার দরকার ছিল না। এ কারণে প্রস্তাব করা হয়েছিল, আরো বড় জায়গায় আরো আধুনিক শিশু পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হোক। শেখ হাসিনা রাজি হননি। যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, এক প্রেসিডেন্ট তা নির্মাণ করেছেন। সেটি থাকুক। বিসদৃশ শিশু পার্ক হয়ে গেল। আজ গি. কা. শিশু পার্কটির জন্মরহস্য উন্মোচন করলেন।

গি. কা. আরো বলেছেন, "জিয়াউর রহমান চান নি স্বাধীন বাংলাদেশে একজন মুসলমানের পরাজয়ের চিহ্ন থাকুক। সে জন্য পাকিস্তানী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়াজী যে স্থানে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন সেখানে শিশু পার্ক

স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ, নিয়াজী একজন মুসলমান।"

আগে অনেকে বলেছেন। লিখে ইঙ্গিত করেছেন যে, বাধ্য হয়ে জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। ২৫ মার্চ রাতেও তো তিনি সোয়াত জাহাজের দিকে যাচ্ছিলেন অস্ত্র নামাতে। আর পাকিরা তাঁকে বিশ্বাস করত দেখেই তো সে দায়িত্ব দিয়েছিল। তাঁর ওপরালা বাঙালিদের তো আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জনতার বাঁধার সম্মুখীন হয়ে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। এসব বিশ্বাস করিনি। কারণ ন'মাস তো তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই ছিলেন। কিন্তু গি. কা. চৌধুরীর কথা শুনে মনে হচ্ছে, সত্যিই তো পাকিদের আস্থাভাজন না হলে ঐ সময় কোনো বাঙালি অফিসারকে অস্ত্র খালাসের জন্য পাঠানো হতে পারে, বিশেষ করে যে অস্ত্র ব্যবহৃত হবে বাঙালি হত্যায়। বোঝা যাচ্ছে, বাধ্য হয়েই যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সাবেক কমান্ডারের অবমাননার তার ভালো লাগেনি। তাই সেই স্মৃতিচিহ্নটি মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। হায়, কতভাবেই না আমরা প্রতারিত হই। গি. কা. চৌ. এটাই বলতে চেয়েছেন জিয়াউর রহমান পাকিদের হয়ে কাজ করেছেন বা এজেন্ট হিসেবেই যুদ্ধে গিয়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে, না হলে ক্ষমতায় গিয়েই কেন তিনি প্রথম জামায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা বাতিল করলেন, কেন আলবদর ও রাজাকারদের মন্ত্রী করলেন, আর কেনইবা সংবিধানের মূলনীতি পাল্টালেন?

গি. কা ঘোষণা করেছেন, "এটাই [অর্থাৎ পাকিস্তান তত্ত্ব] বিএনপির মূল অন্তর্নিহিত শক্তি। এ জন্যই বিএনপি তিনবার নির্বাচিত হতে পেরেছিল।" প্রথম বাক্যটির ব্যাপারে এখন আর আমরা দ্বিমত পোষণ করব না। দ্বিতীয় বাক্যটিতে একটু ঝামেলা আছে। প্রথমবার বন্দুকের জোরে ক্ষমতা করায়ত্ত করা হয়েছে, দ্বিতীয়বার ঐ বন্দুক পাশে রেখেই ক্ষমতা পাওয়া গেছে। তৃতীয়বার বিএনপি জিতেছে যদিও লাহোরের 'ফ্রাইডে টাইমস'-এর খালেদ আহমদ তাঁর পত্রিকায় লিখেছিলেন, নির্বাচনের ঠিক আগে নাকি সেনাপ্রধান ঢাকা আসেন এবং বিএনপি যাতে ক্ষমতায় যায় সে জন্য ১০ কোটি টাকা হস্তান্তর করেন সে সময়ের ক্ষমতাধর একজনের কাছে। খালেদ ব্যক্তিটির পদমর্যাদা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি তা থেকে বিরত থাকলাম এ কারণে নয় যে তিনি এখন আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, খালেদ কোন প্রমাণের ভিত্তিতে (নিশ্চয় প্রমাণ ছাড়া এমন কথা লেখার সাহস হবে না, যে দেশের ওপর আল্লাহ, নিচে মিলিটারি) তা লিখেছেন তা আমি জিজ্ঞাসা করিনি। সরকার ইচ্ছা করলে খোঁজখবর করতে পারেন।

গি. কা চৌধুরী আরো লিখেছেন, "পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে।" এ বক্তব্য কিছু নয়। রাজাকারী চিন্তার ধারকদের এটাই থিম সং। তিনি আরো বলেছেন, "ভাষা আন্দোলনের প্রয়োজন হতো না। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে বুঝিয়ে বললেই হতো। মনে

হচ্ছে গি. কা. র তুলনায় জিন্নাহ নেহায়েত বালক ছিলেন। একুশে সম্পর্কে হীন উক্তি বা জিন্নাহ সম্পর্কে মন্তব্যে ভাববেন না যে, বছর কয়েক আগে মস্তিষ্কের প্রবল রক্তরক্ষরণে যে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন তার রেশ রয়ে গেছে। না, তাই নেই। একুশে পদকটি তিনি যত্ন করেই রেখেছেন, টাকাটিও। তা প্রত্যর্পন করেননি।

এতদিন জানতাম, ডিসেম্বর এলে জামায়াতীদের মনস্তাপ হয়, পাগল পাগল লাগে। কেন? তা বোঝা দুষ্কর নয়। গত ত্রিশ বছর চেষ্টাচরিত্র করেও বাংলাদেশকে পাকিস্তান করা যাচ্ছে না। এটি কী কম দুঃখ? জামায়াতের সমান্তরালে বিএনপি ও জাপা এরশাদ পাকি চর্চা শুরু করেছিল। কিন্তু তবুও জামায়াত থেকে তাদের খানিকটা পার্থক্য করা হতো। কারণ দু'দলে এমন অনেকে ছিলেন এবং আছেন, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু গত দু'মাসে বিশেষ করে ডিসেম্বরে এমন সব ঘটনা ঘটছে যাতে মনে হচ্ছে, এই তিনটি দলের আলাদা অস্তিত্বের কোনো দরকার নেই। দলপতিদের চেয়ে তাঁদের সমর্থক বুদ্ধিজীবীরাই তা বলছেন।

গি. কা. র উক্তি, আলবদর নিজামীর বিজয়ের মাসে আমীরত্ব গ্রহণ ছাড়া এ মাসে পাকি রাজা বাংলাদেশ সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি করার পর বিএনপি সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ও এসব দলের মুক্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণ নির্বাক ছিলেন। এখন বোঝা যাচ্ছে, পাকি সেনাপতির মৃত্যু হলে কেন বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী হয়েও শোকবার্তা পাঠান, যা বিশ্বের আর কোনো সরকারপ্রধান পাঠান নি। কেন আলবদর প্রধান নিজামীকে সেকেন্ড ইন কমান্ড করেন এবং ব্যাক হিসাবে রাখেন দেশের দু'নম্বর জেলখাটা প্রেসিডেন্ট নিশান ই হায়দার এরশাদকে। যদিও এরশাদ বলেছিলেন, "খালেদা জিয়া আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল।" [*ইত্তেফাক*, ১৭.১.৯৭]।

এখন আর এগুলোকে পাগলামি হিসেবে গ্রহণ করার সময় নেই। বিএনপির থিঙ্ক ট্যাঙ্কের একজন, ঢাবির একজন অধ্যাপক আফতাব আহমদ গত পরশু এক সভায় উচ্চৈঃস্বরে বলেছেন, "জাতীয় সঙ্গীত কি ঐশীবাণী যে পাল্টানো যাবে না।" [*জনকণ্ঠ* ১০.১২] আমরা জানি, কোরান ছাড়া সব কিছুই পাল্টানো যায়, প্রয়োজনে পিতামাতাও। এটা যার যার অভিরুচি।

তিনি আরো বলেছেন, "হিন্দু রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত।" তিনি ঢাবির অধ্যাপক, কিছু বলতেও ভয় করে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকই পদাধিকারবলে পণ্ডিত এবং বুদ্ধিজীবী। তা রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন না, ছিলেন ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মরা হিন্দু ধর্মকে অস্বীকার করে বেরিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা নিরাকার ঈশ্বর নিয়ে।

মানুষ চেয়েছিল, বাংলাদেশ হয়েছিল। আফতাবরা নয়, মানুষ চাইলে জাতীয় সঙ্গীত কেন দেশও বদলাবে। 'পাক সরেজমিন' এখনও পাকিদের জাতীয় সঙ্গীত। মাস কয়েক আগে তিনি লিখেছিলেন, '৪৭-এর স্পিরিটই ঠিক। 'পাক সরজমিনে

শাদ বাদ'ও ঠিক। এটি হরদম তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে গাইতে পারেন। এতে যদি তার 'অভিপ্রায়' 'অনুভূতি' ও 'আত্মমর্যাদা' প্রকাশ পায় মন্দ কী!

সেই সভায় বিএনপির চিন্তা কলসের আরেকজন অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ বলেছেন, "না হয় ধরে নিলাম, বেগম খালেদা জিয়া লেখাপড়া একটু কম জানেন। কিন্তু সেখানে ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মতো ব্যক্তি আছেন, যিনি জীবনে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করেননি। সাইফুর রহমানের মতো বিশ্বখ্যাত এ্যাকাউন্ট্যান্ট রয়েছেন। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ও খন্দকার মাহবুবউদ্দিন আহমদের মতো খ্যাতিমান আইনজীবীরা আছেন। এ রকম একটি টিম থাকতে ইরফান রাজার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে তিনদিন লেগে গেল! এটা বিস্ময়কর। বিএনপির জন্য প্রতিবাদ করা তো সহজ ছিল।" বেগম জিয়া পড়াশোনা কম জানেন কী বেশি জানেন তা নিয়ে এ ধরনের হীন প্রশ্ন করব না কারণ, বিদ্বান নই যে বিদ্যার বড়াই করব। তবে এটুকু বলব গত ১৫ বছর রাস্তায় রাস্তায় বেগম জিয়াকে মিছিল করতে দেখেছি [এরশাদের সময়], নির্যাতিত হতেও দেখেছি। তখন এসব শত নাগরিকের সদস্যকে দেখিনি। হতে পারে তা ভুল রাজনীতি, যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি। না হলে যে বেগম জিয়া বলেছিলেন, "প্রেসিডেন্ট এরশাদ মজজিদে দাঁড়াইয়া অসত্য কথা বলিয়াছেন।" (*ইত্তেফাক* ৬.৩.৮৮) তাঁর মুক্তির জন্য এখন কেন ঝাপাইয়া পড়িতেছেন? আরাম কেদারায় বসে যে অধ্যাপক ছবক দিচ্ছেন, তিনি কি কনফিউজড অধ্যাপক? তিনি জানেন না, বিএনপির পক্ষে পাকিদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া সম্ভব না। যাদের নাম তিনি বলেছেন তারা ব্রিলিয়ান্ট বা বিখ্যাত হলে কী হবে, বেগম জিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ আছে? সে মুরোদ কি ড. মাহবুবেরও আছে?

একই সভায় অধ্যাপক আফতাব আহমদও ছিলেন। অধ্যাপক আ. আ. চিৎকার করে বলেছেন, "পাড়ায় পাড়ায় মস্তানী করেছে বা দলীয় টিকিটে নির্বাচন করেছে এমন লোক কিভাবে বিচারপতি হয়। ইরফান যা করেছেন তা ভারতীয় পঞ্চম বাহিনীর হয়ে করেছেন... মুক্তিযুদ্ধের ৩০ বছর পর স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ বলে কিছু নেই। [*জনকণ্ঠ* ১০.১২) হ্যাঁ, এ রকম লোককে বিচারপতি করা হয়েছিল এবং তাকে তার কর্মের ফলও ভোগ করতে হয়েছে। তুলনা নয়। কিন্তু বিএনপি আমলে এরকম একজনকে করা হয়েছিল এবং প্রায় একই রকমের কাণ্ড ঘটানোর পরও তার চাকরি যায়নি। মানুষ কতটা বিকারগ্রস্ত হলে বলতে পারে ইরফান ভারতীয়। আওয়ামী লীগের বললেও চলত। আর স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ কিছু নেই। এটা নতুন কোনো স্ট্যান্ড নয়। জামায়াত গত দু'দশক তা বলছে।

এ ডিসেম্বরে মনে হয় এ ধরনের আরো বক্তব্য আসবে বিভিন্ন দিক থেকে। পরিকল্পিত ছক কেটেই তা করা হচ্ছে। নিজামী গতকালও বলেছেন, আলবদরের

সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। নিজামী এ ধরনের প্রকাশ্য মিথ্যাচার করতে পারছেন এ কারণে যে, পাকিপন্থী আরো দু'টো দলও এখন তাঁর কব্জায়। ঢাকা আলবদর ইউনিটের প্রধানকে করা হয়েছে জামায়াতের মহাসচিব। এরা ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই নিজেদের উন্মোচন করেছে। ক্ষমতায় গেলে বলার অপেক্ষা রাখে না ১৯৭১-এর সব অর্জন নস্যাৎ করে ১৯৪৭ ফিরিয়ে আনা হবে। এখন বিভিন্ন ব্যক্তি, গ্রুপ, দলকেই ঠিক করতে হবে এদের কি প্রতিরোধ করা হবে? না, ১৯৪৭-এর দিকে যাত্রা করতে হবে?

১১ ডিসেম্বর, ২০০০

আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বাঁচব তো?

পত্রিকায় মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) দেখলাম, জামায়াতের নেতা কাদের মোল্লা ইফতার পার্টিতে বেগম জিয়ার সঙ্গে রসিকতা করছেন। বেগম জিয়া, আপনার কি মনে পড়ে এই কাদের মোল্লা এক সময় বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গঙ্গার পানি, তিনবিঘা তালপট্টি সমস্যার সমাধান না করে খালি হাতে ভারত থেকে ফিরে এলে বারো কোটি মানুষ এই সফরের খরচ কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবে? "এসব সমস্যার সমাধান না করলে এই সরকারকে ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হবে না।" (*বাংলার বাণী* ১৫.৫.৯২) বেগম জিয়া খালি হাতেই ফিরেছেন। কাদের মোল্লার রসিকতার সময় আপনাকে ঘিরে থাকা চারপাশের মোসাহেবদের কি মনে পড়েছিল, এই কাদের মোল্লা তারও চার বছর পর বলেছিল, "বিএনপি সরকার মিথ্যাবাদী, জনগণের সম্পদ হরণকারী, নির্লজ্জ সরকার।" (*সংগ্রাম* ২৬.২.৯৬) বিএনপি সরকারের 'জন্মদাতা গোলাম আযম' (*মিল্লাত* ১৭.২.৯৩) এ কথা বলতেও তারা ভোলেনি।

আরো আছে লিখলাম না। মোসাহেবদের কোনো কথা মনে থাকে না। আপনি বিএনপি প্রধান না থাকলে, তখন যে থাকবে তারা তার মোসাহেবী করবে এবং বলবে, আরে বেগম জিয়া, তিনি তো লেখাপড়া জানতেন না। যা এখনই অনেকে বলছে। বিএনপির চিন্তা কলসের লোকজনই বলছে। আমরা অনেকে আপনার সমালোচনা করি বটে, কিন্তু এ ধরনের চরিত্র হননকারী কথা বলি না। কারণ, জননেতাকে জননেতা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। তাঁর পিএইচডি অনেক সময় শিং হয়ে যায়। যেমন ঢাবির অধ্যাপক– অধ্যাপক আ. আ. বা আফতাব আহমদ। শিং হয়ে গেলে সবাইকে গুঁতোতে চায়। সমস্যা হচ্ছে, যুদ্ধাপরাধীদের ও পাকিদের উচ্ছিষ্টভোগী মোল্লাদের আচরণ এ রকমই হবে। তারা আপনাকে 'মিথ্যাবাদী' বলে আপনার ইফতারী খেতেই যাবে। তাই বলে আপনারও? নাকি এটাই ঠিক যে জামায়াত যা বলেছে অর্থাৎ 'গোলাম আযম বিএনপির জন্মদাতা' তা-ই ঠিক। না হলে তাদের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করে ইফতার করতে তো রুচিতে বাধার কথা!

যুদ্ধাপরাধী মোল্লার কথা উঠলই যখন, তখন বলি, তাঁর আমীরের হয়ে কয়েকদিন আগে পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠিয়ে তিনি বলেছেন, নয়া আমির নিজামী

আলবদর ছিলেন না। ধর্মের নামে রাজনীতি করলে কি অনবরত মিথ্যা বলতে হয়? ইসলাম আর মিথ্যা সংমিশ্রণ জামায়াতের পক্ষেই একমাত্র করা সম্ভব। নিজামী '৭১-এ আলবদর না থাকলে, বলতে হয় সে সময় জামায়াত বলে কোনো দল ছিল না। সুতরাং গোলাম আযম নামে তার কোনো আমীরও ছিল না। নিজামীদের কসাইয়ের চকচকে ছুরিতে এই ডিসেম্বরে অগণিত বুদ্ধিজীবী নিহত হয়েছেন। ২৯ বছর আগে এ দিনে নিজামীর নির্দেশে তার সাঙ্গপাঙ্গরা আমার শিক্ষকদের বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে নিয়েছিল। ছাত্র বলে তারা নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল। মিথ্যা বলা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জামায়াত কর্মীদের কি প্রথম গুণ হতে হবে মিথ্যাবাদিতা? দ্বিতীয় গুণ কি মোনাফেকী? কারণ, বিএনপিকে ইসলামবিরোধী ফতোয়া দিয়ে আজ মাহে রমজানের সময় তারা তাদের সঙ্গে না হলে ইফতার করে কীভাবে? যাক, নিজামীরা আমার শিক্ষক ও আরো অগণিত বুদ্ধিজীবীকে রায়েরবাজার আর মিরপুরে কুচি কুচি করে কেটেছে। নিজামী সেটি কীভাবে ভুলবেন? ভুলতে পারেন নি দেখেই সে সময়ে তাঁর ডান হাত আলী আহসান মুজাহিদকে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল করেছেন। কে এই মুজাহিদ? ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন নিজামীর ডান হাত। ঢাকার আলবদর প্রধান। লক্ষণীয় পাকি গণহত্যার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তখন, তারাই এখন জামায়াতের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে। যুদ্ধাপরাধী কামারুজ্জামান, সাঈদী, কাদের মোল্লা প্রমুখ।

এই প্রজন্মের কাছে গো. আযম বা আলবদর নিজামী বা রাজাকার সাঈদীর মতো মুজাহিদ ততটা পরিচিত নন। কিন্তু ভুললে চলবে না, ঢাকা শহরে আলবদররা যত খুন করেছে তার সব দায়িত্ব ঢাকার আলবদরপ্রধান হিসেবে তাঁর ওপরই বর্তায়। এই মুজাহিদ ১৯৭১ সালের ১৫ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে দেশপ্রেমিক যুবকেরা ভারতীয় চরদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছে এবং রাজাকার, আলবদর ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য হিসাবে জাতির সেবা করছে।" জাতির এই সেবা ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মানুষদের জবেহ করা। তরুণীদের ধর্ষণ করা। ঐ একই সময় মুজাহিদ (৭ নভেম্বর) বলেছিলেন, "এ দেশের তৌহিদবাদী মানুষ মানবতার দুশমন, শান্তির দুশমন ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুস্তানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। দুনিয়ার মানচিত্র থেকে হিন্দুস্তানের অস্তিত্বকে মুছে না ফেলা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রামের বিরাম নেই।" শুধু তাই নয়–

১. 'আগামীকাল থেকে কোনো লাইব্রেরি হিন্দুদের ও হিন্দুস্তানী দালালদের বইপুস্তক কেনাবেচা করতে পারবে না।"

২. "ভারতীয় দালালদের...মুখ আমরা চিনি। জনগণকে এদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে।'

৩. 'দিল্লীর বুকেই বৃহত্তর পাকিস্তানের পতাকা উড্ডীন করতে হবে।'

তারা হিন্দুস্তানকে নিশ্চিহ্ন করে দিক আমাদের কিছু আসে যায় না। আমরা আতঙ্কিত তাদের জোট বেঁধে পরিকল্পিতভাবে ছুরি হাতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। এ ডিসেম্বরের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করুন এবং আগে এদের যেসব মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি তা দিয়ে তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন তাহলে দেখবেন রাতে আর ঘুম আসবে না।

এখন আর আমাদের বলার কিছু নেই। বিএনপির চিন্তাবিদ সাংবাদিক গি. কা. চৌ ঘোষণা করেছেন, জিয়াউর রহমান পাকিদের অনুগত ছিলেন। এতটাই অনুগত যে, নিয়াজীর অপমান মুছে ফেলার জন্য শিশু পার্ক করেছিলেন। জনাব মান্নান ভূঁইয়া তাঁকে যাই বলুন না কেন, এই উক্তি আমাদের প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত করেছে। আজ অধ্যাপক আ. আ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত বদলানোর উপদেশ দেন। '৭১-এর এই সময় পাকিদের সহযোগী শিক্ষকরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের আস্ফালন করেছে। শত রাজাকার কমিটি অনরবত রাজাকারী মতবাদ প্রচার করছে। পাকি কূটনীতিককে প্রত্যাহার করার পর সে ঢাকায় রয়ে গেছে। পত্রিকায় পড়লাম, রাজাকারদের আওয়ামী লীগেও যোগ দেয়ানো হচ্ছে এবং এ সংবাদ বারংবার প্রচারিত হওয়ার পরও আওয়ামী নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদ করেননি। মনে হচ্ছে এ সরকার আস্ফালনকারী সরকার, কার্যকর নয়। অবস্থা অনেকটা ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের মতো। অবস্থা যেভাবে এগুচ্ছে তাতে বার বারই মনে হচ্ছে, আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বাঁচব তো! আজ বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবসে কেন যেন বার বার এ কথাই মনে হচ্ছে।

আমাদের শিক্ষকরা কেন শহীদ হয়েছিলেন? বা বুদ্ধিজীবীরা? বা অগণিত মানুষ? কারণ তাঁরা কয়েকটি আদর্শের জন্য লড়েছিলেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কর্মক্ষেত্রে। সেগুলো হলো গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ন্যায়বিচার এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বা অসাম্প্রদায়িকতা। অন্য কথায়, সিভিল সমাজ যা ছিল সংবিধানের ভিত্তি। না, আমরা শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারিনি।

শহীদরা আমাদের ভবিষ্যত তৈরি করে দিয়েছিলেন। যে কারণে আমি আজ শিক্ষক আমরা শিক্ষকের জায়গায়, আমার বন্ধু ও অগ্রজেরা সচিব বা জেনারেল বা মন্ত্রী বা কোটিপতি। অন্যদিকে আজ অধ্যাপক আ. আ. থেকে সাংবাদিক গি. কা. চৌধুরী, আলবদর নিজামী থেকে স্বৈরশাসক এরশাদ, এদের সব কর্মকাণ্ড বা দেশের অপমানকে মেনে নিয়েছি, নিচ্ছি। নিজেদের বর্তমান বিসর্জন দিতে রাজি না হওয়ায় আমরা মেনে নিয়েছি, সেসব অপমান অংশগ্রহণ করেছি অপমানকারীদের কর্মকাণ্ডে। আমার শিক্ষকরা চর্চা করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতির আর আমরা আপোসের আর ভয়ের। মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি ছিল বিজয়ীর। আর

আমরা যা চর্চা করছি এখন তা পরাজিতের। আমরা নাকি করব বাংলাদেশ রাজাকারশূন্য। এই সংস্কৃতি দিয়ে? এখানেই আমার শহীদ শিক্ষকদের সঙ্গে আমার বা আমাদের অনেকের তফাত। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর সেই শহীদ শিক্ষক ও বন্ধুদের সম্পর্কে লিখেছিলেন, "আমরা যারা সঙ্গী ছিলাম তাঁদের, তাঁরা সামান্য হয়ে পড়েছি, যতটা সামান্য ছিলাম তার চেয়েও বেশি।" এ কথা যে কত্য সত্য তা বুঝি যখন দেখি সামান্য রুটির টুকরোর জন্য পরিচিতদের হাহাকার। আওয়ামী লীগ এক সময় নমিত ভঙ্গি গ্রহণ করেছিল এই জামায়াতের প্রতি আর জামায়াত তো বলে– বিএনপির জন্মদাতা তারাই। তাহলে এ দেশে খুনীরা আলবদররা কেন আস্ফালন করবে না? আজ ১৪ ডিসেম্বর মনে হলো, নিজ দেশেই আমরা উদ্বাস্তু, যারা এখনো মনে করি দেশে চর্চা হওয়া উচিত মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতির। তবে দেখা যাক তার আগে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারি কি না আমি বা আমাদের অনেকে।

১৪ ডিসেম্বর, ২০০০

রাজাকে রাজার মতো ঢাকায় থাকতে দেয়া যায় না

পাকি ডেপুটি হাইকমিশনার এখনো অনুধাবন করতে পারেনি যে ত্রিশ বছর আগে পাকিদের বিশেষ করে পাকি জেনারেলদের মুখে লাথি মেরে বাঙালিরা স্বাধীন হয়ে গেছে। অবশ্য, এই ডেপুটি ইরফান রাজার খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। সে দেখেছে, এ দেশে তো পাকি আবহ আছেই, তাহলে পাকি জেনারেলরা ১৯৭১ সাল সম্পর্কে যা বলে তা বলতে দোষ কী? সে তো এক জেনারেলেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। ইরফান কী দেখে? ইরফান দেখেছে, তাদের এক সময়ের জিগরী দোস্ত গোলাম আযম প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়িয়ে রাজনীতি করে, ১৯৭১-কে স্বীকারই করে না। আরেক দোস্ত, যে বাঙালিকে একমাত্র নিশান-ই হায়দার [নিশানই বরদার] দেয়া হয়েছিল সেই অব. জে. এরশাদও একই কাজ করে। এরা আবার রাজনৈতিক জোট বেঁধেছে আরেকজনের সঙ্গে যিনি পাকি সেনাপতি মারা যাবার পরই শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী অন্য দেশের সেনাপতির মৃত্যুতে শোকবার্তা পাঠাননি। পাঠানো যায় না। হ্যাঁ, সেনাপতিটি যদি আইজেনহাওয়ারের মতো কেউ হতেন তা হলেও মানা যেত। অবশ্য পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বন্ধু হলে অন্য কথা। বেগম জিয়া আবার যে পত্রিকাটিকে নিজের বলে মনে করেন সে পত্রিকার মালিক ছিল পাকিদের ভাড়াটে খুনী। ১৯৭১ সালে ভাড়াটে খুনীদের যে বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল তার প্রধান এখন আবার জামায়াত নামক রাজনৈতিক দলের আমীর। রাজা তো এগুলোই দেখেছে এবং আরো দেখেছে এদের জনসভায় বেশ লোক হয়। ইরফান রাজা আরো শুনেছে, পাকিদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা হলে, পাকি ভাবাপন্ন বাবা-মার কন্যারা গালে পাকি পতাকার ছবি এঁকে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে এসে উল্লম্ফন করে। তাই বোধ হয় 'বিজের' সেমিনারে সাহস করে সে কিছু বক্তব্য রেখেছে যা অধিকাংশ পাকিস্তানিই মনে করে। রাজা কী বলেছে–

১. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ হয়নি। হয়েছে ২৩ হাজার। হামদুর রহমান কমিশনও তাই বলেছে।

২. গণহত্যার জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন হলে সে পাল্টা প্রশ্ন করেছে "কিসের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে? ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের অর্ধাংশ হারানোর জন্য?"

৩. এই সমস্ত 'দুষ্কর্ম' শুরু করেছিল আওয়ামী লীগ। হামুদুর কমিশনের মতও তাই। যদি এ দেশটিতে কিছু রাজনৈতিক দল ও পত্রিকা পাকি আবহ সৃষ্টি না করত

তাহলে কি ইরফান রাজা প্রকাশ্যে এ রকম বিবৃতি দিতে সাহস করত? বা এ-ধরনের বিবৃতি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত, কূটনৈতিক অব্যাহতি থাকলেও? এ মন্তব্য শুনে আপনারা অনেকে ক্ষুন্ন হতে পারেন। কিন্তু, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। তারপর আপনারাই বিচার করবেন, এ দেশে পাকি মনোভাবাপন্ন দল ও পত্রিকা আছে কিনা এবং কেন ইরফান রাজারা এ-ধরনের বক্তব্য প্রদানের সুযোগ পায়।

১. ক. এ ঘটনার কথা শুনে দৈনিক যুগান্তর বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করেছে। অধিকাংশ রাজনীতিবিদ ক্রুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। হাসানুল হক ইনু রাজার "এ আচরণের জন্য পাকিস্তান নিঃশর্ত ক্ষমা না চাওয়ার পর্যন্ত দূতাবাসের সব কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে" বলেছেন। এমনকি জাপার ফিরোজ রশীদ পর্যন্ত রাজার বক্তব্যকে "অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক" বলেছেন। কিন্তু শুনুন, মহানগর বিএনপি সভাপতি সাদেক হোসেন খোকা বলেন, "আগে আমরা পাকিস্তানী কূটনীতিকের বক্তব্য বিস্তারিত জানি, তারপর নিশ্চয় আমাদের প্রতিক্রিয়া জানাব।"

খ. "জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক কাদের মোল্লা বলেন, "ঢাকায় পাকিস্তানী কূটনীতিক কি বলেছেন, আগে তা জানি, তারপর মন্তব্য করব, এখন এর বেশি বলার নেই। (*যুগান্তর*, ২৮-১১)।

ঘটনাটি সবাইকে (সাংবাদিকরা) জানিয়ে মন্তব্য চাওয়া হয়েছে। শুধু দু'টি দলের রাজনীতিবিদদের বক্তব্য ভিন্ন। পাকিদের ঔদ্ধত্য তারা দেখেও দেখেন না। কী বুঝলেন?

২. বাংলাদেশের সব পত্রিকা বিষয়টি প্রথম পাতার শিরোনাম করেছে, করারই কথা। কারণ, বাংলাদেশে বসে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনীতিবিদ বাঙালিদের চপেটাঘাত করে যাওয়ার ঘটনা এই প্রথম। কিন্তু, সংবাদটি সেভাবে ছাপেনি, শুধু একটি পত্রিকা। অনেকেই পত্রিকাটিকে আইএসআইয়ের মুখপত্র বলে মনে করে এবং এ ঘটনাটি না ছাপাকে তার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরছে। আমরা বলি, এভাবে কোনো সংবাদপত্রকে কোনো গুপ্তর চর সংস্থার কণ্ঠ বলা উচিত নয়। অনেকের পাকিস্তান প্রীতি থাকতে পারে অনেকে পাকিদের বুট জুতা বুকে তুলে রেখে আনন্দ পেতে পারে সেজন্য তাকে আইএসআই কণ্ঠ বলতে হবে? হ্যাঁ, সেই ইনকিলাবের অনেক খুঁজে পেতে খবরটি পাওয়া গেল। কিন্তু কী আছে তাতে? এ পত্রিকার খবরের ছোট শিরোনাম– "পাক হাইকমিশনারকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব" কেন? তাদের সূত্র অনুসারে একটি "সেমিনারে একজন পাকিস্তানী কূটনীতিকের মন্তব্যের ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছে। সূত্র পাকিস্তানী কূটনীতিককে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছে। সূত্র পাকিস্তানী কুটনীতিককে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তলব করাকে 'আশু ও দ্রুত

প্রতিক্রিয়া' বলে উল্লেখ করেছে।" পত্রিকাটি আরো লিখেছে, "তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নিহতদের সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টেরও উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, যুদ্ধে মাত্র ২৬ হাজার বাংলাদেশী নিহত হয়েছিল।" খবর এখানেই শেষ। আইনত সব ঠিক আছে। কিন্তু খবরটি পড়ে ধারণা হবে, কী এক বক্তব্যের জন্য মন্ত্রণালয় এত কঠোর হয়েছে। ১৯৭১-এ তো ২৬ হাজারই মারা গেছে। দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত পত্রিকাটি এখনো এ রকম খবর প্রকাশ করছে এবং এখনো ঢাকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা না হয় মুক্তিযোদ্ধা নই কিন্তু দেশে তো শুনেছি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বলে একটি বিরাট সংগঠন আছে।

সুতরাং ইরফান রাজা কা কেয়া কসুর? বদরুদ্দীন উমর যথার্থই বলেছেন, "পাকিস্তানী কূটনীতিক-এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য রাখার সাহস কোত্থেকে পেলেন। এই যে এত বড় একটা অসত্য ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি করা হলো এ জন্য তো সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না। প্রতিক্রিয়া হবে সরকার ও কিছু বুদ্ধিজীবীর মধ্যে এবং ক'দিন বাদে সেটাও থাকবে না। সুতরাং, আজ পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনার যে একটা বলার সুযোগ পেলেন এ জন্য দায়ী কে?... দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি প্রকৃত প্রতিরোধ থাকত তবে তিনি এমন কথা বলারই সাহস পেতেন না। তাই বলছি, আজ দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতি তাদেরকে এ-ধরনের বক্তব্য রাখতে উৎসাহিত করছে।" (*যুগান্তর* ২৮-১১)।

কারা এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে বা করছে তার উদাহরণ তো তুলে ধরেছি এবং বর্তমান শাসক দলও যে এদের এক সময় আস্কারা দেয়নি তা না উল্লেখ করলে সত্যের অপলাপ হবে।

ইরফান রাজা শুধু মিথ্যা বলেনি, ইতিহাসের সত্যকে চ্যালেঞ্জ করার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। শাসক আওয়ামী লীগকে ১৯৭১-এর জন্য দায়ী করেছে। ১৯৭১ সালের পরাজিত পাকি জেনারেলদের উত্তরাধিকার বহন করে ২০০০ সালে কোনো পাকি কূটনীতিবিদ ঢাকায় থাকতে পারে না। দেশে পাকি আবহ থাকতে পারে কিন্তু দেশে তো একটি সরকার আছে। এ সরকার যে দল গঠন করেছে সে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাদেরও অভিযুক্ত করার সাহস পাচ্ছে এই পাকি ডেপুটি। আমাদের মাঝে এখনো যদি স্বাধীনতার ইজ্জতবোধ খানিকটা অবশিষ্ট থাকে, এ সরকারের যদি মর্যাদাবোধের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে– তা হলে অবশ্য ইরফান রাজাকে আর রাজার মতো থাকতে দেয়া যায় না। দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাকে অবশ্যই বহিষ্কার করতে হবে। এতে চার দলের নেতৃবৃন্দ হয়ত দুঃখিত হবেন ইনকিলাবের 'পাঠক'রা হয়ত নিন্দা করবে, কিন্তু রাজামিয়াদের রাজত্ব যে নেই সেটা তো প্রমাণিত হবে।

২৯ ডিসেম্বর, ২০০০

রাষ্ট্র কি এক ব্যক্তির কাছে জিম্মি?

আমরা যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে। ফতোয়াবাজি সম্পর্কিত রায় প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লিখেছিলাম এই রায়ে সাধারণ মানুষ খুশি হলেও খুশি হবে না বিভিন্ন চরের পীর ইনকিলাব ফ্রন্ট বা স্বঘোষিত কিছু 'ইসলামী বুদ্ধিজীবী'। গতকাল পত্রিকার সংবাদে জেনেছি, এই রায়কে সবাই যুগান্তকারী মনে করলেও মনে করেনি বিএনপির মুখপত্র হিসেবে পরিচিত আলবদরের মালিকানায় পরিচালিত *দৈনিক ইনকিলাব* ইসলামী ঐক্যজোটের দুই নেতা 'শায়খুল হাদিস' আজিজুল হক 'মুফতি' ফজলুল হক আমিনী, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আলবদর প্রধান বর্তমান জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামী ও কিছু 'ইসলামী চিন্তাবিদ'।

২ তারিখের সব পত্রিকা এই রায়ের বিষয়টিকে শিরোনাম করেছিল গুরুত্ব বিবেচনা করে। কিন্তু ইনকিলাবে অনেক কষ্টে খুঁজে পেতে সংবাদটি বের করতে হয়েছে। কিন্তু গতকাল জনাব হক ও আমিনীর বক্তব্য '*ইনকিলাব*' শিরোনাম হিসেবে এনেছে। এই উদাহরণটি দিলাম ইসলামের 'স্বঘোষিত' নিশান খবরদারদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাবার জন্য।

দৈনিক জনকণ্ঠ-এর সংবাদে জানা যায়, মুফতি আমিনী দুই বিচারপতিকে মুরতাদ ঘোষণা করেছেন। ফতোয়াবাজ এই 'মুফতি' এর আগে অনেককে মুরতাদ ঘোষণা করেছেন, প্রশিকার ড. কাজী ফারুককে হত্যার ফতোয়া দিয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, বিচারপতির রায়ের সমালোচনা করার অধিকার আমাদের সবার আছে কিন্তু বিচারপতিকে মুরতাদ হিসেবে ফতোয়া দেয়ার অধিকার এই ব্যক্তিটির বা অন্য কারো আছে কি না? না থাকলে, আদালত অবমাননার দায়ে হাইকোর্ট তাঁকে সমন জারি করবে কি না? বা ৫০৮ ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে কি না? এটি দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আমরা দেখতে চাই, একটি ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রকে হুমকি দিয়ে জিম্মি রাখতে পারে কি না?

এ বিষয়ে আরো কিছু বলার আগে তাদের মুখোশটি উন্মোচন করা দরকার। এদের একজন 'শায়খুল হাদিস' আরেকজন 'মুফতি'। সমাজ তাঁদের কাছে ধর্ম বিষয়ক ব্যাখ্যার আশা করতে পারে বটে কিন্তু রাজনীতি! ধরে নিলাম রাজনীতি তাঁরা করতে পারেন কিন্তু তাঁরা কোন ধরনের রাজনীতি করবেন? যেহেতু ইসলাম

তাঁরা বিশ্বাস করেন সুতরাং তাঁদের কথায় ও কাজে মিল থাকতে হবে। তা হলে এবার দেখুন–

১৯৯৪ সালে 'শায়খুল হাদিস' বিএনপি'র বিরুদ্ধে বলেছিলেন "বিসমিল্লাহের নামে ক্ষমতায় এসে সরকার নাস্তিক মুরতাদদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে আর সন্ত্রাস দমন আইনে গ্রেফতার করছে ইসলামের পক্ষ শক্তিকে।" (*দৈনিক সংগ্রাম*, ১৩.৭.৯৪)। তিনি আরো বলেন, 'মোনাফেক ধোকাবাজরা ক্ষমতা দখল করে বসে আছে।" (*ভোরের কাগজ*, ৬.৮.৯৪)।

আমিনী বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর "দেশে ইসলাম বিদ্বেষীরা যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।" [*মিল্লাত* ৪.২.৯৩)।

তাঁর মতে "বিসমিল্লাহ বলে যে জাতি তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল আউযুবিল্লাহ বলে আবার তাদের ক্ষমতা থেকে অপসারিত করবে।" [*সংগ্রাম* ১০.৯.৯৫]। তিনি আরও বলেন, বিএনপি আমলে তাঁর মনে হয়েছে তারা 'ভারতের অঙ্গরাজ্যে বাস' করছেন। (*সংগ্রাম* ১৭.৮.৯৪]।

ইনকিলাব লিখেছে, এঁরা হলেন ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ও মহাসচিব। এক সময় নারী নেতৃত্ব নাজায়েজ বলেও তাঁরা ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইসলামী ঐক্যজোট বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বে গঠিত জোটের অংশীদার। এখন প্রশ্ন ইসলাম বিরোধী, মোনাফেক, ভারতের সেবাদাস হিসেবে যাঁদের তাঁরা ঘোষণা দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আবার ঐক্য করেন কিভাবে? নারী নেতৃত্ব নাজায়েজ হলে বেগম জিয়ার সঙ্গে ইফতারিও বা সারেন কিভাবে? মোনাফেক তাহলে কে? আর ইসলামে মোনাফেকের স্থান কী? আসলে, ধর্মকে তারা ব্যবহার করেন রাজনীতির জন্য, স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যা এক ধরনের ব্যবসা।

এ দু'জন ও নিজামী যে বিবৃতি দিয়েছেন তারপ্ন ভাষা একই রকম। মনে হয় একই বক্তব্য কপি করে তারা দিয়েছেন। আমিনী বলছেন (বা অন্যরাও) "গ্রাম্য মাতব্বরা অসৎ উদ্দেশ্যে ভাড়াটে মুন্সীদের দিয়ে যে সব অনাচার করে তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।" (*ইনকিলাব* ৩.১.২০০১) উত্তম। একথা গত এক দশক তাঁরা বলেননি কেন যখন প্রায় ২৫০ নারীকে নিদারুণভাবে নির্যাতন করেছে ফতোয়াবাজরা। তাঁদের কি তখন মানবিক বিচার বুদ্ধি বলে কিছু ছিল না? তাঁরা বলেননি কেন না, ঐ সব গ্রাম্য মাতব্বর ও মুন্সীরা তাঁদের সহযোগী তাঁদের ক্ষমতার উৎস। তাদের ভোটে তাঁদের জীবন রাজনীতি সব নির্বাহ হয়। আমার–

৪ জানুয়ারি, ২০০১

নতুন ফতোয়া–বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ অবৈধ সন্তান!

রাজাকাররা আর কিছু বাকি রাখল না। খুন জখম, লুট ধর্ষণ দেশদ্রোহিতা অভিধানে এ রকম আর কোনো শব্দ নেই যা তারা করেনি। ইসলামের নামে রাজনীতিতো তাদের পেশাই। এখন সবশেষে তারা আল্লাহকে রাজনীতিতে টেনে এনেছে এবং এমন সব কথা বলে যে ধর্মভীরু অনেক মুসলমান এসব কথা শুনলে কানে হাত দেবেন। আমার এ মন্তব্যের ভিত্তি দু'তিন দিন আগে রাজাকার ও ফতোয়াবাজ এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় খুন করার অভিযোগ রয়েছে যার বিরুদ্ধে, সেই দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর একটি বক্তৃতা। জামায়াতের প্রথম দু'জন আলবদর নেতার পর যার (সাঈদী) স্থান। রাজাকার সাঈদী সম্প্রতি পিরোজপুরের একটি বক্তৃতা দিয়েছে। এ বক্তৃতার সারমর্ম ছাপা হয়েছে শুধু একটি পত্রিকায় (দৈনিক সংবাদ ১৯.১.২০০১)। সে কারণে এখানে সংবাদাংশের প্রায় পুরোটাই বিবৃত করব।

১. সাঈদী বলেছে '৭৫ ও '৭১-এ পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলেছিলাম বলে ওরা আমাদের রাজাকার বলে। যারা আজ আমাদের রাজাকার বলে তারা পিতার অবৈধ সন্তান। বাংলাদেশের জনতার কাছে লৌহমানব আইয়ুব খানও হার মেনেছে। আর আওয়ামী লীগতো ছোট্ট এক মহিলার দল।"

আমরাও এতদিন বলে এসেছি জামায়াত পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলে। জামায়াতী নেতারা স্পষ্টভাবে তা কখনো স্বীকার করেনি। আজ রাজাকার সাঈদী স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে যে রাজাকারদের পার্টি জামায়াত পাকিদের পক্ষে। এখানে সাঈদী আরো স্পষ্টভাবে একটি কথা বলেছে, তা হলো ১৯৭৫ সালের ঘটনাও পাকিস্তানের পক্ষে ঘটানো হয়েছিল এবং '৭৫-এর পর সৃষ্ট বিএনপিও পাকিদের পাকজাত দল। সে কারণেই বেগম জিয়া তার একপাশে টেনে নিয়েছেন আলবদর প্রধান জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামীকে। রাজাকার সাঈদীর এই ভাষণের পর আরো পরিষ্কার হয়ে গেল বেগম জিয়া রাজাকার ও ফতোয়াবাজদের নিয়ে যে আঁতাত করেছেন তা মূলত পাকিদের পক্ষে এবং তাদের প্রধান কাজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিদের উৎখাত করা।

এখানেই যদি রাজাকার থামত তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু রাজাকার সাঈদী মুক্তিযোদ্ধাদের বলেছে জারজ। ১৯৭১ সালে যারা পাকিদের পক্ষে ছিল তাদেরতো

রাজাকারই বলে। এই শব্দ তাদেরই সৃষ্টি। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। ১৯৭১ সালে কিছু রাজাকার ছাড়া সবাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। তাহলে তারা সব অবৈধ বা জারজ সন্তান। তা জনাব আহাদ চৌধুরী কী বলেন? খালি একটা বিবৃতি দেবেন বোধ হয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের পক্ষ থেকে? জনাব মান্নান ভূঁইয়া ১৯৭১ সালে লড়াই করেছেন বাংলাদেশের পক্ষে, তিনিও অবৈধ সন্তান। ঠিক নাকি জনাব ভূঁইয়া? বেগম জিয়াতো নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মন্ত্রণালয় করবেন বলেছিলেন। প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। এখন দেখছি তিনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছিলেন। যা হোক, চার দলের অন্যতম শরিক আজ স্পষ্ট বলে দিয়েছে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ জারজ।

বাংলাদেশের যে জনতার কাছে আইয়ুব খান হার মেনেছে সে জনতার নেতৃত্বে সাঈদীরা ছিল না। ছিলেন মাওলানা ভাসানী আর আওয়ামী লীগ। ঐ সময়ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছিলেন একজন মহিলা। রাজাকার সাঈদী শেখ হাসিনাতো 'ছোট্ট মহিলা বেগম জিয়া কি খুব বড়? বাংলাদেশ নারাজ পার্টি বা বিএনপি কি বড় মহিলার দল? জামায়াত নারী নেতৃত্ব মানে না। তাহলে সাঈদী-নিজামীরা বেগম জিয়ার পাশ ছেড়ে নড়ে না কেন? তাদের কারণে তো ভন্ডামী শব্দের অর্থ খোঁজার জন্য তার অভিধানও দেখতে হয় না।

২. সাঈদী বলেছে "আজ হাইকোর্টেও সরকারের পোষ্য দালালে ভরপুর। তা না হলে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়া হিল্লাকে এক শ্রেণীর বিচারক অবৈধ বলে রায় দিয়েছে। একজন বিচারক হিন্দুস্তানের দালাল ছাড়া আর কিছুই নয়।" হাইকোর্টের রায় মন মতো না হলে বিচারকরাও সরকারের দালাল। এর অর্থ সব রায় তাদের মনমতো হতে হবে। ফতোয়া ও হিল্লা বিয়ে সম্পর্কে সাঈদী যা বলেছে আলেমরা ইতোমধ্যে তার বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। এখন আশা করি সাঈদীর এই ফতোয়া সম্পর্কে তারাই মতামত দেবেন। হাইকোর্টের বিচারকরা এখন গালিগালাজকে কিছু মনে করেন না। খুব সহনীয় তাঁরা। আগে সাংবাদিক বা যাঁদের মামার জোর কম তাঁদের প্রতি স্বপ্রণোদিত হয়ে আদালত অবমাননার সমন জারি করতেন। লেখক পেলে তো কথা নেই। কিন্তু ফতোয়াবাজরা তাঁদের মুরতাদ বললে, হত্যার হুমকি দিলে আদালত অবমাননা হয় না। বিএনপির ব্যারিস্টাররা প্রধান বিচারপতির দরজায় লাথি মারলে আদালত অবমাননা হয় না। সাঈদী তাঁদের হিন্দুস্তানের দালাল বললে মান যায় না, সব সহ্য করা যায়। কিন্তু শেখ হাসিনা আদালতের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে বললে আদালত অবমাননা হয়। ধন্য বিচারকবৃন্দ। ধন্য আপনারা।

৩. সাঈদীর মতে, "ধর্ম নিরপেক্ষতা মতবাদ একটি কুফরী মতবাদ, এটি হারাম। কোনো মুসলমানের এ হারাম আইন মেনে নেয়া জায়েজ নয়।"

কোন ধর্মগ্রন্থে এ রকম বলা আছে? এটি আইন তাও বা রাজাকারকে কে

বলল? ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা যুক্ত মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে। রাজাকারদের পক্ষে মানবতাবাদের সঙ্গে জড়িত কিছু মানা সম্ভব নয় সেটাই ১৯৭১ তো বটেই ১৯৭৫-এর পরও প্রমাণিত।

৪. সাঈদী বলেছে, "হিন্দুস্তানের দালাল এ সরকার আল্লাহর পত্রিকা *ইনকিলাব* বন্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। অথচ ইসলাম বিরোধী কাফের লোকদের পত্রিকা 'সংবাদ' বন্ধ করে না– যে পত্রিকা সুযোগ পেলেই আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা শুরু করে।"

আল্লাহর পত্রিকা ইনকিলাব। নাউজুবিল্লাহ। আলেম সমাজ, আল্লাহ কবে পাকিদের মুখপত্র ইনকিলাবকে নিজের পত্রিকা হিসেবে ঘোষণা দিলেন? রাজাকাররা এখন আসমান জমিনের স্রষ্টাকেও নিজেদের হীন প্রয়াসে ব্যবহার করতে চায়। বিজ্ঞাপন হিসেবে?

যাক জানা গেল, *'সংবাদ'* যারা পড়ে তারা কাফের। সংবাদের পাঠকরাই আশা করি 'মুসলমান' সাঈদীর মোকাবিলা করবেন। আর সরকার অপপ্রয়াস দূরে থাকুক ইনকিলাবের বিরুদ্ধে কোনো প্রয়াসই নেয়নি। নিলে ইনকিলাব এখনো বের হয়? বরং সরকারের অনেকে ইনকিলাবের পক্ষে। ইনকিলাবের বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা তা পাঠকরাই নিয়েছে।

৫. "এ সরকার আমার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে, আমাকে সভা করতে দেয়া হয় না। আমার বিরুদ্ধে জেহাদ করা আর আল্লাহর বিরুদ্ধে জেহাদ করা সমান কথা।"

এ সরকার আমার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলে তো খুশিই হতাম। আর কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো সরকার জেহাদ ঘোষণা করবে কোন দুঃখে? রাজাকার সাঈদী কতবড় মিথ্যাবাদী তা বোঝা যায়, যখন সে বলে সে সভা করতে পারছে না। এ বক্তব্য সে তাহলে দিল কোথায়? তাকে অনেক জায়গায় সভাতে বাধা দিচ্ছে তারাতো সাধারণ মুসলমান হিন্দু নয়। আবার আল্লাহর কথা নিয়ে এসেছে সাঈদী নোংরা রাজনীতি করার জন্য। নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে দাবি করছে যা কোনো মনুষ্য সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলাদেশের আলেম সমাজ কি মনে করেন কোনো বান্দা আল্লাহর সমকক্ষ? যদি তা না হয় যে এই ঘোষণা দেয় তার কী হবে?

সাঈদী নিজেকে এখন আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজাকার বলে। সাঈদীর মতে, তারা জারজ সন্তান, অবৈধ। আমি ভীরু লোক আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আপনারা যারা সাহসী ও ক্ষমতাবান তারা হয়ত এ বিষয়ে ভাববেন। আমি শুধু বলতে পারি, প্রাণীর ঔরসে প্রাণী জন্মে, মানুষের ঔরসে মানুষ আর পাকিদের ঔরসে রাজাকার।

২৩ জানুয়ারি, ২০০১

সাকাচৌর কান্না, আমিনীর চিৎকার, অন্যদের মৃদু হাসি

কিছু কিছু কথা বার বার লিখতে হয়, মানুষকে পুরনো স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়ার জন্য, যাতে মানুষ ভবিষ্যতের সঙ্গে বুঝতে পারে। কোনো কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বার বার লিখতে হয়, লিখতে না চাইলেও, যাতে মানুষ ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ছবিটি। দুই পুলিশের ঘাড়ে ভর দিয়ে বিশালদেহী রাঙ্গুনিয়ার সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ওরফে সাকা চৌধুরী বেরিয়ে আসছেন এবং তিনি কাঁদছেন। তাঁকে ধরে রাখা হবে না সেটা সবাই জানত, কিন্তু তাঁর চোখে পানি, এটিই সবাইকে বিস্মিত করেছে। কারণ ১৯৭১ সালে সাকার চোখে পানি ছিল না। তরুণ সাকা এবং তার পিতা ফকা চৌধুরী চট্টগ্রামে কী করেছিলেন তা বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রপত্রিকায় আছে। মাহবুব উল আলম তাঁর 'বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ পিতা-পুত্র ও পাকিরা মিলে কুণ্ডেশ্বরীর অধ্যক্ষ নূতন চন্দ্র সিংহকে হত্যা করে। লেখকের বর্ণনায়, "তার জন্য কেঁদেছে হিন্দু, কেঁদেছে মুসলমান। মুসলমান যখন কেঁদেছে সালাহউদ্দিন প্রবোধ দিয়েছে ঃ 'মালাউন' মলো তোমরা শোক কচ্ছ কেন?" সুতরাং ২০০১ সালে সাকার চোখে পানি সেটি অত্যাশ্চর্য বটে। তবে, এই অশ্রু কাউকে বিচলিত করেনি। চাঁটগার মানুষদেরই দেখেছি নির্বিকার এবং বলছে সাকার চোখে যখন পানি তখন সামনে খুন-খারাবি আছে। আসলে সাকার সঙ্গে অশ্লীল মন্তব্য খুন খারাবি শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়ে যায় আপনা আপনি। প্রায় একই সঙ্গে আরেকটি সংবাদে দেখলাম, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা ফজলুল হক আমিনী জেল থেকে বেরিয়েছেন এবং বেরিয়েই চিৎকার– "আমি থাকব না চার জোটে।" আমজনতা এগুলো দেখে, পড়ে আর হাসে। তাদের কাছে এসব নতুন কিছু নয়। এগুলো ঘটবে তারা জানে, জানত। তারা এসব নাটকে অভ্যস্ত কারও চোখে এখন জল, পরমুহূর্তে হাতে স্টেন। কারও গলা এখন চড়ে যায় পরমুহূর্তে পোষা জন্তুর মতো হাত থেকে খাবার খুঁটে যায়। অনেকে বলছেন, পত্রিকাগুলো কী কারণে সাকা বা আমিনীর মতো লোকদের নিয়ে এত নাচানাচি করে। এর উত্তর, পত্রিকা পণ্য, পত্রিকা বিক্রি হতে হবে। সেখানে উত্তেজক খবর থাকবেই, কারণ বাংলাদেশের মানুষ উত্তেজনায় অভ্যস্ত। তাছাড়া, আমাদের রাজনীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সাকা যুদ্ধাপরাধী হওয়া সত্ত্বেও এ

দেশের সাংসদ, মন্ত্রী সব হয়েছেন। আমরা তা মেনেও নিয়েছি। যারা তাঁকে বানিয়েছে বা পরিণত করেছে আজকের সাকায়, তাদের আমরা ছি ছি না করে শুধু সাকাকে ছি ছি করলে হবে তা এক ধরনের আত্মপ্রতারণা। সাকা, আমিনী আমাদের দেশের রাজনীতি, একশ্রেণীর রাজনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গি, সাধারণ মানুষের চেতনার স্তরের প্রতিফলন। এটি অস্বীকারের কি কোনো উপায় আছে?

সাকা ১৯৭১ সালে কী করেছেন তা সংক্ষিপ্তাকারে গণতদন্ত কমিশন রিপোর্টে আছে। শুনেছি, আমার ভুল হতে পারে, স্বাধীনতার পর তিনি ও তাঁর পিতা দেড় মণ সোনাসহ ধরা পড়েন। সাকার পিতা জেলে মৃত্যুবরণ করেন। সাকা বিদেশ চলে যান। পিতৃদত্ত বিত্ত তাঁর ছিল কিন্তু গত তিন দশকে তা ফুলে ফেঁপে এত হয়েছে যে তিনি নিজেও তার হিসাব জানেন কিনা সন্দেহ। এই বিত্তই অস্ত্র কিনতে, মানুষ কিনতে, ভোট কিনতে সাহায্য করে এবং আমরা জানি, এই তিনটি বস্তুই বাংলাদেশে এখন সহজলভ্য ও সস্তা। সা. কা ফিরে রাজনীতি শুরু করেন। তাঁর যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে অনেকেই বিস্মৃত হলো। তাঁর ঘাঁটি রাঙ্গুনিয়া। সেখান থেকে তিনি কখনও পরাজিত হননি। কেন হননি তার অনেক কারণ আছে, কিন্তু তাঁর এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি তো তিনি।

আজ যাঁরা সাকার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন, ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁদের যদি বলি সাকা তো আমাদেরই সৃষ্টি। তাহলে এর উত্তর কী হবে? সাকার উত্থান তো জিয়া ও এরশাদ আমলেই। কোনো রাজনৈতিক দল কি তাতে আপত্তি করেছে? রাজনৈতিক দল ও তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্ন, সাকা বা তাঁর মতো লোকদের বিরুদ্ধে আপনারা কী করেছেন? একটি হিসাব অনুযায়ী "খুন, অপহরণসহ বিভিন্ন গুরুতর অপরাধের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে গত ১০ বছরে দায়ের করা ৮টি ফৌজদারী মামলা এখন বিভিন্ন আদালতে চূড়ান্ত বিচারের পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া ১৯৭১ সালে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে রেকর্ডকৃত আরও ৬টি মামলা পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়া চলছে।" (*সংবাদ* ২.৬.২০০১)।

এ রকম একজন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলের নেতা ছিলেন, সর্বশেষ বিএনপির, তাহলে বুঝুন বিএনপির অবস্থান কোথায়! এই যে ১৪টি মামলা তার কোনোটিরও ৩০ বছরে সুরাহা হলো না, এমনকি আওয়ামী আমলেও! মোর্শেদ খান মিষ্টির দোকানের হামলায় জননিরাপত্তা আইনে খাবি খান আর সাকার দোরগড়ায় একজন নিহত হয় কিন্তু জননিরাপত্তা আইন সেখানে অচল। এর মাজমা কি মানুষ বোঝে না? সব মানুষ কি গরু?

সংবাদপত্রের মতে, "কি সরকারি দলে, কি বিরোধী দলে সাকার গোপন সম্পর্কের রয়েছে শক্ত ভিত্তি।" (*জনকণ্ঠ* ২.৬.২০০১) সাকা এত অপছন্দনীয় হলে নির্বাচিতই বা হন কিভাবে, রাজনৈতিক দলগুলোতেই বা এত পাত্তা পান কিভাবে?

বিএনপি নেতা আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেছেন, "বর্তমান সরকারের কোনো না কোনো অংশের সাথে আঁতাত এবং অতীতেও বিএনপির কোনো কোনো নেতার সাথে সম্পর্ক রেখে তিনি ফায়দা লুটেছেন? এ কথা তো আগে কখনও বলেননি আপনারা। কেন বলেননি বা আমরাও বলি না এ প্রশ্নগুলো নিজেকে করুন। সাকা বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন তাতে কী? তিনি নতুন দল করবেন অথবা আরেকটি দলে যোগ দেবেন। কেউ তাঁকে বাধা দেবে না। সা.কা. যখন গ্রেফতার হন আমি তখন চাঁটগায়। সাকার গ্রেফতারের খবর যেই শুনে, একটু বিস্ময় প্রকাশ করে, তারপর মৃদু হাসে। বলে, সাকা ছাড়া পেয়ে যাবে। সাকা নিজেও বলেছেন, "পারলে গ্রেফতার করে নিয়ে যাক। এত ব্যস্ত হবার কী আছে?" [*প্রথম আলো,* ২.৬) কারণ, মানুষ জানে আ. লীগ এখন সাকাকে ব্যবহার করবে বিএনপির বিরুদ্ধে বিএনপিকে পর্যুদস্ত করার জন্য। সব রাজনৈতিক দল-ই এটি করবে। আমাদের আপত্তি অন্যখানে। তা হলো অস্ত্রের ব্যবহার। কেন জানি মনে হয়, চট্টগ্রামে অনেক লাশ পড়বে। একটি বিষয় উল্লেখ্য, যাঁরা সাকা বা তাঁর মতো যাঁদের ব্যবহার করেছেন বা করছেন তাঁরা কিন্তু কখনও ভাবেননি সাকাদের দ্বারা তাঁরাও ব্যবহৃত হয়েছেন। সাকারা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যাঁরা সাকাদের ব্যবহার করেছেন তাঁরা রাজনীতিতে একটি নতুন মডেল তৈরি করেছেন– তা হলো সাকা মডেল। হাসিনা বা খালেদা মডেল নয়। রাজনীতিতে সাকা হতে পারলে কেউ তাঁদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না। তাঁরা যা খুশি করতে পারেন। এক সময় তাঁরাও হারিয়ে যাবেন বা মাটিতে লুটিয়ে পড়বেন তা সত্য, কিন্তু যে ক'টা দিন থাকবেন সে ক'টা দিন তো দাপটে থাকবেন। যাঁরা সুস্থ রাজনীতির ধারক তাঁরা এদের সামনে টিকতে পারছেন না। কারণ কোনো দলেই গণতন্ত্র নেই। সব দল পরিচালিত হয় এক বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের দ্বারা। সেখানে শুধু থাকে ক্ষমতার প্রশ্ন অন্য কিছু নয়।

একই সঙ্গে আমিনী জেল থেকে বেরিয়ে চিৎকার করে বলছেন, "৪ দলের জোটের সাথে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন করা যাবে কিনা পরে জানাব।" বলেছেন তিনি, "আমরা জেল খেটেছি, নির্বাচনে সম্মানজনক আসন দিতে হবে।" (*সংবাদ* ২.৬) এই আমিনী বিএনপি আমলে বিএনপিকে লক্ষ্য করে বলেছিল, "অযোগ্য সরকার।" শুধু তাই নয়, "আমরা ভারতের অঙ্গরাজ্যে বাস করছি।" (*সংগ্রাম*) "সরকার উৎখাত না করলে স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা যাবে না।" সেই আমিনী যদি বিএনপির সঙ্গে জোট বাঁধে তা হলে বিএনপিও আমিনীর চরিত্র কি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা আমিনীর নিন্দা করি, কিন্তু যারা তাঁকে প্রশ্রয় দেয় তাদের সমর্থন করি, কিভাবে? বিএনপির একজন সমর্থক আমাকে বলেছিলেন, এইসব বর্জ্য পদার্থকে বাদ দিয়ে যদি বিএনপি নির্বাচনে লড়াই করতো তাহলে জিততো।

ব্যক্তিগতভাবে আমারও তাই মনে হয়। বিএনপি কী মনে করে আমিনী বা জামায়াতের পিছে আছে লাখ লাখ ভোটার? বা সাকার? বরং এসব কারণে একথাটাই এখন রটছে, যে আওয়ামী লীগ জিতবে। ভোটের আগেই বিএনপি হেরে যাচ্ছে। বিএনপি কিছু বর্জ্য ত্যাগ করছে। বাকিগুলোকে করলে তার সিট হয়ত কিছু বাড়বে। আর আ. লীগ এসব বর্জ্য ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু জোট? যদিও সবাই বলেন, রাজনীতিতে শেষ কিছু নেই তা সত্ত্বেও কট্টর এক আওয়ামী লীগার বলেছেন, এসব হলে দল ছেড়ে দেব। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যেই এ ধরনের একটি বড় অংশের সৃষ্টি হয়েছে যা রাজনীতিবিদরা হয়ত আঁচ করতে পারছেন না। রাজনীতিবিদরা ভাবছেন তাঁরা খুব রাজনীতি করছেন। এতে অনেকেই মৃদু হাসছেন। কারণ রাজনীতিবিদদের একাংশ জানেন না, তাঁদের অবস্থা 'রাজার নতুন পোশাক' গল্পের রাজার মতো। তাঁরা ভাবছেন, নতুন পোশাক পরে হাঁটছেন, আসলে তাঁদের পরনে কিছুই নেই। আমরাও যদি সমাজে রাজনীতিতে সাকা বা আমিনী মডেলদের একঘরে করতে না পারি, বা যারা তাদের সমর্থন করে (তা সরকার বা বিরোধী দল যেই করে) তাদের বিরুদ্ধে অনবরত প্রতিবাদ না জানাই তাহলে বাংলাদেশে নিশ্চিন্তে পরিবার পরিজন নিয়ে আমাদের বসবাস করা সম্ভব হবে না। আমরা ভুলে যাই বর্জ্য জমতে জমতে বুড়িগঙ্গারও পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তা হলে ঢাকা এক মহোঞ্জোদারোতে পরিণত হবে।

৪ জুন, ২০০১

বোমা মেরে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না

বোমাবাজির ধর্ম ও ধর্মের মধ্যে মিল আছে শুধু 'ধর্ম' শব্দটির। বোমাবাজির সঙ্গে ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল সূত্রের কোনো মিল নেই বৈপরীত্য ছাড়া। বানিয়ারচরে গির্জায় বোমা মেরে মানুষ হত্যার খবরটি শুনে এ কথা মনে হলো।

কেউ বলেনি এ বোমা হামলা হয়েছে বিএনপির তরফ থেকে বা আওয়ামী লীগের তরফ থেকে। ১৯৯৯ সালের মার্চে যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠান থেকে ৩ জুন বানিয়ারচরে হামলা পর্যন্ত ৬টি বড় ধরনের বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে ৫২ জন, আহত তিন শতাধিক। পত্রিকার খবর অনুসারে "এ বোমা বিস্ফোরণের পিছনে বার বার মৌলবাদী চক্রকে দায়ী করা হলেও সুনির্দিষ্টভাবে পুলিশ এখনও তাদের চিহ্নিত করতে পারেনি। গ্রেফতার হয়নি হরকত নেতা মুফতি হান্নান।" [সংবাদ, ৪.৬.০১] এ সব বোমা হামলায় মৌলবাদী চক্র ও তার সহযোগীদের হাত আছে বলে অনুমান করা হয় এবং এ সব হামলার একটা প্যাটার্ন আছে। মন্দিরে হামলা হয়েছে মসজিদে বোমা মারা হয়েছে, এবার হলো গীর্জায়। ১৯৭১ সালের একটি পোস্টারে লেখা ছিল– আমরা মুসলমান, আমরা হিন্দু আমরা খ্রিস্টান আমরা বাঙালি [ভাবার্থ]। সুতরাং ক্রমান্বয়ে তিন ধরনের ধর্মীয় উপাসনাগরে বোমা হামলার একটি প্যার্টান আছে, সেটি ১৯৭১ সালের মতো অর্থাৎ বাঙালির বিরুদ্ধে। উদীচী ও রমনার বটমূলের অনুষ্ঠান বাঙালি সংস্কৃতির প্রতীক। মৌলবাদীরা বাঙালি সংস্কৃতির বিপক্ষে এ দেশের অধিকাংশ সংস্কৃতিকর্মী বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রপথিক। মৌলবাদীদের তা পছন্দ নয়। 'কমিউনিস্ট' শব্দটি এদের সহযোগীদের গাত্রদাহ ঘটায়। সে কারণে কমিউনিস্টদের সভায় বোমা হামলা হয়েছে। শেখ হাসিনা আবার অসাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক, সুতরাং তাঁকে বিনাশের জন্যও অহরহ বোমা পেতে রাখা হয়।

১৯৭৫ সালের পর থেকে এ দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার (যা মৌলবাদ নামে অভিহিত) বিরুদ্ধে পুনর্বার লড়াই শুরু হয়েছে। এর অর্থ এ সময়েই আবার মধ্যযুগীয় এসব বিষয় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। জিয়াউর রহমানের আমলে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর উত্থান ও পুনর্বাসন হয়েছিল। এরশাদ সে ধারাকে পরিপুষ্ট করেছিলেন। নিজেদের দল ভারি করার জন্য তাঁরা এ ধরনের প্রগতি বিরোধী ন্যাক্কারজনক কাজ করেছিলেন। এ-সবের অর্থ, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে

ধর্মান্ধ গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বাবরী মসজিদ যখন ভাঙলো তখন নরসীমা রাও ঘুমিয়ে না থাকলে তা ঘটতো না। এরশাদ আমলে দাঙ্গা না চাইলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হতো না। আওয়ামী লীগের একাংশ ভোটের আশায় প্রথম তিন বছর সরকারকে বাধ্য করেছে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রতি নমনীয় হতে। যদি তা না হতো তাহলে হয়ত এ-ধরনের ঘটনা ঘটতো না। আরেকটি উদাহরণ দিই। সরকার ধর্মান্ধ এবং ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি ও ব্যবসা করে তাদের প্রতি খানিকটা কঠোর হওয়ার পর রাজপথে আর তাদের উল্লাস পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু সামরিক শাসকরা গত কুড়ি বছরে যা সর্বনাশ করার তা করে দিয়ে গেছেন। সম্প্রতি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দক্ষিণ এশীয় সম্মেলন হয়ে গেল। লক্ষণীয় তার একদিন পর বানিয়ারচরে গির্জায় মানুষ হত্যা করা হলো। অর্থাৎ এরা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চাচ্ছে এ বলে যে, তোমরা কিছুই করতে পারবে না। আমাদের পক্ষ অনেক শক্তিশালী। এ শক্তিশালীকরণটি হয় অনেকভাবে। যেমন দক্ষিণ এশীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সম্মেলন নিয়ে অনেক রটনা শুনেছি। এম আর আখতার মুকুল তো সম্মেলনের মুখ্য সমন্বয়কারী শাহরিয়ার কবিরকে প্রকারান্তরে আইএসআইয়ের এজেন্টই বানিয়ে ফেললেন। উদ্যোক্তাদের তার সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত করলেন। তিনি অবশ্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, নির্বাচনের পর সম্মেলন করতে। ঐ সময় এটি করলে কি শাহরিয়ার এজেন্ট হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেতেন? কারণ তিনি মনে করেছিলেন, এ সম্মেলন নিয়ে ঝামেলা হতে পারে নির্বাচনে হয়ত প্রভাব পড়তে পারে। এ ধরনের ধারণা আমাদের পক্ষে যায় না। প্রধানমন্ত্রী যে সম্মেলনের প্রতিনিধি ও সমন্বয়কারীদের চায়ের নিমন্ত্রণ জানালেন তাহলে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা কী দাঁড়াল। তিনিও কি এজেন্ট হয়ে গেলেন? জনাব মুকুলের লেখার প্রতিবাদ করতে অনেকে বলেছিলেন, নানাবিধ তথ্যও দিয়েছিলেন। আমরা কেউ তার প্রতিবাদ করিনি। কারণ তাহলে জনাব মুকুলের বিরুদ্ধাচারণ করতে হয়। জনাব মুকুল আমাদের অনেককে সন্দেহ করতে পারেন। কিন্তু আমরা তাকে মৌলবাদী বা ইনকিলাবী ভাবি না। *'জনকণ্ঠ'* এ দেশে মৌলবাদের "আফগানিস্তানের তালেবানরা যেভাবে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন বৌদ্ধ মূর্তি ভেঙ্গেছে তা পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। তিনি খ্রিস্টান স্কুলে পড়ার সময়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত চার্চে যেতেন। এতে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি।" (*জনকণ্ঠ* ৫.৬.০২)।

এ কথা ভুল যে, বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তলোয়ারের জোরে, এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুফীদের কারণে, যারা সাম্য ও শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন যা ইসলামের মূল উপাদান। সুতরাং বোমা মেরে অন্য সব ধর্ম নাকচ

করে, উদারমনা মানুষকে হত্যা করে যারা ভুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান তারা মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন। বোমা মেরে শুধু মানুষ হত্যা করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক মনোভাব বিলোপ করা যায় না। আমাদের হতাশা এই যে, অধিকাংশ রাজনৈতিক দল মনে করে মৌলবাদীদের প্রতি নমনীয় থাকলে ভোটের সুবিধা হয়। তাহলে প্রশ্ন চরের পীর, মুফতি নামধারী ব্যক্তি বা জামায়াতে ইসলাম কেন একচেটিয়া ভোট পায় না?

ধর্মান্ধতা, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা বা মৌলবাদ কোনো ধর্মেরই অংশ নয়। সব ধর্মই শান্তির পক্ষে। কোনো দল যদি মনে করে তাদের ছাড় দিলে সুবিধা হবে তাহলে তারা ভুল করবে। ফলে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব ধর্মের ও দলের মানুষকেই এ অশান্তকামীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। এক্ষেত্রে যারা এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে তাদেরই সমর্থন করতে হবে। কারণ 'মৌলবাদের অন্ধকার' দেশ গ্রাস করলে আপনার ও আপনার সন্তানের ভবিষ্যত বলে কিছু থাকবে না। আপনি, আপনারা কি তাই চান?

এ দেশে মৌলবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার পত্রিকা যা কখনো এ সব বিষয়ে নমনীয়তা দেখায়নি। সে পত্রিকায় এ ধরনের বাক-বিতন্ডা মানুষকে বিভ্রান্তই করবে। আমাদের লড়াই ইনকিলাব জাতীয় পত্রিকার বিরুদ্ধে। আমরা পরস্পরের প্রতি যদি সহনীয় না হয়ে যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করি, নিজের অতীত না দেখি তাহলে আমাদের পক্ষের মানুষকে আরো বিভ্রান্ত করা হবে। এ-ধরনের বেশ কিছু ঘটনা এ সম্মেলনের সময় ঘটেছে যা অকারণে মানুষকে বিভ্রান্ত করে আর বোমাবাজদের শক্তিশালী করে তোলে।

কোনো ধর্মেই বোমা মেরে মানুষ হত্যা করার বিধান নেই। বাংলাদেশে এসব ঘটনা ঘটানোর পিছে আন্দাজ করা হচ্ছে তালেবানীদের ভূমিকাই মুখ্য। বর্তমান সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই এ সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য তাদের উৎপাত শুরু করেছে। এ নিয়ে জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা হয়েছে। সরকার তা উপেক্ষা করেছে। পাকিস্তানেও বিভিন্ন সরকার তাই করেছে। ফলে পরিস্থিতি এমন যে, এসব গ্রুপ একত্রিত হয়ে সামরিক সরকারকেও হটিয়ে দেয়ার মতো শক্তি অর্জন করেছে। এ কথা জানিয়েছেন পাকিস্তানে বসবাসরত বিশিস্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হামজা আলভী।

বাংলাদেশেও এমন হতে পারে। কারণ উদীচী থেকে বানিয়াচরের ঘটনায় কিছু গ্রেফতার ছাড়া আর কিছুই হয় নি। আইনগত বিষয় তেমন জানি না। কিন্তু এসব ঘটনার তদন্ত ও দ্রুত চার্জশীট দেয়ার জন্য কি বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া যেত না? এবং এসব ঘটনার দ্রুত বিচার নিষ্পন্ন করার জন্য কি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যেত না। এখন পর্যন্ত এ সব ঘটনায় কেউ শাস্তি না পাওয়ায় এসব ঘটছে ও ঘটবে।

তালেবানী, ইনকিলাবী বা এদের সহযোগীদের কাছে ধর্ম বড় বিষয় নয়। তাদের মূল বিষয় হচ্ছে ধর্মকে সামনে রেখে ক্ষমতা হস্তগত করা এবং সে ক্ষমতার অর্থ হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকী সবাইকে ক্রীতদাস করে রাখা। ধর্ম বা ধার্মিকতাই যদি মূল হয় তাহলে নিরস্ত্র মানুষকে কেন এখাবে হত্যা করা হবে। পাকিস্তানের বিশিস্ট পণ্ডিত এএইচদানী মৌলবাদ বিরোধী সম্মেলনে বলেছেন, "আফগানিস্তানে যা হয়েছে তা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের জন্য অশনি সঙ্কেত।

৯ জুন, ২০০১

রাজাকার নিয়ে কীভাবে অন্ধকার থেকে আলোয় নেবেন?

কথাটা সুন্দর ভারি সুন্দর। আগে এ কথা বলতেন দার্শনিক, সাহিত্যিক শিক্ষকরা। এখন বলেন, রাজনীতিবিদরা। অন্ধকার থেকে আলোয় নেয়া। আমাদের রাজনীতিবিদরা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিতে চান। গত তিন দশক ধরেই চাচ্ছেন, তাতে কতটা আলোকিত হয়েছি সে আপনারাই বিবেচনা করবেন।

এ কথা আবার মনে পড়ল পত্রিকার শিরোনাম দেখে "বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারঃ জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার অঙ্গীকার।" (*যুগান্তর* ৮.৯) বত্রিশ দফা প্রতিশ্রুতি দিয়ে খালেদা জিয়া জানাচ্ছেন যে জাতিকে তিনি আলোকিত করবেন। এর অর্থ জাতি গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে আওয়ামী লীগের সময় ছিল তমসাচ্ছন্ন। অথচ বিএনপি ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে শাসন করেছে এক দশক। এর মধ্যে তাঁর পাঁচ বছরও অন্তর্গত। অর্থাৎ শুধু আওয়ামী লীগ নয়, তাদের শাসনামলও ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন।

এখানে একটু দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলি। অন্ধকার থেকে আলোয় নিতে গেলে একক নেতৃত্বের দৃঢ় পদক্ষেপে আলোকিত করার কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে হলে বেগম জিয়া যে বলেছেন, তিনি আলোকিত করবেন, তাঁর হাতে সেই মশাল দূরে থাকুক, হারিকেনও তো দেখি না। বেগম জিয়াকে দেখুন, সুন্দর ছিমছাম, কনফিডেন্ট। তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঃ বিএনপির আরো অনেক মহিলাও আছেন। কিন্তু মইত্যা রাজাকার নামে খ্যাত মতিউর রহমান নিজামীর স্ত্রীকে কখনো দেখেছেন বা আমিনীর? তাঁদের ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বের হলেও তাদের বাধ্যতামূলকভাবে সৌদি বোরকা পরতে হয়। সাইফুর রহমানকে দেখেছি সব সময় সাফারি স্যুটে এবং যতটা সম্ভব ভদ্র ভাষায় কথা বলতে। আমিনী পানের পিক ফেলতে ফেলতে অশালীন ভাষায় কথা বলেন। এরা সবাই মুসলমান। এর অর্থ, সব মুসলমান এক নয়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন। শিফন ও বোরকার অনেক তফাত, একটি নব্য ধনবানের যিনি আলোকিত হতে চাচ্ছেন। আরেকটি চূড়ান্ত রক্ষণশীলতার। এ অমিলের মিল হলে না হয় একক নেতৃত্ব বা দৃঢ়ভাবে চলা সম্ভব। কিন্তু তেল জলে কি মেলা সম্ভব? বিএনপির ৩২ দফা প্রতিশ্রুতিতে কী আছে আলোকিত করার? যেমন বলা হয়েছে সংসদের আসন হবে ৫০০। হতে পারে

কিন্তু ৩০০-এর সংসদেই বিএনপি চার বছর এল না। ৫০০ দিয়ে কী করব? আরো ব্যয় অপচয়, হানাহানি। প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আধুনিকীকরণ। এই তোয়াজে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা এক নম্বর। চামচারা নেতানেত্রীকে তৈলাক্ত করে ফেলেন আর সেই তেলের সঙ্গে নিজেরটুকু যোগ করে নেতারা সেনাদের সিক্ত করেন। সেনাবাহিনীর ডাণ্ডার ভয় সবার জব্বর। এমনকি প্রবল প্রতাপান্বিত আমলা উপদেষ্টারাও সে ভয়ে জর্জরিত। বেচারা শাহ ফরিদ, তাঁর ভাই নির্বাচন করছেন, তিনি হারালেন তাঁর পদ। শুনেছি, অনেক সেনা কর্মকর্তার ভাই বেরাদর নির্বাচন করছেন, তাঁদের কিন্তু বদলি হয়নি। যা হোক সেনাবাহিনী আধুনিকীকরণ বর্তমান বিশ্বে প্রধান অগ্রাধিকার নয়। সেটি জাতীয় অপচয়ের খাত বৃদ্ধি করে। এরপর আছে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের সম্পদের হিসেব। ন্যায়পাল নিয়োগ। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ। ত্রিশ বছর শুনেছি এসব কথা। আর কত শুনব? বেগম জিয়া আরো বলেছেন বেতার টিভির স্বায়ত্তশাসন দেবেন। এ মিথ্যাচারের দরকার ছিল না। এর আগে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি রাখেননি। আওয়ামী লীগও প্রায় একই রকম করেছিল। আসলে তথ্য মন্ত্রণালয় লুপ্ত হওয়া উচিত। এটি একটি নুইসেন্স, অপচয়মূলক খাত। আরো কিছু আছে যা হয়ত আরো কিছু পলিটিক্যাল পার্টির ফরমানে পাওয়া যাবে। তা হলো স্থায়ী বেতন ও মঞ্জুরি কমিশন গঠন, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, গঙ্গার পানি চুক্তির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সংবিধানিক সমাধান, গ্রাম সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ইন্টারনেট পল্লী প্রতিষ্ঠা, সব বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল সরকারিকরণ। এর মধ্যে দু'একটি ছাড়া কিছুই করা সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে অনায়াসে নিশ্চিত হতে পারেন।

বিএনপি ঘোষণা করেছে, সংসদে তারা মহিলাদের আসন বৃদ্ধি করবে। আপনাদের কি মনে আছে মহিলা আসন সংরক্ষণের জন্য তখন বিএনপির প্রতি কত আবেদন জানানো হয়েছিল। তাঁদের জন্য শেষ সংসদের শেষ দিনও অপেক্ষা করা হয়েছিল। তাঁরা আসেননি। এখন বলছেন, মহিলাদের আসন সংরক্ষণ করবেন মহিলারা তা বিশ্বাস করেন? না মনে করেন এ গরু মেরে জুতা দান।

স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করবে কি বিএনপি? যার নেতাদের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের এখনও সুরাহা হয়নি। ধরা যাক, তারা সরকার গঠন করল। নেতারা এ ধরনের কমিশন গঠন করতে দেবেন?

বিএনপি ইশতেহারে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ১ হাজার কোটি টাকার আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। (*ভোরের কাগজ* ৯.৮) ইশতেহারে ব্যক্তিগত আক্রমণ এই প্রথম। মনে হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশনের ঘোষণা আওয়ামী লীগকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে দুর্নীতি হয়নি এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া ১৯ জনের নাম ধরে ইশতেহারে বক্তব্য

রাখা আর যাই হোক, আলোকিত মনের পরিচয় নয়। নির্বাচন বিধির ১৭ ধারায় বলা হয়েছে "কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দল কিংবা প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোনো ধরনের তিক্ত, উস্কানিমূলক এবং ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না।" এর আগেও বেগম জিয়া বলেছেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মিলিটারি ও ধর্ম থাকবে না, যা মারাত্মক অভিযোগ। তবে আপনারা নিশ্চিত থাকুন জনাব সাঈদ বিএনপির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবেন না। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম সাংবিধানিক সমস্যার বেগম জিয়া কী সমাধান করবেন? শান্তিচুক্তির পর যিনি বলেন, ফেনী পর্যন্ত ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে তাঁর মুখে আর যাই হোক এটা মানায় না। শান্তিচুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে কি বড় রকমের কোনো অশান্তি হয়েছে?

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মন্ত্রণালয় গঠন করবে। যারা আলবদরপ্রধান নিজামী বা মইত্যা রাজাকার নামে যিনি খ্যাত ও যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে ঐক্য করে, তারা এ কথা বললে কী বলবেন? স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ না হলে এ ধরনের অঙ্গীকার সম্ভব? যুদ্ধাপরাধী সা. কা. চৌধুরীর দুর্দান্ত সব গালি হজম করে যিনি সাকাকে ধানের শীষ প্রতীক উপহার দেন তিনি এ কথা বললে বলতে হয়, সূর্য পশ্চিমে উঠতে পারে। তবে বলে রাখি, বাংলাদেশে কিন্তু এটাও সম্ভব।

মন্ত্রণালয় দূরে থাকুক, নিজামী-আমিনীদের নিয়ে ক্ষমতায় এলে দেশে বোরকার যুগ প্রবর্তনে বাধ্য হবে বিএনপি। গার্মেন্টসে কর্মরত মহিলাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ হবে। পাঠ্যপুস্তকের বদল হবে। বিএনপি সমর্থক তরুণদের বলি, তাদের আর আধুনিক তারুণ্যের স্বপ্ন দেখতে হবে না। লক্ষণীয় যে, বিএনপির বিরুদ্ধে জামায়াতে বিদ্রোহী প্রার্থীদের তিরস্কার বা বহিস্কার কোনটাই করা হয়নি। কারণ, বিএনপি প্রার্থী হারা জেতাতে জামায়াতের কিছু আসে যায় না, তাদের জিততে হবে। ধর্ম মানুষকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে না, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদও নয়। এ সব বিবেচনা করে বলা যেতে পারে, ঐক্যজোট জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে নয়, আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাবে, ইশতেহারে যাই লেখা থাকুক না কেন।

১০ সেপ্টেম্বর, ২০০১

খালেদা জিয়ার পাকা ধান কেটে নিচ্ছে নিজামী-সুবাহান!

গত এক দশকে এত উত্তেজিত হননি ১৯৭১ সালে সারা পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর প্রধান মতিউর রহমান নিজামী। তিনি পাবনা-১ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন। এক বিবৃবতিতে তিনি বলেছেন, "ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি চারদলীয় জোটের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইয়া চরিত্র হনন করিয়া জনগণের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করিতেছে।" [*ইত্তেফাক*, ১২.৯]। তা ছাড়া যুদ্ধাপরাধী সাঈদী সুবাহান, ইউসুফ প্রমুখও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও এডাব প্রশিকার তৎপর তার নিন্দা জানিয়েছেন।

নিজামীকে সবাই ঠাণ্ডা মাথার লোক হিসেবে জানেন। ঠাণ্ডা মাথা না হলে ১৯৭১ সালে তিনি আলবদর বাহিনীর প্রধান হতে পারতেন না। ১৯৭১ সালে সারাদেশে যে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে আলবদররা, তার জন্য ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনা দরকার। আলবদররা তা করতে পেরেছিল। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যে গত এক দশক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে নিজামী তার বিপক্ষে তেমন কিছু বলেননি। এখন তিনি ক্ষেপলেন কেন? এই সংগঠনটিকে 'সন্ত্রাসী' বললেন কেন?

নিজামী পাবনা-১ থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আছেন আবু সাইয়িদ। নিজামী ছিলেন '৭১-এর পাকিদের দোসর। আবু সাইয়িদ মুক্তিযোদ্ধা। গতবার জিতেছেন আবু সাইয়িদ। এবার জিততে চান নিজামী। তাঁর ধারণা চারদলীয় জোটের ঐক্য মানে সব ভোট পাওয়া যাবে। তাত্ত্বিক দিক থেকে সব ঠিক ছিল কিন্তু বাস্তবে একটু ঝামেলা হচ্ছে।

সেই এলাকায় প্রশ্ন উঠেছে, নিজামীকে কেন মইত্যা রাজাকার বলা হয়? তার মানে, ১৯৭১-এ সে রাজাকার ছিল। না, রাজাকার নয়, আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিল। ১৯৭১-এ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা শুধু নয়, নিজ এলাকায় নিজামীর নেতৃত্বে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। বিশ্বাস না হলে বেড়া থানার বৃশলিকা গ্রামের আমিনুল ইসলাম ডাবলু, শোলবাড়িয়ার মাধবপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কুদ্দুস, সাথিয়া থানার মিয়াপুর গ্রামের মোঃ শাহজাহান আলীকে জিজ্ঞাসা করুন। শাহজাহান আলী বেঁচে যান। তাঁর গলায় এখনো নিজামীদের ছুরির দাগ আছে। ঢাকা শহীদ মিনারে

গত বছর ৭ ডিসেম্বর বেড়া থানার বৃশলিকা গ্রামের আব্দুল লতিফ বলেছিলেন, "একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাবনায় যিনি 'মইত্যা' রাজাকার হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনিই জামায়াতে ইসলামীর নতুন আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। একাত্তরের নিজামীর আরেকটা পরিচয় ছিল। পাবনা-বেড়া-সাঁথিয়ার মানুষ তাঁকে মইত্যা রাজাকার হিসাবে চিনতেন। তাঁর মতো খুনী আজও টিকে আছে, যা দুঃখজনক।'

এসব খবর নতুন প্রজন্ম জানার পর তারা বলছে, খুনীকে ভোট দেব কিভাবে? অবস্থা নিজামীর এতই প্রতিকূলে যাচ্ছে যে, তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, "ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় থেকে জামায়াতের প্রতিটি আসনে জামায়াতকে ভোট না দেয়ার জন্য চিৎকার করে বেড়াচ্ছে।" [*জনকণ্ঠ*, ২০.৯]।

নিজামী আরেকটা মিথ্যা বললেন। রাষ্ট্র এখন, ভালো করে জানেন, বিএনপি তালেবানদের তত্ত্বাবধায়কদের অধীনে। সুতরাং তারা ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিকে পছন্দ করবে কেন? স্বয়ং রাষ্ট্রপতি রাম শ্যাম যদু মধু সবাইকে সাক্ষাতকার দিলেও নির্মূল কমিটি তাঁর সাক্ষাতকার পায়নি। নিজামী যতটা সন্ত্রাসের সঙ্গে পরিচিত আর কেউ ততটা নয়। কোরান হাতে নিয়ে বলেন তো তিনি ১৯৭১-এ কী করেছেন? নিজামীর হাতে রক্তের দাগ আছে। নির্মূল কমিটির হাতে নেই, অস্ত্র ব্যবহারও তারা জানে না।

ইসলামের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা তো সত্য কথা বলেন। শান্তির বাণী যাঁরা প্রচার করেন তাঁদের সঙ্গেই তাঁরা থাকেন। নিজামী ১৯৯৫ সালের ১৩ আগস্ট বিএনপি সম্পর্কে বলেছিলেন– "বর্তমান সরকারের আমলে গত আড়াই বছরে ৫ হাজার ২৯৩ জন খুন হয়েছে। দেশ আজ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের নিকট জিম্মি *[ইত্তেফাক]*। সেই সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে তিনি জোট বাঁধেন কিভাবে নিজে সন্ত্রাসী না হলে? তিনি আরো বলেছেন 'ইসলামী জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না।' এ সরকারের অধীনে ইসলাম রক্ষা করতে হলে নিজামীর ভাষায় ধানের শীষে ভোট দেয়া সম্ভব নয়। এখন নিজামী বলুন ঐ সব কথা মিথ্যা! এটি অস্বীকার করলে তিনি মোনাফেকীর দায়ে পড়বেন। কারণ এগুলো পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তাঁরই পত্রিকায়। সুতরাং, জামায়াতের আমিরকে কি বলবেন?

নিজামীরা মওদুদী মতবাদের অনুসারী। মওদুদী বলেছেন, 'নির্বাচনী প্রচারণা শিকারি কুকুরদের দৌড়।' শুধু তাই নয়, 'গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট বা সংসদের সদস্যপদ গ্রহণ করাও হারাম, প্রার্থীদের পক্ষে ভোট প্রদানও হারাম।' নিজামী তাহলে তাঁদের গুরুকে সম্পূর্ণভাবে অমান্য করছেন। জামায়াতের এই আমির বলুন প্রকাশ্যে যে মওদুদীকে তাঁরা ঘৃণা করেন।

পাবনা-৫ আসনে দাঁড়িয়েছে জামায়াতের যুদ্ধাপরাধী আবদুস সুবাহান। এই

লোকটি '৭১-এ গণহত্যার সঙ্গে জড়িত। পাবনার কালাচাঁদপাড়ার অধ্যক্ষ গণি জানিয়েছেন, 'মে মাসে পাবনার ফরিদপুর থানার ডেমরাতে মাওলানা আব্দুস সুবাহান, মাওলানা ইসহাক, টেগার ও আরো কয়েকজন দালালের একটি শক্তিশালী দল পাকিস্তানী আর্মি নিয়ে ব্যাপক গণহত্যা করে। সেখানে ঐ দিন আনুমানিক ১০০০ মানুষ হত্যাসহ ঘরবাড়ি পোড়ানো, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন ইত্যাদি করা হয়।

বিএনপি জোট এই সব হত্যাকারীকে বিভিন্ন জায়গায় নমিনেশন দিয়েছে। যেমন '৭১-পূর্ব তাবিজ বিক্রেতা দিইল্যা রাজাকার ওরফে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে জামায়াত নেতা ওরফে যুদ্ধাপরাধীকে পিরোজপুরে নমিনেশন দিয়েছে। শেখ হাসিনার নামে যে অশ্লীল ক্যাসেট প্রকাশ করেছে যা নির্বাচনবিধি ভঙ্গ। কিন্তু নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ আনা সত্ত্বেও তা বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি। কেন দেয়া হয় নি এটা সবাই জানে। পিরোজপুরবাসী জেনে রাখুন, সাঈদী বিদেশে যেখানে গেছে বাঙালিরা সেখানেই তাকে প্রতিরোধ করেছে। তালেবান ৭ জনকেও নমিনেশন দিয়েছে ঐক্যজোট। জোটের লক্ষ্য, বিভিন্ন জায়গায় এদের জিতিয়ে ছোট ছোট পাকি উপনিবেশ সৃষ্টি এবং অন্তিমে পুরা বাংলাদেশকে পাকিস্তানে পরিণত করা। আপনারা কি পাকিস্তান বাংলাদেশে থাকতে চান, না বাংলাদেশে থাকতে চান? আপনাদের স্ত্রী-কন্যা, পরিবার-পরিজনের ইজ্জত অক্ষুণ্ন রাখতে চান, নাকি ১৯৭১-এর অবস্থায় পড়তে চান?

পাবনা ও অন্যান্য জেলার ভোটারদের বলি, বিশেষ করে বিএনপির নতুন প্রজন্মকে। ধরা যাক আওয়ামী লীগের আবু সাইয়িদ খারাপ, নিজামী কি তাঁর চেয়ে ভালো? আপনি কি চান আপনার এলাকা পাকি এলাকা হিসেবে পরিচিত হোক? যদি না চান তাহলে বিবেচনা করুন ১ অক্টোবর কী করবেন। খবর পাওয়া গেছে ঐ সব এলাকায় নতুন প্রজন্মের বিএনপিরা বলছে দরকার হলে তারা ভোট কেন্দ্রে যাবেনা। তারা ছাড় বেঁধেছে–

খালেদা জিয়ার পাকা ধান
কেটে নিচ্ছে নিজামী-সুবাহান।

২২ সেপ্টেম্বর, ২০০১

একজন যুদ্ধাপরাধীর মৃত্যু

বাংলাদেশে গণহত্যার প্রধান নায়ক, যুদ্ধাপরাধী জেনারেল-টিক্কা খানের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশের গণহত্যার জন্য তিনি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। অথচ আশ্চর্য সরকারি কোনো নথিপত্রে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে টিক্কা খানের নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে টিক্কা খান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও 'খ' অঞ্চলের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণ সেপাই হিসেবে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ পদে আরোহণ করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় রান অব কচ বা কচ্ছের যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এলিটদের চোখে পড়েন এবং তার পর ধীরে ধীরে সেনা এস্টাবলিশমেন্টে স্থান করে নেন। তাঁর হিংস্রতা লক্ষ্য করে জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠান। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। তার পর দায়িত্ব গ্রহণ করেন জেনারেল নিয়াজী। অবশ্য জেনারেল নিয়াজীকে প্রথম থেকে পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়েছিল। টিক্কা খান চলে গেলে গভর্নর হন আবদুল মালেক।

টিক্কা খান চলে এলে গভর্নর হিসেবে তাঁর শপথগ্রহণ করাতে অস্বীকার করেন প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী। টিক্কা খান প্রথম থেকেই বাঙালিদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। ২৫ মার্চের আগে তিনি ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করে পরিস্থিতি জানতে চান। তৎকালীন পুলিশ কর্মকর্তা এএম মেছবাহউদ্দিন তাঁকে সামগ্রিক পরিস্থিতি ব্রিফ করে জানান, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছাড়া সঙ্কট উত্তরণ করা যাবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই বিধেয়। টিক্কা খান ভুরু কুচকে বলেছিলেন, 'ইউ আর আস্কিং ফর দি মুন। এ উক্তি থেকেই বোঝা যায়, ক্ষমতা হস্তান্তর না করার সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হয়েছিল।

২৫ মার্চ, গণহত্যা শুরুর দায়িত্ব তাঁর ওপরই বর্তায়। কারণ তিনি গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন। ২৫ মার্চ গণহত্যার পর ২৬ মার্চ রাতে বঙ্গভবনে সেনা অফিসারদের নিয়ে তিনি এক নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন। ২৬ মার্চের কথা মনে হলে এই ছবিটির কথা মনে হয়। হাজার হাজার বাঙালিকে হত্যা

করে রক্তেরঞ্জিত হাত নিয়ে খুশিমনে সেনা অফিসারদের নিয়ে নৈশভোজ সারছেন জেনারেল টিক্কা।

গণহত্যা শুরু হওয়ার পর ৯ এপ্রিল বিচারপতি সিদ্দিকীর কাছে তিনি শপথ নেন। এবার আর বিচারপতি সিদ্দিকী শপথ পড়াতে অস্বীকার করেননি। আসলে রাস্তার ব্যাপারটিও বিচারপতিদের অনেকাংশে প্রভাবিত করে। এর পর থেকে বাংলাদেশের যা ঘটেছে তার জন্য টিক্কা খান অবশ্যই দায়ী। পাকিস্তানে গিয়ে জেনারেল টিক্কা খানের সাক্ষাৎকার নেয়ার চেষ্টা করেছি কয়েকবার (১৯৯৮)। তাঁর পরিবার থেকে জানানো হয়েছে, তিনি সাক্ষাৎকার দেয়ার পর্যায়ে নেই। স্মৃতিভ্রম ঘটেছে।

১৯৭১ সালের ঘটনা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলাপ করেছি। কিন্তু আশ্চর্য, টিক্কা খান সম্পর্কে তেমন কোনো মন্তব্য কেউই করেননি। সবাই ক্ষিপ্ত জেনারেল নিয়াজীর ওপর। বরং অনেকে টিক্কা খানকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। টিক্কা খান সম্পর্কে জেনারেল নিয়াজীই কিছু মন্তব্য করেছেন। হামুদুর রহমান কমিশনও টিক্কা খান ও ফরমান আলীকে কোনো কিছুর জন্য দায়ী করেনি। এর একটি কারণ, টিক্কা ঢাকা ছেড়ে আগেই চলে গিয়েছিলেন। টিক্কা খান পরে যোগ দিয়েছিলেন ভুট্টোর সঙ্গে। ভুট্টোর নির্দেশে তিনি বেলুচিস্তানে কম্বিং অপারেশন করেন অনেকটা ঢাকা স্টাইলেই এবং 'বেলুচিস্তানের কসাই' উপাধি লাভ করেন। পাকিস্তানের সম্মানিত রাজনীতিবিদ শেরবাদ খান মাজারির আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। উল্লেখ্য, ভুট্টো টিক্কাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান করেছিলেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী বলেছেন, 'টিক্কা খান ভেবেছিলেন ২৫ মার্চের অ্যাকশন ১০ এপ্রিলের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তারা মানুষের ক্রোধের গভীরতা বোঝেনি।

জেনারেল নিয়াজী সাক্ষাৎকারে আমাদের জানিয়েছিলেন, টিক্কা খান বলেছিলেন বাগদাদে চেঙ্গিস খান বা হালাকু খান যে রকম নির্মমতা দেখিয়েছিলেন তা দেখাতে হবে। তিনি বলেছিলেন, তিনি মাটি চান, মানুষ নয়। ইয়াহিয়া এসব দেখেশুনে ভড়কে টিক্কা খানকে দশ দিনের মধ্যে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এখানে বলা দরকার, কোনো জেনারেলকে যদি অপারেশনের মধ্যে সরিয়ে দেয়া হয় তালে তা তাঁর জন্য মৃত্যু পরোয়ানার মতো।'

জেনারেল রাও ফরমান আলী এর উত্তরে আমাদের জানান, "আমি দুঃখিত, কিন্তু আমাকে বলতে হচ্ছে, জেনারেল নিয়াজী একজন মিথ্যাবাদী। টিক্কা খান কখনও ঐ ধরনের উক্তি করেননি। গভর্নর হিসেবে তিনি ছিলেন চমৎকার, অথচ দুর্ভাগ্য যে, বেলুচিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানে তার একই দুর্নাম রটেছে।" হ্যাঁ

চমৎকারভাবে তিনি গণহত্যা চালাতে পারতেন। যদি বলা হয় টিক্কা খান কিছুই করেননি, তাহলে বলতে হবে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে কোনো গণহত্যা ঘটেনি। অবশ্য অধিকাংশ পাকিই তা মনে করে।

টিক্কা খান কতটা বোধহীন ও নির্মম তার একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করছি। পাকিস্তানের সাংবাদিক এমভি নকভী এক সাক্ষাৎকারে আমাদের বলেছিলেন, "পাকিস্তানি বাহিনী ছিল বিশৃঙ্খলা লুটেরা বাহিনী, এরা লুট করেছে, ধর্ষণ থেকে শুরু করে সব রকমের অপরাধ করেছে। এ সেনাবাহিনী কত বোধহীন ছিল তার প্রমাণ জেনারেল টিক্কা খানের মন্তব্য। ঢাকা থেকে ফেরার পর সাংবাদিকরা যখন লুট, ধর্ষণ, হত্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, "ধর্ষণের সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত। মাত্র তিন হাজার, মাত্র তিন হাজার মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে।" ক্রোধে নকভীর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পাকিস্তানীরা ৮৭ বছরের টিক্কা খানকে সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করেছে। সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু টিক্কা খান বাঙালি ও বিশ্ববাসীর কাছে 'বাংলার কসাই' হিসেবে পরিচিত থাকবেন। আমাদের দুঃখ, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আমরা তাঁর বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছি।

ওদের বিরুদ্ধে মামলা হবে?

টিক্কা খানের মৃত্যুর সংবাদ বাসস পরিবেশন করেছে রয়টারের বরাত দিয়ে। খবরে বলা হয়েছে, "১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে টিক্কা খান সামরিক ক্র্যাকডাউনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি হিসাবে আবির্ভূত হন।" জোট সরকার যে ইতিহাস এখন শেখাচ্ছে এই বক্তব্য তার সম্পূর্ণ বিরোধী। জেনারেল জিয়ার নাম তারা কোথাও উল্লেখ করেনি। অথচ একজন মেজর হিসেবে কিছুদিন একটি সেক্টরের অধিনায়কত্ব করে তিনি বাঙালিকে স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ চৌধুরী এখনো বাসসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেননি। রয়টারের বিরুদ্ধে মামলা করার মুরোদ না থাকলে (রয়টারের প্রধানের সঙ্গে আলতাফ চৌধুরী সাক্ষাৎ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ) অন্তত তার খবর পরিবেশন বন্ধ করুন। এভাবে এরা জোট সরকারের ইতিহাসের বিরোধিতা করবে আর আপনারা তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করবেন না তা কি করে হয়?

৩১ মার্চ, ২০০২

নিজামীর পলায়ন ॥ দিগন্তে সামান্য আশার আলো

খবরটি হয়ত অনেকে পড়েছেন। অনেকের হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে। জোট সরকারের বা জামাত-বিএনপির পত্রিকার জোর বেশি, তারা খবরটি ছোট করে ছেপেছে। অন্যদের কাগজের জোর কম স্বাভাবিকভাবেই, কিন্তু খবরটা তারা বড় করে ছেপেছে, দৈনিক সংবাদ তো একেবারে প্রথম পাতায়। খবরটা সবাইকে ছাপতে হয়েছে এত ডামাডোলের ভেতরও। কারণ জামাতি-বিএনপি শাসনে এ ধরনের ঘটনা ঘটা অভাবনীয়। ঘটনাটি কী?

মুক্তিযুদ্ধের সময় মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন আলবদর বাহিনীর প্রধান। এ বাহিনীর কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা। নিজামীর নেতৃত্বে এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছিল। নিজামী একজন যুদ্ধাপরাধী। তাকে বা তার দলকে রাজনীতির সুযোগ দিয়েছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান, যাকে অকারণে স্বাধীনতার ঘোষক বলা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজামী ও তার দল জামাতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। একথা আমাদের জেনারেশনের অজানা নয় কিন্তু এখন অনেকে তা বিস্মৃত বা স্মৃতিভ্রষ্টের ভান করেন। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের পক্ষে ধারণা পাওয়া মুশকিল যে সফেদ শ্মশ্রু সম্বলিত মোলায়েম চেহারার মন্ত্রী নিজামীর হাত রক্তরঞ্জিত, খুনি বা মস্তান বাহিনীর সে ছিল প্রধান কারণেই এই ভূমিকা দিতে হলো। বেগম খালেদা জিয়া তার স্বামীর আরদ্ধ কার্য সম্পন্ন করেছেন আলবদর বাহিনীর সাবেক প্রধান এ দেশের প্রধান মৌলবাদী দলের আমির নিজামীকে কৃষিমন্ত্রী করে। এটি এক ধরনের প্রতিশোধ বাংলাদেশের জন্মের বিরুদ্ধে। পাকি-রা এ প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, পারেনি কিন্তু বাঙালি পেরেছে নিজের পিঠে ছুরি মারতে। অবশ্য এ কাজে বাঙালি সবসময় পটু। নিজামীকে কৃষিমন্ত্রী করার আরেকটি কারণ আছে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের কৃষকের ভূমিকা ছিল প্রধান। তাই তাদের বা তাদের পূর্বপুরুষের 'পাপের' প্রায়শ্চিত্ত যাতে হয় সে জন্যই নিজামীকে করা হয়েছে কৃষিমন্ত্রী।

নিজামী এখন নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে আমাদের খরচে, বাংলাদেশের পতাকা লাগিয়ে ফুর্তিতে ঘুরে বেড়ায়। সার্টিফিকেটধারী মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এবং ১৯৭২ থেকে প্রতিটি সরকার বাংলাদেশের মানুষকে অপমান করেছে, এভাবে যে, প্রায় ৬ কোটি ৪৯ লাখ মানুষ তখন দেশে ছিল তারা অমুক্তিযোদ্ধা কাপুরুষ। যে ১ কোটি পলায়ন করেছিল তারা রিফিউজি। আর যে ১ লাখ পালিয়েছিল বা

দেশ ত্যাগ করেছিল বা যুদ্ধ করেছিল তারা শুধু মুক্তিযোদ্ধা, সাহসী সন্তান। নিজামীরা পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর এই সাহসী সন্তানরা এখন কী করে? একথা বললাম এ কারণে যে, আমরা তো ১৯৭১ সালে কাপুরুষ ছিলাম, এখনও তাই।

তাই এই নিজামী ৪ঠা মে সাভারে আম্রকানন ও ধান্যক্ষেত্র পরিদর্শন করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ (হয়ত মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল) করার মানসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেন। ঢোকার পরই বাঁধার সম্মুখীন হন। সবশেষে সাবেক আলবদর প্রধান 'ডেইরি গেট' দিয়ে প্রবেশ করেন। এ সময় প্রগতিশীল ছাত্রজোটের প্রায় অর্ধশতাধিক ছাত্রছাত্রী মন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ের যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে কবীর সারণির রাস্তায় শুয়ে পড়ে এবং মন্ত্রীকে ক্যাম্পাস ছাড়তে বলে। এ সময় মন্ত্রীর গাড়ি বহর বেশকিছু সময় আটকে থাকে। মন্ত্রীর সঙ্গে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তারা ছাত্রছাত্রীদের রাস্তা থেকে সরে যেতে বললেও তারা তাদের অবস্থানে অনড় থাকে। পরে মন্ত্রীর গাড়িবহর রাস্তা পরিবর্তন করে দ্রুত ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। এ সময় প্রগতিশীল ছাত্রজোট কর্মীরা মন্ত্রীর গাড়িবহরকে ধাওয়া করে এবং নিজামীকে লক্ষ্য করে 'ধর রাজাকার' শ্লোগান দিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল করে।' (*সংবাদ* ৫.৫.২০০৩)।

ঘটনাটি অভাবনীয় এ কারণে যে, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পর থেকে জামাত-বিএনপি'র যে তাণ্ডব শুরু হয়েছিল এখনও তা চলছে। এস্টাবলিশমেন্ট ও ইয়ার লতিফের ম্যান্ডেট পাওয়ার পর জামাত-বিএনপি ঝাঁপিয়ে পড়ে আওয়ামী লীগ ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর। এ অত্যাচার এমন পর্যায়ে পৌচেছে যে, বাংলাদেশকে মানবাধিকার লঙ্ঘনে প্রথম সারির মধ্যে ফেলা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধী ও মৌলবাদীদের নিয়ে সরকার গঠনের পর দেশটি মৌলবাদী দেশ হিসেবে বিদেশে পরিচিতি পেয়েছে, যে কারণে প্রবাসী বাঙালিরা এখন বিপদের সম্মুখীন। সেই জোটে সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রীকে ধাওয়া করল কিছু সাহসী যার ফলে সাবেক আলবদর নেতাকে পালাতে হলো! এটি গত দু'বছরে সবচেয়ে অভাবনীয় ঘটনা। প্রগতিশীল ছাত্রজোট সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। এই জোট যে ক্ষুদ্র তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের সাহস আকাশ প্রমাণ। উল্লেখ্য, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি ও আওয়ামী লীগের দুটি ছাত্র সংগঠন আছে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ। ছাত্রদল এখন শিবিরের সঙ্গে মিশে গেছে, ফলে তারা নিজামীকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে এটিই ছিল বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা তা করেনি। এ বিষয়টি লক্ষণীয়। আওয়ামী লীগ নেত্রী স্বয়ং এখন যুদ্ধাপরাধী ও জামাতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু যুদ্ধাপরাধীকে বাধা দেয়ার জন্য ছাত্রলীগের কেউ সেখানে ছিল

পত্রিকার খবরে তা পাওয়া যায়নি। এ বিষয়টি লক্ষণীয়।

এখানে একটি প্রশ্ন তোলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না। ইরাক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন সরকার এ দেশে পরিচিত হয়ে উঠেছে মানবতা লঙ্ঘনকারী ও যুদ্ধাপরাধী হিসেবে। এ কারণে, বাংলাদেশের মানুষ বুশ ও তার সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ বেলজিয়ামে সে সরকারের কিছু কর্তাব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের জন্য মামলা করা হচ্ছে। গত এক মাস এ কারণে মানুষের পদভারে দেশের রাজপথগুলো ছিল কম্পিত। কিন্তু এ দেশের মানুষ নিজের দেশের যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে- মিছিল করা দূরে থাকুক কোনো বক্তব্যও প্রদান করেননি। সুতরাং এ প্রতিবাদ কতটা যৌক্তিক? বিষয়টা কেমন দেখুন। এ দেশে সরকার গঠিত যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের দ্বারা। আর এ দেশের যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশে সব সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতিকর্মীরা। গত দু'বছরও সংস্কৃতি কর্মীরা এসব অনাচারের বিরুদ্ধে কম-বেশি প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল প্রায় নীরব। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে মধ্যে, মৃদুবাম ও বামদের একটা প্রভাব ছিল। কিন্তু গত দুবছরে তা অন্তর্নিহিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন দক্ষিণ ও চরম দক্ষিণপন্থীদের প্রবল প্রতাপ। এ পরিপ্রেক্ষিতেও জাহাঙ্গীরনগরের ঘটনাটি অভাবনীয়।

এ ঘটনার পরদিন সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা মৌন মিছিল ও সমাবেশ করেছে। শুধু তাই নয়, বিএনপি আওয়ামী লীগ ও বাম ধারার ১০২ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'জামায়াতে ইসলামীর কোনো নেতা ইতোপূর্বে ক্যাম্পাসে ঢোকার দুঃসাহস দেখায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন মৌলবাদী মনোভাবের কারণে এবার এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটল। বিবৃতিতে মতিউর রহমান নিজামীকে কুখ্যাত খুনি আলবদর বাহিনীর প্রধান বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।' (*প্র. আলো.* ৬.৫)।

বর্তমানের চরম দক্ষিণপন্থী আবহে জাহাঙ্গীরনগরের যারা প্রাক্তন আলবদর নেতাকে প্রতিরোধ করেছেন তাদের অভিনন্দন। সেখানে আমরা যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দূরে থাকুক কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেলেছি সেখানে এ প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ আমাদের সামান্য হলেও সাহস যোগাবে, আশার আলো দেখাবে প্রগতির পথ উন্মুক্ত করবে। হতাশাবাদীদের মনে এ আশাও জাগাবে তা হলে দেশে সব কিছু একেবারে শেষ হয়ে যায়নি।

আশা করি এর ইতিবাচক প্রভাব শুধু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, দেশেও পড়বে। কারণ পরের দিন, এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটেছে, 'বরিশালের

গৌরনদী ও মাদরীপুরের কালকিনি উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় সোমবার ইসলামী জঙ্গী সংগঠন হিজবুত তওহিদের প্রচারপত্র বিতরণের সময় গোলযোগকালে সংগঠনের সদস্যদের হাতুড়ির আঘাতে ২০ জন আহত হয়। পরে বিক্ষুব্ধ জনতার পিটুনিতে সংগঠনের একজন নিহত ও কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়। (ঐ)

নিজেদের আত্মসম্মান ও অন্য দেশের যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর বা গৌরনদীর মতো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আশা করি আমরা বিষয়টি অনুধাবন করব এবং যে আশার আলো মাত্র প্রস্ফুটিত হচ্ছে তা সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত করার জন্য একত্রিত হবে।

৭ মে, ২০০৩

আবারো সাকাচৌ

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অর্থ অনেকে অনেক রকম করতে পারেন, কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে এরসঙ্গে বাংলাদেশের সব মানুষ, সংস্কৃতির সম্পর্ক খুব কম। বরং এর নামকরণ করা হয় যদি জামায়াত-বিএনপি জাতীয়তাবাদ, তাহলে এবং ভালো হয়। যদি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হতো বাংলাদেশ, একেবারে খাঁটি বাংলাদেশ, তাহলে আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণা পাকিস্তান। না হলে জামায়াতকে কেন প্রায় একীভূত করা হবে বিএনপির সঙ্গে? জামাতিয়রা ১৯৭১ সাল অস্বীকারকরেএবং ১৯৭১ সালে পাকিদের হয়ে যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তার জন্যও তারা অনুতপ্ত নয়। জেনারেল জিয়া এদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন, বেগম জিয়া সেটিকে শক্তিশালী করেছেন। এ জাতীয়তাবাদে সব মুসলমানের স্থান নেই, যারা বাঙালি সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী তাদের তো নয়ই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, জামায়াতি নেতারা প্রায়ই বলেন, ১৯৪৭-এর চেতনায় ফিরে যেতে হবে। পাকিস্তানি আদর্শে যারা বিশ্বাসী ছিল এবং এখনো আছে, তারা কিন্তু সব বিএনপি-জামায়াতে, ১১ দল বা আওয়ামী লীগে নয়।

জোট সরকার দেশের সব মানুষকে বিএনপি-জামায়াত জাতীয়তাবাদের অধীনে আনতে চায়। গত দু'বছরের ঘটনাবলী তার প্রমাণ। আওয়ামী লীগ করে এমনসব মুসলমান হিন্দুদের হত্যা, নির্যাতন, ভিটা থেকে বিতাড়ন, জিজিয়া বা চাঁদা আদায় এর উদাহরণ। এই জাতীয়তাবাদের চরিত্র এবার আরো উন্মোচিত হলো সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে ওআইসির সেক্রেটারি জেনারেল পদে মনোনয়ন দানে।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছি। সেই লেখার পর সাকাচৌকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। ওআইসির মনোনয়ন পেয়ে সাকাচৌ এমন কিছূ মন্তব্য করেছেন, যা আমার উপর্যুক্ত বক্তব্য সমর্থন করে। এর সঙ্গে আমাদের রাজনীতির ধারাটাকেও খানকিটা স্পষ্ট করে।

আমাদের সিভিল সমাজ, রাজনীতিবিদের নিয়ে পূর্বে হতাশা প্রকাশ করেছিলাম। কারণ সাকাচৌকে মনোনয়ন দেয়ার পরও কোথাও কোনো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি। মৃদু ভাষণের লেখা ও নির্মূল কমিটির প্রতিবাদ ছাড়া সব ছিল নিশ্চুপ। নির্মূল কমিটির প্রতিবাদটিও *জনকণ্ঠ* ছাড়া আর কেউ গুরুত্ব দিয়ে

ছাপেনি। তারপর প্রকাশিত হলো জনকণ্ঠে সাকাচৌর উপযুক্ত বক্তব্য। এবার যেন সবাই নড়েচড়ে বসলেন।

এরকম বক্তব্য তিনি হরহামেশা দেন আর এখন তো পাক-সউদি-বাং স্পন্সরশিপে তিনি ওআইসির প্রার্থী। কিন্তু সামান্য একটি লাইন যে বিভিন্ন মহলে এত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, তা হয়তো সাকাচৌ ভাবেননি। তিনি বোধহয় আরো অবাক হয়েছেন আওয়ামী লীগের এত তীব্র প্রতিক্রিয়ায়। কারণ গত আমলে তাকে একটি খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করে কি কারণে জানি ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। ১১ দলও প্রতিবাদ জানিয়েছে। কাগজে লেখালেখি শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা প্রতিবাদ জানানো শুরু করেছে। সাকাচৌ ভেবেছিলেন এবং পাকিদের পরিকল্পনা ছিল, সাকাচৌ নির্বাচিত হলে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীরা স্বীকৃতি পেয়ে যেত। একসময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতেন। যেমন জাতিসংঘের মহাসচিব যুদ্ধাপরাধী কুর্ট ওয়াইল্ডাহইম অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আর যা-ই হোক বেগম জিয়া আর তার পুত্র তো যুদ্ধাপরাধী নন। সুতরাং সরে যেতেই হতো।

সাকাচৌকে তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন করার সাহস আমাদের হবে না। তবে সাংবাদিকরা তো হরহামেশা তার সাক্ষাৎকার নেন। আমাদের হয়ে কি তাকে জিজ্ঞেস করবেন তার এই উক্তি কি প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির মহিলা সমর্থকদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়? বাঙালি মেয়েরা কি নাভির নিচে শাড়ি পরে? হলুদ শাড়ি পরে কেউ শহীদ মিনারে যায়? হলুদ তো বসন্তের প্রতীক। বিএনপির নারী সমর্থকরাও তাহলে সাকাচৌ বর্ণিত সেইসব রমণী? এখন আরেকটি প্রশ্ন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারের মেয়েরাও তো শাড়ি পরেন, শহীদ মিনার বা জিয়ার কবরে যান, তাদের নিয়েও ইয়ার্কি করার ক্ষমতা তাহলে রাখেন সাকাচৌ। আচ্ছা, সাকাচৌ, পরিবারের মেয়েরা কি বোরখা পরে চলাফেরা করেন? আর ছেলেদের মুখ কি শুশ্রূ শোভিত ও মস্তক টুপিতে আচ্ছাদিত? সাকাচৌকে তো কখনো তথাকথিত ইসলামি পোশাক পরতে দেখিনি। সাকাচৌর কথায় জামাতিরা উল্লাস প্রকাশ করেছে, কারণ তারা অশ্লীল পর্ণোগ্রাফিক কথা পছন্দ করে। সাঈদীর ওয়াজে কি তারা দলে দলে যোগ দেয় না?

দৈনিক *ভোরের কাগজ* এ পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন রাজনীতিবিদকে প্রশ্ন করেছিল। কারণ এটা জানা যে, প্রত্যেক দলের কিছু রাজনীতিবিদের সঙ্গে সাকাচৌর গভীর সখ্য বিদ্যমান। এ কারণে কোনো দল বা নামী রাজনীতিবিদরা তার বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। ভোরের কাগজের প্রতিবেদনে এর কিছু ইঙ্গিত পাবেন।

জাতীয় পার্টি (ম) প্রধান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এ পরিপ্রেক্ষিতে বলেন,

'সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ব্যাপারে আওয়ামী লীগ যে অবস্থান নিয়েছে তা অস্বাভাবিক নয়। তাদের যুক্তি দুর্বল তাও আমি বলবো না। তবে এ ব্যাপারে যেহেতু বিএনপি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে, এখন এ নিয়ে দেশের স্বার্থটাই বিবেচনায় রাখা উচিত। কারণ এবার এ পদটি পাওয়ার ব্যাপারে সত্যি সত্যিই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।' অর্থাৎ প্রকারান্তরে তিনি সাকাচৌকে সমর্থনই করেছেন। যুদ্ধাপরাধী হলেও তাকে মনোনয়ন দিতে হবে–এ যুক্তিটি সাকাচৌর কথাবার্তার মতোই উদ্ভট।

জাসদ (ইনু)-এর সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেন, 'ওআইসির মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনের জন্য প্রার্থী দিতে হলে সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলেই দেয়া উচিত। কারণ তাকে নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমাদের দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' লক্ষণীয়, তিনি সাকাচৌর বিপক্ষে কিছু বলেননি। তার এই উক্তি বাঁ ঘেষা দলগুলোর প্রতি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতো, যদি না সিপিবির সভাপতি মনজুরুল আহসান খান জোরালোভাবে এর বিপক্ষে বলতেন। তিনি বলেছেন, 'সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী একজন যুদ্ধাপরাধী, খুনি ও সন্ত্রাসীদের গডফাদার। তার মতো ব্যক্তি যদি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে তা হবে জাতির জন্য অপমানজনক। ওআইসির মহাসচিব পদ নয়, বিভিন্ন অপরাধের জন্য তার বিচার হওয়া উচিত।'

তার এই বক্তব্য আওয়ামী লীগের বক্তব্যের মতোই। অন্তত একটি বিষয়ে তারা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন, যা উৎসাহব্যঞ্জক।

অতীতে সাকাচৌ আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ সম্পর্কে নানা কটুক্তি করেছেন। এমনকি সংসদেও। তা সত্ত্বেও বাজারে গুজব ছিল এবং সংবাদপত্রের বিভিন্ন খবরে তার সঙ্গে সাকাচৌর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে ইঙ্গিত করা হতো। কিন্তু এবার তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, 'সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী একজন চিহ্নিত খুনি ও সন্ত্রাসী। তাকে ওআইসির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মহাসচিব করা হবে জাতির জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। বিএনপি তাদের দলের লোক মনোনয়ন দিক, উই ডোন্ট মাইন্ড। কিন্তু বিএনপিতে কি আর কোনো লোক নেই?'

আশা করি, এরপর এ সম্পর্কিত সব ধরনের জল্পনা-কল্পনার অবসান হবে।

তোফায়েল আহমেদ আওয়ামী লীগের বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত করেছেন। কোনো যুদ্ধাপরাধী সম্পর্কে আওয়ামী লীগ এই প্রথম কঠোর অবস্থান নিয়েছে। আওয়ামী লীগের অনেকেই মনে করেন ঃ জামায়াত, যুদ্ধাপরাধী বা ইনকিলাবিদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়া উচিত নয়। ভোটের রাজনীতির কারণে এদের অতি নমনীয় হওয়া উচিত। এ ধরনের ধারণা যে ভুল ও বিভ্রান্তিকর, তা অনেক আওয়ামী লীগারকে বোঝানো যায়নি। তারা অনুধাবন করেন না যে, জামায়াতি বা

ইনকিলাবিরা ভুলেও কখনো নৌকার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না। কারণ আওয়ামী লীগ তাদের দিল-পসন্দ পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিল। এটি তাদের চোখে বিশাল অপরাধ।

সাকাচৌর ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কঠোর অবস্থান এ ধারণার সৃষ্টি করছে যে, জামায়াত বা যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপারে বর্তমান আওয়ামী লীগ নমনীয় মনোভাব নেবে না বা প্রগতিশীল শিবিরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদারনীতির সমর্থকরা এ কারণে আওয়ামী লীগের প্রতি নমনীয় হবেন। সিভিল সমাজের বিভিন্ন সংগঠনও এখন সাকাচৌর বিরুদ্ধে নেমেছেন। সাকাচৌ হয়তো এ কারণেই প্রতিবাদলিপি পাঠিয়ে জানিয়েছেন, তিনি এ ধরনের উক্তি করেননি। অবশ্য কেউই তা বিশ্বাস করছে না। উল্লেখ্য, সাকাচৌ আজ পর্যন্ত তার কোনো বক্তব্যের (প্রকাশিত) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাননি। এতে বোঝা যায়, এখন তিনি খানিকটা চিন্তিত। কারণ তার ধারণা ছিল, সারা জীবন বাঙালি-বাংলাদেশ নিয়ে তিনি ইয়ার্কি করে যেতে পারবেন যা গত তিন দশক ধরে তিনি করছেন।

সাকাচৌকে মনোনয়ন দিয়ে বেগম জিয়া ও নিজামী বাঙালি, বাংলাদেশকে অপমান করেছেন, যে অধিকার তাদের কেউ দেয়নি। অনেক রাজনীতিবিদ ও সিভিল সমাজের বিভিন্ন গ্রুপ এখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রশ্ন তুলবেন, দেশেই যার গ্রহণযোগ্যতা নেই, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি কীভাবে গ্রহণযোগ্য হবেন। যিনি নিজের দেশ, দেশের মহিলা, দেশের ঐতিহ্য নিয়ে ব্যঙ্গ করেন– তিনি যে ইসলামি অন্য দেশগুলো সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করবেন না, তার গ্যারান্টি কী? এবং সে ধরনের বক্তব্য যে বাংলাদেশকে একটি ব্রাত্য দেশে পরিণত করবে না, তার নিশ্চয়তা কী?'

বাঙালি ও বাংলাদেশ নিয়ে ইয়ার্কি বন্ধ করুন

'শুককুইজ্যা কডে'? (শুককুর কোথায়?) আজকের অতি বিখ্যাত, অতি ক্ষমতাবান, বিশেষ কিছু ভবন ও বিএনপি-জামায়াতের নীল নয়না 'যুবক' সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বা সংক্ষেপে সাকাচৌ-র পিতা ফজলুল কাদের চৌধুরী বা ফকা চৌধুরীর রাজনীতির মূলমন্ত্র ছিল এ ধরনের হুঙ্কার। অর্থাৎ পেশী, অর্থাৎ মস্তান। পিতার যোগ্য সন্তান সাকাচৌ। পিতার পথ ধরে ১৯৭১ সালে পাকিদের অনুসরণ করেছিলেন এবং সে পথ থেকে বিচ্যুত হননি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে তার সখ্য ছিল এবং আছে যে কারণে বাংলাদেশের কোনো আইন তার ক্ষেত্রে তাকে লুফে নেয়। যখন তখন যা খুশি তা নির্বিবাদে বলতে পারেন।

অন্যরা যে যা বলুক আমি সাকোচৌ-র সাহসের প্রশংসা করি। তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান বেগম খালেদা জিয়াকে পথের ধুলের মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছিলেন এবং বেগম জিয়া প্রায় নতজানু হয়ে তাকে শুধু দলে ফিরিয়ে আনেননি, মন্ত্রীর মর্যাদায় সংসদের উপদেষ্টা করেছেন এবং নির্দেশ মতো সাকাচৌ সাংসদকে অকার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান দু'জন, যাদের নামে পুরো বাংলাদেশ ভয়ে কম্পমান সেই তারেক রহমান (বা জিয়া) ও বেগম জিয়াকেও তিনি কখনো বন্দনা করেননি। অথচ বিএনপির ওজনদার মন্ত্রী ব্য. না. হুদা তো তারেক বন্দনায় আবেগে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন এবং তারপরও বেগম জিয়া সাকাচৌকে ওআইসির মহাসচিব পদে মনোনয়ন দিয়েছেন। মনে হয়, সাকাচৌ এমন কিছু জানেন যেটি প্রকাশ পেলে বর্তমান সরকার বিপর্যস্ত হতে পারে।

সাকাচৌ বাংলাদেশের মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। প্রায় শয়নরত অবস্থায় চোখ বুজে তিনি টিভিতে সাক্ষাৎকার (পরামর্শ) দেন। বাংলাদেশ নিয়ে তার ইয়ার্কির শেষ নেই। এবং স্বাভাবিক। তিনি বা তাঁর পরিবার কখনো বাংলাদেশ চাননি। যুদ্ধাপরাধী তিনি তারপরও এ দেশে থাকছেন যেহেতু আর কোথাও এতো ইয়ার্কি চালে থাকলে এতো ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারবেন না।

সাকাচৌ সম্প্রতি সেই ইয়ার্কির ভঙ্গিতেই বলেছেন, 'অবিবাহিত নারী, হলুদ শাড়ি পরে রাতের আঁধারে রাজপথে হাঁটা, খালিপায়ে একুশে রাতে শহীদ মিনারে গিয়ে আমরি বাংলাভাষায় গান গাওয়া নাকি আমাদের সংস্কৃতি। মহিলারা নাভির

নিচে শাড়ি না পরলে সংস্কৃতি বের হয় না। শাড়ি-ব্লাউজ কম না পরলে সংস্কৃতি বের হয় না। সংস্কৃতির মালিকানা কুক্ষিগত করে রেখেছে মুনতাসীর মামুন, কবীর চৌধুরী, শাহরিয়ার কবির, শামসুর রাহমান, আসাদুজ্জামান নূর, আলী যাকেরেরা সংস্কৃতির সোল এজেন্ট।'.....(জনকণ্ঠ ১.৬)।

এ রকম বক্তব্য তিনি হরহামেশা দেন আর এখনতো পাক-সৌদি-বাং-স্পন্সরশিপে তিনি ওআইসির প্রার্থী। কিন্তু সামান্য একটি লাইন যে বিভিন্ন মহলে এতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা হয়তো সাকাচৌ ভাবেননি। তিনি বোধহয় আরো অবাক হয়েছে আওয়ামী লীগের এতো তীব্র প্রতিক্রিয়ায় কারণ, গত আমলে তাকে গ্রেপ্তার করে কী কারণে জানি না ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ১১ দলও প্রতিবাদ জানিয়েছে। কাগজে লেখালেখি শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা প্রতিবাদ জানানো শুরু করেছে। সাকাচৌ ভেবেছিলেন এবং পাকি-সৌদি ও বাংলাদেশের বাঙালি পাকিদের পরিকল্পনা ছিল, সাকাচৌ নির্বাচিত হলে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীরা স্বীকৃতি পেয়ে যেতো। আর আমেরিকাতো যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে। আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিজেকে শক্তিশালী করে সাকাচৌ এক সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতেন। যেমন জাতিসংঘের মহাসচিবং যুদ্ধাপরাধী কূট ওয়াইল্ডহাইম অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আর যাই হোক বেগম জিয়া আর তার পুত্রতো যুদ্ধাপরাধী নন। সুতরাং সরে তাদের যেতেই হতো। বাংলাদেশ তখন সম্পূর্ণভাবে 'শুককুইজ্যা' ও তাদের লিডারদের চারণভূমিতে পরিণত হতো।

সাকাচৌ যে উক্তি করেছেন তা বিএনপির নারী সমর্থক ও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও গেছে। পর্ণো দেখতে দেখতে মনটাও অনেকের পর্ণোগ্রাফিক হয়ে যায়। না হলে এই উক্তি এবং তাও মিথ্যা বলা যেতো না। বাঙালি মেয়েরা নাভির নিচে শাড়ি পরে? হলুদ শাড়ি পরে কেউ শহীদ মিনার যায়? হলুদ তো বসন্তের প্রতীক। বিএনপির নারী সমর্থকরাও তাহলে সাকাচৌ বর্ণিত সেইসব রমণী? এখন আরেকটি প্রশ্ন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ও তার পরিবারের মেয়েরাও তো শাড়ি পরেন, শহীদ মিনার বা জিয়ার কবরে যান তাদের নিয়েও ইয়ার্কি করার ক্ষমতা তাহলে রাখেন সাকাচৌ? আচ্ছা, সাকাচৌ পরিবারের মেয়েরা কি বোরখা পরে চলাফেরা করে? আর ছেলেদের মুখ কি শ্মশ্রু শোভিত ও মস্তক টুপিতে আচ্ছাদিত? সাকাচৌকেতো কখনও তথাকথিক ইসলামি পোশাক পরতে দেখিনি। সাকাচৌর কথায় জামায়াতিরা উল্লাস প্রকাশ করেছে কারণ তারা অশ্লীল পর্ণোগ্রাফিক কথা পছন্দ করে। সাঈদীর ওয়াজে কি তারা দলে দলে যোগ দেয় না?

বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াত জাতীয়তাবাদের চরম বিকাশ ঘটেছে এখন যার উদাহরণ যুদ্ধাপরাধী সাকাচৌর মনোনয়ন। গত কয়েকদিন বিভিন্ন দল/সংস্থার প্রতিবাদ দেখে মনে হচ্ছে তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখনো এমন অনেক মানুষ আছে

যারা বিএনপি-জামায়াত জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসী নয় এবং তারা প্রতিবাদের সাহস রাখেন। তাদের কাছে আবেদন সাকাচৌ কী তা আবার বিস্মৃতপরায়ণ প্রবীণ ও নবপ্রজন্মের বাঙালিদের কাছে তুলে ধরুন। এটি দেশপ্রেমিকের কর্তব্য। ইতিমধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি তথ্য তুলে ধরছি।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারির দৈনিক বাংলা খুলে দেখা যাক। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের ২০ দিন পর। তখনো বিএনপি হয়নি যেহেতু, সেহেতু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মিথ্যার বেসাতি শুরু হয়নি। সে সময়কার দৈনিক বাংলার খবর:

"সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও তার পিতা ফজলুল কাদের চৌধুরী 'গুড সাহেবের হিলস্থ' বাসায় মরহুম ড. সানাউল্লার এক ছেলেসহ চাটগাঁ-এর কয়েকশ' ছেলেকে ধরে এনে নির্মম অত্যাচার করতেন। ১৭ জুলাই ১৯৭১-এ ছাত্রনেতা ফারুককে ধরে এনে পাকবাহিনীর সহায়তায় সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী হত্যা করেন। ২৬ মার্চ থেকে আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীদের বাসায় পাকবাহিনীর এক প্লাটুন সৈন্য মোতায়েন থাকতো। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ফজলুল কাদের চৌধুরীসহ তাদের পরিবার প্রায় দেড় মণ সোনাসহ পালানোর সময় মুক্তিবাহিনীর কাছে গত ১৮ ডিসেম্বর '৭১ ধরা পড়েন" জিয়াউর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় মুক্তিযুদ্ধের যে দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও সত্য তথ্য হিসেবে এই সংবাদটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আমাদের সম্পর্কে বিএনপি-জামায়াতি জাতীয়তাবাদীদের ঘোরতর আপত্তি থাকতে পারে; কিন্তু মাহবুব-উল-আলম সম্পর্কে তো নেই। ১৯৭২ সালে বয়োবৃদ্ধ মাহবুব-উল-আলম সাহিত্য বাদ দিয়ে বিভিন্ন তথ্য ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত রচনা করেন এবং স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যে তা প্রকাশিত হয়। মানুষের মনে তখনো মুক্তিযুদ্ধের, স্মৃতি টাটকা। ১৮ নভেম্বর (১৯৭১) জেল থেকে মুক্তিপাওয়া নিজামুদ্দিন নামে এক মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব-উল-আলমকে বলেন '৫ জুলাই তিনি ধরা পড়েন এবং ফকা চৌধুরীর কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফজলুল কাদেরের পুত্র সালাহ্উদ্দিন, অনুচর খোকা, খলিল ও ইউসুফ বড় লাঠি, বেত প্রভৃতি হাতে আমাকে পিটাতে থাকে। ৫ ঘণ্টা মারের চোটে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। এ অত্যাচারের বিবরণ জানতে হলে বইটি পড়ুন। সেখানে সাকাচৌ সম্পর্কে আরেকটি সত্য ঘটনার উল্লেখ আছে।

চট্টগ্রামের কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের মালিক ছিলেন অধ্যক্ষ নূতন চন্দ্র সিংহ। ১৩ এপ্রিল ১৯৭১ সালে পাকি হানাদারা তাদের পোষ্য রাজাকারদের নিয়ে তার বাসায় যায়। নূতন চন্দ্র সিংহ তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় করেন। তারপর মাহবুব-উল-আলমের ভাষায় 'কিন্তু সালাহ্উদ্দিন তাদের ফিরিয়ে আনলেন। তার বাবা বলে

দিয়েছেন, এই মালাউনকে আস্ত রাখলে চলবে না। সেদিন বীরত্ব ছিল যাদের হাতে অস্ত্র ছিল তাদের নয়, বীরত্ব ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র এই সত্তর বর্ষীয় বৃদ্ধের। তিনি মন্দিরের সম্মুখে বিগ্রহের দৃষ্টির সামনে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হড়ে দাঁড়ালেন। তারা তাকে তিনটি গুলি করে। একটি গুলি একটি চোখের নিচে বিদ্ধ হয়, একটি তার হাতে লাগে আর তৃতীয় গুলিটি তার বক্ষ ভেদ করে যায়, তিনি মায়ের নাম করে মাটিতে পড়ে যান। তার জন্য কেঁদেছে হিন্দু, কেঁদেছে মুসলমান। মুসলমান যখন কেঁদেছে, সালাহ্উদ্দিন প্রবোধ দিয়েছেঃ মালাউন মলো, তোমরা শোক কচ্ছ কনে?.... ১৩ এপ্রিল ১৯৭১ শুধু কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ নূতন চন্দ্র সিংহের হত্যার জন্য স্মরণীয় নয়, অন্য দু'টি হত্যার জন্যও স্মরণীয়। ফজলুল কাদের চৌধুরীর পুত্র সালাহ্উদ্দিনের পরিচালনায় গুণ্ডা বাহিনী সকাল সাড়ে ১০ টায় গহীরার বনেদী বিশ্বাস পরিবারে ঢুকে চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের পুত্র কলেজ ছাত্র ও ছাত্রকর্মী দয়াল হরি বিশ্বাসকে ধরে ফেলে এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।' (বিস্তারিত বিবরণের জন্য মাহবুব-উল-আলমের বইয়ের, পৃ. ২৫৪-৫৫ দেখুন)।

১৯৭২ সালে নূতন চন্দ্রের পুত্র সত্যরঞ্জন হত্যামামলা করেছিলেন। মামলার এফআইআর নং ইউ/এস/৩০২/১২০(১৩)/২৯৮ বিপিসি। ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি মামলা শুরু হয়। মামলার ১০ জন আসামির মধ্যে ফকাচৌসহ পাঁচ জন ছিল জেলে। সাকাচৌ পাঁচজনসহ পালিয়ে গিয়েছিলেন। চার্জশীটে বলা হয়েছিল, অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

গণতদন্ত কমিশন যখন কাজ করছিল, তখন চাটগাঁর শহীদ সন্তান শেখ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর জানিয়েছিলেন, তার পিতা ও ভাইকে সাকাচৌ ও তার বাহিনী হাটহাজারী ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। তিনিও মামলা করেছিলেন তার বিরুদ্ধে।

চাটগাঁর জাতীয় পার্টির এক সময়ের নেতা হারুন-অর-রশীদও কমিশনকে জানিয়েছিলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, তার পিতা ফজলুল কাদের চৌধুরী ও তার সহযোগীরা চট্টগ্রামে তাদের গুডস হিলস্থ বাসভবনে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষকে ধরে এনে নির্যাতন ও হত্যা করেছে। এমনকি মেয়েদেরও তারা এনে পাকিস্তানির সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়েছে তাদের মনোতুষ্টির জন্য। তিনি বলেন, সালাহ্উদ্দিন কাদের চৌধুরী স্বাধীনতার ঠিক আগে দেশ থেকে পালিয়ে যান। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে মারার জন্য উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল। তবে সালাহ্উদ্দিন চৌধুরীর পায়ে গুলি লেগেছিল।

সাকাচৌ এরপর দেশে ফিরে রাজনৈতিক দল করেছেন। সব রাজনৈতিক দল, সেটি ডান-বাম যা-ই হোক না কেন, তার বন্ধু আছে, শত্রু নেই। এ সম্পর্কিত খবরাখবরও পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সাকা তারপর আরেক স্বৈরাচারী এরশাদের

দলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হন। এখন আছেন বেগম জিয়ার দলে।

সাকাচৌর চরিত্র ও কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাবে চাটগাঁর রাজনীতিবিদ আবদুল্লাহ আল-হারুনের করা এক মামলায়। তিনি বিএনপি মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমানের বড় ভাই। নির্বাচন কমিশনে ২৫ এপ্রিল ১৯৯১ সালে এক নির্বাচনী মামলায় তিনি জানান: '১ নং বিবাদী (সাকাচৌ) শক্তি প্রয়োগ, হিংস্রতা ও সন্ত্রাসে বিশ্বাসী। তিনি আইন-কানুনের ধার ধারেন না। .... স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ন্যক্কারজনক নারকীয় ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। তিনি বহু হত্যাযজ্ঞে ও লুটতরাজে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। .... তাহার বিরুদ্ধে ১৯৭২ ইংরেজি সনে দালালি আইনে চট্টগ্রাম জেলার হাটাহাজারী থানায় ১৩/৪/৭২ইং তারিখে ১৭নং মামলা দায়ের করা হয়। দানবীর নূতন চন্দ্র সিংহের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডের জন্য ১নং বিবাদীর বিরুদ্ধে রাউজান থানায় ৪১(১)৭২ নং এবং ৪৩(১)৭২ নং মামলা দায়ের করা হয়।'

গণতন্ত্র কমিশন ও অন্যান্য দলিলপত্রে এসব বিষয়ে বিস্তর লেখা হয়েছে। নির্বাচনের আগে, খবরের কাগজ অনুসারে সাকাচৌর ক্যাডাররা নোমানের ক্যাডারকে হত্যা করে তাকে এ কারণে প্রথমবার গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর সাকা মুক্তি পান কিভাবে ঠিক জানি না।

এ ধরনের এক ব্যক্তিকে বেগম জিয়া মনোনীত করেছেন ওআইসি মহাসচিব পদে বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে। জেনারেল জিয়া রাজাকার আলবদর পুনর্বসানের প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। বেগম জিয়া এবার তাতে পরিপূর্ণতা আনলেন। সে সময়ও জিয়ার প্রকল্পে সহায়তা ছিল পাকি ও সৌদিদের, এখনো তা-ই আছে। পররাষ্ট্র সচিবও তা-ই জানাচ্ছেন। মনে রাখা দরকার, ১৯৭১ সালের হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল পাকিরা সাকাদের সাহায্যে এবং সৌদি সমর্থনে। সুতরাং এ ধরনের একজনকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে তারা চাপ দেবে তা স্বাভাবিক।

আমাদের প্রশ্ন অন্যখানে। আন্তর্জাতিক সংস্থায় কি জেনেশুনে এ ধরনের একজনকে মনোনয়ন দিতে হবে? আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বা মানবাধিকার কর্মীরা কি এ বিষয়ে খোঁজ নেবে না? প্রচার চালাবে না? তাহলে সেই ইমেজই তো শক্তিশালী হবে যে বাংলাদেশ একটি মৌলবাদী দেশ, না হলে ১৯৭১-এ যার প্রধান কাজ ছিল হিন্দু হত্যা করা ও অসংখ্য অপকর্মে যে জড়িত, তাকে মনোনয়ন দেবে কেন? বিদেশে বাঙালিদের কি অবস্থা, তা তো এখন সবার জানা। এ অবস্থার আরো অবনতি হবে। বিএনপিতে কি এখন আর যোগ্য কোনো লোক নেই। অবস্থা কি এতোই খারাপ? নাকি দেশ ও দশের মানুষকে নিয়ে বিএনপি-জামায়াত ইয়ার্কি করছে/ সময় আছে এসব ইয়ার্কি থামান। আমরা মনে করি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের নাগরিক কর্তব্য এ ধরনের ইয়ার্কি রুখে দাঁড়ানো! অনেকে হয়তো

ভাবছেন, একজন যুদ্ধাপরাধী ওআইসিতে গেলে আমাদের কি! এর ফলে এটাই প্রমাণ হবে জামায়াত-বিএনপি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পক্ষে সবাই (যেমন, জার্মানিতে হয়েছিল হিটলারের সময়)। এর পরিণতি কি জানেন, শুধু ব্যবসায়ী পেশাজীবী নয়-যাদের একটি বাড়ি আছে, ছোট একটি ব্যবসা আছে বা মন্ত্রী-সবাইকে, তাদের পরিবারকে কাফফারা দিতে হবে এবং তখন কেউ সহানুভূতি জানাবে না। কারণ যে জাতি যুদ্ধাপরাধীকে সমর্থন করে, সে জাতি যুদ্ধাপরাধী জাতি হিসেবে পরিণত হয়। তাকে সহানুভূতি জানানোর কোনো কারণ নেই। কালা ফারুক বা এ্ ধরনের কেউ নিহত হলে কি আপনি শোকাহত হন?

৪ জুন, ২০০৩

আমিনী-নিজামীদের ইসলাম ও আমাদের ইসলাম

এই যে আমরা এত লেখালেখি করি, পাঠকরা কি তা ধর্তব্যের মধ্যে আনেন? সরকারি নেতা ও কর্মকর্তারা যে এগুলো ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না, তা তো বলাই বাহুল্য। কয়েকজন লিখিয়ে এ ধরনের আলোচনা করছিলেন এক আড্ডায়। একজন তো হতাশ হয়েই বললেন, পাঠকদের কোনো সাড়া পাই না, তাই লেখালেখি বন্ধ করে দেবো ভাবছি।

লিখিয়েরা যা আলোচনা করছিলেন, আসলে বোধহয় তা ঠিক নয়। পাঠকরা যদি এসব লেখা না-ই পড়বেন, তাহলে পত্রিকাগুলো প্রতিদিন এত রাশি রাশি লেখা ছাপতো না। হ্যাঁ, কারো লেখা হয়তো পাঠকরা গোগ্রাসে লুফে নেন, যেমন জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরীর, কারো লেখা পড়ে দর্শন চিন্তা জাগে বা ক্রোধের সঞ্চার হয়, যেমন জনাব ওয়াহিদুল হকের। এসব লেখার ওপর ভিত্তি করে একজন পাঠক নিজের মতামত গড়ে তোলেন। পাঠকরা প্রতিক্রিয়া জানান না এ কারণে যে, লেখার অভ্যাস অধিকাংশের নেই বা হয়তো লিখবো লিখবো করে লেখা হয় না বা লেখা পাঠালেও অনেক সময় সম্পাদক তা ছাপেন না। কিন্তু অনেকে লেখেন এবং অনেক পাঠকের লেখা স্বয়ং লেখককেও ভাবায়।

এ ধরনের এক পাঠকের প্রতিক্রিয়া আমার নজরে পড়েছে ১০ জুলাইর দৈনিক ভোরের কাগজে। পরিবাগ থেকে জনাব আবদুস সালাম ভোরের কাগজে আমার একটি লেখার ওপর তার দীর্ঘ অভিমত জানিয়েছেন। আমার লেখাটি ৬ তারিখের ভোরের কাগজে ছাপা হয়েছিল– 'ভিক্ষুকের আবার মান-অভিমান' শিরোনামে।

অনেকে বলতে পারেন, আমার এ লেখা ভোরের কাগজে দেয়া-ই উচিত, কিন্তু আমার মনে হয়েছে, যে বিষয়টির অবতারণা করেছেন জনাব সালাম তার গুরুত্ব আছে বর্তমান সময়ে। সুতরাং তা যে কোনো কাগজেই আলোচনা করা যেতে পারে।

আমার পূর্বতন লেখার বিষয় ছিল জনাব ফজলুল হক আমিনী। তার অনুগামীরা তাকে মুফতি নামে সম্বোধন করেন। নেতাকে কর্মীরা যে কোনো উপাধিতেই সম্বোধন করতে পারেন, কিন্তু সাংবাদিকরা কেন করেন জানি না। কারণ পত্রিকায়ই দেখেছি, বেগম জিয়াকে শর্ত দেয়ার পর বড় কাটরার মাদ্রাসাটি স্থানীয় সংসদ সদস্যের সাহায্যে তিনি দখল করে নিয়ে নিজেই প্রিন্সিপাল বনে

গেছেন। কোনো মুফতি কখনো এ ধরনের কাজ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

আমি ওই লেখায় আমিনী, নিজামীদের পূর্বেকার অনেক বক্তব্য উদ্ধৃত করেছিলাম, যেখানে তারা পূর্ববর্তী বিএনপি শাসনকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের দেবতার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তারা নারী নেতৃত্বকেও নাজায়েজ বলেছিলেন। আর দিচ্ছেন ওরা এখন নারী প্রধানমন্ত্রীর আঁচলের নিচে তো আছেনই এবং তিনি যে হুকুম দিচেচ্ছন তা-ই তামিল করছেন। যেমন আমিনী সংসদ সদস্যপদে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে বলেছিলেন, ম্যাডাম বলেছেন তা-ই তিনি পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। জোটের চারটি দলই নিজেদের সব সময় বড় মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। অন্য কথায় ধর্মব্যবসা করে। তাই মন্তব্য করেছিলাম–এটা পরিস্কার যে এরা ঈমানদার নয়, মুসলমান হতে পারে। ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে চারটি দলই ক্ষমতায় এসেছে এবং এখনো-বিরোধী দল বলে প্রচার করছে। টুপি পরা, দাড়ি রাখা ও কপালে কালো দাগকে যদি মানুষ মনে করে মুসলমানদের ট্রেডমার্ক, তাহলে তার সংখ্যা বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে বেশি। দু'নেত্রীর বা দু'দলের নেতাদের লেবাস, চলন দেখুন।

ইসলাম বলে ঈমানদার কথা দিলে কথা রাখে, বরখেলাপ করে না। কিন্তু এরা বারবার কথা বরখেলাপ করে। সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন ওঠে, ইসলামের নাম বলে তারা যখন ভোট চায়, তখন মানুষ তাদের ভোট দেয় কেন? মানুষের মন জটিল, তা বিশ্লেষণের ক্ষমতা আমার নেই। সোজা একটা উত্তর দিতে পারি যা মূর্খের বচন বলে মনে হতে পারে, তাহলো-ভন্ডরাই ভন্ডদের নেতা মানে, বিশ্বাস করে। বেগম জিয়াকে আমরা প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাতে পারি এ কারণে যে, জোটের দুই 'ইসলামি দলে'র 'দুই ঠিকাদার'কে পায়ের নিচে রেখে দিয়েছেন। টু' শব্দটিও কেউ করছে না।

এ প্রসঙ্গে জোটের আরেক অংশীদার (ঐক্যজোট দু'ভাবে বিভক্ত) 'শায়খুল হাদিস' (কেন এই উপাধি তা আমার জানা নেই) মহিলা ট্রাফিক পুলিশ নামানো হয়েছে দেখে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন তাদের প্রত্যাহার করতে। কারণ এরা 'বেপর্দা' আওরত। বেপর্দা আওরতের সামনে মোমিন মুসলমান তো যান না। কিন্তু কয়েকদিন আগেই দেখলাম মখমলের আলখাল্লা পরে শায়খুল হাদিস প্রধানমন্ত্রী সন্দর্শনে গেছেন এবং আলখাল্লা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও নিজের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করেননি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে জনাব সালাম সরল ভাষায় যে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন, তা আমাদের অনেকেই পারতাম না। তিনি লিখেছেন ঃ 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় ব্যবস্থা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। গণতান্ত্রিক চেতনায় মতপার্থক্য বা মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক এবং এ জন্য একে গণতন্ত্র বলা হয়। কিন্তু ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা তা

ধর্মীয় গ্রন্থের অনুশাসনে আবদ্ধ। এখানে কি ভিন্নমত থাকার সুযোগ আছে? ইসলামের অনুসারী সব রাজনৈতিক দল কোরআন ও সুন্না অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলছেন। তাহলে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনে বা সংগ্রামে একাধিক দল বা একাধিক মতের কথা বলা হয় কেন? তাহলে কি পবিত্র ধর্মগ্রন্থে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার একাধিক ধারার কথা উল্লেখ করা আছে? বিষয়টি অবশ্যই ইসলামি চিন্তাবিদদের বিশ্লেষণের দাবি রাখে।'

সত্যিই তো, এ সোজা কথাটা আমরা হাজার হাজার জ্ঞানী-গুণী লোক মনে রাখি না কেন?

জনাব আমিনী কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছেন, 'দেশের মানুষ বিএনপি ও জামায়াতকে বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে জামায়াত তো একটি গাদ্দার রাজনৈতিক দল, যদিও আমরা তাদের সঙ্গে জোট করেছি। তবে সেটা আদর্শিক কারণে নয়, রাজনৈতিক কারণে' (*ভোরের কাগজ* ৩.৭.০৩)। অর্থাৎ একটি ইসলামি দল আরেকটি ইসলামি দলকে 'গাদ্দার' বলছে এবং আদর্শ তাদের কাছে প্রাথমিক কোন বিষয় না। আদর্শ ছাড়া ইসলাম থাকে কী করে?

সেজন্য আপনারা আমার সঙ্গে একমত হন বা না হন, একটি কথা বলতে চাই, এদেশে সত্যিকারের ইসলামি আদর্শের কোনো দল নেই। যারা ইসলামি দল করেন, তারা ইসলামের মূল নীতি মেনে চললে রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন পড়ে না। তাই যখন কেউ বলেন যে, ইসলামি আদর্শে রাষ্ট্র গঠন করতে চান, তখনই সন্দেহ জাগে এবং তখন ধরে নিতে হবে যে তিনি ইসলাম নিয়ে ব্যবসা করতে চান। ইসলামের নাম ভাঙিয়ে, অন্ধ-অশিক্ষিত জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতা দখল করে নিজের স্বার্থ হাসিল করতে চান। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক দলগুলো ইসলামের ঠিকাদারি ব্যবসা করতে চান। এটি যে কোনো দেশে যে কোনো ধর্মভিত্তিক দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

গত দু'দশকে তথাকথিত ইসলামি দলগুলোর নেতারা যা বলেছেন, তার যদি সংকলন করা যায় তাহলে দেখা যাবে, তাদের কোনো কথার সঙ্গে কোনো কথার মিল নেই এবং যা বলেছেন তার উল্টোটা করেছেন। একটি উদাহরণ দিই। জামায়াতের বর্তমান আমির নিজামী বলেছিলেন ঃ 'ইসলামি জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না (*ইত্তেফাক* ২৪.১.১৯৯৪)। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে, নিজামীরা তো এখন শুধু বিএনপিকে সমর্থন-ই নয়, তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকারও গঠন করেছে। জনাব সালাম প্রশ্ন রেখেছেন এ পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে– 'ইসলাম ধর্মে মিথ্যা কথা বলা জায়েজ কি-না?'

ইসলাম কেন, কোনো ধর্মেই মিথ্যা বলা জায়েজ নয়। আমি ধর্মতত্ত্ববিদ নই যে, এর ওপর ওয়াজ করতে পারবো। কিন্তু আগ্রহী পাঠক বিচারপতি মুহম্মদ

হাবিবুর রহমানের কোরান-সূত্র গ্রন্থটিতে 'মিথ্যাবাদী ও সীমা লঙ্ঘনকারী'দের বিষয়ে আল্লাহ্ কী ফরমিয়েছেন তা দেখতে পারেন। আমি সেখান থেকে দু-একটি উদাহরণ দিতে পারিঃ

১. সূরা শোয়ারাতে আছে– 'তোমাকে কি জানাবো কার কাছে শয়তান অবতীর্ণ হয়? ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর কাছে। ওরা কান পেতে থাকে, আর অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।'

২. সূরা মুলক– 'এদের আগে যারা এসেছিল, তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল, তাই ওদের ওপর আমার শাস্তি কী কঠিন হয়েছিল।'

৩. সূরা আল-ই-ইমরান– 'তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তারপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন, তার তাদের জন্য রয়েছে কষ্টকর শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী।'

জনাব সালাম আরো লিখছেন ঃ 'ইসলাম ধর্মের কোথায় এই ম্যাডামের শাসন ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, তা বিস্তারিত জানাতে। না, এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। নারী-পুরুষকে আমরা অনেকেই সমানভাবে বিচার করি। কিন্তু আমিনী-নিজামীরা সবসময় নারী নেতৃত্ব নাজায়েজ বলে ঘোষণা করেছেন।

জনাব সালাম পরিশেষে বলেছেন ঃ 'ইসলাম ধর্মে যদি মিথ্যা কথা বলা হারাম হয়ে থাকে এবং ধর্মীয় ভাষায় মিথ্যাবাদীকে যদি মোনাফেক বলা হয়, তাহলে বাংলাদেশের ইসলামি দলগুলোর ঠিকাদারি নেতাদের বাস্তব অবস্থান কোথায়?'

আসলে এ বিষয়ে ভালো লিখতে পারবেন জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী, যিনি এক সময় মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু যার মনে ধর্ম নিয়ে ছটাক মাত্র সংস্কার নেই। আর পারবেন মওলানা আবদুল আউয়াল যিনি জামায়াতের আসল চেহারা নামে চমৎকার একটি বই লিখেছেন।

কোরআনে আল্লাহপাক মোনাফেকদের সম্পর্কে এত বলেছেন যে, নতুন কিছূ বলার নেই। আমি শুধু সুরা নিসা থেকে একটি লাইন তুলে দেবোঃ 'মোনাফেকদের শুভ সংবাদ দাও যে তাদের জন্য রয়েছে নিদারুণ শাস্তি।'

এ প্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদের সাম্প্রতিক এক বক্তৃতার কথা উল্লেখ করতে হয়, বাংলাদেশের মুসলমানরা নিশ্চয়ই মানবেন যে, মালয়েশিয়ায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বাঙালিরা তাদের থেকে বড় মুসলমান নয়। কিন্তু সে দেশটি কোথায় আর আমরা কোথায়। এর কারণ সেখানকার নেতারা ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দেননি। কেউ দিলেও মানুষ মেনে নেয়নি এবং মনে রাখা উচিত, মালয়েশিয়ায় মুসলমান ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাস করেন। তিনি বলেছেন, 'মুসলমানদের সহজেই নির্যাতন ও যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ ভ্রান্ত ধর্মীয় শিক্ষা, যা তাদের পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। সারা বিশ্বে মুসলমানরা আল্লাহর কাছে

ইরাকি মুসলমান এবং তাদের রক্ষা করতে মোনাজাত করে কিন্তু তাদের প্রার্থনার জবাব আসেনি। এর কারণ এই নয়– আল্লাহ মুসলমানদের পরিত্যাগ করেছেন, বরং এর কারণ তারা তাদের প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র, সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত বাহিনী তৈরিতে জ্ঞান এবং যোগ্যতায় উন্নত বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারেনি। মাহাথির বলেছেন, 'ফিলিস্তিনি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা শহীদ হিসেবে বহু মুসলমানের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু যারা বিজ্ঞান, গণিত, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় অধ্যয়ন করেন, তাদের কাছে তাদের কোনো মূল্য নেই।' তিনি আরো বলেছেন, 'মুসলমানরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা অনুসরণ না করে বর্তমানে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করে মুসলমানদের দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করেছে' (*ভোরের কাগজ*, ১০.৭.০৩)।

সাধারণ মুসলমান ইসলামের সরল জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী, যা কল্যাণকর। ভ্রান্তি সৃষ্টি করে আমিনীরা। যিনি ইসলামের মূলনীতি জানেন, তার জন্য নিজামী-আমিনীদের দরকার হয় না। আল্লাহ-রসূলই যথেষ্ট। ইসলাম মানে বুঝি মাদ্রাসা আর মসজিদ সৃষ্টি। আসলে আমাদের মনে যথেষ্ট গণ্ডগোল আছে, জেনেটিক গোলমাল আছে, না হলে নিজামী-আমিনীদের নেতৃত্ব কেন একশ্রেণীর মানুষ মেনে নেয় বা তারা বহাল তবিয়তে রাজনীতি করতে পারেন? এদেশে এখন জন্মানো এত অগৌরবের, এত লজ্জার হতো না– যদি না আমরা এবং নিজামী-আমিনীরা আল্লাহর সেই বাণীটি মনে রাখতাম ঃ 'আর তোমাদের এই যে জাতি এ তো একই জাতি। তাই তোমরা আমাকে ভয় কর। কিন্তু (তারা) নিজেদের কাজকর্মে বহুদলে বিভক্ত। প্রত্যেক দল নিজেকে নিয়েই খুশি। তাই ওদের কিছুকালের জন্য বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও' (সুরা মুমিনুন)।

১৪ জুলাই, ২০০৩

পাকিরা পাকি-ই, বাংলাদেশের পাকিরাও তা-ই

অন্য কোনো দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা দেখাটা বেশ একটু বিপজ্জনক। শরীর এবং মনের ওপর চাপ পড়ে। কিন্তু দলটি বাংলাদেশের এবং বাঙালি হিসেবে বাংলাদেশের জয় দেখতে চাই, তাই মাঝে মাঝে টিভি খুলে বসি এবং রক্তচাপ না থাকলেও মনে হয় রক্তচাপের সৃষ্টি হচ্ছে। জানি, বাংলাদেশ জিতবে না তবু শেষ মুহূর্তেও বাংলাদেশের জয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ অবশ্য সেই প্রার্থনা কবুল করেন না।

অনেক সময় এ বিষয়ে ভাবলে অন্য একটি কথা মনে হয়, তাহলো– এদেশের প্রায় অর্ধেক লোকই তো প্রকারান্তরে পাকিভক্ত। তাদের প্রার্থনা কি বাংলাদেশের পক্ষে থাকে? আল্লাহ তাহলে করবেন কী? জানি, বিষয়টি বিতর্কের কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে আমার মন্তব্যটি উড়িয়ে দেয়াও যাবে না। জামায়াত-বিএনপিদের কি পাকিদের জন্য মনের গহীন গভীরে খানিকটা ভালবাসা নেই? গত ২৫ বছর তাদের সমস্ত কার্যকলাপ কি বাংলাদেশের বিপক্ষে নয়? বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়া কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধীদের স্বাধীনতার ৫ বছরের মধ্যে পুনর্বাসন থেকে সাকাচৌকে ইসলামি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়ন বাংলাদেশের কোন আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী ভারতের বিরুদ্ধে এ দু'টি দল যে পরিমাণ বিষোদগার করেছে, গণহত্যাকারী পাকিদের বিরুদ্ধে কি কখনো এ দুটি দল সে পরিমাণ বিষোদগার করেছে, গণহত্যাকারী পাকিদের বিরুদ্ধে কি কখনো নিন্দামূলক কোনো মন্তব্য এ দু'দলের কোনো নেতার মুখে শুনেছেন? সবচেয়ে বড় কথা এরা ইতিহাস তো স্মরণ করতে চান-ই না বরং বিকৃত করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বদলে মেজর জিয়া হয়ে যান স্বাধীনতার ঘোষক যা চরম আওয়ামী-বিদ্বেষী বদরুদ্দীন উমর পর্যন্ত ইতিহাসের সত্যের খাতিরে মানতে রাজি নন। তা দেশের অর্ধেক লোক যদি জোটের আদর্শ সমর্থন করে, তাহলে তাদের কী বলবো? শুধু তা-ই নয়, পাকিদের আদর্শের ধারক হোক, হতেই পারে, কিন্তু তাই বলে পাকিদের অপমানও মেনে নেয় নির্দ্বিধায় চাকর-বাকরের মতো। এটি তো আরো জঘন্য।

বাংলাদেশ-পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে সে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হলো। আমাদের দেশে আমরা এত বড় মুসলমান যে, শুক্রবার খেলা থাকলে

মুসলমানত্ব নষ্ট হয়ে যায়। বাঙালি-পাকিদের আদর্শ পাকিস্তানে শুক্রবার খোলা ও নাছারাদের বন্ধের দিন রোববার বন্ধ। শুক্রবার ও জুমার কারণে খেলার জন্য স্পেশাল কোনো বিরতি নেই। প্রথম দু'টি খেলায় দেখা গেল স্টেডিয়াম ফাঁকা। আমাদের এখানে পাকিস্তানের খেলা হলে স্টেডিয়ামে জায়গা পাওয়া যায় না। করাচি, পেশোয়ার মুলতানে দেখা গেল সব দর্শক পাকিস্তানের সমর্থক। কারো হাতে বাংলাদেশের কোনো পতাকা নেই। আমাদের এখানে শ'খানেক পাকিস্তানি পতাকা দেখা যাবে। তরুণ-তরুণীরা গালে পাকিস্তানি পতাকা এঁকে নেয়। সেখানকার হোটেলে কেউ বাঙালি খেলোয়াড়দের দর্শনের জন্য ভিড় করেছে বলে কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এখানে শেরাটনে প্রৌঢ় মাতা ও তরুণী কন্যাদের ভিড় করার সংবাদ খবরের কাগজেই দেখেছি। বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানের চমৎকার ব্যাটি, ফিল্ডিং কখনোই করতালিতে প্রশংসিত হয়নি। পাকিস্তানের প্রতিটি চারের মার-ই দর্শকদের উল্লসিত করেছে। পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা ভ্রমণ করে আরামদায়ক শ্রেণীতে, বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের সে আসন দিতে তারা ভুলে যায়। এর কারণ, বাংলাদেশ বা বাঙালিদের তারা দেশ বা মানুষ মনে করে না এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে অভ্যস্ত। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে পরাজয়ের কথা তারা ভোলেনা। তাই ভোরের কাগজের খবর অনুযায়ী, পাকিস্তানে যেতে ইচ্ছুক সাংবাদিক ও খেলোয়াড়দের ভিসা ফরমে যাদের জন্ম ১৯৭১-এর আগে তাদের 'পাকিস্তানি বাই বার্থ' লিখতে বাধ্য করা হয়েছে।

আমরা ১৯৭১-এর বিজয়ের কথা মনে রাখি না। ভাবি প্রাক-'৭১ এর চাকর বাকরের মতোই আছি। আমাদের দলের পক্ষ থেকে বিমান ভ্রমণে পক্ষপাতিত্বের জন্য প্রতিবাদ করা হয় না। দলের ম্যানেজার উর্দুতে সাক্ষাৎকার দেন নস্টালজিক হয়ে। আচরণটা করি সবসময় পরাজিতদের মতো। ফলে খেলোয়াড়রা শুরুতেই মনস্তাত্বিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়।

পাকিরা বিবেকের মুখোশ পরে প্রতারণা করে। রশীদ লতিফ তার প্রমাণ। সত্য তারা কখনো স্বীকার করে না, তাদের কর্মকাণ্ডের জন্যও কখনো তারা অনুতপ্ত নয়। মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী ঘটনাবলী এর প্রমাণ। ১৯৭১-এর গণহত্যার জন্য কখনো তারা অনুতাপ দেখায়নি। অনেকে বলবেন, তাহলে মুলতান বা ফয়সালাবাদে এত দর্শক এল কেন? না, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা দেখতে আসেনি। রশীদ লতিফ সাসপেন্ড হওয়ার জন্য তারা ক্ষুব্ধ, পাকিস্তান যেন বাংলাদেশকে দলিত-মথিত করে, তার প্রার্থনা নিয়েই তারা স্টেডিয়ামে এসেছিল। যে কারণে ইনজামাম বলেছেন, পাঁচটি ওয়ানডের জয়ই রশীদ লতিফকে উৎসর্গ করবে।

তবে একথাও সত্য যে, এর বাইরেও মানুষ আছে। ১৯৭১-এ গণহত্যার বিরোধিতা করার জন্য পাকিস্তানে অনেকে নির্যাতিত হয়েছেন। বাংলাদেশের

পরাজয়ে বাংলাদেশের পাকিরা মনে মনে খুশি হলেও অনেক বাঙালি তাতে খুশি হয়নি। টেস্ট ম্যাচে দেখা গেছে, আম্পায়ার থেকে দর্শক সব বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যে জিরো বা বাঙালিদের যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে সবাই পছন্দ করে, তার প্রমাণ দক্ষিণ আফ্রিকার আম্পায়ারের খালেদ মাসুদকে অশালীনভাবে ডেকে পাঠানো, আপিল করলে হুমকি দেয়া ইত্যাদি। এতসব সত্ত্বেও বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা বাঙালির মতোই খেলেছে, '৭১-এর বিজয়ে মতো মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে। হয়তো প্রতারণা না করলে, আম্পায়াররা জোট না বাঁধলে একটি *টেস্টে* তারা জিততো। অভিনন্দন বেশি প্রাপ্য আতাহার আলী খানের। সুদর্শন এই সাবেক খেলোয়াড়, বাংলায় অভ্যস্ত নন, কিন্তু বাঘের মতো পাকি কমেনট্রেটরদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। প্রকাশ্যে। এ ধরনের মানুষকে দলের ম্যানেজার করলে বিদেশে হয়তো নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রাখা যেতে পারে। বাংলাদেশের পাকিরা এখানকার ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ করলেও খেলোয়াড় ও কমেনট্রেটর যে বাঙালিদের জন্য লড়েছেন প্রধান প্রবনতার বাইরে, এটুকুই বাঙালিদের আশা।

ক্রিকেট খেলার এই পর্যবেক্ষণ হয়তো যথেষ্ট জোরালো মনে হবে না। তাহলে গত কয়েকদিনের দু-একটি ঘটনার উদাহরণ দিই।

ডেইলি স্টারের (৮.৯.০৩) একটি খবরে বলা হয়েছে ঃ ১৯৭১-এর আলবদর প্রধান বর্তমানে জোটের প্রভাবশালী মন্ত্রী 'নিজামী কৃষিমন্ত্রী থাকাকালে গত মে মাসে শেরপুর জেলার নকলায় প্রতিষ্ঠিত জয় বাংলা কৃষি মার্কেটে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে মার্কেটের নাম বদলের নির্দেশ দেন। পরে আগস্ট মাসে জয় বাংলা বাজারের নাম বদলে ধোনাকোলা করা হয়।'

বিডিআরের একজন মুক্তিযোদ্ধা বীর উত্তম মরহুম সালাহউদ্দিন আহমদের পরিবারকে বিডিআর কর্তৃপক্ষ 'যে কোনো কায়দায় বাস্তচ্যুত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাসার দখল কেড়ে নেবার জন্য এর মধ্যে দু'দিন এমন ব্যবহার করা হয়েছে, ভীতসন্ত্রস্ত পরিবারটি বাসা চেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে এক রকম আত্মগোপন করে আছে' জানিয়েছে *জনকণ্ঠ* (১২.৯.০৩)। বিডিআরের পরিচালককে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন, 'তারা আইন দেখেন আর কিছু নয়। মুক্তিযোদ্ধা বা মানবিক কোনো বিবেচনা আইনের আওতায় পড়ে না।' সালাহউদ্দিন আহমদের স্ত্রীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিডিআর পরিবারটিকে থাকার জন্য ছোট একটি বাসা দিয়েছিল। সালাহউদ্দিন আহমদ বীর উত্তমরা না থাকলে যে এখন কেউ আর বিডিআরের মহাপরিচলক বা পরিচালক হতে পারতেন না, তা অবশ্য বলাইবাহুল্য।

এসব ঘটনা আর পর্যবেক্ষণের উপসংহার একটিই– একবার যে রাজাকার সে

যেমন সবসময় রাজাকার, তেমনি পাকিরা পাকি-ই আর বাংলাদেশের পাকিরাও তা-ই। ভূখন্ডটি স্বাধীন হয়েছে বটে, এখন তো আর তাকে পরাধীন করা যায় না, তাই বাংলাদেশ নামটি রয়ে গেছে। হয়তো থেকে যাবে। কিন্তু মানুষের প্রধান প্রবণতা পাকিদের দিকেই, যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জোরজবরদস্তি ইতিহাস থেকে বাদ দেয়া হয়, তার নামাংকিত প্রতিষ্ঠানের নাম বদল করে দেয়া হয় এবং আমরা নিশ্চুপ থাকি অর্থাৎ সমর্থন করি। এ কারণেই ১২ তারিখে টিভিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে কমিটেড পার্টনার।

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

স্বদেশে গোলাম আযমদের প্রত্যাবর্তন

জামায়াতের অবসরপ্রাপ্ত কিন্তু কার্যত বড় আমির গোলাম আযমের মুখ ফসকে বহুদিন পর একটি সত্য কথা বেরিয়ে গেছে। দিলপছন্দ দেশ পাকিস্তানে গেছেন কয়েকদিন আগে। করাচিতে নেমে তিনি বলেছেন তার মনে হয়েছে 'যেন নিজ দেশেই আছেন।' ৩১ বছর পর সফর করলেন তিনি করাচি। শুধু তাই নয়, তার খায়েশ বাংলাদেশ-পাকিস্তানের ব্যবসা-বাণিজ্য চরম পর্যায়ে উন্নতি হোক। *জনকণ্ঠ*, ২২-১২। প্রবাসীরা প্রবাসে যত সুখ-আহ্লাদে থাকুক, নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি তাদের মনটা পড়ে থাকে নিজের দেশের দিকে যা সে ছেড়ে এসেছে সজ্ঞানে, স্বইচ্ছায় 'উন্নত' জীবনযাপনের জন্য। বিশেষ করে শেষ বয়সে অনেকের আকুতিই হয় এরকম যে, তাকে যেন কবর দেওয়া হয় নিজ দেশে। সুতরাং শেষ বয়সে, ৩১ বছর পর করাচি ফিরে গোলাম আযমের অনুভূতি সে রকমটি হওয়াই স্বাভাবিক। থাকেন তিনি বাংলাদেশে, সেটি তার কাছে প্রবাস, যেখানে থাকেন বাধ্য হয়ে, রাজনীতির কারণে, উন্নত জীবনের জন্য তো বটেই। এ কারণেই বলা হয় যার যেথা ঘর। পাকিরা গোলাম আযমকে নিজের লোক, দেশের লোক জেনে খাতির যত্ন ভালো করবে স্বাভাবিক। তবে, এ দেশে, কয়েকমাস কলেজে শিক্ষকতার কারণে নামের আগে অধ্যাপক লাগানো, ভাষা সৈনিকের জিকির তুলুন, সফেদ শ্মশ্রু নিয়ে সুফী ভাব করে থাকুন, কিছুতেই কিছু হবে না। আমাদের কাছে তিনি রাজাকার-আলবদর বা এক কথায় যুদ্ধাপরাধী এবং পাকিতন্ত্রের প্রতীক। উল্লেখ্য তার দল এখন বিএনপির সহযোগী হয়ে ক্ষমতায়।

ইসলামী ঐক্যজোটের ভগ্নাংশের প্রধান ফজলুল হক আমিনীও এখন পাকিস্তানে। সেখানে তাকে রাষ্ট্রীয় প্রোটোকল দেওয়া হচ্ছে যা অন্য কোনোখানে দূরে থাকুক বাংলাদেশেও দেওয়া হয় না। তিনিও টেলিফোনে তার এক সুহৃদকে জানিয়েছেন, 'এখানে খুব আরামে-আদরে আছি। সর্বক্ষণ সামনে পিছনে থাকে আর্মির সারি।' (ঐ) আমিনীর ভগ্নাংশ দল চারদলীয় জোটের শরিক বটে তবে বিএনপির জামায়াতের নেতাকর্মী দূরে থাকুক, সামান্য কর্মীও তাকে পাত্তা দেয় না। সরকারের একটি পদও তাকে দেওয়া হয়নি। তাহলে পাকিস্তান তাকে এত আদর-যত্ন করে কেন?

এই উদ্ধৃতিগুলো তুলে ধরলাম এ কারণে যে, আমরা যখন এদের পাকিদের

প্রতীক, মৌলবাদের, অন্যকথায় ধর্ম ব্যবসার প্রতীক বলেছি তখন অনেকে ক্ষুদ্ধ হয়েছেন। আমিনীর বিষয় জানি না। কিন্তু গোলাম আযম '৭১ সালে কী করেছেন আমাদের জেনারেশনের যারা বিএনপিতে আছে তারাও এ কথা স্বীকারে দ্বিধান্বিত। এ কথা মনে রাখা জরুরি, বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের একটি নীতি-অনবরত অসত্য বলা। সুতরাং যে উদ্ধৃতিগুলো দিলাম, সেগুলো দেখেও তারা বলবে এতে কিছুই প্রমাণিত হয় না।

আমার সঙ্গে অনেকে একমত হবেন না, তবুও নিদ্ধির্ধায় বলতে চাই, ২০০০ সালের নির্বাচনের পর কাগজে-কলমে বা ভৌগলিক দিক থেকে বাংলাদেশ থাকলেও তাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশের খুব বেশি কিছু একটা নেই। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যে আদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই করে জন্মেছিল সে আদর্শেই ফিরে এসেছে। যুদ্ধাপরাধীরাই এখন ক্ষমতায়। যারা তাদের ক্ষমতায় এনেছে স্বাভাবিকভাবেই তারা বাংলাদেশ দর্শনে বিশ্বাসী নয়। ফলে তাদের মূল নীতিই হবে, শারীরিকভাবে (অর্থাৎ ভৌগোলিকভাবে-পাকিদের সঙ্গে মিলিত হতে পারলেও (পারলে তারা নিজেদের সম্মানিত ভাবত) মানসিকভাবে যেন পারে তাদের মূল উদ্দেশ্য, দক্ষিণ এশিয়ার পাকিদের সহযোগী রাষ্ট্র হিসেবে বা তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসেবে থাকা 'হিন্দু নেপাল বা 'বৌদ্ধ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মুসলমানত্ব প্রকাশ করা। পত্রপত্রিকা অনুসারে, জামায়াতও তার গুণমুগ্ধ বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর আইএসআইদের গুরুত্ব বেড়েছে। যেটা আওয়ামী আমলে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল এবং দেশে ও আশপাশের দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। পাকিস্তান যেন সাম্প্রদায়িক নীতিগ্রহণ করে দেশটিকে হিন্দু শূন্য করেছে ও এখন খ্রিস্টান শূন্য করতে চাচ্ছে জামায়াত ও তার সহযোগী বিএনপি ও ইসলামী ঐক্য বাংলাদেশে একই নীতি গ্রহণ করেছে। পাকিস্তান যেমন সামরিক যাঁতায় নিষ্পেষিত এরাও সামরিক বাহিনীর পরোক্ষ ফ্রন্ট এবং গণতন্ত্র বস্তুটি এখানে প্রায় নির্মূল করা হয়েছে। পাকিস্তানের মতোই সন্ত্রাস-দুর্নীতি এখন সরকারের প্রধান নীতি। যারা বাংলাদেশ ভালোবাসেন বাংলাদেশের অর্থে, পাকি অর্থে নয়, তাদের তাই আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম বাংলাদেশের পাকিকরণ না চাইলে জামায়াত-বিএনপি রোধ করতে হবে। হয়তো অনেকে তা চাননি বা চান না বা বাংলাদেশে এখন পাকিরাই হয়তো জিতেছে, তাদের অনুসারিরাই হয়তো বেশি। পাকিভক্তির একটা উদাহরণ দিই। এইপাকিভক্তদের অন্যতম যুদ্ধাপরাধী হিসেবে পরিচিত সাকাচৌ বেগম জিয়াকে এক সময় কুৎসিত সব ভাষা গালাগালি করেছিলেন যা বাংলাদেশে কেউ করেনি। বেগম জিয়া কিন্তু তাকেই ওআইসির মহাসচিব পদে মনোনয়ন দিয়েছেন। কারণ, জামায়াত তাকে চায়, সে কারণে ওআইসি ও জামায়াতের পৃষ্ঠপোষক সৌদি আরব তাকে সমর্থন জানাবে। এর ফলে বাংলাদেশে

অবস্থা কী হবে তা বাঙালিরা পরে টের পাবেন। অপরদিকে আরেক যুদ্ধাপরাধী মন্ত্রী মুজাহিদ মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, 'বাংলাদেশ এখন মৌলবাদীদের শক্ত ঘাঁটি।' (*জনকণ্ঠ* ২১.১২) পরে অবশ্য তা অস্বীকার করা হয়েছে।

কয়লা ধুলেই কি ময়লা যায়? কয়লার রং কি সাদা হয়ে যায়। যায় না। জামায়াত নেতারা সব সময় এগুলো বলে আসছে এবং তাদের সহযোগী বিএনপিও এ বিষয়ে একমত। এ জন্য তারা দেশ হিন্দু-খ্রিস্টান শূন্য করতে চায়। (সাম্প্রদায়িকতা), মৌলবাদ বা ওহাবিবাদ প্রচার করতে চায় (কাদিয়ানীদের অমুলমান করা, মসজিদের নামে জমি দখল করা ইত্যাদি)। ওহাবীরা কেন সৌদি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল এর বিশদ বিবরণ জানতে চাইলে তারিক আলীর *ক্লাশ অফ ফান্ডামেন্টালিজম'* গ্রন্থটি পড়ার অনুরোধ জানাবো। এ থেকে বেগম জিয়াকে নিয়ে তাদের এগোনো কৌশলটাও পরিষ্কার হবে। যে কারণে নারী নেতৃত্ব হারাম ঘোষণার পর জামায়াত নেতারা বেগম জিয়ার পদচুম্বনে আগ্রহী। গোলাম আযম একদিকে নীতিবান। তিনি যা মনে করেন তা বলেন। তিনি দু'যুগ আগে ১৯৭১ সালের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, 'রিপ্যান্ট করার কোনো কাজতো আমি করিনি। রিপ্যান্ট করবো কেন?' (আখতার হোসেন, *জননেতা গোলাম আযম*, পৃ-৪৭)। তারই সুর ধরে এখন বলছেন, নিজ দেশে ফিরে এসেছি। আত্মজীবনীতে গোলাম আযম লিখেছেন 'স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েমের সংগ্রামকালে মুসলিম জাতীয়তাবোধ ম্লান হয়ে গেল এবং বাঙালি জাতীয়তার চেতনা প্রবল হয়ে দেখা দিলো। ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে পার্থক্য, তা একশ্রেণীর লোক ভুলেই গেল।' পৃ-২৫১) বিএনপিও তাই মনে করে। বিএনপি মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছেন 'ইনকিলাব', 'সংগ্রাম' ও 'দিনকাল' তাদের পত্রিকা। এগুলোর চরিত্র কী তা কারো অজানা নয়।

গণঅসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠলে গণঅভ্যুত্থান হয়। জামায়াত জানে তারা ক্ষমতায় এলে যা করবে তাতে গণঅসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠতে পারে। সে জন্য গোলাম আযম তার 'স্টাডি সার্কেল' গ্রন্থে লিখেছেন- 'বাংলাদেশে নির্বাচনই নিরাপদ মাধ্যম। গণঅভ্যুত্থান এ দেশের জন্য মারাত্মক– এতে প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী শক্তি সুযোগ পেয়ে যাবে। (পৃ.১৬৭) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার এও বলেছেন– 'নির্বাচন ছাড়া জিহাদের মাধ্যমেও তা হতে পারে- যেমন আফগানিস্তানে হয়েছে;। (পৃ.১৬৮) কী বুঝলেন? সারা দেশে অসংখ্য মৌলবাদী গোষ্ঠীর অস্ত্রশস্ত্রসহ ধরা পড়া ও না পড়ার মধ্যে কী প্রমাণিত হয়? আর না হলে পাকি পদ্ধতি তো আছেই। তার মতে-'সশস্ত্র বাহিনীর অফিসাররা জিহাদি জজবায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং জওয়ানদেরকে শাহাদাতের প্রেরণা দেবে।' (পৃ. ১৬৫) এ সবেরই ফয়সালা করতে সব পাকি ও তালিবান পন্থীরা পাকিস্তানে কিনা কে জানে। এবং

তারপর খবর পাওয়া গেল তালেবান বিরোধী পাকি প্রেসিডেন্টকে হত্যার জন্য দু'বার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

বাংলাদেশের পাকিকরণ বা ইজ্জতহরণ সম্পর্কে আমরা জামায়াত-বিএনপি ঐক্যজোট সম্পর্কে যত সাক্ষ্যপ্রমাণই তুলে ধরি না কেন বিএনপি-জামায়াত অনুসারী ও তাদের গুণমুগ্ধ ভোটাররা বলবে প্রোপাগাণ্ডা। কিন্তু এখন আমাদের সুস্পষ্টভাবে বলার সময় এসেছে জোট বাংলাদেশপন্থী নয় পাকিপন্থী। গত ৩ বছরে তাদের কোনো ব্যবস্থা বাংলাদেশ আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন, আমরা জানি কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। সাদা হয় না। বিএনপি-জামায়াত বলবে এটি ঠিক নয়। যেমন আলতাফ চৌধুরী বলেছেন 'দেশে খুন বেড়েছে, অপরাধ বাড়েনি। জামায়াত-বিএনপির অনুসারীদের বলি, সেমতো কয়লা বারবার ধুতে থাকুন, দেখুন ময়লা যায় কিনা বা সাদা হয় কিনা।

৩০ ডিসেম্বর, ২০০৩

জিয়াউর রহমান যে ভুল করেছিলেন

ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার একটি উক্তি নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় বেশ আলোচনা চলছে। অনেকে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচয় দিতে ভালোবাসে এমন অনেক দল ভালো ভালো বিবৃতি দিয়েছে যদিও গত ৩২ বছরে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিহত করার বিষয়ে তাদের অবদান প্রায় শূন্য। একটি বিষয় আমাকে বিস্মিত করেছে, হয়তো, আমি অর্বাচীন দেখেই, তা হলো, এতে ক্রুদ্ধ বা অবাক হওয়ার কী আছে? বেহুদা কথা বলার জন্য অনেকে তাকে বেহুদা বলেন। সেটি একটি দিক। কিন্তু, আমি বলবো ব্যা, না. হুদা তার মতোই আচরণ করেছেন। একটা বিষয় বোঝা বোধহয় উচিত। তা হলো, তার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড কী? শুনেছি, ভুল হতে পারে (হলে ক্ষমাপ্রার্থী), মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে না থাকার জন্য। যাহোক, ঐ পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণেই ব্যা.না হুদা তরুণ বয়সে লে. জে. জিয়াউর রহমানের নতুন দলে যোগ দিয়েছিলেন। দলটির মূল খুঁটি ছিল পাত্তা না পাওয়া ফ্রাসট্রেটেড বামপন্থী, স্বাধীনতাবিরোধী, রাজাকার-আলবদর প্রভৃতি। এভাবে জিয়া ডান-বামের খিচুড়ি করে প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল একটি দল গঠন করতে পেরেছিলেন, হুদারা ছিলেন যার তরুণ তুর্কী। তা সেই ব্যা. না. হুদা কি মুক্তিযুদ্ধকে মহান মুক্তিযুদ্ধ বলবেন? আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, ছাগল ম্যা ম্যা করবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি যদি ছাগল দিয়ে ধান চাষ করতে চান, সেটা কি সম্ভব?

নাজমুল হুদার একটি উক্তি নিয়েই অনেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন কিন্তু তিনি এরকম আরেকটি উক্তি করেছেন প্রায় এ সময়ে যেটি ছাপা হয়েছে ইত্তেফাকে, যা সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আমি সেটাও উদ্বৃত করবো।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের এক অনুষ্ঠানে যেখানে জামায়াতিরাও উপস্থিত ছিল স্বাভাবিকভাবেই, সেখানে ব্যা. না. হুদা বলেছেন, 'তৎকালীন দেশের (পাকিস্তান) সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে জামায়াত কোনো অপরাধ করেনি। কারণ, স্বাধীন সার্বভৌম দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব।' ছাত্র শিবিরের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, 'এখানে একটিই ধারা তা হলো ইসলামি মূল্যবোধের বিষয়।'

হ্যাঁ এ মন্তব্য স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষেই যায়। কিন্তু তৎকালীন দেশের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করার অর্থ কি খুন, জখম, গণহত্যা, লুট, ধর্ষণে অংশগ্রহণ করা? অবশ্য বলা যেতে পারে, সেই একাত্মতার মানে তাই না হলে কেন বর্তমান সময়ের জোটের মূলনীতি হবে খুন, জখম, লুট, ধর্ষণ? ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি ৫ হাজার টাকায় স্ত্রীর সংগঠনের নামে বরাদ্দ করা ইসলামি মূল্যবোধের বিষয় কিনা কে জানে। বিএনপির জাতীয়তাবাদের অর্থ যে ইসলামি জাতীয়তাবাদ, সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

মুসলিম লীগের ৯৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আর এক সভায় ব্যা. না. হুদা বলেছেন,' সেদিন যদি মুসলিম লীগ ভারত বিভক্ত না করে পাকিস্তান বা বানাতো তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশ হতো না।' (*ইত্তেফাক*, ১.১.০৪)। তার লজিক অনুযায়ী বলতে হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব না থাকলে বাংলাদেশ হতো না, বাংলাদেশ না হলে জিয়াউর রহমানের সৃষ্টি হতো না। আর জিয়াউর রহমান না থাকলে দেশে এতো পাকিপন্থী হতো না আর ব্যারিস্টার নাজমুল হুদাদেরও 'রাজনীতি' করে মন্ত্রী হতে হতো না। অনেকে বলেন, শিক্ষা কুলাঙ্গারকে অঙ্গারে পরিণত করে। কিন্তু বাংলাদেশ যেহেতু সব সম্ভবের দেশ সেহেতু শিক্ষা অনেককে খাঁটি এবং ভালো কুলাঙ্গারেও পরিণত করে।

ব্যা. না. হুদা তথা ছুপা রুস্তমদের বিভিন্ন বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠছে তা হলো জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে যে 'ভুল' করেছিলেন তা শুধরে দেওয়া। সরকারের নীতি নির্ধারক, নীল চোখের যুবক যখন বলেন, নিজামীরা যা করেছিল তা ঠিক তখন এটাই বলা হয় কূটনৈতিকভাবে যে, জিয়া ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের অধীনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ করেছিলেন তা ছিল ভুল। বেগম জিয়াও নিশ্চয় তাই মনে করেন এবং বিএনপিও। কারণ তারা বলেননি যে, পুরস্কার লাভ করেছেন তা ছাড়তে কিন্তু তারা নারাজ। এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ও অবশ্য পরিষ্কার। জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের ভুলটি করে বুঝেছিলেন, যে কারণে তিনি ব্যা. না. হুদা ও নিজামীদের নিয়ে দল করেছিলেন, তাদের পুনর্বাসিত করে ছিলেন। এ কারণেই বিএনপি নেতাকর্মীরা ব্যা. না. হুদার বক্তব্যের কোনো প্রতিবাদ করেনি।

বিষয়টি অন্যভাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। আমরা আগে এ মন্তব্য করেছিলাম যে, বিএনপি-জামায়াত মূলত একইদলের এপিঠ-ওপিঠ। এতে অনেকে গোস্‌সা হয়েছিলেন। যারা আওয়ামী বিরোধিতা করার জন্য বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের বোধ হয় ধারণা হয়েছিল, তাদের মধ্যেও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ আছে। তারা পাকি আদর্শে বিশ্বাসী নন। জিয়াউর রহমান যখন বিএনপি করেন, আগেই উল্লেখ করেছি, জামায়াতি বা পাকি আদর্শে বিশ্বাসী অনেকেই দলে

এসে এতদিন ঘাপটি মেরে বসেছিলেন ছুপা রুস্তমের মতো। এখন ক্ষমতায় আসার পর সেই ছুপা রুস্তমরা বেরিয়ে আসছে। না হলে হুদা-নিজামীর বক্তব্য এই রকম হবে কেন? দু'টি দল যদি একই দল না হবে তাহলে পাকি আদর্শ অনুসারে (১৯৭১ স্মরণ করুন) দেশটি হিন্দুশূন্য, খ্রিস্টানশূন্য করায় মেতে উঠবে কেন? ধর্মের জিকির তুলে দেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করবে কেন? এ বিষয়ে সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন আবদুল কাইয়ুম *দৈনিক প্রথম আলোতে (৩১.১২.০৩)*। যে সাকাচৌ বেগম জিয়াকে গালাগাল করেন তাকেই কেন ইসলামি সম্মেলন সংস্থায় মহাসচিব মনোনয়ন দেওয়া হয়? কারণ কি এই, হুদা লজিক অনুসারে ১৯৭১ সালে সাকাচৌ কোনো ভুল করেননি। উল্লেখ্য, জামায়াতিরাও সবসময় বলে ১৯৭১ সালে কোনো ভুল করিনি। গোলাম আযম তো প্রকাশ্যে বলেছেন, এ কারণে তিনি 'রিপ্যান্ট' করেন না। বিএনপি পাকিপন্থী না হলে যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে সরকার গঠন করবে কেন? সে কারণেই বলছিলাম, বিএনপির ছুপা রুস্তমরা এখন বেরিয়ে আসছেন এবং প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং দাঁড়াবেন। এটিই স্বাভাবিক। এরপরও যারা এটিকে অস্বাভাবিক ভাবেন বা দু'টি দকে মুক্তিযুদ্ধের নিরিখে আলাদা করেন, তারা ধান্ধাবাজদের স্বর্গে বাস করছেন। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি সারা দেশে ১১টি জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠন আছে, যাদের বিরুদ্ধে সরকার কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ইসলামি জঙ্গিবাদের দেশের পাসপোর্ট নিয়ে ভবিষ্যতে দেশ থেকে বেরুনো দুঃসাধ্য হবে। এ দেশের মানুষকে, বিশেষ করে আমাদের জেনারেশনকে ভাবতে হবে আমরা কি পাকিদের দলে থাকবো, তাদের সমর্থন করবো– নাকি ভাবেবো, পরাজিত পাকিদের পরাজিত আদর্শ দিয়ে একুশ শতকে পথ চলা সম্ভব নয়। দেশপ্রেমিক হিসেবে পরিচয় দেওয়াও সম্ভব নয়। আজ এরা ক্ষমতায় আছে দেখেই বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। না, এটা আমার মন্তব্য নয়। নিউইয়র্ক টাইমসের এই মন্তব্যটি মহিউদ্দিন আহমদ উদ্ধৃত করেছেন তার একটি প্রবন্ধে (*জনকণ্ঠ ১.১.০৪*)-'Bangladesh may now be among the world's most dangerous countries for jounalists. সাংবাদিকদের পরিপ্রেক্ষিতে বললেও কি তা সাধারণ মানুষদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

৫ জানুয়ারি, ২০০৪

বিএনপি কীভাবে জামাতের বি টিমে পরিণত হলো

জামাত-বিএনপি যখন একজোট হয়ে রাজনীতি শুরু করে তখন আমাদের কি যেন বলে, সুশীল সমাজের সুশীল মার্কা অনেকে বলেছিলেন, গণতন্ত্রে এমনটিই হতে পারে। তারা তখন দিব্যি ভুলে গিয়েছিলেন, ইউরোপে আমাদের থেকে উন্নতমানের গণতন্ত্র চর্চা হয় এবং সেখানে নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। এই একই কারণে, ১৯৭২ সালের সংবিধানে জামাত বা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কারণ, জামাত ও ধর্মব্যবসায়ীরা ১৯৭১ সালে গণহত্যা গণধর্ষণ ও গণলুটের সঙ্গে ছিল জড়িত। সেই 'সুশীল ভদ্রলোক'রা তখন বলতেন, লিখতেন যে, জামাত এমন কোনো শক্তি নয়, ৭% ভাগ ভোট আছে মাত্র। আমরা বলেছিলাম, এটা ভুল। কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।' জামাতের পূর্ব ইতিহাস জিঘাংসা ও হিংস্রতার ইতিহাস। তারা সব সময় কয়েক ভাগ ভোট নিয়ে অন্যের পৃষ্ঠপোষকতায় বড় হয়েছে। তাদের গুরু মওদুদী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকদের সমর্থন করেছিলেন। ভারত থেকে বিতাড়িত হলে তিনি পাকিস্তান আশ্রয় নেন এবং মানুষ হত্যার জন্য দাঙ্গার সৃষ্টি করেন। যে কারণে, পাঞ্জাবীদের মতো ধর্মব্যবসায়ীরাও তার ফাঁসির আদেশ দিতে বাধ্য হয়েছিল। মওদুদীর হয়ে বাংলাদেশের ভার নিয়েছিলেন গোলাম আযম, যার শিষ্য নিজামী ছিলেন আলবদর প্রধান। জিয়াউর রহমানের মহব্বতের কারণে এবং তারপর আরেক ধর্মব্যবসায়ী এরশাদের কারণে আজ ওদের রবরবা। গত কুড়ি বছরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক শাসনের বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে জামাত। যাক, আমরা তখন বলেছিলাম, এইবার বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বারোটা বাজল বলে। যেসব বিখ্যাত সাংবাদিক 'গণতান্ত্রিকভাবে' জামাতকে ক্ষমতায় আনতে সাহায্য করেছেন, তাদের পত্র-পত্রিকায় জামাত সম্পর্কে এখন মিনিমাম খবর পাবেন। এতে কী প্রমাণিত হয়? নিজেরাই বুঝে নিন।

বিএনপির প্রচুর অন্ধ, অজ্ঞ সমর্থক মনে করেছিল বিএনপি বোধ হয় এবার তাদের এজেন্ডা কার্যকর করার ব্যাপারে শক্তিশালী হবে। একদিক থেকে বলতে গেলে, বিএনপির প্রধান দুটি এজেন্ডা পূর্ণ হয়েছে। প্রথমটি হলো লুট, হত্যা, ধর্ষণ। অনেকের ধারণা, আওয়ামী লীগের প্রধান শত্রু বিএনপি, মোটেই না। বিএনপি মোটামুটি সুবিধাবাদী কিছু লুটেরার দল, আদর্শবিহীন। গত দু'বছরে সংবাদপত্রের বিভিন্ন খবরই এর প্রমাণ। আদর্শগত দিকে থেকে আওয়ামী লীগের প্রধান শত্রু

জামাত। গত তিন বছরে জামাত ও বিএনপি হত্যা, লুট, ধর্ষণে সহায়তা করেছে তবে সহযোগী হিসেবে বিএনপির দ্বিতীয় এজেন্ডা, জিঘাংসা বা হীনম্মন্যতা কার্যকর করা। অর্থাৎ যেখানে যেখানে বঙ্গবন্ধু বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম আছে তা মুছে ফেলা এবং নৌকা প্রতীক ধ্বংস করা। লক্ষ্য করবেন, সর্বোচ্চ আদালতের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িপাল্লা কিন্তু ঠিকই আছে। এবং আরো ভেবে দেখুন, স্বাধীনতা যুদ্ধের, প্রধান-বিরোধী ছিল জামাত, বিএনপির তখন সৃষ্টি হয়নি। জামাতের পক্ষে স্বাধীনতার প্রতীকসমূহ সহ্য করা মুশকিল।

এ ছাড়া কার্যত সর্বক্ষেত্রে জামাতের এজেন্ডা কার্যকর হয়েছে। কত উদাহরণ দেবো? এর সংখ্যা এত বেশি যে কয়েক পৃষ্ঠা লাগবে। সামান্য ক'টিই যথেস্ট। যুদ্ধাপরাধী জামাতিদের ক্ষমতা দখল ও যুদ্ধাপরাধীকে ইসলামী সংস্থায় মনোনয়ন, মওদুদীর উগ্রপন্থা কার্যকরভাবে গ্রহণ যার ফলে বাংলাদেশ এখন ইসলামী জঙ্গিবাদী দেশ হিসেবে পরিণত। এর প্রমাণ, অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রচুর জঙ্গিবাদী গ্রেফতার এবং বিচার না হওয়া। এতে বোঝা যায় ঐ সব গ্রেফতার ছিল লোক দেখানো। যার সর্বশেষ উদাহরণ, হযরত শাহ জালালের (রহঃ) মাজারে বোমা নিক্ষেপ, বিশেষ বিশেষ জায়গায় জামাতের ছাত্র ক্যাডার নিয়োগ, অন্যান্য জায়গায় বিএনপির সদস্য ক্যাডার নিয়োগ যাতে তারা জামাতের ওপর নির্ভরশীল থাকে। শোনা যাচ্ছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইংরেজিতে কথা বলা তাকে অপসারণ করে জামাত ক্যাডারের একজনকে নিয়োগ করা হবে। এই ক্যাডার কয়েকদিন আগেও ছিল সচিব যার ভয়ে মন্ত্রীরা পর্যন্ত ছিল নিশ্চুপ। এখন দেশের নাম বদলের বাকি মাত্র। এটি হলে কয়েক দশক আগে ক্ষমতা দখলকারীর পরিবারদের সবাইকে দেশ ত্যাগ করতে হবে। শেখ হাসিনাকেও। অথবা তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ধর্মযুদ্ধের মতো যুদ্ধ করে শহীদ হতে হবে। এ কারণেই কয়েকদিন আগে, জামাতের ছুপা রুস্তম, ব্যা, না. হুদা ঘোষণা করেছিলেন, ১৯৭১ সালে জামাত কোনো অপরাধ করেনি যা ১৯৭১ সালেই জামাতের নেতারা বলেছিল।

আমি এ বিষয়ের সর্বশেষ তিনটি উদাহরণ দেবো–

১. সপ্তাহখানেক আগে, জামাতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবির বা বাচ্চা জামাতিরা বিএনপির ছাত্র সংগঠন বা খালেদা জিয়ার সোনার ছেলেদের এমন পিটিয়েছে যে অনেকে পিতৃ পরিচয়ও ভুলে গেছে। ছাত্রদল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ই, শোনা গেছে রাজশাহী ত্যাগ করেছে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী, ছাত্রদলের পৃষ্ঠপোষক শিক্ষকদেরও এমন ধাওয়া করেছে বাচ্চা জামাতিরা যে, তাদের অনেকে এখন ঢাকায়। ছাত্রদলের বিরুদ্ধে বেশ ক'টি মামলাও করেছে শিবির। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ বা তরুণ তুর্কী, ক্যারিশমেটিক লিডার হিসেবে পরিচিত তারেক রহমান এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। মন্ত্রীরা নিশ্চুপ। ঢাকা থেকে কোনো লিডার রাজশাহী যাওয়া দূরে থাকুক, খানিকটা সমবেদনাও জানায়নি। ছাত্রদলের সাধারণ কর্মীরা, যারা লুটের ভাগ পায়

না কিন্তু ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো লাফায়, এখন বোধহয় তাদের সময় এসেছে বিষয়টি অনুধাবন করার।

২. পত্রিকার খবর এবার হজের সরকারি প্রতিনিধি দলে বিএনপির ধর্মমন্ত্রী নেতৃত্বে থাকছেন না। জামাতিরা শুধু 'মন্ত্রীর নামই নয়, একই সঙ্গে প্রতি দল থেকে বাদ দেওয়া হয় মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত সিংহভাগ লোকেরও নাম। আর এদের পরিবর্তে ঢোকানো হয় জামাত পছন্দ 'খ্যাতিমান' সব লোক। এদের মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাজাকার হিসেবে কাজ করেছে এবং ধর্ষণের অভিযোগ আছে এমন কুখ্যাত লোকও হয়েছে।' (*জনকণ্ঠ* ২০.০১.০৪)। একদিকে ঠিকই আছে। সৌদিরা রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের পছন্দ করে যারা রাজতন্ত্রের সমর্থক।

৩. জামাতের পাকিকরণ এজেন্ডাও যে সমাপ্তির পথে তার প্রমাণ পাকিস্তানের সিনেটে মুত্তাহিদা মজলিস-ই-আমলের সংসদীয় নেতা মাওলানা গুল নসিব খান বলেছেন, তাঁরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন এবং বাংলাদেশের সংসদে তাদের তিনজন এমপি আছে। এরা হলেন– ওয়াক্কাস, আমিনী ও শহিদুল। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতি অবস্থান খুবই সুদৃঢ় এবং সে দেশের প্রতিটি শহরে দলটির সংগঠন রয়েছে।' এরা সব জামাতের উগ্রবাদের সমর্থক জোটের অধস্তন সহযোগী।

৪. বেগম জিয়া বলেছেন, তার পক্ষে আহমদিয়াদের এখন অমুসলিম ঘোষণা করা সম্ভব নয়। হলে হয়তো করতেন। অন্যদিকে সরকারের আরেক প্রধান নিজামী ফতোয়া দিয়েছেন, আহমদিয়ারা অমুসলিম এবং তাদের যারা সমর্থন করে তারাও অমুসলিম। আপনি রাগ করে হয়ত বলতে পারেন, ইসলাম তার পিতার সম্পত্তি নাকি যে সে নির্ধারণ করবে কে মুসলমান, কে নয়? কিন্তু বলা পর্যন্তই। ১৯৭১ সাল থেকে দিব্যি খেয়েদেয়ে তারা পুরুষ্ট হয়েছে। কী করতে পেরেছেন? এখন কি 'বীর' খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারাও?

৫. রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান থেকে জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা বাদ। সিপিএ সম্মেলনের কথা স্মরণ করুন। কয়েকদিন আগে এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী উদ্বোধনেও জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়নি এবং বিএনপির লিডার মান্নান ভুঁইয়া ক'দিন আগে বলেছেন পুরনো কথা বা অতীত ভুলে যেতে।

সুতরাং, এখন জামাতের বি টিম হিসেবে বিএনপিকে ডাকতে পারেন। সেটি ভালো না লাগলে, আপাতত জুনিয়র জামাতি বলতে পারেন। তবে, বেশিদিন এ অবস্থা থাকবে না। এখন বিএনপি-জামাত একই দলের এপিঠ-ওপিঠ। ভবিষ্যতে দল একটিই হয়ে যাবে।

২৩ জানুয়ারি, ২০০৪

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও রাজনীতি

দেখতে দেখতে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির এক যুগ পূর্ণ হলো। আমরা যারা এটি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তাদের তখনো তরুণ বলে চালিয়ে দেয়া যেতো। আমাদের বড়দের প্রবীণ। এখন আমাদের আর তরুণ বলার উপায় নেই। বড়রাও সে অর্থে সচল নন। কিন্তু যে কারণে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে কারণটির অবসান এখনো হয়নি। অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। সেজন্য যারা জড়িত ছিলেন, তারা এখনো দমেননি।

নির্মূল কমিটি এক যুগ উপলক্ষে গণআদালতের বিচারক অভিযোগকারীদের বিশেষভাবে সংবর্ধনা দেয়। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এখন আশি পেরিয়েছেন, কলিম শরাফী, গাজিউল হক আশির দিকে ছুটছেন, সৈয়দ শামসুল হক আর বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সত্তরে পা দেবেন। কিন্তু সেদিনের সভায় এরা সবাই ছিলেন সোচ্চার।

এবং এ কথাটাই তারা বার বার বলছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই।

নির্মূল কমিটির আগে ছিল মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র। একদিন কার বাসায় যেন সমমনা কয়েকজন বসে আলাপ হচ্ছিল। এরশাদ আমল তখন। জামায়াত, বিএনপি, আওয়ামী লীগের সঙ্গে আন্দোলন করলেও আমরা শঙ্কিত হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, এই আন্দোলন আন্দোলন খেলার মাধ্যমে তারা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে চাচ্ছে। সামরিক শাসকদের সঙ্গে তাদের সব সময় যোগাযোগ থাকে। তখনো ছিল নিশ্চয়ই। কারণ স্টাবলিশমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া জামায়াত কখনো বেড়ে উঠতে পারে না। শক্তি সঞ্চয়ের পর পুরনো পৃষ্ঠপোষকদের ছুরি মেরে সে স্থান দখল করে। এইটা তাদের রণকৌশল। আমাদের সঙ্গে সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন কয়েকজন। জামায়াত তথা ঘাতক তথা যুদ্ধাপরাধীদের উত্থানে ছিলেন তারা শঙ্কিত। ক্ষুব্ধও। সে কারণে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র গঠন করা হলো। কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হলো একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়? একুশে বইমেলায় ডানা প্রকাশনীর দোকানে বইটি বিক্রির বন্দোবস্ত করা হয়। পুরো মেলাজুড়ে সৃষ্টি হয় আলোড়ন। পুরনো ইতিহাস, যা সামরিক কর্তৃপক্ষ ও জামায়াতের মিলিত চেষ্টায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল, তা আবার জ্বলজ্বল করে ওঠে। এ বইটি বিবেকবান মানুষকে আঘাত করেছিল, সমাজে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

করেছিল। তার ফলেই চিন্তা করা হচ্ছিল, শুধু গবেষণা নয়– মাঠপর্যায়েও কিছু কাজ করা যায় কি-না। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় নির্মূল কমিটি।

প্রধানত শাহরিয়ার কবিরের উদ্যোগে গঠিত হয় নির্মূল কমিটি। এই প্রথম বাংলাদেশে ডানপন্থি চিন্তা–ভাবনার লোক ছাড়া সব ধরনের বুদ্ধিজীবীদের একই প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল, যা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে এর আগে সম্ভব হয়নি। শুধু তা-ই নয়, নির্মূল কমিটির সব ধরনের কর্মকাণ্ডে ছিলেন তারা সক্রিয়। এর অন্য একটি দিক আছে। বাংলাদেশের প্রায় সব লেখক-শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী তথা বুদ্ধিজীবীর প্রাণের দাবি ছিল যুদ্ধাপরাধী শনাক্ত ও তাদের বিচার করা। কিন্তু নির্মূল কমিটির একার পক্ষে দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে গঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল সমন্বয় কমিটি। রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৭০টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় জাতীয় সমন্বয় কমিটি। আহ্বায়ক হলেন জাহানারা ইমাম।

একাত্তরের দিনগুলি লেখার সময়ই বোধহয় ঘাতক-দালালদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার কথা তার মনের অবচেতনে ঘুরতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের পর ঘাতক-দালালদের উত্থান তাকে অসম্ভব পীড়া দিতো। কারণ তিনি ছিলেন শহীদ জননী। পুত্রহারা যারা হননি, তাদের পক্ষে সেই শোকের মাত্রা অনুভব করা সম্ভব নয়। সে কারণে যখন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং পরে সমন্বয় কমিটি হলো, তখন তার 'মুক্তিযোদ্ধা ছেলে'রা আহ্বান জানিয়েছিল এর ভার নেয়ার জন্য এবং তিনিও সায় দিয়েছিলেন, যদিও আক্রান্ত তিনি তখন ক্যান্সারে।

নির্মূল কমিটির প্রধান দাবি ছিল এবং এখনো আছে, তাহলো-যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। কারণ একটি সভ্য সমাজ গড়ে তুলতে এর বিকল্প নেই। অতীতে যাদের হত্যা করা হয়েছে বা লাঞ্ছিত করা হয়েছে, তাদের হত্যাকারী বা লাঞ্ছনাকারীদের বিচার যদি না হয় তাহলে মানুষ বর্তমানের মুখোমুখি হবে কীভাবে? কারণ হত্যাকারীরা সমাজে ঘুরে বেড়াবে বীরদর্পে এবং এতে প্রতীয়মান হবে, খুন করলেই যে বিচার হবে– এমন কোনো কথা নেই এবং বাংলাদেশে ঠিক তা-ই হয়েছে। বাংলাদেশ যে সন্ত্রাসের কারণে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, তার মূল কারণ সেখানেই নিহিত। ইউরোপেও এক সময় গণহত্যা চালানো হয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজ সভ্যতার সেই সূত্রটি মেনে নিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় সমাজের অগ্রগতির এটিও একটি কারণ। সমাজে স্থিরতা ফিরে এসেছিল এবং আগের অভিজ্ঞতা মনে রেখে, ইউরোপে আর কখনো নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদকে উৎসাহ দেয়া হয়নি। দমন করা হয়েছে, কারণ তা গণতান্ত্রিক আদর্শের বিপরীত।

আহমদ জিয়াউদ্দিনের এক প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, হিটলারের নরমেধযজ্ঞের পর অধিকৃত রাষ্ট্রগুলোর স্লোগান ছিল, যারা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের কোনো স্থান হবে না দেশে। পাশ্চাত্যের সব ক'টি অধিকৃত রাষ্ট্রে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটিই ছিল সরকারি নীতি। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, দালালির কারণে বেলজিয়ামে ১ লাখ, নেদারল্যান্ডে ১ লাখ ১৩ হাজার এবং ফ্রান্সে ১ লাখ ৩০ হাজার লোককে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ১৯৯৫ সালে বেলজিয়ামের জনসংখ্যা ছিল ৮৩ লাখ আর নেদারল্যান্ডে ৮৮ লাখ। ফ্রান্সে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল ৬ হাজার ৭৬৩ জনকে, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডে ২ হাজার ৮৪০ ও ১৫২ জনকে। বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডে ও ফ্রান্সে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড দেয়া হয়েছিল যথাক্রমে ৫৩ হাজার, ৪৯ হাজার এবং ৪০ হাজার মানুষকে। এখানেই শেষ নয়। কারাদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল জরিমানা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, জেল মেয়াদ শেষে পুলিশ মনিটরিং এবং বসবাসের জন্য বিশেষ এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়া। বেলজিয়ামে তো রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়েছিল এবং সে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে (প্রয়োজনে)।

সে তুলনায় আমাদের দেশের খুনি, যুদ্ধাপরাধীরা স্বর্গে বসবাস করছে। খুনের বিচার থাক তারা আজ মন্ত্রী, আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিয়োগ পাচ্ছে। দেশের লোকের এতে সায় আছে– বিদেশে যদি কেউ তা বলে, তখন আমাদের উত্তর কী হবে? দেশের লোকের যদি সায় না থাকে, তাহলে এতদিন বহাল তবিয়াতে বসবাস করে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে কীভাবে।

এর অন্য দিকটি হলো, নির্মূল কমিটিই শুধু গণহত্যা বা যুদ্ধাপরাধের বিচার দাবি করেছে তা নয়। এ দাবি ১৯৭২ সাল থেকে করা হয়েছে। এবং তৎকালীন সরকারও এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছিল। আন্তর্জাতিকভাবে দাবি উঠেছিল গণহত্যা বিচারের। কয়েকদিন আগে ১৯৭২-৭৫ সালের পত্রিকা উল্টাতে গিয়ে সে ঘটনাগুলোই মনে হলো। আমি নিশ্চিত, আজ অনেকে সেসব ভুলে গেছেন। তাই বারবার এ কথাগুলো বলা উচিত। কয়েকটি উদাহরণ দিইঃ

১. ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক জুরি সম্মেলন রায় দিয়েছিল, বাংলাদেশের গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি হওয়া উচিত। (দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৭.৯.১৯৭২)।

২. ইসলামি দেশগুলোর প্রতি তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছিলেন ঃ 'ইসলামের নামে গণহত্যা দেখিয়া যান।' (ঐ ২৬.২.৭২)।

৩. সরকার গঠন করে গণহত্যা তদন্ত কমিশন। ৫.৪.৭২

৪. ড. কামাল হোসেন ঘোষণা করেছিলেন, গণহত্যার বিচার বাংলাদেশেই হবে।

১৯৭২ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত দালাল আলবদর, যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেফতার ও বিচার সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলো বর্তমান প্রজন্মের অনেককে আগ্রহান্বিত ও বিস্মিত করতে পারে। গত দু'দশকে এক ধরনের প্রচারণা চালানো হয়েছে, যার মূল কথা হলো দালাল, আলবদরদের গ্রেফতারে তৎকালীন সরকার শৈথিল্য প্রকাশ করেছে, তারা দণ্ডিত হয়নি এবং তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে যেহেতু এখন এক ধরনের রাজনীতি চলছে এবং এখনো আলোচিত, তাই সে সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করবো, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী হত্যা প্রসঙ্গটি।

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালেই বুদ্ধিজীবী হত্যার দাবি করা হয়েছে। উল্লিখিত পত্রিকাগুলোর পাতা উল্টালেই এ বক্তব্যের সত্যতা মিলবে। শুধু তা-ই নয়, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল 'চারুকলা ও সাহিত্য সংক্রান্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন করা হবে। তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, হত্যার বিচার হবে। বঙ্গবন্ধুও তো স্বপ্ন দেখেছিলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কিছুই হয়নি।

বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত ও অপরাধীরে শাস্তি প্রদানের দাবি জোরালো হয়ে উঠলে ২৫ ডিসেম্বর (১৯৭১) দৈনিক বাংলা লিখেছিল।

'আলবদর বাহিনীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। এই কমিটিকে সরকারের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। তাদের তদন্তের ভিত্তিতেই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পশুদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জেনেভা কনভেনশনের অছিলায় যাতে তারা নিষ্কৃতি না পায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যদি সব দুর্বৃত্ত রেহাই পেয়ে যায়, তবে এদেশের নিহত নিরপরাধীদের আত্মা কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না। অবশেষে বুদ্ধিঝীবীরা নিজেই তদন্ত কমিশন গঠন করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির আশ্বাসে কাজ শুরু করেন। কমিটির আহ্বায়ক জহির রায়হান নিজেই এরপর নিখোঁজ হয়ে যান।

বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত দাবি করে '৭২ সালের ১৭ মার্চ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারবর্গ শহীদ মিনারে গণজমায়েত করেন। এরপর মিছিল করে বঙ্গভবনে যান। মিছিলকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম দেখা করতে অস্বীকার করেন। পরে মিছিলকারীরা বঙ্গভবনের ফটকে অবরোধ করে বসে পড়লে অনেকক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী এসে তাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং মিছিলকারীদের সঙ্গে তার উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। পরে তিনি জানান, তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হবে। ইতোপূর্বে ৮ ফেব্রুয়ারি জহির রায়হানের অন্তর্ধানসহ বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিন সপ্তাহের ভেতর তাকে রিপোর্ট করা হবে। সেই

তদন্তের ফলাফল দেশবাসী কখনো জানতে পারেননি।

সংবাদ থেকে জানতে পারি ১৯৭২ সালে ড. আজাদকে হত্যার দায়ে দু'জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর এ মামলার কী হলো, তা জানি না। ডা. আলীম চৌধুরীর হত্যাকারী হিসেবে আলবদর আবদুল মান্নানকে (বর্তমানে 'মওলানা' ও ইনকিলাবের মালিক) ধরা হয়েছিল। সেও ছাড়া পেয়ে যায়। শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত খালেক মজুমদারকে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ ৭ বছরের কারাদন্ড দেন। হাইকোর্ট সে রায় বাতিল করেন।

মনে হয় বিচারকরা সব স্বর্গে ছিলেন। যেখানে জামায়াতে ইসলামী চোখের সামনের এত বড় হত্যাকাণ্ড ঘটালো, সেখানে কি ইমপ্রেশন হবে আওয়ামী লীগ দায়ী ছিল? বিচারকরা অবসর নেয়ার পর আজকাল অনেক উপদেশ দেন। বদরুল হায়দারও দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, এই বিচারক প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের কাছে দোয়া মাগুতে গিয়েছিলেন। একই ধরনের আর্গুমেন্টে গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে। এতে যে ন্যাচারাল জাস্টিস লজ্জিত হয়েছে তা কারো মনে হয়নি। আমরা এগুলো মেনে নিয়েছি, কারণ আমরা সেই আইনের ফ্রেমে বাস করি। কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় শুধু আমরা উল্লেখ করতে চাই– বাংলাদেশে যত বিতর্কমূলক নির্বাচন হয়েছে, তার প্রতিটির প্রধান (নির্বাচন কমিশন) হলেন একজন বিচারপতি। বাংলাদেশে যতগুলো অগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রতিটির প্রধান ছিলেন একজন বিচারপতি। ১৯৭৮ সালের এক রায়ে বিচারপতিরা রায় দিয়েছিলেন সামরিক আইন সংবিধানের ওপর। অথচ পৃথিবীতে সামরিক আইন জঙ্গি আইন হিসেবে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলাভাষা রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সব কাজ কর্ম ওই ভাষায় সম্পাদনের নির্দেশ দেয়া হয়। অধিকাংশ বিচারপতি সেই আইন না মেনে ইংরেজিতে রায় লিখেছেন।

১৯৭৫ এর পর থেকে বুদ্ধিজীবী হত্যা তথা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারটি ধামাচাপা পড়ে যায়। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটি তারপর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের দাবি তোলে এবং সে দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। তখন শেখ হাসিনাও এ দাবি সমর্থন করেন। সে দাবি থেকে আমরা এখনো সরিনি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পর আবার এ দাবি জোরদার হয়ে উঠছে। অনেকে শহীদ পরিবারের সদস্যদের বলছেন মামলা দায়ের করতে। আমরা এর বিরোধী। কারণ বিষয় দুটি আলাদা।

বুদ্ধিজীবীদের যারা হত্যা করেছে, তারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। বর্তমান বিশ্বে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কোনো দেশের মধ্যে সীমিত রাখা যাচ্ছে

না। চিলির একনায়ক পিনোশের ঘটনা এর উদাহরণ। প্রচলিত আইনে এই বিচার সম্ভব নয়। কারণ 'মওলানা' আবদুল মান্নান যদি বলেন, ডাঃ আবদুল আলীমকে তিনি হত্যা করেননি তখন আর এর প্রমাণ কী হবে? বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে হত্যার কথা স্বীকার করেছিল। মান্নানরা তো তা করেনি। বিচারক বলতে পারেন, সংগৃহীত প্রমাণ যথেষ্ট নয়। যদিও আমরা জানি, তৎকালীন কাগজপত্রে তা উল্লিখিত হয়েছে। এ ধরনের বিচারের জন্য সব সময় স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করা হয়। তাই সরকারকেও এটা করতে হবে এবং সরকারকে বাদী হতে হবে। শহীদ পরিবারগুলো আজ নিঃস্ব। জীবনধারণই তাদের জন্য কষ্টকর। বছরের পর বছর তারা মামলা লড়বেন কীভাবে? সংবিধানে কিন্তু স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা আছে।

বিএনপি বলে, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের দল। এরশাদ বলেন, তিনি মুক্তিযোদ্ধা। আওয়ামী লীগ বলে, তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল। সুতরাং তিন পক্ষই তো সংসদে বিষয়টি তুলে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করতে পারে। মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করলে তো এমনটিই হওয়া উচিত। আর খুনের মামলা বা খুনের বিষয় কখনো তামাদি হয় না। সব রাজনৈতিক খুনের বিচার সব দল দাবি করছে। বাংলাদেশের উজ্জ্বল সন্তানদের ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা কি রাজনৈতিক হত্যা নয়?

মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার, আলবদর, আল শামস এবং অন্যান্য স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠন যে শুধু পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তা-ই নয়, তারা গণহত্যা, ধর্ষণ, লুট এবং অন্যান্য সমাজবিরোধী কাজেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সফল যুদ্ধ শেষে তাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল, যুদ্ধ শেষে অনেকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেকের বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগ এনেছে, অনেকে শাস্তির ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এসব অভিঘাত সৃষ্টি করলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর। সরকার অবশ্য চেয়েছে পাকিস্তানি দালালদের বিরুদ্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি সরকার ঘোষণা করে 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ, ১৯৭২। এ আইনে শাস্তির মেয়াদ ছিল দু'বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। এ ধরনের আইনের যে প্রয়োজন ছিল শুধু তা-ই নয়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্যও প্রয়োজন ছিল এর যথাযথ প্রয়োগ। ২৮ মার্চ সারা দেশে দালাল বিচারের জন্য গঠন করা হলো ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল। কিন্তু এ আইনে একটি ফাঁক ছিল। সপ্তম ধারায় বলা হয়েছিল ঃ 'থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি যদি কোনো অপরাধকে অপরাধ না বলেন, তবে অন্য কারো কথা বিশ্বাস করা হবে না। অন্য কারো অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার হবে না ট্রাইব্যুনালে। অন্য কোনো আদালতে মামলা দায়ের করা হবে না।'

১৯৭৩ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এই অধ্যাদেশ বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ৩৭ হাজার ৪৭১ জনকে। মামলা নিষ্পত্তি হয়েছিল ২ হাজার ৮৪৮ জনের। দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল মাত্র ৭৫২ জন। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

এই সাধারণ ক্ষমা সমাজে এমন অভিঘাত হানবে, যা বাংলাদেশকে বিভক্ত করে দেবে, তা যদি ওই সময় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতেন, তাহলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার আগে তাদের চিন্তা করতে হতো। এখনো বাঙালি জাতিকে এই সাধারণ ক্ষমা নিয়ে তর্ক করতে হচ্ছে। শেখ মুজিব ও তার সরকার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তিনি বা তারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি এবং মানুষকে কী যাতনার মধ্যে থাকতে হয়েছে, তাও তারা অনুধাবন করেননি। করলে তাদের পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব হতো না। যেমনটি বলেছেন শহীদ সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার ঃ 'আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোনো নেতা যুদ্ধে আপনজন হারাননি। ফলে স্বজন হারানোর ব্যথা তাদের জানা ছিল না। ঘাতকদের তারা সহজেই ক্ষমা করে দিতে পেরেছিলেন।' অন্যদিকে এ পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের বক্তব্য, যা শেখ হাসিনা বলেছিলেন জাতীয় সংসদে।

সেই সময় প্রায় ৪ লাখ বাঙালি পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় ছিল। তাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্য রাস্তায় নেমেছিল, বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিল। আমাদের কাছে এসেও তাদের আত্মীয় স্বজন অনেকে কান্নাকাটি করেছেন। এ রকম একটা অবস্থায় সেই সব বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্যই এই Clemency (ক্ষমা) দেয়া হয়েছিল। (মুক্তিযুদ্ধে) অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বাড়ির একজনকে কোনো একটা পদে রেখে সেই বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং এ ধরনের যে সব কেস ছিল, যারা প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেই বঙ্গবন্ধু সাধারণ 'ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু যারা সত্যিকার যুদ্ধাপরাধী, বিশেষ করে যারা গণহত্যা চালিয়েছে, যারা লুটতরাজ করেছে, যারা নারী ধর্ষণ করেছে, যারা অগ্নিসংযোগ করেছে, তাদেরকে কিন্তু ক্ষমা করা হয়নি।'

এ বিষয়গুলোই বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকা উল্টালে প্রায় প্রতিদিন চোখে পড়বে দালাল-আলবদরদের গ্রেফতারের এবং তাদের বিচারের খবর। দেখা যাবে বিচারে অনেক কারাদণ্ড, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হচ্ছে।

২৬ জানুয়ারি, ২০০৪

ট্রাম্পকার্ড হারিয়ে যাওয়ায় এলো বাংলা ভাইয়ের শাসন

গত আড়াই বছরে বিভিন্ন সময় আমরা লিখেছিলাম, বাংলাদেশের পরিণতি হবে সামন্তযুগের মতো। কেন্দ্রে একজন রাজা বা রাণী থাকবেন বটে তবে দেশটি বিভক্ত হয়ে যাবে বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যে। এই মতামত অনেকের কাছে একপেশে এবং এক্সট্রিম মনে হয়েছে। আজ দেখা যাচ্ছে তা-ই ঘটছে। বাংলা ভাইয়ের উত্থান ও উত্তরাঞ্চলে তার সামন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা এর উদাহরণ।

দস্যু বাহরাম বা বনহুরের মতো এক রহস্যময় চরিত্র বাংলা ভাইয়ের। জনাব জলিলের গোল্ডকার্ড ট্রাম্পকার্ডটি হারিয়ে যাওয়ার পর বাংলা ভাইয়ের আবির্ভাব পত্রিকাগুলোকে সঞ্জীবিত করেছে। গত এক সপ্তাহ বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলা ভাইয়ের কার্যকলাপের রহস্যময় সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছে। অধিকাংশ পাঠক যেহেতু একটি পত্রিকা পড়েন, সেজন্য তার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ চিত্র পাবেন না। তাই কখনো তাকে হিরো, কখনো বা ভিলেন মনে হবে। আসল বাঙলা ভাইকে, কী তার কাজ সেটি অগোচরেই থেকে যাবে। বিভিন্ন পত্রিকা পড়ে আমি যা জানতে পেরেছি, নিচে তা তুলে ধরছি।

১. বাংলা ভাইয়ের পরিচয়

তিনি বিভিন্ন সময় নিজের বিভিন্ন পরিচয় তুলে ধরেছেন। কখনো বলছেন, ঢাকার এক কোচিং সেন্টারে পড়াতেন। তার জবান ও লেবাস এতো বাঙালিপনায় ভরপুর ছিল যে, তাকে সবাই বাংলা ভাই ডাকা শুরু করে। আবার কখনো বলছেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাস করেছেন। আগে আমাদের ধারণা ছিল, বাংলা সাহিত্য নিয়ে যে পড়াশোনা করে, সে আর যা-ই হোক অসভ্য বা রাজাকারী ধ্যান-ধারণার হয় না। অবশ্য সে ধারণা এখন আর নেই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাংলা পড়াচ্ছেন এ রকম রাজাকারী চিন্তার শিক্ষক কম নয়। যা হোক, অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজশাহীর বাগমারা এলাকার লোকজন তাকে গত দু'বছর ধরে চেনে। কারণ 'এখানে মসজিদে মসজিদে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত কার্যক্রম পরিচালনা করতে এলে ধাওয়া খেয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।'......[তার] নাম সিদ্দিকুর রহমান। বাড়ি বগুড়ায়। সেখানে আযিযুল হক কলেজে পড়ার সময় ইসলামী ছাত্রশিবিরের সক্রিয় ক্যাডার ছিলেন।.... কথিত আছে, আফগানিস্তানের কান্দাহারে মৌলবাদী ট্রেনিং নিতে গিয়ে তিনি বাংলা ভাই

হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সেই পরিচয়ে তিনি এখন আত্মপ্রকাশ করেছেন (*জনকণ্ঠ* ২৩ বৈশাখ)।

সুতরাং বিভিন্ন পত্রিকায় তার যেসব পরিচয় বেরিয়েছে, তা তার আসল পরিচয় তুলে ধরেনি। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে বাংলা শব্দটা ব্যবহার করায়। বয়স তার একটু বেশি হলে অবশ্য পরিচয়ে বলা হতো সে মুক্তিযুদ্ধও করেছে। আজিজুল ওরফে বাংলা ভাই জামায়াতের একজন ক্যাডার এবং আফগানিস্তানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত তালেবানি ভাবধারায় বিশ্বাসী। তার কর্মকাণ্ডকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে।

না হলে আরো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

২. বাংলা ভাইয়ের উত্থানের কারণ

বাংলা ভাই যেসব এলাকায় তৎপরতা চালাচ্ছেন, সেসব কীভাবে চালাচ্ছেন বা সেখানে তার উত্থান কীভাবে হলো সে সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক জনকণ্ঠে। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, নওগাঁও, নাটোর, রাজশাহী ও বগুড়ার আটটি উপজেলায় বাংলা বাহিনী তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব এলাকায় প্রথম পর্যায়ে খাঁটি সর্বহারা যারা ছিল, তাদের বিলুপ্তি ঘটেছে অনেক আগেই। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর দলে সর্বহারাদের লালন শুরু করে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য। এসব উপজেলার কেন্দ্র বাগমারা যেখান থেকে জাতীয় পার্টির আমজাদ হোসেন ১৯৯১ সালে এমপি নির্বাচিত হন। সুতরাং জাতীয় পার্টিকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য 'সর্বহারা'দের উত্থান ঘটে। ১৫ বছরে খুন হয় ৫০ জন। এর প্রতিক্রিয়ায় বিএনপি নেতারাও খুন হতে থাকে। কিছুদিন আগে বিএনপি নেতা হামিদ খুন হয়। তার জানাজায় বাগমারা থেকে নির্বাচিত বিএনপি এমপি আবু হেনা বলেছিলেন, 'কোনো সর্বহারা নয়, স্থানীয় বিএনপি সন্ত্রাসীরা খুন করতে পারে (*জনকণ্ঠ*)।

এসব এলাকা পরিণামে সন্ত্রাসীদের এলাকায় পরিণত হয়। সর্বহারা নামধারী সন্ত্রাসী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী সব মিলে এলাকায় চরম ত্রাসের সৃষ্টি করে। পুলিশদের কেউ সেখানে চেনে না। কারণ বাংলাদেশে পুলিশদের পরিচয় মাসলম্যান ও সন্ত্রাসীদের বন্ধু জনগণের নয়। গত এক দশকে জামায়াতে ইসলামীরও সেখানে আধিপত্য বাড়তে থাকে। এ পটভূমিকায় বাংলা ভাই ওরফে আজিজুলের উত্থান।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাইয়ের সাক্ষাৎকার পড়ে তার উত্থান সম্পর্কে একটি ধারণা করেছি।

এসব এলাকার বিএনপি এমপি নেতাদের দ্বন্দ্বে, একদলের উদ্যোগে বাংলা ভাইয়ের সৃষ্টি। বাগমারার এমপি আবু হেনা একদিকে অন্যদিকে হাওয়া ভবন ঘনিষ্ঠ

দুলু, রাজশাহীর মেয়র প্রভৃতি। প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য খুব সম্ভব এরা কাউকে খুঁজতে থাকে এবং জামায়াতের আজিজুলকে পেয়ে যায়। জামায়াতের সশস্ত্র ক্যাডাররা তো আছেই তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় পুলিশ ও বিএনপির একটি অংশের সন্ত্রাসীরা। শুরু হয় এ্যাকশন।

৩. এই অনুমানের প্রমাণ কী?

বাংলা ভাই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন 'ভূমি উপমন্ত্রী নাটোর থেকে নির্বাচিত এমপি রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর সঙ্গে দু'দিন দেখা এবং কথা হয়েছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য আবু হেনা জনবিচ্ছিন্ন। তাকে এলাকার জনগণ চায় না বলে তার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন মনে করিনি (*জনকণ্ঠ*, ৫.৫.০৪)।

রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি নূর মোহাম্মদ জানিয়েছেন, 'তাদের প্রতি আমাদের সায় আছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। পুলিশের সম্মতি না থাকলে তারা মাঠে থাকতে পারে না (ঐ)।

সুতরাং মূল বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়, বিএনপি জামায়াত জোটের স্বার্থে, এলাকার বিরোধীদের এবং সর্বহারা নামধারী যারা জোটের নয় শায়েস্তা করার জন্য বাংলা ভাই ও তার সন্ত্রাসী দলকে মদদ দিচ্ছে। বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা প্রথম। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, আমেরিকা ও ইউরোপীয়দাতাদের এর পেছনে হয়তো সায় আছে। বিশেষ করে, আমেরিকার। তারা পৃথিবীর সব দেশে সন্ত্রাস ও মানবাধিকার হরণ করার পৃষ্ঠপোষক এবং তালেবানি শাসনের মদদদাতা। অতীত ইতিহাস তা-ই বলে। ভাইস রয় লর্ড হ্যারি বিভিন্ন বিষয়ে অযথা বক্তব্য রাখলেও এ বিষয়ে নিশ্চুপ। ইসি সুশাসন ও মানবাধিকার নিয়ে কথা বললেও এ বিষয়ে নিশ্চুপ। এখানে উল্লেখ্য, এদেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী বা রাজনীতিবিদদের ক্যান্টনমেন্টে ঢুকতে সৈনিকরা বাধা দেয় কিন্তু লর্ড হ্যারিকে সালাম জানাতে জানাতে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে অনুষ্ঠান করেছে। ফলে সৈনিকদের আনুগত্য সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা পাই। এসব কিছুও পরোক্ষভাবে মদদ দিচ্ছে বাংলা ভাইকে।

৪. বাংলা ভাই যা করছেন

বাংলা ভাই যা করছেন তা হলো ৪টি জেলায় তার বাহিনী নিয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছেন। সঙ্গে আছে পুলিশ ও জোটের ক্যাডাররা। সর্বহারা নিধনের নামে এলাকার সমস্ত মানুষকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি রেখে যা খুশি তাই করা হচ্ছে। টাকা পয়সা আদায় করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তাদের হাতে বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে প্রচুর। এসব বিষয়ে ৪/৫টি পত্রিকায় বাংলা ভাই বিশদ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। আমি সেসব সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। যা থেকে আপনারা তার কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন–

প্রথম আলো ঃ আপনারা সর্বহারা সন্দেহে লোকজনকে ধরে এনে নির্যাতন করছেন নির্যাতনের মাধ্যমে প্রাণে মেরে ফেলেছেন পঙ্গু করেছেন। এসব কি আইনবিরোধী কাজ নয়?

বাংলা ভাই ঃ আমরা নির্যাতন করে কোনো মানুষকে প্রাণে মেরে ফেলেছি এটা ঠিক নয়। যারা মারা যাচ্ছে তারা এনকাউন্টারে অথবা জনগণের রোষানলে পড়ে মারা পড়ছে। যারা পঙ্গু হচ্ছে, তারা জনরোষে পড়ে অবস্থার শিকার হচ্ছে।

প্রথম আলো ঃ আপনারা কীভাবে নির্ধারণ করেন কে সর্বহারা আর কে নয়? নিশ্চিতই বা কীভাবে হন? আর এই কাজ তো পুলিশের?

বাংলা ভাই ঃ কেউ কারো সম্পর্কে অভিযোগ দিলে সেটা কয়েকদিন ধরে যাচাই করি বিভিন্ন সূত্র অনুসন্ধান করে। তারপর তাকে ডেকে আনি। সে স্বেচ্ছায় স্বীকার করে অস্ত্র দিয়ে দিলে আমরা ভালো হওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকি। পুলিশও আমাদের সঙ্গে সহায়তা করে থাকে।

প্রথম আলো ঃ জাগ্রত মুসলিম জনতার ব্যানারে আপনি বহু হত্যা মামলা এবং বড় অপরাধের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের আত্মসমর্পণ করাচ্ছেন। এই অঞ্চলের একজন পুলিশ সুপার বলেছেন, এ ধরনের কোনো কাজ করার আইনগত কোনো অধিকার আপনার বা জাগ্রত জনতার নেই। আপনি কী মনে করেন?

বাংলা ভাই ঃ এটা উনারা হয়তো আপনাদের কাছে বলেছেন ঃ কিন্তু আমাদের তারা বলেননি। বরং পুলিশ তো আমাদের কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে। আর আমরা তো ভাল কাজ করছি। (*প্রথম আলো* ৫.৫.০৪)

বাংলা ভাই কীভাবে কী কাজ করছেন এ সাক্ষাৎকারে তা পরিষ্কার। তিনি আরো জানিয়েছেন, দুলু ও এসপি মাসুদ তার কাজে মহাখুশি। দৈনিক জনকণ্ঠের প্রতিবেদন অনুযায়ী ইসলামী শাসন কায়েম করার পক্ষে ছাদকায়ে হাদিয়া হিসেবে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা দান খয়রাত আদায় করছেন জোর করেই। নির্মম নির্যাতন ছাড়াও পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, লোকজনকে নামাজ পড়তে বলা হচ্ছে ও বোরখা ছাড়া মহিলাদের পেটে মুখে কাদা কালি মেখে দেয়া হচ্ছে।

জামায়াত তাদের ফ্রন্ট হিসেবে বাংলা ভাইকে দিয়ে 'জাগ্রত মুসলিম জনতা' নামে একটি ফ্রন্ট গড়ে তুলেছে। সংবাদের প্রতিনিধি বাংলা ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

"আপনার নেতৃত্বাধীন সংগঠন 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ' কি রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রকাশ্যে আসবে?

বাংলা ভাই ঃ এ মুহূর্তে সে রকম কোনো পরিকল্পনা আমাদের নেই। তবে সাধারণ মানুষ চাইলে প্রয়োজনে রাজনৈতিক দল হিসেবে জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএসবি) প্রকাশ্যে আসতেও পারে।

সংবাদ ঃ এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত?

বাংলা ভাই ঃ সঠিক সংখ্যা গুনে রাখা হয়নি, তবে প্রতিটি ইউনিয়ন, গ্রাম ও মহল্লায় একটি করে ইউনিট কাজ করছে। এ হিসাবে প্রায় ৩ লাখ।

সংবাদ ঃ আপনাদের প্রতিপক্ষ কারা?

বাংলা ভাই ঃ প্রতিপক্ষ হিসেবে কাউকে দেখছি না কেউ আমাদের প্রতিপক্ষও নয়। তবে একথা ঠিক যে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে আমাদের একাজগুলো সরকার এবং বিরোধী দলের কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসীর স্বার্থবিরোধী হওয়ায় তারা গোপনে আমাদের বিরোধিতা করছে বলে খবর এসেছে। যারা আমাদের বিরোধিতা করছে তাদের আমরা সংশোধনের সুযোগ দেবো। সংশোধন না হলে তাদের কঠিন শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে। (*সংবাদ* ৬.৫.০৪)।

আশা করি পাঠকরা আজিজুল ওরফে বাংলা ভাইয়ের উত্থান ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আভাস পেয়েছেন। কিন্তু কোনো প্রতিবেদনে বা কোনো কলামিস্টের লেখায় সম্পূর্ণ বিষয়টি আসেনি, কেউ এ ঘটনাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করেননি।

মুল বিষয়টি হলো সরকার ও আইন। জোট সরকার কার্যত আছে কি-না? নেই। যা হচ্ছে তা আইনে অনুমোদিত কি-না? এটি সবাই জানে, বিএনপি যেখানে, সেখানে আইন-সুশাসন থাকে না সেখানে থাকে পেশী বা হাওয়া ভবনীয় শাসন। এটি জিয়াউর রহমান সৃষ্টিকৃত ঐতিহ্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশবিরোধী, চরম মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট সংগঠন জামায়াতে ইসলাম। আরো আছে মওদুদ আহমদ নামক একটি লোক, যার প্রধান কাজই হচ্ছে আইনের শাসন বিনষ্ট করা। যে কারণে ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে বাংলাদেশে, তার কোনোটিই আইন অনুমোদিত নয়।

এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার। কেন্দ্রীয় সরকার দেশটাকে লিজ দিয়েছে জামায়াত-বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডারদের হাতে। তারা বিভিন্ন এলাকার নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে দিচ্ছে। বর্গীদের মতো এলাকায় লুটপাট করে যা পাচ্ছে, তার একটা ভাগ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নেতাদের। এর ভাগ পাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে আইনি কিন্তু সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ বাহিনী। এই বাহিনী সশস্ত্রভাবে নিরস্ত্র লোকদের আক্রমণ করে গণগ্রেফতার করে এবং তারপর মহানন্দে চাঁদা তুলে মহাভোজ খায়। ওরস্যালাইন তৈরিতে যেমন এক চিমটি লবণ লাগে, তেমনি এসবের পেছনেও আছে খানিকটা আদর্শ আদর্শ ভাব। সেটি হচ্ছে পাকিপন্থী হওয়া ও তালেবানি হওয়া। বেগম জিয়া বা সাফারি পরিহিত কোনো মন্ত্রীকে দেখে মনে হতে পারে এরা তালেবানী নয়। না তারা তালেবানি নয়, তাদের ছেলেমেয়েরা কেউ মাদ্রাসায় পড়েনি বা বোরখাও পড়েনি। বাংলা ভাইয়ার বাবারও সাহস হবে না এদের মেয়ে বা পুত্রবধূর পেটে মুখে কালি মেখে দেয়ার। এরা ব্যবহার করছে

ইসলামকে নিজেরা ইসলামের বাইরে থেকে, কিন্তু ইসলামি ভাব নিয়ে। আমাদের দেশে সবচাইতে ভালো ব্যবসা ধর্মব্যবসা বা ইসলাম ব্যবসা। এতে কোনো পুঁজি লাগে না। একটু দাড়ি আর মাথায় টুপি থাকলে তা বাড়তি বোনাস। অধিকাংশ মানুষ এদেশে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ এবং ডানপন্থী। সেখানে যে কোনো ইসলামি জোশ চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। আর ধর্মব্যবসাকে বা ধর্মব্যবসায়ীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো না কোনো সাহায্য করেছে সব ধরনের 'সেকুল্যার দল'।

১৯৯১ সাল থেকে বিএনপির স্ট্রাটেজি বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার। আর জামায়াতের উদ্দেশ্য, ফাক ফোকর খুঁজে নিজেদের 'আদর্শগত' আধিপত্য কায়েম করে অন্তিমে ক্ষমতা দখল। বিএনপিতে এখন হাওয়া ভবনপন্থীরা ক্ষমতায়। তারা চাচ্ছে হাওয়া ভবনপন্থী ছাড়া অন্যান্য বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বা বামপন্থী সমর্থকদের নিশ্চিহ্ন করা। এই স্ট্র্যাটেজিতে সঙ্গী হচ্ছে জামায়াত। বাংলা ভাই এর উদাহরণ এবং সংবাদের সাক্ষাতকারে সেটি পরিস্ফুট। ওই এলাকার জনাব আবদুল জলিলের ট্রাম্পকার্ডটি যদি হারিয়ে না যেতো, তাহলে আজ হঠাৎ বাংলা ভাইয়ের উৎপত্তি হতো না। সরকার বা জোট বিরোধী প্রবল আন্দোলন এসব অনাচার রোধ করার প্রধান হাতিয়া। যতদিন সরকার পতনের ডেডলাইন ছিল ততদিন অনাচারকারীরা খানিকটা সংযত ছিল। লক্ষ করবেন জনাব জলিল নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ার পর বাংলা ভাইয়ের উত্থান। জনাব জলিলের আশাবাদে সারা দেশে ফ্যাসিবাদ নিপাতের আশা করা হয়েছিল। সেটি না হওয়াতে সারা দেশে হতাশা দেখা দিয়েছে। আওয়ামী লীগ এখন সংসদেও যাবে। শেখ হাসিনা ফেরার সময় যদি আরেকটি ট্রাম্পকার্ড এনে জনাব জলিলকে দেন তাহলে অন্য বিষয়। কিন্তু সেটি হওয়ার নয়। পুরো বিরোধীদলীয় রাজনীতি মূলত হয়ে যাচ্ছে আবেদন নিবেদনের। মানুষ এদের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। অন্যদিকে পুলিশের 'সর্বহারা সন্ত্রাসীর অত্যাচার। সুতরাং এর এখন প্রতিকার হবে না, রাষ্ট্রে যখন কোনো আইন নেই এবং জনাব জলিলের পশ্চাৎগমনের পর যখন অনিশ্চয়তা তখন একটি বেআইনি শাসন মেনে নেয়াই ভারো। তাছাড়া বাংলা ভাই ও পুলিশরা সশস্ত্র। তারা নিরস্ত্র। আর এদেশে তো বঙ্গবন্ধু নেই আর হবেও না যে, নিরস্ত্রদের নিয়ে রুখে দাঁড়াবেন। সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাইয়ের উদ্ভব।

অন্যদিকে জামায়াত সুযোগ বুঝে একটা কেস স্টাডি করছে। একটি এলাকায় তালেবানি শাসন প্রতিষ্ঠা করলে কী হতে পারে তাই তারা দেখছে।

৫. যা হতে পারে

ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। কারণ আমরা জ্যোতিষ চর্চা করি না তবে অনুমান করে নিতে পারি ঃ

১. বলকানাইজেশন অফ বাংলাদেশ হতে পারে। অর্থাৎ এ রকম বিভিন্ন

এলাকায় বাংলা ভাই জাতীয় সামন্ত সর্দারদের উদ্ভব হতে পারে। তবে সব জায়গায় জোটীয় সামন্তরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে এমনটি হবে না। তারেক জিয়ার এলাকার লোক যেমন চারটি জেলা দখল করেছে, তেমনি গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া বা অন্যান্য এলাকার আওয়ামী শাসন কায়েম হতে পারে। বা যে ভাই টাকা অস্ত্র জোগাড় করতে পারবেন, সে ভাই সে এলাকা দখল করবেন। আমেরিকা ও ভারত এটিকে সমর্থন করবে এবং কে না জানে বিএনপি-জামায়াতের মতো মার্কিন-ভারতপন্থী দল খুব কমই আছে। কারণ বিভক্ত বাংলাদেশ হবে দুর্বল ও নতজানু। ইতোমধ্যে সরকারি আচরণে তা স্পষ্ট। পাকিস্তানি পররাষ্ট্র সচিবের নৈশভোজে নাকি জনা পাঁচেক মন্ত্রী প্রটোকল ভেঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তবে সরকারি এই নীতি বুমেরাংও হতে পারে। বাংলা ভাইদের বিরুদ্ধেও হয়তো অস্ত্র ধরা হবে। শুরু হবে রক্তারক্তি যা কারো নিয়ন্ত্রণে থাকবে না।

২. ওই চার জেলায় তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠা হলে বিভিন্ন জেলাকে ওই ধরনের তালেবানি শাসনের অধীনে আনা হবে। আমেরিকার ভাইস রয় এই তালেবানদের সমর্থন করবেন যেমন করেছিল আফগানিস্তানে তারপর মৌলবাদ দমনের নামে আফগানিস্তান বা ইরাকে যা করেছিল ঠিক তাই করবে। তবে, তালেবানি শাসন জামায়াত প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তারা বিএনপিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখন সাফারি পরা, শিফন পরা, মৌলবাদী বিএনপির পালানোর পথ পাবে না। অন্তত কিছু দিনের জন্য হলেও তো জামায়াত বলতে পারবে তারা লক্ষ্যে পৌঁছেছে।

আমাদের অনুমান যে সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই লেখা শেষ করার পর দৈনিক সংবাদের রিপোর্ট ঃ 'গত ১৪ এপ্রিল বিকেলে মচমইলে জেমএবরি ধর্ম সভায় লুৎফর রহমান মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ড. হুমায়ুন আজাদকে 'কুত্তা' আখ্যা দেয়। জোরপূর্বক স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানদের দিয়ে এসব সভা আহ্বান করা হচ্ছে। স্কুল ও কলেজ প্রধানদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদেরকে কালো পর্দার পার্টিশনও দিয়ে আলাদা বসার ব্যবস্থা করতে। মেয়েদের বোরকা পরা বাধ্যতামূলক। শিক্ষকদের প্রতিদিন ১০ মিনিট করে ইসলামি আলোচনা করতে হবে। সিগারেট-বিড়ি খাওয়া বন্ধ রাখতে বলা হচ্ছে। নামাজ আদায় করা হবে নিয়মিত। সর্বহারা পাওয়অ মাত্র খতম করার জন্য জনগণের প্রতি নির্দেশ দিচ্ছে ক্যাডাররা। পুলিশ কোনো কিছু করলে আমরা ব্যবস্থা নেবো বলে প্রচার করছে জঙ্গি ক্যাডাররা (৭.৫.০৪)।

আরো জানা গেছে বাংলা ভাইয়ের পরিচয় হয়ে গেছে তার নির্দেশে বা প্রশ্রয়ে তাকে ডাকা হচ্ছে পাকিস্তান ভাই বা পাকি ভাই। এ বিষয়ে আশা করি বিশদ আলোচনার আর প্রয়োজন নেই। ওআইসিতে যুদ্ধাপরাধীকে মনোনয়ন দেয়া হবে আর দেশে পাকি শাসন হবে না এটা কি সম্ভব।

৬. পরিত্রাণ প্রয়োজন কি-না?

এদেশের অধিকাংশ মানুষই যেহেতু অজ্ঞ ও ধর্মান্ধ এবং ডানপন্থী, সেহেতু তারা ফ্যাসিস্ট শাসন বা তালেবান শাসনে হয়তো আপত্তি করবে না। বর্তমান সময় তার প্রমাণ। এবং এই শাসনের ফলে সাফারি, স্যুট পরা মৌলবাদীরা সবচাইতে লাভবান হচ্ছে। এরা হচ্ছে মৌলবাদের অন্য মুখ যা বিদেশিদের দেখানো হয়। এ অবস্থায় যারা বসবাস করতে পারেন করবেন, দেশত্যাগের ক্ষমতা থাকলে চলে যাবেন। না হলে পরিবার পরিজনসহ নিজেকে আল্লাহর জিম্মায় রেখে দিন গুজরান করবেন। ১০ মে দাতাদের বৈঠকের পর দেখবেন ফ্যাসিবাদ কাকে বলে। এই লেখা প্রেসে যাওয়ার সময় খবর এলো আহসানউল্লাহ মাস্টার নিহত হয়েছেন। বিরোধী দলের যারাই কমিটেড ও সৎ তাদের মেরে ফেলা হবে এ বিষয়টি এখন নিশ্চিত।

সংখ্যালঘিষ্ঠ যারা, লিবারেল বা মধ্যপন্থী যারা, ফ্যাসিস্ট বা তালেবানি শাসন তারা চান না। তাদের সফল হতে হলে দোদুল্যমান রাজনীতি ত্যাগ করতে হবে। স্পষ্ট ভাষায় বলতে হবে কী চান? সিস্টেম বদলানোর জন্য বিপ্লব দরকার, সে কারণে ৫০০ বছর অপেক্ষা করতে চান না আগে মানুষ বাঁচিয়ে বিপ্লব করতে চান? সংসদে হাজিরা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন, না পাল্টা মার দেয়ার জন্য জনগণকে সংগঠিত করবেন, বোঝাবেন সেটাও ঠিক করতে হবে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে গত চার যুগ ধরে মানুষ যাদের চেহারা দেখে আসছে, তাদের অধিকাংশকেই মানুষ চায় না। বিকল্প এই একটিই আছে। প্রতিরোধের বদলে প্রতিরোধ এবং সেক্ষেত্রে জোট অহিংস হবে না সেটাও মনে রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখা দরকার, সবারই কিছু অর্জন করতে হলে কিছু ত্যাগ করতে হয়।

তবে সাফারি ও শিফন পরা মৌলবাদীদের একটি কথা বলি, তালেবানরা পুরোপুরি ক্ষমতায় বসতে পারলে সাফারি আর শিফন পরে এদেশে ঘুরতে হবে না। সে বিষয়টি মনে রাখলেই খুশি হবো। আর আমাদের জন্য হয়তো অন্তিমে এটিই হবে সান্ত্বনা।

১০ মে, ২০০৪

বোমা থাকবে না তো কি তবারুক থাকবে?

ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর ঘৃণ্য বোমা হামলার পর দেশব্যাপী প্রতিবাদ বিক্ষোভ, নিন্দার তুফান শুরু হয়েছে এবং তা দেখে আশ্চর্য লাগছে। অন্তত যুদ্ধাপরাধীদের যারা সমর্থন করে এবং জোট বাঁধে তাদের তো এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যারা নিরপেক্ষ তাদেরও তো ঘৃণা প্রকাশ করার কিছু নেই। তারা সবাই এত বিজ্ঞ, রাজনীতি বোঝেন তাহলে তারা আশ্চর্য হন কেন? যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থন করবো তাদের সঙ্গে যারা গাঁটছড়া বাঁধে তাদের ব্যাপারে উল্লাস প্রকাশ করবো আর বোমা হামলা হলে দুঃখিত হবো তা হতে পারে না। আপনারা কি আশা করেছিলেন তাদের আমলে মাজারে মসজিদে বোমা থাকবে না তবারুক বিতরণ করা হবে। যারা এ ধরনের চিন্তাভাবনা করেছিলেন তারা হয় মূর্খ নয় প্রতারক এবং এখনো সেই প্রতারণা করে চলেছেন।

ইতিহাস আমাদের কারো ভালো লাগে না জানি, যদি না তা নিজপক্ষে কিছু যুক্তি তুলে ধরে। কিন্তু, কোনো ঘটনা বিনা কারণে ঘটে না, একটা পটভূমিকা থাকে, থাকতেই হবে এবং বর্তমানে ঘটনার কারণ জানতে হলে পুরোনো কিছু ঘটনার পর্যালোচনা করতে হবে।

১৯৭৫ সালে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখলের পর যখন যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি দিয়ে দোস্তি পাতালেন তখনই যুদ্ধাপরাধী, ক্যান্টনমেন্ট ও বিএনপির মধ্যে একটি যোগাযোগ গড়ে উঠলো। এটি তাদের জন্য ভালো হলো বটে কিন্তু দেশের ঈশান কোণে যে মেঘ দেখা দিলো তা কেউ অনুধাবন করেনি। সেই মেঘ আস্তে আস্তে ছড়িয়েছে ক্যান্টনমেন্টের আরেক প্রতিনিধি এরশাদের আমলে। লক্ষণীয় ক্ষমতা উৎখাতকারী বা দখলকারী জিয়া-এরশাদ ক্যান্টনমেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে রাজাকার আলবদরদের শুধু পুনঃপ্রতিষ্ঠাই করেননি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনর্বাসিত করেছেন। বেগম জিয়া তাদের আরব্ধ কাজটি সমাপন করেছেন মাত্র। তিনি রাজাকার আলবদর যুদ্ধাপরাধীদের পার্টিকে আঁচলে বেঁধেছেন এবং ক্ষমতায় গেছেন। যেদিন এ কাজটি হয়েছে সেদিনই বাংলাদেশের পুরো আকাশে কালো মেঘে ঢেকে গেছে এবং ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। এই ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা এখন লাগলো ব্রিটিশ হাইকমিশনারের গায়ে।

ধর্মব্যবসায়ীদের উত্থান ১৯৭৫ থেকে শুরু হলেও নব্বইয়ের দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় স্বৈরাচার থেকে মুক্তির জন্য রাজনীতিবিদরা জামাতের

প্রতি নমনীয়তা দেখিয়েছেন। কিছু পত্রিকা এবং আমরা এর বিরোধিতা করেছিলাম এই যুক্তিতে যে হরিণ যেমন মাংস খায় না বাঘ যেমন ঘাস খায় না, জামাতও তেমন রক্ত ছাড়া থাকতে পারে না। গণতন্ত্র তাদের কাছে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার একটি ধাপ মাত্র। যে সব রাষ্ট্র নিজেদের ইসলামি বলে সেসব একটি রাষ্ট্রের উদাহরণ দেখান যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দেখা গেছে স্বাভাবিকভাবেই জামাতের রাজনীতি রগকাটা রাজনীতি নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

আওয়ামী লীগ আমলে ধর্মব্যবসায়ীদের বোমা হামলা শুরু হয়। তখনও আমরা বলেছি, এর পেছনে ধর্মব্যবসায়ী যাদেরকে মৌলবাদী হয় তারা সক্রিয়। আমাদের এসব মন্তব্যে অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এমনকি আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরাও। খুব সম্ভব আওয়ামী লীগ আমলে ৬টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। তার মধ্যে অনেক ক'টির তদন্ত শুরু হয়, উদীচী বোমা হামলায় চার্জশীট দাখিল করা হয় গ্রেফতারও করা হয়েছিল অনেককে। কিন্তু যতটা কঠোর হওয়া উচিত ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের সে সময় তা হয়নি। তাদের অনেক নেতা শিশুর মতো। তারা মনে করেন ইনকিলাবকে তোয়াজ করলে ইনকিলাব তাদের পক্ষে লিখবে, মৌলবাদী বা সেনাবাহিনীকে তোয়াজ করলে তারা তাদের পক্ষে রাস্তায় নেমে পড়বে। সোনিয়া গান্ধীও নিতান্ত স্বল্প শিক্ষিত গৃহবধূ ছিলেন এবং তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন কংগ্রেসের প্রধান শত্রু মৌলবাদীরা এবং তাদের তোয়াজ করে যে ফল হয় না ইতিহাসেই তার সাক্ষী আছে। আমাদের শিশুর মতো আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেকেই তা বুঝতে চাননি। এখন বুঝতে পেরেছেন কিনা জানি না। এ কারণে সামান্য তাও বিদেশী গৃহবধূ হয়ে ওঠেন অনন্য আর আমাদের অনন্য নেতারা হয়ে ওঠেন সামান্য।

এভাবেই ধর্মব্যবসায়ীরা রাজনৈতিক দল শক্তিশালী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশ্রয়ে শক্তিশালী হয়েছে। একটি উদাহরণ দিই, ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত যত রাজনৈতিক বা ধর্মীয় হত্যাকাণ্ড হয়েছে তার জন্য দায়ী কোনো খুনির শাস্তি হয়নি। কিন্তু সেকুল্যার আদর্শে বিশ্বাসী, লিবারেল, গণতন্ত্রমনা অনেকে এ সময়টুকু শুধু শাস্তিই পাননি মৃত্যুবরণও করেছেন। শুধু তাই নয়, সেক্যুলার আদর্শে বিশ্বাসী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিঝীবীরা আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু বিএনপি জামাত সমর্থক কেউই আক্রান্ত হননি বরং একুশে পদক, স্বাধীনতকা পদক পেয়েছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মানসিক গঠনের কথাও এসে যায়। মানসিকভাবে আমাদের দোস্তি হিপোক্রেসি এবং ডানপন্থার সঙ্গে। পারিবারিকভাবেও আমরা ধর্ম নিয়ে অতিশয়োক্তি করি, ভাবি বেহেশতের পথটা সুগম হলো, কিন্তু মর্ত্যে সামান্য মানবিকতাও দেখাই না। এখনও পাকিস্তানি হতে আমরা যত ভালোবাসি, তাদের ডিকটেটরশিপকে যত শ্রদ্ধা করি ভারতীয় গণতন্ত্রকে ততই ঘৃণা করি। ওরা যে

হিন্দু! সেনাবাহিনীতে এখনও প্রশিক্ষণের সময় বলা হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের বন্ধুরা হলো শত্রু, স্বাধীণতা হরণকারীরা হলো বন্ধু।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা সহজ কেন ২০০১ সালে চরম ডানপন্থী যুদ্ধাপরাধী জোট ক্ষমতায় এলো। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কলঙ্ক লতিফুর ও তার গং, বাংরেজ প্রধান নির্বাচনী কমিশনার সাঈদ ও তার গং জনগণের একাংশ, সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা ও সংবাদপত্রের জোশে যুদ্ধাপরাধীদের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেলো। এর সঙ্গে ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজে সক্রিয় সমর্থন।

যুদ্ধাপরাধী জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই লুতিফুর মুয়ীদ গংদের তত্ত্বাবধানে হিন্দু নির্যাতন, আওয়ামী নির্যাচন করেছে প্রকাশ্যে। সুতরাং ক্ষমতায় এসে প্রথম দিন থেকে তারা টার্গেট প্র্যাকটিস শুরু করেছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় প্রথমদিকে *জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, সংবাদ* ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ পত্রিকা এসব টার্গেট প্র্যাকটিসের পক্ষে ছিল, অন্তত বিপক্ষে ছিল না। আমরা যারা মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিরোধিতা করেছিলাম তারা আওয়ামী লীগের 'দালাল' ও সরকার বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে মাশুল দিয়েছি। দুঃখের বিষয়, আজ যে সব রাজনৈতিক দল ঘৃণা প্রকাশ করছে তারাও সে সময় নিশ্চুপ ছিল। আজ কী প্রমাণিত হলো–

১. এখন সবাই বলছে মৌলবাদীদের প্রধান প্রতিষ্ঠান জামাত বা তার প্রভাবিত কেউ এ কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। আপনাদের খেয়াল আছে কিনা ১২ জানুয়ারি হযরত শাহজালাল (র.)-এর মাজারে বোমা হামলা হয়। তার তিন দিন আগে যুদ্ধাপরাধী সাঈদী মাজার ও ওরশকে হারাম এবং ধর্মবিরোধী হিসেবে ফতোয়া দেন। পরবর্তী সময়ে এ ঘটনার নেপথ্যে সাঈদীর বক্তব্যকে দায়ী করে অনেক সংগঠন প্রতিবাদ জানালেও জামাত ইসলামী অভিযোগের প্রতিবাদ করেনি। বরং ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার সুবাদে তদন্তকে প্রভাবিত করার অভিযোগ ওঠে জামাতের বিরুদ্ধে (*ভোরের কাগজ*, ২২.৫.০৪)। এরপর দরগাহর মাছ মেরে ফেলা হয়। বায়েজীদ বোস্তামীকে কাছিমের ওপর হামলা হয়, এখন ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর হামলা হলো। সিলেটে সাঈদী টাইপের আরো কিছু লোক আছে যারা প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে এ ধরনের ফতোয়া দেন।

উল্লেখ্য, সাঈদীর একটি মন্তব্যের পরই অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা হয়।

২. এ ধরনের প্রতিটি ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং ত্রয়োদশ ভূঁইয়া আওয়ামী লীগকে দায়ী করে বিবৃতি দেন। তারপর কিছু ঘটে না। যেমন ঘটেনি বাংলা ভাইয়ের ক্ষেত্রে। এবারও কঠোর নির্দেশ ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। তদন্ত হবে বলে জানা গেছে এবং আওয়ামী লীগই এজন্য দায়ী বলে বিএনপি নেতারা ঘোষণা

করেছেন। এ ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ই প্রমাণিত– এক. সরকার চাইছে কিন্তু পারছে না কারণ পুলিশ চরমভাবে অদক্ষ, দুই. সরকার চাইছে না। উল্লেখ্য, বোমা বিস্ফোরণের পর 'মাজারের লোকজন আলী আসগর নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশে সোপর্দ করলেও তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।' (*জনকণ্ঠ* ২২.৫.০৪)। এর আগেও অনেককে ধরলেও পরে তারা বিভিন্ন কারণে ছাড়া পেয়ে যায়।

আমরা মনে করি, দুই কারণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বর্তমান যে পুলিশ বাহিনী, অনেকের মতে তা পুরোপুরি জামাত-বিএনপি ক্যাডার বা প্রভাবে পরিপূর্ণ। দক্ষতা তাদের মাপকাঠি নয়। আর তারা জানে, তদন্ত সুষ্ঠু হলে নিজেদের অর্থাৎ সরকারকেই হয়তো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এর জন্যই বোধহয় আলী আসগররা ছাড়া পেয়ে যায়। এটা জোট নেতৃবৃন্দও ভালো জানে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় এবারো কোনো তদন্ত হবে না কেউ ধরাও পড়বে না। যদি এ চুক্তি না মানেন তাহলে বলতে হবে জোট সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই দেশের ওপর। সুতরাং তাদের ক্ষমতায় থাকার বা রাখার যুক্তি কি বিদেশী শক্তির মধ্যে শুরু থেকে আমেরিকা ইংল্যান্ড জোটকে প্রশ্রয় দিয়েছি। এটা তাদের গ্লোবাল পলিসির এক্সটেনশন মাত্র। বর্তমান, ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের অনুরোধ করবো, আপনাদের পুরোনো কাগজপত্র ঘেটে দেখুন, সাবেক রাষ্ট্রদূত কী সব রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। যখন হিন্দু নির্যাতন চরমে তখন শুনেছি এবং মনে হয় পত্রিকায় পড়েছিও যে দূতাবাস থেকে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে এ ধরনের নির্যাতন হয়নি। তারাও দেখেও না দেখার ভান করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের দূতাবাস যদি এখন রিপোর্ট পাঠায়, এটি মডারেটর মুসলিম দেশ, মডারেট একটা হামলা হয়েছে, রাষ্ট্রদূত মডারেটলি আহত হয়েছেন চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই, তাহলে আমরা অবাক হবো না। তবে ভাগ্যের কী পরিহাস যাদের পেছনে তাদের এই উৎসাহ এবং তারা ওদের কর্মকাণ্ডে এতই খুশি ছিল যে, বাংলাদেশকে সন্ত্রাসমুক্ত তালিকায় রেখেছে তাদেরই রাষ্ট্রদূত আজ বোমা হামলায় আহত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যতটুকু জানি, টনি ব্লেয়ার শাসিত দেশটি ছাড়া অন্যান্য দেশ কূটনৈতিকভাবে জোটীয় তৎপরতার বিরুদ্ধে বলেছে।

৩. আজমীর শরীফ যেমন ভূ-ভারতে সেরা তীর্থস্থান, সব ধর্মের সব মানুষ সেখানে নিয়মিত যান। হযরত শাহজালাল (র.)-এর মাজারেরও বাংলাদেশে স্থান সেরকম। এর মধ্যে ধর্মসহিষ্ণুতার একটি ব্যাপার আছে। বিএনপি-জামাত ধর্মসহিষ্ণুতার পক্ষে নয়। আর এস এস মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছে, বিজেপি বাবরি মসজিদ ভেঙ্গেছে কিন্তু আজমীরে বোমা বিস্ফোরণ হয়নি। সুষমা স্বরাজ এক মাথা ন্যাড়া করার কথা বলে বাড়ির বাইরে যেতে পারছেন না। অথচ গজার মাছের মৃত্যু ধরলে তিনবার এই মাজারে হামলা হয়েছে, মানুষ খুন হয়েছে। কিন্তু

ধর্মব্যবসয়ীরা, জোট সমর্থক যারা এর জন্য দায়ী তারা বহাল তবিয়তেই আছেন। সুতরাং ধরে নিতে হবে এ ধরনের ঘটনায় মানুষের ব্যাপক সমর্থনও আছে। না হলে, যেখানে এসব ঘটছে সেখানে জনবিস্ফোরণ ঘটতো। মানুষজন এত কিছু জানে, আর তারা জানে না কারা কেন এসব ঘটাচ্ছে এবং জেনেও যখন মানুষ নিশ্চুপ থাকে তখন তাকে সমর্থক বলা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে।

৪. সেনাবাহিনী যে এখন বিএনপি-জামায়াতের, সাধারণ মানুষের আজ্ঞাবহ নয় তা আবার প্রমাণিত হলো এবং এ নির্বাচনে যে তাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাও আবার প্রমাণিত হলো। দেখুন, সিএমএইচ যেতে, ক্যান্টনমেন্টে যেতে, মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জানাতে আওয়ামী লীগের যারাই গেছে তাদেরই বাঁধা দেওয়া হয়েছে। বাধা দেওয়া হয়নি জামাত-বিএনপির কাউকেই। গতকালও একই ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা শহরের মধ্যে এই ক্যান্টনমেন্ট এখন বিষফোড়ার মতো এবং জামাতি-বিএনপিরা খুশি যে আইনি সশস্ত্ররা তাদের পক্ষে। সুতরাং এটা হুমকির মতো যে, জামাতি-বিএনপির বিরুদ্ধাচরণ করলে অপারেশন ক্লিনহার্ট হবে এবং তারা যাতে এসব ঘটাতে পারে সেজন্য ইনডেমনিটি দেওয়া হয়েছে। ইঙ্গিতটা এ রকম তোমরা যাই করো তোমাদের ইনডেমনিটি আছে। শুধু বরাহ শাবক জনগণ যাতে মাথা তুলতে না পারে।

যদি গণতন্ত্র মানেন তাহলে মানতে হবে, পুলিশ সেনাসহ জোটীয়রা একদলে। তাদের জনসমর্থনও আছে বিদেশী সমর্থনও আছে। সুতরাং এসব চলবে। আর যদি মনে করেন, না স্বার্থান্বেষী কিছু গ্রুপ বা ব্যক্তি দেশটির ওপর সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো চেপে বসেছে এবং তাহলে সেই দৈত্য অপসারণের বন্দোবস্ত করতে হবে। ঘৃণা প্রকাশ, বিবৃতি এমনকি আমার এই লেখাও এক্ষেত্রে বাতুলতা মাত্র।

সে জন্যই বলেছিলাম, বোমা হামলার সমর্থক যখন এত এবং যখন কোনো হামলাকারীই ধরা পড়ে না তখন আমাদের পথে পথে বোমা বিছানো থাকবে না তো কি তবারুক থাকবে? আমাদের অনেকের ধারণা এ ধরনের ঘৃণা কাজের মাধ্যমে ইসলাম রক্ষা হচ্ছে। আর আমরা যদি মনে করি এ ধরনের হত্যার মাধ্যমে ইসলাম রসাতলে যাচ্ছে, দেশটিকে একটি বর্বর দেশে পরিণত করা হচ্ছে এবং মানুষকে রক্ষা নয় তার মনুষ্যত্ব নষ্ট করা হচ্ছে তাহলে সকল দোদুল্যমানতা ত্যাগ করে পথে নামতে হবে। সিন্দাবাদের দৈত্যকে আমাদের সরাতে হবে। আমাদের হয়ে কেউ সেই দৈত্য হটাবে না। আমাদের চুপ থাকা মানে এ ধরনের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড সমর্থন করা এবং এতে উৎসাহিত হয়ে এ ধরনের ঘটনা আরো ঘটানো হবে। পথে পথে আরো বোমা বিছানো হবে। ইসলামের নামে তবারুক নিয়ে কেউ অপেক্ষা করবে না।

২৪ মে, ২০০৪

বিসমিল্লাহ্ বলে ডিসেম্বর থেকে বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু

বিসমিল্লাহ বলে ডিসেম্বর থেকেই শুরু হলো বুদ্ধিজীবী হত্যা। বিসমিল্লাহ ও হত্যা বিপরীতধর্মী দু'টি শব্দ। কিন্তু পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশে এ দুটি শব্দ এক হয়ে যায়। কারণ, এখানে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করার মতো দল আছে তা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ যেহেতু অজ্ঞ, ধর্মান্ধ সুবিধাবাদী ও শক্তের ভক্ত সেহেতু ধর্ম ব্যবসায়ীরা এখানে রমরমা অবস্থায় আছে। ধর্মের নামে এখানে ক্ষমতায় যাওয়া, লুট-চুরি-ডাকাতি-হত্যা ধর্ষণ সব জায়েজ এবং এ সবই তারা আল্লাহর নাম নিয়ে করে যেটাতে আমাদের আপত্তি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সংবিধানে বিসমিল্লাহ বসানো হয়েছিল এটা ভুলে যান কেন? যদি তা না হতো এবং বাংলাদেশের মানুষ ধর্ম বুঝে ধর্মপ্রাণ হতেন তাহলে এ দেশটি বর্জ্যের দেশে পরিণত হতো না।

ডিসেম্বর এলে ভয়ও হয়। আনন্দও জাগে। ডিসেম্বরে আমরা ধর্ম ব্যবসায়ীদের হিংস্র নখদন্ত দেখেছি আবারও বিজয়ও দেখেছি। এ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করি। এ রকম এক ডিসেম্বর, শাহরিয়ার সাবের, শফি ও আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল জামাতী-বিএনপি সরকারের নীতিনির্ধারকরা। গভীর শীতের রাতে ওয়ারেন্ট ছাড়া সশস্ত্র আদমীরা যখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আমার এক প্রতিবেশী বন্ধু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ঘটনা জানতে। আমি তাকে নিষেধ করি। কারণ তিনি না জানলেও পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টার বিষয়টি আমার জানা। সদর রাস্তায় সাদা মাইক্রোবাস দাঁড়ানো। এটি দেখে তিনি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কারা? তাকে কোথায় নিচ্ছেন? দাঁতমুখ খিঁচিয়ে একজন উত্তর দিলো,, তাতে আপনার কী দরকার? আপনি কে?

বন্ধুটি নির্বোধের মতো উত্তর দিলেন দরকার আছে। এটা ডিসেম্বর মাস। পরিচয়হীন আপনারা কয়েকজন এসেছেন। সাদা মাইক্রোবাস করে। তুলে নিয়ে যাচ্ছেন একজন অধ্যাপককে। ১৯৭১-এ তাই হয়েছিল।

আমি ততোক্ষণে মাইক্রোতে উঠে পড়েছি এবং দলনেতাকে বলছি, ওর কথা বাদ দিতে। যাতে এনকাউন্টার পরিস্থিতি না হয়। সুতরাং ডিসেম্বর এলে ভয় করাটা অমূলক নয়। ১৯৭১ সালে বর্তমান সফেদ শুশ্রুর মতিউর রহমান নিজামী ছিল কিলার স্কোয়াড আলবদর বাহিনীর প্রধান। বর্তমান জামাতী নেতাদের অধিকাংশ

এ ধরনের বিভিন্ন স্কোয়াডের সঙ্গে ছিল জড়িত। আমার শিক্ষকদের এ স্কোয়াডের খুনিরাই রাতের অন্ধকারে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে সাদা মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে খুন করেছে। ডিসেম্বর এলেই।

তাদের হাত নিশপিস করে যেমন রাত হলেই ভ্যাম্পায়ার জেগে ওঠে। ডিসেম্বর এসেছে তাই ভ্যাম্পায়াররা তাদের কাজ শুরু করেছে। জোট বা জামাতীয় বিএনপি আমিনী সরকারের আমলে রাজশাহী থেকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু হলো। আগামী নির্বাচন পর্যন্ত এটা চলবে এবং এটি অস্বাভাবিক কিছু না। তাদের কাজ তারা করছে, আমাদের কাজ আমরা করিনি এবং করিনি দেখেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউনুসকে প্রাণ দিতে হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু চাকরি করি তাই অধ্যাপক ইউনুসের সঙ্গে আলাপ ছিল। সজ্জন ব্যক্তি। ছাত্রজীবনে ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত। ধার্মিকও। তার কাছে ধর্ম শুধু ইবাদত ছিল না, ছিল মানবধর্ম-মানুষের কল্যাণ। যারা তাঁকে হত্যা করেছে তাদের ধর্ম হলো তাদের প্রতিবন্ধকতা দূর করে ক্ষমতায় যাওয়া, থাকা এবং তা ভোগ করা। মানব ধর্ম নয়।

জোট ক্ষমতায় গেছে সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা করে। ক্ষমতায় থাকার জন্য তারা আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। রাজনীতিবিদদের একরকম নতিস্বীকার করানোর পর তাদের মনে হচ্ছে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার জন্য বাকি প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা। নির্বাচন করেই তারা যাবে। তাদের বুথ পাহারা দেওয়ার জন্য র‍্যাব, চিতা কোবরাই ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে–যাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। নির্বাচন কমিশন প্রশাসন সব তৈরি। বাকি শুধু শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অঙ্গন, কিছু সাংবাদিক। এরা পাঁচজন হলেও প্রতিবাদ করে, কেউ তাদের রক্ষা করে না, তবুও তারা প্রতিবাদ জানিয়ে যায়। আন্তর্জাতিক মহলও তাদের বক্তব্য গ্রহণ করে। এই শেষ প্রতিবন্ধকতা দূর হলে জামাতি-বিএনপিরা আজীবন যা খুশি তাই করতে পারবে।

পাকিরাও তাই ভেবেছিল। তাদের লেখা বইপত্রে দেখা যায়, পাকিস্তানের শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য তারা যতটা না দায়ী করছে রাজনীতিবিদদের তার চেয়ে বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের। কারণ, দেশের নাম বদল হতে পারে দেশ নাও থাকতে পারে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যায় নিজ অবস্থানে। ১৯৭১ সালেও প্রতিরোধটা এসেছিল ছাত্র শিক্ষকদের কাছ থেকে।

১৯৭১ সালে পাকি জেনারেলরা ক্ষমতায় ছিল। তাদের তল্পীবাহক বা হুককাররদার হিসেবে ছিল জামাত ও অগন্য ধর্মব্যবসায় নিয়োজিত দলগুলো। পাকিদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের নোংরা কাজগুলো সারতো জামাতী ইসলামের

নামে। এখনো ক্ষমতায় সেনারা, যাদের রোল মডেল পাকিস্তান। তাদের হয়ে তাদের স্বার্থ দেখে দেশ শাসন করছে বিএনপি। নির্বাচনের সময় সেনাদের প্রবল অত্যাচার না হলে বিএনপি ক্ষমতায় যেতে পারতো কী না সন্দেহ। সাবেক দুই প্রধান বিচারপতি সেনাদের সাহায্যেই লালসা নির্বাচন করেছিলেন। বাংলাদেশ হওয়াতে বোধহয় তাদের একটা আক্রোশ হল। সুতরাং বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতৃত্ব যে দল দিয়েছিল তাদের খানিকটা শায়েস্তা করা হয়েছিল। আর এখনো জামাতী ও ইসলামী দলগুলো আছে শাসকদের তল্পীবাহক হিসেবে। সুতরাং ১৯৭১ ও ২০০৪ এ তেমন কোনো তফাত নেই। একটি উদাহরণ, সার্ক সম্মেলনে রাষ্ট্র প্রধানদের জাতীয় স্মৃতিসৌধে নেওয়া হবে না। কারণ তাহলে বাংলাদেশের বীর শহীদ ও বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়। শ্রদ্ধা দেখানো হবে পাকি-বাংলার রূপকার জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বর যে শুধু বুদ্ধিজীবী হত্যা হয়েছিল তা নয়। মার্চ ১৯৭১ থেকেই তা শুরু হয়েছিল, যা তুঙ্গে উঠেছিল ১৪ ডিসেম্বর। এখানেও লতিফুর রহমানের সময় থেকে হত্যা শুরু হয়েছে, নির্বাচনে 'জয়ী' হওয়ার পর ১৯৭১-এর মতো হত্যা, ধর্ষণ শুরু হয়েছে। পাকি সৈন্যদের স্থান নিয়েছে জোটের ক্যাডাররা। এখন নির্বাচন সামনে রেখে সেটা তুঙ্গে ওঠানো হবে। অধ্যাপক ইউনুস হত্যার মাধ্যমে সে শুরু হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের হত্যার হুমকি গত তিন বছর ধরেই দেওয়া হচ্ছে। পশ্চাদপদতা, স্বৈরাচার ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অন্যসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'প্রগতিশীল' শিক্ষকরাও পারেননি। এ কারণে ব্যক্তিগতভাবে আমি রাজশাহীর লড়াকু শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আর আমি তো ভুলিনি। ১৯৬৯কে শুধু জোরদার করেনি, বাংলাদেশ অর্জনের পথ সুগম করেছিল। পুরো এরশাদ আমলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকরা লড়াকু ভূমিকা পালন করেছিল, আত্মাহুতি দিয়েছিল। গত তিন বছরও রাজশাহীর শিক্ষকরা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছিলেন। আমি বিশেষভাবে চিন্তিত অগ্রজ অধ্যাপক খালেক বা সনৎ কুমার সাহা ও অনুজ অধ্যাপক আবু বকর, মলয়, কাশেম, বিধান বা মাহবুবের জন্য। তারা বারবার হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন। সতর্ক থাকাটা তাদের জন্য জরুরি। ১৯৭১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেউ কেউ তাদের সহকর্মীদের হত্যায় সাহায্য করেছিল। অধ্যাপক ইউনুসের হত্যার পর পত্রিকায় দেখলাম কিছু শিক্ষক কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছিলেন। সে জন্যই ঐ কথা আবার মনে হলো।

অধ্যাপক ইউনুসের হত্যার বিচার হবে না। বরং তাঁর পরিবার বা আওয়ামী লীগের কাউকে জড়ানো হতে পারে। বলা হবে, বৈষয়িক বিষয় নিয়ে বিরোধ ছিল। রাজনীতির কোন বিষয় এতে নেই। পুলিশ তদন্ত শুরু করবে কিন্তু কাউকে খুঁজে

পাওয়া যাবে না। এটি বর্তমান প্যাটার্ন। যেমন র‍্যাব জামাত বা বাংলা ভাইয়ের মধ্যে সন্ত্রাস খুঁজে পায় না কিন্তু জনযুদ্ধে পায়। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, ১৯৭১ সালে যারা বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা করেছিল তারা আজ ক্ষমতায়। ১৯৭১-এর বিজয় দিবস তাদের পরিকল্পনা সমাপ্ত করতে দেয়নি। এখন বিএনপি-জামাত সেই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সফল করবে। আমাদের অনেককে এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে, প্রতিরোধ করলেই মৃত্যু হবে যারা ভাবেন তাদের বলি, বিছানায় শুয়েও মৃত্যু হতে পারে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্যদের মতো শুধু ফাঁকা গর্জন না করে কার্যকর কী করা যায় তাই আমাদের ভাবা উচিত। প্রতিরোধহীন মানুষ আর কাঁচা সবজির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

'নিরপেক্ষ' ও ধার্মিকরা সান্ত্বনা পেতে পারেন এ ভেবে যে, আল্লাহ অধ্যাপক ইউনুসের মতো ভালো মানুষকে উঠিয়ে নেন। গোলাম আযম, নিজামী বা মান্নান ভূঁইয়াদের রেখে দেন আমাদের পরীক্ষার জন্য। ১৯৭১ সাল থেকে এখন অবধি সেই পরীক্ষা চলছে। হিসাব করে দেখুন, আল্লাহ কত ভারো মানুষদের নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন, খবিশ বান্দাদের রেখে দিয়েছেন বাংলাদেশে।

সংক্ষেপে দুটি প্রসঙ্গ তুলে আলোচনা শেষ করবো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক মোকারম হোসেন আপতদৃষ্টিতে ধীর স্থির শান্ত মানুষ ছিলেন যে রকম হন খাঁটি অধ্যাপকরা। তখন মোনেম খাঁর সময়। ছাত্রদল/শিবির যা করছে এনএসএফও তাই করতো। এ রকম একদিন, তাঁর কিছু ছাত্র ধাওয়া খেয়ে তার ল্যাবরেটরিতে আশ্রয়ের জন্য ঢুকেছিল। এই প্রথম দেখা গেল তিনি ক্রুদ্ধস্বরে ছাত্রদের বলছেন, মেয়ে মানুষ নাকি, ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে এসেছো, লজ্জা করে না? এ ঘটনাটি আমাকে বলেছিলেন ধমক খাওয়া একজন ছাত্র। সেই ধমক তাদের এতো উজ্জীবিত করেছিল যে, মোনেম খাঁন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে আসতে পারেননি।

১৯৭১ সালে শিল্পী কামরুল হাসান একটি বিখ্যাত পোস্টার এঁকেছিলেন ইয়াহিয়ার মুখাবয়ব দিয়ে। সেখানে লেখা ছিল– তারা মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি। ঐ পশুরা ১৯৭১-এ যা করেছিল এখনো তাই করছে– যা আগেই উল্লেখ করেছি। ঐ সময় পশুদের হত্যা করা হয়েছিল বলে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল।

২৮ ডিসেম্বর, ২০০৪

বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে লাফালাফি বন্ধ কেন?

বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটটা যেনো ধর্মব্যবসায়ীদের ইজারা দেয়া হয়েছে। পরিচ্ছন্ন বা সত্যিকারের ইসলামের পরিবর্তে ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ইসলামের কেন্দ্র হয়ে উছে বায়তুল মোকাররম এলাকা। এর খতিব মুক্তিযোদ্ধাদের 'গাদ্দার' উপাধি দেয়ার পর বহাল তবিয়তে আসীন থাকেন। 'বুশকে থুতুতে ভাসিয়ে দেয়ার' কথা ঘোষণার পরও তারেক রহমানের মতো প্রবল ক্ষমতাধরও কুঁকুড়ে থাকে খতিবের ভয়ে। জানি না তার শক্তির উৎস কোথায়। জামাত ক্ষমতায় আসার পর বায়তুল মোকাররম এলাকায় তাদের অবস্থান সংহত করেছে। কোনো কিছু তাদের মনঃপূত না হলে জুমার পর মিছিল বের করা, রীতিনীতি ভঙ্গ করে উত্তর গেটে মিটিং করে হুমকি দেয়া, নর্তন-কুর্দন করার ভয়হীন স্থান হচ্ছে ওই এলাকা। সর্বশেষ তারা লাফালাফি করেছে সার্ক স্থগিত হওয়ার পর। ভারতীয়দের মুণ্ডুপাত করার জন্য অবশ্য ওই এলাকা আগে থেকেই নির্ধারিত।

সার্ক নিয়ে মিথ্যা কথা উচ্চারণে দ্বিধা করেননি নীতিনির্ধারকরা। স্যুটকোট পরে প্রকাশ্যে মন্ত্রী হয়ে অবলীলাক্রমে মিথ্যা কীভাবে বলা যায়, তার উদাহরণ মন্ত্রীরা। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, এদের পুত্র-কন্যারা কি প্রকাশ্যে পিতৃপরিচয় দেয়? পিতা মিথ্যুক, এটি আর যা-ই হোক, গর্বের কোনো ব্যাপার নয়। সর্বশেষ কয়েকদিন আগে সার্ক নিয়ে আওয়ামী লীগকে দোষী করে সাইফুর রহমানও বোধহয় বক্তব্য রেখেছিলেন। হাতের কাছে পত্রিকা না থাকার উদ্ধৃতি দিতে পারলাম না।

স্মৃতিশক্তি আমাদের দুর্বল। সেজন্য অনেক কথা বারবার মনে করিয়ে দিতে হয়। শেখ হাসিনার সরকার ন্যাম সম্মেলন আয়োজন করেছিলো। ন্যামের সদস্যসংখ্যা একশ'রও উপরে। এবং ন্যাম জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর বিশ্বজোড়া সংস্থা। এই আয়োজন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলো। জামায়াত ক্ষমতায় আসার পরপরই, খালেদা ফ্যাকশনের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান মুখ কুঁচকে ন্যাম স্থগিত ঘোষণা করলেন। তার যুক্তি 'ন্যাম ডেড হর্স।' ন্যামের জন্য পয়াসা খরচ করা যাবে না। শুধু তাই নয়, ন্যামের জন্য নির্মিত বঙ্গবন্ধু হলের নাম পাল্টে ফেলা হলো। ন্যামের জন্য নির্মিত ভবনগুলো নিজেদের নামে বাটোয়ারা করার প্রস্তাব হলো।

পুরো ন্যাম সম্মেলন বন্ধ হয়েছিলো একটি ভবনের নাম বদলের জন্য! এত বড় নোংরামির প্রতিবাদ তো কেউ করেননি। টিভি চ্যানেলগুলো একটি প্রতিবেদনও পেশ করেনি। বায়তুল মোকাররমে নাচানাচি হয়নি। এতে একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, চ্যানেলগুলোর মালিকানা জামাতের খালেদা ফ্যাকশনের হাতে। এর মাঝে মাঝে কিছু সংবাদ পরিবেশন করে নিরপেক্ষতার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে মাত্র। এবং 'নিরপেক্ষ' থেকে শুরু করে বিরোধীরা পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তাদের সংবাদ পরিবেশনার পক্ষপাতহীনতা নিয়ে। এরা বুজেও বুঝতে চায় না যে, অন্তিমে পক্ষ বেছে নিতে হলে তারা এস্টাবলিশমেন্টের পক্ষেই থাকবে। একই কথা প্রযোজ্য অধিকাংশ সংবাদপত্রেরর ক্ষেত্রে।

এবার যখন সার্ক স্থগিত হলো, জামাতি সরকার এতো উত্তেজিত হয়ে উঠলো যে বলার নয়। বায়তুল মোকাররম ও এর উত্তর গেটে ভারত অর্থাৎ হিন্দুদের কারণে ইসলাম বিপন্ন রব উঠলো। মন্ত্রীরা প্রচ্ছন্ন ভঙ্গিতে একই কথা বলতে লাগলেন। অবশ্য তাদের বক্তব্য আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। কারণ আওয়ামী লীগ তো 'হিন্দু', তার মানে ভারতের এজেন্ট। সেজন্যই তে আওয়ামী লীগের কথা শুনে ভারত এলো না। পররাষ্ট্র সচিব যে ভঙ্গিতে কথা বলার কথা নয়, সে ভঙ্গিতে বললেন। তিনি বুঝলেন না ছোট দেশের পক্ষে এসব কথা মানায় না, বাইরে একে বলে ছোট মুখে বড় কথা। অনেক সাংবাদিক দুঃখ প্রকাশ করে লিখতে লাগলেন। মনে হচ্ছিলো, সারা বাংলাদেশ দুঃখ সাগরে নিমগ্ন।

এখন এ প্রশ্নটি করা যাক, সার্কের চাইতে বড় 'ন্যাম' বন্ধ করে দিলে তখন কেন বাংলাদেশে এসব পক্ষ দুঃখ সাগরে ভাসলেন না? সাংবাদিকদের অশ্রুজলে কেন নিউজপ্রিন্ট ভাসলো না? কেন, উত্তর গেটে 'দেশ বিপন্ন' ধ্বনি উচ্চারিত হলো না? কেন চ্যানেলে যেসব তালেব এলেমদের ভাষ্য শোনা গেলো না? কেন সেসব মূর্খের চিঠি দেখা গেলো না যে ভারত না এলেও সার্ক সম্মেলন হবে না। কেন উল্লেখ হলো না বারবার যে, এর আগেও ছয়বার সার্ক স্থগিত হয়ে গেছে? কেন জনাব রহমান নিরাসক্ত স্বরে বললেন না, সার্ক ইজ এ ডেড হর্স? ন্যাম হয়নি দেখে বাংলাদেশের যেমন অনেক টাকা বেঁচেছে, সার্ক না হওয়ায়ও তো গরিব দেশের অনেক টাকা বাঁচলো।

সার্ক কি জীবন্ত অশ্ব? না, সার্ক মৃত অশ্ব। গত ২০ বছরে সার্ক কি কোনো ইতিবাচক কাজ করতে পেরেছে জাঁকালো চা খাওয়ার সম্মেলন ছাড়া? প্রতিটি দেশ তো দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতেই কাজ চালাচ্ছে। সার্ক ফ্রেমে তো কিছুই হচ্ছে না। করার স্কোপও নেই। গরিব দেশের কথা যখন উঠেলো তখন বলি, সার্কের অধিকাংশ দেশই গরিব। দারিদ্র বিমোচনের জন্য ৩০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠনের কথা ছিলো। এতো বছরে ৭টি দেশ তো ৩০ কোটি টাকার ফান্ডও গঠন

করতে পারলো না। তা জনাব রহমানের কথা ধার করেই বলতে হয়, ডেড হর্সের জন্য এতো অশ্রুপাত কেন?

অনেকেই জানেন, অশ্রুপাত আসলে সুন্দর ফটো সেশনগুলো মিস হওয়ার জন্য। কালো মেয়েকে ফর্সা বানানোর জন্য। জামায়াতি সরকার গত চার বছরে দেশের যে ভাবমূর্তি তুলে ধরেছে, তা এক কথায় ভয়ানক। ভাব ও মূর্তি দুটোই চুরমার করে দিয়েছে তারা। এখন আন্তর্জাতিক চাপে কিছু মেরামতি দরকার। সেটি হলো না দেখেই এতো অশ্রুপাত।

সার্ক কি বাংলাদেশের সম্মেলন ছিলো? তা হলে বিমান বন্দর থেকে বেরুবার সময় ধানের শীষের 'ভাস্কর্য' কেন গড়া হলো? সেখানে কেন স্থান পেলো না সার্ক বা রাষ্ট্রীয় প্রতীক? সার্কের এজেন্ডা বিষয় কি বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছিলো সরকার? এ ঐতিহ্য না থাকলেও তো গণতন্ত্রের স্বার্থে তা করা যেতো। কারণ জামাতের খালেদা ও নিজামী- দুটি ফ্যাকশনই নাকি গণতন্ত্র ভালোবাসে। অন্যদিকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তো না আসার ব্যাপারে পরম শত্রু বিজেপির সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। কারণ, সেখানে ব্যক্তি থেকে দল বড়, দল থেকে দেশ বড়। আমাদের এখানে দল থেকে ব্যক্তি বড়, দেশ থেকে দল বড়।

সার্কের ভবিষ্যৎ কী? বাংলাদেশ সরকার যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে বা উত্তর গেটে সরকার সমর্থকরা যা করেছে, তাতে সার্কের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে তুলেছে। ১৮ ফেব্রুয়ারির দৈনিক সংবাদে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব শ্যাম শরনের বক্তব্যটি পড়ুন। এটি বোঝার জন্য কূটনীতিবিদ হওয়ার দরকার পড়ে না। শ্যাম শরণ বলছেণ, 'এটাই আমাদরে প্রত্যাশা হয়ে রয়েছে আজ, যদিও এক্ষেত্রে সার্কের রেকর্ড খুব বেশি উৎসাহজনক নয়। আসল কথা হচ্ছে, সার্ক এখনো একটি পরামর্শমূলক সংস্থা হিসেবেই রয়ে গেছে। গত ২০ বছরে একটিও সহযোগিতামূলক প্রজেক্ট সার্ক গ্রহণ করতে পারেনি। বস্তুত কোনো সহযোগিতামূলক কিছু করার ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতাও রয়েছে। বরং সার্কের কোনো কোনো সদস্য রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে অঞ্চলের বাইরের দেশ বা আঞ্চলিক অথবা আন্তর্জাকি সংস্থার সাহায্য দিয়ে প্রায় প্রকাশ্যেই সার্কের মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে ভারসাম্য তৈরি চেষ্টা করেছে অথবা সার্ককে এক ধরনের আঞ্চলিক বিরোধ নিষ্পত্তির সংস্থা হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে।' ইঙ্গিতটি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের প্রতি।

না, এখানেই শেষ নয়। আরো আছে- 'ভারত তার প্রতিবেশীদের এই মর্মে আশ্বস্ত করতে চায় যে, তাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু যে বিষয়টি ভারত খুব বিব্রত করে তা হচ্ছে, ভারতের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রদর্শন, যা প্রায়ই তাদের জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতাকে

আড়াল করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ স্বাভাবিক সম্পর্কের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে এবং রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ও অর্থনৈতিকভাবে গতিশীল একটি অঞ্চল হিসেবে আমাদের অঞ্চলের আত্মপ্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।'

দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের পড়ালেখার মান ও অভিজাত নির্ণায়ক এই বক্তব্য। এ প্রতিক্রিয়ার পর হঠাৎ উত্তর গেটের গগনবিদারী চিৎকার বন্ধ। সার্ক নিয়ে হঠাৎ দুঃখবোধ ও অশ্রুপাত হাওয়া। আমাদের প্রশ্ন, এটি কেন হবে? হয় সাইফুর রহমানের বক্তব্য অনুযায়ী এটিকেও 'ডেড হর্স' বলতে হবে, নয়তো এটিকে জীবন্ত অশ্বে পরিণত করতে হবে। আমরা চাই তা জীবন্ত অশ্বে পরিণত হোক। সবার অশ্রুপাতও সে কথা বলে। তাই নয় কি? তাহলে প্রশ্ন, ভারতের পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করে সার্ক বাঁচানো যাবে কি-না? যদি তা পারা যায় উত্তম। নিরস্ত্র জনগণকে না মেরে-ধরে অবিলম্বে উত্তর গেটে সমাবেশ শুরু করুন। সীমান্ত বন্ধ করে দিন। ভারতের রাষ্ট্রদূতকে ফেরত পাঠিয় দিন। আমারদেরকে যারা সরকারবিরোধী বলেন, তারাও থাকবো সরকারের পিছে। একথা বলছি এ কারণে যে, এক অসাংবাদিক বৃটিশ বাঙালি পরিচালিত সাপ্তাহিক ইয়ার্কিতে ঘোষণা করা হয়েছে, আমরা দেশ বিরোধিতা করি। এনাফ ইজ এনাফ। একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাক। আর তা যদি করার মুরোদ না থাকে, তাহলে কীভাবে ভারতকে সক্রিয় করা যায় তা ভাবুন। সেটি করার প্রথম শর্ত, বোমাবাজিবন্ধে পদক্ষেপ নিন। অন্তত একবার হলেও কিছু দোষীকে গ্রেফতার করে বিচার করুন। আওয়ামী ও হিন্দু দলন বন্ধ করুন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করুন। সবচাইতে বড় কথা, মৌলবাদী উত্থান বন্ধ করুন। কিন্তু সরকার নিজেই যেখানে মৌলবাদে বিশ্বাসী, সেখানে এ সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে? এখন শুধু ইউরোপ বা আমেরিকা নয়, সার্কের দেশগুলোও ইসলামে মৌলবাদে ভীত। পাকিস্তানের জনগণের একটা বড় অংশও এ থেকে মুক্তি চায়। সেটি কি সম্ভব? কখনো কি জামাতের নিজামী ও খালেদা অংশের পক্ষে এই ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব হবে- দল থেকে দেশ বড়? যদি তা প্রমাণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে বাংলাদেশের ভয়ে যে কেউ সার্ক ছেড়ে চলে যাবে না, তার গ্যারান্টি কে দেবে?

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

প্রতিরোধ করুন অথবা দেশ ছাড়ুন নয়তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকুন

জামাতের খালেদা ফ্যাকশন সরকারে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোও তাদের হাতে। নিজামী ফ্যাকশনের হাতে মাত্র দুটি মন্ত্রণালয়। কিন্তু তারা এখন এতই বলীয়ান যে খালেদা ফ্যাকশনের হোমড়া-চোমড়াদের নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা মশকরা করে। এই ফ্যাকশনের একটি গোপন মেমো আবু সাইয়িদ তার সাম্প্রতিক গ্রন্থে ফাঁস করে দিয়েছেন যা *দৈনিক সংবাদ* সবিস্তারে উদ্ধৃত করেছে (১৯.০২.০৫)। এর উত্তর দেবে কি, বরং ভয়ে সেই ফ্যাকশনের স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীর লোকজন জনাব সাইয়িদের বাড়িতে ঢুকে বইগুলো জব্দ করেছে। তারা ভয় পাচ্ছে এ ভেবে যে, বইটি বাজারে গেলে যদি গোলাম আযম বা নিজামী চটে যায়। সেই মেমোতে উল্লেখ করা হয় 'দেশের শাসনে জোট সরকারের চরম ব্যর্থতা, জোটভুক্ত সংগঠনসমূহের প্রতি চরম অনীহা এবং অসদাচরণের তীব্র নিন্দা করা হয়। (জামাতের সভায়)। সভায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অনৈসলামিক কার্যকলাপ, লাগামহীন কথাবার্তা, কথা ও কাজে অমিল এবং মন্ত্রী মান্নান ভূঁইয়া, মির্জা আব্বাস, ব্যারিস্টার মওদুদ, ড. মোশাররফ হোসেন, সাইফুর রহমানসহ প্রায় সব মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর সমালোচনা করা হয়। এমনকি মন্ত্রিপরিষদের জামাতি দুই মন্ত্রীর ব্যর্থতা ও অসচেতনতার ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।'

প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছে নিজামীরা তা আমরা করবো না। নিজামীরা সরকারের আছে তারা ভাল জানে। কিন্তু যে ভাষায় এটি বলা হয়েছে সেটি বেয়াদবি। দুঃখ এই যে, এর চেয়ে সাধারণ ব্যাপার নিয়ে সংসদে, হ্যাঁ, সংসদে বেগম জিয়া আওয়ামী লীগের সাংসদদের বলেছিলেন, 'চোপ, বেয়াদব'। অথচ এতোবড়ো বেয়াদবির বিরুদ্ধে একবারও বললেন না তিনি 'খামোশ'।

আমরা নিশ্চিত নিজামীরা বলবে, এটি সর্বৈব মিথ্যা। একসময় নিজামীরাইতো বলেছে, নারী নেতৃত্ব হারাম। এখন সেই হারাম যদি হালাল হয় তাহলে যা উদ্ধৃত হয়েছে তাও সত্যি। ধরে নিলাম সেটি মিথ্যা কিন্তু শাহরিয়ার কবির মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলনের ১৩ ফেব্রুয়ারির গোলটেবিলে যেসব দলিল উপস্থাপন করেছে সেগুলো? ওগুলো তো তাদের কন্ট্রোলার পাকিদের লেখা।

জমিয়তে তালাবা ইসলামিয়ার মুখপত্র 'হাম কদাম' এ অক্টোবর ২০০৪-এর সংখ্যায় মুনিম জাফর খানের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা ঐ সময় বাংলাদেশ সফর করেন। যুদ্ধাপরাধী মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের সঙ্গে তারা দেখা করেন। মুজাহিদ তাদের জানান, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে আমরা এ কাজটি বাধ্য হয়ে করি নাই বরং এটার প্রয়োজন ছিল সরকারের মধ্যে থেকে নিজেদের অনুকূল পরিবেশ এবং পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি সেগুলোকে তাবৎ পড়া সব করার জন্য এ পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক ছিল।

আমাদের হাতে দুটি মন্ত্রণালয় আছে একটি সমাজকল্যাণ অপরটি শিল্প। এর আগে কৃষি মন্ত্রণালয়ও আমাদের হাতে ছিল। সেটা ফেরত নেওয়ার একমাত্র কারণ হলো আমরা এর মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ।

ছাত্রদের মাঝে প্রভাব বিস্তারের জন্য তারা বিভিন্ন কোচিং সেন্টার স্থাপন করেছে। এ রকম দুটি সেন্টার হলো 'রেটিনা' ও 'কনক্রিট'। জামাতের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হলেন সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান যিনি ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা করছেন। জামাতের গোপন মেমোতে জামাতি আরেকটি ব্যাংকের নাম পাওয়া যায়– আল আরাফাহ।

এটা এখন পরিষ্কার যে জামাত একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। প্রশাসনের সবখানে তাদের লোক ঘাপটি মেরে আছে। ক্ষমতায় আসার পর তারা তাদের খুঁটি পাকাপোক্ত করেছে। এখন তাঁরা ও তাদের সেকেন্ড ফ্রন্ট অন্যান্য জঙ্গি গ্রুপগুলো সক্রিয় হয়ে উঠছে। তারা সারা দেশে গ্রেনেড ও বোমা ছুড়ে অরাজকতা সৃষ্টি করছে যাতে খুব সহজেই ক্ষমতা দখল করতে পারে। অন্যদিকে, সজীব বাঙালি সংস্কৃতির ওপর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে হামলা চালাচ্ছে। গত তিন সপ্তাহের খবরের কাগজগুলো দেখুন এবং পর্যালোচনা করুন তাহলে বুঝবেন আপনি এখন মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে। আমি খবরের কাগজ থেকেই কিছু উদাহরণ দিচ্ছি–

১. সংগ্রামের রিপোর্টার বোমা হামলায় নিহত হওয়ার পর এএসপি মোফাজ্জেল গ্রেফতার। বোমা রাখা হয়েছিল যুগান্তরের সাংবাদিকের জন্য। লক্ষণীয়, মোফাজ্জল এসব কাজকর্ম বহুদিন করে আসছে। প্রায় পুলিশ কর্মচারী তাই করে এবং সরকারের অনেক লোক তা থেকে বখরা পায়। জামাতের কর্মী মারা যাওয়ায় মোফাজ্জেলকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে সম্পূর্ণ সরকারি সুবিধায় হেলিকপ্টার এনে চিকিৎসা করা হয়। অন্যদিকে জনাব কিবরিয়া যাতে বিনা চিকিৎসায় মারা যান সে ব্যাপারে জামাতের নিজামী ও খালেদা ফ্যাকশন একমত

ছিল। এবং এখন পর্যন্ত অন্যান্য সাংবাদিক হত্যাকারী কাউকে ধরা যায়নি।

২. লক্ষ্মীকানা গ্রামে নাট্যানুষ্ঠান বোমা হামলার জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশের বোমা স্কোয়াড সদস্যদের বিরুদ্ধে নথি গায়েব। (*সংবাদ* ১৮.০২.০৫)।

৩. আহলে হাদিস নেতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. গালীব যিনি বাংলা ভাইদের নেতা। তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রতিদিনই তার কার্যকলাপের খবর ছাপা হচ্ছে পত্রিকায়।

৪. সবচেয়ে বেশি সরকারি বিজ্ঞাপন পেয়েছে কথিত পাকি ও গোয়েন্দা প্রভাবিত দৈনিক ইনকিলাব জামাতের নিজামী ফ্যাকশানের পত্রিকা, *দৈনিক সংগ্রাম*, জামাতের খালেদা ফ্যাকশনের, তারেক জিয়ার মালিকানাধীন দৈনিক দিনকাল। এগুলোর সার্কুলেশন সর্বমোট ১ লাখও হবে কিনা সন্দেহ। সরকারি টাকা দিয়ে এদের ভিত্তি মজবুত করা হচ্ছে।

৫. বাংলা ভাইয়ের হাতে নির্যাতিত তিনজন আবার পুলিশের ক্রসফায়ারে নিহত (*ভোরের কাগজ* ৯.০২.০৫)। ক্রসফায়ারে আজ পর্যন্ত কোনো জঙ্গী সংগঠনের নেতা নিহত হয়নি।

৬. বাগমারায় বাংলা ভাই ক্যাডারদের সমাবেশ (*সংবাদ*, ৩০.০১.০৫)। মন্ত্রী থেকে শুরু করে পুলিশ সবাই বলছে, বাংলা ভাই কেউ নেই। সুতরাং তাকে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

৭. চট্টগ্রামে ব্রাশফায়ারে ইউপি চেয়ারম্যান খুন। বিএনপি বলছে খুন করেছে জামাত (*সংবাদ* ৫.০২.০৫)। এ ধরনের খুন হরদম হচ্ছে।

৮. একই দিনে টাঙ্গাইলে বোমা, কুড়িগ্রামে গ্রেনেড, ঠাকুরগাঁওয়ে বোমা সরঞ্জাম উদ্ধার (*ভোরের কাগজ* ১৯.০২.০৫)।

৯. হাসিনার সফরের পর টুঙ্গিপাড়ায় ৬০টি বোমা উদ্ধারের কথা সরকার গোপন করেছে (*ভোরের কাগজ* ১৯.০২.০৫)।

১০. জামালপুরের গ্রামে এখনো জঙ্গিরা তৎপর (*ভোরের কাগজ* ১৯.০২.০৫)।

১১. ১৪ ফেব্রুয়ারিতে ভ্যালেনটাইন ডেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা হামলা এবং এর পরপরই আলামত সব ধুয়েমুছে সাফ। তখন র‍্যাব ও পুলিশ এলাকাটি পাহারা দিচ্ছিল।

১২. সরকার সমর্থক ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক প্রভৃতি এনজিওতে বোমা হামলা।

১৩. চট্টগ্রামের কালী মন্দিরের সামনে বোমা বিস্ফোরণ (*ভোরের কাগজ*, ২০.০২.০৫)।

কয়েকটি উদাহরণ দিলাম মাত্র, শুধু বোঝার জন্য। প্রতিদিনই এসব ঘটনা

ঘটেছে এবং ঘটবে। এই নিবন্ধ লেখার সময় খবর পেলাম মৌলভীবাজারে আশুরার মিছিলে বোমা হামলা হয়েছে। প্যাটার্নটি হচ্ছে– এসব ঘটনা ঘটবে, কাউকে গ্রেফতার করা হবে না। একই কারণে, হাইকোর্টের বিচারকরা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করতে চাননি। আষ্টেপৃষ্ঠে রাষ্ট্রকে তারা বেঁধে ফেলেছে এবং এখন ক্ষমতায় বসার আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

'জামাতের গোপন মেমোতে বলা হয়েছে মহিলাদের ঘরে ঢোকাতে হবে এবং সরকারবিরোধী আন্দোলন তীব্র হলে তারা খালেদা ফ্যাকশনকে পরিত্যাগ করবে এবং ভারতের আগ্রাসী তৎপরতা জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং ভারতবিরোধী বক্তব্য যুক্তি সহকারে অব্যাহত রাখতে হবে। প্রচারণার কৌশল হিসেবে বলা হয়, জামাত ক্ষমতায় গেলে যা করবে ঃ সংবিধানের সংবিধানিক নাম হবে গণপ্রজাতন্ত্রের স্থলে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তন করে কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামী সংবিধান বাস্তবায়ন করা হবে। আর তা সম্ভব শুধু জামাত ক্ষমতাসীন হলে। কাজেই স্বাভাবিক পন্থায় ক্ষমতাসীন না হতে পারলে বিকল্প ব্যবস্থা সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সারা বিশ্বব্যাপী ক্ষমতায়নের পরিকল্পনায় বাংলাদেশকে শীর্ষ স্থান দিয়ে কার্যক্রম ও পরিকল্পনা কার্যকর করা হবে। সংবিধানে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা সংযোজন করতে হবে। সংবিধানের ৪নং অনুচ্ছেদের পরিবর্তন করে জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলার স্থলে সুরা ফাতিহা সংযোজন করতে হবে। জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামি অনুশাসন অনুযায়ী মহিলাদের চলতে হবে।

সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় যা ভারতে পূর্বাশা নামে পরিচিত (৮ বর্গকিলোমিটার), যা ভারতীয় নৌবাহিনী ১৯৮১ সালে জোরপূর্বক দখল করে নেয় তা অবশ্যই মুক্ত করে বাংলাদেশের অখন্ডতা রক্ষা করতে হবে। (*সংবাদ* ১৯.০২.০৫)।'

খালেদা ফ্যাকশনও এ বিষয়ে একমত। সার্ক স্থগিত হওয়ার পর থেকে তার ফ্যাকশনের সবাই এ ধরনের কথা বলে যাচ্ছেন। তিনি নিজেও কয়েকদিন আগে আওয়ামী লীগকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'যারা আল্লাহ খোদা বিশ্বাস করে না, তারাই ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করছে। তারা দেশের উন্নয়ন চায় না। আমরা যাতে উন্নয়ন করতে না পারি সে জন্য পরিকল্পিতভাবে হরতাল এবং জ্বালাও-পোড়াও কর্মসূচি দিচ্ছে। তারা বিদেশীদের সহায়তায় ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় আসতে চায়।' (*জনকণ্ঠ* ১৮.০২.০৫)। অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে।

সম্প্রতি বাইচান্স গ্রেফতারকৃত জঙ্গি শফিকুল্লাহ বলেছে, 'তাদের একটি যুব সংগঠন রয়েছে, তার নাম মুজাহিদীন যুব সংঘ। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান এবং এনজিওদের সভা সমিতিতে বোমা হামলা করাই এই সংগঠনের কাজ এবং তাদের একটি বোমা স্কোয়াড় রয়েছে। তারা এই হামলাকে ইসলামি জেহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।' (*ইত্তেফাক* ১৭.০২.০৫)।

সরকারের সেকেন্ড ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করছে এমন জঙ্গি সংগঠনের সংখ্যা এখন ৪৫। শাহরিয়ার ৪৩টি নাম উল্লেখ করেছেন। তারা এখন পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার জন্য কাজ করছে। শাহরিয়ার নেজামে ইসলামের একটি দলিলের উল্লেখ করেছেন। যেখানে আওয়ামী লীগ থেকে ইয়াহিয়া খানকে উত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, 'যে অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য একদিন এদেশের মানুষ পাকিস্তান চেয়েছিল এবং ভোট ও রক্তের বিনিময়ে হাসিল করেছিল আজ দেশ, সেই অবস্থানের দিকে দ্রুত ফিরে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের বাঁচার পথ একটাই, আর তাহলো সারা উপমহাদেশে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হওয়া। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে এক মুহূর্ত দেরি না করে দুই দেশ এক জাতি হিসেবে পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করা। পাকিস্তান-বাংলাদেশ দুটি দেশ কিন্তু মুসলিম হিসেবে এক জাতি।' (০৯.০২.০৫)। ইতিমধ্যে জয়পুরহাটে জামাতের মিছিল থেকে স্লোগান দেওয়া হয়েছে 'পাকিস্তানি বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' (*সংবাদ* ১৬.০২.০৫) মার্কিন রাষ্ট্রদূত জামাতের একটু সমালোচনা করায় যুদ্ধাপরাধী জামাত নেতা সাঈদী পল্টনে পরিষ্কার ভাষায় বলেছে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা হলো শয়তানের বিধান।' সাঈদী ঘোষণা করে আমেরিকা বাংলাদেশকে নাস্তিকতা শেখাতে চায়। সমাবেশ থেকে স্লোগান ওঠে, 'বাংলার আকাশে তালেবান পতাকা তুলবই' ও এর ওপর ভিত্তি করে গজল পরিবেশন করা হয়। সমাবেশে খালেদা ফ্যাকশনের আখতার হামিদ সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংসদের ডেপুটি স্পিকার। (*জনকণ্ঠ*, ২০.০২.০৫) এরপর মার্কিন রাষ্ট্রদূত একদম নিশ্চুপ হয়ে গেছেন ভয় পেয়ে।

এসব যে নতুন খবর তা নয়। তবুও এই বিস্তৃত প্রবন্ধটি লিখলাম একটি কারণে। তিনটি বিষয় স্পষ্ট করার জন্য-

১. জামাত সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিগ বিজনেস (হরতালের কথা শুনলে অর্থাৎ বিরোধীদের প্রতিবাদের কথা শুনলে যারা ক্ষিপ্ত হয়ে যান) ও এনজিও এবং গণমাধ্যমের একটা বড় অংশ, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসনের বড় অংশ এতে সহায়তা করেছে। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী। এরা ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে আগ্রহী এবং এসব কার্যকলাপ সে লক্ষ্যে পৌছার প্রক্রিয়া মাত্র।

২. এদের লক্ষ্য পাকিস্তানি বাংলাদেশ স্থাপন করা। এ কারণে তারা যাদের শেষ করে দিতে চাইছে তারা হলো–

১. সেক্যুলার ও বাম প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের ২. আওয়ামী লীগ, সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ, বাসদ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী-সমর্থকদের ৩. সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায় ৪. আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ৫. এনজিও (যারা জোটের পক্ষে নয়) মানবাধিকার আন্দোলনের নেতাকর্মী ৬. গ্রামাঞ্চলে নারী এবং ৭. বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্প সংস্কৃতিসহ যা কিছু বাঙালিত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার সমর্থক। (শাহরিয়ার কবিরের ধারণাপত্র)।

৩. এ লক্ষ্যে জোট সরকার সব ব্যবস্থা নিয়েছে। যে কারণে কেউ গ্রেফতার হয় না, ভুল করে কাউকে গ্রেফতার করলেও ছেড়ে দেয়া হয় এ সব দোষ আওয়ামী লীগের কাঁধে চাপিয়ে আওয়ামী কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ এক্ষেত্রে সব ধরনের সহায়তা করছে। যাদের শেষ করে ফেলতে হবে তারা অসহায় এবং অস্ত্রহীন। অন্যপক্ষ সশস্ত্র-ওপরের উদাহরণগুলো যা প্রমাণ করে। শুধু তাই নয় জামাতের ডকুমেন্টে আছে বিকল্প [অর্থাৎ সশস্ত্র] পন্থা অবলম্বনে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভও সর্বতোভাবে এদের সহায়তা করবে। এখন মানববন্ধন, হরতাল করে কোন লাভ নেই।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য একটিই। যদি দেশে থাকতে চান এবং শান্তিতে পরিবারসহ গণতান্ত্রিক পরিবেশে থাকতে চান তবে, আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে প্রতিরোধে, প্রতিবাদে। যদি ভাবেন, আমার কিছু হবে না আমি নিরপেক্ষ বা যদি ভাবেন আমি আওয়ামী লীগ করি না কিছু হবে না বা যদি ভাবেন, আমি জামাতের খালেদা ফ্যাকশনের অনুগামী বা যদি ভাবেন রাজনীতিবিদরা সব করে দেবে তবে বোকার স্বর্গে বাস করছেন। খালেদা ফ্যাকশনের অনুরাগীদের বলি, নিজামী ফ্যাকশনের ডকুমেন্টটি দেখুন। নেতারা সব অর্থশালী, বিপদে আপনাদের ছেড়ে যেতে কসুর করবেন না। মওদুদ আহমেদ বা সাকা চৌধুরী কত বার দল বদলেছে বলতে পারবেন? যদি ভাবেন, প্রতিবাদ প্রতিরোধ না করলেও বেঁচে যাবেন তবে বলবো ভুল করছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছাড়া শান্তির লক্ষ্যে পৌছানো যায়নি। আর যদি তা না করেন, তবে যারা পারবেন দেশ ছাড়ুন। তাও যদি না চান তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকুন।

এটুকু বলার পর বলবো, এত কিছুর পরও শেষ হাসিটা আমাদের থাকবে। যেসব ব্যবসায়ী, এনজিও কর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী উৎসাহভরে জোট সমর্থন করেন এবং জামাতের খালেদা ফ্যাকশনের তরুণ-তরুণী-কেউই এদেশ ছেড়ে যেতে পারবেন না। আর যাহোক, তালেবানি বাংলাদেশের পাসপোর্ট পৃথিবীর সব দেশেই অগ্রহণযোগ্য হবে। আমরা শুধু মারা যাবো। আর বাকিরা সব সারা বছর ভ্যালেনটাইন দিবস পালন করবে সেটি হবে না।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

নীল-নকশা, ধর্ম ব্যবসা ও বুটের তলায় বাঙালি সংস্কৃতি

নীল নকশা শব্দ দুটির কথা বহুদিন ধরে শুনে আসছি। ইংরেজি ব্লু-প্রিন্ট শব্দটিরই অনুবাদ। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানী রাজনীতির বিরুদ্ধে বাঙালি দলগুলো এ শব্দ দুটি ব্যবহার করতো। নীল নকশা শুনলেই তখন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে বলে শঙ্কা হতো। স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত সবকটি রাজনৈতিক দল পরস্পরের বিরুদ্ধে নীল নকশা বাস্তবায়নের অভিযোগ করেছে। এতো সুন্দর নীল শব্দটির আজ এ পরিণতি। যাক অতি ব্যবহারের ফলে শব্দ দুটি এখন বাত কে বাতে পরিণত হয়েছে। নতুন প্রজন্ম নীল নকশা শব্দটিকে গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু এখন মনে হয় গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসেছে।

নীল নকশা কী তা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছিল ১৯৭১ সালে। পাকিস্তান ও পাকিস্তানপন্থী দল যেমন জামাত, মুসলিম লীগ নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল। বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতায় না দেওয়া, গণহত্যা কার্যকর করা ছিল সেই নীল নকশা। যারা এগুলো প্রণয়ন করে তারা আজীবন টিকে থাকবে। হিটলার, ফ্রাংকো, মুসোলিনী আইয়ুব, ইয়াহিয়া, জিয়াউল হক ও জিয়া সবাই তাই ভেবেছিল। ঐ নীল নকশার সর্বশেষ ধাপ ছিল ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা যার নেতৃত্ব দিয়েছিল বর্তমান জামাত সরকারের প্রধান ব্যক্তি মতিউর রহমান নিজামী। গোলাম আযম তো ছিলই। ভাগ্যের পরিহাস বেগম জিয়ার স্বামী মেজর জিয়া তখন গোলাম আযম-নিজামী গংদের নিকেশ করার জন্য ঘুরছিলেন। আজ সেই সব ঘাতক বেগম জিয়ার সুগন্ধী আঁচলের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। তখন বুঝেছিলাম নীল নকশা কী।

জিয়া ও এরশাদ আমলে আরেকটি নীল নকশার রূপরেখা পরিষ্কার হয়েছিল। এরা দেশটি সেনাবাহিনীর কাছে বন্ধক রেখে সমাজকে জিম্মি করতে চেয়েছিলেন। তারা নেই কিন্তু তাদের উত্তরসূরিরা রয়ে গেছে যারা এখন ক্ষমতায়। বাংলাদেশ এখন মিনি পাকিস্তান। অনেকে মনে করেন পাকি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের মাধ্যমেই সরকার পারিচালিত হয়। এ কথা বিশ্বাস করতাম না। এখন মনে হয় এর মধ্যে সত্য থাকলেও থাকতে পারে। কারণ, পাকিরা মধ্য ষাট থেকে যা করেছিল সে প্যাটার্নের সঙ্গে মিল আছে বর্তমান প্যাটার্নের। ঐ সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আঘাত করে সুবিধা করতে না পেরে তারা বাঙালি সংস্কৃতি বিনাশ করতে এগিয়ে আসে। সেটি অবশ্য জিন্নাহর নেতৃত্বে ১৯৫১ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল। তাঁর

সর্বশেষ ধাপ ছিল শহীদ মিনার ভেঙ্গে মসজিদ করা এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা, কারণ আমাদের সংস্কৃতির মূল এরাই। এখন আবার নীল নকশা শব্দটি অবয়ব পাচ্ছে, তার অর্থ পরিস্কার হচ্ছে।

জামাতের দুটি ফ্যাকশন জামাত (নিজামী) ও জামাত (খালেদা) একটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছেছে। ডান্ডা মেরে আওয়ামী লীগকে হয়তো ঘরে ঢোকানো যাবে কিন্তু দেশের অগণিত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা বোধ নষ্ট করে দিতে হবে। বাঙালিদের বাংলাদেশী বানানোর এছাড়া আর কোন উপায় নেই। এ জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে হরকাতুল জিহাদ থেকে বাংলা ভাই। বিজ্ঞজনদের অনুমান এরা সরকারের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে নিজামীর নির্দেশে যে কারণে এদের কাউকে 'ধরা যাচ্ছে' না। এদের নীল নকশার প্রথম ধাপ হলো আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের বিনাশ। এ বিষয়ে তারা সম্মতি পেয়েছিল ভারতের তৎকালীন বিজেপি সরকারের।

নিজামীরা পাকিদের মতো বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ ও হিন্দুরা ভারতের প্রতিনিধি। যদিও ভারতের কাছে বস্ত্র উন্মোচন করেছে বর্তমান সরকার যে কারণে নিজামীর আমন্ত্রণে ১২ হাজার কোটি টাকা নিয়ে টাটা এগিয়ে এসেছিল। হাসিনা আমলে আসেনি। যে কথাটা আমরা মনে রাখি না। তাহলো ধর্মব্যবসায়ীরা মূলত প্রতারক। যা হোক তালেবানি রাষ্ট্রে আওয়ামী ও হিন্দু থাকতে পারবে না তবে পর্দা ছাড়া দু একজন থাকতে পারবে। যেমন প্রধানমন্ত্রী। এখানেই এদের প্রতারণা পরিস্কার হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্ট্রাটেজি হচ্ছে, স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কৃতির যে সব মাধ্যম আছে সেগুলো গুড়িয়ে দেওয়া। ১লা বৈশাখে বোমা হামলা এর আগে শামসুর রাহমানের ওপর হরকাতুলের হামলা দিয়ে শুরু। এরপর বোমা পড়েছে খ্রিস্টান চার্চে। ভাঙা হয়েছে মন্দির। তারপর শুরু হলো গ্রাম বাংলার প্রাণবন্ত সংস্কৃতি মেলায় হামলা। সিনেমা হলে বোমা হামলা। বাংলা ভাইয়ের নির্দেশে (যা সরকার মানতে বাধ্য)। উত্তরাঞ্চলে খোলা জায়গায় সব ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। না এখানেই সব নয়। যুগ যুগ ধরে গ্রাম বাংলার প্রধান বিনোদন যাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গ্রাম বাংলায় এসব দমন করে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে এরা এখন এগুচ্ছে শহরের দিকে। টার্গেট ঢাকা শহর। ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার অন্যরূপ। একদিকে চলে প্রতিবাদী আন্দোলন, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক জাগরণ। এটিও একটি ঐতিহ্য যা সরকার দমন করতে চাইছে। এটিই এক ধরনের ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্য নষ্ট করার জন্য দুটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একটি হলো ভূমি প্রতিমন্ত্রীর ভাষায় (যা সরকারের নীতি) আওয়ামী লীগকে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করতে হবে। (*সংবাদ* ১৫.২.২০০৫)। আক্ষরিক অর্থে তাই করা হচ্ছে। সাংস্কৃতিক জাগরণের মূল কেন্দ্র শহীদ মিনার ও বইমেলা। দ্বিতীয় ব্যবস্থা এ দুটিকে অপাঙতেয় করে তোলা।

বইমেলায় প্রচুর র‍্যাব নিয়োগ করা হয়েছে যাদের সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসীদের মতোই ভয় করে কারণ এদের হত্যার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তো আছেই। নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার নামে এ ব্যবস্থা যাতে দর্শক কম হয়। তাহলে মেলা তার গুরুত্ব হারাবে। শুধু তাই নয় র‍্যারের মতো বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকাশককে বলছে অন্য প্রকাশকদের বই না বিক্রি করতে। এটি 'নীতিমালা'র যতোক্ষণ জামাতের দুটি ফ্যাকশনের দোকান। (তারা প্রকাশক ও বিক্রেতা কোনটিই নয়।) না উঠানো হবে ততোক্ষণ নীতিমালা মানতে কেউ বাধ্য নয়। তাছাড়া এটি পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের মেলা। শুধু প্রকাশকদের নয়। মেলা বিনষ্ট হলে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও কমিটির সদস্য সচিবকে আমাদের কাছে এর জবাব দিতে হবে। মেলার গুরুত্ব হ্রাসে এটি একটি পরোক্ষ কৌশল।

অন্যদিকে ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সামনে 'ভালাবাসা' দিবস পালনে উৎসুক শ্রোতা/দর্শকদের ওপর বোমা হামলা হয়েছে। এদেশের এ অবস্থায় যারা এ ধরনের অনুষ্ঠান করে এদের মানসিকভাবে বাস্তুহারা ছাড়া কিছু বলার নেই। মূল বিষয় সেটি নয়। মূল বিষয় হলো ভারতে শিবসেনারা এ ধরনের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে। সৌদি আরবে ঐ দিন গোলাপ ফুল বিক্রি নিষিদ্ধ ছিল। সৌদি অনুরাগী এবং মৌলবাদীরা এ ধরনের অনুষ্ঠান পছন্দ করে না। যারা উদীচী, মেলা, সিনেমা, যাত্রায় বোমা হামলা করেছে অনেকের অনুমান তারাই এই হামলা চালিয়েছে। অবশ্য বলা হবে আওয়ামী লীগ করেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো সুটেডবুটেড এক বৃদ্ধ ব্রিটিশ বাঙালি সাপ্তাহিক সম্পাদক যিনি জামাতের খালেদা ফ্যাকশনের অনুগত ছিলেন এসবের প্রবক্তা। এখন তার দলের অন্য ফ্যাকশন নাকি এসব করছে। দেখা যাক মৌলবাদী এই ক্লাউন সম্পাদক কী করে।

এখানেই শেষ নয়। সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (হ্যাঁ সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃপক্ষ শহীদ মিনারে একুশে অনুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে র‍্যাব ও পুলিশ যায় শহীদ মিনারে। (*সংবাদ* ১৫.২.০৫)। ১৯৭১ সালে বুটঅলারা শহীদ মিনার গুড়িয়ে মসজিদ করেছিল। ২০০৫ সালে বুটঅলরাই পদস্খলন করলো শহীদ মিনার। উল্লেখ্য, এখানে রাষ্ট্রনায়করাও আসেন নগ্নপদে। শ্রদ্ধা জানানোর সেটিই রীতি।

এসব চলছে 'নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার' নামে। বাংলাদেশে কিন্তু নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ভেতর অহরহ বোমা হামলা হয় প্রেসিডেন্ট নিহত হয়। প্রশ্ন দেশে সরকার থাকলে এবং তার হাতে দেশের নিয়ন্ত্রণ থাকলে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দরকার হয় কিনা। ২০০১ সালের জামাতের দুই ফ্যাকশন জেতার পর এসব শুরু হয়েছে। আসলে বাঙালি যেদিয়ে বাংলাদেশী আনতে হবে। বাঙালি সংস্কৃতি থাকবে মৌলবাদ ও বুটের তলায়। আর বেয়নেটের ডগায় প্রস্ফুটিত হবে তালেবানি সংস্কৃতি। যেমন

স্বৈরাচারী এরশাদের প্রশংসা করে কলকাতার সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদকীয় লিখেছিল বেয়োনেটে এসে বসেছে প্রজাপতি।

পাকি আমলে এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো লাভ হয়নি। কিছু মানুষ মারা গেছে। এদের এতসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও বইমেলায় দর্শক কমছে না। যা ঢুকছে ঠিক সে পরিমাণ নিরাপত্তার কারণে ঢুকতে পারছে না। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শহীদ মিনারের অনুষ্ঠান করছে। আর বসন্তের প্রথম দিনে? সারা ঢাকা ডুবে গিয়েছিল হলুদ রঙে। হলুদ কাপড় পরে বসন্তকে স্বাগত জানাতে সবাই বেরিয়েছিল। আমার এক বন্ধু বলেছিল সেই সাত সকালে দেখেছে সেজেগুজে। কপালে টিপ দিয়ে হলুদ কাপড় পরে মেয়েরা যাচ্ছে ফ্যাক্টরিতে। মুঘল [ইসলামী] আমল থেকেই এর চল। কেউ কাউকে বলে দেয়নি হলুদ শাড়ি পরতে। জামাতের খালেদা ফ্যাকশনের অনেকেও হলুদ কাপড় পরে বেরিয়েছে। কয়েক কোটি লোক না মারলে স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কৃতির এই প্রকাশ কি বন্ধ যাবে?

জামাতের খালেদা অংশের অনুসারী তরুণ-তরুণীদের বলি। মৌলবাদ সমর্থন ও সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে একই সঙ্গে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। এই সাধারণ সত্যটি বুঝতে হবে। 'নিরপেক্ষ' 'বাস্তুহারা মনের' তরুণদের বলি। শুধু বাউল নয় ব্যান্ড সঙ্গীতও নিষিদ্ধ হবে এবং তারপর কী হবে। তালেবানি রাষ্ট্রের এক ভাবমূর্তির সৃষ্টি হবে বাংলাদেশে। এবং তারপর কী হবে? এসব তরুণরা যাদের একমাত্র লক্ষ্য সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া সে লক্ষ্য আর পুরণ হবে না। এটি স্মরণ রাখতে হবে। বাংলাদেশের বাইরে জামাত-বিএনপি ক্যাডারের কোনো দাপট নেই। আর বুটঅলা ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের বলি ৫০ বছরে যা হয়নি, ভবিষ্যতেও সেটি হবে না। বুট ও মৌলবাদী পোশাক ফেলে এক সময় দৌড়াতে হবে।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

ক্ষমতায় আছেন মাসুদ মিয়ারা

ভাবছেন, বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী, জামাতপন্থী বিএনপির প্রধান, প্রবল ক্ষমতাশালী। না, আপনার ধারণা বোধহয় ঠিক নয়। খবরের কাগজের বিভিন্ন রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে, তার চেয়েও ক্ষমতাশালী একজনের আবির্ভাব হয়েছে বাংলাদেশে। তিনি একজন তরুণ। ভাবছেন তারেক রহমান? না, আপনার ধারণা ঠিক নয়। তার নাম হচ্ছে মাসুদ মিয়া।

নামটি সাধারণ, আরো দশ পাঁচটি নামের মতো। কিন্তু ব্যক্তিটি অসাধারণ। তার আগে এতো নিম্নপদে থেকে কেউ কখনো প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি। সাধারণভাবে দেখলে, মাসুদ মিয়া বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিসের একজন জুনিয়র কর্মকর্তা, পদমর্যাদা এসপির। এ রকম শয়ে শয়ে এসপি বাংলাদেশে ছিল এবং এখনও আছে বোধহয়। তাদের নামও কেউ জানে না। কিন্তু মাসুদ মিয়ার নাম ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে, রাজশাহী থেকে টেকনাফ পর্যন্ত। কারণ? কারণ আর কিছুই নয়। প্রমাণিত হয়েছে যে, একজন এসপি হলেও তিনি ক্ষমতাধর, অন্তত তার মন্ত্রীর চেয়েও। তার কেশটিও কেউ স্পর্শ করতে পারে না। কেন তারা ক্ষমতাধর? সেটি অন্য বিষয়।

মাসুদ মিয়া প্রথমে খবরে আসেন বাংলা ভাইয়ের কল্যাণে। এবং তখনই তার ক্ষমতা বোঝা যেতে থাকে। বাংলা ভাইয়ের কথা মনে আছে তো? জামাতের সেকেন্ড ফ্রন্ট জাগ্রত মুসলিম জনতার নেতা। বাংলা ভাই এক সময় জামাতের ক্যাডার ছিলেন। বর্তমানে অন্য যে সব ইসলামী জঙ্গী ধরা পড়ছে, দেখা যাচ্ছে এদের অধিকাংশই ছিল জামাতের ক্যাডার। আমাদের অনেকের যে ধারণা ছিল জঙ্গিবাদী গ্রুপগুলো জামাতের সেকেন্ড ফ্রন্ট, এখন দেখা যাচ্ছে, সে ধারণা বেঠিক নয়।

'বাংলা ভাই' যখন রাজশাহীতে, বিশেষ করে বাগমারায় অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করেন তখন মাসুদ মিয়া খবরে আসেন। মানুষ তখন বলেছে বাংলা ভাইয়ের অত্যাচারে ঐ অঞ্চল বিপর্যস্ত কিন্তু সেখানকার বিএনপি সাংসদ বলেছেন এ নামে কেউ নেই। জামাতী মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, 'বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি।' মাসুদ মিয়াও বলেছেন, বাংলা ভাইটি আবার কে? বা থাকলেও তারা ভালো লোক। অথচ কাগজে বেরুচ্ছে বাংলা ভাইয়ের প্রতিনিধিরা এসপির অফিসে বৈঠক

করেছে। বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা ট্রাকে করে শহর ঘুরে গেছে। সরকারের সব মন্ত্রী বলছেন, বাংলা ভাই নেই। অথচ খবরের কাগজে বিস্তারিত বিবরণসহ তার ছবি বেরুচ্ছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যিনি সব সময় ব্যস্ত 'লুকিং ফর শত্রু' নিয়ে তিনি পর্যন্ত বললেন, কই বাংলা ভাই নামে তো কেউ নেই। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী তখন নির্দেশ দিলেন, বাংলা ভাইকে গ্রেফতার করতে। অর্থাৎ বাংলা ভাই আছেন। মাসুদ মিয়া নাকি অনেক খোঁজাখুঁজি করছেন বাংলা ভাইকে পাচ্ছেন না। অথচ প্রতিদিন খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে বাংলা ভাইয়ের সচিত্র বিবরণ। মাসুদ মিয়া গ্রেফতার করলেন না বাংলা ভাইকে। বা তিনি 'খুঁজে' পেলেন না। একজন পুলিশ অফিসার তার এলাকার একজনকে খুঁজে পাচ্ছে না। যে নিয়ত সন্ত্রাস করছে। অথচ খুঁজে পায় বিরোধীদের। র‍্যাব যেমন, আওয়ামী-বিএনপি সন্ত্রাসী খুঁজে পায় কিন্তু খোঁজ পায় না জামাতি সন্ত্রাসীর। যেমন–বাংলা ভাই সম্পর্কেও তারা কিছু জানে না। তাজ্জব বাত। কিন্তু আপনারা তো এখন জানেন, বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ। এখানে একজন সামান্য এসপিও অবলীলাক্রমে পারে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষা করতে। তখনই সবাই অনুধাবন করতে পারেন, আসলে বেগম জিয়ার হাতে ক্ষমতা তেমন নেই। অনেকে এ প্রশ্নও করতে লাগলো, তিনি কি আসলেই পুতুল? কোন দেশে প্রধানমন্ত্রীর আদেশ উপেক্ষা করতে পারে একজন জুনিয়র সাংসদ, একজন প্রতিমন্ত্রী বা একজন জুনিয়র এসপি?

ব্যাপারটি কিন্তু অন্যভাবেও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

এক. বাংলা ভাই আছে। কারণ লোকটি তাদেরই সৃষ্টি। চরমপন্থী এবং আওয়ামী লীগারদের ইসলামের নামে ঠেঙ্গিয়ে দমন করার জন্যই ঐ এলাকায় এমপি, মন্ত্রীরা বাংলা ভাই শুধু সৃষ্টি নয়, সে যাতে শশীকলার মতো বৃদ্ধি পায় সেটিও দেখা ছিল তাদের নৈতিক দায়িত্বের অন্তর্গত। সুতরাং বাংলা ভাইয়ের বিষয়টি শাসক দল সব সময় অস্বীকার করেছে। অন্য অর্থে এরা আপাদমস্তক, প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় 'টপ টু বটম' মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদীরা দেশের শাসনে থাকলে আর যাই হোক দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় না।

দুই. বাংলা ভাই ছিল এবং আছে। বিষয়টি হচ্ছে সন্ত্রাস দমনে যে প্রধানমন্ত্রী অতি আগ্রহী সে বিষয়টি বারবার তুলে ধরতে হবে। সে জন্য তিনি বাংলা ভাইকে গ্রেফতার করো, কেন তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না বলে হুমকি ধামকি দেবেন। কিন্তু যাদের গ্রেফতার করার কথা তারা সবাইকে গ্রেফতারের জন্য খুঁজে পেলেও বাংলা ভাইকে পাবে না। কিন্তু এই কৌশলের তাৎপর্য আমাদের কাছে কীভাবে প্রতিভাত হবে তা তারা ভাবেনি। মানুষের সামনে প্রমাণিত হচ্ছে, এতবড় প্রধানমন্ত্রী, সামান্য একজন এসপিকেও দিয়ে কাজ করাতে পারেন না। তার আর ইজ্জত তাকে কোথায়?

তিন. প্রধানমন্ত্রী আন্তরিকভাবেই বলেছেন বাংলা ভাই ও জঙ্গিদের গ্রেফতার করতে। কিন্তু সম্মিলিতভাবে এবং এককভাবে মাসুদ মিয়া সে আদেশ অমান্য করেছে। এতে প্রমাণিত হয়, সরকারে কোনো একক কর্তৃত্ব নেই। ক্ষমতার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলয় আছে। যে কারণে প্রধানমন্ত্রীর এপিএস পাঁচ-ছ' হাজারের মসনবদার তিন কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি কেনে এবং তার কিছুই হয় না। এ ব্যাপারে 'স্বাধীন' দুর্নীতি দমন কমিশনও নিশ্চুপ। মেয়রের এপিএস চার-পাঁচ হাজারের মসনবদার কোটি টাকা লোপাট করে। তার চাকরি যায়, কিন্তু টাকা থেকে যায়।

মাসুদ মিয়া বাংলা ভাইদের প্রবল সাপোর্ট দিয়ে গেল। এবং বাংলাদেশ একটি মৌলবাদী অভব্য দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিত হয়ে উঠলো। মন্ত্রীরা মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত হলো 'এছলামি' মন্ত্রীরাও। দেশের ভাবমূর্তি শেষ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দেশের ভাবমূর্তি বিনাশকারী হিসেবে আমাদের চিহ্নিত করেন, গ্রেফতার করে নির্যাতন করেন কিন্তু এদের ব্যাপারে স্পিকটি নট। এর নিশ্চয় কিছু মাজেজা আছে।

মাজেজা যাই থাকুক কথা বলার চ্যাম্পিয়ন সাইফুর রহমানকে যখন দাতারা জানালো, ভিক্ষা দেবে না, তখন টনক নড়লো। আসলে বিদেশী সামান্য আমলাদের লাথিঘাটা না খেলে আমাদের অতি শিক্ষিত আমলা ও মন্ত্রীদের টনক নড়ে না। এখন হঠাৎ 'এছলামের' নিশানবরদার সাবেক আলবদর প্রধান নিজামী, অলঅয়েজ যিনি শত্রুদের 'লুকিং' (নাকি 'দেখভাল') করছেন সেই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সবাই বলছেন, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বাংলা ভাইকে গ্রেফতার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীও আবার হুঙ্কার দিলেন। জেএমবিকে নিষিদ্ধ করা হলো। অর্থাৎ বাংলা ভাই আছে। সেই সব মন্ত্রী, সেই সব এমপি সেই সব পুলিশরা এখন নিজের থুতু নিজেই চেটে খেলো। কে জানে, থুতু হয়তো চেটে খেলে মধুর মতো লাগে।

সব কথার শেষ কথা, বাংলা ভাইকে গ্রেফতার করা যায়নি। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দুঃখ করে বলছেন, তিনি বিব্রত। কৌতুকময় নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা গেলো, সেই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলছেন, খবরের কাগজ পড়ে তিনি জেনেছেন বাংলা ভাই দেশে নেই।

তা মাসুদ মিয়ার ভূমিকা এখানে কী? সেটিতেই আসছি। গত এক বছরে পত্রপত্রিকার পাতা ওল্টালে দেখবেন, আইজি থেকে তার ওপর সংবাদ বেশি। জঙ্গিদের সমর্থন, টাকা-পয়সা এদিক-ওদিক করা, ওপরঅলার সব ধরনের আদেশ অমান্য করা, বাংলা ভাইয়ের ক্যাডার ছাড়া সব ধরনের মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা সব কিছুর কেন্দ্রে মাসুদ মিয়া। হয়তো এসব কারণেই সম্প্রতি অনেককে ডিঙ্গিয়ে মাসুদ মিয়াকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের এডিশনাল ডিআইজি হিসেবে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। হয়তোবা গোয়েন্দা সংস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য তাকে আনা

হয়েছে। কারণ এখন যারা আছেন তারা তো বাংলা ভাইয়ের খবর মন্ত্রীকে দিতে পারেননি। খবরের কাগজ পড়ে মন্ত্রীকে জানতে হয়েছে। তবে আমাদের আশঙ্কা স্পেশাল ব্রাঞ্চের কী হবে জানি না। তবে আমাদের অনেককে গ্রেফতার করা হতে পারে। সেই বিখ্যাত এসপি কোহিনুর মিয়াকেও ঢাকায় আনা হয়েছে যিনি প্রকাশ্যে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমকে নিজের স্ত্রীর ছোট ভাই হিসেবে সম্বোধন করে লাঠিপেটা করেছিলেন এবং আমাদের অনেকের ওপর অকথ্য নির্যাতন করেছিলেন যাকে আব্দুল গাফফার চৌধুরী 'কোহিনুর থেরাপি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, এ কারণে নাকি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ তাকে বিদেশ যাওয়ার ভিসা দেয়নি। শুধু কোহিনুর মিয়া নন, ভবিষ্যতে হয়তো আরো অনেকেই দেশত্যাগের ভিসা নাও পেতে পারেন।

না, ঘটনা এখানেই শেষ নয়। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিভিশনে প্রচারিত নির্দেশ শুনে (দর্শক হিসেবে যা দেখছি ও শুনেছি) রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি নূর মোহাম্মদ ও বাগমারার ওসি কিবরিয়া ভেবেছিলেন, সত্যি সত্যিই এত দিনে বোধহয় গ্রিন সিগন্যাল পাওয়া গেল বাংলা ভাইকে দুরস্ত করার। কাজে নেমে পড়লেন তারা। এবং তারপর? মাসুদ মিয়া ৫ তারিখে নিজের বদলির আদেশ পেয়ে ৭ তারিখে ওসিকে ক্লোজ করেন। এটি জানতে পেরে ডিআইজি ঐ দিনই ওসিকে দায়িত্ব পালনের আদেশ দেন। ওসি তা মানলে ওসিকে শোকজ করেন মাসুদ মিয়া। শুধু তাই নয়, মিয়া সাহেব সেখানে আরেকজন ওসিকে পোস্টিং দেন। নতুন ওসি এ নির্দেশ পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পুরো বিষয়টি তদন্তের জন্য তখন মাসুদ মিয়া একজন এএসপিকে দায়িত্ব দেন। এএসপি এটি জেনে ছুটিতে চলে যান। মাসুদ মিয়াকে এত ভাল ফর্মে আগে কখনো দেখা যায়নি। এসব বিষয়ে নাকি তিনি মন্তব্য করেছেন, এসপির কাজ এসপি করছে ডিআইজির কাজ ডিআইজি করছে (অবিকল উদ্ধৃতি নয়)। মূল কথা হলো, প্রধানমন্ত্রী যেখানে চুপ মেরে যান সেখানে নূর মোহাম্মদ ডিআইজি। একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কোনো থানার ওসিকে লাইনে ক্লোজ করার ক্ষমতা একজন এসপির নেই।... এসপি নিজের বদলির আদেশ পেয়ে এভাবে কোনো ওসিকে বদলি করতে পারে না। আর সব বিষয়ে ডিআইজিকে অবহিত করতে হয়। *(ভোরের কাগজ,* ১০.০৩.০৫) যে পুলিশ কর্মকর্তা এ মন্তব্য করেছে তার চাকরি যাওয়া উচিত। সে আপ টু ডেট নয়। এখন নিয়ম, নিয়ম বলে কিছু থাকবে না। থাকবে শুধু মাসুদ মিয়ারা।

১০ মার্চ বাগমারার শোকজপ্রাপ্ত ওসি থানায় একটি জিডি করা করে জানান, মাসুদ মিয়া তার কাছে এক লাখ টাকা ঘুষ চেয়েছেন এবং ওই পরিমাণ টাকা না দিলে তাকে ক্লোজ করা হবে বলে হুমকি দিয়েছিলেন। মাসুদ মিয়া ঘুষ চাওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। এদিকে বাগমারার যুগীপাড়ার একজন সহকারী

দারোগাসহ তিন পুরিশকে এসপি গত ৭ মার্চ ক্লোজ করে লাইনে রেখেছেন। এসপিকে (অর্থাৎ মাসুদ মিয়া) গালাগালি করার অভিযোগে এদের ক্লোজ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। (*প্রথম আলো* ১১.০৩.০৫)। ১১.০৩.০৫)।

প্রতিদিন এ ধরনের খবর প্রকাশিত হওয়া শুরু করলে নিজামী থেকে সাইফুর সবাই বলতে লাগলেন, সাংবাদিকরা বাড়াবাড়ি করছে। এতো স্বাধীনতা ভাল নয়। কিন্তু মাসুদ মিয়ার কাজকর্ম যে প্রশাসনের লণ্ডভন্ড চেহারাটা তুলে ধরছে এটি বোধহয় কেউ কেউ বুঝতে পেরেছেন। কারণ, দাতারা বলাবলি করছে দেশে সুশাসন নেই। অবশেষে আইজি তাকে স্ট্যান্ড রিলিজ করেন। এবং তার বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মদদ দেওয়া' ক্রসফায়ারে ভয় দেখিয়ে উৎকোচ আদায়, চোরাচালানী দলের সঙ্গে সখ্য, দালালের মাধ্যমে অর্থ আদায় ও বদলির ভয় দেখিয়ে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। (ঐ. ১৩.৩)।

এখানেই কি এ কাহিনীর শেষ? না এর মাজেজা কি? পত্রপত্রিকায় পড়েছি, বাংলা ভাই ও তার গুরুরা দেশেই আছে। দাতারা টাকার ছাড় দিলে অথবা নির্বাচনের আগে তার কাজ কারবার শুরু হবে। পত্রপত্রিকার কারণে মাসুদ মিয়া এখন লায়াবিলিটি। প্রয়োজনে তাকে বিসর্জন দেওয়া হবে। যেমন-গডফাদাররা এখন বিসর্জন দিচ্ছে তাদের সন্ত্রাসী শিষ্যদের। আর পত্রপত্রিকার হাউকাউ কমে গেলে বিভাগীয় তদন্ত হয় থেমে যাবে নয়তো কিছু পাওয়া যাবে না। পত্রপত্রিকার চাপ অব্যাহত থাকলে তাকে চাকরিচ্যুত হয়তো করা হবে। তখন মাসুদ মিয়া বিএনপিতে জয়েন করতে পারেন এবং একজন ভাল বেনিফিশিয়ারিতে পরিণত হবেন। আর যদি কিছু অর্জন করে থাকেন তাও থেকে যাবে। লোকে বলে, বিএনপির সবচেয়ে বড় গুণ এরা উপকারীদের মনে রাখে এবং পুরস্কৃত করে। আওয়ামী লীগ উপকারীদের পুরস্কৃত দূরে থাকুক, সুযোগ পেলে লাথি মারে। উল্লেখ্য, বিভাগীয় তদন্ত শুরু হলেও মাসুদ মিয়ার প্রমোশন কিন্তু ঠিক আছে।

পুরো ঘটনার মাজেজা হলো, পুরো প্রশাসন এ ধরনের মাসুদ মিয়াতে ভর্তি। কেউ কাউকে মানছে না। সবাই মুক্ত পুরুষ। আজকের পত্রিকায়ই দেখুন- 'নিয়ন্ত্রণহীন রেলওয়ে ঃ কেউ কারও নির্দেশ মানে না।' (*যুগান্তর* ১৪.৩.০৫)।

ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে অত্যাচার-নিপীড়নের মাত্রা বাড়ছে এবং লুটের একটা মহোৎসব চলছে। জোটের নীতিনির্ধারকরা ভাবছে, এভাবে সবাই পুরস্কৃত হলে এরা নির্বাচনে তাদের জন্য লড়বে। কিন্তু সারা বিশ্বে কেন আমাদের কাছেই প্রমাণিত হচ্ছে আসলে এখন আর দেশে শাসন নেই, সুশাসন তো পরের কথা। প্রধানমন্ত্রী সেজেগুজে বক্তৃতা দেবেন এ পর্যন্তই। মাসুদ মিয়াদের মতো বিএনপির তরুণ নেতা, মন্ত্রীদের বোলচাল শুনুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন দেশে এখন কী অবস্থা

এবং কী অবস্থা হতে পারে। আজ প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ থাকতো, যদি এ রকম অসংখ্য মাসুদ মিয়ার সৃষ্টি না হতো, নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে ও আওয়ামী দমনের নামে জোটের কর্তাব্যক্তিরা মাসুদ মিয়াদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন। যে অব্যবস্থার সূচনা করেছেন তারা এদের সাহায্যে অচিরেই তা প্রলয়ঙ্করী হয়ে তাঁদের ভাসিয়ে নেবে। মাসুদ মিয়াদের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ঔদ্ধত্য, অভব্যতা একথাই প্রমাণ করে এবং এটা এখন পরিষ্কার যে, শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, প্রশাসন এখন তাদের হাতে জিম্মি। হয়তো মাসুদ মিয়ারা একমাত্র দায়বদ্ধ তারেক রহমানের কাছে। তিনি যে ভঙ্গিতে এখন আঙ্গুল উচিয়ে কথা বলছেন এবং যেভাবে সব কাউন্সিল করছেন এবং দেশজুড়ে মাসুদ মিয়ারা যা করছে তাতে মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই সাইফুর রহমান, মওদুদ আহমদদের, আমাদের কাতারে এসে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আর যদি ক্ষমতা চিরস্থায়ী না হয় তাহলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মাসুদ মিয়াদের কী হবে তা দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। জোটের শাসন করার টেকনিক অক্ষরে অক্ষরে তখন তাদের পালন করতে হবে বা করানো হবে। মাসুদ মিয়ারা তখন যা বানিয়েছেন তা নিয়ে কেটে পড়বেন? শুনে রাখুন, যে ভারতের ভিসা যে কেউ অনায়াসে পায় সে ভারতও সাদেক খানের মতো জাঁদরেলকে নাকি ভারত যাওয়ার ভিসা দেয়নি।

১৫ মার্চ, ২০০৫

গ্রেনেড-বোমার দেশে

মৌলবাদী জোট সরকার অনেকদিন থেকে বোধহয় চাচ্ছিল 'গিনেস বুক রেকর্ডস'-এ তাদের নাম উঠুক। গত বছর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার পর হয়তো তারা আশা করেছিল নাম এবার উঠলো বলে, অথচ ওঠেনি, এবার আগস্টে তারা সফল হয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে একই সাথে পাঁচশরও বেশি বোমা ফাটেনি। অনেকে এ ধরনের আলোচনায় আপত্তি করবেন। বলবেন, জোটের অর্ধেক মৌলবাদী হতে পারে, বাকি ৫০ ভাগ তো মৌলবাদী নয়। এ যুক্তি যারা দেয় জানবেন তারা জোটের পক্ষে। মানুষের শরীরকে দুই অংশ যদি করেন, দুটি একরকম হলে, জোড়া লাগালে তো মানুষ হবে। জামাতের এজেন্ডা, বিএনপির এজেন্ডা কি ভিন্ন? বোমাবাজির পর সব অংশ কি একইভাবে বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়নি?

৫০০ বোমা হামলার পরও কি কিন্তু সরকার কেন্দ্রীয় বোমাবাজদের ধরতে পারেনি। আপনাদের খেয়াল আছে কি না, রাজশাহীর পুলিশ প্রধান মাসুদ মিয়া বাংলাভাইয়ের সাথে মিলে কাজ করত। পত্র-পত্রিকায় হৈচৈ হওয়ার পর মাসুদ মিয়াকে খালি ট্রান্সফার করা হয়েছে। সরকার বা তাদের আইনি সন্ত্রাসী বাহিনীগুলো এতো লোককে অবলীলাক্রমে ধরে, আর ওদের পারছে না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অনেকে বলবেন, অনেকতো গ্রেফতার হচ্ছে। হচ্ছে, আবার ছেড়ে দেয়াও হচ্ছে। কতজনকে ধরা হলো আর কতজনকে ছাড়া হলো সে হিসাব কি আমাদের জানা? এতোসব ডামাডোলের মধ্যেও কিন্তু তাদের ভারতীয় অ্যাঙ্গেল দূর হয়নি। অবৈধভাবে বসবাসরত এক ভারতীয়কে ধরা হয়েছে। সে নাকি বলেছে, সব কিছুর সাপ্লাই এসেছে ভারত থেকে। অন্যদিকে জোট নেতারা খোলাখুলি বলেছেন, ভারত বোমা হামলার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। এ বক্তব্য থেকে কিন্তু এখনো তারা সরে আসেনি। জোট যে কিছু গ্রেফতার করেছে তার অন্য কারণ আছে। তাদের মুরুব্বী আমেরিকাকে বোঝানো, তারা মৌলবাদী নয়, মৌলবাদী কার্যক্রম তারা সমর্থন করে না। এ সার্টিফিকেট তো আগেই পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে। তাদের মতে, জামাত হচ্ছে সেক্যুলার পার্টি। এ যদি সেক্যুলার পার্টি হয় তা হলে নন-সেক্যুলার যে কী হবে তা ভাবতেই পারছি না।

অধিকাংশের মত স্বঘোষিত বোমা হামলাকালী জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) একটা ওয়ার্নিং দিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিগুলোকে,

সরকারকেও। ম্যাসেজটা হচ্ছে, আমরা শক্তিশালী কি না নিজেরাই বুঝে দেখ। সরকারের প্রতি ম্যাসেজটা হচ্ছে, আমরা দ্বিতীয় ফ্রন্ট আছি, ঠিক আছি কিন্তু আমরা আর তা থাকতে চাইছি না। প্রকাশ্য ক্ষমতার ভাগ আমরা চাই। অনেকে বলবেন, জেএমবিতো সরকারের প্রতিও হুমকি প্রদান করেছে। তাদের লিফলেটে লেখা হয়েছে-

"এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছে আল্লাহ বিরোধী শক্তি। কারণ যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র প্রধান এবং রাষ্ট্রের অন্য পরিচালকবর্গ নির্বাচিত হচ্ছেন তা একটি অনৈসলামিক পদ্ধতি। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে কোথাও প্রচলিত কাফির-মুশরিক বিরচিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি পদ্ধতির স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এসব পদ্ধতিই হচ্ছে আল্লাহর বিধানের প্রতিপক্ষ এক একটি ব্যবস্থা এবং কাফির-মুশরিক ও ইহুদি মস্তিষ্কপ্রসূত এসব বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে শুধুমাত্র মুসলিম আকীদা ও বিশ্বাসকে ধ্বংস করার মানসে। কাজেই এদেশের মুসলিম জনতার আজ ভাববার সময় এসেছে।"

উল্লেখ্য, সরকারের দায়সারা তদন্তেও প্রমাণিত হচ্ছে, জেএমবির'র অনেক সদস্য জামাতের সঙ্গে যুক্ত। এরা যদি সরকারের কোনো ফ্রন্ট না হতো তাহলে তো জোটের নেতারা তাদের বিপক্ষে বিবৃতি দিতেন। তাতো হয়নি। সে কারণে বলেছিলাম বিএনপি একটি মৌলবাদী দল। যারা তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের গন্ধ খোঁজেন তারা মতলববাজ।

শাহরিয়ার কবির বাংলাদেশে ৫৮টি ইসলামী মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাঁর মতে, 'এই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড অথবা আধা আন্ডার গ্রাউন্ড অবস্থায় সারাদেশে তৎপর রয়েছে। এই তালিকায় এদের মূল রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলাম শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন ইত্যাদির নাম অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি।

এদের অর্থনৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ়। আবুল বারকাত এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বার্ষিক নিট মুনাফা ১২০০ কোটি টাকা। এদের এনজিওর সংখ্যা ৪৫০। গড়ে প্রতিটি এনজিও মৌলবাদী দেশ ও গোষ্ঠী থেকে সরকারি হিসাবেও বার্ষিক ১০ কোটি টাকা করে পেলে তাদের আয় দাঁড়াচ্ছে ৪৫০০ কোটি টাকা। সর্বমোট ৫৭০০ কোটি টাকা। জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ৫ শতাংশ। অনেক বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদ বলতেন, এরা তেমন কোনো ফ্যাক্টর নয়। এগুলো এক ধরনের মিথ। যাদের আয় বছরে ৫৭০০ কোটি টাকা তারা কোনো ফ্যাক্টর নয়- একথা যারা বলে তাদের বিদ্যা-বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখা এখন মুশকিল। ওরা আসছে- না, চুপি চুপি নয়। ওরা জানান দিয়েই আসছে।

২.

ওরা আসছে। গন্তব্যে পৌঁছার যাত্রা শুরু করেছিল অনেক আগেই। তাদের পথটা গত এক দশকে সহজ করে দিয়েছে নীতিনির্ধারক, ক্ষমতাবান ও রাজনীতিবিদরা। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়, এসব লোকজন নিজেদের ভারি চালাক ভাবেন। আসলে প্রমাণিত হচ্ছে ওরা নির্বোধ অথবা তারা ওদের সঙ্গে জড়িত। ওরা যে আসতে পারে তা কিন্তু গত এক দশক ধরেই লেখালেখি হচ্ছে। ১৯৭৫ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান ও পরবর্তীকালে এরশাদের নেতৃত্বে এদের পথ চলা শুরু। প্রতিটি বিএনপি আমলে (অথবা সামরিক শাসনামলে) এরা আস্তে আস্তে বেড়েছে। একদশক আগে তারা গন্তব্য ঠিক করে চলা শুরু করেছে। গত এক দশক এদের বিরুদ্ধে জনমত ও জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন শাহরিয়ার কবির। যে কারণে তাকে দু'বার রিমান্ডে নিয়ে অত্যাচার করে জেলে নেওয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগ আমলে যখন শামসুর রাহমানের ওপর হরকতুলরা আক্রমণ করে তখন জামাত-বিএনপি কিছু বলেনি। পুলিশ আক্রমণকারীকে গ্রেফতার করে। কিন্তু তখনো নীতিনির্ধারকদের অনেকে আমাদের লেখালেখিকে অতিরঞ্জিত বলেছেন। এমন মন্তব্যও করেছেন অনেকে, কবি আবার পাবলিসিটির জন্য এগুলো করেননি তো! এরপর বোমা হামলা শুরু হতে থাকে। বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও সংস্কৃতসেবী এবং লেখকরা বারবার বলেছেন, সচেতন হোন, এরা বাংলাদেশকে গ্রাস করবে। তযখন ফরিদপুরে শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য পুঁতে রাখা বোমা আবিষ্কৃত হলো, তখন তৎকালীন নীতিনির্ধারকরা বললেন, না অবস্থা তো গুরুতর। কিন্তু সচেতন হয়ে তখন আর কিছু করার ছিল না। আওয়ামী লীগকে সরানোর জন্য তখন মঞ্চ প্রস্তুত। আওয়ামী নেতারা সেটি না বুঝেই পরম তৃপ্তিতে সেই মঞ্চে তখন সমাসীন। আমরা শুধু সান্ত্বনা পেতে পারি এ ভেবে যে, আওয়ামী লীগের সময় কিছু জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মনে রাখা দরকার জোটের সমর্থকরা তখন জঙ্গিবাদের কোনো সমালোচনা করেনি বরং বলেছে, ইসলাম বিপন্ন।

এই ওরা নানা নামে পরিচিত। মাঠপর্যায়ে এদের নাম হরকাতুল জেহাদ, তালেবান, জামাআতুল মুজাহিদীন, বাংলা ভাই ইত্যাদি। রাজনীতি বা প্রশাসনে পরিচিত সাকাচৌ, মান্নান ভূঁইয়া, নিজামী, মুজাহিদ, বাহাউদ্দিন বা আফতাব প্রভৃতি নামে। এ মন্তব্যে অনেকের আপত্তি হতে পারে, কিন্তু গত ১০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখবেন মূলত একটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যই এরা কাজ করছে। কাউকে হয়তো আদর্শ, আর কাউকে হয়তো অর্থ প্রণোদনা যুগিয়েছে, এই যা পার্থক্য। পর্যালোচনা করলে দেখবেন, গত এক দশক এদের সমস্ত হামলার লক্ষ্য

ছিল আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীর সমর্থক ও প্রগতিশীল লেখক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতি কর্মীরা। কখনো জোটের কোনো কর্মী বা সমর্থকের বিরুদ্ধে নয়। আলো লক্ষ্যণীয়, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা (অর্থাৎ আমলা, পুলিশ গোয়েন্দা) সব সময় বলেছে, এসব করছে আওয়ামী লীগ ও তাদের 'মদদদাতা' রা অথবা ভারত। গ্রেফতার করা হয়েছে ঐসব দলের নেতাকর্মী বা প্রগতিশীলদের। জামাত-বিএনপি জঙ্গিরা যতো হত্যা-সন্ত্রাস, বোমাবাজিই করুক না কেন তাদের বিরুদ্ধে কখনো কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযান চালানো হয়নি। গ্রেফতারও হয়নি তেমন কেউ। কাউকে কাউকে গ্রেফতারে বাধ্য করা হলেও পরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। রিমান্ডে নিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে। এ দিকগুলো যারা দেখেও দেখেন না অথবা নিজেদের নিরপেক্ষ দাবি করেন, তারা অবশ্যই জোটপন্থী অথবা মতলববাজ। এসব কথা এখন পরিষ্কারভাবে বলার সময় এসেছে। একজন মান্নান ভূঁইয়া, নিজামী বা শাইখ আব্দুর রহমানের মধ্যে তফাত কী? দাড়ি ও পোষাকের। এই সত্য মেনে নিলে পুরো বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। পার্থক্য যদি থাকে তাহলে তাদের ৩ জনের বক্তব্য এরকম হয় কেন? ১৮ আগস্টের যুগান্তর দেখুন, আমিনী, বায়তুল মোকাররমের খতিব, মুজাহিদ, মান্নান ভূঁইয়া সবার বক্তব্য এখন একই রকম। কেন? খতিব ওতো আরো এককাঠি সরেস। বলেছেন (অর্থাৎ ইঙ্গিত করেছেন) জামা'আতুল বোমাবাজির সঙ্গে জড়িত নয়। লোকটি এক সময় প্রকাশ্য জনসভায় বলেছিলেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা গাদ্দার।' জোট ও দক্ষিণপন্থী এস্টাবলিশমেন্ট ২০০১ সালে ক্ষমতা দখলের পর এথনিক ক্লিনজিং শুরু করেছিল। হিন্দুদের ওপর সুপরিকল্পিতভাবে নির্যাতন শুরু হয়। জঙ্গি সংগঠনগুলোকেও লেলিয়ে দেয়া হয়। কারণ তাদের মতে, আওয়ামী লীগ, বামপন্থী ও প্রগতিশীলরাও মুসলমান নয়। 'মুসলমান' নামধারী অমুসলমান। এই জঙ্গি নিজামী ও মান্নান ভূঁইয়াদের ইসলাম সম্পর্কে একটা পার্ভারসন আছে। তাদের বিবেচনায় পিছলেপড়া পাতলা রঙিন শিফন ও হীরক বা মুক্তার অলঙ্কারে রমণী হচ্ছে ইসলামের প্রতীক। আবরু রাখা, অলঙ্কারবিহীন নারী ইসলামের প্রতীক হতে পারে না। নিজামী ও আমিনীরা একসময় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল, নারী নেতৃত্ব হারাম। কিন্তু নারীর নেতৃত্ব ছাড়া এক কদম চলার মতো মুরোদও তাদের নেই। এরা মিথ্যাবাদীতো বটেই, এক ধরনের পার্ভারসনও কাজ করে তাদের মধ্যে। আর তাদের মুসলমানত্বের মাপকাঠি হলো কে কতোটা বেশি পাকিস্তানের গোলাম ও ভারতবিরোধী তা প্রমাণে। শান্তিচুক্তি করলে যদি ফেনী থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত ভারতের অধীনে চলে যায় (বেগম জিয়ার ভাষ্য) তাহলে বাংলাদেশে সেই ভারতীয় টাটা ১২ হাজার কোটি বিনিয়োগ করলে কিছু হয় না কেন? বেগম জিয়ার অ্যাপলস্টিকরা কী বলেন তা শুনতে আমরা আগ্রহী। এ ধরনের ইসলামী লোকের হাতে ইসলাম বিপন্ন- এ কথা বারবার বলা হচ্ছে। কাজ কিছুই হয়নি।

গত ৬ বছরে বড় ধরনের ৪৭টি বোমা হামলা হয়েছে। বাংলাদেশের বিশাল

গোয়েন্দা বাহিনী কোনো কিছু করতে পারেনি বা কিছু করতে চায়নি কারণ তারা পাকিস্তানিমনা ও দক্ষিণপন্থায় বিশ্বাসী। আর জঙ্গিদের মদদদাতা যে পাকি আইএসআই ও সৌদি আরব এ কথা আজ অজানা নয়। আওয়ামী লীগের আমলে, পাকিমনাদের মুখপত্র ইনকিলাবে ৬/৭ জন ডিজিএফআই প্রধান সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, এদেশের লেখক ও সংস্কৃতিসেবীরা ভারতের দালাল ইত্যাদি। তখন আমি ও মনিরুজ্জামান সংসদের প্রতিরক্ষা বিষয়ক কমিটিতে আবেদন জানিয়েছিলাম, এদের শুনানির। কী প্রমাণে এসব তারা বলেছেন জানতে। কমিটি রাজিও হয়েছিল। এরপর আওয়ামীল লীগ অপসারিত হয়। এ কারণেই হয়তো পরে আমাকে গ্রেপ্তার ও কিছুদিন আগে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কারণে) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আফতাব আহমদর 'দুর্নীতির' অভিযোগে আমাকে পার্লামেন্টারি কমিটিতে নিয়ে যায়। সাব-কমিটির চেয়ারম্যানের দুই আত্মীয়াকে আফতাব ইতোমধ্যে চাকরি দিয়েছিল [পত্রিকায় প্রকাশিত]। ব্যক্তিগত হলেও উদাহরণটি দিলাম এ কারণে, পাকিমনাদের নিয়ন্ত্রণ সমাজ ও রাষ্ট্রে কতোটা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বোঝাবার জন্যে। গোয়েন্দা দপ্তরগুলো প্রধানত বিএনপি ও জামাত সমর্থক। আত্মসন্তুষ্টি প্রবল হওয়ায় আওয়ামী লীগ তা বোঝেনি। সে সময়কার নীতিনির্ধারকদের অনেকের শিশুসুলভ ধারণা দেখে মনে হয়, এদেশে সবচেয়ে সোজা বোধহয় রাজনীতিবিদ হওয়া।

জোট আমলে বিশাল সব অস্ত্রের অবৈধ চালান শেখ হাসিনার ওপর হামলাসহ প্রায় ৫০টি বোমা ও গ্রেনেড হামলার জন্য দায়ী কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি গোয়েন্দারা। শাহ কিবরিয়াসহ আওয়ামী লীগের এমপি ও নেতাদের হত্যাকারীকে ধরতে পারেনি গোয়েন্দারা। বাধ্য হয়ে যে কয়জন জঙ্গিকে ধরা হয়েছিল তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে নিম্ন আদালত তাদের সম্পূর্ণ সহায়তা করে। ২০০১ থেকে এ পর্যন্ত আইনমন্ত্রী মওদুদ ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবরের কারণে ৭০ হাজারেরও বেশি ক্রিমিনাল ও জঙ্গিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পত্রিকায় দেখেছি বাংলাভাইকে মন্ত্রীরা আশ্রয় দিয়েছে। র‍্যাবের হাতে অনেকে মারা পড়লেও জঙ্গি কেউ ক্রসফায়ারে মারা পড়ে না। সেনাবাহিনীর অপারেশন ক্লিনহার্টেও একই অবস্থা। র‍্যাব সবাইকে খুঁজে পায় কিন্তু বাংলাভাই বা আব্দুর রহমানকে পায় না। এগুলো কেন হয় যদি কেউ বলেন বোঝেন না, তাহলে তাদের মাথায় মগজ পনু:স্থাপন করলেও কিছু হবে না। এসব দায়হীন হত্যা ও কোনো বিচারে না হওয়ার নিট ফল- সারা দেশে একযোগে ৫০০টির বেশি বোমা হামলা হয়, যা একটি বিশ্ব রেকর্ড।

এখনো বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। মুন্সীগঞ্জে পাওয়া গেছে ১০০টি বোমা। ৬৩ জেলায় বোমা ফেলা হয়েছে সকাল ১১টা থেকে ১১.৩০টা মধ্যে। এর আগের রাতে মুন্সীগঞ্জে মনসা মেলায় শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ৬৩টি

জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে কি পরিমাণ লজিস্টিক সাপোর্ট ও সংগঠন লাগে? সরকারি প্রশ্রয় ও সাহায্য ছাড়া এটি সম্ভব? ডঃ কামাল হোসেনও তাই বলছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বললেন, ১৪-১৬ তারিখে হামলা হতে পারে জানতেন কিন্তু ১৭ তারিখেরটা জানতেন না তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ১৪-১৬ তারিখের সম্ভাব্য দেশেই নেই। তারা কেন এ খবরটি দিতে ব্যর্থ হয়েছে? ৫০০ বোমা ফাটার পরও টিভিতে নীতিনির্ধারকদের কারো মুখে কোনো উদ্বেগ দেখিনি। বোমা হামলার সাথে সাথে ছাত্রদল আওয়ালী লীগকে দায়ী করে শেখ হাসিনা জবাব চাই- এ ব্যানার নিয়ে মিছিল করে। বক্তৃতায় আওয়ামী লীগকে দায়ী করে শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ মিছিল বেরুতে দেয়া হয়নি। আবার মান্নান ভূঁইয়ারা এও বলেছেন, বিরোধী দলের সহযোগিতা চাই। টিভিতে বলা হচ্ছে, খবরের কাগজ বলছে, এমনকি জামা'আতুল মুজাহিদীন বলছে-জামাআতুল বোমা হামলা করেছে। কিন্তু সরকার ও নীতিনির্ধারকরা বলছে আওয়ামী লীগ করেছে। চীন সফরত ঝলমলে পোশাকে সজ্জিত প্রধানমন্ত্রীকেও বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হয়নি। ছায়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চলে গেছেন সঙ্গী-সাথীসহ অবকাশ যাপনে কক্সবাজারে। পত্রিকার খবর অনুসারে, বিএনপি ক্যাডারদের ধর্ষণ ও লুণ্ঠন অব্যাহত আছে। চট্টগ্রাম জোটের পক্ষে মেয়র নির্বাচনে হস্তক্ষেপকারী পুলিশ কর্মকর্তা ইতোমধ্যে প্রমোশন পেয়েছেন। বরং শিক্ষামন্ত্রীর সামনে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে পুরস্কার না নেওয়ায় পুলিশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। এসব বিষয় কিসের ইঙ্গিত করে তা যদি কেউ বুঝেও না বোঝার ভান করে তাহলে কিছু বলার নেই। হ্যাঁ, বোমা হামলার জন্য কিছু গ্রেফতার করা হয়েছে। আগেও মাঝে মাঝে হয়েছে। ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখনো তাই হবে।

নীতিনির্ধারকদের মতে, আওয়ামী লীগ যদি এর সঙ্গে জড়িত থাকে তবে বলবো, ফালতু কথাবার্তা না বলে তাদের গ্রেফতার করুন। তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, আওয়ামী লীগের লোকজন এখন দাড়ি রেখে টুপি ও আলখেল্লা পরা শুরু করেছে। আওয়ামী লীগ নেতারা এতো বড় কাজে সমর্থ হলে বলব, আগামীকালই এই জালিমদের উৎখাত করা হোক। এসব লুটেরা, ধর্ষক, অকর্মণ্য, ফালতুরা পুরো দেশ বিপন্ন করে তুলেছে। বাজারে এখন দুটি মত প্রচলিত। এক. জোট দেশের পরিস্থিতি এমন করে তুলেছে যে এর কদর্য চেহারা আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। নির্বাচন স্বচ্ছ হলে এদের ঘটিবাটি সব হারাতে হবে। সুতরাং এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি কর যাতে বলা হবে বেসামরিক সরকার আর কিছু করতে পারছে না, সামরিক সরকার আসা দরকার। এরপর সামরিক সরকার আগে যেভাবে এদের ক্ষমতায় বসিয়েছে সেভাবে আবার বসাবে। তাহলে আপাতত ক্ষমতাসীনদের ক্রাইসিস

কাটবে। দুই. সন্ত্রাস করে ও সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দিয়ে অবস্থা এখন এমন হয়েছে যে, কাউকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না। ক্লায়েন্টরাই এখন ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছে।

ওরা আসছে, না, চুপি চুপি নয়। জানান দিয়ে আসছে যে, ওরা সুসংগঠিত ও সুসংহত। এমন কি তাদের মদদদাতারা চাইলেও কিছু করতে পারবে না। দ্বিতীয় ফ্রন্টে তারা থাকতে আর রাজি নায়। আমরা শুধু নই, বেগম জিয়াও এখন বিপদগ্রস্ত। তাঁর রক্ষকরাও।

ওরা চলে এসেছে গন্তব্যে। আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি সফল হয়েছে। ওরা আফগানিস্তান ও ইরাকে যা করেছিল, এখন এখানেও তাই করবে। তাদের অপারেশনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো মাত্র। অবস্থা কেমন? বিদেশীরা বাংলাদেশ ত্যাগ করছে। জোটের অ্যাপলজিস্ট পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার খবরগুলো পড়ুন। তারা ও তাদের অ্যাপলজিস্টরা এখন নানা কথা বলছে, বোমা হামলা হয়েছে কিন্তু ক্ষতিতো তেমন হয়নি। সুতরাং বিপদ কিছু নেই। আমাদের ভাত ছেড়ে কপি খেতে বলা হয়েছিল, ওরা আসছে, কপিও খেতে হবে না। নাইকো থেকে শুরু করে ব্যারিস্টার নীতিনির্ধারকের ১৫ আগস্টের কাঙালিভোজ লুট করা সব টাকা-পয়সা এখন চলে যাচ্ছে বিদেশে। তাদের ভিসাও তৈরি। এখন তারা আমাদের ঘাস খেতে বলে চলে যাবে। দেশের যা অবস্থা করে তারা যাচ্ছে তাতেও ঘাসও পাবেন না, ভিসা তো নয়ই। ওরা আসছে, শিফন শাড়ি, ব্যান্ড আর ফ্যাশন শো, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া আর হৈহুল্লোড় করার দিন শেষ। ও লেভেল এ লেভেল নয়, এখন মাদ্রাসাই হবে বাধ্যতামূলক। জোট সমর্থকদের পরিণতি এরকম হতেই বাধ্য বিশেষ করে যারা ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো লাফায়।

৩.

বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী বোমা হামলার তদন্তের ফলাফল যে অন্তিমে অশ্বডিম্ব হবে সে বিষয়টি এখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বোমা হামলার পর জোটের বিভিন্ন শরিক দলের নেতা, মন্ত্রী ও আমলাদের বিভিন্ন বক্তব্যে সেটি টের পাওয়া যাচ্ছে। ২১ আগস্টে বোমা হামলার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। তদন্ত শেষে নাকি জানা গেছে, জজ মিয়া নামক এক দিনমজুরই ২১ আগস্টের বোমা হামলার হোতা। গত ৪ বছরে অজস্র বোমা হামলা, গ্রেনেড হামলা, অস্ত্র চোরাচালান, এমপি হত্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যা ঘটেছে এক্ষেত্রেও তা ঘটবে। কেউ কেউ গ্রেফতার হলেও নিম্ন আদালত থেকে ছাড়া পাবে এবং মামলা ধামাচাপা পড়বে।

১৭ আগস্ট দেশজুড়ে বোমা হামলার পরপরই ছাত্রদল শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে দায়ী করে মিছিল করে। বিকেলে বিএনপি জনসভা করে শেখ হাসিনাকে দায়ী করে তাকে গ্রেফতারের দাবী জানায়। অন্যদিকে গণমাধ্যমে বারবার প্রচারিত হতে থাকে, বোমা হামলার স্থানগুলোয় যেসব লিফলেট পাওয়া

গেছে তার সব জামা'আতুল মুজাহিদীনের। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা বলছে, তারা জামা'আতুলের সদস্য এবং তারাই জড়িত বোমা হামলার সঙ্গে।

জামাতে ইসলাম, ইসলামী ঐক্যজোট প্রভৃতি তথাকথিত আধুলি-সিকি ইসলাম দলগুলো একই বক্তব্য রাখে। বোমা হামলার বিরুদ্ধে তাদের মিছিল-মিটিং করতে দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ করতে চাইলে তাদের লাঠিপেঠা করা হয়। কয়েকজন মন্ত্রী এর আগে বিরোধী দলের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। মনে হচ্ছে এর অর্থ আওয়ামী লীগ আলোচনায় এসে লাঠিপেটা খাক। জোটের অ্যাপলজিস্টরা, এমনকি কিছু কিছু বিদেশী কর্মকর্তাও বলা শুরু করেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের দোষারোপ বা কলহের কারণে বোমাবাজরা পার পেয়ে যাচ্ছে। এসব বক্তব্যে একটা ফাঁক আছে। কলহ কে করছে? গত ৪ বছরে, বোমাবাজদের ধরা হচ্ছে না, ধরলেও বিচার হচ্ছে না, কোনো গ্রেনেড হামলার বিচার হয় না এবং এর প্রতিবাদ করলেই বলা হচ্ছে কলহ। এসব 'বিজ্ঞজন' জোটের দ্বিতীয় ফ্রন্ট তা বলাই বাহুল্য।

বোমাবাজদের যে কিছু হবে না তার প্রমাণ ক্ষমতাসীনদের বিভিন্ন বক্তব্য। প্রধানমন্ত্রীর পর যে মন্ত্রী সবচেয়ে শক্তিশালী সেই মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, বোমা হামলার পিছনে আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। তিনি বলেন, 'এ ঘটনায় ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' সরাসরি জড়িত। এছাড়া ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (অর্থাৎ 'র') জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।' (*সংবাদ* ২১.০৮.০৫) জামাতিরা এর আগে জনসভায় বলেছিল, 'ঐসব বোমা হচ্ছে ভারতের এবং এ দেশের গোয়েন্দাদের সহযোগিতায় তা ব্যবহার করা হচ্ছে।'

সরকারের মুখপাত্র যখন এ ধরনের বক্তব্য দেন তখন তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। আওয়ামী লীগ যদি জড়িত হয় তাহলে কীভাবে জড়িত? এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের জোরালো ব্যাখ্যা চাওয়া উচিত। মোসাদ জড়িত তিনি জানেন কীভাবে? বাংলাদেশের কোন কোন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিজামীকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবেন। তদন্তের খুব একটা দরকার পড়বে না। তারা না পারলে, প্রধানমন্ত্রী তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই পারেন। অবশ্য সে হিম্মত কি আছে প্রধানমন্ত্রীর?

অন্যদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, কোনো দেশের জড়িত থাকার খবর তার জানা নেই। নিজামী যা বলেছেন, তা সরকারের বক্তব্য নয়। আর কে করেছে তাও স্পষ্ট নয়। সরকারের সোল এজেন্ট কি মোরশেদ খান? তার বক্তব্য যদি সরকারের হয় তাহলে নিজামীরটি হবে না কেন? মন্ত্রীর ক্রম অনুসারে তিনি নিজামীর অনেক নিচে।

এ প্রশ্নের জবাব কী দিতে পারবেন মি. খান? তার বক্তব্য লক্ষ্য করুন। জামা'আতুল মুজাহিদীন নয়, এখনো জানা যাচ্ছে না, বোমা হামলা কারা করেছে। আইজিপি কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, বোমা হামলায় জামা'আতুল মুজাহিদীনই জড়িত (*যুগান্তর* ২১.০৮.০৫)

এদিকে চারদল অর্থাৎ জোটের বৈঠকে ইসলামী দলগুলোর নেতা জানান, 'জাম' আতুল মুজাহিদীনসহ আরো যে সংগঠনগুলো বোমা হামলার সাথে জড়িত থাকার কথা বলা হচ্ছে তা সঠিক নয়। এরকম কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব আগে ছিল না, এখনো নেই। এই সংগঠনগুলোর ধারণার (ক্রিয়েটেড) জঙ্গিবাদী সংগঠন। একটি গোষ্ঠী বা সংগঠন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে।' তাহলে সরকার জামা'আতুল মুজাহিদীন নামে যে সংগঠনকে ২ বছর আগে নিষিদ্ধ করেছে তা কোন সংগঠন? যারা বোমা হামলা করেছে তারা বলছে তারা জামা'আতুল সদস্য। এরা বলছে না। উল্লেখ্য, জামা'আতুলের একটি বড় অংশ এসেছে জামাতে ইসলামী ও অন্য দলগুলো থেকে। উল্লেখ্য, এর আগে এরা ড. গালিবের বোমাবাজির নিন্দা জানিয়েছিল।

চারদলের অন্যতম নেতা, পান খেয়ে ঠোঁট লালকরা ফজলুল হক আমিনী পল্টন ময়দানে তালেবানি রাষ্ট্র ঘোষণা দেয়ায় বেগম জিয়া আগ্রহভরে তাকে জোটে নিয়েছিলেন। এতেদিনে জামাতের বিরুদ্ধে কথা বললেও এখন তিনি বলছেন, জামাতের সঙ্গে তাদের কোনো বিরোধ নেই। তিনি বলছেন, মাদ্রাসা-মক্তবের দিকে যেন সরকার রোষকষায়িত লোচনে না দেখেন। তিনি বিমানবন্দরে কয়েক মাদ্রাসা ছাত্রকে গ্রেফতারের ব্যাপারে গোয়েন্দা ও পুলিশকে দায়ী করে বলেন, 'তাদের ছেড়ে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী দলগুলোর নেতাকর্মীকে ধরুন, তাহলে বোমা হামলার সমস্ত ঘটনা বেরিয়ে পড়েব। (*জনকণ্ঠ*, ২০.০৮.০৫)। তারা নাকি টাঙ্গাইলের মিষ্টি কিনতে বিমানবন্দরে গিয়েছিল। টাঙ্গাইলের মিষ্টির দোকান সেখানে আছে এই প্রথম জানা গেলে। জনসভায় এরা বলছে, 'দেশব্যাপী বোমা হামালার ঘটনার দায়ভার ইসলামপন্থী দলগুলোর ওপর চাপানো হলে সরকারের জন্য বুমেরাং হবে।' (*সংবাদ* ২০.৮.০৫)। অর্থাৎ বেগম জিয়াকে সরাসরি হুমকি অথবা ব্লাকমেল। ২১ আগস্ট পর্যন্ত বক্তৃতা-বিবৃতি দেখে মনে হচ্ছে, সিদ্ধান্ত হবে যে, জামা'আতুলের কথা বলা হলেও এরা দোষী নয়, অন্য কেউ এদের দিয়ে হামলা করিয়েছে। সেই অন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং দেশে প্রমাণিত হবে যে এই 'ইসলামী' দলগুলোই সাহসী। তারা কিছু একটা করার ক্ষমতা রাখে।

মূল বিষয় হচ্ছে, তথাকথিত এসব ইসলামী দলের নেতারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেনি। মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল ভারত। সেই থেকে তাদের আক্রোশ আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী দলগুলোর বিরুদ্ধে। ভারত হচ্ছে পরম শত্রু।

অন্যদিকে জিয়াউর রহমান এদের রাজনীতিতে নিয়ে আসেন এবং সামরিক শাসকরা এদের ধারাবহিকভাবে সহায়তা করে। কারণ সামরিক কর্মকর্তারা ছিলেন পাকিস্তান ফেরত। শুনেছি, এখনো সেনা প্রশিক্ষণে শত্রু হিসেবে ভারতকে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং তাদের সহানুভূতি পাকিদের প্রতি। এসব কিছুর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। যে কারণে বাংলাদেশে যেকোনো ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় 'র'-কে 'আইএসআই' কে নয়। অথচ এটা অজানা কোনো কথা নয় যে, দুটি এজেন্সিই নিজ স্বার্থে এখানে সক্রিয়। এভাবে এসব বাংলাদেশবিরোধী নেতা, সেনা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে অলিখিত এক ঐক্য গড়ে উঠে। যে কারণে এ ধরনের অপরাধীরা ধরা পড়ে না।

১৯৭১ সালে কৃষ্ণ শ্মশ্রুধারী নিজামী ছিলেন আলবদর বাহিনীর প্রধান। এই আলবদররা পাকিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অজস্র ধর্ষণ, লুট ও খুন করেছে। আমার শিক্ষকদের খুন করেছে আলবদররা। সেই সময় প্রতিদিন একবার ভারতকে গালিগালাজ করে অন্ন গ্রহণ করতেন। এখন শুভ্র শ্মশ্রুধারী নিজামীকে দেখে কেউ তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমরা তো ইতিহাস ভুলতে পারি না। সুতরাং জানি নিজামীরা কী করবে। নিজামীরা মিথ্যে দিয়ে শুরু করবে। কোথায় ইসরাইল, কোথায় বাংলাদেশীদের সমস্যা নিয়ে কূল নেই তারা বাংলাদেশে বোমা বিস্ফোরণ করাবে। কল্পনারও একট দৌড় থাকে। এই নিজামী একসময় সংসদে বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বা ঘোষক কে সে বির্তকে জামাত জড়াতে চায় না। তবে একথা বলতে পারি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান' (*আজকের কাগজ,* ২৭.০৭.৯২)। আরো বলেছিলেন, 'দেশে সন্ত্রাস বিস্তারে বিএনপি চ্যাম্পিয়ন' (*বাংলার বাণী,* ২৭.১০.৯৩) তাই নয়, 'এই সরকারের (অর্থ বিএনপি) অধীনে ইসলাম তথা স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নয় (*ভোরের কাগজ,* ৭.৭.৯৪)। জামাত একবার বিবৃতি দিয়েছিল যে, নিজামী আলবদরের সঙ্গে জড়িত ছিল না। তথাকথিত দলগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য মিথ্যাচার, সুবিধা মতো স্থান পরিবর্তন। ধর্মের নামে তাদের এই মিথ্যাচার ও অপরাধীর পক্ষে সাফাই গাওয়া আমরা থামাতে পারব না যদি আল্লাহ পারেন। আমাদের সান্ত্বনা কোরআনে আছে- 'এদের আগে যারা এসেছিল তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাই তাদের ওপর শাস্তি কি কঠিন হয়েছিল (মুলক)। কোরআনে আরো আছে,- আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টকর শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী।' (আল-ই-ইমরান)।

এদের শক্তির প্রধান উৎস মাদ্রাসা। পশ্চাৎমুখী এই ব্যবস্থা কী তৈরি করেছে তা এখন পরিষ্কার। এদের রুটি-রোজগারের উৎসও তাই। মাদ্রাসা-মক্তব-মসজিদ এখন ধর্মের স্থানের বদলে ওদের কাছে বিশেষ স্বার্থের স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাকে

বলা যেতে পারে 'ভেস্টেড ইন্টারেস্ট'। পাকিস্তানেও এমনটি হয়েছে। গত ২৫ বছর ক্ষমতার সঙ্গে থেকে তারা বিশাল বিত্তের মালিক। অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতের মতে, তাদের বার্ষিক আয় ১২০০ কোটি টাকা। এ টাকা দিয়ে তারা এসব ক্যাডার পালন করে। এরা মাদ্রাসার ধ্বজাধারী হলেও এদের পুত্র-কন্যারা কেউ মাদ্রাসায় পড়ে না। এদের মূল কাজ ইসলামী নয়, বরং অর্থ ও ক্ষমতা যা আরো অর্থ ও ক্ষমতা এনে দেবে।

বেগম জিয়া যুদ্ধাপরাধী ও এসব দলকে নিয়ে ক্ষমতায় গেছেন। সামরিক বাহিনী এতে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছে। কয়েকদিন আগে এক সামরিক অফিসার যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চেয়েছিলেন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, ১৯৯৬ সালে বিএনপি যাতে জিতে সেজন্য তারা নির্যাতন চালিয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপি জেতেনি। সে কারণেই ২০০১-এর নির্বাচনে অত্যাচারের মাত্রা ১০০ গুণ করে বিএনপিকে ক্ষমতায় আনা হয়েছে। একথা কেউ আগে বিশ্বাস করেনি। এখন করছে। সেই নির্যাতনকারীকে আমেরিকা ছাড়তে হয়েছে। জোট গত ৪ বছর ধরে ধর্ষণ-লুট সমানে চালাচ্ছে। সরাসরি তারা জঙ্গিদের প্রশ্রয় দিয়েছে যাতে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীদের শায়েস্তা করা যায়। এ কারণে তারা জঙ্গিদের মদদ দিয়েছে বিভিন্নভাবে। 'কয়েক বছরে পাঁচ শতাধিক জঙ্গি গ্রেফতার হলেও প্রশাসনের নমনীয় ভূমিকার সুযোগে বাংলা ভাইসহ জঙ্গিদের সমর্থকরা ছাড়া পেয়ে গেছে কারণ '১. মামলা সাজানো হয় দুর্বলভাবে, ২. নষ্ট করা হয় মামলার আলামত, ৩. সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় নেই। ৪. ৬ বছরে পাঁচ শতাধিক গ্রেফতার ও মুক্ত।' (*প্রথম আলো* ২১.৮.০৫)। শুধু তাই নয়, পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তারা বলেছেন, 'জঙ্গি তৎপরতার খবরকে সরকার এতোদিন 'গণমাধ্যম'- এর অপপ্রাচার কিংবা বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখে আসছিল। জোট সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও শরিক দলের নেতারা প্রকাশ্য বক্তৃতা-বিবৃতিতেও এসব কথা বলে আসছিলেন। ফলে পুলিশও জঙ্গিদের ব্যাপারে জোরালো কোনো পদক্ষেপ নিতে সাহস পায়নি। এখন কি অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে?

সরকারী নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি পড়ে কী মনে হয়? পত্রিকার খবর অনুযায়ী, 'সারা দেশে একযোগে নজিরবিহীন বোমা হামলার তদন্ত কাজ ভিন্ন খাতে ঘুরিয়ে দেয়া হচ্ছে। স্তিমিত হয়ে পড়ছে। হামলার ঘটনার প্রধান সন্দেহভাজন ইসলামী জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদীনের সদস্যদের গ্রেফতার অভিযান।' (*জনকণ্ঠ*, ২০.৮.০৫)। ইতোমধ্যে পার্বতীপুরে ২ জামাত কর্মীকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামেও একই ঘটনা ঘটেছে। নিজামী দাবী করেছেন টুপি দাড়িঅলা কাউকে ধরা যাবে না। তারা বোমা মারলেও। আমার এক বন্ধু জানালেন এক কর্মকর্তা তাকে জানিয়েছে, আমাদের অর্ডার পেয়ে গেছি। জঙ্গিদের আর ধরা যাবে

না। ধরতে হলে অন্যদের ধরা হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাভাইয়ের কথা মনে পড়ছে। বাংলাভাই যখন উত্তরাঞ্চলে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করছিল তখন নিজামী-আমিনীরা বলেছিল, বাংলাভাই মিডিয়ার সৃষ্টি। বেগম জিয়া বাংলাভাইকে গ্রেফতারের হুকুম দিলেন বারবার। যে প্রধানমন্ত্রীর পদভারে বাংলাদেশ কাঁপে থরথর করে তিনি এতোবার হুকুম দিলেও বাংলাভাইকে কেন ধরা হয় না? এর অর্থ, তিনি বলার জন্য বলেন যা ইতোমধ্যে প্রমাণিত। অথবা তিনি এক পুতুল সরকারের প্রধান। এখন একটাই সমস্যা, দেশে যে জঙ্গি নেই তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

আগেই উল্লেখ করেছি, দেশে এখন একটি প্রচলিত মত, জোট প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীকে ডেকে আনবে। এটি জোটের বক্তব্য নয়। হাওয়ায় ভেসে আসা কথা। তবে, হাওয়াই কথারও যেন খানিকটা ভিত্তি আছে বলে মনে হয়।

হাইকোর্ট পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণার পর, মধ্যরাতে বিচারকের ঘুম ভাঙিয়ে সরকার সে রায় স্থগিত করিয়েছিল। যদি জোট সামরিক বাহিনীর পক্ষে অর্থাৎ সামরিক শাসনের বিপক্ষে, তাহলে এতো চিন্তিত কেন? পঞ্চম সংশোধনী ছিল সামরিক বাহিনীর অপকীর্তিগুলো ঢাকা দেয়ার রক্ষাকবচ। শুধু তাই নয়, পরদিন দেখা গেল, এসবির লোক রায় দেয়া বিচারককে এজলাস থেকে নামিয়ে এনেছে। রোকনউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, বিকেলে আদালত ত্যাগ করার সময় তিনি র‍্যাবের গাড়ি দেখেছেন আদালতে। এ ধরনের অভূতপূর্ব ঘটনা পাকিস্তানী আমলেও ঘটেনি এবং প্রত্যেকটি ঘটনা একই যোগসূত্রে গাথা কি না তাই বা কে জানে?

একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। উপমহাদেশের যে কোনো দেশে যে কোনো ধরনের জঙ্গিবাদ অন্য দেশে অভিঘাত সৃষ্টি করবে। রাজনীতিবিদদের অঙ্ক অন্য রকম। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার সিভিল সমাজ এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হলে কয়েক জেনারেশনকে এর মাশুল দিতে হবে। ভারত ইতোমধ্যে বলেছে, সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক দেশ না হলে অগ্রগতি সম্ভব না। পাকিস্তানে মোশাররফও মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করেছেন। বাংলাদেশী পাকিরাতো সেটিও অনুসরণ করতে পারেন। পাকিস্তানের মতো দুর্বৃত্ত দেশ যা বুঝেছে বাংলাদেশ তা বুঝছে না। এখানকার বর্তমান নীতিনির্ধারকরা কী জিনিস এতেই বোঝা যায়। এটা স্পষ্ট যদিও তার প্রশ্রয়দাতারা উপমহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব চায় না এবং মুসলমান ছাড়া কাউকে তারা মানতে রাজি নয়। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে নিজামী-আমিনী, তারা সার্ক সম্মেলন চাচ্ছেন না। ভারতকে বোমা হামলার জন্য দায়ী এর উদাহরণ। ভারত যতোক্ষণ বিষয়টি পরিষ্কার না করবে বা বাংলাদেশের কাছে এর প্রমাণ না দাবি করবে ততদিন মন্ত্রী নিজামীর বক্তব্যই সত্য থাকবে। বাংলাদেশে এ ধরনের

প্রশ্রয় দক্ষিণ এশিয়ার জন্য বিপজ্জনক কি না তা অন্য দেশগুলোর বিবেচনা করতে হবে। আমাদেরও সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ ধরনের ধর্ম ব্যবসায়ী, টাউট খুনি, মিথ্যাবাদী, প্রতারকদের হাতে জিম্মি থাকব কি না। বেগম জিয়া এতে আনন্দ পেতে পারেন, আমরা পুলকিত কি না তাও অনুধাবন করার সময় এসেছে।

ওরা আসছে, জোট এখন নিন্দিত। তাদের সেকেন্ড ফ্রন্ট হিসেবে গড়ে তোলা বাংলাভাই, শাইখরা আসছে। বাংলাদেশ আর থাকবে না। আমরা যারা বাংলাদেশে থাকতে চাই, যারা সেনা, গোয়েন্দা ও জোটের নীতিনির্ধারকদের দুর্বৃত্তায়ন থেকে বাঁচতে চাই। তারা তাদের রাজনৈতিক সূক্ষ্ম হিসাব বাদ দিন। একাট্টা হয়ে কর্মসূচী দিন। কাঁদুনি না গেয়ে রাস্তায় আসুন। লোকের অভাব হবে না। না হলে এর দায়-দায়িত্ব আপনাদের ওপরও বর্তাবে।

জুলাই, ২০০৫

সাকাচৌ'র বিশাল গোস্‌সা

সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ওরফে সাকাচৌ কয়েক মাস অন্তর অন্তর প্রচার মাধ্যমে আসতে চান। হয়তো পড়েছিলেন, না পড়াশোনা না করলেই এদেশে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হয়। হয়তো শুনেছিলেন একজন রাজনীতিবিদ বলেছিলেন, প্রচারে থাকতে চাই, সেটা পক্ষে না বিপক্ষে, তা বড় কথা নয়। সাকাচৌ প্রচারে থাকতে চান। তবে তার পেছনে কখনও কখন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। মিডিয়ায় জোটের কর্মকাণ্ডের জন্য যখন নেতারা চাপে থাকেন তখন সাকাচৌ বা সে ধরনের কেউ এমন অশালীন উক্তি করেন, যাতে মিডিয়া ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তা নিয়ে মেতে থাকে। মূল ইস্যু আড়ালে চলে যায়। সাকাচৌ শালীন ভাষায় কথা বলতে পারেন না। আমাদের দেশে এখনও একটা কথা আছে। বিয়ের আগে মুরব্বিরা বলেন, গরিব হলেও চলবে, খানদান ভাল হতে হবে। একজনের আচার-আচরণ বুঝিয়ে দেয় তার খানদান কেমন! সাকাচৌর আচরণ বুঝিয়ে দেয় কেমন পরিবার থেকে তিনি এসেছেন। তবে শুধু পরিবার নয়, সাকাচৌ'র এ ধরনের কথাবার্তার পেছনে কাজ করে গোসসা, ভীষণ গোসসা। কেন পাকিস্তান ভাঙল? এই পাকিস্তানের জন্য সাকাচৌ ও সাকাচৌর বাবা কী করেননি। ১৯৭১-এ খুনের দায়ে সাকাচৌর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, তাকে যুদ্ধাপরাধী বলা হয়, যে কারণে পাকি সমর্থনেরও পরও তিনি ওআইসিতে ভোট পাননি। কিন্তু তাকে বাংলাদেশে থাকতে হচ্ছে, থাকতে হচ্ছে, কারণ এখানে রাজনীতিবিদরা তাকে যেমন প্রশ্রয় দেন অন্য দেশে তা পারেন না, যে সম্পদ তিনি অর্জন করেছেন তাদের দোয়ায় তা বিদেশে হতো না। আসলে জিয়াউর রহমান না থাকলে নিঃস্ব ও ভবঘুরে অবস্থায় তাকে বিদেশে কাটাতে হতো। ভাগ্যিস হাইকোর্ট বর্ণিত অবৈধ দখলদার জিয়াউর রহমান ও এরশাদ ছিলেন। ভাগ্যিস জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনী করেছিলেন। সাকাচৌরা বহাল তবিয়তে রয়ে গেলেন বাংলাদেশে, সৃষ্টি করলেন এক ভায়োলেন্ট সমাজ, যেখানে তারাই থাকবেন অধিপতি।

বাংলাদেশ, বাঙালি, যা শুভ তার বিরুদ্ধে সাকাচৌ। এরই মধ্যে তিনি অনেকের বিরুদ্ধে, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্তর্গত, অশালীন মন্তব্য করেছেন। এরপর করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে। আমি তার মন্তব্যের কারণে এ লেখালিখতে বসিনি, লিখছি এর অন্য প্রাসঙ্গিকতা দেখে। এতে বোঝা যাবে,

আমরা যাকে এলিট সমাজ বলি, তাদের সদস্যরা কেমন, রাজনীতির বিষয় কী ইত্যাদি।

ঘটনাটি হল, সাবেক জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম চট্টগ্রামে ডাক্তার তৈরির একটি বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছেন, যার নাম সংক্ষেপে ইউএসটিসি। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন গণ্ডগোল চলছে। কিন্তু ছাত্রকে বহিষ্কার হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধি দল সাকাচৌ'র সঙ্গে দেখা করে। কারণ? তাদের হয়তো মনে হয়েছে, বহিষ্কৃতদের পেছনে আছেন সাকাচৌ এবং ডা. ইসলাম যেহেতু সে পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল, সুতরাং সমস্যার অবসান হবে। সাকাচৌ তাদের যা বলেছেন তার নির্যাস হল-১. বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে প্রথম দুটি শব্দ বাদ দিতে হবে, কারণ 'বঙ্গবন্ধুর নাম কবরে দেয়ার জন্য আমি বেঁচে আছি'। (*যুগান্তর* ১.৯.০৫) ২. ডা. ইসলাম বেশি ঝামেলা করলে তাকে 'উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। ৩. বহিষ্কৃত ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ বাতিল না করলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলতে থাকবে।

এ খবর প্রকাশিত হওয়ার পর পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি এবং মিছিল বক্তৃতা শুরু হয়েছে। অনেকে ডা. ইসলামের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে চাইছেন। আমি জানি না মিটিং-মিছিল থেকে যাকে 'বেয়াদপ' বলা হচ্ছে তাকে শায়েস্তা করতে জানে না রাজনৈতিক কর্মীরা? আফতাবকেও বেয়াদব বলা হতো। তার অবস্থা এখন কী? অন্যদিকে ডা. ইসলাম কোনভাবেই আমাদের সহানুভূতি পেতে পারেন না। কেন নয়, সেটি পরে বলছি।

সাকাচৌ'র বক্তব্যে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বাংলাদেশ পাকিস্তান হচ্ছে না, এখনও বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলা যাচ্ছে না, তার গোস্‌সা হবেই। তাছাড়া তার পুরনো রাজনীতি এবং তিনি যে দল করেন তার রাজনীতির মূল বিষয়ই তো তা। অবৈধ উৎখাতকারী ও তার ল্যাঙটদের দর্শন যদি এটি না হতো এবং হলেই বিস্মিত হতে হতো।

তার আগে দেখা দরকার সাকাচৌ এমন কথা বলার সাহস রাখেন কীভাবে? কেনইবা রাজনীতিবিদরা দু'একদিন তার বক্তব্যের বিরোধিতা করে চুপ করে থাকেন? বেগম জিয়া সম্পর্কে ২০০১-এর নির্বাচনের আগে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, আমি জোটের দর্শনের বিরোধী সত্ত্বেও সে মন্তব্য করব না। এরপর সাকাচৌ বিএনপির টিকিটে এমপি হয়ে উপদেষ্টা হয়েছেন। বেগম জিয়ার সঙ্গে বাতচিত করেছেন। আমাদের রাজনীতিবিদদের নির্লজ্জতার এটি একটি প্রমাণ। অনেকে বলেন রাজনীতিতে শেষ কথা নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি তা সুবিধাবাদী রাজনীতির কথা। আর রাজনীতির লজ্জা-শরম থাকবে না, এটি কেমন কথা? তাহলে তরুণদের আমরা কী মেসেজ দিচ্ছি? এখানেই শেষ নয়। সাকাচৌ

পর্নোগ্রাফির ভাষায় শেখ হাসিনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তখন আওয়ামী লীগ শুধু নয়, সিভিল সমাজের অনেকেই এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তারপর দেখা গেল ছেলের বিয়ের দাওয়াত দেয়ার জন্য তিনি শেখ হাসিনার গৃহে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন এবং শেখ হাসিনা তাকে সাক্ষাৎ দিয়েছেন। যারা সাকাচৌর উক্তিতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাদের অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? প্রধান দু'দলের এবং অনেক বাম নেতার সঙ্গে নাকি সাকাচৌর ওঠাবসা ছিল। এখনও আছে কিনা জানি না। সাকাচৌ কি খুব শক্তিশালী? তার দেদার অর্থ আছে, অনুচর আছে এবং এখানে রাজনীতি যেহেতু অর্থ ও পেশিচালিত, সে কারণে তাকে শক্তিশালী পুরুষ বলেই অনেকে মনে করেন। কিন্তু শেখ হাসিনার আমলের শেষ পর্যায়ে যখন খুনের দায়ে সাকাচৌকে গ্রেফতার করে থানা হাজতে রাখা হল তখন তার ভেউ ভেউ করে কান্নার ছবি কি কাগজে ছাপা হয়নি? তখন কেউ তাকে রক্ষায় এগিয়ে আসেনি বটে কিন্তু তখনকার নীতিনির্ধারকরা কী কারণে যেন তাকে ছেড়ে দেন। সুতরাং শক্তিশালী নন তিনি, ওই অর্থে কিন্তু শক্তিশালীদের ওপর দয়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের তিনি বাপ-মা তুলে গালাগাল দেন এবং তাদের গোসসা চায় না, তারা তাকে প্রশ্রয় দেন। এই নার্ভাসনেসের কারণ আমাদের জানা নেই।

এবার ডা. নূরুল ইসলাম প্রসঙ্গ। শোনা যায়, মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য অনেকের কাছ থেকে তিনি বিশাল অনুদান পেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য। এই অর্থ নিয়ে অনেক কথা চালু আছে, যা একেবারে অর্থহীন নয়। সেসব বিষয়ে আমি যাব না। সবাই আশাবাদী ছিল তার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে। ভাল হতো তিনি যদি তরুণ কাউকে বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর ভার দিতেন। দেননি। অশীতিপর ডা. ইসলাম উপাচার্য হলেন। সেই থেকে ইউএসটিসিতে ঝামেলা হচ্ছে এবং পারতপক্ষে কেউ সেখানে ভর্তি হতে চায় না বিদেশী ছাত্ররাও চলে যাচ্ছে।

শেখ হাসিনার আমলে তিনি আত্মজীবনী লেখেন। সেখানে তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তারপর সে বই পৌছে দিয়েছেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। এরপর জাতীয় অধ্যাপক হয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের নামকরণ করেছেন বঙ্গবন্ধুর নামে।

প্রায় একই সময় বা তার খানিক আগে তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য। সেখানে সাকাচৌর বাবা ফজলুল কাদের চৌধুরী ওরফে ফকাচৌর ওপর শোক প্রস্তাব তুলে ঘন্টা কয়েক লড়াই করেছেন সে প্রস্তাব পাস করার জন্য। সেজন্যই তিনি আশা করেছিরেন সাকাচৌ তাকে সমর্থন করবেন।

শেখ হাসিনার সময় শেষ হয়। চট্টগ্রামে ১৯৭১ সালের বৃহৎ বধ্যভূমি পাহাড়তলী বধ্যভূমিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা নিলেন। সে জায়গায় স্থাপন করলেন 'শহীদ জিয়াউর রহমান'-এর নামে আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। ওই সময় প্রজন্ম

৭১-এর সভাপতি ও আদি সন্তান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান গাজী সালেহউদ্দিন এর প্রতিবাদ করেন, এলিট সমাজের দ্বারে দ্বারে ঘোরেন, যাতে বধ্যভূমিতে স্থাপনা না করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষের এলিট সমাজ তাকে সহানুভূতি জানায়নি। অধ্যাপক সালেহউদ্দিনকে বরং কর্তৃপক্ষ থেকে ভাল রকমের একটা -- দেয়া হয়েছিল। শহীদের সন্তান সেই টোপ গেলেন কীভাবে? উদাহরণ দিলাম এ --- যে আমরা কী বলি আর কী করি। আমরা কাদের সম্মান করি? বা শ্রদ্ধা জানানোর কি আর আছে সমাজে? আমরা কোথায়, নেমে যাচ্ছি তা বোঝানোর জন্যই এই উদাহরণ দিলাম।

সুতরাং সাকাচৌ'র বক্তব্যের প্রতিবাদ করবেন, তা ডা. ইসলামের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করবেন না? আগেই বলেছি, সাকাচৌ কিছু না ভেবে এ উক্তি করেননি। চাটগাঁয় বিএনপি নেতা জামালউদ্দিনের হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে। হত্যার কথা যারা স্বীকার করেছে তারা বলছে, বিএনপি এমপির ভাই হত্যার জন্য টাকা ও নির্দেশ দিয়েছে। র‍্যাব বলছে, বিষয়টি অস্বচ্ছ। তাই তারা নিশ্চিত নয় এমপির ভাই-ই জড়িত কিনা। অথচ ক্রসফায়ারের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। অন্যদিকে মৌলবাদী সরকারের প্রশ্রয়ের বোমাবাজিতে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ছায়া ও ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী তারেক জিয়া বলছেন, বোমাবাজদের সঙ্গে আল কায়দার সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। পরে তিনি তা অস্বীকার করেছেন। এ বিষয়টি এতদিন সরকার অস্বীকার করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, সর্বহারা ও জেএমবি একত্রে এ কাজ করছে। জোটের দিশেহারা অবস্থা সবার চোখে পড়ছে। মিডিয়াও পরম উৎসাহে এসব তুলে ধরছে। সাকাচৌ এ সময় এ উক্তি করলেন যাতে হৈচৈটা তাকে নিয়ে হয়। হয়েছেও, তবে জোট প্রতিদিন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে তাতে সাকাচৌ আগের মতো সুবিধা করতে পারেনি। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে জোট নেতাদের দারুণ গোসসা। কেন তারা তাদের 'ম্যান্ডেট' দিয়েছিল– এটাই কারণ।

খবরের কাগজে প্রতিদিন দেখছি বিশাল কোম্পানি থেকে ক্ষুদ্র কোম্পানি সব মালিকরা খাবারে বিষ মেশাচ্ছে, ভেজাল মেশাচ্ছে, একটি জাতিকে হত্যা করছে। এই নিঃশব্দ হত্যাকারীদের কয়েক টাকা জরিমানা করা হচ্ছে মাত্র। স্বয়ং আইনমন্ত্রী ফাঁসির আসামীকে মুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেন। গোয়েন্দারা হাইকোর্টের আসন থেকে বিচারপতিকে নামিয়ে আনে। নিত্যদিনের লুট, ধর্ষণ, হত্যার কথা বাদ দিলাম। সরকারি আইনি বাহিনী নিত্য সন্ত্রাস করছে। একবার ভেবে দেখুন, রাজনীতি কোথায় চলে গেছে, আমরা কত অমানুষ ও নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছি। এই দেশটির পরিণতি কী, তাও বোঝা যাচ্ছে।

তারপরও মানুষ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকে, আন্দোলনে আসে না কেন? এ ক্ষোভ

আমাদের অনেকের। কারণ, সেই আস্থার অভাব। সাকাচৌদের তারা চেনে। মান্নান ভূঁইয়ার মতো যাদের প্রতি অনেকের মোহ ছিল তারাও মান্নান ভূঁইয়াদের এখন হাড়ে হাড়ে চেনে। আগস্ট মাসে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু পরিষদের বিশাল শোকসভা হল। সেখানে বিশিষ্ট বক্তা ডা. নুরুল ইসলাম। মানুষ এতে কী সিগন্যাল পায়? আমরা একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গবন্ধু বা তার সময়কালকে বিচার বিশ্লেষণ করার সময় যদি সামান্য সমালোচনা করি তখন শীর্ষস্থানীয় নেতারা ক্রোধে বাকরহিত হয়ে যান। আর বধ্যভূমিতে (আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী) জিয়াউর রহমানের নামে (যাকে আওয়ামী লীগ মনে করে অবৈধ উৎপাতকারী) হাসপাতাল যিনি করেন তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় শোক দিবসে বক্তৃতা দিতে। আওয়ামী লীগের কেন বিশাল গোস্‌সা হয় না? তাদের না হলে আমাদের মতো দর্শকদের গোসসা হবে কী করে? সাকাচৌ এত দারুণ গোসসায় ফেটে পড়েন, প্রতিপক্ষের কেন তার চেয়ে তীব্রতর গোসসা হয় না? আমরা কি সব বিশ্বাসের জায়গাগুলো নষ্ট করে ফেলছি? এ নিয়ে কি আমাদের ভাবার সময় এসেছে?

জঙ্গিরা এ দেশে থাকবে

মিডিয়া এখনও ক্লান্ত হয় নি। ইসলামী জঙ্গিদের খবর নিত্য বেরুচ্ছে। মাঝে মাঝে হেড লাইন হয়ে, টিভিতেও আসছে। জোট সরকার যাকে বলে গ্যাঁড়াকলে পড়েছে। একসঙ্গে ৫০০ বোমা ফাটানোর ব্যাপারটা বেশি বেশি হয়ে গেছে। জোট যে এদের বিরুদ্ধে সক্রিয় এখনও এ ধারণাই সৃষ্টি করতে চাচ্ছে, তারা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে খুবই তৎপর। জোট সরকার গত চার বছরে দেশের যে ভয়ঙ্কর ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছে, তা থেকে বেরুতে হলে খানিকটা তৎপরতা দেখাতেই হয়। এরই সূত্র ধরে তারা দুই জঙ্গি নেতা শায়খ আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আপনারা ভাবছেন, সরকার খুবই সিরিয়াস, হা হা হা। লিখেছিলাম, যা মানতে অনেকে অরাজি যে, এ দেশের ৪০ ভাগ লোক এখন জঙ্গিবাদের সমর্থক। এ ধরনের মন্তব্য অনেকের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। রাজনৈতিক নেতারা প্রায়ই বলেছেন, জঙ্গিবাদ এখানে সমস্যা নয়, দেশের লোক ধর্মান্ধ নয়, ইতাদি ইত্যাদি। তাই যদি হয়, তাহলে আর পুরস্কার ঘোষণা কেন, আর ফরহাদ মজহারও কেন জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে বলবেন মুক্তিযোদ্ধারাও সন্ত্রাসী। যেমন, এ রকম বলেন বায়তুল মোকাররমের খতিব, মুক্তিযোদ্ধারা গাদ্দার। জঙ্গিবাদকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে গত এক দশক ধরে। গত পাঁচ বছরে এ প্রশ্রয় পৃষ্ঠপোষকতায় রূপ নিয়েছে। মৌলবাদী দল, রাজনৈতিক নেতা, কিছু পত্র-পত্রিকা ও বুদ্ধিজীবী এবং প্রশাসনের সাহায্যে জঙ্গিবাদের বিকাশ ঘটানো হয়েছে। সে কারণে বাংলাদেশে মৌলবাদ-জঙ্গিবাদের প্রতি সমর্থন আছে, থাকবে এবং যে সরকারই আসুক, তারা এ মানুষ যদি জঙ্গিবাদের বিপক্ষে শূন্য সহিষ্ণুতা বা জিরো টলারেন্স না দেখায় তাহলে এ থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই।

বলতে চাই, জঙ্গিবাদ নিয়ে চলছে এ দেশে তা একেবারে ভাঁওতাবাজি। জঙ্গিবাদের বিকাশের সময় থেকে কিছু পত্রপত্রিকা বাদে অধিকাংশ পত্রপত্রিকা এদের খবর তুলে ধরেছে এবং এর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে লেখালেখিও হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এর গুরুত্ব দেননি। বলেছেন, এগুলো মিডিয়ার অতিরঞ্জন। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, প্রান্তিক দুটি সংগঠন-নির্মূল কমিটি ও কমিউনিস্ট পার্টি একমাত্র এ ব্যাপারে ছিল সোচ্চার। আওয়ামী লীগ আমলের শেষ দিকে সরকারের খানিকটা টনক নড়ে। জঙ্গি নেতা মুফতি হান্নানকে গ্রেফতার করা হয়। জোট সরকার ক্ষমতায় এলে ৭০ হাজার সন্ত্রাসীকে ছেড়ে দেয়। যার মধ্যে

জঙ্গির সংখ্যা ছিল না।

এ পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বলতে চাই-জঙ্গি, জঙ্গিবাদ থাকবে। আমার মন্তব্য এখানে বেশি থাকবে না, তবে ২০০১ থেকে এ পর্যন্ত নীতিনির্ধারকদের মন্তব্যের উল্লেখ থাকবে-এ প্রতিপাদ্যের প্রমাণ হিসাবে।

প্রথমে স্বীকার করে নেয়া ভাল, জোট মৌলবাদী তা বটেই, জঙ্গিবাদও। জামায়াতী ও ইসলামী ঐক্যজোটের কয়েকটি অংশ মৌলবাদের বিশ্বাসী। একথা তারা অস্বীকার করে না। তাছাড়া জামায়াত যুদ্ধাপরাধীদের দলও বটে। তাদের সঙ্গে যারা জোট করে বা করবে এ কথা জেনেই করবে। অনেকে, বিশেষ করে বিএনপির সমর্থকরা এটি মানতে রাজি হবে না। বিএনপির সাদা গলাবদ্ধ বা ভদ্রলোকরা এ মন্তব্যে বিব্রতবোধ করেন কিন্তু গত কয় বছরে সরকারি নীতি রচনা করেছে জোট এবং কার্যকরও করছে তারা। শুধু তাই নয়, এক সময়ের লেফটিস্ট মান্নান ভুইয়াও যুদ্ধাপরাধী বলে আখ্যায়িত নিজামী বা ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? রাশেদ খান মেননও লিখেছেন, 'বিএনপি যদি ধড় হয়, জামায়াত এখন তার মাথা' (*যুগান্তর*, ১৮.৯.০৫০। এখন পরিষ্কার যদিও ২০০১ সালেও কমিউনিস্টরা স্বীকার করেনি যে, তৎকালীন সেনাপ্রধান জে, হারুনের কর্তৃত্বাধীন সেনাবাহিনী প্রাণভরে পিটিয়েছিল বিরোধী ভোটারদের। এ কাজে পুরোপুরি সহযোগিতা করেছিলেন তৎকালীন আইজ যিনি ছিলেন একজন সাবেক সৈনিক। এসব কথা যারা ভুলে যান, তাদের জ্ঞানপাপী বললে প্রশংসা করা হয়। লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে পুরো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশাসনকে ব্যবহার করা হয়। লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে পুরো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশাসনকে ব্যবহার করে মৌলবাদী চরম ডানপন্থী জোটকে ক্ষমতায় এনেছিল।

২০০২ সালে বগুড়ায় বিশাল অস্ত্র চালান ধরা পড়লে (অনুমান করা যায়, এগুলো জঙ্গিরা কিছু ব্যবহার করছে) বেগম জিয়া বলেছিলেন–'প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগই আল কায়দা, তালেবান। তারা ছাড়া দেশে আর কোন তালেবান কিংবা আল কায়দা নেই' (*প্রথম আলো* ১.৮.০২)। মাত্র কয়েকদিন আগে নিউইয়র্কেও বিএনপির সভায় আওয়ামী লীগের সপ্তাহখানেক আগে সংসদেও তিনি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কিছু বলেননি। জাতিসংঘেও তিনি বলেছেন, সন্ত্রাস দমন করা হবে। কিন্তু বাস্তব কি তা আমরা ভুক্তভোগীরাই জানি।

আওয়ামী লীগ আমলে কোটালীপাড়ায় বোমা হামলায় মুফতি হান্নান গ্রেফতার হয়েছিল। তার সমর্থনে ২০০৩ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বায়ু সেনা আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছিলেন, 'মুফতি হান্নানের নিজের ওজন হতে পারে বড়জোর ৪৫ কেজি, সে কিনা এ বোমাটি সবার চোখের আড়ালে পকেটে করে হেলিপ্যাডে নিয়ে গিয়েছিল? (*প্র. আলো* ৩১.০৩.৩। আলতাফ হোসেন...দুর্নীতির দায়ে তার

বিরুদ্ধে মামলা হয়। জোট তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে। দৈর্ঘ্যে দায়ে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। জোট তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে। দৈর্ঘ্য তিনি বড়জোর সাড়ে পাঁচ ফুট বা সামান্য বেশি। ওজন না হয় ৮০/৯০ কেজি। তিনি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও ওজনে তার চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি ওজনের বিমান চালাতেন কীভাবে নাকি চালানিনি? বাংলাদেশে সবই সম্ভব। উল্লেখ্য, তিনি এখনও মন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার একজন প্রভাবশালী সদস্য।

২০০৩ সালে মহিলা ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় নামলে সরকারের নীতি (জোট) নির্ধারক শায়খুল হাদিস এদের প্রত্যাহারের দাবি জানান (এরা নিজেদের নামের আগে অদ্ভুত সব উপাধি ব্যবহার করেন। কারণ এরা বেপর্দা আওরত। এসব আওরতের সামনে তো মোমিন মুসলমান (তারা নিজেদের দাবি করেন) যেতে পারে না। তারপর দেখলাম, মখমলের আলখাল্লা পরে, বোরখা না পরা প্রধানমন্ত্রী সন্দর্শনে যাচ্ছেন। মহিলা ট্রাফিক পুলিশ এখন রাস্তায় নেই। *জনাব হাদিসরা এখনও বলছেন* , ইসলামীরা বোমা হামলা করেনি। তিনি জোটের শরিক।

'আমরা হবো তালেবান' স্লোগান দিতে খ্যাত, রক্তিম দাঁতের ফ. হ. আমিনী ২০০৩ সালে বলেন–'দেশের মানুষ বিএনপি ও জামায়াত বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে জামায়াত তো একটি গাদ্দার রাজনৈতিক দল, যদিও আমরা তাদের সঙ্গে জোট করেছি। তবে সেটা আদর্শিক কারণে নয়, রাজনৈতিক কারণে' (*ভোরের কাগজ,* ৩.০৭.০৩)। অর্থাৎ একটি ইসলামী দল অন্যটিকে গাদ্দার বলছে এবং দাবি করছে ইসলাম কার্যকরই তাদের লক্ষ্য। আদর্শ না থাকলে ধর্ম থাকে কী করে? এজন্যই এদের আমরা ইসলামের ঠিকাদার বলি। রাশেদ খান মেননের ভাষায়, 'আমিনী কসম খেয়ে বলেছেন যে, এর পেছনে আওয়ামী লীগ ও ভারত আছে। বিএনপির অন্য মন্ত্রীরাও পিছিয়ে নেই। নৌপরিবহন মন্ত্রী কর্নেল আকবর ১৭ আগস্ট বোমাবাজিকে পটকাবাজি ও ফোঁড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন' (*যুগান্তর,* ১৮.০৯.০৫)। তারা দাবি করেছেন, দাঁড়ি-টুপিঅলাদের ধরা যাবে না। আমিনী এখনও প্রায় একই কথা বলছেন। তিনি জোটের সংসদ সদস্য।

জোটের সবচেয়ে শক্তিশালী মন্ত্রী নিজামী ১৯৯৪ সালে বলেছিলেন, ইসলামী জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না' (*ইত্তেফাক* ২৪.০১.১৯৯৪)। তারপর তিনি এখন জোটের মন্ত্রী।

১৯৭১ সালে সারা পাকিস্তান আলবদর প্রধান, যাদের প্রধান মিশন ছিল বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা, সেই নিজামী প্রায়ই এমনসব উক্তি করেন। যার সঙ্গে সত্যের সম্পর্কে নেই। অথচ শুভ্র শ্মশ্রুধারী নিজামী এখানে ইসলামের প্রধান প্রবক্তা। তিনি জঙ্গিদের সমর্থক, ২০০৪ সালে ক্রিস্টিনো রোকাকে তিনি বলেছিলেন, 'আহমদিয়া সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম পালন করতে পারবে না। (*জনকণ্ঠ*

২০.৩.০৪)। ভাংলা ভাই সম্পর্কে বলেন , আমি তাকে চিনি না, তার সম্পর্কে কিছুই জানি না, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশ ইসলামী জঙ্গিদের কোন অস্তিত্ব নেই। (ঐ) বাংলা ভাই ছিল জামাতে ইসলামীর ক্যাডার। ১৭ আগস্টের বোমা হামলার পর নিজামী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন-'বোমা হামলার সঙ্গে ভারতীয় ও ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ও 'মোসাদ' জড়িত। তিনি এখনও প্রায় একই রকম বক্তব্য দিচ্ছেন।

যুদ্ধাপরাধী হিসেবে পরিচিত জামায়াতের নেতা ও জোটের মন্ত্রী মুজাহিদ ২০০৩ সালে ঘোষণা দেন, 'বাংলাদেশ এখন মৌলবাদীদের শক্ত ঘাঁটি (*জনকণ্ঠ,* ২১.১২.২০০৩)। পরে তিনি বলেছেন, এ কথা তিনি বলেননি। জামাতের নীতিনির্ধারক গোলাম আযম লিখেছেন- নির্বাচন ছাড়া জিহাদের মাধ্যমেও তা হতে পারে যেমন আফগানিস্তানে হয়েছে স্টাডি সার্কেল ২.১৬৮)।

জোটের শরিকরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারত আওয়ামী লীগকে দায়ী করেছেন ১৭ আগস্টের বোমা হামলার জন্য। ২০০১ থেকে এ পর্যন্ত প্রতি ক্ষেত্রেই একথা বলা হয়ে থাকে। অথচ অনেকের অনুমান জঙ্গিদের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য আসে মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তান থেকে। জোট পাকিদের এখানে স্থাপন করতে চায়। আপনারা জানেন কিনা জানি না, বোমা হামলার পর একমাত্র পাকিস্তানকেই বাংলাদেশ ব্যাংক (কোম্পানি হিসেবে) স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে (ড. আলমগীর *জনকণ্ঠ,* ১৮.৯)। মন্ত্রী পটল শ্রীলংকায় বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের আইয়ুব খানে বক্তৃতা দিয়ে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন (*যুগান্তর,* ১৮.৯)।

ইতিমধ্যে যোগাযোগমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন, ১৯৭১ সালে জামায়াত কোন অপরাধ করেনি। জামাতের পাকিকরণ এজেণ্ডাও যে সমাপ্তির পথে তার প্রমাণ পাকিস্তানের সিনেটে মুত্তাহিদা মজলিসই আমলের সংসদীয় নেতা মওলানা গুল নাসির খান বলেছেন, তারা বাংলাদশের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন এবং বাংলাদেশের সংসদে তাদের তিনজন এমপি আছে, এরা হলেন-ওয়াক্কাস, আমিনী ও শহিদুল। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের অবস্থান খুবই সুদৃঢ় এবং দেশের প্রতিটি শহরে দলটির সংগঠন রয়েছে। এবারের বোমা হামলা তারই প্রমাণ। শুধু তাই নয়, যারা বোমা হামলা করছে জামাআতুল, আহলে হাদিস বা অন্যরা-এদের অধিকাংশই জামাতের সদস্য ছিল। পত্রপত্রিকাই সে খবর দিচ্ছে।

আমিনী ২০০৩ সালে পাকিস্তান নেমে বলেন, 'তাকে সেখানে রাষ্ট্রীয় প্রটোকল দেয়া হয়। তিনি জানান, এখানে খুব আরামে সাদরে আছি। সর্বক্ষণ সামনে পেছনে থাকে আমার গাড়ি' (জনকণ্ঠ, ২২.০২.০৩)। পাকিস্তানে নেমে একইভাবে বলেন, 'যেন নিজ দেশেই আছি।' (ঐ) আরও পাকিপন্থী ও যুদ্ধাপরাধী বলে পরিচিত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে বেগম জিয়া ওআইসিতে মনোনয়ন দিয়েছিলেন এবং

পাকিস্তান তার পক্ষে ক্যানভাস করেছিল। সর্বশেষ ঘটনা ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের স্ত্রীকে লাঞ্ছনা। পুলিশ যার বিরুদ্ধে অভিগে তাকে গ্রেফতার করেনি। পাকিস্তানের হাইকমিশনারের স্ত্রীকে লাঞ্ছনা করলে কী হতো তা ভাবতেই পারি না। পাকি ধারার বিকাশই এর কারণ।

বাংলা ভাই যখন রাজশাহীতে গৃহযুদ্ধ শুরু করে ইসলামী রাজ প্রতিষ্ঠায়, তখন সরকার ও প্রশাসন তাকে মদদ দেয়। বাংলা ভাই বলে, 'ভূমি উপমন্ত্রী, নাটোর থেকে নির্বাচিত এমপি রুহুল কুদ্দুস তালুকদারের সঙ্গে দুদিন দেখা এবং কথা হয়েছে (*জনকণ্ঠ* ৫.৫.০৪)। আরও বলে, 'পুলিশ আমাদের সঙ্গে সহায়তা করে থাকে' (*প্র. আলো* ৫.৫.০৪)। তার মতে তাদের সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ (*সংবাদ* ৬.০৫.০৪)। রুহুল কুদ্দুস এখনও উপমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য।

২০০৪ সালে বাংলা ভাই ও ৩ হাজার সশস্ত্র লোক নিয়ে রাজশাহীতে প্রবেশ করে। রাজশাহীর তৎকালীন এসপি মাসুদ মিয়া সশ্রদ্ধভাবে জঙ্গিদের জানান, 'আপনারা আমাকে সহযোগিতা করছেন, আমরাও আপনাদের সহযোগিতা করছি' (*সংবাদ* ২৫.৫০৪)। সশস্ত্ররা প্রকাশ্যে রাস্তায় পুলিশ ও প্রটেকশনে ঘুরতে পারে কিনা এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রাজশাহী সহকারী পুলিশ কমিশার ওয়াজেদ আলী। কেউ শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করলে আমরা বাধা দেব কেন? হকিস্টিক, রামদা, লাঠিসোঁটার ব্যাপারে তার মন্তব্য-এগুলো আবার অস্ত্র নাকি (*প্র. আলো* ২৪.০৫.০৪)।

সেই সময় প্রধানমন্ত্রী দু'বার বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের আদেশ দেন। সে আদেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাবর পালন করেননি। এর অর্থ, হয় প্রধানমন্ত্রীর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই মন্ত্রিসভার ওপর, নয় এটি ছিল কথার কথা। বরং বাবর বাংলা ভাইকে ইংলিশ ভাই বলে ঠাট্টা করেছেন। উল্লেখ্য, সেই মাসুদ মিয়াকে প্রমোশন দিয়ে একেবারে গোয়েন্দা বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে যেসব পুলিশ, মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতার যোগাযোগ ছিল তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। বাবর এখন বলছেন, '১৭ আগস্টের বোমা হামলার সঙ্গে জামা'আতুল মুজাহিদীন ও জনযুদ্ধ জড়িত। তিনি ছাড়া এ মন্তব্য আর কেউ করেনি। বরং এক জঙ্গি পুলিশকে বলেছে, আপনারাই তো আমাদের জনযুদ্ধের বিরুদ্ধে নামিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন র‍্যাব অনেক সন্ত্রাসীকে হত্যা করলেও কোন জঙ্গিকে সন্ত্রাসী বলেনি, হত্যাও করেনি। বরং দুইজন অবসরপ্রাপ্ত সেনার নাম পাওয়া গেছে-যারা জঙ্গিদের বিভিন্নভাবে মদদ দিয়েছেন। সিলেটে বোমা হামলার পর 'মাজারের লোকজন আলী আসগর নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশে সোর্পদ করলেও তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে' (জনকণ্ঠ ২২.০৫.০৪)। অথচ ময়মনসিংহে কথিত যোগাযোগের জন্য শাহরিয়ার কবিরসহ আমাদের অনেককে

গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। বাংলা ভাইয়ের উপদেষ্টা লুৎফর রহমান হুমায়ূন আজাদকে 'কুত্তা' আখ্যা দেয়ার পর তার ওপর হামলা হয়। এখন ধরে নিতে পারি হামলাকারীরা ছিল জেএমবির। যে কারণে তাদের ধরা হয়নি। লুৎফরকে এখনও পুলিশ ধরতে পারেনি-যদিও সংবাদে তার সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। ৪/৫ দিন আগে দুই জঙ্গি ২৫টি ইসলামী সিডি ও ৩১টি জেহাদি বই নিয়ে সংসদ হোস্টেলে জামায়াতের এমপির সঙ্গে দেখা করতে এসে ধরা পড়ে (*সমকাল* ১১.০৯.০৫)। তাদের বিরুদ্ধে ৫৪ ধারায় মামলা করা হয়। আর শাহরিয়ারসহ আমাদের অনেকের বিরুদ্ধে হয় রাষ্ট্রদোহি মামলা। গ্রেফতারকৃত কোন জঙ্গির অপরাধ মাফ হয়ে যাচ্ছে' (*জনকণ্ঠ* ১৭.৯)। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, বোমাবাজরা জোটের বোমা ফ্রন্ট। এখন বেকায়দায় পড়ে কিছু জঙ্গিকে ধরতে হচ্ছে। উপর্যুক্তি বক্তব্য তাই প্রমাণ করে। বরং প্রশ্ন করতে পারেন, নিজেদের নিজেরা ধরবে কীভাবে?

এ ধরনের অজস্র উদাহরণ দেয়া যায়। এসব প্রমাণ করে বিএনপি, জামায়াত বা জোটের কেউ সত্য বলতে অক্ষম। তারা জঙ্গিদের সমর্থক। উল্লিখিত ঘটনাবলী কি প্রমাণ করে না, সব সেটআপ আগের মতোই আছে। সুতরাং বলা যেতে পারে অন্যান্য বোমা হামলার মতো ১৭ আগস্টের বোমা হামলার নীতিনির্ধারকরা ধরা পড়বে না। পড়বে কীভাবে? এদের অধিকাংশ জামাতের সঙ্গে যুক্ত এবং জামায়াত এখন ক্ষমতায়। মিডিয়াও একসময় এসব খবর দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে বা মিডিয়ার দৃষ্টি ফেরানোর জন্য নতুন কাণ্ড ঘটানো হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলতে হয়-জঙ্গি, জঙ্গিবাদ বাংলাদেশে ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কেননা, এর সমর্থক এ দেশের ৪০ ভাগ মানুষ। এটি ভুললে বাস্তবকে এড়ানো হবে মাত্র। এদের সমূলে উৎখাত করার মতো মানসিকতা বিরোধী রাজনীতিবিদ, লিবারেলদের আছে কী না সেটাই বিচার্য। আমরা সিরিয়াস কিনা সেটাই বিবেচ্য। যারা সরকারের এসব হম্বিতম্বি-পুরস্কার ঘোষণায় ভাবছেন, জঙ্গি ইস্যুর সমাধান হয়ে যাচ্ছে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। জঙ্গিবাদ নির্মূল করবে এ সরকার, যারা এর স্রষ্টা-হা হা হা!

২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

নিজেরা নিজেদের ধরবে কীভাবে?

যে কথা আমরা বলছি গত ৬-৭ বছর, আজ অনেকে সে কথা বলছেন বাধ্য হয়ে। বাধ্য না হলে বলতেন না, যেমন বলেননি গত ৫-৬ বছর। আমরা যারা বারবার এ কথা বলেছি এবং বলার জন্য লাঞ্ছিত হয়েছি, উপহাসিত হয়েছি, আজ সে কথা ফলে গেছে দেখে যে তৃপ্তি পাচ্ছি তা নয়। কারণ বিষয়টি এখন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি জঙ্গিদের আক্রমণে আবার নিহত আইনজীবী/দর্শনার্থীদের প্রসঙ্গেই বলছি। যখন এথনিক ক্লিনজিং-এর নামে আওয়ামী লীগের ওপর নির্যাতন, হত্যা শুরু হলো, বিরোধী দল নিশ্চিহ্নকরণের নামে আওয়ামী লীগের ওপর নির্যাতন, হত্যা শুরু হলো, সাংবাদিকদের যেনতেনভাবে মেরে ফেরা হতে লাগলো তখন ভদ্রলোকদের একটা বড়ো অংশ ছিলেন নিশ্চুপ। আজ আদালতে হামলায়, বিচারক আইনজীবীরা (তাদের একাংশ বহুদিন থেকে এইসব অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছেন) ভীত। বস্তুত, ২৯ তারিখের ঘটনায় দেখলাম যারা নিশ্চুপ ছিল, এমনকি বিএনপি-জামাতের অনেকেই আতঙ্কিত। কারণ বোমাতে বিএনপি জামাত চিনবে না।

বাংলাদেশ এই নষ্টামীর, ধ্বংসের রাজনীতি শুরু করেছে বিএনপি-জামাত। আমরা যখন এ কথা বলেছি তখন আমাদের আওয়ামী লীগ বলা হয়েছে। আজ বিএনপি-জামাতের কট্টর সমর্থকরাই সে কথা বলছে। যেমন, সাংসদ আবু হেনা। তিনি স্পষ্ট করে জঙ্গি উত্থানের জন্য সরকারকে দায়ী করেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, এমন কট্টরপন্থী জিয়াপ্রেমী হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন? বলছেন দায়ে পড়ে। কারণ, বিএনপি-জামাত মিলে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দিচ্ছে। অবস্থা এমন যে, তাকে এসপার ওসপার করতে হবে। তবে, আবু হেনার খানিকটা সাহস আছে যেটি বিএনপি কর্নেল জেনারেলদেরও নেই। বিএনপিতে চালু হলো ভৃত্যতন্ত্র। রাণীমার সামনে চোখ তুলে কথা বলার সাহস কারো নেই। যুবরাজ একটু হাসলে সেদিন সাইফুর রহমানের ঘুম ভালো হয়। বাকিরা রাণীমায়ের পরিচালিকা হবু যুবরাজের পার্শ্বচরকে সালাম দিয়ে গর্ববোধ করেন। আওয়ামী লীগেও সে ব্যবস্থা চালু। তবে, দলের বিভিন্ন ফোরামে বা বাইরে তারা বিভিন্ন বক্তব্য দিতে পারেন, যেমন বলছেন মোহাম্মদ হানিফ বা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। শেখ হাসিনা সে সব কথা/পরামর্শ শোনেন কী শোনেন না সেটি অন্য ব্যাপার। সে

পরিস্থিতিতে আবু হেনা নিজেকে বিপন্ন করে কথা বলছেন। আমরাতো জানি, আবু হেনা নিজেও জানেন তার জোট ছিল মনুষ্য নামধারী হিংস্র পশুদের আস্তানা। আবু হেনা নিজেও কী ৪ বছরের কম গিবৎ গেয়েছেন। আবু হেনা বহিষ্কৃত হয়েছেন জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বলার জন্য নয়। তিনি বলেছেন বিএনপিতে রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র চলছে। হাওয়া ভবন অঘোষিত সরকার। দলের চেয়ারপারসন দেখে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন (*প্রথম আলো* ২৫.১১.৫)। এমন নতুন কথা নয়। কিন্তু জামাত-বিএনপির কোনো সদস্যের এহেন বেয়াদপি সহ্য করবেন কেন মালিকান। অন্যরা একক-আধটু বলতে চাচ্ছিলেন ভবিষ্যতের বিকল্প তৈরির জন্য। কিন্তু, এক ধর্মকে সব খামোশ হয়ে গেছেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মতো ভিটেমাটি হারাতে চান না তারা। তবে, নির্বাচন যতো ঘনিয়ে আসবে এ ধরনের কথা ততোই শোনা যাবে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি প্রমাণ করছে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জঙ্গি নিজামী ও খালেদার কার্যকলাপে সায় দিতে আর রাজি নয়।

আবু হেনার মতো যাদের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন, তারা হয়তো গা বাঁচাতে এগিয়ে আসবেন। অবাক হবেন না মওদুদের মতো লোকও যদি কয়েকদিন পর একই ধরনের কথা বলেন।

একটা বিষয়ে আমরা ভুল করি, মানুষকে বিভ্রান্ত করি। চরম নচ্ছারকে তার মৃত্যুর পর প্রশংসাবাণীতে ডুবিয়ে দিই। ফলাফলে ওই নচ্ছার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তার নষ্টামি স্বীকৃত হয়। এ রকম ঘটনা ঘটছে। যেমন, বিএনপি-জামাতকে আমরা আলাদা করে দেখি।। আজকাল অনেক সুবেশী 'ভদ্দরনোক' ও মহিলাকে বলতে শুনবেন, আমি জামাত করি না, বিএনপি করি। কারণ জামাত করা এখন নষ্টামি হিসেবে পরিচিত। বিএনপি-জামাত এখন এরই দলের দুঅংশ-এ বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার হতে হবে। এক ফ্যাকশনের লিডার মান্নান ভূঁইয়া, অপর ফ্যাকশনের নিজামী। জাপানের এলডিপি যেমন বহুধা ফ্যাকশনে বিভক্ত। আলাদা আলাদা অফিসও আছে সবার। খালেদা জিয়াকে আপাতত দুই ফ্যাকশনই নেত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছে। নিজামী-মান্নান ভূঁইয়ার বক্তব্যের কোনো পার্থক্য থাকলে জানাবেন। মেনে নেবো তারা ভিন্ন আদর্শের লোক। সে হিসেবে জোটের সমর্থকরা বিএনপি-জামাতেরই সমর্থক।

যারা বিএনপি-জামাতকে আলাদা হিসেবে দেখতে চান তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। সংসদীয় কমিটিতে বিজ্ঞ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত যখন বলেন, জামাতকে বের করে দিলে জঙ্গিবাদ থেকে মুক্তি পাবো, সেখানে অবাক হই। কারণ, এতে বিএনপির সমস্ত অপকর্মকে আড়াল করা হয়। অথচ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কথিত বিএনপির সদস্যরাই তা মানতে রাজি নন। যে মওদুদ বিচার ব্যবস্থা ধ্বংসের

আয়োজন শুরু করেছিলেন (স্বাভাবিকভাবেই জঙ্গিরা সেটিকে ধ্বংসের জন্য নেমেছে), তিনিই সেই সভায় বলেছেন, 'এখন যারা আল্লাহর আইন কায়েমের নামে সন্ত্রাস করছে তাদের সাথে জামাতকে এক করে দেখার কোনো অবকাশ নেই' (*জনকণ্ঠ* ২৯-১১) যুদ্ধাপরাধী সাঈদী বলেছে, 'বিএনপি-জামাত এক মায়ের দুটি সন্তান। যারা এর মধ্যে পার্থক্য খোঁজে, এক ভাইকে পরিত্যাগ করার জন্য অন্য ভাইকে উসকে দেয় তারা আর যাই হোক, বিএনপি-জামাতের বন্ধু নয়, আওয়ামী লীগের অনুচর ও ভারতের দালাল' (*সংবাদ* ২৯-১১)।

জোটের সমর্থকরা বিএনপি-জামাতেরই সমর্থক। তাদের নতুন স্ট্রাটেজি হচ্ছে, এ কথা বলা যে, এটি একটি জাতয় সমস্যা, ঐক্যবদ্ধভাবে এর মোকাবিলা করা উচিত'। এ কথা বলে তারা ২০০1 থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত বোমা ও গ্রেনেড হামলার প্রশ্রয় ও আশ্রয়দাতা হিসেবে নিজেদের আড়াল করতে চাইছে। তারা এখন মাঠ-ঘাট দাপিয়ে মিটিং মিছিল করে বোমা হামলার প্রতিবাদ করবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। গতকাল থেকে টিভিতে এসব ভালমত দেখা যাচেছ। অবাক হই ভেবে কোনো সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেন না যেসব মন্ত্রী ও আমলা প্রকাশ্যে জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়েছে সমর্থন জুটিয়েছেন, এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন না কিন্তু সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন? জোটের সমর্থকরা বলেন, এ সরকার জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে না, সে কারণেই তো প্রতিদিন কমপক্ষে একজন করে জঙ্গি গ্রেফতার হচ্ছে। কিন্তু আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন, মাঠে যারা জঙ্গি নিয়ন্ত্রক তাদের গায়ে কিন্তু ফুলের টোকাও পড়ছে না। মাঠ পর্যায়ে কিছু বাহক ধরা পড়েছে মাত্র। ড. আলমগীর, শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে প্রবল উল্লাসে পুলিশ রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে কিন্তু ড. গালিব, আবদুর রহমান বা মুফতি হান্নানের বিরুদ্ধে নয়। বরং এদের বিরুদ্ধে এমন দুর্বল চার্জশিট দেওয়া হয় বা হবে যে এরা জামিন পেয়ে যায়। জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ বা জেএমবি কী? নানাজন নানা ব্যাখ্যা দেবেন। কিন্তু মূলত বিষয়টি একটি জায়গায় গিয়েই ঠেকবে। জেএমবি একটি জঙ্গিবাদী সংগঠন। এর সদস্য কারা? অধিকাংশ সদস্য জামাত, ঐক্যজোট বা এদের নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসার ছাত্র। শাহরিয়ার কবির দেশে ৫৮টি জঙ্গি সংগঠনের তালিকা তৈরি করেছেন। আসলে সংগঠন মূলত একটিই: জেএমবি এলো: জেএমবি নিষিদ্ধ হলো, বাংলাভাই এলো। লক্ষ্য করবেন ৫৮টির আদর্শে, লক্ষ্যে কোনো তফাত নেই।

এদের মাতৃসংগঠন হচ্ছে জামাত, যাদের মূল হচ্ছে পাকিস্তানে। এর পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ও সৌদি আরব। জেএমবি, হরকাতুল জেহাদ নিষিদ্ধ হলেও জামাত তাদের বক্তব্যই বিভিন্ন জায়গায় পেশ করছে। নিজামীর সাম্প্রতিক বক্তব্য ও সাঈদীর ওয়াজ তার প্রমাণ। সরকারের অন্য

অংশীদার তালিবান সমর্থক আমিনীর ঐক্যজোটের সঙ্গে জামাতের দ্বন্দ্ব আছে তবে তা হচ্ছে ক্ষমতা, অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে। তবে লক্ষ্য তাদের এক।

বিএনপি এসব যুদ্ধাপরাধী নিয়ে জোট করছে এটি স্বাভাবিক। বিএনপির পৃষ্ঠপোষকরা জিয়ার আমলে লুট করে বড়া লোক হয়েছে। জিয়া অনেক মাস্তানকে দলে জায়গা দিয়েছিলেন। যে কারণে মৌল বৈশিষ্ট্য লুটেরা চরিত্র। জিয়া যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং জোট তাদের সমর্থক। একজন জোট সমর্থকের চেহারা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। উদ্ধত, হিংস্র ধরনের, সৌজন্যবর্জিত, বোধ-বিবেকশূন্য। বেগম জিয়া/নিজামী থেকে তৃণমূলে তাদের সমর্থকদের লক্ষ্য একই-যে কোনোভাবে কর্তৃত্ব বজায় রেখে নিজেদের সম্পদশালী করা। ১৯৭১ সালে পাকিরা বলেছিল, মানুষ চাই না-মাটি চাই। জোটের বক্তব্যও ওই সবকটিই। যে কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রাম বিরোধী রাজনীতির সমর্থকশূন্য। এভাবে এরা সম্পদশালী হয়েছে। বিএনপির ছয়-সাতজন সাংসদ টিভি চ্যানেল খুলছেন। এদের অধিকাংশ ছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত। ৪ বছরের মাথায় তারা যদি কাগজ, টিভি চালাতে পারেন, তাহলে লুণ্ঠনের পরিমাণটা বোঝা যায়। ক্ষমতা দখলের আগে এ দর্শনে বিশ্বাসী রাষ্ট্রপতি, লতিফুর রহমান, জেনারেল হারুন সবাইকে একত্র করতে পেরেছিল। এটিই তাদের সাফল্য। তাদের সমর্থকদের তারা দিয়েছে-থুয়েছে তাই এখনো সমাজে তারা পোক্ত। আওয়ামীল লীগ করতে পারেনি এটিই তাদের ব্যর্থতা। আর আওয়ামী নেতারা নেন, দেওয়ার ব্যাপারে তাদের কুণ্ঠা বেশি; তাই তারা সমাজ থেকে হটে যাচ্ছেন। জেটের কৌশল হলো অত্যাচার ও ধর্ম। অশিক্ষিত জনগণের কাছে ধর্মে আসক্তির মতো। আর প্রশাসন হচ্ছে তাদের নিপীড়ন যন্ত্র। সত্যি বলতে কি, বাংলাদেশের মানুষের চরিত্রও বদলে গেছে। গত ৪ বছরের উদাহরণ। একটি সামান্য কথা বলি-একটি দেশে একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে অমুসলমান বলে কীভাবে? তারা যাদের হত্যা করছে বা করতে চাচ্ছে, তারা সবাই মুসলমান। ইসলামের দেশে তারা কী ইসলাম প্রচার করে? অন্য মুসলমানদের ওপর তারা অত্যাচার চালিয়েছে, যেটি স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দ.) নিজেও করেননি। এটা কিভাবে সম্ভব? সাধারণ মানুষকে এ কথা কেউ বুঝিয়ে বলেনি। আমি শুনেছি, এরা রিক্রুটদের বলেছে, অমুলমান মারলে তারা বেহেশতে ভোগ করতে পারবে এমন ১৮টি জিনিসের কথা বলেছে। সমর্থকও সৃষ্টি করা হয় এভাবে। অভাবী অভুক্ত মানুষ এসব বক্তব্য গিলছে। উত্তরাঞ্চল হচ্ছে জেএমবির উর্বর ঘাঁটি। এবং সরকার ইচ্ছে করে সেখানে ৫ বছর মঙ্গা সৃষ্টি করেছে যাতে রিক্রুমেন্টটা ভালো হয়। আওয়ামী লীগ আমলে ৫ বছর উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা হয়নি।

এ কথায় মাঠপর্যায়ে এদের নাম হরকাতুল, জামা'আতুল, বাংলাভাই, তালিবান, শায়খ রহমান; কেন্দ্রীয় রাজনীতি ও প্রশাসনে এরা পরিচিত সাক চৌ,

মান্নান ভূঁইয়া, নাজমুল হুদা, নিজামী, মুজাহিদ বা আফতাব নামে। এ মন্তব্যে অনেকে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন; কিন্তু গত ১০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখবেন মূলত একটি লক্ষ্যে পৌছানার জন্যই এরা কাজ করছে। কাউকে হয়তো আদর্শ আর কাউকে হয়তো অর্থ প্রণোদনা জুগিয়েছে, এই যা পার্থক্য। পর্যালোচনা করলে দেখবেন, গত এক দশক এদের সব হামলার লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগ ও বামপন্থার সমর্থক বা প্রগিতিশীল লেখক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা। কখনো জোটের কোনো কর্মী সমর্থকের বিরুদ্ধে নয়। এমনকি তাদের হত্যার যেসব তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে, সেখানেও জোটের কেউ নেই। একেবারে নেই বললে সত্যের অপলাপ হে। মাঝে মাঝে দু'একজনের নাম থাকে। আরো লক্ষণীয়, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা (অর্থাৎ আমলা, পুলিশ, গোয়েন্দা) জোট সমর্থক, সবসময় বলেছেন, এসব করেছে আওয়ামী লীগ ও তাদের মদদদাতা 'র' অথবা ভারত। গ্রেফতার করা হয়েছে ওইসব দলের নেতাকর্মী প্রতিশীলদের। জামাত, বিএনপি বা এদের সেকেন্ড ফ্রন্ট জঙ্গিরা যতো হত্যা-সন্ত্রাস-বোমাবাজিই করুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কখনো কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযান চালানো হয়নি। গ্রেফতার হয়নি তেমন কেউ। কাউকে কাউকে গ্রেফতারে বাধ্য হলেও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বাদ দিই-আমাকে, শাহরিয়ার কবির বা সালিম সামাদ বা প্রিসিলার মতো অল্পবয়সী মেয়েদের রিমান্ডে নিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে। এ দিকগুলো যারা দেখেও দেখেন না অথবা নিজেদের নিরপেক্ষ বলে দাবি করেন, তারা অবশ্যই জোটপন্থী অথবা মতলবাজ।

একজন মান্নান ভূঁইয়া, নিজামী বা শায়খ রহমানের মধ্যে তফাতটা কী, দাঁড়ি ও জোব্বার। এই সত্য মেনে নিলে পুরো বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। পার্থক্য থাকলে তাদরে সব বক্তব্য এক রকম হবে কেন? তাদের মতে, আওয়ামী লীগ, বামপন্থী বা প্রগতিশীলরা মুসলমান নয়। নাজমুল হুদাও একসময় পার্লামেন্টে এদের নব্য মুসলমান বলেছেন। আমরা হচ্ছি মুসলিম নামধারী অমূলমান। এদের পারভারশনও লক্ষণীয়। তাদের বিবেচনায় পিছলে পড়া পাতলা রঙিন শিফন ও হীরক বা মুক্তার অলঙ্কার এবং চড়া মেকআপে ভূষিত হচ্ছে ইসলামের প্রতীক। আব্রু রাখা, অলঙ্কারবিহীন নারী ইসলামের প্রতীক হতে পারে না। নিজামী ও আমিনীরা একসময় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন নারী নেতৃত্ব হারাম। কিন্তু নারীর নেতৃত্ব ছাড়া এক কদম চলার মতো মুরোদও এদের নেই। জোব্বা পরিহিত এরা যখন বেগম জিয়াকে ঘিরে আলোচনা করেন, তা দেখার মতো এক দৃশ্য বটে। তাদের মুসলমানিত্বের মাপকাঠি হলো কে কতোটা বেশি পাকিস্তানের গোলাম ও ভারতবিরোধী। শান্তিচুক্তি করলে যদি ফেনী থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত ভারতের

অধীনে চলে যায় (বেগম জিয়ার ভাষ্য) তাহলে বাংলাদেশে টাটাকে আনার জন্য খালেদা-নিজামীর এতো টানাটানি কেন? আর মিথ্যা না বলে এরা থাকতেও পারেন না। এ ধরনের লোকের হাতে আমরা, দেশও শুধু নয়-ইসলামও বিপন্ন, এ কথা পরিষ্কারভাবে বলার সময় এসেছে। এভাবে কখনো মূল জামায়াত-বিএনপি, কখনো তাদের ছায়া জঙ্গিদের দিয়ে উৎখাত করার কাজটিই তারা গত ৪ বছর ধরে করে আসছে।

এখন জেএমবির একটি অংশের মনে হয়েছে, তারা যথেষ্ট শক্তিশালী। সুতরাং সামনের নেতৃত্ব হটিয়ে রাষ্ট্রকে আয়ত্তে আনতে হবে। বিএনপিতে তারেক জিয়া যে কাজটি করছেন। গণ্ডগোলটা এখানেই।

সমস্যা হচ্ছে এদের কীভাবে দমন করা হবে? কারণ সরকারের ভেতরে বাইরে তো জঙ্গিরা। আলতাফ হোসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন, তাকে জানিয়ে মুফতি মান্নান গা ঢাকা দেয়নি? শায়খ রহমান তো ঢাকায়ই ছিলেন গত দুতিন মাস। বাংলাভাইও দেশে। এদের গ্রেফতার করতে গেলে কীভাবে যেন তারা জেনে যায়। রংপুরে জঙ্গিদের একটি ঘাঁটিতে বোধ হয় ভুল করে পুলিশ হানা দেয়। কিন্তু পত্রিকায় দেখলাম, যাদের হত্যা করা হবে তাদের তালিকা করা হয়েছিল সেই তালিকাটা খোয়া গেছে। সার্কের তিনদিন জঙ্গিরা নিশ্চুপ থাকে। 'সরকার' বা তাদের বড়ো ভাইদের প্রেস্টিজ রক্ষায় আর সম্মেলন শেষ হলেই তাদের হত্যা করা হয়। র‍্যাবের ক্রসফায়ারে সব রকমের মানুষ নিহত হয় কিন্তু নিহত হন না কোনো জঙ্গি। তিন-চারদিন আগে, বাংলাভাইয়ের অন্যতম সহযোগী মাহতাবকে র‍্যাব ধরে গল্পটল্প করে ফের জামাই আদরে মাইক্রোবাসে করে বাড়ি পৌঁছে দেয়। কারণ, এক উপমন্ত্রী ও বিশেষ ভবনের নির্দেশ' (*জনকণ্ঠ*, ২৯-১১)। আমরা আগেই বলেছিলাম র‍্যাব হচ্ছে জামাত-বিএনপির *ঠেঙারে* বাহিনী যাদের দিয়ে নির্বাচনের বৈতরণী পার হবে জামাত-বিএনপি। ব্রিটিশ মন্ত্রীও একই কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন। চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে বোমা হামলার পর জোটের নীতিনির্ধারক খন্দকার মোশাররফ বলেছেন, 'হঠাৎ করে দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান [মিথ্যাটা লক্ষ করুন] ও বিরোধী দলের সরকারবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার' *(প্রথম আলো)*। বোমা হামলা খতিয়ে দেখার কোনো কারণ নেই। বার সমিতির প্রেসিডেন্টের কাছে জঙ্গিরা হুমকি দিয়ে চিঠি দিলে সরকারি আইনজীবীদের নেতা জয়নাল আবেদিন বলেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভীতি সৃষ্টির জন্য এ ধরনের চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিটি ভীতিকর 'নয়' (*জনকণ্ঠ*,ঐ)। তার পরদিনই দুই আদালতে বোমা হামলা। আইনজীবীরা তার প্রতিবাদ জানালে সরকারি আইনজীবীরা ভন্ডুল করে দেন। এগুলো কি বোমাবাজদের প্রশ্রয় দেওয়া নয়? 'জঙ্গিদের মদদদাতা এনজিওগুলি এখনো ধরায় ছোঁয়ার বাইরে' (*ইত্তেফাক*

২৯-১১)। প্রশিকা বা অন্যদের ফান্ড কিন্তু সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যে এনজিও ফেডারেশন হয়েছিল তারাও কিন্তু এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ।

বোমা হামলার পর আবদুল মান্নান ভূঁইয়া শুকনো মুখে একটা ভালো কথা বলেছেন- এক মাসের মধ্যে বোমা হামলা বন্ধ হবে। জানি না, তিনি নিজামীর পারমিশন নিয়ে একথা বলছেন কিনা। নিয়ে থাকলে, বোমা হামলা নিশ্চিত বন্ধ হবে। তিনি পারমিশন নিয়েছিলেন কি নেননি তা বোঝা যাবে কয়েকদিনের মধ্যে।

আবু হেনা একটি কথা বলেছেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বলার জন্য তাকে বহিষ্কার করা হয় কিন্তু যারা জঙ্গির পৃষ্ঠপোষক তাদের কিছু বলা হয় না। এতে প্রমাণ হয় এ সরকার জঙ্গিদের দ্বারা গঠিত, জঙ্গিদের জন্য গঠিত। বস্তুত আবু হেনার বহিষ্কার, পূর্বের সব ঘটনা, এমনকি বোমা হামলার পরও জামাত-বিএনপি নেতাদের কথাবার্তা পুরো বিষয়টিকে নগ্ন করে দিয়েছে। সুতরাং, নিশ্চিত থাকতে পারেন যতোদিন জোট ক্ষমতায় থাকবে, ততোদিন জঙ্গিরা বাংলাদেশে শুধু মুক্তভাবে বিচরণ করবে না, শাসনও করবে। কারণ, নিজেরা নিজেদের ধরবে কীভাবে?

জঙ্গিবাদ, বোমাবাজি পছন্দ করলে অবশ্যই জোটকে সমর্থন করুন

তাহলে বাংলাদেশে এখন হিন্দুরাও ইসলামি শাসন প্রচলনের জন্য আত্মহুতি দিচ্ছে! অসম্ভব শোনাচ্ছে? বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন, বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ। বিএনপিপন্থীরা বলবেন, কেন খ্রিস্টানরা কি ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপ-আমেরিকায় আত্মাহুতি দিচ্ছে না? বিএনপি-জামায়াতি বা তাদের সমর্থকরা যখন কোনো মন্তব্য করে, তখন খেয়াল করে শুনবেন। এরা হয় মিথ্যা বলে, না হয় ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে যাতে বিপদে পড়লে পার পাওয়া যায়। তারা কিন্তু কখনো বলবে না, ওইসব খ্রিস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। অনেকে বলতে পারেন, গয়েশ্বর-নিতাইরা কি জামায়াত-বিএনপি করছে না যারা বাংলাদেশে ইসলামি শাসন কায়েম করতে চাচ্ছে/ হ্যাঁ, এই যুক্তির কাছে আমি পরাস্ত। আক্ষেপ করে শুধু বলতে পারে, 'ইসলামি' দেশে হিন্দু রাজাকারের শুধু সৃষ্টি নয়-বাড়ছেও। আর এটা সম্ভব হচ্ছে বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ বলে।

একথা মনে পড়লো বেচারা যাদবের কাহিনী পড়ে। নেত্রকোনায় ভয়াবহ বোমা হামলার খবরগুলো সন্ধ্যা থেকেই বিভিন্ন বাংলা চ্যানেলে দেখছি। এনটিভির আগে যাদবের প্রসঙ্গ কেউ তোলেনি। এনটিভির খবর দেয় যাদব জঙ্গি, কারণ তার শরীরে তার পেঁচানো ছিলো। বাংলা এবং ইংরেজী বলতে না পারা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও আধো বাংলা আধো ইংরেজীতে বলেন, যাদবের শরীরে তার পেঁচানো ছিলো। জনকণ্ঠের খবর অনুযায়ী, তার প্রহরীরা বিশেষভাবে যাদবের পুরুষাঙ্গ পরীক্ষা করে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এরপর এনটিভির সাথী এটিএনও একই খবর পরিবেশন করে। চ্যানেল আই তখনো দাবড়ানি খায়নি দেখে বলে, যাদব একজন মেকানিক। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে, আত্মঘাতী বোমাবাজ সাইকেলে চড়ে এসেছিলো। মনে রাখা দরকার, এনটিভির মালিক হচেছন বেগম খালেদা জিয়ার ডানহাত মোসাদ্দেক আলী ফালু, যাকে জোর করে বেগম জিয়া 'নির্বাচিত' করে সংসদ সদস্য করেছেন। বিএনপি আমলে তিনি একটি দৈনিক ও দুটি টিভি চ্যানেলের মালিক হয়েছেন। সাইফুর রহমান কিন্তু এসব ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেন না। যদিও ক্লাউনসুলভ নানা মন্তব্য করেন প্রতিদিন। তা বাংলাদেশ দুর্নীতিতে ফার্স্ট হবে না কি লাস্ট হবে? ফালু টিভি বিনা কারণে এটি করেনি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব বোমাবাজি চলছে তার বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষ দেখে এমন একটা রূপ দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে-কে

বলছে জেএমবি বোমাবাজি করছে, জেএমবি করলে তো সেখানে হিন্দু থাকতো না। এরা আসলেই দুষ্কৃতকারী। এবং হিন্দু যেহেতু, সেহেতু ভারতীয় এবং ভারতীয় মানেই তো আওয়ামী লীগ। মান্নান ভূঁইয়া, নিজামী, আমিনী এখন যেসব বক্তব্য রাখছেন, তাতে হয়তো হিন্দু বোমাবাজের ঘটনাটা খাবে।

মুশকিলটা হচ্ছে জামাত-বিএনপির নোংরা খেলাটা দিনকে দিন স্পষ্ট হয়ে বেরুচ্ছে। জামায়াত-বিএনপি যারা করে, তারা পিপড়রে পেট পিষেও শেষ রসটুকু নিংড়ে নিতে চায়; যে কারণে বাংলাদেশকে দুর্নীতির চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে নড়ানো যাচ্ছে না। এদের ভেতরটাও এমন যে, তাদের শরীরে কোথাও আঁচড় দিতে গলগল করে পুঁজ বের হয়। আত্মঘাতী বোমায় দেশ ছারখার আর তাদের নেত্রী সেজেগুজে মক্কায় গিয়ে আমাদের উপদেশ ঝাড়ছেন সন্ত্রাস কমানোর জন্য। তার মন্ত্রিসভায় জঙ্গি সমর্থরা সমানে আওয়ামী লীগ ও একটি বিদেশী রাষ্ট্রকে দোষী করে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা না হয় বিএনপি-জামাতের বিরুদ্ধে কিন্তু লিডাররা কী বলছেন? বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অলি আহমদ জামাতের নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন, জামাত পরাজিত হয়েছে এবং তিনি বলেছেন, 'বোমাবাজদের সঙ্গে' আপস করতে পারি না' (*সংবাদ*, ৪.১২.০৫)। স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য ওবায়দুর রহমান বলছেন, 'এককভাবে বিএনপির নির্বাচন করা উচিত।' শুধু তাই-নয়, তিনি আরো বলছেন, '১৯৭১ সালে যারা ধ্বংসাত্মক কাজ করেছিলো, তারাই আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। জাতিকে তারা ধ্বংস করতে চায়' (*জনকণ্ঠ*, ৯.১২.০৫)। ওই তারা হচ্ছে জামাতিরা। জামাতি নামটা নেয়া যাচ্ছে না আর কী যেমন, ভাসুরের নাম নেয় না অনেকে। দিনাজপুরে জোটের প্রার্থী, যার টাকা খাওয়ার বেশ একটা সুনাম নাকি ছড়িয়েছিলো [গুজবও হতে পারে কারণ জামায়াতিরা নাকি সৎ] তিনি আধলাখেরও বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন, তাও বিদিশার জাতীয় পার্টির কাছে। সে প্রার্থী আবার মুসলমান নয়। তার মানে, মানুষ মাত্রই মনে করছে জামাত মানে বোমাবাজ, ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী। আর যদি জামাতিদের ছেড়ে কেউ কিছু করে, তাহলে হয়তো তাকে কিছুটা দেয়া হতে পারে। এমনকি জোটের শরিক ইসলামী ঐক্যের সংসদ সদস্য ওয়াক্কাসও বলেছেন, জামাতিরাই বোমাবাজির জন্য দায়ী। তার ভাষায়, 'জামায়াত মানেই জেএমবি, বিএনপির ভাড়া করা দল; (*জনকণ্ঠ*, ৮.১২.০৫)। তারপরও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী 'লুকিং ফর শত্রু'র কাজ মহাউদ্যমে চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরই মধ্যে সংলাপ নামে এক মহাতামাশার সৃষ্টি করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, পতিত এরশাদ ছাড়া আর কেউ বেগমের সঙ্গে যেতে রাজি নয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোও মনে করে জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষক খালেদা জিয়া ও নিজামী। অন্তত এক্ষেত্রে শেখ হাসিনা যথার্থই বলেছেন, এদের সঙ্গে বসা আর জঙ্গিদের সঙ্গে বসা

একই কথা। বিএনপির প্রতি খানিকটা সহানুভূতিশীলদের মতে, জামায়াত বাদ দিলে সংলাপ হতে পারে। যেনো জামায়াতই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী। ইসলামী ঐক্যজোট আর বিএনপি নয়। বিএনপি-জামায়াত যে মিলেমিশে একাকার, এটা জানলেও তারা স্বীকার করতে চান না। এখন প্রেস্টিজে লাগে।

সংলাপ নামক মহাতামাশার পক্ষে এস্টাবলিশমেন্টের চাকর-বাকর ও ক্যাবল টিভিগুলো বেশ প্রচার চালাচ্ছে। যেনো সংলাপ হলেই ঐকমত্য হয়ে যাবে। এসব জ্ঞানপাপীর কাছে প্রশ্ন, যারা সংলাপে যাবে তাদের অধীনে কি পুলিশ, র‍্যাব বা সেনাবাহিনী আছে? নাকি জামাত-বিএনপির মতো সশস্ত্র ক্যাডার আছে যে তারা একত্র হয়ে রিসোর্স এক করলে জঙ্গি রোখা যাবে? যদি তা না হয়, তাহলে সংলাপে বসে কি ঐকমত্য হবে? আচ্ছা, ধরে নিলাম, সব দল সংলাপে গেলো এবং ঐকমত্য হলে জঙ্গি দমন হবে; কিন্তু সরকার করলো না বরং বিরোধী দলকেই দায়ী করতে লাগলো, যেমন এখন করছে- তখন কী হবে? তাহলে জ্ঞানপাপীরা এতো তড়পাচ্ছেন কেন? আগেই বলছিল, নরমপন্থীরা (অর্থাৎ বিএনপির প্রতি সহানুভূতিশীল) বলছে, জামাত না থাকলে তারা যাবে। কিন্তু ঐজ্যজোট, যারা জামায়াত থেকে কম ভয়ঙ্কর নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি, তাদের সম্পর্কে জ্ঞানপাপীরা নিশ্চুপ কেন?

দেখা যাচ্ছে, যেসব কিশোর ধরা পড়ছে, তারা অধিকাংশ কওমি মাদ্রাসার ছাত্র। কেউ তো বলছে না এদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মাদ্রাসাগুলো এখন বোমাবাজ সৃষ্টির কেন্দ্র হয়ে উঠছে। তালিবানপন্থী আমিনী বলছেন, 'বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না, এমন ধাক্কা দেবো খুঁজেও পাওয়া যাবে না' (*জনকণ্ঠ*, ৯.১২.০৫)। শুধু তাই-ই নয়, 'গত চার বছর সরকার মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে কিছু করেনি; কিন্তু এখন কোথাও কোথাও তল্লাশি চালাচ্ছে। দেশে এখন ২০ হাজার কওমি মাদ্রাসায় ৫০ লাখ ছাত্র-শিক্ষক আছে। এদেরে পাশ কাটিয়ে ধোঁকা দিয়ে কেউ ক্ষমতায় যেতে পারবে না।....কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে জিহাদ শুরু হবে' (*প্রথম আলো*, ২.১২.০৫)। কই জেল মাখা চুলের মন্ত্রী তো এখন আর মন্ত্রী লুকিং ফর শত্রু'তে ব্যস্ত নন। বরং 'সরকার মাদ্রাসায় জঙ্গি আস্তানা অনুসন্ধানে তালিকা তৈরির আদেশ জারি করে তা আবার নিজেরাই প্রত্যাহার করে নিয়েছে' (*জনকণ্ঠ*, ৯.১২.০৫)। এর অর্থ জোট সরকারই পৃষ্ঠপোষক জঙ্গিদের।

বাবর এখন আধো ইংরেজীতে জানাচ্ছেন, 'ইট ইজ গ্লোবাল।' এর মানে কী? তার আধো আধো কথা অর্থ যা ধরতে পেরেছি তাহলো, অনেক দেশেই তো বোমা হামলা হচ্ছে, ফলে এটা আর এমন কী বিষয়! সাইফুর রহমানও চান্স পেলে একই কথা বলেন। তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, সেসব দেশে সরকার জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষকতা করে কি-না। কি-না করছে এখানকার সরকার। তাছাড়া তারা তো

জঙ্গিদের ধরে। এখানে তো বাংলাভাই, শায়খ রহমান, খামারুকে সরকার ধরে না। ভুল করে ধরে ফেললে পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়। এদের মধ্যে তারা শত্রু খোঁজেন না। বরং আজ নেত্রকোনার যাবার কথা হল, সংলাপের কথা বলে এদের ও নিজেদের আড়াল করতে চাচ্ছেন। গত পরশুই জঙ্গিরা বলেছে, 'মহিলাদের বোরখা পরেই রাস্তায় নামতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা সন্ধ্যার পর বেরুতে পারবে না' (*জনকণ্ঠ*, ৯.১২.০৫)। ঢাকা ও মফস্বলের বিএনপি ঘরানার মহিলা ও ছাত্রীদলের সদস্যরা কী বলে দেখা যাক। অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করা যাবে: কিন্তু মোদ্দা কথাটা হলো- বোমা খেতে চান কি-না, পরিবার পরিজন বোমা হামলায় অক্কা পাক চান কি-না, শিফন-লেহেঙ্গা ছেড়ে বোরখা পড়তে চান কি-না, চাইলে অবশ্যই জামায়াত-বিএনপি-ইসলামী ঐক্যজোট বা নিজামী-খালেদা-আমিনী বা জোট সরকারকে জোর সমর্থন করে যান। আমাদের আপত্তি নেই। আমরা চার বছর ধরে অর্ধমৃত, এখন না হয় পুরোপুরিই মৃত হবো।

১২ ডিসেম্বর, ২০০৫

কই উনি তো শহীদ হলেন না

শায়খ আবদুর রহমানকে যখন গ্রেফতারের পাঁয়তারা চলছে তখন আমি দেশের বাইরে। চ্যানেল আইটা সেখানে দেখা যায়। খবর দেখে মধ্যাহ্নভোজের সময় রাজনীতিমনস্ক একজনকে বেশ উচ্ছ্বাসভরেই বললাম, 'যাক দ্বিতীয় সারির জঙ্গিকে তাহলে ধরা গেল।' তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'ধরা হল কি বাই কনসালটেশন।

যাক।' এবং মুহূর্তে গত কয়েক বছরের ঘটনা ভেসে ওঠে এবং আবারও অনুভব করি, বর্তমানে দেশে যেমন ঘটনা ঘটছে তার কোনটাই আকস্মিক নয়। এবং প্রতিটি ঘটনার পেছনে কোন না কোন রাজনীতি কাজ করছে। গত দু'দিন পত্রপত্রিকা জুড়ে সেসব রাজনীতির কথা বলা হচ্ছে এবং বিদেশেও যারা বাংলাদেশের খোঁজখবর রাখেন তাদের ধারণাও এ বিষয়ে বেশ স্বচ্ছ।

আবদুর রহমানকে এখন ধরা হল কেন? ওই যে 'বাই কনসালটেশন', মন্তব্য সেটি বিশ্লেষণ করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ৬৩টি জেলায় বোমা ফাটার পর স্বদেশী-বিদেশী চাপে সরকার কিছু জঙ্গিকে ধরতে বাধ্য হয়। তবে, তারা বাংলা ভাই ও আবদুর রহমানকে পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সময় দেয়। এতদিন তৃতীয়-চতুর্থ সারির জঙ্গিদের ধরা হয়েছে। তখনই পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে, আবদুর রহমান ও বাংলা ভাই কোথায় সরকারি কর্তাব্যক্তিরা তা জানে। তাদের সময়মতো ধরবে। সময়টা নির্ধাতির হল মার্চ মাস।

গত এক মাসে বিদ্যুৎ ভেঙ্গে পড়েছে। ডিজেল, সারের অভাবে চাষীরা চাষ করতে পারছে না। উত্তরাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ অবস্থা বিরাজ করছে। লোডশেডিং, জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধিতে মধ্যবিত্ত ক্রুদ্ধ। চতুর্দিকে এক অরাজক অবস্থা, মন্ত্রীরা টাকা খেয়ে দেশে আর পরবর্তী সরকারের খাওয়ার জন্য কিছু রেখে যাচ্ছে না-তা সবাই বিশ্বাস করছে। নির্বাচন কমিশনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন কমিশনের সদস্য বিচারকার। বিরোধীরা আন্দোলনে প্রস্তুত। বিদেশীরাও সরকারের পক্ষে নয়। পরিস্থিতি এরকম চললে, আন্দোলনের দরকার পড়বে না, সরকার আপনিই পতিত হবে। অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট বুশ ভারত-পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, আবদুর রহমানকে এখন ধরলে কমপক্ষে দু'সপ্তাহের একটা বিরতি পাওয়া যাবে। সরকারের অনুমান বেঠিক নয়। পত্রিকা থেকে অন্যান্য

খবর এখন উধাও। প্রধানমন্ত্রী আমাদের মহাজন আমেরিকাকে বলতে পারছেন, আমরা জঙ্গি ধরছি। তাছাড়া এক তারিখে চট্টগ্রাম শহর যে পুরোটা মিছিলের শহরে পরিণত হবে সেটিও সরকারের অজানা ছিল না। আবদুর রহমানকে ওইদিন গ্রেফতার করে বিরোধী দলের বিশাল, অতি বিশাল সমাবেশের খবর হটিয়ে দেয়া গেছে।

এসব যুক্তি উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু শায়েখের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যান্য বিষয়ে যুক্তি নাকচ করা যাবে কীভাবে? পরিবার-পরিজন নিয়ে কেউ আন্ডারগ্রাউন্ডে যায়-এই প্রথম জানলাম। শুধু তাই নয়। ছেলেকেও রহমান স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। এতদিন জানতাম, আন্ডারগ্রাউন্ডে একজনই যায়। শুধু তাই নয়, রহমানকে সসম্মানে গ্রেফতার করা হল। জেলা প্রশাসক, র‍্যাব কর্মকর্তারা সমসময় তাকে 'সাহেব' বলে সম্বোধন করছিলেন। অথচ এ লোকের নির্দেশে কত লোক খুন হয়েছে, পঙ্গু হয়েছে। তার মাথার দাম ধরা হয়েছে পঞ্চাশ লাখ টাকা। আমি, শাহরিয়ার কবির বা সাবের চৌধুরী কি কাউকে খুন করেছিলাম না নির্দেশ দিয়েছিলাম? রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মর্যাদা (যদি সেটিকে বিবেচনায় ধরেন) কি আবদুর রহমান থেকে আমাদের কম ছিল? আমাদের মধ্যরাতে তুলে নেয়া হয়েছে, হাজতে দাগী খুনির সঙ্গে ফেলে রাখা হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা শুধু নয়, রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা আনা হয়েছে। হাজতি ভ্যানে করে আনা-নেয়া হয়েছে। আবদুর রহমানকে গ্রেফতার করে যত্ন করে নাস্তা খাওয়ানো হয়েছে, আরামদায়ক পাজেরো জাতীয় গাড়িতে ঢাকায় আনা হয়েছে। আবদুর রহমানের নামে বিস্ফোরক আইনে মামলা হয়েছে। অথচ রহমান শুধু ক্রিমিনাল নয় নিষিদ্ধ ঘোষিত একটি সংগঠনের নেতা। সরকার কাকে কী দৃষ্টিতে দেখছে এতেই তা পরিষ্কার।

আবদুর রহমান কেমন নেতা? ধার্মিক হলে সে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করত না। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে আবদুর রহমান ক্ষমতার অধিকারী হতে চেয়েছে। এজন্য প্রচুর টাকা বিদেশ থেকে পেয়েছে। সরকারি প্রশ্রয় পেয়েছে। তার অনুসারীদের শায়খ জেহাদের জন্য শহীদ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তার কাজকর্ম সব এর বিপরীত। প্রথমত রহমান আত্মসমর্পণের আগে বলেছে, সে জীবিত ধরা দেবে না অর্থাৎ আত্মহত্যা করবে যা ইসলামে নিষিদ্ধ। কিন্তু সুড়সুড় করে পরে সে আত্মসমর্পণ করেছে। লোক দেখানোর জন্য হাতে কোরআন শরিফ ছিল আবার! সোহরাব হাসান ঠিকই লিখেছেন, 'যে শায়খ সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করে শিষ্যদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল, সেই শায়খ জীবন বাঁচাতে কাপুরুষের মতো আত্মসম্পর্ণ করল র‍্যাবের হাতে। তার কথা ও কাজে মিল ছিল না। বিশ্বাসে ফাঁকি ছিল।' (*যুগান্তর*, ০৩.০৩.০৬)। *ডেইলি স্টারের* শিরোনামটিও

ছিল যথোপযুক্ত 'টেরর ডন সারেন্ডারাস মিকলি' (*০৩.০৩.০৬*)। আমার খারাপ লেগেছে শায়খেল স্ত্রীর আর্তি। মহিলা একদিন স্বামী সম্পর্কে যা বিশ্বাস করেছিলেন এখন দেখেন তার পুরোটা মিথ্যা। এ বিশ্বাস ভঙ্গ সম্পর্কে তিনি বলেছেন আমাদের বের করে দিয়ে উনি না বলেছিলেন শহীদ হবেন। আমি আমার মেয়ে, নাতনী এবং কোলের বাচ্চা নিয়ে কাঁদানে গ্যাসের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করলাম। ... কই উনি তো শহীদ হলেন না।' (*ইত্তেফাক* ০৩.০৩.০৬) এর কারণ, শায়খ অন্যের হয়ে ভাড়া খাটছিল যেখানে ক্ষমতা দখলই ছিল মূল কথা, ইসলামী আদর্শ নয়। অথচ এই লোকটির কারণে অনেক তরুণ বিপথগামী হয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, আহত হয়েছে। এবার তার অনুসারীরা দেখুক তাদের নেতা কী রকম! আরও উল্লেখ্য, ধরা পড়ার পরপরই শায়খ তার অনুসারীদের সম্পর্কে খবরাখবর দেয়া শুধু করেছে। বেগম জিয়া এই মুহূর্তটি কাজে লাগাতে চেয়েছেন পরিকল্পনামাফিক। হঠাৎ তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি সব ইসলামী দল ও রাজনৈতিক দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাকে সহযোগিতা করার জন্য, শুধু একটি দল ছাড়া। নামোল্লেখ না করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দলটি আওয়ামী লীগ। তার অভিযোগ আওয়ামী লীগ 'উল্টো মদদ যুগিয়েছে সন্ত্রাসীদের।' কিভাবে সেটি বলেননি। তারা কিভাবে সহযোগিতা করবে সরকারি দলকে যেখানে সবসময় বলা হয়েছে তারা সন্ত্রাসীদের মদদ যুগিয়েছে, না, সরকারি প্রশাসন তাদের হাতে? মনে হয়, সরকার যা করবে তা সমর্থন করাই হচ্ছে সহযোগিতা। তাহলে তো সন্ত্রাসীদের সমর্থন করতে হয়। গত চার বছর সরকারের যে কর্মকাণ্ড তা সন্ত্রাস ছাড়া আর কি? শুধু তাই নয়, জোটের মন্ত্রীরা তো সবসময় মিথ্যা বলছে, সারের জন্য কৃষকরা বিক্ষোভ করছে আর ইসলামের আরেক ঠিকাদার নিজামী বলছে সারের মজুদ যথেষ্ট। এই লোকটিই বলেছিল, বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি। তাহলে তার সরকার মিডিয়া সৃষ্ট লোকের জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে কিভাবে? চারদিকে বিদ্যুতের হাহাকার আর বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলছেন, কোথাও বিদ্যুতের কোন অভাব নেই। আরও আছে, ২২ আগস্ট গ্রেনেড হামলা বা রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরীকে যারা গ্রেনেড ছুঁড়েছিল তাদের কি গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেছেন, এখন এ ধরনের জঙ্গি সন্ত্রাস বন্ধ হবে। সত্য নয় এমন কথা তিনি বলেন কিভাবে? চারদলীয় জোটের দুটি দল তো সবসময় জঙ্গিবাদের সমর্থন করছে। যাদের জঙ্গি হিসেবে ধরা হচ্ছে, 'তাদের অধিকাংশ বলেছে, তারা ছাত্র শিবির বা জামাতে ইসলামীর সঙ্গে জড়িত বা কোন সময় জড়িত ছিল। জঙ্গিদের আস্তানা থেকে যেসব বই-পুস্তক উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই-ই হচ্ছে গোলাম আযমবা মওলানা মওদুদীর। (*যুগান্তর ০৩.০৩.০৬*) আর পাওয়া যাচ্ছে সাঈদীর ক্যাসেট। জামাত হচ্ছে প্রথম

সারির জঙ্গি প্রবক্তা। শায়খরা হচ্ছে দ্বিতীয় সারির। যে কারণে, শায়খের বাসা থেকে গোলাম আযম বা মওদুদীর বই পাওয়া গেলেও তা সিজার লিস্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। জামাত, ঐক্যজোট সবসময় বলছে শায়খের মতো (বা শায়খ বলেছে তাদের কথামতো) তারা আল্লাহর আইন চায়। ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন করতে চায়। কয়েকদিন আগেও আমিনীরা বলেছেন, তারা হামাসের মতো বিজয় চান। সুতরাং জঙ্গিদের সঙ্গে রেখে জঙ্গি দমনের কথা বলা নিতান্ত হাস্যকর, মতলবাজি। এরা সরকারের হয়ে সমাজে সরকারের কর্তৃত্ব বিস্তার করতে চাচ্ছিল। যে কারণে, গত তিন বছর প্রকাশ্যে জঙ্গিদের উত্থান, অত্যাচারে সাড়া দেয়নি সরকার। মাত্র কয়েক মাস হল বাধ্য হয়ে জেএমবিকে নিষিদ্ধ করেছে। সরকারি প্রশাসন প্রকাশ্যে এদের সহায়তা করেছে। এর সর্বশেষ উদাহরণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. তাহের হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত শিবির নেতা সালেহীকে গ্রেফতার না করা। পত্রপত্রিকায় তাকে গ্রেফতারের কথা বললেও সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি।

প্রশাসন শুধু নয়। সরকারি মন্ত্রীরাও প্রকাশ্যে জঙ্গিদের সমর্থন করেছে। ডেইলি স্টার একটি রিপোর্টে এ ধরনের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছে (০৩.০৩.০৬)। তারা হলেন-টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আমিনুল হক, ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস দুলু, বিএনপি সাংসদ নাদিম মোস্তফা ও মিজানুর রহমান মিনু, বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী ও গোপালগঞ্জ বিএনপির সভাপতি, জামাত মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী, বিএনপির মন্ত্রী / সাংসদ ও গ্রেফতারকৃত জঙ্গিরা এসব নাম উল্লেখ করেছে। অবশ্য, উপরোল্লিখিতরা এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে (*ডেইলি স্টার*, ০৩.০৩.০৬)। এ হিসেবে বিএনপিকে জঙ্গিদের মদদদাতা বা জঙ্গি সমর্থক বা জঙ্গি বলা যেতে পারে। অবশ্য, তাদের মহাজন আমেরিকা মনে করে, তারা মডারেট ইসলামিক বা ডেমোক্রেটিক দল। আমেরিকা তালেবানদেরও তাই মনে করত। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, মহাজনরা দুষ্কর্মের সহায়তাকারীদের বিপদে পড়লে ত্যাগ করে। পুলিশের মাসুদ মিয়ারা সরকারি নির্দেশে আইন অমান্য করে জঙ্গিদের প্রশ্রয় দিয়েছিল। তাদের চাকরি গেছে। শায়খের অনুসারীরা মারা যাচ্ছে, আত্মগোপন করে আছে আর শায়খ ধরা দিয়ে তাদের নাম বলে দিচ্ছে। যে শায়খ সরকারের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করছিল সরকার এখন তাকে ধরেছে। যে আমেরিকা তালেবানদের মদদ দিয়েছিল আজ তাদের তারা হত্যা করছে। সুতরাং, জোট যতদিন থাকবে ততদিন জঙ্গিবাদ নির্মূল হবে তা হতে পারে না। এ কারণেই শায়খকে মিয়ার সঙ্গে কথা বলতে দেয়া হয়নি। যদি বেফাঁস কোন কথা বলে দেয়।

আরেকটি থিউরি হচ্ছে, সরকারের এখন বিভিন্ন গ্রুপ। এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে নাজেহাল করতে চাচ্ছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সিঙ্গাপুর হয়ে জাপানে। তিনি

দেশে থাকলে শায়খ ধরা পড়ত কিনা সন্দেহ। কারণ, এক সময় বাংলা ভাইকে তিনি পরোক্ষভাবে হলেও সমর্থন করেছেন। বলা হয়ে থাকে তিনি তারেক জিয়ার নমিনি। তারেক জিয়াও এখন সিঙ্গাপুর হয়ে জাপানে।

অনেকে হয়তো খুশি যে, শায়েখের বিচার হবে, শাস্তি পাবে। অদূর ভবিষ্যতে নয়। মাসুদ আহমদের কথাবার্তা শুনে কী মনে হয়? এসব কারণেই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে দুর্বল চার্জশিট দেয়া হচ্ছে। তাদের কারও বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হয়নি যা করা হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী, ইতিমধ্যে অনেক জামিনও পেয়েছে। সরকার দিন গুনছে, কখনও অন্য খবর আবার বড় হয়ে উঠবে। খবর চাপা পড়ে যাবে। দরকার হলে তারা ঘটনা সৃষ্টি করবে। সরকার হয়তো করছে, জনসমর্থন এখন তাদের দিকে যাবে। এটি একটি 'সাফল্য'। হইতে পারে, তা ক্ষণস্থায়ী। অধিকাংশ পত্রপত্রিকাই জানাচ্ছে, এ গ্রেফতার 'বাই কনসালটেশন'।

যে কৃষক ফসল বুনতে পারছে না তার কাছে শায়খ রহমান গ্রেফতার হওয়া না হওয়া কোন ঘটনা নয়। যেসব গার্মেন্টিস কর্মী পুড়ে মারা পড়ছে মালিকদের কারণে, তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে এ গ্রেফতার কোন খুশির বার্তা বয়ে আনবে না। যে মধ্যবিত্ত দু'বেলা ভাত খেতে হিমশিম খাচ্ছে তার কাছে এ 'খুশির খবর' ইতোমধ্যে অতীত। মন্ত্রীরা যে মিথ্যা স্তোক দিচ্ছেন এটিও হোয়াইট কলারদের কাছে স্পষ্ট। সমস্ত সমাজ ফুঁসছে। প্রশ্ন উটছে, বাংলা ভাই গ্রেফতার হচ্ছে না কেন? লাভা উদ্গিরণের ঠিক আগে নয়তো নির্বাচনের আগে (যদি নির্বাচিত হয়) আবার বাংলা ভাই গ্রেফতার হবে। তার আগে নয়।

৫ মার্চ, ২০০৬

নিজামী এখন কী করছে?

ক্ষমতার বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ হলেই আমাদের ভূখণ্ডে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেন, ইসলাম খুবই নাজুক। অন্তত আমাদের দেশেল স্বঘোষিত ইসলামের ঠিকাদাররা তাই প্রমাণের চেষ্টা করেন। পাকিস্তান আমলে ঘনঘন ইসলাম বিপন্ন হতো। ১৯৭১ সালে আমরা নই, তারাই ইসলামকে শুধু বিপন্ন নয়, ধর্মের নামে ত্রিশ লাখ হত্যা করলো। এই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম সহায়ক শক্তি ছিল জামাতে ইসলামী। ১৯৭১ সালে কিলিং স্কোয়াডের প্রধান ছিল মতিউর রহমান নিজামী নামে এক জামাতী যুবক। আজ বাংলাদেশে সেই পাকিস্তানিমনা, মুসলিম লীগ ধাঁচীয় দল হচ্ছে বিএনপি এবং তাদের প্রধান সহায়ক শক্তি সেই কিলিং স্কোয়াড জামাত। ১৯৭৫ সালে প্রকৃতপক্ষে তারা ক্ষমতা দখল করে। সেই থেকে আবার দেখা যাচ্ছে এক বছর পরপরই ইসলাম বিপন্নের ধুয়া তোলা হয়। যিনি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কথা বলেন, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, মহিলার সাজ-পোশাকের সঙ্গে ইসলামের তাহজিব-তমুদ্দনের কোনো সম্পর্ক নেই। তার চালচলনের সঙ্গেও এবং তিনি অনবরত মিথ্যা কথা বলেন। তার অন্যতম সহযোগী জামাতের আমীর মতিউর রহমান নিজামীর চালচলনে একটা ইসলামী ভাব অছে। তবে সেই কিলিং স্কোয়াডের ভাবটাও আছে। জঙ্গি সৃষ্টি ও মদত দেওয়া এর উদাহরণ। নিজামীরও প্রধান বৈশিষ্ট্য মিথ্যা বলা, অনবরত মিথ্যা বলা। এ দুজনই ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করছে। সুতরাং এক হিসেবে প্রকৃত ধর্মপ্রেমীদের তারা শত্রু। যারা এদের সমর্থক তারাও বিকৃত ইসলামের সমর্থক, যদিও ক্ষমতার জায়গাগুলো তাদের করায়ত্ত।

নিজামী কী ধরনের বস্তু তা বোঝা যাবে এখন তার ভাষ্য আর কয়েক বছর আগের ভাষ্য মেলালে। এই সব লোকদের একটা সুবিধা হলো আমরা তেমন পড়াশোনা করি না, খোঁজখবর করি না, ভুলে যাই। না, হলে যে কোনো সাধারণ রিপোর্টারই তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দিতে পারতো।

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার কানসাটে গণহত্যা চালিয়েছিল। ঐ এলাকার এমপি আবার জামাতের। হতেই হবে। এ ঘটনার পর তারা খানিকটা শঙ্কিত। ফলে শিফন, মুক্তার মালা পরিহিতা মহিলা আবার ইসলাম বিপন্নের ডাক দিয়েছেন। সাবেক আল বদর প্রধান নিজামীও সেই সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। সংবাদে

প্রকাশ, 'আওয়ামী লীগকে ইসলামের দুশমন আখ্যায়িত করে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ঠেকাতে খতিব ও ইমামদের সহযোগিতা চেয়েছে নিজামী।' বিএনপি ও জামাতের কাছে আওয়ামী লীগ ইসলামের দুশমন এ কারণে যে তারা মনে করে, পাকিস্তান ইসলামের ঝাণ্ডা বরদার আর আওয়ামী লীগ পাকিস্তান ভেঙ্গেছে। এটি গোলামের গোলামদের কাছে অমার্জনীয় অপরাধ।

এই নিজামী সে সভায় বলেছে, '১৯৭২ ও ১৯৯৬ সালে দুবার ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামের নামে বোমাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য দেশের ইসলামী আন্দোলনের যে চরম সর্বনাশ হয়েছে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আওয়ামী লীগ কিছু আলেম-ওলামাকে তাদের পক্ষে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। তাদের এই প্রচেষ্টায় কোনো আলেম যেন শরিক না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য খতিব ও ইমামদের সতর্ক থাকতে হবে। আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যেন বর্তমান নাজুক পরিস্থিতির কোনো সুযোগ না নিতে পারে সে জন্যও খতিব-ইমামদের সহযোগিতা প্রয়োজন।' *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৬.৪.০৬)।

প্রথম কয়েক লাইনের অর্থ বিচার করুন। ১৯৭২-৭৫ ও ১৯৯৬-২০০০ সময়টুকু ছাড়া যারা ক্ষমতায় ছিল তারা ইসলামি বেরাদর। ১৯৯১-৯৬ ক্ষমতায় ছিল বিএনপি। শ্বেত শ্মশ্রুশোভিত তথাকথিত ইসলামি লেবাস ও টুপি পরিহিত ইসলামের এই ব্যবসায়ীর তখনকার কিছু বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি-

১. 'বিএনপি সরকার ইসলামি রাজনীতি নিষিদ্ধের তৎপরতা চালাচ্ছে।' (*মিল্লাত*, ২৫.০৩.০৯)।

২. 'ইসলামি জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না। ঐ দিনের সংবাদটি খানিকটা বিশদ আকারে উদ্ধৃত করছি যাতে মতলববাজ এই ঠিকাদারের চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়।' তিনি সরাসরি দলের উপনেতা কর্তৃক আসন্ন নির্বাচনে জামাত বিএনপিকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন দেবে এই মর্মে-প্রচারণের জবাব দিয়ে বলেন, বি চৌধুরীর এই বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক। শুধু জামাতে ইসলামি নয়, এ দেশের কৃষক-শ্রমিক ও ইসলামি জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না। (*ইত্তেফাক*, ২৪.০১.৯৪) ডা. ব. দ. চৌধুরী ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেননি। জামাত সে সময় অপ্রকাশ্যে পরে প্রাদেশ বিএনপিকে সমর্থন করে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দুটি মন্ত্রীর পদ তারা লাভ করে।

৩. 'এই সরকারের [বিএনপি] অধীনে ইসলাম তথা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব নয়, সাড়ে তিন বছরের শাসনই এই কথায় প্রমাণ বহন করে।' (*সংগ্রাম* ৭.৮.৯৪)।

৪. 'অতীতে নমরুদ, ফেরাউন, আবু লাহাব, আবু জেহেলরা সন্ত্রাস, নির্যাতন, হত্যা রিয়া যেমন ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করিতে পারে নাই, তেমনিভাবে এই

সন্ত্রাসী বিএনপি সরকারও ইসলামি আন্দোলনের নেতাকর্মীদের হত্যা করিয়া ও দেশের ইসলাম আন্দোলনকে স্তব্ধ করিতে পারিবে না। তিনি বলেন, 'বিসমিল্লাহর দোহাই দিয়া ইসলাম রক্ষায় জনতার সমর্থন লইয়া ক্ষমতায় গিয়া এই সরকার ইসলামের সামান্যতম মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহারা এই দেশ হইতে ইসলামকে মুছিয়া ফেলার ইহুদি ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের চেষ্টা করিতেছে।' (*ইত্তেফাক*, ১৯.১২.৯৫)

বিএনপি যদি বাংলাদেশ 'ইহুদি ষড়যন্ত্র' বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট থাকে তা হলে আজ জামাত কি তার অংশীদার? যদি তাই হয় তা হলে মুসলমানরা কি জামাতকে সমর্থন দিলে তা 'ইহুদি ষড়যন্ত্রে বাস্তবায়নে' সাহায্য করা হয় না? বিএনপি যদি এতো ইসলামবিরোধী হয় তা হলে জামাত কেন বিএনপিকে সমর্থন করছে? এগুলোর কোনো উত্তর পাবেন না। কারণ, এ দলগুলো এমন দল যারা যা খুশি তা করতে পারে। বিএনপি দুই আমলে ৪০ জন কৃষক হত্যা করেছে। অন্যান্য হত্যঅর কথা বাদ দিলাম। অবশ্য জামাতকে এ বিষয়ে পিছে ফেলতে পারেনি। জামাত বলেছিল, নারী নেতৃত্ব তারা মানে না, নাজায়েজ। কিন্তু বেগম জিয়ার সুগন্ধী আঁচলের তলায় দুই জামাতি 'লিডার' পোষা মুরগির মতো ধান খুঁটে খাচ্ছে। নিজামীদের সাহস থাকলে বলুক তারা এসব বক্তব্য দেয়নি? আর যদি দিয়ে থাকে তাহলে এখন বলুক 'ইহুদি ষড়যন্ত্র' বাস্তবায়নকারীদের সঙ্গে তারা কীভাবে আছে?

আমাদের সবসময় সবশেষে বাংলা প্রবাদের কাছে ফিরে যেতে হয় যার ভিত্তি শ শ বছরের অভিজ্ঞতা। এ ধরনের একটি বাক্য- পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়। আমাদের ৫০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, নিজামীরা কী না বলে, জামাত কী না করে।

জঙ্গি কেন হয়, জঙ্গি কেন থাকবে?

১৯৭১ সাল থেকে জঙ্গি বলতে আমরা একটি রাজনৈতিক দলকেই বুঝতাম, সেটি হচ্ছে জামাতে ইসলামী। এর আগে পাকিস্তানি আমলেও জঙ্গি জামাতকেই বোঝানো হতো। গত শতকের মধ্য পঞ্চাশে আহমদিয়াদের হত্যার জন্য তারা লাহোরে দাঙ্গা শুরু করেছিল। তৎকালীন সরকার তখন জঙ্গিবাদী নেতা মওদুদীকে গ্রেফতার করে ও সন্ত্রাসের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। পরে অবশ্য মার্জনা চাইলে মওদুদী দণ্ড থেকে অব্যাহতি পান।

জামাত তাদের সেই ঐতিহ্য থেকে কখনও বিচ্যুত হয়েছে-এমন দাবি কেউ করতে পারবে না। জামাতের প্রধান লক্ষ্য, যে করেই হোক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং পেশী ও অর্থের সাহায্যে কর্তৃত্ব বিস্তার। এ কারণে তারা তাদের মতো করে ব্যবহার করে। এ কারণেই তারা অনবরত মিথ্যা বলে। আমাদের দেশের মানুষের একটা বড় অংশ অশিক্ষিত নয় এবং শিক্ষিতদের একটি অংশ ডানপন্থী। আর এজন্যই জামায়াত মিথ্যা ও ধর্ম ব্যবহার করে বহাল তবিয়তে টিকে আছে।

জামাতের জঙ্গি রূপটা আমরা ভালভাবে অনুধাবন করি ১৯৭১ সালে। বেগম জিয়া সেটি অনুধাবনে অক্ষম। পাকিদের সহযোগী ভৃত্য হিসেবে জামাতিরা এমন কোন নারকীয় কাজে নেই যে করেনি। তাদের কিলিং স্কোয়াড আলবদরদের প্রধান ছিলেন মতিউর রহমনা নিজামী। সহযোগী ছিলেন জামাতের বর্তমান নেতৃবৃন্দ। এ বিষয়ে যথেষ্ট লিখিত তথ্যপ্রমাণ বিদ্যমান। তাদের হাত, জোব্বা এখনও রক্তে রঞ্জিত। আমাদের দূর্ভাগ্য, ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদদের জন্য আমরা সেই কিলিং স্কোয়াডের প্রধান ও সদস্যদের বিদায় করতে পারিনি। প্রধানত জিয়াউর রহমানই এজন দায়ী। মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ব্যালান্স করার জন্য কিলার জামায়াতিদের তিনিই সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পুর্নবাসন করেছিলেন।

আগেই বলেছি, জামাত তার হত্যার ঐতিহ্য সবসময়ে বজায় রেখেছে। ১৯৭১-৭৫ পর্যন্ত শুধু তা বন্ধ ছিল। সেনাবাহিনী (কারণ পরবর্তী দেড় শতক তারা ক্ষমতায় ছিল) ও জিয়া এবং এরশাদ অনুসারী নষ্ট রাজনীতিবিদদের প্রশ্রয়ে তারা তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য ১৯৭১ সালে লুকিয়ে রাখা এবং ১৯৭৫ সালের পর সরবরাহকৃত ও সংগৃহীত অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে। এর উদাহরণ রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরোধীদের রগ কেটে দিয়ে তারা আনন্দ

করত। খুন, জখমও তারা কম করেনি রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে। অস্ত্রবাজ জামাতদের কখনও সেনা ভজনাকারী জিয়া বা এরশাদের দল কিছু বলেনি। এভাবে জামাত বিখ্যাত হয়ে ওঠে রগকাটা দল হিসেবে। অবৈধ বৈদেশিক সাহায্য ও অন্যান্য পন্থায় গড়ে তোলা হয় দলের অর্থনৈতিক ভিত্তি। অস্ত্র ও অর্থ এভাবেই জামাতকে প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম তো সঙ্গে ছিলই।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, বিএনপি জামাতের সঙ্গেই জোট বাঁধবে। এখন অবস্থা এমন যে দুটি দলকে আলাদাভাবে দেখতে লেবাস ছাড়া সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। যে কারণে নিজামী, মান্নান ভূঁইয়ার লেবাস ছাড়া কথাবার্তা বা চালচলনে পার্থক্য নেই। তবে এক সময় বিএনপি ছিল সিনিয়র পার্টনার। এখন জামাত সিনিয়র পার্টনার। জুনিয়ারদের অবস্থা এখন এত খারাপ যে, ওঠবস করতে বললেও জুনিয়র তাই করবে। কারণ বিএনপির মধ্যেও জামাত/জঙ্গি সমর্থক বেড়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এর প্রমাণ।

সরকারে এসে জামাত তার জঙ্গি পরিচিতি আড়াল করার প্রয়াস নেয়। কারণ আন্তর্জাতিকভাবে জঙ্গি ইতিবাচক নয়। কিন্তু জঙ্গিরা না থাকলে সমাজ ও রাষ্ট্রে জামাতের অস্তিত্ব থাকে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় বিভিন্ন দল। সরকারি মুখপত্র হিসেবে পরিচিত এনটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন আসলে জেএমবিরই অংশ। কাজের সুবিধার জন্য তারা বিভিন্ন নাম গ্রহণ করে। বাংলাদেশে এরকম প্রায় ৬০টি দল আছে। যে যত অজুহাত বা ব্যাখ্যাই প্রদান করুন না কেন, আজ এ বিশ্বাস জন্মেছে এগুলো কোন বা কোনভাবে জামাতের সঙ্গে জড়িত।

যত জঙ্গি ধরা পড়েছে, তারা সবাই যুক্ত ছিল মাদ্রাসার সঙ্গে। অনেকে মাদ্রাসা পাস করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। সেক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মাদ্রাসার শিক্ষকরা এমন কিছু শিক্ষা দেয় যাতে একটি ছাত্র জঙ্গি হয়। বিভিন্ন জঙ্গি তাদের কনফেশনেও একথা বলেছে। সিলেবাসেও গণ্ডগোল আছে নিশ্চয়। সরকারি ও কওমি মাদ্রাসায় কর্তৃত্বের তফাৎ থাকতে পারে, কিন্তু অন্তিমে মূল বিষয়টি এক। যেমন-আমিনী-নিজামী কর্তৃত্বের ব্যাপারে একে অপরকে অপছন্দ করলেও একই জোটে আছেন এবং জঙ্গিবাদের সমর্থনে বিভিন্ন সময় বক্তব্য রেখেছেন। মাদ্রাসা সম্পর্কে কোন কথা উঠলেই আমিনীর হুঙ্কার শোনা যায়। জঙ্গিবাদ না চাইলে মাদ্রাসা শিক্ষায় পরিবর্তন আনতে হবে। একই আধুনিক শিক্ষার অন্তর্গত করে এর সংস্কার করতে হবে। কিন্তু তা রাজনীতিবিদরা করবেন কিনা সন্দেহ। প্রতি সরকারের সময় মাদ্রাসার বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে। এ আমলে আরও বেশি। এর কারণ, সেক্যুলার রাজনীতিবিদদের একটা বড় অংশ ধর্ম ব্যবহার করতে চেয়েছে। এভাবে রাজনীতিবিদরা স্রেফ সুবিধাবাদী পলিটিশিয়ান হয়ে রইলেন, স্টেটম্যান

হলেন না। পাকিস্তানের মতো দেশেও জেনারেলেরা তখন মাদ্রাসা রেজিস্ট্রিকরণসহ কিছু নিয়ম-কানুন আরোপ করছেন। আমাদের রাজনীতিবিদরা সে সাহসও অর্জন করেননি। মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রাখলে তাকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ বা সময়োপযোগী করতে হবে। এর সিলেবাসে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। না হলে জঙ্গি সৃষ্টি হবেই। জঙ্গি থাকবেই। আজ এ সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সাহস আমাদের দেখাতে হবে।

যতজন জঙ্গি ধরা পড়েছে তাদের অধিকাংশ বলেছে, কখনও না কখনও তারা জামাতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এ সূত্রে এই তত্ত্বই পাই যে, জঙ্গি সংগঠনগুলো জামাতের অঙ্গসংগঠন। যেমন-বিএনপি তাঁতি দলের সদস্যরা বলতেই পারে তারা বিএনপির নয়। কিন্তু আসল সত্যটি কী? নিজামী যদি বলেন, ১৯৭১ সালে আমি জামাত করিনি তখন কিছু বলার থাকে না। কারণ নিজামী তখন ছাত্র (শিবিরের) নেতা ও আলবদরের প্রধান। সে কারণে বলা যেতে পারে, সব জঙ্গি সংগঠনেরই মাতৃসংগঠন জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ, তারা স্বীকার করুক বা না করুক।

জঙ্গি নেতা আবদুর রহমান বলছে, তার আদর্শ হল 'সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী, অধ্যাপক গোলাম আযম, আহমেদ আবদুল কাদেরসহ বেশ কয়েকজন ইসলামী লেখক। এদের লেখা বই নিয়মিত পড়া ছাড়াও জেএমবির মজলিস-ই-শূরা সদস্যের পড়া ছিল বাধ্যতামূলক।' (*ইত্তেফাক* ৬-৬-৩-০৫)। অধিকাংশ জঙ্গির কাছে এ ধরনের বই ও সাঈদীর ক্যাসেট পাওয়া গেছে। জামাত বলতে পারে, এসব বই পড়ার অধিকার সবার আছে। আছে, কিন্তু ধর্মব্যবসায়ীদের দলের সমর্থক ছাড়া কেউ এদের বই পড়ে না। কিছু একাডেমিশিয়ান গবেষণার জন্য পড়তে পারে। প্রধানমন্ত্রী থেকে প্রায় সব মন্ত্রী জঙ্গি কর্মকাণ্ডের জন্য এখনও আওয়ামী লীগকে দোষী করেন। মওদুদী, গোলাম আযম, সাঈদী কি আওয়ামী নেতা?

জঙ্গিদের টাকা আসে কোথা থেকে? ইনকিলাবের মতো চরম ডানপন্থী পত্রিকাও শিরোনাম করেছে- 'জামাতে ইসলামী পরিচালিত ব্যাংকে জেএমবির অর্থ লেনদেন' (৮-৩)। দেশের ৬টি পূর্ণাঙ্গ ও ৭টি সনাতন ব্যাংক পরিচালিত হয় শরিয়া কাউন্সিল দ্বারা। যার প্রধান সরকারি কর্মচারী বায়তুল মোকাররমের খতিব। এই কাউন্সিলের কোন জবাবহিদিহা নেই এবং তা অবৈধ (জনকণ্ঠ ৮-৩)। অর্থমন্ত্রী কি তা জানেন না? জানেন। কিন্তু করার কী আছে, জঙ্গি তো জোটেরই সৃষ্টি। আর অবৈধ কাজকামের সংখ্যা এ আমলেই বেশি।

জঙ্গিরা যদি জোট সরকারের প্রশ্রয় না পেত বা সমর্থন না থাকত তাহলে গত ৪ বছরে এতসব নিষ্ঠুর অমানবিক কাণ্ড ঘটত না। আজ যদি আবদুর রহমান বা সিদ্দিকুল ইসলামকে ধরা যায়, তাহলে ৪ বছর আগে তারা যখন হত্যাকাণ্ড শুরু করে তখনও তাদের ধরা যেত। এদের দু'জনকে ধরতে বাধ্য হওয়ার আগ পর্যন্ত

সরকারের প্রতিটি মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, নেতা, র‍্যাব, পুলিশ তাদের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেছে। গত ৪ বছরের পত্রপত্রিকায় এর অজস্র উদাহরণ আছে। কয়েকটি উদাহরণ-

১. প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া থেকে জোটের নিম্নতম কর্মী পর্যন্ত বলেছেন, বাংলাদেশে জঙ্গি বলে কিছু নেই। আছে কিছু সন্ত্রাসী, যার মদদদাতা আওয়ামী লীগ ও ভারত। নিজামীর ক্লাসিক উক্তি স্মরণীয়-বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি। এখন তাহলে জঙ্গি এলো কোথা থেকে? অর্থাৎ জোটের সবাই মিথ্যাচার করেছে। এটি খুবই লজ্জার বিষয়। দুইদিন আগেও প্রধানমন্ত্রী এক জনসভায় একই ধরনের ইঙ্গিত করেছেন।

২. অথচ জঙ্গিরাই বলেছে সরকার তাদের সমর্থন করছে। কিছু উদাহরণ-

ক. কথিত বাংলা ভাইয়ের অস্তিত্ব নেই- ভূমি উপমন্ত্রী দুলু (*প্রথম আলো* ২৩.৫.০৪)।

খ. 'বাংলা ভাই ঠিক কাজই করেছে'- নূরুল হুদা, রাজশাহী জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি (ওই, ২৫.৫.০৪)

গ. তথাকথিত বাংলা ভাইয়ের যদি কোন অস্তিত্ব না থাকে, বাংলা ভাই যদি একটা কাল্পনিক চরিত্র হয়, তাহলে পুলিশের কী করার থাকতে পারে (মন্ত্রী ও জামাত প্রধান নিজামী (ওই, ২৩.৬.০৪)।

ঘ. 'সর্বহারাদের সন্ত্রাসের মধ্যে বাংলা ভাইয়ের কর্মকাণ্ড সিন্দুর মধ্যে একটা বিন্দু মাত্র'-১৯৭১ সালে আলবদর প্রধান, বর্তমানে জামাত নেতা ও মন্ত্রী নিজামী (ওই, ২৩.৬.০৪)।

ঙ. 'বাংলা ভাই সম্ভবত বাংলাদেশের বাইরে পালিয়ে আছে'-স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর (ওই, ৮.৩.০৫)। সরকারের মন্ত্রীরা বিশেষ করে বাবর, মান্নান ভূঁইয়া ও নিজামী পুরো বিষয়টা নিয়ে ঠাট্টা করে বাংলা ভাইকে ইংলিশ ভাইও বলতেন।

এছাড়া ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন পত্রিকায় খবর অনুযায়ী মন্ত্রী আমিনুল হক, আলতাফ হোসেন, আলমগীর কবির, সংসদ সদস্য নাদিম মোস্তফা প্রমুখ জঙ্গিদের সমর্থন দিয়েছেন। এরা সব বিএনপির। বাবর এতদিনে এই প্রথম বুদ্ধিমানের মতো বলেছেন, 'বাংলা ভাইকে নিয়ে সংবাদপত্রের খবর সত্য'। এটি না বললে সরকারের নজিরবিহীন সাফল্যের কথা আবার বলা যায় না।

সিদ্দিকুল ইসলাম রাজশাহীতে নজিরবিহীন সমর্থন পেয়েছিল বিএনপি সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, নেতা, পুলিশ অফিসার, জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে। মাত্র কয়েক মাস আগে প্রথম আলোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সিদ্দিকুল বলেছিল- 'প্রথম আলো। আপনি নাটোরের উপমন্ত্রী দুলু, রাজশাহীর এসপি মাসুদ মিয়াসহ এ অঞ্চলের বড় বড় নেতা এবং পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। কি কথা

হয়েছে তাদের সঙ্গে? তারা কীভাবে আপনাকে সাহায্য করেছেন?

বাংলা ভাই এদের সঙ্গে আমার সরাসরি সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে, তারা আমাদের কাজে খুশি' (৫.৫.০৪)।

সুতরাং, বিরোধী দলসহ অনেকেই যদি একে সাজানো নাটক বলে তাতে অতিশয়োক্তি নয়। জোট দেশে-বিদেশে প্রমাণ করতে চায় তারা জঙ্গিবাদের সমর্থক নয়। কিন্তু তা ধোপে টিকছে না। সরকার সত্য অস্বীকার করতে পারেন, নিজামী পারেন, কিছু কিছু কলামিস্ট তাদের হয়ে কলম ধরতে পারেন কিন্তু সবাই তো আর পুতুল নয়। জোট কি ধরত বাংলা ভাই বা রহমানকে? মোটেই না, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আলটিমেটামের কারণেই ধরতে হয়েছে। সে কারণে দু'মাস আগে মান্নান ভূঁইয়া বলেছিলেন, দু'মাসের মধ্যে জঙ্গি নেতা ধরা পড়বে। আড়াই মাসের মধ্যে ধরা হল। আবার দেশে ফিরে বললেন, কয়েকদিনের মধ্যে বাংলাভাইকে ধরা হবে। দু'দিনের মধ্যে বাংলা ভাইকে ধরা হল। এতসব কাকতালীর ঘটনা ঘটতে পারে না। সরকার ধরতে বাধ্য হয়েছে। কারণ জনজীবনে সঙ্কট এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। বিরোধী দলকে টাকা খরচ করতে হচ্ছে না তেমন, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিরোধীদের বিশাল বিশাল সমাবেশ হচ্ছে। ফলে লোকজনের দৃষ্টি, মিডিয়ার দৃষ্টি অন্যদিকে নেয়া দরকার। মিডিয়াকে অনুরোধ, জঙ্গিদের ছাড়াও সার-বিদ্যুৎ সঙ্কট, কৃষকদের বিক্ষোভগুলো যথাযথভাবে তুলে ধরার। এয়ার মার্শাল আসগর খান বলেছেন 'বর্তমান ইসলামী জঙ্গিকে কেন্দ্র করে আমরা যে সমস্যা দেখছি তা আসলে সৃষ্টি করা একটি ইস্যু। রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই জঙ্গিদের সৃষ্টি করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।...এখন এই জঙ্গিবাদকে ক্ষমতার স্বার্থেই নানাভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কখনও এদের ব্যবহার করে ইস্যু সৃষ্টি হচ্ছে, কখনও শাসকরা নিজেদের স্বার্থেই এদের নির্মূল করছে। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে এর চরম মূল্য দিতে হচ্ছে মানুষকে। (*জনকণ্ঠ* ৮.৩.০৫)। তিনি আরও বলেছেন, পাকিস্তানি মৌলবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এখানকার জঙ্গিদের। এটি নতুন কথা নয়। আমরা এসব কথা অনেকবার বলেছি। শুধু পাকিস্তান নয়, ভারত, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশের মৌলবাদীদের সঙ্গেও এদের সম্পর্ক আছে। এসব দেশের কিছু সংস্থা বিশেষ করে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এদের মদদ যোগাচ্ছে এটিও অনেকবার পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে। শায়খও জিজ্ঞাসাবাদে তাই বলছে।

সরকারের সঙ্গে যে জঙ্গি নেতাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এর প্রমাণ আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের সময় অনেক আলামত নষ্ট করা। সিজার লিস্টে অনেক কিছু বাদ দেয়া হয়েছে। এগুলো পত্রপত্রিকার খবর। আবদুর রহমান প্রশ্নোত্তরে বলেছে, 'জোট সরকারের এক প্রভাবশালী নেতার টিনসেডে গ্লাসের গাড়িতে সপরিবারে তাকে সিলেট শহরে পৌঁছে দেয়া হয়। .....একটি পতাকাবাহী

গাড়ি কাঁচপুর ব্রিজ পর্যন্ত তাদের গাড়িটিকে গার্ড করে পৌঁছে দেয়' (*জনকণ্ঠ*, ৮.৩.০৬)। জানা গেছে, পত্রিকার খবরে প্রশ্নোত্তরের সময় জোট নেতাদের নাম বললে টেপ বন্ধ করে দেয়া হয়। (এত গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তারপরও সব খবর পত্রিকায় আসছে কিভাবে?)। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে কিনা গোয়েন্দাদের এই প্রশ্নে (এ সময় ভিডিও বন্ধ ছিল) 'শায়খ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, জেএমবির সঙ্গে কারা জড়িত তা কেবল সরকার ও সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন জানে! এছাড়া গোটা দেশবাসীই জানে। শায়খ এ সময় বলেন, দলের গঠনতন্ত্র পাল্টে জোটে যোগ দিয়ে যারা ক্ষমতায় আসীন রয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে সংসদ নির্বাচনের সুযোগ আদায়ের লোভে এতদিন তারাই জেএমবিকে মদদ দিয়েছে। ....জামাত দেশের অন্যান্য ইসলামী সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার ভয়ে সভা-সমাবেশ করে জঙ্গিবিরোধী মতবাদ প্রচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে।' (ওই) একটি পরিসংখ্যান দেখুন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ২২৮টি মামলার রায় হয়েছে ৪টি। দ্রুত বিচারে কোন মামলা নেই। চার্জশিট হয়েছে ১২২টির মধ্যে ১০৬টির। তদন্তে ত্রুটি ৯০টি (অনেক জঙ্গি ছাড়া পেয়েছে এ কারণে। সিদ্দিকুল ইসলামকেও একবার ধরে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল)। বিচারাধীন আছে ৬১টি (*যুগান্তর, ৮.৩.০৬*)। এসব পরিসংখ্যান কি তুলে ধরে সরকার জঙ্গিবিরোধী? এরা এবং জোটের চামচারা জানে না, প্রয়োজনে জোটের নীতিনির্ধারকরা এদের ছেঁটে ফেলবে। শায়খকে ধরিয়ে দিল সে, যে আশ্বাস দিয়েছিল তাকে ধরা হবে না, শায়খ ধরিয়ে দিল বাংলা ভাইকে, এরা আবার ধরিয়ে দিচ্ছে তাদের অনুচরদের, জামায়াতি নেতারা এখন তাদের অস্বীকার করছে, মাসুদ মিয়াদের চাকরি যাচ্ছে, প্রয়োজনে মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদেরও যাবে।

র‍্যাব-পুলিশদের দৃষ্টিভঙ্গিও লক্ষণীয়। র‍্যাবের ক্রসফায়ারে অনেকে নিহতহলেও কোন জঙ্গি নিহত হয়নি। 'সন্ত্রাসী'দের হত্যার পর র‍্যাব তাদের তুমি বলে সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করে আর আবদুর রহমানদের বলে আপনি। তাদের ভালভাবে নাশতা পানি খাওয়ানো হয়। ডাক্তার দেখানো হয়। বাংলা ভাইকে ধরার পর পাখার বাতাস করা হয়। অথচ মনে পড়ে, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীরকে গ্রেফতার করে অমানুষিক নির্যাতনের পর প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও দেয়া হয়নি। বাংলা ভাই রুটি-হালুয়া পছন্দ করে বলে তাকে তা দেয়া হয়েছে। আরও লক্ষ্য করুন, বাংলা ভাইয়ের শরীর সামান্য ঝলসে গেছে ও দুটি স্প্রিন্টার ঢুকছে। তাকে বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেছে। এমনকি সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারও। অথচ নির্বিরোধী শাহ কিবরিয়া পিন্টারে ঝাঁঝরা হয়ে ছ ঘণ্টা বেঁচে রইলেন। তার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না, বেসরকারি বা

সরকারি হেলিকপ্টারও না। অথচ তিনি যে সাবেক অর্থমন্ত্রী ছিলেন তাই-ই নয়, বর্তমান সংসদের সদস্যও ছিলেন। সুতরাং এ ধরনের পুলিশ, র‍্যাব থাকলে, জোট থাকলে, ইসলামের ঠিকাদার হিসেবে পরিচিত দলগুলো থাকলে, মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়লে জঙ্গি শুধু থাকবে না, সংখ্যাও বাড়বে।

এ জঙ্গিরা এ পর্যন্ত বিচারক, পুলিশ, আইনজীবীসহ ২৯ জনকে হত্যা করেছে, আহত হয়েছেন ৯ শতাধিক আর চির পঙ্গত্ববরণ করেন ২ শতাধিক (*ইত্তেফাক*, ৫.৩.০৬)। এসবের জন্য শুধু শায়খ/বাংলা ভাই বা জঙ্গিদের দায়ী করলে অবিচার হবে। যারা এদের প্রশ্রয় দিয়েছে এসব প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ডের, যেসব পুলিশ অফিসার এসব হত্যাকাণ্ডের মামলা নেয়নি, যেসব সংসদ সদস্য, মন্ত্রী এদের প্রকাশ্যে সহায়তা করেছে তাদেরও গ্রেফতার করতে হবে। না হলে ন্যায্যবিচার হবে না এবং জোট যে জঙ্গিদের সমর্থক তাও আবার প্রমাণিত হবে। জঙ্গি দমন হতে পারে, জঙ্গিবাদ দূর হতে পারে যদি বিরোধী দল ঘোষণা করে, তারা ক্ষমতায় গেলে দ্রুত অতি দ্রুত বিচারালয় স্থাপন করে জঙ্গি ও এর সমর্থকদের বিচার করবে এবং ২৯ জন নিহত, ৯০০ আহত ও পঙ্গু হয়ে যাওয়া ২০০ জনকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবে জঙ্গি ও তাদের সমর্থকদের। এতে তাদের লুটের কিছু টাকা নির্যাতিত গরিবরা পাবে। তাহলে জঙ্গিবাদ নির্মূল হওয়ার আশা করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, ঘোষণা করতে হবে (যদি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী হন) বাংলাদেশ হয়েছিল জঙ্গি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র হিসেবে এবং বাংলাদেশ তা-ই থাকবে। জানি না, বিরোধীদের সে মুরোদ বা সৎসাহস আছে কিনা।

৬ জুন, ২০০৬

গণতন্ত্র ও যুদ্ধাপরাধ একসঙ্গে নয়

জামাত ও তাদের সমর্থকদের সাম্প্রতিক বিষোদগার হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন বিষয় নয়। এর একটা প্যার্টান আছে এবং প্রায় তিন সপ্তাহ আগে এই প্রথমবার তারা এ ধরনের বক্তব্য রাখল, তাও নয়। অতীতেও রেখেছে, দেশে যখন কোন সংকটের আশংকা দেখা দেয় বা তাদের ওপর মনোযোগ বেশি দেয়া হচ্ছে বলে মনে হয় তখনই তারা এ ধরনের উক্তি করে। এর একটা কারণ আছে। দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সংবেদনশীল। এ ধরনের মন্তব্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যারা, কিছু রাজনীতিবিদ, সিভিল সমাজের বিভিন্ন গ্রুপ এ প্রতিবাদে অংশ নেয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি তোলে। কিছু দিন পর সবাই আবার আগের অবস্থানে ফিরে যায়। এরই মধ্যে দেখা যায় আশংকিত সংকট আর কোন ইস্যু নয়। জামাত থেকেও দৃষ্টি সরে যায়। লক্ষণীয় এ সময় সরকার [সব সরকার] রেফারির ভূমিকায় বা 'নিরপেক্ষ' থাকে। এর অর্থ, জামাত যে এসব মন্তব্য করে তার পেছনে পৃষ্ঠপোষকতা বা নির্দেশ আছে বলেই সে করে। সেই সিভিল সমাজের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী গ্রুপ বা রাজনৈতিক দল যে-কেউ হতে পারে।

সম্প্রতি জামাত যে এসব মন্তব্য করেছে এর অনেক কারণের একটি হতে পারে। চারদিক থেকে বলা হচ্ছে, জামাতকে অনেক বিষয়ে ছাড় দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে সরকার পক্ষ থেকেও স্বীকার করা হচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, সার সংকট প্রকট। বিশ্ববিদ্যালয় আপাতত মনে হচ্ছে শান্ত, কিন্তু সেটি নাও হতে পারে। যেভাবে সরকার চেয়েছিল (উপদেষ্টার মতে) সেভাবে রাজনীতি চলছে না, চারদিকে অস্বস্তি। হয়তো এসব কারণে জামাতের এসব মন্তব্য। জামায়াতি মন্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ধারাবাহিকভাবে এগুলো দেয়া হচ্ছে এবং এমনভাবে দেয়া হচ্ছে যেন মানুষজন অসন্তুষ্ট হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আপনারা হয়তো এসব মন্তব্য দেখেছেন। তবুও কিছু উল্লেখ করছি-

১. মুজাহিদ 'যুদ্ধাপরাধী বলে কিছু নেই।'

২. কাদের মোল্লা 'কেউ সুন্দরী নারীর লোভে, কেউ ভারতীয় স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধ করেছে।; (মোল্লা অবশ্য বলেছেন, তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেননি)।

৩. শাহ হান্নান : ১৯৭১ সালে যা হয়েছিল তা 'গৃহযুদ্ধ'।

৪. মাহমুদুর রহমান : ‘এমনিতে মুদ্রাস্ফীতির চাপে জনগণের এখন দিশেহারা অবস্থা। এর ওপর দেশে কোন কর্মসংস্থান নেই। বর্তমান সময়ে জনগণের জন্য এর চেয়ে বড় কোন সংকট নেই। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি করার মতো বিলাসিতা এখন জনগণের নেই। (*প্রথম আলো*, ১৩.১১.০৭)

৫. বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির আইন অনুষদের ডিন এবিএম মাহবুবুল ইসলাম ‘যুদ্ধাপরাধী হতে হলে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে যুদ্ধ হয়েছে পাকিস্তান ও ভারতে মধ্যে। বাংলাদেশে সেই যুদ্ধের অংশ ছিল না। এ কারণে বাংলাদেশ কখনোই যুদ্ধাপরাধী ছিল না।’ (ঐ)

৬. চট্টগ্রামের ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ড. মোঃ আবদুস সামাদ যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলে এদেরই বিচার করা উচিত। কারণ, এরা গত ৩৬ বছরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেনি। (ঐ) এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অপরিচিত শিক্ষকও এ ধরনের মন্তব্য করেছেন।

৭. ১৪ নভেম্বর আরেক সভায় গিয়াস কামাল চৌধুরী অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ, জামাত, খেলাফত মজলিশ ও তাদের সমর্থকরা আরেকটি সভায় ‘বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবিদারদের প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন।’ [*প্রথম আলো*, *১৪.১১.০৭*]

৮. জামাতের সহকারী সচিব ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক। ‘সংবিধান পরিবর্তন না করে এই দাবি পূরণ করা সম্ভব নয়। সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে গণভোট করতে হবে।’ (ঐ)

৯. অ্যাডভোকেট মসিউল আলম : যারা বিচার দাবি করছে তাদের উদ্দেশ্যে- ‘ধরে নিয়ে বিচার করলে আপনাদেরও তো ধরে নিয়ে যেতে পারে। ধরাধরি শুরু হয়ে গেলে তো কেউ রেহাই পাবেন না।’ (ঐ)

১০. সাদেক খান ‘একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারাও যুদ্ধাপরাধ করেছে, বিচার করতে হলে দুই পক্ষেরই করতে হবে।’ [প্রথম আলো, ১৫.১১.০৭] উল্লেখ্য, প্রেস ইন্সটিটিউটের এক সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। তিনি এর সভাপতি।

১১. সেই মাহবুবুল ইসলাম : ‘সংবিধান জারি হয়েছে ১৯৭২ সালে। কাজেই ’৭২ সালের পর থেকে দেশের কোন নাগরিক যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেই কেবল তার বিচার করা যাবে।’

এখানে থেকেও প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সেনাধাক্ষ্যকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয়া হয়। প্রশংসা করা হয় ব্যারিস্টার মইনুলের। একই সঙ্গে সমান্তরালে চ্যালেন আইয়ে বঙ্গবন্ধুর খুনি কর্ণেল রশীদের সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়েছে। বিচারের সম্মুখীন করার জন্য নাকি তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি

বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা করে, তার খুনের সঙ্গে জড়িত হিসেবে জেনারেল জিয়ার কথা বলেছেন। তার মেয়ে তথাকথিত ফ্রিডম পার্টির স্বঘোষিত সভাপতি মেহনাজও একই কথা বলেছেন।

২.

এসব মন্তব্যের সার কথা হল-

১. বঙ্গবন্ধুর অবান্তর প্রশংসা

২. যুদ্ধাপরাধী নেই, কারণ, যুদ্ধ হয়েছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে

৩. বঙ্গবন্ধু সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, সুতরাং এসব প্রশ্ন ওঠানো উদ্দেশ্যমূলক।

৪. সংবিধান/বিধি না বদলালে বিচার করা যাবে না।

৫. যারা বিচারের দাবি তুলছে তাদের প্রতি দেয়া হয়েছে প্রচ্ছন্ন হুমকি।

আইনবিদ ও অন্যরা ইতিমধ্যে এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিস্তারিতভাবে। শুধু বলা যেতে পারে জামাত ও জামাত সমর্থকরা যা বলেছে তা ডাহা মিথ্যা। এটি তাদের ট্রেড মার্ক, নতুন কিছু নয়। যুদ্ধ ভারত-বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর সঙ্গে হয়েছে। সুতরাং এটি গৃহযুদ্ধ তো নয়ই, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধও নয়। সংবিধান ও ১৯৭৪ সালের জরুরি আইনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিধি এখনও বলবৎ। পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী দেশে ফিরে গেছে চুক্তি মোতাবেক। তাদের বিচারের দাবি তোলা যায়, কিন্তু তা করার দায়িত্ব পাকিস্তানের। কিন্তু তাদের সহযোগী বাঙালি যুদ্ধাপরাধীরা এ দেশেই আছে, সুতরাং স্পেশাল ট্রাইব্যালে তাদের বিচার করা যাবে। দেশী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি বা বঙ্গবন্ধু ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচার করা যাবে। দেশী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি বা বঙ্গবন্ধু তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এটিও মিথ্যা, তবে অনেকে তা বিশ্বাস করেন।

আমার কাছে এখন একটি বিচারের রায়ের কপি আছে। ময়মনসিংহের তৃতীয় স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারের রায়। বিচারক কেএ রউফ। কোলাবরেশন কেস নং-৩২, সাল ১৯৭২। রাষ্ট্র বনাম রজব আলী ওরফে আমিনুল ইসলাম, মৌলভী কুতুবুদ্দিন আহমদ। রায় দেয়া হয়েছে ১৩.১.১৯৭৩ সালে।

আলীনগর গ্রামের আলবদর প্রধান রজব আলী ২০ আশ্বিন ১৩৭৮ সালে আলবদর ও রাজাকারদের নিয়ে আবু তাহের মিয়া ও বাড়ির কয়েকজনকে থানায় সোর্পদ করবে বলে ধরে নিয়ে যায়। এছাড়া ঘরে তৈজসপত্র, টাকা-পয়সা লুট করে। স্বাধীনতার পর আবু তাহেরের পিতা থানায় এজাহার দেন। থানার তদন্ত রিপোর্টে রজব আলীর কোন দোষ পাওয়া যায়নি। বাদী নারাজি দরখাস্ত দেন। কিশোরগঞ্জের তৎকালীন এসডিও-ও এটি প্রত্যাখান করেন। এসডিওটি কে

কিশোরগঞ্জের কেউ জানালে খুশি হব। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল এই আবেদন গ্রাহ্য করে বিচার শুরু করে। রায়ে বলা হয়, রজব আলী আবু তাহেরকে ধরে নিয়ে যায় এটি সবাই দেখেছে, তবে রজব আলী তাকে হত্যা করেছে এমন চাক্ষুষ প্রমাণ নেই। কিন্তু আবু তাহের ফেরেননি, সাক্ষীরা বলেছেন, তার লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হয়। সুতরাং আবু তাহেরকে হত্যার জন্যই রজব আলী ধরে নিয়ে গিয়েছিল। রজব আলীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।

রায়টি উল্লেখ করলাম কয়েকটি কারণে-

১. জামায়াতিরা যে বলছে, বিচার হয়নি বা ক্ষমা করা হয়েছে তা ঠিক নয়।

২. জামায়াতিরা বলছে, তারা হত্যা করেছে এর প্রমাণ কী? সমসাময়িক পত্রপত্রিকা, জামায়াতি মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রামে* নিজামী-মুজাহিদ কাদের মোল্লা গংয়ের কীর্তি কাহিনী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য আছে এবং গত ৩৬ বছরে নিজামী-মুজাহিদ গং এগুলো অস্বীকার করেনি। ট্রাইব্যুনালে এব তথ্য-প্রমাণই যথেষ্ট, রজব আলীর মামলা এর প্রমাণ। নিজামী বা মুজাহিদ নিজ হাতে খুন করেছে কিনা এমন প্রমাণের দরকার নেই।

৩. নিজামী-মুজাহিদরা ঢাকায় থাকলেও তাদের অনুসারী রজব আলীরা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং সারাদেশে এদের হত্যাকাণ্ডের সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। শুধু নয়, রাজাকার-আলবদর সব একজোট হয়ে বাঙালি নিধন করেছিল এবং তা ছিল ব্যাপক।

৪. কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থানার আলীনগর বাসিন্দাদের অনুরোধ করব, আপনারা আলবদর রজব আলীর খোঁজ করুন। দেখবেন, তাকে যাবজ্জীবন খাটতে হয়নি, সে ছাড়া পেড়েছে ১৯৭৫ সালে। জেনারেল জিয়া এক ফরমান বলে এদের মুক্তি দেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সুযোগ দেন। সামরিক শাসক জিয়া ও এরশাদ এদের পুর্নবাসন করেন ও জিয়ার স্ত্রী বেগম জিয়া এদের শুধু প্রশ্রয় নয়, ক্ষমতায় বসিয়েছেন। সুতরাং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়ার কারণ তারা। গণআদালতে এদের প্রতীকী বিচার হলে বেগম জিয়া গণআদালতের উদ্যোক্তাদের দেশদ্রোহী ঘোষণা করে আদালতে সোর্পদ করেন। এর অর্থ জামায়াতকে রাষ্ট্রীয় পোষকতা দেয়া হয়েছে গত ৩০ বছর। নইল তাদের তাড়ানোর ক্ষমতা ছিল না।

৩.

সব বক্তব্য দিয়েছে জামাতি ও তাদের সমর্থকরা সে বিষয়ে সরকার নীরব। এসব বক্তব্য দেশদ্রোহিতার শামিল। এর চেয়ে কম অপরাধের জন্য অনেককে দণ্ডিত করা হয়েছে। জরুরি অবস্থায় যদি দেশদ্রোহিমূলক বক্তব্য জায়েজ হয় তাহলে ১২ জন শিক্ষক --- কেন-এ প্রশ্ন আজ উঠেছে। পিআইবির চেয়ারম্যান সাদেক খান এত মারাত্মক বক্তব্য দিয়েও স্বপদে। বাংলাদেশবিরোধী বক্তব্য দিয়েও

জামাতি শিক্ষকরা স্বপদে বহাল। মঞ্জুরি কমিশন নিশ্চুপ। এসব নীরবতার অর্থ যে আমরা বুঝি না তা নয়। হ্যাঁ, সরকারের তিনজন উপদেষ্টা ও সিইসি বলেছেন, বিচার হওয়া উচিত। সিইসি বলেছেন দায়িত্ব সরকারের। যুদ্ধাপরাধ ও যুদ্ধাপরাধীদের কথা স্বীকার করেও প্রধান উপদেষ্টা আছেন। বিচার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে উপেদেষ্টা মইনুল হোসেন বলেছেন, সরকার অনেক দায়িত্ব হাতে নিয়েছে আর বাড়তি দায়িত্ব নেবে না।

আদালতে যাওয়ার কথা যারা বলছেন তারা প্রচ্ছন্নভাবে জামাতকেই সমর্থন করছেন। আদালত গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দিয়েছিলেন, যার ফলে জামাত বাংলাদেশে শক্তিশালী শুধু হয়েছে তাই নয়, পরোক্ষভাবে যুদ্ধাপরাধকে গ্রাহ্য করা হয়নি। যাঁরা যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য প্রচলিত আদালতে যাবেন, তারা জামাতকেই সাহায্য করবেন। সংবিধান, আইন অনুযায়ী সরকারকেই বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এদের বিচারের বন্দোবস্ত করতে হবে। এটিই বর্তমান সরকারের কাজ নয়- এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, সরকারের দায়িত্ব ছিল শুধু নির্বাচন করা, হাটবাজার, দালানকোঠা ভাঙ্গা, রাজনীতিবিদদের জেলে পোরা, পৌর নির্বাচন করা, স্বায়ত্বশাসন দেয়া-এগুলো তাদের দায়িত্ব ছিল না। শুল্ক ফাঁকি, কর ফাঁকি, চাঁদাবাজি, জরুরি আইন 'ভঙ্গ' করার জন্য গ্রেফতার ও বিচার করা যাবে, কিন্তু খুনের জন্য নির্বাচনে নিষিদ্ধ বা গ্রেফতার করে বিচার করা যাবে না এটা কোন লজিক নয়। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ওইসব ব্যবস্থা জরুরি হলে, যুদ্ধাপরাধাদের বিচারও জরুরি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য। সরকার ওই সব কাজ হাতে না দিলে এ দাবি উঠত না। আগে কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ওঠেনি।

তবে এই প্রথম কোন সরকারের একাংশ স্বীকার করল যে, যুদ্ধাপরাধ হয়েছে এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা উচিত। জামাত এতে খানিকটা বিচলিত। জনমতও প্রবল হয়ে ওঠেছে। তাই জামাত বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা করেছে। এভাবে যদি সরকারের একাংশ ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের তুষ্ট করে প্রতিরোধটা নমনীয় করা যায়। আবার একই সঙ্গে ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কনফনট্রেশনে যেতে চাইলে এবং এ জন্যই বুদ্ধিজীবী হত্যার ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এতে যদি নির্বাচন স্থগিত হয় তা হলে তারাও বাঁচবে আর যারা সরকারের স্থায়িত্ব চাচ্ছে তাদের কৌশলও সফল হবে। এটি জামাতের দ্বিমুখী স্ট্রাটেজি। আমরা যেহেতু নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী, তাই আমাদের উচিত হবে কোন রকম প্ররোচনায় উত্তেজিত না হয়ে ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি জোরদার করে তোলা।

জামাত যে গত ৩০ বছরের মতো এখনও পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে তার একটি প্রমাণ নিজামী-মুজাহিদের বিরুদ্ধে এখনও দুর্নীতির কোন অভিযোগ না তোলা বা

তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তব্যে প্রতিক্রিয়া না জানানো। গণতন্ত্র ও যুদ্ধাপরাধ একসঙ্গে চলতে পারে না। অন্যান্য অনেকবারের মতো এবারও এ দাবি ধামাচাপা পড়ে যেতে পারে সাম্প্রতিক দুর্যোগের কারণে। আগেও এ রকমটি হয়েছে। আমাদের উচিত, দুর্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে এ দাবি প্রতিদিন তোলা, যাতে নিজামী-মুজাহিদ, রজব আলীদের দুষ্কর্ম বিস্মৃতিতে তলিয়ে না যায়। সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতেও অটল থাকা। এই বিচার ও নির্বাচন পরস্পরবিরোধী নয়। সত্তরের মহাদুর্যোগের পরপরই নির্বাচন হয়েছিল। এ বিচার সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করবে। এ দাবি আবার হারিয়ে না গেলেই আমরা আশাবাদী হতে পারি। গণমানুষ চাইলে বিচার হবেই। রাষ্ট্রে লজিক ফিরিয়ে না আনলে এ রাষ্ট্র অস্বাভাবিক থাকবে যেমন আছে মিয়ানমার বা পাকিস্তান। দুর্নীতি দমনে কিছুই হবে না। চুরি ও খুন দুটিই অপরাধ। কিন্তু কোনটি বড় অপরাধ তা নির্ণয়ের দায়িত্ব শাসকদের এবং এটিই সুশাসনের একটি নিরিখ।

গ্রামের লোকেরা রজম আলীদের ভোলেনি, তাদের কথাও সবার মুখে মুখে। আমরা শহুরের (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান) নিজামী-মুজাহিদ-কাদের মোল্লাদের ভুলি কিভাবে? তাদের এবং তাদের কৃতকর্ম ভুলে যাওয়া আরেকটি বড় অপরাধ। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কখনও এ ধরনের অপরাধ ক্ষমা করে না। এটিই ইতিহাসের সাক্ষ্য।

২৩ অক্টোবর, ২০০৭

রাজাকারদের জন্য আলাদা গোরস্থান চাই

বেশ কয়েক বছর আগে লন্ডনে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। বিলেতে আছেন বছল পঞ্চাশেক হলো। আলাপের এক পর্যায়ে জানালেন, তিনি তার সন্তানদের বলেছেন, তাঁর মৃত্যু হলে তাঁকে যেন বাংলাদেশে তাঁর গ্রামের মাটিতে দাফন করা হয়। জানতে চাইলাম, কোন গ্রাম? তিনি আর গ্রামের নাম মনে করতে পারেন না। এটুকু মনে আছে তা নোয়াখালীতে। কিন্তু গ্রামটি আছে না নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে তা তার জানা নেই। কারণ প্রায় ৫০ বছর তার সঙ্গে গ্রামের কারো সঙ্গে যোগাযোগ নেই। ঘটনাটি বিস্ময়কর বটে কিন্তু সত্য। আমার কাছে আরো বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, তাঁর সঙ্গে সেই গ্রাম বা গ্রামের কেউ বা আত্মীয়স্বজন কারো সঙ্গে যোগাযোগ নেই, কিন্তু গ্রামে তিনি সমাহিত' হতে চান। একেই বোধহয় বলে মাটির টান বা জন্মভূমির মায়া। আর এর জন্যই ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ শহীদ হয়েছিল। এ কারণেই জন্মভূমিকে অনেকে বলেন 'মা' বা মায়ের সঙ্গে তুলনা করেন। যদ্দুর মনে পড়ে গোলাম আযম একবার বলেছিলেন যে দেশে থাকেন সেটিই দেশ। এখানেই আমাদের সঙ্গে জামাতিদের পার্থক্য। এখানেই বাঙালির সঙ্গে জামাতিদের পার্থক্য। যে দেশে জন্মেছি; সে দেশকেই দেশ বলে জানি।

এ ঘটনা মনে পড়লো পত্রিকায় একটি খবর দেখে। তিনদিন আগে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক রেজাউল করিমের মৃত্যু হয়েছে (ইন্নালিল্লাহে.... রাজেউন)। এই রেজাউল করিম ১৯৭১ সালে পরিচিত ছিলেন রিজু রাজাকার নামে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের একাংশ এক সময় তাকে বরখাস্ত করার দাবিতে আন্দোলন করেছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিত রাজাকার অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে এবং তখন ক্ষমতায় ছিল বিএনপি-জামাত। তাই আন্দোলনকারী শিক্ষক-ছাত্ররা নাজেহাল হয়েছিলেন কিন্তু 'রিজু রাজাকারের' কিছু হয়নি। কিছু হলো তার মৃত্যুর পর। রিজুর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক গত পরশুর ভোরের কাগজ ও সমকাল দেখতে পাবেন।

রিজু রাজাকারের মৃত্যুর পর ঘটেছে চমকপ্রদ ঘটনা। তার দেশের মাটিতে তার কবর হয়নি। কিন্তু তার আগে দেখা যাক এই রিজু রাজাকার কে?

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় রেজাউল করিম ওরফে রিজু রাজাকার ছিল

মাগুরার কুখ্যাত খুনি রাজাকার। তার অন্যতম সহযোগী ছিল রাজাকার হাসান কবির। তাদের ডাকা হতো রিজু কবির নামে। মাগুরার মানুষজন তার হত্যাযজ্ঞের কথা ভোলেনি। রিজু বিচিত্র সব উপায়ে মানুষকে কষ্ট দিতো। লুৎফুন্নাহার হেলেনা ছিলেন একসময় ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী, ১৯৭১ সালে ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা। তার দুবছরের শিশুসসন্তান ছিল একটি। রিজু একদিন দলবল নিয়ে হেলেনাকে বাড়ি থেকে তুলে নেয়। অভিযোগ তার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যোগ আছে। হেলেনাকে রিজু তুলে দেয় স্থানীয় পাকিস্তানি কমান্ডারের হাতে। সেখানে তিনি চরমভাবে লাঞ্ছিত হন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। লাঞ্ছনার পর হেলেনাকে জিপের পেছনে বেঁধে সারা শহর ঘোরানো হয়। তারপর মৃত হেলেনাকে খালের পানিতে ফেলে দেওয়া হয়। তাঁকে দাফন করতে পর্যন্ত দেয়নি রিজু রাজাকার। এ ছাড়া মাগুরার লুৎফর রহমান, গোলাম কবির, হামেদ মীর, লিটু-এ রকম প্রগতিশীল অনেককে মোট ৩৬৫ জনকে হত্যা করে রিজু। তার বিশেষ আনন্দ ছিল মানুষ 'জবেহ' করা। রিজু কবির গং যে ১৩৬৫ জনকে হত্যা করেছিল তাদের তালিকা মাগুরার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিমূল কমিটির কাছে পাঠিয়েছে। নির্মূল কমিটির সম্পাদক কাজী মুকুলের সঙ্গে যোগাযাগ করলে সে তালিকা পেতে পারেন।

গোলাম আযম-নিজামী-মুজাহিদদের মতো ১৯৭৫ সালের পর জিয়াউর রহমানের কল্যাণে রিজু পার পেয়ে যান। সসম্মানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সওয়ার হন।

এহেন রিজুর মৃত্যু হয়েছে দিন তিনেক আগে। তাকে দাফনের জন্য মাগুরা নিতে চেয়েছিল তার পরিবার-পরিজন। এ খবর পাওয়ার পর পুরো মাগুরা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এরকম রাজাকারের লাশ মাগুরার মাটিতে তারা দাফন করতে দেবে না। তখন তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয় ফেনীতে তার শ্বশুরবাড়ীতে। সেখানে তাড়াহুড়ো করে তার লাশ দাফন করা হয়। কিন্তু ঘটনার এখানেই শেষ নয়। ফেনীবাসী মুক্তিযোদ্ধারা খবর পেয়ে দাবি তুলেছেন, 'রিজুর লাশ ফেনী থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এ বিষয়ে আগামী সাতদিনের মধ্যে [ফেনীর] ফরহাদনগরের মাটি থেকে রাজাকারের লাশ প্রত্যাহার না করা হলে তারা স্থানীয়ভাবে আন্দোলন করতে বাধ্য হবেন।' (*যুগান্তর*, ১৯.১২.০৭) রিজুর লাশের যদি এ অবস্থা হয় তাহলে বড়ো আল-বদরদের মৃত্যুর পর তাদের কী হবে?

দেয়ালের লিখন সবাই পড়তে পারেন না। যারা পারেন তারা উৎরে যান। রাজাকারদের আস্ফালনের পর সারা দেশে তৃণমূল পর্যন্ত রাজাকারবিরোধী ঘৃণা এখন আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। রাজাকাররা সঙ্গত কারণেই ভেবেছিল দেশে এখনো তারা ক্ষমতায় আছে। সে কারণেই ছিল তাদের আস্ফালন। কিন্তু আন্দোলনের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বঙ্গভবনের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে

রাজাকারসমর্থক ছাড়া কোন রাজনৈতিক দল/ব্যক্তি যায়নি। এরশাদের মতো মানুষ বঙ্গভবনে যাননি, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী যাননি। এমনকি সরকারসমর্থক বলে পরিচিত ড. কামাল হোসেনও যাননি। বঙ্গভবনের অনুষ্ঠান বয়কটের আহ্বান জানিয়েছিল সেকটর কমান্ডারস ফেরাম এবং নির্মূল কমিটি। শুধু তাই নয়, বঙ্গভবনেও ঘটেছে অশ্রুতপূর্ব ঘটনা। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধরা প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, তারা যদি জানতেন এখানে জামাত নেতারা আসবে তাহলে তারা আসতেন না। পূর্বোক্ত দুটি সংগঠন সরকারকে আহ্বান জানিয়েছিল এই বলে যে, বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে যে যুদ্ধাপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের দল জামাতকে আমন্ত্রণ জানানো না হয়। রাষ্ট্রপতি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু বলবো, সরকা দেয়ালের লিখন বুঝতে অক্ষম। আর যারা দেয়ালের লিখন পড়তে অক্ষম তাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল-এমন কথা ইতিহাস বলে না।

মৃত্যু বা মৃতকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু খুনি যুদ্ধাপরাধীরা বাধ্য করছে মন্তব্য করতে। কারণ তারা মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি করে। বিশেষ করে ডানপন্থীরা। আপনাদের অনেকের এসব কথা শুনতে ভালো লাগবে না। কিন্তু সত্যের মুখোমুখি হওয়া দরকার। বাংলা একাডেমীর উল্টোদিকে তিন নেতার মাজারের কথা ধরুন। সেখানে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর কবর দেওয়া হয়েছিল। খাজা নাজিমুদ্দিনের মৃত্যুর পর এ দুজনের মাঝে নাজিমউদ্দিনকে সমাহিত করা হলো যিনি ছিলেন বাঙালিবিরোধী যাতে ঐ দুজনের স্মৃতির মহিমা ম্লান হয়। স্বাধীনতাবিরোধী খান এ সবুরের কবর দেওয়া হলো জাতীয় সংসদ চত্বরে জাতীয় কবরস্থানে বিএনপি আমলে। ভাবা যায়! শুধু তাই নয়, খুলনা শহরে ঢোকার মুখে প্রধান সড়কের নাম তার নামে। এটি দেখে খুলনা আর যাইনি। আমি জানি না, খুলনাবাসী কীভাবে এই অমর্যাদাকর বিষয়টি মেনে নিলেন। জাতির জনক রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে শুধু নৃশংসভাবে হত্যা-ই করা হলো না তাকে কবর দেওয়া হলো টুঙ্গীপাড়ায়। অথচ জিয়াউর রহমানকে জাতীয় সংসদ চত্বরে। শুধু তাই নয়, সুদৃশ্যভাবে তা সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেখানে যাওয়ার জন্য ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। ঐ সময় এ নিয়ে দুর্নীতির কথা উঠেছিল। কিন্তু, আমরা জানি দূদক তা গ্রাহ্য করবে না কারণ জিয়া সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি। অথচ যার অধীনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, যিনি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই তাজউদ্দীন আহমদকে দাফন করা হয়েছে নিতান্ত অবহেলায় বনানী কবরস্থানে। এভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ডানপন্থীরা বাংলাদেশবিরোধী রাজাকার ও রাজাকার সমর্থকদের মহিমা তুলে ধরতে চেয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। আমরা নিতান্ত নপুংসক, অকৃতজ্ঞ জাতি দেখে এর প্রতিবাদ করিনি।

এখন মনে হচ্ছে জাতির ঘুম ভাঙছে। নিজেদের মহিমা ও আত্মসম্মান তারা

আবার ফিরে পেতে চাইছেন। মাগুরা-ফেনীর ঘটনা এর প্রমাণ। আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের এ আন্দোলন ও স্পিরিটকে সমর্থন জানিয়েছে নির্মূল কমিটি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সরকারসমর্থক কয়েকটি দল ছাড়া সবাই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন- খুনিদের বিচার করতে হবে। না করলে হবে নৈতিক দুর্নীতি ও সুষ্ঠু নির্বাচনবিরোধী। এরপরও সরকার তা অনুধাবন না করলে আমাদের কিছু বলার নেই।

এটিও লক্ষণীয় যে, এই প্রথম একটি দাবিতে ডান-মধ্য-বাম সবাই একমত। এ ধরনের ঐকমত্য হয়েছিল ১৯৭১ সালে। এবং আমরা জানি, এ ধরনের ঐকমত্য হলে কী হয়। শুধু সমাসীন সরকার তা বোঝে না।

রিজুর ঘটনার পর অনুমান করে নিচ্ছি, ভবিষ্যতে এ ধরনের রাজাকারের মৃত্যু হলে নিজ এলাকায় তার দাফন করা মুশকিল হবে। প্রতিদিন এ ঘটনা ঘটলে সরকার তা থামাবেন কী করে? কারো মৃত্যু নিয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটুক তা আমরা চাই না। আমি তাদের উত্তরাধিকারীদের কথা ভাবি। তাদের কী হবে? সম্প্রতি, সেনাপ্রধান একটি উত্তম প্রস্তাব দিয়েছেন। সাভারস্মৃতিসৌধে বীরশ্রেষ্ঠ সাতজনকে দাফন কারা। সবাই এ প্রস্তাবকে সানন্দে অভিনন্দন জানিয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি নির্মূল কমিটির নেতা শাহরিয়ার কবিরের সঙ্গে আলোচনা করেছি। রাষ্ট্রের স্বার্থে, সরকারের স্বার্থে, জরুরি বিধিমালার স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, সরকার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। প্রস্তাবটি হলো, রাজাকারদের জন্য আলাদা গোরস্থান হোক। এখানে কুখ্যাত রাজাকারদের কবর দেওয়া হবে সরকারি প্রটেকশনে। তাহলে স্থানীয় জনগণের ক্ষোভ থাকবে না। রিজুর ঘটনার মতো ঘটনা ঘটতে থাকলে সরকার বা রাজাকার পরিবারগুলো তা সামাল দেবে কী করে? সবার লাশ তো সৌদি আরব বা পাকিস্তানে পাঠানো যাবে না। এতে যে পরিমাণ অর্থ অপচয় হবে তার চেয়ে কম খরচে রাজাকার গোরস্থান কমপ্লেক্স করা যাবে। এতে রাজাকারদের উত্তরসুরিদের এবং আমাদেরও সমস্যার সুরাহা হবে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি হবে না। তা না করলে, রাজাকারদের প্রতি ঘৃণা সরকারের প্রতি চলে যেতে পারে যেটি আমরা চাই না। এমনিতেই সরকার সব করবে অথচ রাজাকারদের বিচার করবে না-এ মনোভাবে সবাই ক্ষুব্ধ। আমরা মনে করি অরাজ নৈতিক সরকারের উচিত, বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া। পরবর্তী সরকার যদি সে কাজ সম্পন্ন না করে তাহলে ঘৃণার দহনে তারাই জ্বলবে। এ সরকার কেন যুদ্ধাপরাধীদের দায় নেবে? মইনুল হোসেন বলেছেন, ৩৬ বছর যারা বিচার করেননি তাদের বিচার জরুরি। [ব্যারিস্টার সাহেব নিজে এক সময় সরকারদলীয় সাংসদ হিসেবে ক্ষমতায় ছিলেন] এ সরকার বিচার প্রক্রিয়া শুরু না করলে তাদেরও যে এ ধরনের বক্তব্যের সম্মুখীন হতে হবে না তার নিশ্চয়তা কে দিলো।'

স্মৃতিসৌধে বীরশ্রেষ্ঠরা সমাহিত হলে সেখানে দেশবাসী এই বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। সেটি একটি দ্রষ্টব্য স্থানও হবে যা এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নেও সাহায্য করবে। তেমনি রাজাকার গোরস্থান হলে সেটিও দ্রষ্টব্য হবে। এবং ভিন্ন এলাকার মানুষজনেরও ক্ষোভ থাকবে না। আমরা যেহেতু মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না তাই এই প্রস্তাব। শুধু সরকারই নয় রাজাকাররাও এ প্রস্তাব ভেবে দেখতে পারে। ১৯৭১-এ তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল, মৃত্যুর পরও তারা একত্রে থাকবে। রাজাকাররা রাজাকারদের না দেখিলে আর কে দেখিবে? এ কথা যে কতো সত্য তার প্রমাণ, রিজুর মৃত্যুর পর শোক জানিয়েছে একমাত্র জামাতের চট্টগ্রাম শাখা এবং বলেছে এ ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়। সারা দেশের আর কেউ এমনকি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির কেউ শোক জানায়নি। কেউ ভাবেনি যে তার ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়, একমাত্র রাজাকাররা ছাড়া। এবং সেটি খুবই স্বাভাবিক।

২০ ডিসেম্বর, ২০০৭

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হতেই হবে

যুদ্ধাপরাধী প্রত্যয়টিই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এই বলে যে, বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী বলে কেউ নেই। এর মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের সৃষ্টি বা-এর স্বাধীনতাকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন। যুদ্ধাপরাধী না থাকার মানে বাংলাদেশে কোন যুদ্ধ হয়নি। যদি যুদ্ধ না হয় তাহলে ১৯৭১ সাল বলে কিছু ছিল না। এ প্রত্যয়টিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন জামাত সমর্থক সাবেক সচিব ও ইসলামী ব্যাংকের সাবেক সভাপতি শাহ হান্নান। তিনি বলেছেন, ১৯৭১ সালে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ধারাবাহিকতা ও পাকিস্তান সৃষ্টির পরের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন আছে। এটি যে বাস্তব সেটি প্রমাণের জন্য জামাতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল কাদের মোল্লা বললেন, যারা যুদ্ধ করেছিল তারা সুন্দরী নারীর জন্য গিয়েছিল। এ উক্তির দুটি তাৎপর্য আছে। সেটি হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ যারা করেছেন বা বিশ্বাস করেন তারা মূলত ধর্ষক, লুটেরা। তার এটি বলার উদ্দেশ্য, যদি সরকার সত্যি সত্যি বাংলাদেশ প্রত্যয়ে বিশ্বাস করে তাহলে প্রতিক্রিয়া দেখাবে কারা সরাসরি বাংলাদেশ সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করে, যেই সংবিধানের বলে সরকার ক্ষমতা ভোগ করছে। যদি তারা কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখায় তাহলে এটি প্রতীয়মান হবে, তারাও ধারাবাহিকথায় বিশ্বাসী। এই নেশনটি কতটা শক্তিশালী তা প্রমাণের জন্য, জামাতের সহযোগী ও বিএনপিপন্থী সাদেক খান ঘোষণা করলেন, যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায় বা অন্য কথায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলে তাদের প্রতিপক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের বিচার করতে হবে। সাদেক খান সরকারি প্রেস ইন্সটিটিউটের সভাপতি। তাকে অপসারণ দূরে থাক সরকার ভর্ৎসনাও করেনি। উপদেষ্টা মইনুল হোসেন দাবি করেছেন, যারা বিচার করেননি গত ৩৬ বছর তাদের বিচার আগে করতে হবে।

সরকার যখন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের শীর্সনেতাদের গ্রেফতার শুরু করে নানা কারণ দেখিয়ে, তখনই বারবার প্রশ্ন উঠেছিল কেন জামায়াতীদরে ধরা হবে না। এ দাবি জোরদার হয়ে উঠেছিল দেখেই জামায়াতিরা একথাগুলো পরিকল্পনামাফিকই বলেছে, পরীক্ষা করতে যে সরকারের ঝোঁক আসলে কোন দিকে? তারা এখন নিশ্চিত। সরকার তার নীরবতার মাধ্যমে তার ঝোঁক স্পষ্ট করেছে।

২.

এ মূল্যায়নের অন্যদিকটাও বিবেচ্য। মুজাহিদ ও কাদের আলবদর হিসেবে 'খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাদের খুনখারাবির কথা মিডিয়ায় এসেছে ও আসছে। ইসলামী ব্যাংক জঙ্গিদের অর্থ নাড়াচাড়া করেছে, মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। সাদেক খান এক সময় মার্কসবাদী ছিলেন এবং জঙ্গিবাদ তো বটেই জামাতের প্রত্যক্ষ সমর্থকে পরিণত হয়েছেন। প্রশ্ন জাগতে পারে, সরকারের উপদেষ্টারা, সেনা কর্মকর্তারা রাজনীতি পরিচ্ছন্ন করার জন্য আমাদের হিতোপদেশ দিচ্ছেন এবং আকারে ইঙ্গিতে বলছেন, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে রাজনীতি পরিচ্ছন্ন করার জন্য। রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রায়নের জন্য। এসব হিতোপদেশ দিচ্ছেন যারা তারা যেন প্রতিনিধি নন, আমলা হিসেবে যারা সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের পিটিয়েছেন ও সামরিক সরকারের অধীনে আনন্দে চাকরি করছেন। সেটিও সহ্য করে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা প্রশ্ন করেন দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল নিয়ে, তখন টেলিভিশনে প্রচারিত মোল্লাসল্টের বিজ্ঞাপনের বংশবদ কর্মচারীর মতো বলতে হয়, সব মানলেও এটা মানতে পারলাম না। ১৯৭১ সালের পরীক্ষিত খুনি, নির্যাতনকারী, লুটেরা, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের মদদদাতারা কিভাবে পরিচ্ছন্ন হলেন? বা তাদের দল কিভাবে পরিচ্ছন্ন হল? এর উত্তর এখন না দিলেও পরে দিতে হবে না এমন নিশ্চয়তা কেউ দেয়নি। বিএনপিতে গণতন্ত্র যদি না থাকে তাহলে জামাতে গণতন্ত্র আছে কিভাবে? তাদের তো ইউনিয়ন থেক্রে কেন্দ্র পর্যন্ত কমিটি আছে। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম ও অন্যান্য কমিটি যত মিটিং হয়েছে ইলেকশন কমিশন নিজেরা তত মিটিং করেছে কিনা সন্দেহ। এগুলো অশিক্ষিত সব মন্তব্য। সরকার যদি মনে করে তাদের ভাষায় চাঁদা নেয়া বা টাকা চুরি করা খুন বা ধর্ষণের চেয়ে বড় অপরাধ তাহলে নিশ্চয় আমাদের বলার কিছু থাকে না। কিন্তু, মানুষের মুখও এইবলে বন্ধ রাখা যাবে না যে, তা হল জোট সরকারের সঙ্গে এর মৌল কোন পার্থক্য আছে কিনা? বা ডিটেলসে অমিল থাকলেও মৌল বিষয়ে অমিল নেই। তাহলে ঘুরে-ফিরে এটিই দাঁড়ায়-১৯৭১ সালে যেমন পাকিস্তানিরা জিজ্ঞেস করত মুক্তি হ্যায়, আওয়ামী হ্যায়? সেই ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়নি। নির্বাচনের ভবিতব্য নিয়ে সন্দেহ জাগাও এ পরিপ্রেক্ষিতে অবাঞ্ছনীয় নয়।

এস্টাবলিশমেন্টপন্থীরা এ পরিপ্রেক্ষিতে কখনও কখনও যে প্রশ্নটি করছে তাহল, মুক্তিযুদ্ধের কি খুব একটা দরকার ছিল? তার পরের প্রশ্ন, যদি হয়েই থাকে তো হয়েছিল, তা নিয়ে এখন এত মাতামাতি কেন? এ ধরনের প্রশ্ন যারা করেন তাদের পরের প্রশ্নটি আঁচ করে নিতে তেমন কষ্ট হয় না। পরের প্রশ্নের ধরনটা এরকম, এতদিন পর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ করা কি ঠিক? এতে তো দেশের

মানুষ বিভক্ত হয়ে যায়। শুধু তাই না, বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়, এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি নির্বাচন না হতে দেয়ার ষড়যন্ত্র। অর্থাৎ নির্বাচনের কারণে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি উচিত নয়। এতদিন এ দাবি ওঠেনি। এখন কেন উঠছে।

এসব দাবির কোন সারবত্তা নেই। আর শেষোক্ত দাবিটি সর্বৈব মিথ্যা। তবে এসব প্রশ্নের উত্তর অনেকভাবে দেয়া যায়। একটা সোজা উত্তর হয়তো হতে পারে- ১৯৭১ সালেও অনেকে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল। তাদের উত্তরসুরিদের অনেকের এখনও বাংলাদেশের পক্ষে থাকার কোন কারণ নেই। বাংলাদেশে থাকতে হয় বলে তারা আছেন। অথবা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন তা ব্যবহার করছেন? ক্ষমতা থাকলে, তারা আজ পাকিস্তানের ফ্রেমে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে দ্বিধা করতেন না। তারা সে ক্ষমতা এখনও অর্জন করতে পারেননি। সে ক্ষমতা এখনও নিরস্ত্র সংখাগরিষ্ঠের হাতে এবং তাদের থেকেই আজ ঐক্যবদ্ধ দাবি উঠছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই নির্বাচনের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই।

মুক্তিযুদ্ধের এই অবমূল্যায়নের প্রচেষ্টা ১৯৭২ সাল থেকেই শুরু। এর জন্য কমবেশী আমরা দায়ী। আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী জেনারেশন ছিল মুক্তিযুদ্ধের। ১৯৭৫ সালের পর সচেতনভাবে জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেন। তার সময় থেকেই ফিরে এসেছে ১৯৭১ সালের সেই প্রশ্ন তুমি মুক্তি হ্যায়? তুম আওয়ামী হ্যায়? আমাদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন আওয়ামীবিরোধীরা সমর্থন করল জিয়ার সেই প্রশ্ন। দেশ বিভক্ত হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে। আমরা দেশকে বিভক্ত করিনি। যেহেতু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উঠেছে তাই এ সত্যের মুখোমুখি হতে হবে নি:সংকোচে এবং এই সত্যের মুখোমুখি হয়েই ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, লে. জেনারেল এরশাদ, লে. জেনারেল শওকত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাচ্ছেন এবং তাদের এ সত্য স্বীকার প্রশংসাই, তাদের রাজনীতি পছন্দ করি না। আমরা আমাদের আত্মা বিক্রি করেছি- এ মন্তব্য একারণে যে, যারা দেশ বিভক্ত করল, মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে গেল, খুনি ও ধর্ষকদের পক্ষ নিল, আমরা তাদের বন্ধুত্ব ত্যাগ কিরিনি, ভর্ৎসনাও করিনি। গোকুলে তারা বেড়েছে। এখন সময় এসেছে এ পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের পুনর্মূল্যায়ন।

এ প্রতিরোধটি যে যার ক্ষেত্র থেকেই গড়ে তুলতে পারতেন। আমি যুক্ত লেখালেখির সঙ্গে। বলতে দ্বিধা নেই, এ প্রতিরোধ লেখক, সাংবাদিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ও সংস্কৃতসেবীরা ছিলেন সজীব এবং সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধের বোধ বা অনুভবকে যে কারণে বিনাশ করতে পারেনি শত্রুপক্ষ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখি, নাটক, চলচ্চিত্র, গান বাঁচিয়ে রেখেছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি।

আজকে জামাতের ঔদ্ধত্য ও সরকারের নীরবতার কারণে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সক্রিয় হয়ে উঠছে সিভিল সমাজ, তাদের প্রতিনিধি অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং এ দাবি নতুন নয়। ১৯৭২ সাল থেকেই এ দাবি উঠেছে।

আজ ৩৭ বছর পর ৭১টি সংগঠন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শুধু খুনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নয়, মৌলবাদী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার, যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে দেয়ার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ। এ দাবিকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নানা ঘটনা ঘটতে পারে, ঘটানো হতে পারে, বিভিন্ন মন্তব্য করা হতে পারে আমরা মনে করি, যতদিন আমাদের দাবি আদায় না হবে ততদিন এসব কথা আমাদের বলে যেতে হবে আপনাকেও বলতে হবে আপনার সন্তানদেরও। মনে করিয়ে দেবে তাদের, যখন আমরা থাকব না, যে, স্বাধীনতা চার অক্ষরের একটি শব্দমাত্র নয়। মনে করিয়ে দেবে কিভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত যুদ্ধাপরাধী ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগ্রত রাখা ও তা ছড়িয়ে দেয়া। যাতে ও সমাজে মন্ত্রী হোক, ধনী হোক, প্রভাবশালী হোক, একজন রাজাকারের ছেলে যেন মাথা উঁচু করে বলতে না পারে আমি রাজাকারের পুত্র। এ সমাজে সাধারণ হোক, গরিব হোক, প্রভাবহীন হোক কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধার ছেলে যেন বুক ফুলিয়ে বলতে পারে আমি মুক্তিযোদ্ধার পুত্র আর এ কারণেই নতুন বছরের শপথ হোক, দাবি হোক প্রত্যয় নিয়ে আমরা বলব-দেশের স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এ দেশে হতেই হবে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা জরুরি

বর্তমান প্রতিদিন কেউ না কেউ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি তুলছেন। যারা এক সময় যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে ক্ষমতা ভোগ করেছেন, তাদের অনেকেও এগিয়ে এসেছেন। এসব দেখে নতুন প্রজন্মের অনেকের মনে হতে পারে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটা বোধহয় নতুন বা এ বছরই তা জোরালোভাবে তোলা হয়েছে, আসলে তা নয়। ১৯৭১ সাল থেকেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি তোলা হয়েছে।

যুদ্ধাপরাধী কে? সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা দেশের অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ড, লুট, ধর্ষণ বা বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত ছিল, তারাই যুদ্ধাপরাধী। হানাদার পাকি বাহিনীর নীতিনির্ধারক বা যারা এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত তারা যুদ্ধাপরাধী। স্থানীয় যেসব অধিবাসী তা বাঙালি হোক বা অবাঙালি হোক- এসব কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছে তারাও যুদ্ধাপরাধী। এর সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক বঙ্গবন্ধু ও চার নেতার হত্যা। কারণ, যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থকরাই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল।

ভুলে যাওয়ার এক অসম্ভব ক্ষমতা আছে বাঙালির। অনেকে বলেন, বাঙালি ক্ষমাশীল। আমি মনে করি, তা সুবিধাবাদ, নিষ্ঠুরতা। ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকার বিবর্ণ ফাইল খুলে দেখুন। প্রতিটি পাতায় পাতায় হারিয়ে যাওয়া, খুন হওয়া মানুষের খবর, খুনিদের তালিকা, বিচারের দাবি আর সরকারি প্রতিশ্রুতি। তৃতীয় বছর থেকে এসব খবর কমতে থাকে এবং এক সময় তা সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে ২৫ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায়। হয়তো এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক নয়, খুনিদের বিচার না হওয়া, সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা করা, তাদের মিত্র করা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়নে আমরা ব্যস্ত থেকেছি। কিন্তু যারা শহীদ হলেন, খুনি যারা তাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। এখনো সে চেষ্টা নেওয়া হয়নি। এসব যখন মনে হয় তখন নিজেদের প্রতি ধিক্কার জানানো ছাড়া করার কিছুই থাকে না। একবার ভেবে দেখেছেন কি, প্রত্যেক জাতির জাতীয় বীর থাকে, আমাদের নেই। থাকলেও স্বীকার করি না। আমরা স্বীকার করি তাদের, যাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং যারা বিজাতীয়। পৃথিবীর সব দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর প্রথম যে কাজটি করা হয় তা হলো জাতীয় বীরদের প্রতি স্মৃতি তর্পণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ একমাত্র ব্যতিক্রম।

এ সমস্ত কর্মকাণ্ড হয়েছে আমাদের একাংশের সহযোগিতার কারণে। এর ফলে দেশে দীর্ঘদিন কায়েম থেকেছে প্রজাবিরোধী শাসন। থাবা বিস্তৃত হয়েছে মৌলবাদের। প্রায় সময় আমাদের নিশ্চুপ থাকার কারণ, আমাদের অনেকে এর বিনিময়ে ইউনিফর্মধারী ও ইউনিফর্মহীন বা ইউনিফর্ম-প্রভাবিত শাসকের কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছি। তবে একথা বলা ভুল হবে যে, নিরস্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা এতে অপমানিত বোধ করেনি। তাদের ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছিল জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে।

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকেই বাংলাদেশে গণহত্যা বিশেষ করে বুদ্ধিজীবি হত্যাকারীদের বিচার দাবি করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, শহীদ বুদ্ধিজীবিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল 'চারুকলা ও সাহিত্য সংক্রান্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল' গঠন করা হবে। সেটির কী হলো? না, রাজনৈতিক নেতা বা আমরা, কেউ তার খোঁজ করিনি।

বিজয়ের পর থেকেই পত্রপত্রিকায় বুদ্ধিজীবিদের হত্যার জন্য আলবদরদের দায়ী করে বিচারের দাবি তোলা হয়। ২৫ ডিসেম্বর বেগম সুফিয়া কামাল ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনসহ ৫২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার দাবি করেন। ২৮ ডিসেম্বর (১৯৭১) ১৩ জন বিশিষ্ট শিল্পী ও আইনজীবীর যুক্ত বিবৃতি যোগসাজশকারীদের খুঁজে বের করুন। বিবৃতিতে এসব বুদ্ধিজীবী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র ও তাদের এজেন্টদের আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের মধ্যে এখন বেঁচে আছেন- ব্যারিস্টার (বিচারপতি) মোস্তাফা কামাল, আহমদ রফিক, ফেরদৌসী রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আমিনুল ইসলাম বেদু ও মুস্তাফা জামান আব্বাসী। এদের মধ্যে মোস্তাফা কামাল পরবর্তীকালে বিচারপতি হিসেবে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব অনুমোদন করেন।

১৯৭২ সালে দেখি কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে শহরে বিক্ষোভ সভা ও মিছিল হচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ৫ জুন ১৯৭২ ঘোষণা করেন- যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে।

জহির রায়হান এসব আন্দোলন সংগঠন করেছিলেন এবং হত্যার তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

জহির রায়হান নিখোঁজ হওয়ার পরবর্তী ঘটনা বিবৃত হয়েছে 'একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থে। আমি সেখান থেকে উদ্ধৃত করছি- '৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির উদ্যোগ থামিয়ে দেওয়া হয়। কমিটি ইতোমধ্যে যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ উদ্ধার করেছিল কলকাতার একটি পত্রিকার একজন সাংবাদিক

ভারতে নিয়ে চলে যান। ২১ ডিসেম্বর তারিখে আকাশবাণী কলকাতার কেন্দ্র থেকে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট সমর্থক ব্রিটেনের সাবেক মন্ত্রী জন স্টোনহাউস বলেন যে, বাংলাদেশের শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার ব্যাপারে পাকবাহিনী যে জড়িত ছিল, তার প্রমাণ তার কাছে রয়েছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন এই হত্যাকাণ্ড চলছিল তখন মি. স্টোনহাউস ঢাকাতেই ছিলেন। সাক্ষাৎকারে মি. স্টোনহাউস বলেন, বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন থেকে জেনারেল পদমর্যাদার ১০ জন সামরিক অফিসারকে তিনি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই অফিসারদের নাম প্রকাশে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করার জোর দাবি জানান। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত মুখ্য দালালদের নামও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন বলে তিনি জানান। এই দশজন অফিসারের পরিচয় এবং বুদ্ধিজীবী হত্যাসংক্রান্ত অন্যান্য দলিলপত্র আর কখনোই আমাদের হস্তগত হয়নি।

বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত দাবি করে '৭২ সালের ৭ মার্চ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারবর্গ শহীদ মিনারে গণজমায়েত করেন। এরপর মিছিল করে বঙ্গভবনে যান। মিছিলকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে দেখা করতে অস্বীকৃতি করেন। পরে মিছিলকারীরা বঙ্গভবনের ফটকে অবরোধ করে বসে পড়লে অনেকক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী এসে তাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং মিছিলকারীদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে তিনি জানান যে, তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হবে। ইতিপূর্বে ৮ ফেব্রুয়ারি জহির রায়হানের অন্তর্ধানসহ বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিন সপ্তাহের ভেতর তাকে রিপোর্ট করা হবে। সেই তদন্তের ফলাফল দেশবাসী কখনো জানতে পারেননি।

২.

এ ধরনের মুক্তিসংগ্রামের পর বা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সব সময়ই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে। বাংলাদেশেও হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয়নি। ভারতে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জে এন দীক্ষিত জানিয়েছেন, হানাদার বাহিনীর ৪০০ জনকে যুদ্ধাপরাধের জন্য শনাক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭২-এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু সে সংখ্যা হ্রাস করে ১৯৫ এবং তারপর তা ১১৮-তে নিয়ে আসেন। কিন্তু এই ১১৮ জনের বিচারের জন্যও বাংলাদেশ সরকার মামলা তৈরি করতে পারেনি।

এই যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট চাপ ছিল। ভারতও তাই দিল। দীক্ষিতের বই পড়ে তা-ই মনে হয়, যদিও কোথাও তিনি স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করেননি। শেখ মুজিব যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে প্রত্যর্পণে

সম্মতি দিয়েছিলেন। এবং দীক্ষিত মনে করেন, সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। মুজিব পিএন হাকসারকে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা মুশকিল এবং তিনি এ কারণে সময় ও এনার্জি নষ্ট করতে চান না। দীক্ষিতের মতে, "The subsantative motivation for Mujibs decision might have been long terms strategy of not doing anything which would prevent recognation of Bangladesh by normaly in the sub-continent Mujibur Rahman's approach was valid." কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করায় ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশে কি সেই প্রার্থিত 'stability' এসেছে? না, উপমহাদেশে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরেছে?

আবু সাইয়িদ তার 'সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম' গ্রন্থে লিখেছেন- দেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে তৎকালীন 'সরকারের উদ্যোগের অভাব ছিল না।' এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখিয়েছেন, রাজাকারদের বিচার শুরু হয়েছিল এবং দালাল আইন জারির পর ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে ৩৭৪৭১ জন দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এরপর তিনি অনেক কারণের কথা উল্লেখ করেছেন, যার ফলে রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সামাজিক চাপ, একই পরিবারে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার দুই-ই ছিল এবং রক্ত সম্পর্কের কারণে অনেকে রাজাকারদের বাঁচাতে চেয়েছিল। রাজাকাররাও তাদের আত্মজীবনী এ ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন।

আজ ৩৭ বছর পর প্রশ্ন জাগছে, ওইসব যুক্তি সত্ত্বেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করায় কি সমাজে, রাজনীতিতে শান্তি এসেছে? আসেনি। কারণ, রাজাকারদের চরিত্র- বিচার সে সময় করা সম্ভব হয়নি। এ প্রশ্ন সোচ্চারিত হয়ে ওঠেনি যে, যে অনুকম্পা রাজাকারদের প্রতি দেখানো হয়েছে সে অনুকম্পা কি রাজাকাররা প্রদর্শন করেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি? সবচেয়ে বড় কথা, যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি আমরা অনুকম্পা প্রদর্শন করেছি। তাদের পুর্নবাসিত করেছি এবং আজ আবার তাদের বিরুদ্ধে প্রায় সম্মুখসমরে আমাদের নামতে হচ্ছে। কিন্তু যে ৩০ লাখ শহীদ হলেন, তাদের প্রতি কি এ পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায়বিচার করা হয়েছে? তাদের প্রতি কি যথাযথ মর্যাদা দেখানো হয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তরও হচ্ছে- না। এ প্রসঙ্গে দীক্ষিত উল্লেখিত একটি ঘটনার কথা বলা যায়। যুদ্ধাপরাধী রাও ফরমান আলীকে যখন কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে, তখন তিনি বলেছিলেন ভারতীয়রা ভাবছে, বাঙালিদের সাহায্য করেছে দেখে বাঙালিরা তাদের পক্ষে থাকবে? থাকবে না। কারণ এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন; কিন্তু ১৯৭১ সালের পরবর্তী ঘটনাবলি কি এ যথাযর্থতা প্রমাণ করে না।

৩.

১৯৭৫ সালের পর থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়। চালু করা হয় কাবুল এবং লাহোর কালচার। এরশাদ জিয়াউর রহমানের আদর্শকে আরো পুষ্ট করে গেলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য একটি গণতদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। এর সদস্য ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, শওকত ওসমান, খান সরোয়ার মুরশিদ, দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, কেএম সোবহান, শামসুর রাহমান, অনুপম সেন, এম খালেক, সালাহউদ্দিন ইউসুফ, সদরুদ্দিন ও শফিক আহমেদ। ইতিমধ্যে গঠিত হয় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও জাতীয় সমন্বয় কমিটি।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি আবার ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ জাহানারা ইমামকে সভাপতি করে ১২ জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত হয় গণআদালত এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্মরণাতীতকালের বিশাল সভায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় ঘোষণা করা হয়। 'গণআদালতের মাধ্যমে সৃষ্ট একাত্তরের ঘাতক দালালবিরোধী আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠেন গোলাম আযমসহ একাত্তরের অন্যান্য ঘাতক, দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে।'

কীভাবে গণআদালত হয়েছিল এবং এর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ আছে শাহরিয়ার কবিরের 'গণআদালতের পটভূমি' গ্রন্থে। গণআদালতের পর বেগম জিয়ার সরকার এর সঙ্গে যুক্ত ২৪জনকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করে। হাইকোর্টে বিচার চলে। ২৪ জন জামিনে মুক্তি পান। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহী'র তকমা এখনো এঁটে আছে তাদের শরীরে। বাংলাদেশের মানুষ যদি একবার সুস্থ হন তাহলে ভাবুন-এই বাংলাদেশে রাষ্ট্রদ্রোহী হচ্ছে তারা, যারা দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছে। যারা বিরোধিতা করেছে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী নয়।

৪. আমরা কেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই। এর একটি কারণ এই যে, তারা যে যুদ্ধাপরাধ করেছে তা প্রতিষ্টিত হওয়া। সাবেক রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউর রহমান বলেছিলেন, ১৯৭২ সালে যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে আলোচনার জন্য জার্মানী থেকে এক আইনজ্ঞ এসেছিলেন। ন্যুরেমবার্গ বিচারের একজন প্রসিকিউটরের তিনি ছিলেন সহকারী। তিনি ওয়ালিউর রহমানকে বলেছিলেন, যেভাবেই হোক তোমরা এদের বিচার করো। আর কিছু না হোক, তার যে অপরাধী সে কথা প্রমাণিত হোক।

এ বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি দেখে বাঙালি যুদ্ধাপরাধীরা বলতে পারে তারা কোনো অপরাধী নয়। পাকিস্তানিরাও বলতে পারে তারা অপরাধ করেনি এবং '৭১-এর জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত না হয়ে মাথা উঁচু করে

ঘুড়ে বেড়াতে পারে। সুতরাং আমরা সভ্যতার কারণে হলেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই। ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা পিএন হাকসার শাহরিয়ার কবিরকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধের বিচার বাংলাদেশেই করতে হবে। সেটাই নিয়ম। কিন্তু সে নিয়ম এখন আর নেই। এখন যে কোনো দেশের যুদ্ধাপরাধীর বিচার আন্তর্জাতিক আদালতেও হতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন নাগরিক ফোরামের উচিত, যুদ্ধাপরাধী বিশেষ করে পাক যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হওয়া, আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে সে দাবি উত্থাপন করা।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, বিচারের অনেক ধারণা বা নোশানও চ্যালেঞ্জ করা উচিত। একটি উদাহরণ দিই। শহীদুল্লা কায়সারের হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত খালেক মজুমদারকে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়। হাইকোর্ট সে রায় বাতিল করে। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ও সিদ্দিক চৌধুরী তাদের রায়ের উপসংহারে বলেন, "In the circumstances, therefor, the opinion that doubt has crept into the prosecution case and this doubt goes in favour of the accused and we accordingly give benefit of doubt..."

যে কথা বলছিলাম, জনসমক্ষে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সমসাময়িক পত্রিকায় যার বিবরণ ছাপা হয়েছে তার আবার সাক্ষ্যপ্রমাণ কী? আইন মানুষের সৃষ্টি। মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন-যাপনের ফ্রেমে নিয়ে আসার জন্য। যে আইনে বিচার পায় না সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, সে আইন আবার কিসের আইন?

অনেকে বলেছেন শহীদ পরিবারের সদস্যদের মামলা দায়ের করতে। আমরা এর বিরোধী।

যারা হত্যা করেছে তারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। বর্তমান বিশ্বে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কোনো দেশের মধ্যে সীমিত রাখা যাচ্ছে না। চিলির একনায়ক পিনোশের ঘটনা এর উদাহরণ। প্রচলিত আইনে এই বিচার সম্ভব নয়। কারণ, মাওলানা আব্দুল মান্নান বলেছিলেন, ডা: আবদুল আলীমকে তিনি হত্যা করেননি। আজ এর প্রমাণ কী হবে? বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে হত্যার কথা স্বীকার করেছিল। মান্নানরা তো তা করেনি। বিচারক বলতে পারে, সংগৃহীত প্রমাণ যথেষ্ট নয়।

বিএনপি বলে, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের দল। এরশাদ বলেন, তিনি মুক্তিযোদ্ধা। আওয়ামী লীগ বলে, তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল। সুতরাং, তিন পক্ষই তো স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করতে পারতো। মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করলে তো এমনটিই হওয়া উচিত। আর খুনের মামলা বা খুনের বিষয় কখনো তামাদি হয় না। সব রাজনৈতিক খুনের বিচার সব দল দাবি করছে। বাংলাদেশের উজ্জ্বল সন্তানদের ঠাণ্ডা মাথায়, পরিকল্পিতভাবে হত্যা কি রাজনৈতিক নয়? আপনাদের বিবেক কী বলে?

৫.

বর্তমানে যখন এ লেখা লিখছি তখন আবার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে মানুষ। এর কারণ জামাতে ইসলামী ও সমর্থকদের ঔদ্ধত্য। ১৯৭১ সালে আলবদরের ডেপুটি প্রধান, বিএনপি-জামাত জোটের মন্ত্রী মুজাহিদ ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই।' আরেক যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লা বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ভারতীয় স্বার্থে। আবার কেউ সুন্দরী নারীর লোভে আবার কেউবা লুটতরাজের জন্য যুদ্ধ করেছিল। তাদের সমর্থক এক সময়ের চরম কমিউনিস্ট সাদেক খান বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলে মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিচার করতে হয়। অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধারাও যুদ্ধাপরাধী। আজ স্বাধীনতাবিরোধীদের হুঙ্কার এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। জামাত নিজের জোরে এসব বক্তব্য রাখছে, তা নয়। এ কারণে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান হয়েছে এবং মৌলবাদ আজ এমন পর্যায়ে যে পাকিস্তানের অস্তিত্বই হুমকির মুখে।

শুধু তা নয়, নিজামী-মুজাহিদরা সারা দেশের মানুষকে যে কষ্ট দিয়েছিল তা অবর্ণনীয়। আমিনুর রহমান খানের স্মৃতিকথায় আছে, দুই মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে রাজাকাররা বড়শি দিয়ে তাদের চোখ উপড়ে ফেলেছিল। তারা যখন ক্যাম্পে তখন সুবেদার মেজর মফিজ ছিলেন সেখানে সবচেয়ে বয়সী। তিনি তাদের বলতেন তাকে হারামজাদা, কুত্তার বাচ্চা ডাকতে। অন্য নামে ডাকলেই ক্ষেপে যেতেন। একদিন অসতর্ক মুহূর্তে আমিনুর এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, "মানুষই যদি হতাম তাহলে বেঁচে থাকলাম কেন? মরলাম না কেন সেই দিন? আমারই চোখের সামনে আমার স্ত্রীকে গুলি করে মারলো। আমার হাত পা বেঁধে রেখে চোখের সামনে দুই ছেলেকে মারলো, জামাইকে মারলো। ছেলের বৌকে ও মেয়েকে ধর্ষণ করলো, শেষে, শেষে আমার নাতনী উঃ তো চিৎকার করে বললো নানু, আমাকে বাঁচাও... দেখ আমি কত বড় হারামজাদা। কিছুই করতে পারলাম না। যাবার সময় শুয়োরের বাচ্চারা সবাইকে গুলি করে মারলো। ছেলের বৌটা মরার আগে কত পানি পানি করলো। এক ফোঁটা পানিও দিতে পারলাম না আমার মায়ের মুখে। আমি মানুষ? না জানোয়ার, তুই বল। বল, আমি কী? আমি কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা। হারামজাদা ছাড়া আর কিছু?"

এ রকম লাখ লাখ ঘটনা ঘটেছে। এর কোনো বিচারই হবে না এবং কাদের মোল্লা ও তাদের সমর্থকরা দাপিয়ে বেড়াবে। এটা মেনে নিতে পারি না। এ সরকার বলছে, এটি তাদের কাজ নয়। দু'জন প্রধানমন্ত্রী বন্দি, শিক্ষক-ছাত্রদের গ্রেফতার নির্যাতনও তাদের কাজ ছিল না। ম্যান্ডেটবিহীন বহু কাজ তারা করেছে। যদি তারা বিচারের প্রক্রিয়া শুরু না করে তা হলে ধরে নিতে হবে, তারা পূর্ববর্তী সরকারগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করছে, নতুন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আসলে যুদ্ধাপরাধীরা অত্যন্ত শক্তিশালী। শুনেছি, দেশে তাদের বিচারের দাবি ওঠায় সৌদি আরব ও মালয়েশিয়া বাংলাদেশের শ্রমিকদের হেনস্তা শুরু করেছে। সরকারের পক্ষ থেকেই অনেকে তাদের পক্ষে ওকালিত করছে।

আজ ৩৭ বছরের মাথায় মুক্তিযুদ্ধ যেন প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হতে পারে কিন্তু আমি মনে করি, আমাদের এসব কথা সোনালি শস্যের মতো বেড়ে উঠবে। ঘিরে ধরবে এক সময় নতুন প্রজন্মকে। মনে করিয়ে দেবে তাদের, যখন আমরা থাকব না, যে, স্বাধীনতা চার অক্ষরের একটি শব্দমাত্র নয়। মনে করিয়ে দেবে তাদের, কীভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম।

২৬ মার্চ, ২০০৮

একাত্তরের গণহত্যার বিচার

এই ঢাকায় কয়েকদিন আগে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ নিয়ে আন্তর্জাতিক একটি সম্মেলন হয়ে গেল। ঢাকায় যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে আন্দোলন-কথাবার্তা বলছেন তাদের অনেকেই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাছাড়া ভারত, কম্বোডিয়া, জাপান ও জার্মানি থেকে এসেছিলেন প্রবন্ধ পাঠক এবং পর্যবেক্ষকরা। দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

আলোচনার একটি অধিবেশনে আমি ছিলাম। যার বিষয় ছিল 'ডকুমেন্টিং অ্যান্ড আর্কাইভিং জেনোসাইড'। সাদা বাংলায় গণহত্যা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ-সংকলন এবং সংরক্ষণ। কম্বোডিয়া এখন পলপট আমলের গণহত্যার বিষয়ে আলোচনা শুধু নয়, বিচার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। পলপটের আমলের বিভীষিকাময় দিন ও গণহত্যার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন 'ইউক চাং ডকুমেন্টেশন সেন্টার অব কম্বোয়িা' গঠিত হয়েছে। কিভাবে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়লেন ফারিনা সো। তার প্রবন্ধের উল্লেখ করছি এ কারণে, গণহত্যার বিচারের জন্য এসব বিষয় জরুরি। কারণ আমরাও এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার।

সে তার প্রবন্ধে বলেছেন, তারা যেসব তথ্য-দলিল সংগ্রহ করছেন সেগুলো দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হল প্রাথমিক, অন্যটি সেকেন্ডারি। সরকারি নথিপত্র হচ্ছে প্রাথমিক দলিল। এছাড়া বাকিগুলো সেকেন্ডারি। ১৯৯৫ থেকে এ পর্যন্ত সেন্টার ৬,০০,০০০ দলিলপত্র সংগ্রহ করেছে।

গণহত্যার বিচারের জন্য আমাদের কাছে কিন্তু প্রাথমিক দলিলপত্র তেমন নেই। অন্যান্য দেশে দেশীয়রাই [সরকার] গণহত্যা করেছে, ফলে নথিপত্র সেখানেই ছিল। যেমন-জার্মানি, কম্বোডিয়া। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল ইসলামাবাদে। এখানে গণহত্যা চালানোর সময় শুধু হত্যা করা হয়েছে, কোন নথিপত্র রাখা হয়নি। দ্বিতীয়ত, ফরেনসিক এভিডেন্স যদি না থাকে তাহলে কি হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য আইন বিশেষজ্ঞরাই দিতে পারবেন। তবে সেকেন্ডারি তথ্যের অভাব আর এখন নেই বললেই চলে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কথা উঠেছিল যে, এত বড় একটি গণহত্যা কিন্তু ঠিক ১৯৭২ সালের পর সবাই তা ভুলে গেল কেন? অধ্যাপক রওনক জাহান বললেন,

আমেরিকায় তার ছাত্রছাত্রীদের তিনি গণহত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারা জানিয়েছেন বাংলাদেশে গণহত্যার বিষয়টি তারা জানে না। এটি শুধু তারা নয়, অনেকের কাছেই তা আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে।

এই নৈঃশব্দের কারণ কি? বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদি নিধন সবাই মনে রেখেছে কেন? এর প্রধান কারণ গণমাধ্যম। পৃথিবীর শক্তিশালী গণমাধ্যমগুলো আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে এবং তা ইহুদি গোষ্ঠীদের প্রভাবাধীন। মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শিখণ্ডি হিসেবে আমেরিকা-ইউরোপ দাঁড় করিয়েছে ইসরাইলকে। হিটলার ইউরোপের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ফলে ইউরোপ-আমেরিকা নাজিবাদের বিরুদ্ধে যতরকম স্মৃতি সংরক্ষণ করা যায় তা করেছেন এবং উজ্জীবন করেছেন। বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে পাকিস্তান। পরোক্ষভাবে তাকে সমর্থন করেছে আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো এবং চীন। বাংলাদেশে গণহত্যার বিচার হলে এসব বিষয় সামনে চলে আসবে। তখন বিষয়টি সুপারপাওয়ারদের জন্য স্বস্তিদায়ক হবে না। তারা ভাবেনি বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, সে কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় গণহত্যা সম্পর্কে এ সোনালি নৈঃশব্দ। আমেরিকা নিজে গণহত্যা সংক্রান্ত কোন কনভেনশনে স্বাক্ষর করেনি। কিন্তু আমেরিকা বা ইউরোপ যখন প্রয়োজন মনে করে তখন গণহত্যার বিচারে সহায়তা করে। কম্বোয়িার কথা ধরা যাক। পলপটের বিরুদ্ধে ছিল আমেরিকা। পলপটের বিচারে তারা আগ্রহী। ফারিনা সো জানালেন, তাদের সেন্টারকে ইউ এসইউর সাহায্য করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে সাহায্য করবে ইউএস এইড?

আমাদের এবং আমাদের সরকারগুলোর মনোভাবও যুদ্ধাপরাধ বিচারের অন্তরায়। ১৯৭৫ সালের পর প্রায় সব সরকারের একটাই কথা ছিল পাকিস্তান। সামরিক সরকারগুলো সব সময় ডানপন্থীকে সমর্থন করেছে। এখনও করছে। সামরিক সরকার ও সুপারপাওয়াররা না চাইলে বিচার করা দুরূহ। পলপটের বিচারের আয়োজন করেছেন কম্বোডিয়া সরকার। সে কারণেই 'ইউক চাং' সেন্টার কাজ করতে পারছে।

সুতরাং গণহত্যার বিচারের জন্য দেশ ও বিদেশের সম্মতি থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে আফ্রিকায় সেটি হয়েছিল ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। আগে 'অপরাধীদে'র বিচার হবে, দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি হবে এবং তারপর ক্ষমা বা সমঝোতার প্রশ্ন আসবে। যারা সমঝোতা বা ক্ষমার কথা বলে, তারা পরোক্ষভাবে সমন্বয়ের রাজনীতিকেই সমর্থন করেন।

সরকার বিচার করবে কি করবে না সেটি অন্য প্রশ্ন। কিন্তু বিচারের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর আয়োজন তো করা যেতে পারে। সেটি হল প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি

তথ্য সংরক্ষণ। আমাদের এখানে অনেকে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং অকেগুলো সংস্থা [কেন্দ্র] যুদ্ধাপরাধের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করছে। প্রাথমিকভাবে এসব ব্যক্তি-সংস্থা মিলে একটি ফেডারেটিভ সংস্থা হতে পারে, অন্তিমে যা একটি কেন্দ্রীয় সংস্থায় পরিণত হবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে। বিষয়টি জরুরি। কারণ হত্যাকারী ও যারা নিহত -আহত হয়েছে তারা মারা গেছে। আর বিচার হোক না হোক ১৯৭১ সালের গণহত্যার স্মৃতি তো অক্ষুণ্ন রাখতে হবে পরবর্তী গণহত্যা রোধের জন্য।

ভারতে আশীষ নন্দী বিভিন্ন নজির দেখিয়ে বলেছিলেন, একটি গণহত্যার বিচারবিদের প্রজন্ম লেগে যা। মন্তব্যটি উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে চাইলে দ্রুতও হতে পারে। যেমনটি নুরেমবার্গ বিচার হয়েছিল বা টোকিও বিচার। সে জন্য প্রচারটাও জরুরি। পৃথিবী পরিবর্তিত হয়েছে অনেক; অসম্ভব অনেক কিছু সম্ভবও হচ্ছে। হয়তো ১৯৭১ সালের গণহত্যার বিচার আমরা দেখে যেতে পারব। যেটা জরুরি সেটা হল আমাদের কাজ আমাদের করে যাওয়া।

২০০৮

নিজামী ‘ওলি’ হলে আমরা সবাই ফেরেশতা

জামাতে ইসলামীর লিডারদের কাউকে না ধরাটা খুব দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছিল। সুতরাং সরকারের সময়ের শেষ দিকে (আমাদের আশা) নিজামী গ্রেফতার হলেন। খালেদা-নিজামী সরকারের প্রতি আমার সমবেদনা থাকার কোনো কারণ নেই। গত ৫ বছরে তাদের অপশাসন এরশাদের শাসনকেও ম্লান করে দিয়েছে। এরশাদ ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লুটতরাজের অভিযোগ আছে বটে, কিন্তু দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে কিছু কাজও করেছে। আর নিজামীরা ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের স্লোগান তুলে যথেচ্ছ লুটপাট করেছে; কিন্তু দেশের মানুষকে কিছুই দেয়নি। আমাকে ও আমার বন্ধু শাহরিয়ার কবিরকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জুলুম করেছে, জেল দিয়েছে। তারপরও আমি বলব, যে মামলায় নিজামীকে বা মান্নান ভূঁইয়াকে ধরা হয়েছে তা যৌক্তিক হয়নি। ক্রয় কমিটির সব সদস্য কোনো বিষয়ে একমত হলে পুরো কমিটিকে দায়ী করা যায় না। এখানে আবার কেবিনেট সচিবকে বাদ দিয়ে অন্য সচিবদের ধরা হয়েছে। এ রকম পক্ষপাতমূলক মামলা করা হয়েছে, রায়ও হয়তো সরকার পক্ষে যাবে তবে যে উদাহরণ সৃষ্টি হলো তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরকারের জন্যে শুভ নয়। একই দায়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কেবিনেট মন্ত্রীকে ধরা হবে। কেউ আর তাহলে ক্রয় কমিটিতে থাকবে না। সরকারও চলবে না। কিন্তু নিজামী নিজের দলের প্রচুর লোককে অন্যায়ভাবে চাকরি দিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে, যে কাজটি জামাতের অপর মন্ত্রী মুজাহিদও করেছেন। অর্থাৎ প্রশাসনের জামায়াতিকরণ হয়েছে। এনিভাবে তারা সব সাজিয়েছেন যে, একজন গেলে আরেকজন জামায়াতি আসবে। এটিও বড় ধরনের দুর্নীতি। আর্থিক দুর্নীতির কথাও শোনা গেছে। আমরা ভেবেছিলাম, ১৯৭১ সালে খুন-খারাবির দায়ে তাকে ধরা হবে। তা হয়নি। অনেকে সান্ত্বনা পাচ্ছেন এই ভেবে যে, ৩৬ বছর পর লোকটিকে জেলে পারা হলো তো, সেটিই সান্ত্বনা। না, সান্ত্বনা পাওয়ার কিছু নেই। আমরা চাই জামাতের চিহ্নিত এই ব্যক্তিদের হত্যার জন্য বিচার হোক।

জেনারেল মইন উ আহমেদ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যৌক্তিক বলে ঘোষণা করার পর জামাতিরা বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রবিরোধী যেসব বক্তব্য দিয়েছে তার সারকথা হলো- ১. যুদ্ধাপরাধী নেই, কারণ যুদ্ধ হয়েছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে; ২. বঙ্গবন্ধু সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন সুতরাং এসব প্রশ্ন ওঠানো উদ্দেশ্যমূলক, ৩.

সংবিধান/বিধি না বদলালে বিচার করা যাবে না। এছাড়া যারা বিচার দাবি করছেন তাদের প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়েছেন। সচেতন মহল মাত্রই জানেন তাদের উপর্যুক্ত বক্তব্য সবই মিথ্যা। এটি তাদের ট্রেডমার্ক, নতুন কিছু নয়। যুদ্ধ ভারত-বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর সঙ্গে হয়েছে। সে কারণে আত্মসমর্পণ দলিলে বাংলাদেশে আত্মসমর্পণের কথা লেখা হয়েছে। সুতরাং এটি গৃহযুদ্ধ তো নয়ই ভারত পাকিস্তান যুদ্ধও নয়। সংবিধান ও ১৯৭৪ সালের জরুরি আইনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিধি এখনো বলবৎ। পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীরা দেশে ফিরে গেছে চুক্তি মোতাবেক। তাদের বিচারের দাবি তোলা যায় কিন্তু তা করার দায়িত্ব পাকিস্তানের। কিন্তু তাদের সহযোগী বাঙালি যুদ্ধাপরাধীরা এ দেশেই আছে। সুতরাং স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচার করা যাবে। দেশি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি বা বঙ্গবন্ধু তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এটিও মিথ্যা। এর উদাহরণ জামাতের বর্তমান আমিরের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার ও শাস্তি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

যুদ্ধাপরাধীদের যতদিন মামলায় ফেলা হয়নি ততদিন তারা সরকারের অনুগত ছিল। অনেকেরই ধারণা হচ্ছিল সরকারটা বোধহয় তাঁদেরই। বিএনপির দুর্যোগের সময়ও তারা নিশ্চুপ থেকেছে। নিজামী গ্রেফতার হওয়ায় দৃশ্যপট বদলে গেছে। এখন তারা সরকারের সমালোচনা করছে। এসব সরকারের পিঠে ছুরি মারার মতো, যা আমাদের পছন্দের নয়। একই কাজ করেছেন মেজর হাফিজ ও সাইফুর রহমান। হাফিজ তো বলেই ফেললেন, এ সরকার দেশকে ২০ বছর পিছিয়ে দিয়েছে। সরকার যে তাদের জন্য এত করল তা মনেই রাখলেন না। হয়তো ফেরদৌস কোরেশীও একই কাজ করবেন। আসলে সরকার লোক চিনতে ভুল করেছে।

যা হোক, নিজামী ধরা পড়ার পর জামাত এখন দুই নেত্রী ও নিজামীর মুক্তি চাচ্ছে। এরশাদের আমলের কথা স্মরণ করুন। আওয়ামী লীগ বিএনপি কর্মসূচী দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে জামাতও দিচ্ছে এবং এক সময় বলা হলো তিন দল আলাপ করে কাজ করেছে। জামাত বৈধতা পেল ও আন্দোলনকারী হিসেবে নাম কুড়ালো। বলা হলো, আওয়ামী লীগ বড় দুই দল যা বলছে যা করছে, তারাও তা অনুকরণ করছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে দাবি এখন সারাদেশে সেই দাবির তীব্রতা হ্রাস করার জন্য জামাত এসব করছে। নিজামী গ্রেফতার হওয়ার পর যুদ্ধাপরাধীদের গলার স্বর কীভাবে বদলে গেছে দেখুন। ঢাকা মহানগর আমির বলছেন, 'মতিউর রহমান নিজামীকে গ্রেফতারের মাধ্যমে দেশে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান আজ রাজনীতিবিরোধী অভিযানে পরিণত হয়েছে; (*জনকণ্ঠ*, ৩১.০৫.০৮)। এতদিন এত নেতা-নেত্রী গ্রেফতার হয়েছেন তাতে কিন্তু তা রাজনীতিবিরোধী অভিযান হয়নি।

যুদ্ধাপরাধী সাঈদীর মতে, মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন একজন আল্লাওয়ালা মানুষ। তাকে গ্রেফতার করা সরকারের কাজটি ভালো হয়নি। সেনাবাহিনীকে ব্যারাকের বাইরে বেশিদিন রাখা হলে তাদের পবিত্রতা বজায় থাকবে না। তাদের প্রতি জনগণের ও জনগণের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা থাকবে না। (ঐ) দেখা যাচ্ছে নিজামীকে ছেড়ে দিলেই দেশের সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। পবিত্রতা ফিরে আসবে।

জামাত যদি যুদ্ধাপরাধাধের জন্য অনুতপ্ত হতো তবুও না হয় তাদের প্রতি নমনীয় হওয়া যেত। কিন্তু তারা সেদিকে যায়নি। বরং তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করেছে, যুদ্ধাপরাধ এমন কোনো বড় অপরাধ নয়। তোমরা কী করতে পারো করো। এর উদাহরণ নতুন ভারপ্রাপ্ত আমির হিসেবে যুদ্ধাপরাধী ইউসুফের নাম ঘোষণা। মুজাহিদ যদি গ্রেফতার হন সেজন্য রেডি রেখেছেন একজন ব্যারিস্টারকে। মিছবাহুর রহমান তো ঘোষণা করেছেন, ওই ব্যারিস্টার যে যুদ্ধাপরাধ করেছে তার দলিলপত্র তার হাতে আছে। গোলাম আযম আবার ফিরে এসেছেন দৃশ্যপটে। এরপর কামারুজ্জামান, কাদের মোল্লা, সাঈদী-কত নাম বলব, সবাইকে তৈরি করে রাখা হয়েছে। এবং সবাই যুদ্ধাপরাধী। জামাত যেন যুদ্ধাপরাধ তৈরি করার মেশিন। তাদের পাইপলাইনে আর কত যুদ্ধাপরাধী আছে কে জানে। তৃণমূলে যারা জামাত করেন তাদের জন্য এ সংবাদ শুভ নয়। দেশ আজ যুদ্ধাপরাধী গ্রহণে অনিচ্ছুক। গোলাম আযম ফের মাঠে নেমেছেন। পত্রিকার খবর অনুযায়ী দেশ-বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করছেন। তিনি বলেন 'আমি যদি গ্রেফতার না হতাম তাহলে নাগরিকত্ব ফিরে পেতাম না, তাই নিজামীর বিচারেও হয়তো আমরাই সুফল পাব। কেননা বিচার বিভাগ আমাদের সঙ্গে অন্যায় করবে মনে হচ্ছে না' (*আমাদের সময়* ২৯.০৫.০৮) আসলেও কথাটা ঠিক। এখন পর্যন্ত উচ্চ আদালত সমবেদনার চোখেই দেখেছে এ গণহত্যাকারীদের। গোলাম আযম তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। না গণহত্যাকারীরা এখানেই থেমে থাকেনি '৭১-এর দুর্ধর্ষ আলবদর মুজাহিদ ঘোষণা করেছেন, নিজামীকে গ্রেফতার করতে সরকারের দিল কাঁপেনি, আশ্চর্য, কারণ নিজামী হচ্ছেন 'আল্লাহর ওলি' (ঐ) '৭১-এর আলবদর স্কোয়াডের প্রধান, জোটের বহু অপকর্মের সহযোগী, প্রশাসন জামায়াতিকরণ উদ্যোক্তা, পত্রপত্রিকায় যার দুর্নীতি নিয়ে লেখা হয়েছে তিনি যদি আল্লাহর ওলি হন তাহলে বাংলাদেশে বসবাতরত আমরা সবাই ফেরেশতা। মুজাহিদদের বক্তব্য দেখুন, আল্লাহর ওলিদের নিয়ে কীভাবে ঠাট্টা করছেন এবং একই সঙ্গে ধর্মকে ব্যবহার করছেন। একজন আলবদরকে আল্লাহর ওলি বলা চলে? আল্লাহর ওলিরা কি খুনি ছিলেন।

রাষ্ট্রের কর্তারা এদের প্রশ্রয় দেবেন এটি জানা কথা। অন্তিমে এরা-সবাই ডানপন্থি। আমরা যদি যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ন্যূনতম ব্যবস্থা না নিই তাহলে

সরকার এদের পৃষ্ঠপোষকতা দেবেই। আমাদের ব্যবস্থাটি হলো সামাজিকভাবে তাদের বয়কট করা। এবং প্রতিনিয়ত তাদের দুষ্কর্মগুলো বয়ান করা ও বিচার দাবি করা। সরকার যতই ক্ষমতাশালী হোক জনমানুষ চাইলে বিচার হবেই। জনদাবি না মানলে কী হয় পাকিস্তান ও এর প্রেসিডেন্ট মোশারফ এর সাম্প্রতিক উদাহরণ। দুর্নীতি দমনেও কিছু হবে না। চুরি ও খুন দুটিই অপরাধ। কিন্তু কোনটি বড় অপরাধ তা নির্ণয়ের দায়িত্ব শাসকদের এবং এটিই সুশাসনের একটি নিরিখ।

২ জুন, ২০০৮

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে আন্তরিক নয় সরকার

প্রতি ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে জাঁকজমকভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের জয় জাঁকালোভাবে পালন করা হয়। বাংলাদেশ থেকে অনেকে নিমন্ত্রিত হন। বছর দুয়েক আগে আমরা কয়েকজন এ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। অনুষ্ঠানে বলা হলো ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করে। অনুষ্ঠানের পর ভারতীয় কর্মকর্তাদের কাছে আমি এবং শাহরিয়ার কবির বলেছিলাম তথ্যটি ঠিক নয়। যৌথ কমান্ড অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কর্মকর্তারা বিব্রত হয়েছিলেন এবং এই ভুল ঠিক করে নেবেন বলে বলেছিলেন।

সালাম আজাদ যেভাবে তথ্যটি উপস্থাপন করেছেন তা বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতির বিরুদ্ধাচারণকারীদের উস্কে দেবে, তাদের হাত শক্তিশালী করবে। ওই খবরে বলা হয়েছে সালামকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। কে, কখনও তাকে বিতাড়িত করল সে খবর তো আমরা জানি না। এখানে মিডিয়ায়ও সেই বিতাড়নের খবর আসে নি। সংখ্যালঘুদের সমর্থনের কারণে নাকি তার এই বিপদ। এই নির্বাসন। সংখ্যালঘুদের চরম বিপর্যয়ে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যে ভূমিকা নিয়েছিল বিশেষ করে শাহরিয়ার কবির, ওয়াহিদুল হক, কবীর চৌধুরী প্রমুখ তাদের তো বিতাড়ন করা হয় নি। শুধু শাহরিয়ারকে প্রবল আক্রোশে দুবার গ্রেফতার, রিমান্ড, জেলে নেওয়া হয়েছে। শাহরিয়ার তো দেশত্যাগ করেন নি। আমাদের প্রতিতযশা আইনজীবী ড. কামাল হোসেন থেকে শুরু করে বিভিন্ন এনজিও প্রধান যারা আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত কেউ তো-তখন তেমনভাবে এগিয়ে আসেন নি এসব অসহায় মানুষকে রক্ষায়? গত সপ্তাহের খবর, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে শক্তি প্রয়োগ ও গণহত্যার জন্য ক্ষমা চাইবে না পাকিস্তান। কারণ এটি ইতিহাসের অংশ। তাছাড়া দুদেশের সম্পর্ক এখন চমৎকার (*আমাদের সময়, ১২.০৭.০৮*) এ খবরেরও কোনো প্রতিক্রিয়া আমি লক্ষ করি নি।

খুব সম্ভব নওয়াজ শরীফ যখন প্রধানমন্ত্রী তখন বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়। পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীদের একাংশ কিন্তু নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চেয়েছেন ও সরকার ক্ষমা চাক এ দাবিও তুলেছেন।

আমরাও এ দাবি তুলেছি। কখনো বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে, কখনো পায় নি। নওয়াজ শরীফের পর এই প্রথম সরাসরি সরকারের মুখপত্র ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করলেন। শুধু তাই নয়, ইঙ্গিত করেছেন, দুদেশের সম্পর্ক এখন ভালো। সুতরাং এসব ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটি কী? আমাদের সরকার ছাত্র-শিক্ষকদের পেটাতে যেমন দক্ষ পাকিস্তানিদের মুখোমুখি দাঁড়াতে তারা তেমন দক্ষ নয়। বর্তমান পাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিপিপির। অর্থাৎ যে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তান ভাঙা ও গণহত্যার জন্য দায়ী তার দলের কাছে। কিন্তু এতদিন পর জোরালো ভাষায় যে তিনি এই উক্তি করলেন তার মাজেজা কি? বাংলাদেশের পাকিদের সঙ্গে কি ইতোমধ্যে তারা জোরালো সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছেন? কয়েক দশক আগে গণহত্যার জন্য এখনও বিভিন্ন দেশ ক্ষমা চাচ্ছে। আর পাকিস্তান বলতে চাইবে না এবং তা ইতিহাসের অংশ। এর অর্থ কি? গণহত্যা তো ইতিহাসের অংশ। সেজন্যই তো ক্ষমা চাওয়া জরুরি। তার এই ক্ষমা না চাওয়ার প্রতিজ্ঞা এখানকার পাকিস্তানিদের খুশি করতে পারে, বাঙালিদের করবে না। বাংলাদেশ পাকিস্তানিদের হাত শক্ত করলেও এরা এখানে কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু পাকিস্তানিদের সাধারণ মানুষ বাঙালিদের সহানুভূতি হারাবে।

এর পরপরই ঘটল জামায়াতের জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের ঘটনা, যেটিকে এ কে খোন্দকার 'অসভ্যতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। নিতান্ত ভদ্রলোক বিধায় এর চেয়ে কঠিন শব্দ তিনি আর উচ্চারণ করতে পারেন নি। যেখানে মুক্তিযোদ্ধা লাঞ্ছিত হন সেটি কেমন মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ অনুমান করতে পারেন। সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেআর মোদাচ্ছির। তিনি জোটের পক্ষ হয়ে বিচার ব্যবস্থার সর্বনাশের খেলাটা শুরু করেছিলেন। সম্প্রতি তাকে জামায়াতের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে দেখা যাচ্ছে। এখন বিষয়টা পরিষ্কার যে, জেআর মোদাচ্ছির জোটের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি বলেছেন, তিনি এসব কিছুই জানেন না। জোটের মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তি যেন দুধের শিশু! জামায়াতের সভা আর তিনি জানেন না কিছু। সেখঅনে জোটের নীল চোখের বালক মাহমুদুর রহমান বলেছেন, 'গত ২৬ মার্চ ভারতীয় জেনারেলকে এনে স্বাধীনতার চেতনার অবমানা করেছে। কিভাবে তার ব্যাখ্যা দেন নি, অত গভীরতা জোটের মন্ত্রীর কাছে আশা করা বাতুলতা। একজন সাবেক মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান খান বলেছেন, ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদ ও ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া এখন সময়ের দাবি। সময়ের দাবি পূরণ হোক, আমরা দেখি এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে বলুন ভারতে ওপর। যারা বাসস্টপে ঠিকমতো বা দাঁড় করাতে পারে না, সিএনজি অটো মিটারে চালাতে বাধ্য করতে পারে না, ব্যবসায়ীদের হুমকিতে কাবু হয়ে যায়, পারে, শুধু নিরস্ত্রদের গণগ্রেফতার করতে।

তারা যুদ্ধ করতে পারলে করুক। তাদের কাজই তো তা। এক সময়ের সেক্টর কমান্ডার হামিদুল্লাহ খান আরও বেহতর (ভালো করে) বলেছেন, 'কতিপয় সেক্টর কমান্ডার জাতিকে বিভ্রান্ত করে দেশবাসীকে অপমানিত করার জন্য কথিত মুক্তিযোদ্ধাদের বিচারের হুমকি দিয়েছেন।' (*প্রথম আলো. ১২.০৭.০৮*) মুক্তিযুদ্ধের সুফল আমরা পাই নি পাকিপন্থি জিয়ার এসব অনুসারীদের জন্য। তারা যে প্রাণভয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন সে কথা বার বার প্রমাণ করেছেন। জেনারেল শফিউল্লাহ বা এ কে খোন্দকাররা এমন কথা বলেন না। দেশের জন্য যারা যুদ্ধ করেছেন সত্যিকারভাবে তারা এ ধরনের মন্তব্য করতে পারেন না। কিন্তু মূল প্রশ্ন অন্যখানে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতিরা জাল মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ গঠন করে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাকে লাঞ্ছিত করবেন আর মুক্তিযোদ্ধারা যদি শুধু আহা-উহ্ করে আঙুল চোষেন তাহলে এসব ঘটনা বাড়বেই। এত বড় ঔদ্ধত্য তারা করতে পারছে নিশ্চয় কোনো আশ্বাস থেকে। আসলে বাংলাদেশেই এ ঘটনা সম্ভব। বাংলাদেশ সত্যিই সব সম্ভবের দেশ।

এরই মধ্যে খেলাফত আন্দোলন বায়তুল মোকাররমের ইমামের মর্যাদা চেয়েছে প্রধান বিচারপতির সমান। তারা আরও সংহত করার জন্য এ দাবি তুলছে। এ করে তারা সমান্তরালে শরিয়া আইন চালুর স্বপ্ন দেখছে। আমাদের অভিজ্ঞতাবলে যিনিই ইমাম হন বায়তুল মোকাররম মসজিদের, তিনিই অসাম্প্রদায়িকতা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। প্রকৃত আলেমকে এ পদে বসানো উচিত। যিনি পদমর্যাদা নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে বরং মানুষের খেদমত করবেন।

এরই সঙ্গে আমরা ঢাকাবাসী নামে একটি সংগঠন ঘোষণা করেছে, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে এবং 'কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে না।' (*আমাদের সময়, ১৩.০৭.০৮*)

অন্যদিকে সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে খুবই নমনীয়তা প্রকাশ করছে। মুজাহিদের বিরুদ্ধে মামালার অভিযোগ করা হয়েছে, মুজাহিদকে হাইকোর্ট আগাম জামিন নামঞ্জুর করেছেন। অথচ সরকার তাকে গ্রেফতার করে নি। মুজাহিদ এখন প্রচণ্ডভাবে গালিগালাজ করে সরকারকে। অথচ এর আগে মামলার আগেই অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের এ ধরনের পক্ষপাতিত্বের ফলে সরকার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। অন্যদিকে প্রধান উপদেষ্টা, সেনাপ্রধান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার যুদ্ধাপরধীদের বিচারের দাবির যৌক্তিকতা সমর্থন করে বক্তব্য রাখলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার বন্দোবস্তই করেন নি। বোঝা যাচ্ছে, কাজে নয় কথায় তারা বড়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব বক্তব্য এসেছে এবং দেশে যা ঘটছে ও যুদ্ধাপরাধীরা এখন যা বলেছে এবং করছে তার মধ্যে এক ধরনের ধারাবহিকতা যোগসূত্র আছে

কি না তা আপনারাই বিচার করবেন। গত দেড় বছর কিন্তু ৭১-এর খুনিরা এ ধরনের বক্তব্য দেওয়া শুরু করে নি বা প্রকাশ্যে এ ধরনের কান্ডকারখানা চালায় নি। এতে দুটি বিষয় স্পষ্ট। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটি শুধু দেশ-বিদেশে প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করছে না, তাদের দিশেহারা করে তুলেছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য পাল্টা তারা বক্তব্য দিচ্ছে ও কর্মকান্ড শুরু করেছে।

এর প্রতিবিধান একটিই আমাদের আরও সচেতন হয়ে যুদ্ধাপরাধী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে জনমত জোরদার করতে হবে এবং সক্রিয়ভাবে তাদের এ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করতে হবে। ১৯৭১ সালে এরকম অনেক গোয়েন্দা বাহিনী পাকিদের পক্ষে ছিল হঠাৎ হঠাৎ বিপ্লবী হয়ে চুপসে যাওয়ার কোনা অর্থ নেই যা অনেকের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। যতদিন যুদ্ধাপরাধীরা কাঠগড়ায় না দাঁড়াবে ততদিন আমাদের সোচ্চার থাকতে হবে। এই প্রত্যয় যেন আমাদের থাকে। আর এক্ষেত্রে মিডিয়া হতে পারে আমাদের অকৃত্রিম সহযোগী।

২১ জুন, ২০০৮

স্পষ্ট করে জানিয়ে দিন-যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে কি না

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, যানজট, বিদ্যুৎ সঙ্কট, চরমপন্থীদের মুন্ডু কাটা খেলা, সংসদ সদস্য শেখ সেলিম, সুরঞ্জিত সেনগুপ্তদের দলীয় 'প্রতিপক্ষ'দের আক্রমণ-না, সঙ্কট আর সংবাদের শেষ নেই। তার মধ্যেও সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিন জায়গা করে নিচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত সংবাদ। ওপরে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করেছি সেগুলো সংবাদপত্রে ছাপা শুরু হয়েছে তাতে ছেদ পড়েনি। এর অর্থ, মানুষের মনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়টি জায়গা করে নিয়েছে। মানুষের মন থেকে এটি হটাবার আর কোনো উপায় নেই। এবং তাই, মহাজোট ক্ষমতাগ্রহণের আট মাস পর প্রশ্ন জাগছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কি হবে? এই প্রশ্নের অর্থ- যা মনে করা হয়েছিল স্বতঃসিদ্ধ সে সম্পর্কে প্রশ্ন জাগছে। অর্থাৎ বিচার নাও হতে পারে।

এ ধরনের সংশয়ের সৃষ্টি কাম্য ছিল না। এবং এই সংশয় সৃষ্টির দায় সরকারের। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে একটি ক্রেজ সৃষ্টি করেছিল। উৎসাহ-উদ্দীপনা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, আইন প্রতিমন্ত্রী ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, ডিসেম্বরের মধ্যে বিচারের কাজ চুকেবুকে যাবে। সরকারি উদ্দীপনা দেখে যুদ্ধাপরাধী ও খুনীদের দল হিসেবে পরিচিত জামায়াতে ইসলামীর নেতারা নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। তাদের অধস্তন সহযোগীদের খোঁজ পাওযা যাচ্ছিল না। দিন এগোতে থাকে, সরকারের উদ্দীপনা হ্রাস পেতে থাকে মাঝে মাঝে মন্ত্রীরা রুটিনওয়ার্কের মতো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা ঘোষণা করেন। তারপর তাঁরা বিভিন্ন সুরে কথা বলা শুরু করলেন। একজন বললেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার জন্য দেশী-বিদেশী চাপ আছে। এ সময়ই সংসদ সদস্য বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ সেলিম, জেনারেল শফিউল্লাকে বঙ্গবন্ধু হত্যার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী করেন। সবাই সন্দেহ করে বসলেন এইটা বোধ হয় দেশী চাপ, কারণ, ফরিদপুরের বিখ্যাত এক যুদ্ধাপরাধীও এখন বিভিন্ন আত্মীয়তার মাধ্যমে প্রভাবশালী। আর বিদেশী চাপ-সৌদি, পাকি আর যুক্তরাষ্ট্র। হয়ত এর কোনটাই ঠিক নয়, কিন্তু মানুষের ধারণা তাই।

এর পরপরই আরেকজন মন্ত্রিপর্যায়ের ঘোষণা করলেন, বিদেশী কোনো চাপ নেই। তারপর একজন বললেন, চাপ থাকা না থাকা কোনো বিষয় নয়। আমরা

ঠিক করেছি বিচার করব, বিচার হবেই। সবশেষে আইনমন্ত্রী বললেন, কোনো চাপ নেই, বিচার তো হবেই। শুধু তাই নয়, বাড়ি খোঁজা হচ্ছে। সর্বশেষ সংবাদ, পরশু প্রধানমন্ত্রী এক বক্তৃতায় বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে।

শহরাঞ্চলে তেমন না হলেও মফস্বলে যে প্রশ্নটা তুলছে সবাই, এমনকি আওয়ামী কর্মীরা, তা হলো হবেহবে কিন্তু হচ্ছে না কেন? অনেক কিছু তো আটকে নেই, তাহলে এটি আটকে আছে কেন? এর ফলে এক ধরনের ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে এবং এই ক্ষোভ নিত্যদিনের যন্ত্রণার সঙ্গে একীভূত হচ্ছে। অন্যদিকে, যুদ্ধাপরাধী ও তাদের সহযোগীরা নিজেদের অবস্থান আরও সংহত করেছে।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, যুদ্ধাপরাধীরা বড় অঙ্কের একটি তহবিল গড়েছে। আদৌ যদি বিচার হয় তাহলে, কৌসুলি থেকে মিডিয়া সবাইকে অর্থ দিয়ে বশীভূত করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন, পাকিস্তান এর বিরুদ্ধে লবিং শুরু করেছে, বাংলাদেশের স্ট্যান্ড কী হবে? গত কয়েক সপ্তাহ আবার জামায়াতের নেতারা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য দেয়া শুরু করেছেন। যুদ্ধাপরাধী সাকা চৌ তো ঘোষণা করেছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সরকারের কোনো এখতিয়ার নেই। শুধু তাই নয়, হিযবুত তাহরীর 'বদর দিবসের বিজয় র‍্যালি' বের করবে বায়তল মোকাররম থেকে ৪ সেপ্টেম্বর। বদর দিবসের কথা শুনলেই আল বদরের কথা মনে হয় যারা ১৯৭১ সালে বদর দিবস পালন করে মানুষ জবাই শুরু করেছিল। তারা কী চায়? তাদের ভাষায়- 'খিলাফতের অবর্তমানে মার্কিন-ব্রিটিশ-ভারত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলিম বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে মালিকী, কারজাই, জারদারী, খালেদা-হাসিনার মতো দালাল শাসক গোষ্ঠী। যার ফলে আজ আমরা পরাজিত। পিলখানা হত্যাকাণ্ড, টিপাইমুখ বাঁধ, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ষড়যন্ত্র এর জ্বলন্ত উদাহরণ। বলার অপেক্ষা রাখে না খালেদার নাম ক্যামোফ্লেজের জন্য ব্যবহৃত হলেও আসল টার্গেট প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। শেষ লাইনে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বিএনপি-জামায়াতের অবস্থান সরকারের বিপরীত। হিযবুত তাহ্‌রীরও সেই পক্ষ। এ সবকিছু তুলে ধরে সরকারি নীতি সম্পর্কে নীতি নির্ধারকদের মনের কনফিউশন।

আমাদের মনে হয়েছে পুরো বিচার বিষয়টি নিতান্ত রুটিন আরো দশ-পাঁচটা বিষয় হিসেবে নেয়া হয়েছে। এটি যে সাধারণ হত্যার মতো কোনো ঘটনা নয়, বিএনপি-জামায়াতিরা সেটাই স্বীকার করে না এসব দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক নীতি নির্ধারকদের মধ্যে বিএনপি জামায়াতীরা লুকিয়ে আছেন কিনা।

না

আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদের দীর্ঘ বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, বিচার শুরু হলো বলে। নিপাট এই সজ্জন ব্যক্তিটির জন্য মায়া হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি তিনি দীর্ঘদিন করেছেন, মন্ত্রী হয়ে ভেবেছেন, এখনই কাজ শুরু করে দেবেন। কিন্তু পারছেন না কারণ তিনি তো বোঝেননি, এখানে সংসদীয় সরকার হলেও তা প্রধানমন্ত্রীর একক সরকার, যৌথ কোনো সরকার নয়। অন্যদিকে, সিভিল সমাজের প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে পারছেন না। আমরা তার অবস্থা বুঝি। মন্ত্রীদের পতাকাশোভিত গাড়ি আর-বাড়ি ছাড়া কিছুই দেয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী চাইলে, কাল থেকেই বিচার শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী চান কিন্তু এখনই চান না, তাহলে মন্ত্রীদের এ ধরনের কথা বলতেই হবে। একজন মন্ত্রীতো বলেছিলেন, তদন্ত কর্মকর্তাদের তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অসুস্থ তো তাই স্বাক্ষর হচ্ছে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিদিন রাশি রাশি ফাইল সই করছেন- এটি সবাই জানে।

সরকার বিচার না করলে বা হেলাফেলা করে বিচার করলে কী হবে? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তরুণ স্মার্ট এক লেকচারারকে। তিনি বললেন, সবকিছু নিয়ে পলিটিক্স করলে তা বুমেরাং হবে। তরুণরা ভোট দিয়েছে প্রধানত এই কারণে, তাদের বঞ্চনা করবেন? তাহলে পাঁচ বছর পর দেখা হবে। একজন উচ্চশিক্ষিত কিন্তু গৃহবধূ বললেন, বিচার তো করতেই হবে। না হলে শেখ হাসিনাকে আর কখনও বিশ্বাস করা যাবে না। আমি এমন কাউকে পাইনি যে বলেছে বিচার চায় না। জোটের হিসাব ধরলে ৭০ ভাগ বিচারের ব্যাপারে এককাট্টা। যে ৩০ ভাগ বিরোধী বলে পরিচিত তাদের একটা বড় অংশও যুদ্ধাপরাধী বিচারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। শুধু তাই নয়, আমরা জানি সুপ্রিমকোর্ট রক্ষণশীল কিন্তু সেই কোর্টও সাঈদীর বিদেশ যাওয়া নাকচ করেছে। মওদুদ আহমেদকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে জোট। কিন্তু বলেছে তিনি যেন যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করেন। সবাই প্রস্তুত কিন্তু সরকার যেন নয়। একটি কথা বলি, সিভিল সমাজের ২০ ভাগ ভোট জয়-পরাজয় নির্ণয় করে। এ বিচার না হলে সেই ২০ ভাগ আ'লীগের পক্ষে যাবে না। এইবার যে আওয়ামী লীগ ১০ ভাগ ভোট পেয়েছে তা দলনিরপেক্ষ মহাজোটকে সমর্থন করে ভোট দিতে বলেছিলাম তারা এখন নিশ্চুপ। আদৌ তা নয়, আমরা সরকারের অংশ নই। জামায়াত-বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগ উত্তম এবং তারা যুদ্ধাপরাধীদের ত্বরিত বিচার করবে এ আশায়ই ভোট দিতে বলেছিলাম। অনেকে বলেন, আপনারা কি কিছু পেয়েছেন, না হলে আন্দোলন করছেন না কেন? এ প্রশ্ন করেন বিশেষ করে আওয়ামী লীগ। জাসদ যারা করেন তারা। তাদের দাবি তোলা না তোলার কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা আন্দোলন করেছি, জনমতের চাপে মহাজোটের সব শরিক বলেছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে। সংসদে ঘোষণা হয়েছে বিচার হবে। আমাদের কাজ ঐ টুকুই। বিচার না হলে বা হেলাফেলার বিচার হলে সে দায় সরকার, মহাজোট বা সংসদের। তবে,

যতদিন বিচার না হয়, ততদিন বিচারের দাবি আমরা করে যাব; আমাদের সামর্থ্য এতটুকুই। যাঁরা বিচার চান, বিচার না হওয়াতে অসহিষ্ণু, তাঁদের আমরা অনুরোধ করব নিজ নিজ সাংসদকে বলুন কেন বিচার হচ্ছে না। এই না হলে আগামীতে তাঁকে ভোট দেবেন না। এ কথা স্পষ্ট করে বলুন।

২৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী আবারও বলেছেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। আমরা এখনও বিশ্বাস করি, তিনি তাঁর কথা রাখবেন। ৩৭ বছর অপেক্ষা করেছি, না হয় আরও ক'টা দিন অপেক্ষা করলাম। আন্দোলনের সময় তো আর ফুরিয়ে যায়নি।

জনতার মনে প্রশ্ন জাগছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কি হবে? সেই প্রশ্নের অন্য অর্থ- যা মনে করা হয়েছিল স্বতঃসিদ্ধ সে সম্পর্কে প্রশ্ন জাগছে। অর্থাৎ বিচার নাও হতে পারে।

এ ধরনের সংশয়ের সৃষ্টি কাম্য ছিল না। এবং এই সংশয় সৃষ্টির দায় সরকারের। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে একটি ক্রেজ সৃষ্টি করেছিল। উৎসাহ উদ্দীপনা এত প্রবল হয়ে উঠেছি যে, আইন প্রতিমন্ত্রী ঘোষণা করে দিয়েছেন, ডিসেম্বরের মধ্যেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শেষ হবে।

যুদ্ধাপরাধাদের বিচার সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় এবং উপমহাদশে এ ধরনের বিচার প্রথম এবং সে কারণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে বলতে বাধ্য হচ্ছি সরকারের কোনো ধারণা নেই। যেমন, প্রথমে বিচারের জন্য দরকার বৃহৎ ইমারত যেখানে বাদী-বিবাদীপক্ষ, দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক, দর্শক, প্রসিকিউটার, বিচারক, নিরাপত্তা বাহিনী– সবার জায়গার সঙ্কুলান হতে হবে। দ্বিতীয়ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিচারক। তৃতীয়ত অভিযোগকারী বা বাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি ও অন্যান্য কৌসুলি নিয়োগ। যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেফতার। সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করা। সম্পূর্ণ বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য আইন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন মনিটরিং সংস্থা। চৌকস মুখপত্র। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকি লবিংয়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা ইত্যাদি। এর কোন্‌টি হয়েছে?

আমরা যারা দীর্ঘদিন এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, বলেছিলাম পুরনো হাইকোর্ট ভবনে বিচার কাজ হোক। ইমারতটির স্থাপত্যের সঙ্গে বিচারের গুরুত্ব মানায়। সেটি সুপরিসর। বিচারকাজ শেষ হলে সেখানে যাবতীয় দলিলপত্র ও সংশ্লিষ্ট বস্তু দিয়ে একটি জাদুঘর নির্মাণ করা যেত যেটি দেশী-বিদেশী পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াত। শুধু তাই নয়, এই ইমারতটি সাক্ষ্য দিত, আমরা ইতিহাসের দায় মিটিয়েছি এবং ভবিষ্যতে যাতে যুদ্ধাপরাধ হতে না হয় এটিও তা মনে করিয়ে দিত। এখানে আছে বোধহয় এখন ছোট সরকারি একটি অফিস। ফলে এটি খালি করা কোনো ঝামেলার ব্যাপার নয়।

সরকার ঠিক করেছে আবদুল গনি রোডের অপরিসর একটি ইমারত, যেখানে আছে তিনটি অফিস। আমরা বলেছিলাম, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বাদ দিয়ে যাঁরা এই মামলা পরিচালনা করতে পারেন তাঁদের রাখেন। সরকার আগ্রহী নিম্ন আদালতে ফৌজদারী দক্ষ আইনজীবীতে। এ রকম আরও অনেক বিষয় আছে। এ সব কোনো প্রতিক্রিয়াই শুরু হয়নি, তাহলে আইন প্রতিমন্ত্রী যে বললেন, ডিসেম্বরে বিচার শেষ করবেন, তা কীভাবে?

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছেন, জনমত সৃষ্টি করতে। তাঁর অবগতির জন্য বলি ১৯৭২ সাল থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উঠছে। তিনি দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন। তিনি হয়ত জানেন না, কত ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে আজ আমরা ঐকমত্য পোষণ করছি, আর যেখানে আমাদের প্রতিনিধি সংসদ সদস্যরাতো সর্বসম্মত প্রস্তাব নিয়েছেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে, যেখানে তাঁর দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ঘোষণা করা হয়েছে বিচার হবে, সেখানে আর কী ধরনের জনমত প্রয়োজন?

এ সবকিছু মিলে দু'টি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না। ১৯৭২-৭৩ সালেও সরকার প্রধান/মন্ত্রীরা দেশে-বিদেশে ঠিক একইভাবে পোষণ করেছিলেন বিচার হবে, কিন্তু হয়নি। আজ ৩৮ বছর পর সেই আবেগ আর নেই। তাছাড়া সরকার ও সরকারী দলের প্রভাবশালীদের অনেকে এখন যুদ্ধাপরাধী পরিবার বা যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থক দেশগুলোর নেতাকর্মীদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ। সুতরাং তাদের পক্ষে বিচার কাজ সম্ভব নয়।

দুই. বিচার হবে এ বছর বিভিন্ন ঘোষণা দেয়া হবে, দ্বিতীয় বছর প্রক্রিয়া শুরু হবে, তৃতীয় বা চতুর্থ বছরে বিচার শুরু হবে এবং তা সম্পূর্ণ হবে না। আওয়ামী লীগ বলতে পারবে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম, পারিনি, পরের সরকার করবে, তাতে হয়ত ভোটব্যাংক নষ্ট হবে না।

১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

নতুন বছর হোক যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের

ডিসেম্বরের বা বিজয়ের মাস এলেই জামায়াতীদের মাথাটাথা যেন কেমনে আউলে যায়। পাগল পাগল লাগে। তারা এমন সব কথাবার্তা বলতে থাকেন যে, অনেকের মনে হতে পারে, বাংলাদেশের আরও দশ-পাঁচটি রাজনৈতিক দলের মতোই তাঁরা, বিজয় দিবসে যা যা বলা দরকার তাই বলছেন, পলিটিক্যাল কারেকটনেস আর কী! গত কয়েক বছর ধরে এরকম চলছে, এ বছর তা আরও বেড়েছে। মনে হয় সামনের বছর তা মাত্রা ছাড়াবে। অনেকের আবার এও মনে হতে পারে, সারাবছর এক রকম, ডিসেম্বরে আরেক রকম, মাথা এ রকম আউলে যায় কেন?

জামায়াত বাংলাদেশের অন্যান্য দলগুলোর মতো নয়। তারা অতি সুসংহত, ভেবেচিন্তে প্রথমে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে, সমাজে রাষ্ট্রে, সব পর্যায়ে অনুপ্রবেশ করেছে এবং বিভিন্ন দলে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেও কাজ করছে। তারা যা বলে এবং করে, ভেবেচিন্তেই করে। আবেগবশত তা করে না। করলে, ১৯৭১ সালে আলবদর তরুণরা নিজ শিক্ষকদের জবেহ করতে পারত না। আমাদের মনে রাখা দরকার দলটি যুদ্ধাপরাধীদের। জামায়াতকে অনেকে খুনীদের দল বলেন, কারণ, এদের প্রায় প্রত্যেকটি নেতার হাত রক্তে রঞ্জিত, তরুণ জামায়াতীরা কখনও ভেবে দেখেছেন কী না, খুন না করলেও যুদ্ধাপরাধ না করলেও তারা কেন খুনী বা যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছেন।

২০০৮ সালে নির্বাচনের আগ মুহূর্ত থেকে জামায়াত বাঙালি, বাঙালি রাষ্ট্রের স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বক্তৃতা বিবৃতি দিতে থাকে। বুদ্ধিমান জামায়াতী নেতারা বুঝেছিলেন, মানুষ জোট সরকারের বিপক্ষে চলে গেছে এবং যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে ঘৃণা তীব্র হচ্ছে। উট পাখির মতো মাথা গুঁজে বালিতে কিয়ৎক্ষণের জন্য তারা থাকতে চেয়েছিল, ঝড় চলে গেলে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। নির্বাচনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আওয়াম লীগ জাতীয় ম্যান্ডেট পেলে তারা চিন্তিত হয়ে ওঠে। দেখা যাচ্ছে, অন্যান্যবারের মতো, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে আওয়ামী লীগ এখন কথার কথা নয়, কাজে পরিণত করতে চাচ্ছে। আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ এই বিচারের দেখাশোনা করবেন। দীর্ঘ এক যুগ তিনি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা, তাঁর পক্ষে এ দাবি থেকে হটে

যাওয়া তো অসম্ভব। সুতরাং জামায়াত নেতৃবৃন্দ চিন্তিত। ইতোমধ্যে বিএনপি ও মওদুদ আহমদের চেষ্টায় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ ছিল। এ বছর তা সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। বিচার না করার জন্য বিচারপতিরা জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও খালেদা জিয়াকে ভৎর্সনা করেছেন। ফলে, জামায়াতীদের চিন্তা, যুদ্ধাপরাধ থেকে বাঁচতে হলে ভোল পাল্টাতে হবে। তারা জানে, কয়েকবার বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ ক'টি শব্দ আওড়ালে হয়ত আওয়ামী নেতৃবৃন্দ খুশি হবে। অতীতে দেখা গেছে, এ ধরনের শব্দ শুনলেই আওয়ামী নেতারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন, কিন্তু এবার বোধহয় প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনা শব্দে ভুলছেন না।

জামায়াতী নেতারা গত দুবছর যা বলছেন, আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, তারা তাদের অবস্থান বদলেছেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তারা তাদের অবস্থান বিন্দুমাত্র বদলাননি। কথায় ফুলঝুড়ি কৌশলমাত্র। অবস্থান পাল্টালে (যুদ্ধাপরাধী ব্যতীত) অন্য জামায়াতীদের সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ ছিল।

জামায়াতের তাত্ত্বিক ও আসল নেতা, রাজাকারই আযম গোলাম আযম কয়েক খণ্ডে তার আত্মজীবনী লিখেছেন, নাম জীবনে যা দেখলাম।' কী দেখেছেন তিনি জীবনে। পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য ইয়াহিয়া-ভুট্টোকে তিনি দায়ী করেছেন ঠিকই, তবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার 'ক্ষোভও ছিল, কারণ স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার যখন কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না, তখন ইয়াহিয়ার সঙ্গে সংলাপে ব্যর্থ হতে দিলেন কেন? প্রয়োজনীয় ছাড় দিয়ে হলেও সমঝোতায় পৌঁছা উচিত ছিল।' অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল না। পাকিস্তান থাকাটাই ছিল জরুরি। শুধু তাই নয়, রাজাকার ও শান্তি কমিটির যৌক্তিকতা তিনি তুলে ধরেছেন, ১৯৭১ সালে এরা বাংলাদেশকে নরকে পরিণত করে তুলেছিল, তাঁদের যৌক্তিকতা তুলে ধরা মানে তাদের হত্যা লুট ধর্ষণ সমর্থন করা। মুক্তিযুদ্ধের একটি কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ হতো না যদি না পাকিস্তানিরা এত নৃশংস হতো না, যদি না মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজন নির্বিচারে হত্যা করত। পাকিস্তান জেনারেলরা, ঠিক একই কথা বলেছেণ, প্রশ্ন উঠতে পারে, 'নির্বিচারে' হত্যা হলো কখন? নির্বিচারে হত্যা হলো দেশ-বিদেশে পত্র-পত্রিকায় এর বিশদ বিবরণ এল না কেন? আরও প্রশ্ন উঠতে পারে, গত ৩৮ বছর অবাঙালিদের তারা কখনও কোনো ত্রাণ দিয়েছিলেন কিনা? স্বাধীনতার পর আলবদর মঈনুদ্দীন (যে নিজ হাতে বুদ্ধিজীবীদের জবেহ করেছে), আবদুস সোবহান প্রমুখ যুদ্ধপরাধীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং সেখান থেকে জামায়াতীদের সাহায্য করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, এখনও দ্বিজাতিতত্ত্বই ভাল। এ কথা এখনও তিনি বিশ্বাস করেন।

তার মতের প্রতিধ্বনি করেছেন দলটির বর্তমান আমির মতিউর রহমান নিজামী। তিনি বলেছেন, উপমহাদেশে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিসত্তা সংরক্ষণের

উপলব্ধি থেকেই '৪৭ সালে দেশভাগ হয়। আজকের বাংলাদেশের সীমানায় '৭১-এর পর কোনো পরিবর্তন আসেনি। যে চেতনার ভিত্তিতে ভৌগলিক সীমানা নির্ধারণ হয়েছে, সেটাই এ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ। তাই এ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে অটুট, অক্ষুন্ন ও সুসংহত রাখতে হলে বাংলাদেশের মুসলিম পরিচিতি আরও জোরদার ও মজবুত করতে হবে। [*আমাদের সময়, ১৫.১২.০৯*] অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ যে দ্বিজাতির বিরুদ্ধে চিলতা সঠিক নয়, পাকিস্তানই ঠিক এবং বাংলাদেশকে আরেকটি পাকিস্তান হতে হবে। ধর্ম জাতীয়তার নির্ধারক নয়-এ সত্য তিনি অস্বীকার করছেন। তাহলে, তাদের অবস্থান বদলাল কোথায়?

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় দেখে ইদানীং তারা বঙ্গবন্ধুর ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করছে। নিজামী তাঁকে 'স্বাধীনতার স্থপতি' 'মহান নেতা' হিসেবে উল্লেখ করছেন। ২৭ মার্চ তিনি বলেন, 'মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা যতটা না শ্রদ্ধা করে আমি নিজে শ্রদ্ধা করি তার চেয়ে বেশি।' ৬ ফেব্রুয়ারি শিবিরের সমাবেশে এক সময়কার আলবদর কমান্ডার বর্তমান জামায়াত নেতা মীর কাশেম আলী বলেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন না দেখালে আমরা ১৪ কোটি মানুষ স্বাধীনতা লাভ করতে পারতাম না।' [*সমকাল, ১৬-১২-০৯*]

বঙ্গবন্ধু মীর কাশিমকে তো ১৯৭১ সালে স্বপ্ন দেখাতে পারেননি। পারলে মীর ১৯৭১ সালে আলবদর কমান্ডার হন কীভাবে? নিজামী শেখ মুজিবকে কখনও বঙ্গবন্ধু বলেননি কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সব সময় কায়েদে আজম।

আসলে জামায়াত প্রমাণ করতে চায় ১৯৪৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসে ধারাবাহিকতা আছে, ১৯৭১ সাল একমাত্র বিচ্যুতি।

নিজামীকে আলবদর বললে ক্রুদ্ধ হন। সম্প্রতি শাহরিয়ার কবির ও আমি টেলিভিশনে বিষয়টি উল্লেখ করায় জামায়াত টিভি ও সংবাদপত্রে এ নিয়ে প্রতিবাদ জানায়, তাদের মূল বক্তব্য নিজামী বা জামায়াত কখনও আলবদরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। আর আলবদর বাহিনী তো ছিলই না, অথচ, ১৯৭১ সালে জামায়াতের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রামেই আলবদর বাহিনী সম্পর্কে নিয়মিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, নিজামীর দেয়া বিভিন্ন বক্তব্যসহ, উল্লেখ্য, পাকিস্তানের সন্ত্রাসী সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের টাকায় ১৯৬৯ সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, পাকিস্তানী এক জেনারেলই তা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আইএসআইয়ের সঙ্গে জামায়াতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। এবং এখনও অনেকে মনে করেন সে সম্পর্কে বিদ্যমান।

পাকিস্তানিরা আলবদর সম্পর্কে কী লিখেছেন? পাকিস্তানি গবেষক সৈয়দ

আলি রেজা নসর সম্প্রতি একটি বই প্রকাশ করেছেন, *নাম দি ভ্যানগার্ড অব দি ইসলামিক রিভ্যুলেশন: দি জামায়াতই ইসলামী অব পাকিস্তান*। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামিক জামায়াতই তুলাবা (আইজেটি) সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা শুরু করে। এর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। ১৯৭১ সালে আইজেটি পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। সেনাবাহিনীর সহায়তার তারা আলবদর বাহিনী গঠন করে। এর অধিকাংশ সদস্য ছিল আইজেটির সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অবাঙালি সম্প্রদায় থেকে প্রধানত সদস্য সংগ্রহ করা হতো। আইজেটির নাজিম ই আলা নিজামী এই বাহিনী সংগঠিত করেন। (২/জ-৬৬) আমাদের প্রমাণের আর কী দরকার? যে পাকিস্তানীদের জামায়াতীরা প্রভু মনে করে তারাই এসব বলছে। আরেক আলবদর কমান্ডার মুজাহিদ গত বছর নিজামীকে আল্লাহ্‌র 'ওলি' বলে উল্লেখ করেন। আসতাগফেরুল্লাহ। আমাদের জানা মতে, আল্লাহ্ কোনো খুনী ও মিথ্যাবাদীকে 'ওলি' হিসাবে পাঠাননি। তা আমরা জামায়াতীদের দেখছি গত ৫০ বছর। আমরা জানি তারা কী? এখন নতুন প্রজন্ম ও বাচ্চা জামায়াতীরা জানুক তাদের আমির ওমরাহরা কেমন নাফরমান বান্দা। শাহরিয়ার কবিরের 'যুদ্ধাপরাধী ৭১ 'ডকুমেন্টারিটি দেখুন, সাথিয়ার মানুষ সেখানে জানিয়েছেন, তৎকালীন 'মইত্যা রাজাকার' কী করেছিল।

নিজামী গত বছর বলেছেন, শেখ হাসিনা বলেছেন কোরান সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন হবে না। আবার তিনি ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন। এ উক্তি পরস্পর বিরোধী। '৭২ সালের সংবিধানের সঙ্গে কোরান সুন্নাহর বিরোধটা কোন জায়গায় সেটি নিজামীরা বলেননি। যাতে বাচ্চা জামায়াতী ও ধর্মান্ধদের উত্তেজিত করা যায়।

জামায়াতের সমর্থক খেলাফত মজলিসের আমির মোহাম্মদ ইসহাক বলেছেন, পিতার সম্মতিতে নারী-পুরুষের অধিকার বিষয়ে শেখ হাসিনা 'শরীয়ত' বিরোধী' বক্তব্য তার ইসলাম বিদ্বেষী মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। সম্পত্তি বন্টন নিয়ে আল্লাহর দেয়া সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার বক্তব্য তার মুসলমানিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। তার মূল বক্তব্য 'সেক্যুলার শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে।' 'ধর্মহীন শিক্ষা তারা মানবে না।' (আমার দেশ ১২.১২.০৯) নিজামী প্রায় একই ভাষায় একই ধরনের বক্তব্য রাখেন।

[নয়াদিগন্ত ঐ]

তালেবান হতে চাওয়া বিএনপির আরেক সমর্থক আমিনী বলেছেন, শেখ হ্যাসিনা কোরান সংশোধন করতে চান। এ ধরনের মিথ্যা ও 'জ্বালাময়ী' বক্তৃতার

পরও কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। এইসব ব্যক্তিরা তা অনুধাবন করেছেন কিনা জানি না। ৫০ বছর আগের পাকিস্তানী রাজনীতির ধারা যে ক্রমেই অচল হয়ে উঠছে এটি বুঝতে হয়ত রাজনীতিতে জায়গা থাকতে পারে। কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে- কোরানে তো নারী-পুরুষ সমান বলে বলা হয়েছে। সেটি যদি সত্য হয় এবং আমি যদি সে বিধান মেনে কাজ করি এবং সব সন্তানকে সমান দেখি তাতে আপত্তি কী? আর বর্তমান শিক্ষানীতি তো যতটা সেক্যুলার হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। এতেই গাত্রদাহ! কারণ, তারা ভাবছে মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যযুগে রাখতে পারলে তাদের কর্তৃত্ব বহাল থাকে। তাদের চোখ ফুটলে তো মুশকিল। বাচ্চা জামায়াতীরা তো প্রশ্ন রাখতে পারে তাদের লিডারদের কাছে যে, লিডারদের একজনেও সন্তান মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেনি কেন?

জামায়াত এখন শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস ইত্যাদি পালন নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনার প্রস্তুতি নিয়েছে। এইসব মুক্তিযোদ্ধা কারা জানি না। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও ১৯৭১ সালে আলবদর বাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান, জামায়াতের তৎকালীন ছাত্র সংগঠনের পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদক, মুজাহিদ কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছেন জামায়াত মুক্তিযুদ্ধ করেছে, তার ভাষায় "আমরা স্বাধীনতা এনেছি, প্রয়োজন হলে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করব। তবু, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে আমরা হুমকির মুখে পড়তে দেব না।"

[আমাদের সময়, ১৬-১২-০৯]

গত বছর বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধী বলে কিছু নেই। তাঁর এই বক্তব্য সঠিক হলে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ না হলে তারা মুক্তিযুদ্ধ করলেন কী ভাবে এখনও আমরা তাহলে পাকিস্তানে আছি। তিনি আরও বলেছেন, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মূল্যায়ন করতে হবে। তাদের মূল্যায়নে আমরা যথেষ্ট ভীত। এই মূল্যায়ন হচ্ছে আবার বুদ্ধিজীবী হত্যা।

মুজাহিদ ১৯৭১ সালে কী করেছিলেন ডিসেম্বরে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও পত্রপত্রিকা তা আবারও প্রচার করেছে। জামায়াত কিন্তু লিখিতভাবে এসব বক্তব্য স্বীকার করেনি। লিখিতভাবে তারা যা বলছে তার নমুনা দিচ্ছি-

গত বিজয়ের মাসে জামায়াতের 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র' [বাংলাদেশেই একমাত্র সম্ভব] দু'টি বই প্রকাশিত হয়েছে, বই দু'টিতে জানানো হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ হননি, হয়েছেন ১০ হাজার।

(অথচ পাকি জেনারেল জানিয়েছেন ৪০ হাজার নিহত হয়েছেন) শুধু তাই নয়, যেহেতু ১৬ ডিসেম্বরের আগে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ বলে কোনো রাষ্ট্র ছিল না। অতএব ১৬ ডিসেম্বরের আগে এর অস্তিত্ব স্বীকার বা অস্বীকার করায় কিছু

আসে যায় না। যে শিশুর জন্মই হয়নি, শতবার স্বীকার করলেও তা অস্তিত্বহীন। (*প্র. আলো ১৭.১২.০৮*] গ্রন্থের লেখক মুক্তিযোদ্ধাদের দোষী করেছেন, কারণ হানাদার বাহিনীর হাতে যত মানুষ নিহত হয়েছে আলবদর, আলশামস, রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যরা এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের জন্য দায়ী কে? কে আবার আওয়ামী লীগ, শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক-বাহক ছিল না। বরং ইতিহাস প্রমাণ করে, আওয়ামী লীগই একমাত্র দল যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক।

আমরা চাই, জামায়াত এসব মিথ্যা আরও বলুক। তাতে নতুন প্রজন্ম ও বাচ্চা জামায়াতীদের কাছে প্রমাণিত হবে জামায়াত নেতারা কত বড় মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। শুধু তাই নয়, এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরাও তাদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ আরও বেশি করে তুলে ধরতে পারব।

বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বলেছেন 'দেশে কোনো স্বাধীনতা বিরোধী নেই।' [*নয়াদিগন্ত, ১৬.১২.০৯*] এবং যুদ্ধাপরাধী বিচারের নামে রাজনীতিবিদদের হেনস্থা করা যাবে না।

অর্থাৎ তাদের নেতা সা. কা. চৌধুরীকে যুদ্ধাপরাধী বলা যাবে না। আমরা অনেকবার বলেছি, এখনও বলছি, বিএনপি-জামায়াত এখন সমার্থক। যারা খুনীদের সমর্থক তারাও প্রকারান্তরে খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ও খুনের রাজনীতিই করে। বিএনপি বা জামায়াতকে সমর্থন করা একই কথা।

এটা সবার জানা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সরকারের দৃঢ় অবস্থানে জামায়াতী নেতারা পাগলপারা। সে জন্য তারা এ বছর এসব বক্তব্য দিচ্ছেন, কিন্তু একই সঙ্গে এটিও স্বীকার্য যে তারা তাদের অবস্থান থেকে সরেনি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি মীমাংসিত হওয়া দরকার। শুধু তাই নয়, সংবিধানে সেই ধারা ফিরিয়ে আনা জরুরি, যাতে ছিল ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ। জামায়াতীরা ১৯৭১ সালে ছিল হানাদার বাহিনীর কোলাবরেটর। আর আমরা তাদের বিচার না করেও জামায়াত-বিএনপি জোট সমর্থন করে হয়েছি আরেক ধরনের কোলাবরেটর।

এই কোলাবরেশনের গ্লানি মুছে দেয়ার জন্য অবশ্যই সোচ্চার হন, বলুন সামনের বছর হোক যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বছর। বঙ্গবন্ধু হত্যা বিচার সম্পূর্ণ হওয়ায় আমরা কলুষ মুক্তির ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়েছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে কলুষমুক্ত হওয়ার আরেক ধাপ এগুনো জাতীয় কর্তব্য। মুজাহিদ যে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেছেন তার অর্থ যুদ্ধাপরাধের বিচার থেকে মুক্তি পাওয়া। এটি জামায়াতীদের গলায় ফাঁস থেকে মুক্ত হওয়ার যুদ্ধ।

জনকণ্ঠ ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯

জামায়াতের একটি ফ্রন্ট হয়ে গেল বিএনপি

অবশেষে সব লুকোচুরি শেষ। রহস্যময় কথাবার্তা, রহস্যময় আচরণ, সবই শেষ হলো। বিএনপি এবং জামায়াত যুদ্ধাপরাধ বিচারে তাদের নিজ নিজ অবস্থান পরিষ্কার করল। আমরা যা অনুমান করেছিলাম, তাই হলো। এর অন্যথা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে বিএনপির কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল হয়ত তৃণমূলের চাপের তারা বাস্তবে, মানবতাবাদী ধারায় ফেরত আসবে। কিন্তু তা হয়নি। বিএনপির বর্তমান নেতৃত্ব থাকতে তার কোনো সম্ভাবনা নেই।

প্রায় সময় মৌতাতে থাকা, বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন দাবি করেছেন. "দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকারিভাবে যাদের যুদ্ধাপরাধী বলে তালিকাভূক্ত করা হয়েছিল তাদের তৎকালীন আওয়ামী সরকারই মুক্তি দিয়েছিল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আওয়ামী লীগ সরকারই করেনি। এটাই ঐতিহাসিকভাবে সত্য। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারের নামে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।' [*প্র. আলো. ৩.৪.১০*]

আমরা বুঝতে অক্ষম, যুদ্ধাপরাধ/মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হলে বিএনপির সমস্যাটা কোথায়? তাদের আরেকটি অভিযোগ, এই ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে রাজনৈতিক হয়রানি করা হবে। এই যুক্তি বুঝতেও আমরা অক্ষম। ধরা যাক, আপনার দলে অনেক চোর ডাকাত ধর্ষক ঢুকে পড়েছে। আইন অনুযায়ী তাদের বিচার হওয়া জরুরি। জনস্বার্থে আপনি তাদের বহিষ্কার করবেন, না আঁকড়ে ধরবেন? সে রকম বিএনপিতে যদি যুদ্ধাপরাধী থেকে থাকে তাকে তাদের বহিষ্কার করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধের বিচার করবে বলে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করছে এটি ঠিক নয়, এটি তাদের নির্বাচন ম্যানিফেস্টোতে ছিল না। এ প্রচার সর্বৈব মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর।

যে আইনে বিচারের কথা হচ্ছে তার নাম- 'আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইবুন্যালস) আইন, ১৯৭৩।' "জাতীয় সংসদ প্রণীত নিম্নবর্ণিত আইন ১৯৭৩ সালের ১৯ জুলাই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানকৃত এবং এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হলোই।

১৯৭৩ সালের ১৯ নং আইন আন্তর্জাতিক আইনের অনুসরণে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও অন্যান্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আটক, বিচার এবং শাস্তি প্রদানের যথোচিত ব্যবস্থা করার জন্য আইন"

সংবিধানের ৪৭/১ এ ধরনের আইনের 'হেফাজত' করা হয়েছে এবং স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে- "এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনে অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারিতে সোর্পদ কিংবা দণ্ড দান করিবার বিধান সংবলিত কোনো আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না। "মানবতাবিরুদ্ধ অপরাধসমূহ বা যুদ্ধাপরাধ বলতে কী বুঝব তা বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানীর 'আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩ সহজ পাঠ' পুস্তিকায় সহজভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে-

"মানবতাবিরুদ্ধ অপরাধসমূহ যথা, বেসামরিক জনসমষ্টির যে কাহারো বিরুদ্ধে কৃত নরহত্যা, উচ্ছেদ, ক্রীতদাসতূল্য জবরদস্তি, বিতাড়ন, কয়েদ, অপহরণ, আটক, শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ কিংবা অপর মানবিক কার্যসমূহ কিংবা রাজনৈতিক, গোষ্ঠীগত, উপজাতিগত বা ধর্মীয় কারণে শাস্তি প্রদান যেখানে অপরাধ সংঘটন হইয়াছে তাহা সে স্থানের প্রচলিত আইনবিরুদ্ধ হোক কিংবা না হোক।"

"যুদ্ধাপরাধ যথা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যুদ্ধের আইন কিংবা প্রথা ভঙ্গ করিয়া-যাহার অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু সীমিত অর্থে নহে- বেসামরিক জনসমষ্টির বিরুদ্ধে নরহত্যা, নির্যাতন, জবরদস্তি-শ্রমে স্থানান্তরিত কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যসাধন করা যুদ্ধবন্দিদেরকে কিংবা সাগরে অবস্থানরত ব্যক্তিদেরকে হত্যা কিংবা নির্যাতন করা, সরকারি কিংবা বেসরকারি সম্পত্তি লুটতরাজ করা, সামরিক নিরস্ত্রয়ণে নির্বিচার নগরগুলি, শহরগুলি কিংবা গ্রামগুলি ধ্বংস করা কিংবা বিধ্বস্ত করা।"

বিএনপি 'ট্রাইব্যুনাল', 'যুদ্ধাপরাধ' ও 'সংবিধান' নিয়ে প্রশ্ন তুলে এখন বলছে, এগুলো যথাযথ নয় এবং 'মানবতাবিরোধী অপরাধে' বিচার করার অর্থ হচ্ছে প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসা এবং রাজনৈতিক উইচ হান্টিং।

এসব অভিযোগের কোনোটাই সত্য নয়। এ ট্রাইব্যুনাল ও বিচার করা অধিকার সংবিধান প্রদত্ত। এবং আইনটি হয়েছে ১৯৭৩ সালে তখন বিএনপি হয়নি

এবং ধর্মব্যবসায়ীদের দল হিসেবে জামায়াত ছিল নিষিদ্ধ। 'যুদ্ধাপরাধ' ও মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহ প্রায় একই ধাঁচের। আসলে বিএনপি যেটা ভাবছে তা হলো, এই ধারায় জোট ফেঁসে যেতে পারে। বর্তমান নেতৃত্বের ভয় এটি। বিএনপির অনেক নীতিনির্ধারককে বলতে শুনেছি, আইনমন্ত্রী, এ্যাটর্নি জেনারেল আমেরিকা থেকে ফেরার পর সরকার সুর পাল্টে ফেলছে। অর্থাৎ আমেরিকার পরামর্শে তারা এসব করছে। লক্ষণীয় ঐ দু'জনের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও গিয়েছিলেন এবং মূল উদ্দেশ্য ছিল, অনুমান করছি, বেগম জিয়ার দু'পুত্র যে টাকা পাচার করেছেন তার প্রমাণ সংগ্রহ করা। নয়ত, তাদের সঙ্গে গভর্নরের যাওয়ার কথা নয়। বিএনপি এ বিষয়টিকেই ধামাচাপা দিতে যাচ্ছে এসব মন্তব্য করে। বিএনপির বর্তমান কর্তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বেগম জিয়া ও তার দুই পুত্রকে সব রকমের সুরক্ষা দেয়া। এতে দল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাদের কিছু আসে-যায় না। আরও উল্লেখ্য, আইনমন্ত্রীকে আমি টেলিভিশনে বলতে শুনেছি, ১৯৭১ সালে কৃত অপরাধের বিচার হবে। সে সময় তো বিএনপি ছিল না। সুতরাং তাদের সমস্যা কী? একমাত্র সমস্যা তাদের দলের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ১৯৭১ সালে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কয়েকজনকে রক্ষা করার জন্য বিএনপি এখন যুদ্ধাপরাধ বিচারের সমালোচনা করছে। অর্থাৎ, যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষায় এগিয়ে আসছে। দেখা যাচ্ছে, বিএনপির ক্ষেত্রে দলের চেয়ে ব্যক্তি বড়।

অথচ, আপনারা কি বিশ্বাস করবেন যে, মাত্র এক দশক আগে বিএনপি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুধু নয়, জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছিল। আমরা পুরনো কথা ভুলে যাই দেখে বর্তমানে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয়।

এর প্রমাণস্বরূপ আমি কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি- আমি নিশ্চিত এগুলো পড়লে আপনারা যারপরনাই বিস্মিত হবেন। এগুলো মনগড়া নয়। ১৯৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে মুলতবি প্রস্তাব আলোচনাকালে এসব মন্তব্য করা হয়েছিল্

আওয়ামী লীগের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সংসদে মুলতবি প্রস্তাব তোলেন- "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর নিশুতি রাতে জামায়াত শিবিরের নারকীয় তাণ্ডবে নিহত জোবায়েদ চৌধুরী রীমু [বিএনপি নেত্রীর পুত্র] হত্যাকাণ্ড এবং শতাধিক আহত ছাত্রদের আর্তনাদ বিষয়ক আলোচনা এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের স্বার্থে অবিলম্বে সংসদ মুলতবি করা হোক।" সংসদ মুলতবি করা হয়। এরপর ৩২ জন সংসদ সদস্য এ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করেন। এর মধ্যে ১৭ জন বিএনপির। ১০ জন আওয়ামী লীগের। বাকির আনি-দুয়ানি দলের। এবার বিএনপির কয়েকজন সংসদ সদস্যের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি-

১. "আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা।....রাজাকার জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় আমার ৬২ বছরের পিতাকে বেত্রাঘাত করেছিল... আজকেও সেই রাজাকাররা, সেই আলবদররা এখনও বাংলাদেশে বেঁচে আছে, তাদের সন্তানরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমার সন্তানদেরকে গলা কাটে আর রগ কাটে। ...তাই আজ এই রাজাকার আলবদর আর জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর ও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।" আবদুল আলী মৃধা [নরসিংদী-৫]

২. "দেশের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা, সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করছে যে, জনগণের মানুষ উপলব্ধি করছে যে, জনগণের বিরুদ্ধে যারা রাজনীতি করে, যারা হানাদার বাহিনীর সাথী হয়ে এদেশের মা-বোনদেরকে নির্যাতন করেছে, তাদেরকে আইনগতভাবে রেহাই দেয়া সত্যিকারভাবে আজকে জাতির জন্য একটি কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই আমি আশা করব অতীতের ভুলকে শুধরিয়ে আজকে যারা ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করতে চায়, আজকে যারা এই দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়েছে, এ জামায়াত শিবিরের রাজনীতিকে চিরতরে নিষিদ্ধ করার জন্য আমি আপনাদের কাছে দাবি জানাব।' মেজর (অব) হাফিজউদ্দিন আহমেদ, বীরবিক্রম (ভোলা-৩)

৩. "...আজকে আমরা সারা বাংলাদেশে দেখছি এ জামায়াত শিবির জঘন্য ভাষায় ইসলামকে অপব্যাখ্যা করে এদেশেল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্তির মাঝে ফেলে দিয়ে যে সন্ত্রাসের রাজনীতি, মিথ্যার বেসাতির রাজনীতি তারা সারা বাংলাদেশে কায়েম করেছে, আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে, গত নির্বাচনের সময় তাঁরা মেয়েলোকদেরকে ভোট দিলে বউ তালাক হয়ে যাবে এ ফতোয়া দিয়ে বেড়িয়েছে, যে মেয়েলোকের পিছনে রাজনীতি করলে এ দেশের প্রতিটি মানুষ নরকে চলে যাবে, দোজখে চলে যাবে। এমনিভাবে তারা ইসলামকে অপব্যাখ্যা করে। ইসলামের অসত্য ব্যাখ্যা করে তারা এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষদের বিপথগামী করে ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করছে।

ওদের রাজণীতি যদি দমন না করা যায় তা'হলে আগামী দিনে এই গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের, রাজনীতি এদেশে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।" মশিউর রহমান (ঝিনাইদহ-২)

৪. "গোলাম আযমের বংশধররা এ দেশে কী করতে পারে আমরা অনেকেই ভুলে গিয়েছিলাম, এই কিছুদিন আগেও যখন বলেছিলাম এই গোলাম আযমকে বাংলাদেশে রাখলে বাংলাদেশের পরিণতি খারাপ হবে, আজকে সেটা প্রমাণিত হতে যাচ্ছে...আজকে তাই এই হাউস থেকে এই দিক থেকে, ঐ দিক থেকে প্রস্তাব এসেছে, জামায়াত শিবিরকে নিষিদ্ধ করতে হবে। এরপরেও কি মাননীয় স্পীকার,

আমরা এই সংসদে জামায়াত শিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার প্রস্তাব নিতে পারব না?" শাজাহান সিরাজ (টাঙ্গাইল-৪)

৫. "এদের অস্ত্রের উৎস কোথায় এসব জাতির সামনে আসা দরকার, না হলে দেশ গৃহযুদ্ধের দিকে যাবে এবং ভবিষ্যতে এই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব তাদের দ্বারা বিপন্ন হতে পারে।"

[বিস্তারিত তথ্য এ এস এম সামশুল আরেফিন সম্পাদিত 'জামায়াতে ইসলাম নিষিদ্ধ হোক']

একই কাণ্ড ঘটিয়েছে জামায়াত কিছুদিন আগে। এখন তারা এ বিষয়ে শুধু নিশ্চুপ নয়, নিজামী, মুজাহিদের মতো যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাবার জন্য মাঠে নেমেছে।

এক দশক আগে যারা জামায়াতকে নিষিদ্ধ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, একদশক পর তারা তাঁদের সঙ্গে সরকার গড়লেন। তা'হলে এসব রাজনীতিবিদদের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। বিএনপি যা বলেছিল তাই যদি করত এবং এখনও তা মনে করত তা হলে বলা যেত রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের কমিটমেন্ট আছে। এখন দেখা যাচ্ছে তা নেই। একদশক আগে তারা যা বলেছিল আজ তাদের স্থান এর বিপরীত। অর্থাৎ এরা নিজেদের সুবিধার জন্য যা খুশি বলতে পারে, করতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে। যেমন বলেছিলেন বেগম জিয়া যে, শান্তিচুক্তির পর ফেনী পর্যন্ত ভারতে অন্তর্গত হয়ে যাবে বা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মসজিদে উলুধ্বনি হবে। একজন মহিলা কীভাবে সত্য নয় এমন কথা বলেন?

একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। বিএনপির বর্তমান চরিত্র স্পষ্ট হয়ে গেছে। এরা জামায়াতের একটি ফ্রন্ট। শুধু তাই নয়, এটি চরম সুবিধাবাদী একটি দল যাদের কাছে আদর্শ, কমিটমেন্ট থেকে ব্যক্তি বড়। সুতরাং দেশে যদি যুদ্ধাপরাধের বিচার বন্ধের জন্য তারা অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে তা হলে অপরাধীদের প্রশ্রয় দেয়ার জন্য তাদেরও প্রতিরোধ করতে হবে। আফসোস এ কারণে যে, যারা আওয়ামী লীগের বিরোধিতার জন্য বিএনপিতে যোগ দিয়েছিল আজ বিএনপির নেতারা তাদের কাঁধে যুদ্ধাপরাধের দায় চাপিয়ে দিচ্ছে। তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নষ্ট করছে। বিএনপি যুদ্ধাপরাধের দায় নেবে কিনা এটি চিরচেনা মওদুদ আহমদ, সাকাচৌর হাতে ছেড়ে না দিয়ে তৃণমূলের যুবকদের ঠিক করা উচিত তাদের ভবিষ্যত কী হবে?

১৬ এপ্রিল, ২০১০

গোলাম আযম তার কাজ করেছে, সরকার কি তার কাজ করছে?

এই সংবাদটি *দৈনিক জনকণ্ঠে* ছাড়া কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। খবরটির শিরোনাম 'হঠাৎ আসরে গোলাম আযম' [৭.৪.১০]। খবরের সারমর্ম এই যে গত সপ্তাহে শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অনুমিতরা গোপনে একটি বৈঠক করে গোলাম আযমকে নিয়ে। যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতে ইসলামীর ২৪ জন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন, বিএনপির মওদুদ আহমেদ। অবশ্য, তাঁকে বৈঠকে না ডাকলেও চলত। সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেই হতো। বিএনপি জামায়াতের নির্দেশ অমান্য করবে না, করার সাহস বা সাধ্য কোনোটিই নেই। পরে, একটি প্রতিনিধি দল বেগম জিয়ার সঙ্গেও সাক্ষাত করে। মওদুধ আহমেদের উপস্থিতি ও তারপর বেগম জিয়াকে বৈঠকের ফলাফল জানানো দু'টি দিক তুলে ধরে।

মওদুদ কোথাও থাকা মানে বিপর্যয় ঘটে যাওয়া বা ঘটানো। মূর্তিমান 'ইভিলে'র প্রতীক এই ব্যারিস্টার। অন্যদিকে, এটিও প্রমাণিত হলো, জামায়াতের মতো বিএনপিও ১৯৭১ সালের অপরাধসমূহের বিচারের বিরোধী। অর্থাৎ তাদের অবস্থান সাধারণ মানুষের বিপক্ষে, পাকিস্তান-মনাদের পক্ষে। বিএনপিও রাজাকারদের দোসরদের দল হয়ে গেল! শুনেছি বাচ্চা জামায়াতীরা এখন জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধীদের দল বলা পছন্দ করছে না। তেমনি বাচ্চা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরাও রাজাকার দোসর দল হিসেবে নিজেদের পছন্দ করছে না। কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।

গোলাম আযমদের বৈঠকের মূল এজেন্ডা ছিল যুদ্ধাপরাধের বিচার ঠেকানো। চারটি কৌশলের বিষয়ে তারা একমত হয়েছে।

১. কূটনৈতিক তৎপতার মাধ্যমে বিচার ঠেকানো।

২. 'সরকারের বিভিন্ন দুর্বল দিকগুলি চিহ্নিত করা এবং সে অনুযায়ী সরকারকে ঘায়েল করা। এক্ষেত্রে রাজধানীতে পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসকে প্রাধান্য দেয়া।'

৩. আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে আইনবিদ যোগাড় করে প্যানেল গঠন করা।

৪. এর কোনটিতে কাজ "না হলে সারাদেশে ধ্বংসাত্বক কর্মকাণ্ড চালিয়ে

সরকারকে এবং পুরো দেশকে একটি অরাজক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়ে বিদেশী শক্তিকে বাংলাদেশে আসার সুযোগ করে দেয়ার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।" গোলাম আযমরা যা করছে তা খুবই স্বাভাবিক। গত তিন দশকে এই প্রথম একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে তারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। তারা কখনই ভাবেনি ১৯৭১ সালের অপরাধের জন্য তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। এখন দেখা যাচ্ছে, বিচারের সম্মুখীন হয়ত হতে হবে। তাই 'হয়ত' যত সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে ততই জামায়াতের নেতারা শঙ্কিত হয়ে উঠছে। আমি এখানে 'অস্তিত্বের সঙ্কট' শব্দ দুটি ব্যবহার করিনি। যুদ্ধাপরাধের বিচার হলে জামায়াতের প্রথম সারির সব নেতাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। যুদ্ধাপরাধী ও খুনীদের দল হিসেবে এটি পরিচিত হয়ে উঠবে। এবং চিরতরে তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে। দল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। কিন্তু, নতুন জামায়াতীরা থাকবে, দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে না সত্যি কিন্তু বর্তমান রাজনীতিতে তাদের দরকষাকষির যে সুযোগ তারা এত দিন পেয়ে আসছিল তা থাকবে না। সুতরাং এই বিপর্যয় এড়াবার জন্য তারা যা যা দরকার তা করবে।

জামায়াতের ফ্রন্ট হিসেবে বিএনপিও নাজুক অবস্থায় পড়বে। বেগম জিয়া যতই আন্দোলনের হুমকি দেন না কেন বিচার শুরু হলে, যুদ্ধাপরাধীদের দায় বিএনপিকেও সামলাতে হবে কারণ বিএনপির বর্তমান নেতৃত্ব এই দায় নিজের কাঁধে নিয়েছে। বিভিন্ন কারণে যারা আওয়ামী লীগ বিরোধী এবং বিএনপির সমর্থক তারা এই দায় নিতে নারাজ। সুতরাং সরকারবিরোধী আন্দোলন ঠিক এই মুহূর্তে কতটা জোরদার হবে তাতে সন্দেহ আছে। জামায়াত-বিএনপি তাদের কৌশল নির্ধারণ করেছে, এখন তারা তা কার্যকর করবে। কিন্তু, এর বিপরীতে সরকারের অবস্থান কি? বল এখন সরকারের কোর্টে। আমরা অনেকে ভেবেছিলাম যুদ্ধাপরাধের বিচারের কথা বললেও সরকার তাতে অগ্রসর হবে না। কিন্তু, সরকার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেছে, এটি একটি সাহসী পদক্ষেপ এবং সে কারণে অবশ্যই সরকার অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু, তারপরও প্রশ্ন আছে এবং এ প্রশ্নগুলো বিভিন্নভাবে মিডিয়ায় এসেছে। এর মূল কথা হলো সরকার কতটা প্রস্তুত?

প্রথম কথা হলো, ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নে জামায়াতীরা আদালতে যেতে পারে। সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলবে। সেগুলো কুযুক্তি কী সুযুক্তি তার মধ্যে যাব না। কিন্তু, সাংবিধানিক প্রশ্নে কোনো ফাঁকফোকর আছে কি-না তা কি সরকার ভালভাবে খতিয়ে দেখেছে?

দ্বিতীয়, অনেকের মনে হচ্ছে, এ বিচার সুচারুভাবে সম্পন্ন ও জামায়াত-বিএনপি কৌশল অকার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো নিয়ে সমন্বিত

কোনো কার্যক্রম নেয়া হয়নি। কারণ, সমন্বয়হীনতা স্পষ্ট হচ্ছে এবং এই সমন্বয়হীনতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। তদন্ত কমিটিও প্রসিকিউশন নিয়ে নানা খবর বেরুচ্ছে। অনেকের ধারণা, সরকারের অনেকের ধারণা, মানবতাবিরোধী অপরাধ বোধহয় এক ধরনের ফৌজদারি মামলা। সরকার কি সম্পূর্ণভাবে এই ধারণা থেকে মুক্ত?

তৃতীয়, এই বিচার নস্যাতের জন্য জামায়াত বিএনপি ব্যাপক প্রচার করছে। বিচারের পক্ষে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করছি। কিন্তু দল ও সরকার হিসেবে বিচারের পক্ষে সরকারের যে প্রবলভাবে নামা উচিত ছিল তা কিন্তু পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কেন এই আড়ষ্টতা এর উত্তর কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না।

জামায়াত-বিএনপির কর্মকৌশল আলোচনা করা যাক। কূটনৈতিক তৎপরতা জামায়াতীরা যে দীর্ঘদিন ধরে চালাচ্ছে এটা নতুন কোনো কথা নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাংগঠনিকভাবে সে তৎপরতা চালাচ্ছে বলে আমাদের জানা নেই। অন্তত দু'একটি দেশে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনো সদুত্তর পাইনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতা বিবৃতিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে মন্তব্য করেছেন কিন্তু সেটিই কি যথেষ্ট? জামায়াত-বিএনপি সৌদি আরব এবং পাকিস্তানকে দিয়ে চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু দু'টি দেশই স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছে এটি বাংলাদেশের ব্যাপার। এ দিকটায় মার খেয়েই জামায়াত খানিকটা বিচলিত। যুদ্ধ শুরু হলে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন, ব্যক্তি, রাষ্ট্র নানা বিষয়ে জানতে চাইবে। আমরা নিশ্চিত সরকার সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রস্তুত নয়।

সরকারের সব দিক সবল নয়-এটি সরকার না বুঝলেও আমরা বুঝি। আমলাতন্ত্র যে কাজ করছে না বা কাজ করানো যাচ্ছে না এটি মন্ত্রীরা না বুঝলেও আমরা বুঝি। গতানুগতিক একটি সরকার হয়েছে। মন্ত্রীরা এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নয় বা এমন দক্ষ নয় যেম সরকারের নীতি তারা কার্যকর করতে চাইলেই পারবেন। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সমস্যায় সরকার বিপর্যস্ত- এটি আমরা জানি। কিন্তু সমন্বিতভাবে সরকারের প্রতিটি মন্ত্রী, দলের নেতারা কি তুলে ধরেছেন যে, পানির জন্য ২০০১-৮= সাত বছরে শোধনাগার হয়নি, বিদ্যুতের খাম্বা ছাড়া কিছুই লাগানো হয়নি এবং গ্যাস নেই, তারপরও এই নেই গ্যাসটুকু নিজামী খালেদা টাটাকে দিয়ে দিতে চেয়েছিল ভারতীয় পুঁজিপতিদের কাছে নতজানু হয়ে। না, প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কেউ সোচ্চার নন। গত আমলেও একই ব্যাপার ঘটেছে, অতি কেন্দ্রিকরণ ও ভয় থেকেই বোধহয় সবাই চুপ থাকেন। প্রধানমন্ত্রী যদি এখন বলেন, যে এসব বিষয় যত সোচ্চারভাবে তুলে ধরবে, মন্ত্রিত্বের দিকে সে তত এগুবে এবং যে যত কম বলবে সে মন্ত্রিত্ব হারাবে, তা হলে হয়ত তা কোরামিনের

কাজ করবে। তবে, নিজামী-খালেদা কিছু করেনি এটি জনমনের ক্ষোভ নিরসনে যথেষ্ট নয় নিজামী-খালেদা অকর্মণ্য, লোভী দেখেই তা শেখ হাসিনাকে ভোট দেয়া হয়েছে। সরকার এই সঙ্কট নিরসনে কী করছে তাও তুলে ধরতে হবে।

জামায়াত-বিএনপি আইনী লড়াইয়ের কথা ভাবছে। তারা হাজার হাজার আইনবিদ নিয়োগ করবে বলে জানিয়েছে। সেটি বাগাড়ম্বর। বাংলাদেশে জামায়াত করে এমন আইনজীবী হাজারও নেই। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক, ইবনে সিনা ও মধ্যপ্রাচ্যের টাকায় অনেক আইনজীবী হয়ত আসবে। আমাদের সরকার সে ক্ষেত্রে কী করছে? এক্ষেত্রে চিত্রটি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। কাগজে যা দেখেছি ও যা শুনেছি তাতে অনুমান করছি, আইন প্রতিমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুরনো রাজনৈতিক সহকর্মী হিসেবে একদিকে, আইনমন্ত্রী আরেকদিকে। প্রথমোক্তদের ধারণা, এ বিচার ফৌজদারি বিচারতুল্য সুতরাং নিম্ন আদালতের উকিলরাই যথেষ্ট। দ্বিতীয় পক্ষের ধারণা, এটি বিশেষ বিচার, বিশেষ আইনজীবী দরকার কিন্তু তার জন্য আনুষঙ্গিক কী কী উপাদান সে সব বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা আছে কী না সন্দেহ। প্রথমদিকে, আদালতের জায়গা নির্বাচন থেকেই তা স্পষ্ট। অবকাঠামোগত সুবিধা ও প্রসিকিউটর, তদন্ত সংস্থা পায়নি। যারা দীর্ঘদিন এই আন্দোলন করেছেন তাদের নিয়ে বসে কী ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায়। তা নিয়েও সমন্বিত আলোচনা হয়নি। কেন যেন মনে হয় আমরা যতটা স্বতঃস্ফূত সরকার এতটাই গা-ছাড়া।

জামায়াত-বিএনপির শেষ কৌশল ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কাজ করা। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। বলার আছে এটুকু যে, এ দু'টি দল সবসময় ধ্বংসাত্মক কাজেই পারদর্শী, অভ্যস্ত। দেশ থেকে তাদের কাছে দল বড়, দল থেকে ব্যক্তি বড়, এদের ব্যারিস্টার, নেতা, জাঁদরেল নেতারা যেভাবে তারেক বন্দনা করেন তাতে লজ্জা হয়। তাদের অনেকের থেকে তো বটেই তাদের সন্তানদের থেকেও হয়ত তারেক শিক্ষিত নয়, কোনো গুণের কথাও শোনা যায়নি, অর্থ যোগাড় করা ছাড়া তাও তার মা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বলে। সরকার জানিয়েছে, তারা নিরাপত্তা জোরদার করছে। কিন্তু ১৬ কোটির দেশে সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করতে পারলেই নিরাপত্তা আসবে। অন্যথায় নয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় এই প্রথম একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। দক্ষিণ এশিয়ার জঙ্গিবাদ নির্মূল, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রভাবহীন করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন গড়ে তোলা, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো দৃঢ়করণ ও অসাম্প্রদয়িক রাজনীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের অস্তিত্ব রক্ষা-সবকিছু এই বিচারের ওপর নির্ভর করছে। নিছক ওয়াদা পূরণ ও জনচাপে কাজ করা এবং বিশ্বাস করে একবারের জন্য বিষয়টি

মীমাসা করা-এ দু'টির মধ্যে তফাৎ আছে। সরকার বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা সত্ত্বেও প্রথম ধারণাটাই জনমনে এখনও রয়ে যাচ্ছে। এ বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি আমাদের অনেক দিনের, এ ক্ষেত্রে আমরা সরকারের কর্মকান্ডে দ্বিতীয় বিষয়টি যেন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। ব্যর্থ হলে সরকার পতন অবশ্যম্ভাবী শুধু নয়, বিরাটসংখ্যক মানুষকে দেশত্যাগ করতে হবে এবং আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুকে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে বলে প্রায়ই দাবি করে তা চিরতরের জন্য বিলুপ্ত হবে।

এখন প্রায় প্রতিদিন খবরে জামায়াতকে পাওয়া যায়। তত্ত্বাবধায়ক সামরিক সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন আঁতশ কাচ দিয়েও খবরের কাগজে জামায়াতের কোনো সংবাদ খুঁজে পাওয়া যেত না। শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের এক বছর পর্যন্ত জামায়াত নিশ্চুপ ছিল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে যখন মানুষ কমবেশি সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দও বলছিলেন, বিচার সরকার করবেই, তখনও জামায়াত তেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। গত ৩৫ বছর তো এমন দাবি অনেকেই করেছেন। কী আসে যায় তাতে? শশীকলার ন্যায় জামায়াত বেড়ে উঠেছে। যে মুহূর্তে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলো এবং ধরে নেয়া হচ্ছে যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হবে তখনি জামায়াত নেতৃবৃন্দ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন। কারণ, তদন্ত শুরু হলে এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেলে এক নিমিষে জামায়াতের প্রথম কুড়িজন নেতা বিচারের সম্মুখীন হবেন বলে ধরে নেয়া যায়। তাদের চার দশকের স্বার্থচক্র বিনষ্ট হবে। দল হিসেবে জামায়াত পরিচিত হবে যুদ্ধাপরাধিদের দল হিসেবে। এই ছাপ পড়ে গেলে তা ওঠানো মুশকিল। ফলে, এখন প্রতিদিন জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় নেতারা সভা করার চেষ্টা করছেন, বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছেন।

১৯৭১ সালের দৈনিক সংগ্রামের প্রতিদিনের পাতায় যুদ্ধাপরাধীদের কীর্তিকলাপের যেমন প্রমাণ পাওয়া যাবে, ঠিক তেমনি এখন দৈনিক সংগ্রামের প্রতিদিনের পাতায় নেতৃবৃন্দ কী ভাবছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। পাকিস্তান আমলে আইএসআইয়ের টাকায় প্রতিষ্ঠিত *দৈনিক সংগ্রাম* হয়ত হকারের কাছে বা খবর কাগজের স্ট্যান্ডে যে পাওয়া যাবে না। তবে সংগ্রাম যাদের কাছে পাঠারো হয় (দু'একটি স্টান্ডে যে পাওয়া যাবে না তা নয়) তাদের কাছ থেকে পত্রিকা নিয়ে চোখ বুলোতে পারেন। দৈনিক সংগ্রাম পড়লে বোঝা যায় জামায়াতের নেতৃবৃন্দ দু'ধরনের কৌশল নিয়েছেন। এক. আক্রমণ অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অবৈধ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক। দুই. আত্মরক্ষামূলক অর্থাৎ ১৯৭১ সালে জামায়াত নেতৃবৃন্দ কিছুই করেননি, তারা সব ফুলের মতো পবিত্র।

কয়েকটি উদাহরণ দিই, ১৭ এপ্রিলের পত্রিকার শিরোনাম- 'আন্তর্জাতিক

ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট সংবিধান পরিপন্থী।' এই শিরোনামটিই সংবিধান পরিপন্থী। কারণ, সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাবলেই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। জামায়াতের পৃষ্ঠপোষক জেনারেল জিয়াউর রহমান সংবিধানের আগে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে হবে, তদন্ত হবে, তদন্তে প্রমাণ পেলে, ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হবে, বিচারের সম্মুখীন হওয়ার পর তাকে আত্মরক্ষার বা আইনজীবী দেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। সওয়াল জওয়াবের পর, অপরাধ প্রমাণিত হলে এবং বিচারক যদি মনে করেন অপরাধ হয়েছে তখন শাস্তি দিতে পারবেন।

যুদ্ধাপরাধীদের যারা সমর্থন করে তারাও যুদ্ধাপরাধী

অনেক কিছু বন্দুকের জোরে পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু সংবিধানে যে এই বিচারের বিষয়টি ছিল সেটি বাতিল করতে ভুলে গেছেন। বিএনপি প্রায় দু'দশক ছিল ক্ষমতায়। কিন্তু, তারা এটি পরিবর্তন করেনি। এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে জামায়াতকে। নিজামী-মুজাহিদ এর জন্য বেগম জিয়া ও মওদুদকে দায়ী করতে পারেন শেখ হাসিনাকে নয়। শিরোনামের নিচে ২০ পয়েন্টে ১০টি পর্যবেক্ষণ ছাপা হয়েছে যাতে তা পাঠকের অবশ্যই চোখে পড়ে। সেগুলো হলো-

১. হাত-পা বেঁধে গরু জবাই করার মতো কাউকে কাউকে ফাঁসিয়ে দেয়ার আয়োজন করছে

২. যেনতেনভাবে টার্গেটকৃত ব্যক্তিকে ফাঁসানো যেন উদ্দেশ্য

৩. আন্তর্জাতিক আইনের সাথে পার্থক্য 'কোথায় লিভারপুল আর কোথায় ফকিরের পুলের মতো

৪. মন্ত্রীদের কথায় স্পষ্ট বিচারের রায় ঠিক করে রাখা হয়েছে

৫. এমন বিচার করবেন না যাতে পরবর্তীতে আপনাদেরই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়

৬. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বিচার করা হলে জনগণ তা প্রতিহত করবে

৭. আইনের শাসনবিরোধী কিছু করা হলে ২৬ হাজার আইনজীবী তা প্রতিহত করবে।

৮. হাইকোর্টে আপীলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা সর্বোচ্চ আদালত অবমাননার শামিল

৯. দেশে থেকে মুক্তিযুদ্ধ করার আর ওপর থেকে বাইনোকুলার দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ দেখা এক জিনিস নয়

বলাবাহুল্য, এসবই মিথ্যা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্য।

যুদ্ধাপরাধের জন্য ইচ্ছে করলেই কাউকে টার্গেট করা যাবে না তদন্ত করতে হবে, তদন্তে মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রমাণ পেলে তাকে গ্রেফতার করা হবে, বিচারের সেই ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবে, তারপর অপরাধ প্রমাণিত হলে রায় ঘোষণা করা হবে। ধরা যাক, জামায়াতের সদস্য সংখ্যা ১ লাখ। এর মধ্যে হয়ত ১০০০ জনকে (বেশিও হতে পারে) বিচারের সম্মুখীন করা হতে

পারে। অর্থাৎ ১ লাখের এক ভাগ। খুবই সামান্য। এইসব ব্যক্তির জন্য জামায়াতীরা অন্যরা কেন ঝামেলা পোহাবে। জামায়াতীরা কি ১ হাজার জনের স্বার্থ দেখবে না ৯৯ হাজারের স্বার্থ দেখবে? মন্ত্রীরা তো ট্রাইব্যুনালে নেই, তাহলে তাদের কথায় রায় হবে কীভাবে? আর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক হলে তো শেখ হাসিনা প্রথম আমলেই বিচার করতে পারতেন। গত চার দশক ধরে আমরা বিচার চেয়েছি এবং এবার শেখ হাসিনা সেই ম্যান্ডেট পেয়েছেন দেখেই সেই ম্যান্ডেট কার্যকর করতে যাচ্ছেন। সারা বাংলাদেশে ২৬ হাজার আইনজীবী আছেন? জামায়াত সমর্থনকারী ২৬ হাজার আইনজীবী থাকলে তো দেশের সব বার, এমনকি সুপ্রিমকোর্টের বারও তো জামায়াতীদের দখলে থাকত। আর দেশে থেকে মুক্তিযুদ্ধ করা আর ওপর থেকে দেখা এক জিনিস নয়'-এর মানে কী? সেই একই পাতায় দ্বিতীয় শিরোনাম-'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সম্পর্কে দেশী ও আন্তর্জাতিক মতামত মানদণ্ডের অনুপস্থিতিতে প্রশ্নের মুখোমুখি হবে বিচার প্রক্রিয়া।" এটিও বিভ্রান্তিকর। এখন পর্যন্ত কোনো দেশ এর বিরোধিতা করেনি। জামায়াতের ট্রাডিশনাল সাপোর্টার পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং আমেরিকাও বিচারের পক্ষপাতি। আর আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিষয়টা কী? আমাদের সাংবিধানিক আইনে বিচার হবে। তাহলে, কি আমাদের সংবিধান আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নয়? দেশি-বিদেশী আইনজ্ঞরা বলছেন, ৪০ বছরের পুরনো আইন এখনও যুগোপযোগী এবং ইউনিক। বরং, নুওরেমাবর্গ বা টোকিয়ো বিচারে যা দেখা যায়নি। ঢাকা বিচারে বরং তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেটি কী? মানবতাবিরোধীদের যথেষ্ট ছাড় দেয়া হয়েছে।

একই পৃষ্ঠায় তৃতীয় শিরোনাম-" মওলানা নিজামী যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের মানে জামায়াতের কোনো পর্যায়ের নেতৃত্বে সম্পৃক্ততা প্রমাণ করার সাধ্য কারও নেই।" ভালো কথা, যদি সম্পৃক্ততা নেই তাহলে এত ক্রন্দন, এত আর্তনাদ কেন! আদালতে প্রমাণ উপস্থিত করতে পারলেই খালাস। শেখ হাসিনার নামে খালেদা-নিজামী, মইনুদ্দীন-ফকরুদ্দীন তো অনেক মামলা করেছেন। এতে শেখ হাসিনার ক্রন্দন বা আর্তনাদ কেউ শোনেননি। তিনি বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন, তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। একজন নারী যা পারেন, এতজন জামায়াতীর সে সাহস নেই? কীসের নেতা তারা? বোঝা যাচ্ছে খুন-ধর্ষণ করে সন্ত্রাসী হওয়া যায়, নেতা নয়। 'মাওলানা' নিজামী আপনার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নামেও তো ফখরুদ্দীন-মইনুদ্দীন অনেক মামলা করেছেন। তিনি চিৎকার করছেন বটে, কিন্তু ক্রন্দন বা আর্তনাদ তো করেননি। বিচারের সম্মুখীন হচ্ছেন। একই তারিখের পত্রিকায় ভেতরের পাতায় শিরোনাম 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার যুদ্ধাপরাধীর বিচার।' সংগ্রামে এ ছাড়া প্রতিদিন নিজামী,

সাঈদী বা মুজাহিদরা ১৯৭১ সালে যে বাংলাদেশেই ছিলেন, সে বৃত্তান্ত ছাপা হচ্ছে।

যেমন, নির্বাচনের আগে নাকি সাঁথিয়ার সঙ্গে নিজামির যোগাযোগই ছিল না। নিজামী আরও জানাচ্ছেন 'মোসাদ' ও 'র' অঘটন ঘটিয়ে বাংলাদেশকে বিদেশীদের চারণভূমিতে পরিণত করার চক্রান্ত করছে।' *(আমাদের সময়, ২২.৪.১০)*

'মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হচ্ছে জঘন্যতম অপরাধ।'

নিজামীরা এখনও বুঝতে অক্ষম যে ৪০ বছর আগের রাজনীতি এখন অচল। ইহুদীদের সঙ্গে স্বয়ং মহানবী (দ) সহৃদয় আচরণ করেছেন, তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। আমরা তো কোন্ ছার! আর এটা কি আশ্চর্য নয় যে, নিজামী বা খালেদারা যখন ক্ষমতায় থাকেন তখন 'র' সম্পর্কে কোনো কথা ওঠে না; আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেই 'র' প্রসঙ্গ আসে! তা হলে তো ধরে নিতে হবে 'র' নিজামীদের সহযোগী, আওয়ামী লীগের নয়।

নিজামীদের ভাগ্য ভালো যে, শেখ হাসিনা ক্ষমতায়। তাঁর কাছে একবার পৌঁছে কাঁদতে পারলেই হলো। আগে যে সব যুদ্ধাপরাধের বিচার হয়েছে, সেখানে স্টাস্ট অনুমিত, যুদ্ধাপরাধীকে ধরে গারদে পোরা হয়েছে। বিচার করে সোজা শাস্তি। আপীলটাপিল দূর-অস্ত। শেখ হাসিনা সরকার সংশোধনী এনে যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি অনেক দয়া দেখিয়েছেন। আগে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে হবে, তদন্ত হবে, তদন্তে প্রমাণ পেলে, ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হবে, বিচারের সম্মুখীন হওয়ার পর তাকে আত্মরক্ষার বা আইনজীবী দেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। সওয়াল জওয়াবের পর, অপরাধ প্রমাণিত হলে এবং বিচারক যদি মনে করেন অপরাধ হয়েছে তখন শাস্তি দিতে পারবেন। না, এখানেই শেষ নয়, দোষী ব্যক্তি সুপ্রিমকোর্টের আপীল বিভাগে আপীল করতে পারবেন। আমাদের তো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ নেই এবং শেখ হাসিনার মতো দয়ার শরীরও আমাদের নয়।

যুদ্ধাপরাধীদের এ সুযোগ আমরা দিতাম না।

জামায়াত-বিএনপি হুমকি দিচ্ছে, তারাও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করবে, সরকার পরিষ্কার বলছে, ১৯৭১ সালের বিচার করবে। বেগম জিয়া ও নিজামী কি চান, একই সঙ্গে ২০০১-০৬ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হোক? যদি চান বলুন? বিএনপির নেতৃত্বকেও তা হলে কারাগারে থাকতে হবে। ২০১৪ সালে তারা আওয়ামী লীগের অপরাধের বিচার করবেন? বিদেশীরা দূরে থাকুক, দেশীরাই কি তা মানবে?

প্রতিদিনের *দৈনিক সংগ্রাম* এবং নিজামী মুজাহিদদের বক্তব্য এই সত্যই তুলে ধরছে যে এই প্রথম দল হিসেবে জামায়াত ও ব্যক্তি হিসেব এর নেতারা যাদের

সামনে দাঁড়িয়ে তারা বিচলিত, তারা মরিয়া এবং ডু অর ডাইয়ের জন্য তারা প্রস্তুত। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, ১৯৭১ সালে যারা মানুষ হত্যা, লুট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ করল তাদের বিচার করা 'মানবতাবিরোধী'। যদি তাই হয়, আমরা স্বীকার করব আমরা মানবতাবিরোধী। বিএনপির মওদুদরা বলেছেন 'সভ্য দেশে এই আইন হতে পারে না' (ইত্তেফাক ১৭.৪.১০) হত্যা, লুণ্ঠনকারী, ধর্ষণকারী বিচার না হলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে কি সেই দেশকে সভ্য বলা যায়?

যুদ্ধাপরাধীদের যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে। ৩৫ বছর। আর নয়। সারাদেশের মানুষ অধৈর্য হয়ে উঠছে। যতদিন যাবে, তত তারা সংঘবদ্ধ হয়ে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাবে। সুতরাং আমরা চাইব আর দেরি নয়। সরকার সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে সমন্বয় করে একটি মনিটরিং সেল করুন। আমাদের এখন স্লোগান হওয়া উচিত-জামায়াত নেতারা যুদ্ধাপরাধী আর তাদের যারা সমর্থন করে তারাও যুদ্ধাপরাধী। জঙ্গীদের যে আশ্রয় দেয় তার যদি বিচার হয়, তাহলে যুদ্ধাপরাধীকে যে সমর্থন করবে বা প্রশ্রয় দেবে তার বিচার হবে না কেন?

২৬ এপ্রিল, ২০১০

যুদ্ধাপরাধ বিচার-এটা পুতুল খেলা নয় আগুন নিয়ে খেলা

অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মনে লিখছি যে, যুদ্ধাপরাধী/মানবতাবিরোধী অপরাধ বা একাত্তরের খুনীদের বিচারের বিষয়টি ছেলেখেলায় পরিণত হলো। আরও দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এ ধরনের ছেলেখেলা যারা দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন, যাঁরা গত তিন দশক বিচারের দাবিতে আন্দোলন করেছেন তাঁদের প্রতি এক ধরনের বিদ্রুপ। এটি যদি বিএনপি করত, যদি জাতীয় পার্টি করত, তাহলে মেনে নেয়া যেত। কিন্তু এটি এমন সময় হলো, যা মানা কষ্টকর।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিশাল ম্যান্ডেট আওয়ামী লীগ পেয়েছিল। তাই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আপামর জনসাধারণ আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। এমনকী বিএনপির মধ্য পর্যায়ের অনেকে আড়ালে বলছিলেন, বিচারটা হয়ে যাওয়া দরকার, বেগম জিয়া ও মওদুদ যতই একাত্তরের খুনীদের সহায়তা বা সমর্থন করুক না কেন? অতীতেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে এত বিশাল ম্যান্ডেট আওয়ামী লীগ পায়নি

আওয়ামী লীগকে আমরা অনেকে সমর্থন করি বিভিন্ন কারণে, কিন্তু এ দলটিকে তো পাঁচ দশক ধরে আমরা চিনিও। সে কারণে এত আশার মধ্যেও একটা আশঙ্কা ছিল, বিচারটা খুব সহজে হবে না। হলেও এত গড়িমসি করা হবে যাতে পাঁচটি বছর পেরিয়ে যায়। অনেক হার্ডকোর আওয়ামী ভক্ত এ ধরনের আশঙ্কার কথা শুনে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু বিচার শুরুর শুরুটা দেখুন। প্রথম বছর মন্ত্রীরা শুধু আশ্বাস দিতে লাগলেন। প্রধানমন্ত্রীও দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন। দ্বিতীয় বছর বলা হলো, বিচার শুরু হলো বলে এবং বিচারের স্থান নির্ধারণ করা হলো আব্দুল গণি রোডের অপরিসর একটি ইমারতে। তখনই বোঝা গেল, যাঁরা এ বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা এ বিষয়টি নিয়ে কত কম ভেবেছেন। আমাদের প্রতিবাদে কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে করদাতাদের টাকা খরচ করে ইমারতটি সাজালেন। প্রতিবাদ আরও প্রবল হলে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে জায়গা বদল হলো। কিন্তু ঐ যে আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, সামরিক শাসকরা যেমন প্রতিবাদ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তেমনি আমাদের প্রতিবাদে রুষ্ট কর্তৃপক্ষ পুরনো হাইকোর্টের ছোট একটি পরিসরে বিচারের জায়গা স্থানান্তর করলেন, যেখানে রেকর্ডপত্র রাখার জায়গা,

প্রসিকিউটরদের জায়গা, দর্শনার্থী, মিডিয়ার জায়গা হবে না। যতদিন আপনি মন্ত্রীদের কার্যকলাপ অন্ধভাবে সমর্থন করবেন ততদিন আপনার মতো ভালো আর কেউ নেই। খানিকটা যদি সমালোচনা করেন, তা হলে আর রক্ষা নেই। বলা হবে, আপনার মতো দুর্বৃত্ত আর নেই। শুধু তাই নয়, আমাদের মধ্যে জামায়াতী ঝোঁক আছে। আরও বলা হয়, বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে তো তাদের সমর্থক লেখকরা একটি কথাও লেখেন না। এসব নিরেট মস্তিষ্কঅলাদের বোঝানো অসম্ভব যে, সমাজে ঐসব লেখকের কোনো অবস্থান নেই, আছে দু'একটি বিশেষ পত্রিকায়; যারা সাম্প্রদায়িকতা থেকে শুরু করে স্বৈরশাসন-ক্ষমতার সমর্থক ও পূজারী। এদের সাধারণ মানুষ দুর্বৃত্ত মনে করে। আওয়ামী লীগের সন্তানরা কি চাইবেন দুর্বৃত্তরা তাদের সমর্থক হোক?

দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থা, প্রসিকিউটরদের নিয়োগ দেয়া হলো। তখনই বোঝা গেল, আমরা যা চাই মন্ত্রীরা তা চান না বা বোঝেনও না। ট্রাইব্যুনালের কম্পোজিশন, প্রধান প্রসিউকিটর ও দু'একজন প্রসিকিউটর ছাড়া দেখা গেল কারও প্রতি মানুষের আস্থা নেই। বিচারের প্রধান উপাদান তদন্ত সংস্থার প্রতি দেখা গেল কারও কোনো আস্থা নেই। যাঁদের নাম পত্রিকায় এসেছে প্রসিকিউটর ও তদন্ত সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বলে তাঁদের অনেকে যোগও দেননি। এতদিন হলো, কেন কেউ যোগ দিচ্ছেন না বা যাঁরা দিচ্ছেন না তাঁদের জায়গায় অন্য নিয়োগ হবে কিনা এ বিষয়টি নিয়েও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদাসীন।

প্রথম থেকেই তদন্ত সংস্থার প্রধানকে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মূল অভিযোগ হলো, তিনি জামায়াতে সমর্থক। এ নিয়ে লেখালেখি শুরু হলো। জানা গেল তদন্ত সংস্থার নিয়োগ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আরও জানা গেল, প্রসিকিউটর নিয়োগ নিয়ে আইন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে আইন মন্ত্রণালয়ের অর্ধেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমর্থক এবং তদন্ত সংস্থার প্রধানকে নিয়ে যখন তর্ক-বিতর্ক চলছে তখন এ বিষয়টিকে মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি কর্তৃপক্ষ। কারণ, তারা বিশ্বাস করে, কর্তা সব সময় সঠিক। কিন্তু আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে কর্তা সব সময় সঠিক- এ আপ্তবাক্য বিশ্বাস করানো কঠিন। পয়সা দিলেও অনেকে বিশ্বাস করবে না- অভিজ্ঞতা তাই বলে। কিন্তু পুরো বিষয়টাকে ঘোলা করে দেখা, জনমতের তোয়াক্কা না করা। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত ও কোটারী স্বার্থ আজ বিষয়টিকে কোথায় নিয়ে এসেছে? এটাও তো এক ধরনের অপরাধ। এখন বিষয়টিকে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, গত এক মাস আমরা যা বলেছি তা সঠিক। গত শুক্রবার এক সেমিনারে তিনি বলেছেন, "প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা ইসলামী ছাত্রসংঘের একটি কলেজ শাখার সভাপতি পদের জন্য মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। তিনি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ তদন্ত কমিটির প্রধান হওয়ায়

বিচারের অবস্থা কী দাঁড়াবে তা নিয়ে আমাদের সিরিয়াসলি ভাবতে হবে।” [*জনকণ্ঠ*, ১.৫.১০]

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা যখন এ কথা বলেন তখন বিষয়টি ভিন্নমাত্রা পায়। তিনি তো আমাদের মতো হরিদাস পাল নন; তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বিতর্কিত বিষয়টি জেনেছেন। কিন্তু মন্ত্রীদের কিছু বলতে পারছেন না; তাই উপদেষ্টাকে দিয়ে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানো হচ্ছে। এটি সত্য হলে, বোঝা যায় কেন প্রশাসন স্থবির। অথবা একজন প্রাক্তন শিক্ষক ও সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা ও জনপ্রতিনিধি হওয়ায় ড. আলাউদ্দিনের কাছে আর এসব নেয়া অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। তিনি হয়ত এখন আর পদে থাকা নিয়েও লালায়িত নন। কারণ এ উক্তি সরাসরি সরকারের বিপরীত অবস্থান। একজন মন্ত্রী সরকারে থেকে প্রকাশ্যে সরকারী নীতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন না, কেবিনেট সভায় আলোচনাকালে পারেন, তবে আশ্বস্ত হয়েছি এ কারণেও যে, মন্ত্রিসভায় এখনও দু'একজন আছেন যাঁরা আমাদের পর্যবেক্ষণ বিবেচনায় নেন। ও তা সঠিক মনে হলে আমাদের পক্ষ নেন।

ড. আলাউদ্দিনের মন্তব্য শুনে মনে হয়েছে, যথেষ্ট প্রমাণ হাতে না নিয়ে তিনি মন্তব্য করেননি। অবশ্য তদন্ত সংস্থার প্রধান জনাব মতিন বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। জনাব মতিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি সত্য না হয় তাহলেও বিষয়টি এত স্পর্শকাতর ও বিব্রতকর যে, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই থাকবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে উনি নিজে থেকে সরে গেলেও ভালো। তা না হলে বিষয়টি কী দাঁড়াচ্ছে? যুদ্ধাপরাধের বিচার আওয়ামী লীগ করাচ্ছে জামায়াতের লোক দিয়ে? এ কারণেই যুদ্ধাপরাধ নিয়ে জামায়াত হইচই করছে বটে, কিন্তু তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না, দিলে এর নেতারা নিয়ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা বলতেন না। জামায়াত যে কত দূরদর্শী এ একটি ঘটনাই তা প্রমাণ করে। আর এ ধরনের কাজ আওয়ামী লীগের পক্ষেই সম্ভব। বিএনপি-জামায়াত কখনই এ কাজ করত না। আমরা আরও জেনেছি, হয়ত তা নিছক গুজব, যে কারণে তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি, আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই বিএনপি বা বিরোধীদের থেকে অর্থ নিয়ে তাঁদের কাজ করে দিচ্ছেন। যে কারণে জলাশয় সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কঠোর অবস্থান সত্ত্বেও তা মানা হচ্ছে না।

উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আরও দুটি মন্তব্য করেছেন, যাতে সরকারের অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, “যুদ্ধাপরাধীরা প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে আছে। তারা প্রতিটি পদে বাধার সৃষ্টি করছে। এমনকি ছোট একটি প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষেত্রেও তারা বাধার সৃষ্টি করছে।' (ঐ)। এখানে যে প্রশ্নটি ওঠে তা হলো, সরকার কি এ ধরনের লোকদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। আরও

আছে, অনেক ক্ষেত্রে চিহ্নিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলে অনুরোধ জানান হয়েছে। কাজ হয়নি। আমাদের জানামতে, জানপ্রাণে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে, ওএসডি করা হয়েছে, গুরুত্বহীন পদে বদলি করা হয়েছে। নীতিনির্ধারকদের অনেকেই বলেছেন, এর পেছনে যে অর্থের ভূমিকা নেই তা কে নিশ্চিত করবে? এই দায় কার?

তার তৃতীয় মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য- " যুদ্ধাপরাধীর বিচারের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিদেশে মিশনগুলোকে ভালভাবে সক্রিয় করা হয়নি। (ঐ) এ বিষয়ও আমরা অনেক বলেছি। যুদ্ধপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে ডা. দীপুমণির অবস্থান পরিষ্কার। তিনি এ ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালনেও আগ্রহী। পররাষ্ট্র সচিব শহীদ পরিবারের ছেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, ড. আলাউদ্দিনের মন্তব্য সত্য। হতে পারে তাঁদের সব সময় বিদেশ থাকতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে মনোযোগ দেয়ার সময় তাঁদের নেই। কিন্তু বিচার শুরু হলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্থা যে আগ্রাসন শুরু করবে তা মোকাবেলা করার মতো অবস্থা কি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আছে? না কি দেশে থেকে বিষয়গুলো নিয়ে ভেবেচিন্তে কাজ করে যেটুকু শক্তি আছে তা সংহত করার জন্য আরও একসেট সচিব ও নীতি নির্ধারক রাখা উচিত!

এক কথায় বলা যায়, পুরো বিষয়টা নিয়ে এক ধরনের ছেলেখেলা চলছে। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, আগুন নিয়ে খেলা করছে। কোথাও কোনো সমন্বয় নেই। আপনি মন্ত্রীদের জিজ্ঞেস করুন, কেউ বলতে পারবে না বিচারের বিষয়টি কোন পর্যায়ে আছে?

এ বিচারের সঙ্গে সরাসরি আইন, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, অর্থ মন্ত্রণালয় জড়িত। এদের নিয়ে কি পুরো বিষয়টি মনিটরিংয়ের জন্য একটি কমিটি করা হয়েছে? না।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীই দৈনিক খবরের কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখেন; যে গুণ তাঁর মন্ত্রীদের মধ্যেও বিরল। আমাদের লেখা পড়ে তিনি সন্তুষ্ট/অসন্তুষ্ট যাই হোন না কেন [যদি পড়েন] এ কথা সত্য যে, তাঁর বিপদে তাঁর দলের অনেকের চেয়ে আমরা তাঁর জন্য সবার আগে দাঁড়িয়েছি, এখন যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তখন তাঁদের অনেকের টিকিটিও দেখা যায় নি বা কাজের অজুহাতে বিদেশ চলে গেছেন। আমরা পুরস্কারের আশায় আপনার পাশে দাঁড়াইনি, পুরস্কৃত হব সে আশাও করি না। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যাঁরা সব সময় সবার পক্ষে থাকে তাঁরাই বেশি পুরস্কৃত হয়। এবারও তাই হয়েছে। আমরা একেবারে জনবিচ্ছিন্ন তাও বলা যাবে না। আওয়ামী লীগ যাতে জেতে সে জন্য আমাদের ভূমিকা একেবারে খাটো করে দেখা বোধহয় অনুচিত। এর অর্থ, আমরা যা বলছি তা বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়

আমরা প্রধানমন্ত্রীর প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল। যাঁর প্রজ্ঞা আছে, তিনি যদি কোথাও ভুল করে থাকেন সেট শুধরে নেন। আমরা আশা করব, প্রধানমন্ত্রী বিচারের পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে যেখানে যেখানে ঘাটতি আছে তা পূরণ করে বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবেন। আমরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিবেদন করছি-খাদ্য, আশ্রয়, পানি, বিদ্যুতের মতো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও অগ্রাধিকার পর্যায়ে পড়ে। যাঁরা এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন তাঁরা ভুল করছেন। যুদ্ধাপরাধের বিচার এখন যে পর্যায়ে এসেছে তা যথাযথভাবে সম্পন্ন না হলে দেশের মানুষ সঙ্কটে ও দেশ অস্তিত্ব সমস্যায় পড়বে। সুতরাং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ বিষয়ে মনোযোগ দেয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা তাই প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাব, তদন্ত সংস্থার প্রধান নিয়োগের দায় কার, তাকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিন। এ ঘটনা সরকারের ভাবমূর্তি অনেকাংশে বিনষ্ট করেছে এবং সরকার যে অদক্ষ তা তুলে ধরেছে। কিন্তু সময় এখনও ফুরোয়নি। নতুন তদন্ত সংস্থা প্রধান শুধু নয়, অন্য পদগুলোও আপনি পূরণ করুন। মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে যে দ্বন্দ্ব, যে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, তাতে ভুলের বোঝা বাড়বে। যে সব মন্ত্রী এসব বিষয়ে এলোমেলো সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন তাদের অপসারণ করুন। মানুষ শুধু এতে খুশি হবে না, সরকারের প্রতি আস্থাও বাড়বে। অনুগ্রহ করে মন্ত্রীদের এ পরামর্শ দিন, তাঁরা টিভি ক্যামেরা দেখলেই যেন ঝাঁপিয়ে না পড়ে বিভিন্ন মন্তব্যে মেতে না ওঠেন। তাঁদের কথা বলার আগ্রহ দেখলে মনে হয়, পরিবার পরিজন থেকে তাঁরা মাইক ভালবাসেন। যুদ্ধাপরাধ নিয়ে তাঁদের বিভিন্ন মন্তব্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে, যার ফলে লাভবান হচ্ছে বিএনপি জামায়াত।

সবশেষে বলব, এ বিচার পুতুল খেলা নয়, আগুন নিয়ে খেলা। এ খেলায় ভুল করলে শুধু আমরা পুড়ে মরব তা নয়, আপনারাও ছাই হয়ে যাবেন।

জনকণ্ঠ ৩ মে, ২০১০

যুদ্ধাপরাধের বিচার হবে তো?

গত দু'মাস দেশের বাইরে ছিলাম। আমেরিকার পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্ত, তারপর দক্ষিণে-কম ঘোরা হয়নি। যে শহরে গেছি সে শহরেই বাঙালি পেয়েছি। খুব পছন্দ না করলেও দু'একটি সভায় যেতে হয়েছে। শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে বসতে হয়েছে, আমার কপালটা বড়। এতবড় দেশ, কিন্তু প্রায় জায়গায় পেয়েছি আত্মীয়স্বজন। ছাত্রছাত্রী, বন্ধুবান্ধব আর শুভানুধ্যায়ী।

প্রথমে লস এ্যাঞ্জেলেসের কথা ধরা যাক। ফোবানের একটি সেশন করার কথা ছিল যুদ্ধাপরাধ নিয়ে। কানাডা থেকে হাসান মাহমুদ, ওয়াশিংটনে ভোয়ার আনিসসহ আরও কয়েকজন এর উদ্যোগে নিয়েছিলেন কিন্তু সভাটি হয়নি। তবে, আমরা অনেককে নিয়ে বসেছি এ বিষয়ে আলোচনার জন্য, নিউইয়র্কে নির্মূল কমিটির আল-আমিনের উদ্যোগে একটি সভা হয়েছিল। আমাদের পুরনো বন্ধু হারুন সভাপতি নির্মূল কমিটির। ঐ সভায় এসেছিলেন আমার শিক্ষক মমতাজউদ্দিন আহমদ, নাট্যশিল্পী জামালউদ্দিন আহমদ ও তাঁর স্ত্রী, বিটিভির বেলাল বেগ, জাতিসংঘে আমাদের রাষ্ট্রদূত ড. মোমেন প্রমুখ। শ্রোতাদের একটি বড় অংশ আমার সমসাময়িক বা বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু তরুণ যে ছিলেন না তা নয়। ওয়াশিংটনে আমাদের সাংবাদিক বন্ধু হারুন চৌধরীও একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছিলেন। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা পেশাজীবী এবং আমার সমসাময়িক। নিউ অর্লিয়েন্সে আমার বন্ধু অধ্যাপক শামসুল হুদা তাঁর কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে বসেছিলেন। এ রকম ছোটবড় বৈঠক অনেক হয়েছে।

তারপর লন্ডন। সেখানে ড. বি. বি. চৌধুরী, সুলতান শরীফ, জিয়াউদ্দিন লালা, প্রশান্ত বড়ুয়ার উদ্যোগেও বেশ ক'টি সভা হয়েছে। সব ক'টি সভায় দর্শক উপস্থিতি ছিল ভাল। এবং অধিকাংশ সভায় অপেক্ষাকৃত কমবয়সী বা তরুণ ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। প্রতিটি সভায় আমাদের শ্রদ্ধেয় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ছিলেন। বর্ষীয়ান সাংবাদিক আবদুল মতিন অসুস্থ শরীরেও একদিন দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ালেন।

এই ফিরিস্তি দেয়ার কারণ আছে। আমেরিকা বা লন্ডন, কোথাও কোনো শ্রোতা আমার কাছে ঢাকার যানজট, বিদ্যুৎ বা গ্যাস সমস্যা, এমনকি বিএনপির প্রতিবন্ধকতার রাজনীতি নিয়ে জানতে চাননি। ছেলেবুড়ো সবাই জানতে

চেয়েছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কী হবে?

আমি পাল্টা জানতে চেয়েছি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হলো কি না হলো তাতে আপনাদের কী আসে যায়? আপনারা তো আর দেশে ফিরছেন না। যুদ্ধাপরাধীদের কার্যকলাপও আপনাদের স্পর্শ করবে না। সুতরাং আপনাদের সমস্যাটা কী?

এ ধরনের উত্তর তাঁদের আহত করেছে। তাঁরা নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন বা লন্ডন থাকেন বটে কিন্তু মানসিকভাবে যুক্ত বাংলাদেশের সঙ্গে। বয়োজ্যেষ্ঠ বা আমার সমসাময়িকরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ লড়েছেন, তরুণদের পরিবারে অনেকে শহীদ হয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধ এখনও তাঁদের মথিত করে। আমি যখন আমেরিকায়, তখন আলবদর নিজামী, মুজাহিদ, কামরুজ্জামান, কাদের মোল্লা আর সাঈদীকে গ্রেফতার করা হয়। কানাডা, লন্ডন ও আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সবাই ফোন করে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। তাঁদের উল্লাস চাপা দিয়ে রাখতে পারছিলেন না। সবাই এক বাক্যে বলেছেন, শেখ হাসিনা না থাকলে এমন অসম্ভব কাজ করা সম্ভব হতো না। এখন তাঁরা জানতে চান, বাকিগুলোর কী হবে? যেন আমি ক্ষমতায় আছি আর কী!

দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁরা অবহিত তা নয় কিন্তু যুদ্ধাপরাধের বিষয়টিকে তারা বড় সমস্যা মনে মনে করেন। তাঁদের এই দৃষ্টিকোণ নিয়ে ভেবেছি এবং মনে হয়েছে এর একটা যৌক্তিক ভিত্তি আছে। বাংলাদেশে যে জনসংখ্যা এবং সম্পদের যে অভাব তার মধ্যে ভারসাম্য আনা কষ্টকর। বিদ্যুৎ গ্যাস বা যানজট কখনও কমবে, কখনও বাড়বে, এর সম্পূর্ণ সমাধান একদশকেও হবে কিনা সন্দেহ। অন্তত রাজনীতিবিদদের আয়েশীভাব দেখলে তা মনে হয় না। কিন্তু, যুদ্ধাপরাধের বিষয়টা এখন এমন এক পর্যায়ে এসেছে যে এর মীমাংসা না হলে চিরতরের জন্য বাংলাদেশ একটি মৌলবাদী ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে যাবে পাকিস্তান, সুদান বা সোমালিয়ার মতো। পাকিস্তানের মতো পরিণতি হোক এ জন্য তো আর বাংলাদেশ হয়নি। এ বিষয়ে সবাই একমত যে আওয়ামী লীগ আর সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো এককাট্টা হলে ১৯৭১-এর বাংলাদেশ থাকবে এবং এগুবে। জামায়াত-বিএনপি ও তার মিত্ররা থাকলে বাংলাদেশ নষ্ট হয়ে যাবে। এরা যৌথভাবে একটি 'ইভিল ফোর্স'। প্রবাসীরা দেশে আসেন, অনেকে একবারের জন্য চলে এসেছেন। চলে আসার পরিকল্পনা করছেন, তাদের আত্মীয়স্বজনরা আছেন। সুতরাং তারা এখন সুস্থ একটি বাংলাদেশ কামনা করছেন। শেখ হাসিনা এই সুযোগটা তৈরি করেছেন। এটি যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায়। উদ্বেগটা সে কারণেই।

দেশে ফিরে দেখি, না, যুদ্ধাপরাধির বিষয়টা এখনও এজেন্ডায় আছে। প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো মন্ত্রী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। সেই আগের মতো,

পরস্পরবিরোধী। কারণ, এ বিষয়ে মন্তব্য করাটা নিরাপদ।

যুদ্ধাপরাধ বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, বিচার হবেই এ কথা বিদেশে জোর দিয়ে বলে এসেছি। কিন্তু এর সবের পর, তাদের মতো আমারও মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে। বিচারটা ঠিকঠাক মতো হবে তো?

ফিরে আসার পর প্রসিকিউশন, তদন্ত দলের এবং ওয়াকেফহাল দু'একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাতে, আমার মনে হয়েছে যুদ্ধাপরাধ বিচার বিষয়টা এখন এতিমের মতো। একজন এতিমের জন্য সবাই হা-হুতাশ করে কিন্তু তাকে সবলভাবে সমাজে দাঁড় করিয়ে দেয়ার জন্য খুব কম লোকই অগ্রসর হয়। এ কথা বললে, নীতিনির্ধারক, মন্ত্রী, ট্রাইব্যুনালের ভিত্তি আছে, তাহলো, 'আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩'টি অধিকাংশই পড়েননি। পড়লে, বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করা যেত না। মন্ত্রীরা যে মন্তব্য করছেন, তাতে মনে হয় এর ভেতরেও বোধহয় রাজনীতি আছে। বিষয়টি কিন্তু ছিল এ রকম-কিছু মানুষ অপরাধ করেছে, তাদের বিচার হবে। সরকার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দিয়েছে। এক হিসেবে সরকারের হিসাব শেষ। ট্রাইব্যুনাল তাদের কাজ করবে।" অর্থাৎ ট্রাইব্যুনাল (তদন্ত ও প্রসিকিউশনসহ) ঠিক করবে কার বিচার হবে, কার হবে না, কতদিন বিচার হবে ইত্যাদি। কিন্তু, নীতি নির্ধারকদের কথা শুনলে মনে হয় তারাও এই বিচারের প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলার অধিকার রাখেন। আসলে রাখেন না। শত অনুরোধ-উপরোধে মন্ত্রীদের নামানো যাচ্ছে না। টেলিভিশনের মাইক দেখলে তারা পাগল হয়ে যান। এর জন্য মনে হয় তারা বৌ-বাচ্চাও ত্যাগ করতে পারেন।

আসলে সরকার যেটা করতে পারেন তা হলো ট্রাইব্যুনালের যাবতীয় কাঠামোগত ব্যবস্থার সুরাহাও যাতে এই প্রক্রিয়া স্থবির না হয়ে যায় সমন্বয়ের অভাবে তা দেখার জন্য এক ধরনের মনিটরিং ব্যবস্থার সৃষ্টি করা। যাদের প্রসিকিউশন ও তদন্ত দলে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যুদ্ধাপরাধী বিচার সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। কিন্তু, আমার মনে হয়েছে, যুদ্ধাপরাধী বিচার সম্পর্কে তাদের ধারণা কম, এটিকে তারা নিম্ন আদালতের ফৌজদারী কোনো মামলার মতো মনে করেন। এই ভাবনা ক্লিতু বিচার কাজে বিরাট ফারাক সৃষ্টি করতে পারে। তারা পদ পেয়ে খুশি, সুযোগ সুবিধা পেলে আরও ভাল, কিন্তু কাজ কতটা এগিয়েছে? এর সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যাবে না। আর সবকিছু করা হচ্ছে যেন ক্যামেরার স্বার্থেই।

একটি উদাহরণ দিই, তদন্ত দল আগেভাগে ঘোষণা করে কোথায় যাচ্ছে এবং কী কী করবে। তারপর তাদের তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করা শুরু করে। তদন্ত দল ফিরে গেলে, সাক্ষীদের হুমকি দেয়া হতে থাকে। এদিকে, উইটনেস প্রটেকশন প্রোগ্রামও নেই। তদন্ত দল সাক্ষীদের চিনিয়ে দিচ্ছে, প্রমাণগুলোর ইঙ্গিত করছে। এতে বিরুদ্ধবাদীদের লাভ হচ্ছে। তারা আরও সতর্ক হয়ে সাক্ষ্য

প্রমাণ নষ্ট করছে। আমি কোথাও শুনিনি এভাবে এ ধরনের বিচারের তদন্ত করা হয়।

প্রসিকিউশনের সম্যক ধারণা নেই তদন্তের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে। সমন্বয়ও নেই। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট দুই মন্ত্রণালয়ের দ্বন্দ্বে (প্রধানমন্ত্রী ছাড়া বোধহয় বিষয়টি সবাই জানেন) পুরো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রসিকিউশন ও তদন্ত দলের সদস্য নির্বাচনের দুই মন্ত্রী ঐকমত্যে পৌছেছেন এমন শোনা যায়নি। তাদের অবকাঠামো সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে না, কেন? এদিকে অর্থমন্ত্রী বলছেন, দশ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? অন্যদিকে বিদেশে দূতাবাসগুলোর কেউ জানেন না যুদ্ধাপরাধ নিয়ে তারা কী বলবেন। তাদের প্রশ্ন করা হচ্ছে। কিন্তু কোনো ব্রিফিং বা কাগজপত্র নেই তাদের কাছে। এসব দেখে দু'টি ধারণা হতে পারে-সরকারের একটি অংশ চায় না বিচারটা সত্যি সত্যি হোক বা একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হয়েছে হয়ত-যে জনমতকে সম্মান করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দেখা যাক কী হয়। আর এসব কারণেই বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলেও সবার প্রশ্ন, বিচার হবে তো? হয়ত মাঠের এই এই সন্দেহের খবর পৌছেছে উচ্চপর্যায়ে। গত সপ্তাহে জনাব মুহিতের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের একট সভা হয়েছে এবং ঘোষণা করা হয়েছে সবকিছু সমন্বয়ের জন্য একটি মনিটরিং সেল করা হবে। খুবই আশার বিষয়। আর প্রধানমন্ত্রী তাঁকেই এ বিষয়ে দায়িত্ব দিয়েছেন (না হলে তিনি সভা করবেন কেন?) দেখেও আমরা আনন্দিত। তিনিই একমাত্র মন্ত্রী যার সঙ্গে চাইলেই দেখা করা যায়, নিজেই টেলিফোন ধরেন এবং আশ্চর্য মোবাইলে মিসকল থাকলে কলব্যাক করেন। এবং কথা শোনেন মনোযোগ দিয়ে। শুধু তাই নয়, সমপর্যায়ের মর্যাদা দিয়ে উত্তর দেন। অন্যদের উত্তর পলিটিক্যাল। তাদের কথাবার্তা/উত্তর শুনে মনে হয়, তাদের ধারণা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি শুধু কম নয়, রাজনীতিও বুঝি না। অবুঝ চাষা আর কি! এখানেও জনাব মুহিত ঘোষণা করেছেন, টাকা বরাদ্দ আছে, সমস্যাটা কী? আমাদের প্রশ্নও সেটি? সমস্যাটা কি রাজনৈতিক নাকি স্রেফ যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে ধারণার অভাব? না কি কর্মে অনীহা? নাকি ক্ষমতার দ্বন্দ্ব?

তদন্ত/প্রসিকিউশনের দুএকজন বলছেন, তাঁদের অবকাঠামোগত অভাব প্রচণ্ড, জায়গার/নিরাপত্তার অভাব। যদি সত্যি হয় তাহলে যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আত্মগত এসব বিষয় তারা বিচার প্রক্রিয়া শ্লথ করণে দায়ী।

জনাব মুহিত যে মনিটরিং সেলের কথা বলছেন তা শুধু মন্ত্রী বা আমলা নিয়ে চিরাচরিত প্রথার ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এখানে সিভিল সমাজের কয়েকজনের অর্ন্তভুক্তি জরুরী। শুধু তাই নয়, মনিটরিং-এর ক্ষমতাও তাদের থাকতে হবে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীর একটি ঘোষণার মর্ম বুঝলাম না।

তিনি বলছেন, সমন্বয়ের জন্য এবং তদন্তের স্বার্থে অতিরিক্ত পুলিশ পরিদর্শকের পদমর্যাদা একজনকে প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। এটি কীভাবে সম্ভব? আইনে তো তা নেই।

১৯৭৩ সালের আইনের প্রসিকিউটর বা অভিযোক্তা সম্পর্কে কী লেখা আছে দেখুন ৭(১) সরকার এক কিংবা একাধিক ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনাল সমীপে অভিযুক্তকে সোর্পদ করিবার জন্য নিয়োগ দিতে পারিবেন সে মত শর্তাবলী ও বাধ্যবাধকতাবলী নির্ধারণে যেমত সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে এবং তেমন প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনে একজন। 'প্রসিকিউটর' হিসাবে গণ্য হইবেন।

(২) সরকার তেমন ব্যক্তিদের একজনকে চীফ প্রসিকিউটর আখ্যা দিতে পারিবেন।" তদন্ত সম্পর্কে আছে-

"৮(১)৩ ধারায় নির্দিষ্ট অপরাধগুলির তদন্তের উদ্দেশ্যসাধনে সরকার একটি এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন ; এবং এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত যে কোনো কর্মকর্তার কর্তৃত্ব থাকিবে বিচারকালে মকদ্দমা চালানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করা।"

শুধু তাই নয়, মামলা রুজু করবেন চীফ অথবা একজন প্রসিকিউটর। এর অর্থ, আইন অনুযায়ী প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা যাবে না। কার্যত চীফ প্রসিকিউটর এই দুইটি অংশেরই প্রধান। তদন্ত কর্মকর্তাগণ তাঁকে সহায়তা করবেন। এবং দুপক্ষের সমন্বয় না থাকলে প্রসিকিউটর মামলা করতে পারবেন না। তারপরও কাজ না এগোনোর কারণ দু'টি হতে পারে চীফ প্রসিকিউটর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না বা তদন্ত দল তাকে গ্রাহ্য করছে না। দুটির কোনটিই সুষ্ঠু বিচারের পক্ষে নয়। শুধু তাই নয়, শুনেছি, প্রসিকিউটর ও তদন্ত দলের অনেকে অফিসের ধার ধারেন না। সরকার এখন প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করতে চাইলে আইন সংশোধন করতে হবে। আইন সংশোধন করে যদি প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় তালে দ্বৈত কর্তৃত্ব হবে। কাজ এগুবে না।

এখানে একক কর্তৃত্বই থাকতে হবে। এবং সেটি হবে চীফ প্রসিকিউটরের, কারণ মামলাটি তাকেই লড়তে হবে। এখন সরকার যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমাদের আশা বিচার হবে। এবং বাদীপক্ষ জিতবে। তারপরও প্রশ্ন, কেন যে মাথায় ঘুরপাক খায় বার বার, বিচার হবে তো?

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০

যুদ্ধাপরাধ॥ জামায়াতী বয়ান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ধর্ম ব্যবসায়ীদের পত্রিকা 'দৈনিক সংগ্রাম' বা 'দৈনিক ইনকিলাব' রাখা হয়। আজকাল পয়সা খরচ করে কেউ 'সংগ্রাম' বা 'ইনকিলাব' রাখে কিনা জানি না, রাখলেও সে সংখ্যা সুচবৎ।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে গেলে মাঝে মাঝে 'সংগ্রাম' উল্টেপাল্টে দেখি। কথিত আছে পাকিস্তান আমলে আইএসআই-এর টাকায় 'সংগ্রাম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেমন এরশাদের উৎসাহে ইনকিলাব। এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশের পেছনে স্টাবলিশমেন্ট ও গোয়েন্দা সংস্থার হিসেব ছাড়া টাকা থাকবেই। যাক বর্তমানে যুদ্ধাপরাধী অপরাধে বিচার হলেও অভিযুক্তদের সবাই যুদ্ধাপরাধীই বলে, বিচার ও পরিচিত যুদ্ধাপরাধের বিচার হিসেবে, যেমন, আলবদর রাজাকার হিসেবে] পত্রিকা '*সংগ্রাম*' পড়লে বোঝা যায় এ দলের বর্তমান অবস্থা কী। একটি বিষয় পরিষ্কার যে, জামায়াত নেতৃত্বের গ্রেফতার এবং দলটি যুদ্ধাপরাধীদের দল হিসেবে পরিচিত হওয়ায় জামায়াত নেতা-কর্মীরা হতাশ। তারা ভাবতে পারেনি শেখ হাসিনার এমন ক্ষমতা বা সাহস হবে তাদের গ্রেফতার করার। তারা ভেবেছিল নিজামী মুজাহিদ গ্রেফতার হলে দেশে তুমুল অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে যাবে। তাদের জন্য দুঃখের এবং আমাদের জন্য হর্ষের যে সেরকম কিছুই হয়নি। দেশে অধিকাংশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। এমনকি বিএনপিও তাদের জন্য রাস্তায় নামেনি। আর তাদের পিয়ারা সৌদি, পাকি, মার্কিনীরাও এদের খরচের খাতায় তুলে রেখেছে। জামায়াতের এত সশস্ত্র ক্যাডার, এত অর্থ তারপরও কিছু করা গেল না কেন সেটি নিয়ে জামায়াতীরা বিমর্ষ।

এ কারণে তাদের বর্তমান স্ট্রাটেজিতে তিনটি ধারা দেখা যাচ্ছে। এক পাকিদের মতো বা সে আমলের মতো ভারত বিরোধিতা করা। প্রতিদিন ভারতবিরোধী একটি প্রতিবেদন থাকে পত্রিকায় তারা খেয়ালই করেনি, কয়েকদিন আগে ভারতও পাকিস্তানের দুই তরুণ জুটি বেঁধে ইউএস টেনিসে দ্বিতীয় হয়েছে। দুই, সরকারের 'জুলুম' বিষয়ে নরম গরম লেখা। কিন্তু লেখা আক্রমণাত্মক নয়। সরকারের সাফল্যে তাদের মধ্যে এমন ভয় ঢুকে গেছে 'রগকাটা, গ্রেনেড/বোমা ছোঁড়ায় দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও] যে সরকার আরও ক্রুদ্ধ হলে গ্রেফতার সংখ্যা আরও

বেড়ে যায় কিনা।

তিন. আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ আইন ১৯৭৩ যে 'অন্যায়' সে সম্পর্কে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিবেদন লেখা। দু'দিনের পত্রিকা থেকে তিনটি বিষয়ে আমি উদাহরণ তুলে ধরব-

১. ক. মেহেরপুরের সীমান্তে আজও সাড়ে ৪শ' বিঘা জমি ভারতীয়দের দখলে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেই। চাষাবাদ করতে গিয়ে ৩৮ বছরে প্রাণ দিয়েছে ৮ শতাধিক লোক। [৫.৯.১০]

খ. ডয়াং নদীর ওপর ভারত নির্মিত ড্যাম ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করছে। [৬.৯.১০]

২. ক. কারাগারে শীর্ষ নেতৃবৃন্দের গুরুতর অসুস্থতায় মকবুল আহমদের উদ্বেগ। নেতাকর্মীদের ঈদের পুর্বেই মুক্তি দিন।

খ. অবিলম্বে নিজামীকে মুক্তি না দিলে বৃহত্তর আন্দোলন। [৫.৯.১০]

গ. প্রকৃত অপরাধীদের ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যই প্রশ্নবিদ্ধ বিচারের আয়োজন করা হয়েছে। [৬.৯.১০]

প্রথমটি নিয়ে বলার কিছু নেই। শুধু দু'টি প্রশ্ন। ভারত হিন্দুদের তাই তাদের সব খারাপ। জামায়াত নেতাদের ইসলামী তাহযীব তমুদ্দুন মতো চলা উচিত। তাহলে প্রথম প্রশ্ন গোলাম আযম নিজামীদর পুত্রদের কেন মাদ্রাসায় পড়ানো হয়নি? নাছারা ভাষায় কেন শিক্ষা দেয়া হয়েছে? গরিবদের ছেলেমেয়েদের জন্য মাদ্রাসা যাতে তারা গরিব ও অধীনস্ত থাকে আর লিডারদের ছেলেমেয়েদের জন্য নাছারা শিক্ষা যাতে তারা ধনী থাকে ও শাসন করতে পারে। দুই. গোলাম আযমের ছেলে কেন নাছারার দেশে ব্রিটেনের লন্ডনে এবং নিজামীর ছেলে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অর্লিয়ন্সে ফূর্তি করে? উল্লেখ্য, নিউ অর্লিয়েন্স নানা ধরনের ফূর্তির জন্য বিখ্যাত। দেশের কথা বাদ দিই-তারা কেন সুদান, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, নিদেনপক্ষে পাকিস্তানে থাকে না? তাদের অধস্তনদের কেন তারা কাশ্মীর, আফগানিস্তান, পাকিস্তানে পাঠায়? জামায়াত কর্মীরা যদি বুজদিল না হতো তাহলে গোলাম আযম নিজামীদের এ প্রশ্ন করত। এই দু'টি প্রশ্নের উত্তর-ভণ্ডামী। প্রকৃত ভণ্ড, মিথ্যা ও ধর্ম ব্যবসায়ী ছাড়া কেউ জামায়াত করতে পারে না। সুতরাং, তাদের কথায় ও কাজে ফারাক থাকবে। এই কারণেই ধর্মের কথা বলে জামায়াত ১৯৭১ সালে প্রচুর হত্যা, ধর্ষণ, লুট করেছে।

এবার তাদের দ্বিতীয় কৌশল নিয়ে কথা বলা যাক।।

যেদিন থেকে যুদ্ধাপরাধ বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেদিন থেকে জামায়াত প্রচার করে আসছে, (১) এই আইন তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়, (২) এটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মাধ্যম এবং (৩) এটি আন্তর্জাতিক

মানসম্পন্ন নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই *সংগ্রামে* শিরোনাম-'গণহত্যার সাথে রাজনৈতিক গ্রুপকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ নেই।' (৬.৯.২০১০) ইন্টারনেট ঘেঁটে বা প্ররোচিত করে যেসব বক্তব্য বা প্রতিবেদন পাওয়া যায় সেগুলো তুলে ধরছে জামায়াত। যেমন, 'ক্রাইমস অব ওয়ার প্রজেক্ট ১৯৯৯-২০১০। *'সংগ্রাম'* সাপ্তাহিক হলিডেতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে ছেপেছে। লেফটি বলে পরিচিত হলিডে স্বাভাবিকভাবেই রাইটের পক্ষে। তাই তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনের নাম -'ওয়্যার ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল হেজ টু বি ফ্রি এ্যান্ড ফোর।' মূল প্রতিপাদ্য-"এই আইনটি আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়ার মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়... সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুন্ন হলেও এ আইনটি চ্যালেঞ্জ করা যাবে না সংবিধানের সেই সংশোধনটি মৌলিকভাবেই আইনের শাসনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।" [ঐ] সরকার জামায়াত নেতাদের বিচার করতে চাচ্ছে যা রাজনৈতিক। এবং আইনটি 'স্বচ্ছ' নয় বিধায় বিচার 'প্রশ্নবিদ্ধ'।

জামায়াত দেশে যেমন, বিদেশেও এই প্রচারই করছে। সম্প্রতি বিদেশে গিয়েও এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ, মানুষ সঠিক বিষয়টি জানতে চায়। এসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন মন্ত্রীরা বা বিদেশে অবস্থানরত কূটনীতিকরা। দুঃখের বিষয় এসব উত্তর দেয়া তাদের সামর্থের বাইরে, এবং সিভিল সমাজের পেশাজীবীরাই মূলত উত্তরগুলো দিচ্ছেন।

১৯৭৩ সালের আইন কেন মানবতাবিরোধী অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না? এই আইনে কোথাও বলা হয়নি এবং সরকারী মন্ত্রীদের বাচালতা সত্ত্বেও মন্তব্য করেননি, এই আইন জামায়াত সদস্যদের বিচারের জন্য করা হয়েছে। জামায়াত সদস্যরা তাহলে এত ভয় পাচ্ছে কেন? কারণ, পাকিদের পক্ষের দলের মধ্যে জামায়াত ছিল সবচেয়ে বড়। সুতরাং খুন, ধর্ষণ, লুটের সঙ্গে তাদের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জড়িত। সাকাচৌ কি জামায়াত করত? তা হলে কি তার বিচার হবে না? বা অন্য কেউ? এ প্রসঙ্গেই জামায়াত বলছে, পাকিদের বিচারের জন্য এই আইন করা হয়েছিল। তাদের জন্য নয়। তারা তো রাজনৈতিক দল। এর উত্তর হচ্ছে, রাজনৈতিক দলের বিচার হচ্ছে এমনটি কেউ বলেনি। অপরাধীদের বিচার হবে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক দলের বিচারের কথা বলা হলে, সমস্ত জামায়াতীদেরই বিচার হতো। গুটিকয় নেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। ১৬ ডিসেম্বরের আত্মসমর্পনের দলিলের প্রতিচিত্র আমরা অনেকে দেখেছি, পড়িনি হয়ত সেভাবে। সেখানে প্রথম অনুচ্ছেদেই লেখা আছে 'দিস স্যারেন্ডার ইনক্লুডস অল পাকিস্তান ল্যান্ড, এয়ার এ্যান্ড লেভেল ফোর্সেস এ্যাজ অলসো অল প্যারামিলিটারি ফোর্সেস এ্যান্ড সিভিল আর্মড ফোর্সেস' [আত্মসমর্পণ যারা করছে তাদের মধ্যে আছে পাকিস্তানী স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীসহ প্যারা-মিলিটারি বাহিনী

ও অসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর সমস্ত সৈনিক ।]

রাজাকাররা প্যারা-মিলিটারি ফোর্সেসের অন্তর্গত। আলবদর, আলশামস, সিভিল আর্মড ফোর্সেসের অন্তর্গত। শান্তি কমিটির সদস্যরা এদের সহায়তাকারী। অপরাধী না হলে এদেরসহ আত্মসমর্পণের কথা আসত না। তাই শুধু পাকিস্তানীদের বিচারের জন্য আইনটি হয়েছিল সেটি বিভ্রান্তিকর। আর জামায়াতীরা তো পাকিস্তানী নাগরিকই ছিল। মুশকিল হচ্ছে আলবদর আলশামস রাজাকার শান্তি কমিটর সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল জামায়াতের সদস্য বা সমর্থক। তারা তো কখনও ভাবেনি 'অজয়' পাকিস্তানীরা এভাবে পরাজিত হবে এবং তাদের ও তাদের সহযোগীদের বিচারের জন্য আইন হবে।

জামায়াতের দ্বিতীয় প্রচারের ধারার উত্তর প্রথম উত্তরেই দেয়া আছে। তবুও খানিকটা পুনরাবৃত্তি করছি। জামায়াত তো খুনী ও ধর্ষকদের দল হিসেবে নিষিদ্ধ ছিল তাদের পুণজন্ম দেন সেই ছোটখাটো মেজর, পরবর্তীকালে লে. জে. জিয়াউর রহমান যিনি অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। জিয়া ও এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে জামায়াত বড় দল হয়েছে। এখন এদের নেতারা খুন ধর্ষণ লুট করলে এবং তাদের বিচার হলে কি দলের বিচার হচ্ছে না ব্যক্তির বিচার হচ্ছে? ২০০১ থেকে এ পর্যন্ত খালেদা-নিজামী যে বিভীষিকাময় শাসন চালিয়ে ছিলেন তার জন্য ব্যক্তিকে দায়ী করা হচ্ছে না দলকে? অপরাধীর বিচার হওয়া মানে দলের বিচার হওয়া নয়।

পৃথিবীর প্রতিটি আইনের পক্ষে বিপক্ষে সমালোচনা আছে, থাকবেই। তাতে সেই আইনটি অকার্যকর হয়ে যায় এমন কথা কেউ বলবে না। ১৯৭৩ সালের আইনের পক্ষে যেমন সংখাগরিষ্ঠ আন্তর্জাতিক সংগঠক ও খ্যাতিমান ব্যক্তিরা আছেন তেমনি এর সমালোচনা করার জন্যও গুটিকয় ব্যক্তি বা সংগঠন আছে, জামায়াত সুযোগ পেলেই যাদের কথা তুলে ধরে। সেই সমালোচনা থাকতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বা মানবাধিকারটি কী? কিছু শ্বেতাঙ্গ বা নাছারা [জামায়াতের ভাষায়] বিপক্ষে বললেই আন্তর্জাতিক মানদণ্ড খাড়া হয়ে যায় নাকি।' বা 'খ্রিস্টান' দেশগুলোর আইনই শুধু আন্তর্জাতিক মানদ ? সৌদিরা বা পাকিরা বা ইরানীরা যে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে, হাত-পা কর্তন করে সেটি কি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পড়ে? যারা এগুলো করে তারা এগুলোকে শরিয়া আইন বলে চালায়। তা নিযামী-মুজাহিদরা কখনও তার নিন্দা করে না। তারা কি ঐ আইন অনুযায়ী বিচার চায়? তা হলে তো এত ঝামেলার কোনো দরকার হয় না। তারা যে খুন করেছে তার অনেক সাক্ষী আছে। সাক্ষী এনে বিচার করে শিরচ্ছেদ করলেই তো সব চুকে বুকে যায়। বাঙালিরা কোনো আইন করলে তা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে টেকে না, শ্বেতাঙ্গরা করলে টেকে এরকম হীনম্মন্যতা বোধ আমাদের থাকা উচিত

নয়। জামায়াত যে বারবার মৌলিক অধিকারের কথা তোলে সেটি কি? ইউরোপে কোনো নাজিদের রাজনৈতিক অধিকার দেয়া হয় না? সেটি কি মৌলিক অধিকারের বিপক্ষে নয়? কিন্তু সবাই সেটা মেনে নিয়েছে কারণ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা আদর্শের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার থাকতে পারে না।

সামগ্রিকভাবে জামায়াত যুদ্ধাপরাধ/মানবধাবিরোধী অপরাধের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করে যদিও ন্যুরেমবার্গ বা টোকিয়ো ট্রায়ালের বিপক্ষে তারা নয়। ন্যুরেমবার্গের বিচারক রাধাবিনোদ পালও এই যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। বলেছিলেন, আমেরিকাও কি যুদ্ধাপরাধী নয়? এই চুক্তি নাকচ হয়ে যায়। কারণ, বিজয়ীরা বিচার করেছে। সব দেশে, সব বিচারের ক্ষেত্রেই তা হয়েছে। আমরা বিজয়ী হয়েছি সেক্ষেত্রে আমাদের যুক্তিই বহাল থাকবে।

ইসলামী চিন্তাবিদ দেওয়ান আজরফ পাকি ও তার সহযোগীদের খুন খারাবি আর ধর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছিলেন, বিশ শতকে ইসলামের নামে কেউ ইসলামকে এভাবে অপমান করেনি। পৃথিবীর আর কোথাও নয় মাসে ৩০ লাখ মানুষ হত্যা ও ১০ লাখ নারীকে ধর্ষণ করা হয়নি। সুতরাং, ধর্মীয় ও মানবাধিকার কোনো দিক থেকেই এটি গ্রহণযোগ্য নয়। যদি নাই হয় তাহলে শুধু এ দু'কারণেই তো বিচার হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, খুনী ও ধর্ষকদের বিচারের কথা উঠলেই মানবাধিকারের প্রশ্ন আসে। তা হলে যারা খুন হয়েছে, ধর্ষিত হয়েছে তাদের মানবাধিকারটা রক্ষা হয় কোথায়?

এবার আসে জামায়াতের তৃতীয় ধারার প্রচার নিয়ে। এর মূল প্রতিপাদ্য, জামায়াত নেতা যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা 'আলেম দ্বীন।' এদের গ্রেফতার করে 'ধর্মভীরু জনগণের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে।' খুনী, ধর্ষকরাও আলেম দ্বীনি এই সংজ্ঞাও শুনতে হলো? এরা আলেম ও দ্বীনি হলে বাংলাদেশের সবাই আলেম ও দ্বীনি। আমরা তো মনে করি এদের গ্রেফতার না করাটা ছিল ধর্মভীরু জনগণের সাথে তামাশা এর পর ইনিয়ে বিনিয়ে বলা হয়েছে এদের বয়স ষাটের ওপর, এদের রিমান্ডে নেয়া ঠিক নয় বিশেষ করে রমজান মাসে তাদের জেলে রাখাই উচিত নয়। সাঈদীর সঙ্গে সরকারের 'নিষ্ঠুর আচরণের' একটি নমুনা তুলে ধরেছে 'সংগ্রাম- "মওলানা সাঈদীকে ডিবি অফিসের হাজতখানায় রাখা হয়েছে। এই হাজতখানায় বাথরুম নেই। শুধুমাত্র প্রস্রাবের সামান্যতম ব্যবস্থা আছে। মেঝেতে বিছানা চাদর নেই নেই, বৈদ্যুতিক পাখা। রোজা ও অসুস্থ অবস্থায়ই মওলানা সাঈদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।' [৫.৯.১০]

নিজামী-সাঈদীরা যখন ক্ষমতায় তখন ঈদের দিন রাতে শাহরিয়ার কবির, সাবের চৌধুরী মোহাম্মদ শফিসহ আমাকে গ্রেফতার করা হয় সে সময়টা তো আল্লাহ আনন্দের সময় হিবেবে নির্ধারণ করেছেন। তবুও তো গ্রেফতার করা হয়

আমাদের। এবং রিমান্ডে নেয়া হয়। এবং সাঈদীকে যে কক্ষে রাখা হয়েছে আমাকেও সেখানে রাখা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিএনপির লাঠিয়াল কোহিনূরের নির্দেশে আমার সঙ্গে রাখা খুনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আমাকে খুন বা আহত করার। অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের চেষ্টায় এবং খুনের দায়ে অভিযুক্ত আমাকে আঘাত করতে অপরাগ হওয়ায় আমি বেঁচে যাই। [বর্তমানে পলাতক সেই কোহিনূরকে গ্রেফতার করা থেকে পুলিশ বিরত থাকছে বলে অনুমিত] জিজ্ঞাসাবাদ সেই সময় আমাদেরও করা হয়েছে। ড. মহীউদ্দিন খান আলমগীরের মতে প্রবীণ মানুষের ওপর কী চরম অত্যাচার করা হয়েছে তা সারা পৃথিবী জানে। আমরা অভিযোগ করিনি। আর ইসলামের খেদমতগারদের এত অভিযোগ কেন? সেই সময় আমাদের গ্রেফতার ও নির্যতান যদি জায়েজ হয়ে থাকে ঈদের সময় তা হলে রমজানে রিমান্ড ও জিজ্ঞাসাবাদ নাজায়েজ হবে কিভাবে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আগে দিয়ে ঐসব মন্তব্য করা উচিত। আর যারা আলেম, দ্বীনের খেতমতগার হয়ে এ খুন ধর্ষণ করতে পেরেছেন সামান্য এই গ্রেফতার ও রিমান্ডে তাদের এত ভেঙ্গে পড়া কেন? তবে, জামায়াতী বয়ান শুনে (পড়ে) বোঝা কঠিন নয় যে তারা তাদের ওস্তাদ মওদুদীর প্রতি এখনও তাদের আস্থা অবিচল। জামায়াত নেতারা মওদুদীর সেই উপদেশ একনিষ্ঠভাবে মানছে মওদুদী লিখেছিলেন-"বাস্তব জীবনে এমন কিছু চাহিদা রয়েছে যেগুলোর খাতিরে মিথ্যা বলা কেবল জায়েজই নয় বরং ওয়াজেব।" [মাসিক তরজুমানুল কোরআন, খণ্ড ৫০, ২ সংখ্যা ১৩৭৭)।

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১

যুদ্ধাপরাধীদের দল এখন একটি নয়-দুটি

এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না, যে, রাজাকারের দল বাংলাদেশে একটি নয় দু'টি। একটি জন্ম পাকিস্তান আমলে, যা আমাদের কাছে জামায়াতে ইসলামী নামে পরিচিত। অন্যটির জন্ম বাংলাদেশে, ১৯৭৫ সালের পরে, আমাদের কাছে যা পরিচিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নামে। এ মন্তব্যে অনেকে ক্ষুব্ধ হতে পারেন, বিস্মিত হতে পারেন কিন্তু যুক্তি বা বাস্তবতা অস্বীকার করবেন কীভাবে? জামায়াতের আজহার যা বলেন, বিএনপির খোন্দকার দেলোয়ারের বক্তব্যও সেই একই রকম। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত সাকা ওরফে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর জন্য বিএনপি পূর্ণ দিবস হরতালের আহবান জানায়। জামায়াতের আজহারুল ইসলাম বলেছেন "মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের ৯৯ ভাগ চেয়ারম্যান ছিল আওয়ামী লীগের লোক। রাজাকার, শান্তি বাহিনী নিয়োগ দিয়েছে তারা আর পুলিশের এসপিরা। তারা অপরাধী হবে না আর জামায়াত নেতাদের বিচার করবে, এমন দু'মুখো নীতি দেশবাসী সহ্য করবেন না।" [*প্রথম আলো*, ১৭.১২.১০]

অন্যদিকে বিএনপির খোন্দকার দেলোয়ার বলেছেন, "দেশবাসী জানতে চায়, মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতারা কে কোথায় ছিলেন। নিজেদের জান বাঁচাতে (তারা) কোথায় পালিয়েছিলেন। কোন্ নেতার কোন্ সন্তান, কোন্ ভাতিজা মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। এই তালিকা জাতির সামনে প্রকাশ করুন।"

বিএনপির মহাসচিব বলেন, "আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব কখনই এ দেশের স্বাধীনতা চাননি, চেয়েছেন স্বায়ত্বশাসন। তাঁর ঘোষিত ৬ দফায়ও স্বাধীনতার কথা ছিল না। ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে এক সমাবেশে শেখ মুজিব স্বায়ত্বশাসনের কথাই বলেছিলেন।।" [*কালের কণ্ঠ*, ১৬.১২.১০]

আজহার যা বলেছেন তার সত্যতা জানি না। তবে, ধরে নিলাম ১৯৭১ সালে দেশের ৯৯ ভাগ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের ছিল। কিন্তু আজহার যেটা বলেননি তা হলো, এদের অধিকাংশ নিয়াজীর নেতৃত্বাধীন পাকি হানাদার বাহিনী, গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন রাজাকার বাহিনী, মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বাধীন আলবদর, বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন, নতুবা যুদ্ধ করছিলেন অথবা পালিয়ে ছিলেন। রাজাকার বা শান্তি বাহিনীর তালিকা এ জন্য প্রণয়ন জরুরি

ছিল। তবে, এখন পর্যন্ত রাজাকারদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে আধিক্য দেখা যাচ্ছে জামায়াত ও মুসলিম লীগারদের।

জাতীয় সংসদের রেশন চুরির দায়ে পরিচিত বিএনপির খোন্দকার যে মৌতাতে থাকেন সব সময় তার মন্তব্যই তা প্রমাণ করে। ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বায়ত্বশাসনের কথা বলেছিলেন। তাতে সমস্যা কোথায়? ১৯৭১ সালের ৭ ও ২৬ মার্চ তিনি কী বলেছিলেন সেটি খোন্দকার কোন লজ্জায় বলছেন না। আওয়ামী লীগ নেতারা কোথায় ছিলেন খোন্দকার জানেন না? তারা সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন। খোন্দকার যাকে 'পিতা' হিসেবে জানেন সেই মেজর জিয়াকে তখন প্রমোশন দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতারা এবং তাদের অধীনে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। খোন্দকাররা যদি মুখ খোলেন ভালো কথা, তখন জিয়াউর রহমানের স্ত্রী থেকে সাকা চৌরা কী করছিল তা আরও বিশদভাবে বর্ণিত হবে? খোন্দকার সেটি চান? না, এখানেই শেষ নয়। আজহারও জানাচ্ছেন, "টেলিভিশনে আমাদের যতই খারাপ লোক বলা হোক, যতই যুদ্ধাপরাধী বলা হোক মানুষ তা বিশ্বাস করবে না।" তিনি বলেন "আমরা যুদ্ধাপরাধেল বিচারের বিরোধী নই। জামায়াত কোনো যুদ্ধ করেনি পাকিস্তানী সেনারা যুদ্ধ করেছিল। চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে আসেন, বিচার করেন। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করব। কিন্তু আধিপত্যবাদী শক্তিকে পথ পেতে দিতে ইসলামপন্থীদের যুদ্ধাপরাধী করে ঘায়েল করবেন, দেশের মানুষকে এত বোকা মনে করবেন না।" বিজয় দিবসের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি আরও বলেন. "এই দিন আসলে তারা একটি কথা বলে, 'রাজাকারমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চাই।' রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার নামে তারা দেশকে ইসলামমুক্ত করতে চায়। জীবন থাকতে আমরা ইসলামমুক্ত বাংলাদেশ হতে দেব না।

এটি ঠিক জামায়াত পাকিদের মতো সশস্ত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। তাদের যুদ্ধ ছিল অন্যরকম্ নিরস্ত্রদের বিরুদ্ধে। জামায়াতীরা পাকিদের খাদেম হিসেবে কাজ করেছে, শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকার হিসেবে গ্রাম কি গ্রাম লুট করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে, নারীদের ধর্ষণ করেছে, হানাদারদের পথ চিনিয়েছে। আলবদর হিসেবে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। এই সব কথা পুরনো বটে কিন্তু আমাদের দেশে বার বার তা মনে করিয়ে দিতে হয় না হলে খোন্দকার ও আজহাররা এ ধরনের মিথ্যাচার করতেই থাকবে। এবং কেউ কেউ যে বিভ্রান্ত হবে না তা কীভাবে বলি? আর দেশে জ্ঞানপাপীরা সংখ্যা কম নয়

জামায়াত-বিএনপির এসব বক্তব্যের পেছনে অন্য একটি রাজনীতি আছে। সেটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতি তত্ত্বের রাজনীতি। এ রাজনীতির অর্থ হচ্ছে, ভারত হিন্দু বা কাফের পাকিরা মুসলমান অর্থাৎ মুমিন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা

যায় না, মুমিন সেজে কেউ মুসলমানদের হত্যা করে। কাফেররাও এত মুসলমান হত্যা করেনি। সে অর্থে ঐ সব 'মুসলমানরা' ধর্মদ্রোহী। জামায়াত বিএনপি ধর্মের নাম দিয়ে পাকিস্তানী রাজনীতি করবে। যে কারণে, বিএনপি বার বার বলছে। আওয়ামী লীগ বিদেশী প্রভুর কথা মতো চলছে। ভাসুরের নাম না নেয়ার মতো ভারতের নাম তারা নিচ্ছে না কারণ কয়েক বছর আগে ভারতীয়দের তাঁবেদার হিসেবেই তারা কাজ করেছে। সে সময় ভারত ক্ষমতায় ছিল বিএনপির/জামায়াতের মতোই সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি। সবচেয়ে বড় কথা বেগম জিয়া ও নিজামী বা আজহার বাঙালিদের কাছে পাকিদের আত্মসমর্পণটা মানতেই পারেন না। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সমস্ত প্রটোকল ভেঙ্গে পাকিস্তানী সেনা প্রধানের মৃত্যুতে বেগম জিয়া শোক বার্তা পাঠিয়ে ছিলেন। সেটা আমরা ভুলিনি। ১৯৭১ সালে ঐ জেনারেল নাকি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের পাহারাদার ছিলেন। পাকিদের আত্মসমর্পণের স্মৃতি মুছে দেয়ার জন্য জেনারেল জিয়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিশু পার্ক করেছিলেন তাও আমরা ভুলিনি। দেখুন সেই একই ধারায় আজহার কী বলছেন- 'স্বাধীনতার নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ দিয়েছে' উল্লেখ করে জামায়াতের এই নেতা আরও বলেন, 'আপনারা স্বাধীনতা এনেছেন, রক্ষা করব আমরা ইনশাআল্লাহ।... আমার দেশের শত্রু পাকিস্তান নয়, বোকাও বোঝে এই শত্রু ভারত। যারা ভারতের বন্ধু, তারা বাংলাদেশকে রক্ষা করতে পারবে না।' [ঐ] যাক, জীবনে একবার হলেও জামায়াত নেতা সত্য কথা বলছেন যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু জামায়াত স্বাধীনতা রক্ষা করবে? সর্বনাশ! তাদের স্বাধীনতা রক্ষার অর্থ তো পাকিস্তানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। বিএনপি-জামায়াত যে এসব কথা বলছে এর দু'টি দিক আছে। প্রথমত, যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে এটি তারা কখনও ভাবেনি। একজন একজন করে যুদ্ধাপরাধী গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে তারা শুধু বিপর্যয় নয় ভীতও হয়ে পড়েছে। কারণ, সাকার পর অবশ্যই আসবে গোলাম আযমের প্রশ্ন। দু'টি দলেই যুদ্ধাপরাধী আছে কমবেশি। আগে জামায়াত ছিল যুদ্ধাপরাধীদের দল। এখন বিএনপিও। বিএনপিও জামায়াতের মতো বলছে, তারা যুদ্ধাপরাধীর বিচার চায়। তাই যদি চায় তা হলে সাকা গ্রেফতার হলে তারা প্রতিবাদই বা জানায় কেন, হরতালও বা আহ্বান করে কেন? এ দু'দলই যুদ্ধাপরাধীদের সংরক্ষণ, পরিশোষণ করতে চায়। শুধু তাই নয়, আজহার তো নিজেকে মুক্তিযোদ্ধাও দাবি করছেন।

"দলের ভারপ্রাপ্ত আমির মকবুল আহমাদ বলেন, জামায়াত সব সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে জামায়াতকে গালিগালাজ করা হচ্ছে, কিন্তু জনগণ সব জানে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা উল্লেখ করে মকবুল আহমাদ আরও বলেন,

'জাতির পিতা যা করে গিয়েছেন তাঁর দল তা মানেন না। তিনি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয় মীমাংসা করেছেন। এখন তার সিদ্ধান্ত তাঁর শিষ্যরা মানে না।' তিনি বলেন, বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবস এলেই তারা (আওয়ামী লীগ) আমাদের রাজাকার, আলবদর, আলশামস বলে গালিগালি করে। এখন জাতির কোন্দলের সময় নয়, এখন ঐক্যের সময়।" [*প্রথম আলো*, ঐ]

আমি জানি না আলবদর, আলশামসকে কী নামে উল্লেখ করব। যে যা ডাকে তো সেই নামেই ডাকতে হবে। তবে তিনি একটি ভালো কথা বলেছেন ঐক্য নিয়ে। আমরা মনে করি বিজয়ের মাসে জাতির কোন্দলের সময় নয়। জাতিকে এখন ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত করার দাবি জানাতে হবে ও দু'টি যুদ্ধাপরাধী দলকে প্রতিহত করতে হবে। অন্য আরেকটি দিকও বিবেচ্য ঃ বর্তমান প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক তাঁর দীর্ঘ দু'টি রায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে ইতিহাস তুলে ধরেছেন, কেউ যদি তার বিপরীত বা মিথ্যা বলে তাহলে আদালত তা আমলে নিতে পারে কিনা? আমরা আইন-প্রণেতাদের অনুরোধ জানাব বিকৃতি সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়নে। যুদ্ধাপরাধীরা, তাদের দল ও সমর্থকরা যে ভাবে ইতিহাস বিকৃত করার প্রচেষ্টায় নামছে তা দেশদ্রোহিতার শামিল। ইতিহাসে বিকৃতিকে এখন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করার সময় এসেছে।

১০ জানুয়ারি, ২০১১

আমিনী, যুদ্ধাপরাধী ও যুদ্ধাপরাধের সমর্থনকারীরা লম্ফঝম্পের সাহস পেল কেন?

ইসলামী ঐক্যজোটের ডাকা হরতাল সফল হলো কী হলো না সেটি বড় বিষয় নয়। বিষয় হলো–ইসলামী ঐক্যজোটের মতো সিকি পয়সার একটি দল হরতালের কথা ভাবতে পারল, ঘোষণা করল এবং মিছিল করল। আমিনী ধমক দিয়ে বলেছেন, শেখ হাসিনা মিথ্যাবাদী। 'নারীনীতিই ইসলামবিরোধী, কোরানবিরোধী। অবিলম্বে ইসলামবিরোধী ও নারীনীতি শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে।" হাসিনা সরকার ইসলামবিরোধী সরকার। *[জনকণ্ঠ ২.৪.১১]*

জামায়াতে ইসলামীও ঘোষণা করেছে, আগামী ৫ মার্চ নিজামী মুজাহিদদের মুক্তির দাবিতে তারা সমাবেশ করবে। ইতোমধ্যে তারা ঘোষণা করেছে, ১৯৭১ সালে এসব জামায়াতীরা ছিলেন ছাত্র। তারা অপরাধ করলে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারতেন না। তারা "এ দেশের খুবই জনপ্রিয় নেতা।.... তাদের মতো সম্মানিত ব্যক্তিদের রিমান্ডে নিলে তা হবে দেশের রাজনীতিকে কলুষিত করা।"

বলা বাহুল্য, তথাকথিত এ দুই ইসলামী দলের নেতাদের কথা মিথ্যা। ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদের মিথ্যা বলতেই হবে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তারা মিথ্যা বলছেন। নারীনীতি কী তা আমিনী বোঝেন কিনা সন্দেহ। আদৌ সরকারের নীতিটি তিনি পড়েছেন কিনা সন্দেহ। কারণ, তাদের হুমকিতে সরকার ইতোমধ্যে নতিস্বীকার করে ১৯৯৬ সালের নারীনীতি বদলেছে। আমরা বরং বলতে পারি, আমিনীদের মতো ধর্মব্যবসায়ীদের ধমকে শীর্ষ রাজনীতিবিদরা কুঁকড়ে গেলেন কেন? রণ থেকে তাঁকে পিছু হটার পরামর্শ দিল কোন্ সেনাপতিরা তাঁদের নাম আমরা জানতে চাই। ক্ষমতা ছেড়ে তাঁরা যখন সিভিল সমাজে আসবেন তখন তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়াটা যেন করতে পারি। যেমন করেছি, আমরা গণবিরোধী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানদের সঙ্গে।

জামায়াত সব সময় মিথ্যার বেসাতি করেছে। তাদের গুরু মওদুদীই তা জায়েজ করেছেন। '৭১ সালে আলবদরদের অধিকাংশ ছাত্র ছিল কিনা? তারা কি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেনি? তাদের লিডার কি নিজামী বা মুজাহিদ ছিলেন না? ছাত্র থাকাকালীন হত্যা করা যাবে না এটি কোন ধরনের যুক্তি। ১৯৭১ সালে

হানাদার পাকিদের সঙ্গে হত্যা লুট ধর্ষণে যুক্ত ছিল ইসলামী ছাত্রসংঘের নিজামী মুজাহিদদের মতো সদস্যরা। যুদ্ধাপরাধীরা আবার কোন দেশে সম্মানিত? ভদ্রসমাজে নয়, বিএনপি সমাজে হতে পারে। নিজামী, মুজাহিদ জিতেছেন তখনই যখন সামরিক বাহিনী বা বিএনপি তাদের সহায়তা করেছে। মুক্ত নির্বাচনে সব সময় আওয়ামী লীগ জয়ী হয় এবং জামায়াত কোনো আসন প্রায় পায় না। ইতিহাস তাই বলে। নিজামীরা আমাকে, শাহরিয়ারকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করেছে। আমাদের রিমান্ডে নেয়ার পরও যদি রাজনীতি কলুষিত না হয়, তা হলে অপরাধীদের রিমান্ডে নিলে রাজনীতি কলুষিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা সব সময় রিমান্ডের বিরোধিতা করেছি। তবুও বলি, যুদ্ধাপরাধীদের রিমান্ডে নেয়ায় কেউ অখুশি হয়নি।

যে প্রশ্নটি তুলেছিলেম সেটিই আবার করি। আওয়ামী লীগ জঙ্গী দমন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে ঘোষণা করায় বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিল। কেননা, বেগম জিয়ার, নিজামী ও তৎকালীন ডিজিএফআইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গী ও যুদ্ধাপরাধীদের পোষণে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদ বিকশিত হওয়ায় হত্যা, খুন, ধর্ষণ মহামারীর মতো বেড়েছিল। মানুষ তা থেকে মুক্তি পাওয়ার নিমিত্তে দলে দলে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছেন।

আমরা বলব না, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ভুলে গেছে। গত দুই বছর জঙ্গী দমনে সরকার পিছপা হয়নি। নিয়মিত একজন দুজন করে জঙ্গী ধরা পড়েছে। অবশ্য ধরা পড়ার পর কী হয়েছে তা আমরা জানি না। তাদের নামে অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে কিনা। বিচারের কী খবর সেটি আমাদের জানা নেই। তবে যুদ্ধাপরাধীদের শাসনামলের পরিস্থিতি যে এখন বিরাজ করছে না তা বলাই বাহুল্য।

সরকার এরপর যুদ্ধাপরাধী বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। শেখ হাসিনা সবচেয়ে সাহসী কাজ বলে যা বিবেচিত হার্ডকোর যুদ্ধাপরাধী বা যুদ্ধাপরাধীমনা ছাড়া কেউ তাতে অখুশি হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। বিএনপিমনা অনেকে আমাকে বলেছেন, প্রকাশ্যে আমরা কিছু বলতে পারব না কারণ খালেদা জিয়ার পার্টি করি কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে আছি। দেখবেন, বিচারটা যাতে হয়। আমরা কী দেখার মালিক? দেখার মালিক তো প্রধানমন্ত্রী।

যুদ্ধাপরাধী বিচারের পুরো প্রক্রিয়াটি ছিল এলোমেলো। সেই প্রথম বছরের কথা তুলতে চাই না। কিন্তু এখন কি পরিস্থিতির খুব উন্নতি হয়েছে? সামান্য। মানুষজনের হতাশা বাড়ছে, অন্যদিকে আশান্বিত হচ্ছে আমিনীরা, যুদ্ধাপরাধীরা।

প্রথমত দেখা গেল, প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রীর বক্তব্য আছে যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে। ১৯৭৩ সালের আইন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে তারা প্রায় দু'টি বছর এমন সব

মন্তব্য করতে লাগলেন যে, পুরো প্রক্রিয়াটি বানচালের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আইন প্রতিমন্ত্রীকে যদি জিজ্ঞেস করি, তিনি কয়েকবার দু'তিনটি তারিখ দিয়েছিলেন বিচার শুরু এবং শেষের তার কী হলো? ঈশ্বর কি তাকে দৈববাণী প্রেরণ করেছিলেন? সেই দৈববাণী কার্যকর হলো না কেন? অন্যদিকে তদন্ত দলও ঘন ঘন টিভি ক্যামেরার সামনে এসে বক্তব্য দেয়া শুরু করল, মনে হচ্ছে, সেখানে কোনো শৃঙ্খলা নেই এবং শৃঙ্খলা আরোপ করার মতো কোনো ব্যক্তিও নেই। মানুষজনের আশা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল এসব মন্ত্রী ও তদন্তকারীদের বচনে। এখন সেই আশা সর্বনিম্ন পর্যায়ে।

জনমনে একটা ধারণা জন্মেছে, সরকার বিচার প্রক্রিয়া চতুর্থ বছরে শুরু করে পঞ্চম বছরে গিয়ে বলবে, আমরা শত চেষ্টা করেও পারলাম না। আগামীবার ভোট দিন। বিচার শেষ হবে। তাদের হয়ত ধারণা, এতে জামায়াত চাপে থাকবে, মানুষ ভোটের বাক্স ভরে দেবে। নতুনযারা ভোটার, যাদের ডিজিটাল প্রজন্ম বলা যেতে পারে তারা এতে ভুলবে ভাবলে ভুল হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব হয়ত ভাবছেন, এটিই বাস্তবতা। আমরা বলব তা পরাবাস্তবতা। যদি বিচার শুরু না হয়, আগামীবার আওয়ামী লীগের নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসা দারুণ কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার হবে।

বিচার প্রক্রিয়া এগুচ্ছে না নানাবিধ কারণে। আমরা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেনদরবার করেছিলাম বিচারের অর্থ বরাদ্দের জন্য। দশ কোটি টাকা উনি বরাদ্দ করেছিলেন। সে টাকার অধিকাংশ ফেরত যাচ্ছে কেন? অর্থাৎ কাজ করতে পারেনি। কেন কাজ করতে পারেনি? সেটি বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত চারটি মন্ত্রণালয়কে জিজ্ঞেসা করুন। যদি তারা আগ্রহী হন তা হলে বিচার প্রক্রিয়া শ্লথ হবে কেন?

প্রধানমন্ত্রী আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না জানি, বিশ্বাস করবেন গোয়েন্দা সংস্থা, চারপাশের কাছের জন ও মন্ত্রীদের কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই বলছি, যেভাবে কাজ চলার কথা সেভাবে চলছে না। চালানো যাচ্ছে না। বিচার হবে কিভাবে? মনে রাখা ভাল, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে গোয়েন্দা সংস্থা রিপোর্ট দিয়েছিল, আওয়ামী লীগ জিততে পারে তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না।

আপনি কি জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে, প্রসিকিউটর ও তদন্ত সংস্থার বসার জায়গা নেই। ১০ জন প্রসিকিউরেটরের জন্য একটি বা দু'টি কক্ষ বরাদ্দ। তাদের সহায়তাকারী কোনো স্টাফ নেই। তদন্ত সংস্থায় আছেন বোধ হয় ১৭ জন, তার মধ্যে যোগ দেননি তিনজন। এরা বিভিন্ন পদমর্যাদার। এদের জন্য বরাদ্দকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষের সংখ্যা হবে গোটা দশেক। এদেরও সহায়তাকারী কোনো স্টাফ নেই। কোনো গবেষক নেই। ফরেনসিক ল্যাবরেটরি দূরে থাকুক, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়

সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। আপনি কি জানেন, বুকসেল্ফ আছে, কিন্তু বই নেই। কারণ বই কেনার টাকা রিলিজ করা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ বই, রেফারেন্স, ডকুমেন্টস ছাড়া বিচার হয়? ক্রুদ্ধ হতে পারেন আমার বন্ধুরা, কিন্তু এটা কি সত্যি নয় যে প্রসিকিউটরদের অধিকাংশ নিয়মিত অফিস করেন না। তাদের অনেকের ধারণা, এটি পলিটিক্যাল নিয়োগ। প্রসিকিউটরদের সম্মান ও বেতন তার জন্য বোনাস। তদন্ত সংস্থার সবাইও কি অফিস করেন? স্বল্প কয়েকজন তদন্তকারী ও প্রসিকিউটরদের কমিটমেন্টের কারণে এখনও সংস্থাটা টিকে আছে। আপনি কি জানেন কম্পিউটার আছে দু'টি এবং তাও প্রায় হ্যাং হয়ে যায়। জানেন কি কম্পিউটার অপারেটরের সংখ্যা মাত্র একজন। জানেন কি, রুটিন কাজ চালাবার মতো লোকও নেই। জানেন কি, এখনও এর সঙ্গে যারা জড়িত বিশেষ করে প্রসিকিউটরদের অনেকে মনে করেন, এগুলো নিম্নআদালতের মামলার মতো। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন, তিনি একটি টাইপরাইটারের সাহায্যে পাকিস্তান করেছিলেন। তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে দু'টি হ্যাঙ হয়ে যাওয়া কম্পিউটারের সাহায্যে যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পন্ন হবে। অন্যান্য আর কী নেই তার আর ফিরিস্তি দিয়ে ক্ষমতাবানদের বিরাগভাজন হতে চাই না। কল্পনা আকাশকুসুম একেই বলে।

সরকারের কাছে এসব সামান্য খবর থাকতে পারে কিন্তু প্রতিপক্ষ খুঁটিনাটি জানে। বিদেশে প্রবলভাবে তারা সরকারবিরোধী প্রচার চালাচ্ছে। তা প্রতিহত করার ক্ষমতা বা কমিটমেন্ট পররাষ্ট্র বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে আশা করা বাতুলতা। দেশে তারা সংহত হচ্ছে। তারা বুঝে গেছে, সামনের বছর থেকে সরকার আরও ব্যতিব্যস্ত থাকবে এবং সরকার ও সরকারপক্ষে বিভিন্ন কাঠামো জীর্ণ হয়ে পড়বে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন। সুপ্রীমকোর্ট বারের নির্বাচন। সুতরাং সংঘবদ্ধভাবে তারা মাঠে নামছে। আর এ কারণেই জামায়াত এখন সভা-সমাবেশের কথা ভাবছে। বিএনপি হরতাল দিচ্ছে এবং আমিনীরা হরতাল ডাকছে এবং অকথ্য ভাষায় সরকারকে গালিগালাজ করার সাহস পাচ্ছে। অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং আমি তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি না যে, সরকার যথাযথ মনোযোগ দিয়ে যদি কাজ করত এবং বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতো তাহলে অন্তত দুএকটা মামলা নিষ্পত্তি হতো। যদি অপরাধ প্রমাণিত হয়ে শাস্তি হতো তা হলে আজ আর আমিনী বা যুদ্ধাপরাধীরা লম্ফ দেয়ার সাহস পেত না। বিএনপিও এতো তরতাজা হতো না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বিষয়টি সরকার হাল্কাভাবে নিয়েছে। আমলাতন্ত্রে তো সরকারই তাদের অবস্থান শক্তিশালী করে দিয়েছে। যদি সরকার সতর্কতার সঙ্গে কাজ করত, তাহলে আজ এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।

এ পর্যন্ত সরকার যাদের গ্রেফতার করেছে সে ব্যাপারে সবাই সন্তুষ্ট।

কারণ,এদের প্রত্যেকেই যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সুপরিচিত। কিন্তু যে প্রশ্ন করছেন অনেকে যেমন একজনের বিচারেই কি কাজ শেষ হয়ে যাবে? নাকি এটি চলমান প্রক্রিয়া হয়ে থাকবে? কেউ জানে না। সংস্থার কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে ধারণা হয়েছে, সুপরিচিত কয়েকজনের বিচারের পরই তারা হাত খুলে ফেলবেন। তবে আমার ধারণা ভুলও হতে পারে।

রাম ছাড়া রামায়ণ হতো? যুদ্ধাপরাধের বিচার হবে অথচ গোলাম আযমের কোনো খবর নেই। পত্রিকায় দেখেছি তদন্ত সংস্থা তাকে অভিযুক্ত করার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণাদি যোগাড় করছে। কিন্তু সরকার তাকে গ্রেফতার করতে প্রস্তুত নয়।

সেই ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে গোলাম আযম বলেছিলেন. "কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যারা শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চাচ্ছেন, তাদের এ কথা জানা দরকার যে, তেমন কোনো শাসনতন্ত্র সফল হবে না এবং সে জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকেই দায়ী থাকতে হবে।

গণহত্যার পর গোলাম আযম সম্পর্কে পত্রিকায় প্রথম খবর পাই ৬ এপ্রিল। ৫ তারিখ নূরুল আমিনের নেতৃত্বে ১২ জন টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করেন। গোলাম আযম ছিলেন সেই কমিটির সদস্য। এই সাক্ষাতকারের পরই শান্তি কমিটি গঠিত হয় এবং গোলাম আযম হন তার তিন নম্বর সদস্য। শান্তি কমিট এরপর লুট, খুন, ধর্ষণ শুরু করে হানাদারদের সহযোগী হিসেবে। গোলাম আযম ছিলেন জামায়াত নেতা। জামায়াত ছিল পাকিদের সহযোগী। জামায়াতের ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা সবকিছু মিলিয়ে গণহত্যায় গোলাম আযমের ভূমিকা স্পষ্ট। তাকেই শ্রেষ্ঠ যুদ্ধাপরাধীর খেতাবটা দেখা যায়।

১৯৭১ সালে তার সম্পর্কে শেষ খবর পাই ৩ ডিসেম্বরের পত্রিকায়। ১ ডিসেম্বর লাহোরে তিনি বলেন, "জাতি আজ যে অবস্থা অতিক্রম করছে তাতে জাতির সামনে দুটো বিকল্প পথ খোলা আছে। একটি হলো সম্মানজনক মৃত্যু এবং আরেকটি হলো আল্লাহর দান হিসেবে বেঁচে থাকা।....যদি পূর্ব পাকিস্তান হারিয়ে যায় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানও নিরাপদ থাকবে না।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ওতপ্রোতভাবে এ ব্যক্তি জড়িত যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে। জিয়াউর রহমানের প্রিয়গান, "প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' মনে রেখে বলতে হয়– যুদ্ধাপরাধ প্রথম গোলাম আযম, শেষও গোলাম আযম। গোলাম আযমকে বিচার প্রক্রিয়ায় না আনলে এই বিচার বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হবে না আপনারা মনে করেন। সবাই তা তামাশা হিসেবেই নেবে।

এসব কারণেই বিএনপি, জামায়াত, আমিনীদের মনে হয়েছে এবং তারা বলেছে যে, সরকারের পক্ষে যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু সম্ভব হবে না। সম্ভাবনা

যেটুকু ছিল তা কলিতেই বিনষ্ট করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে আমিনীরা, জামায়াতীরা মাঠে নেমে দাপাচ্ছে। সরকারকে হুমকি নেয়ার সাহস রাখছে। আর তিন বছরের মাথায় সরকারের জবাব লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বহুদিন ধরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবির সঙ্গে আমরা যুক্ত। সাধারণ মানুষের ধারণা, দেশে এবং বিদেশে যে এর খবরাখবর সব আমরা জানি। এবং আমরা চাইলে এর কাজ ত্বরান্বিত করতে পারি।

বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, পথেঘাটে, সভা-সমিতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিদেশে, চেনাঅচেনা যার সঙ্গেই দেখা হয়, তার এখন প্রশ্ন বিচারটা হবে তো? আপনারা সরকারকে বলছেন না কেন, লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে কাজ এগিয়ে নিতে। আপনারা বললেই তো হয়। আমি আমাদের অগণিত শুভার্থীদের বলছি। সত্যিই সত্যি এই বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা কিছু জ্যানি না। সুনির্দিষ্টভাব সরকারের কেউ কিছু জানেন কিনা তাও জানি না।

সরকার প্রধানের কাছে সর্বশেষ আবেদন, যেহেতু আপনাকে ছাড়া এ দেশে কোনো কাজ হয় না এবং কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে নারাজ, সে কারণে আপনার কাছেই নিবেদন, একবার পর্যালোচনা করে দেখুন এই বিচার প্রক্রিয়া কোনো মরুপথে পথ হারালো। সেই মরুপথ থেকে নদীর ধারা উদ্ধারের দায়িত্ব আমাদের নয়, সরকারের। আমরা স্বেচ্ছাসেবক হতে পারি মাত্র।

পূর্ণগতিতে যদি যুদ্ধাপরাধী বিচার প্রক্রিয়া চলে, বিচার শুরু এবং একটি মামলাও শেষ হয় তা হলে দেখবেন খান্নাসদের মাঠ দাপানো কমে গেছে। যদি দাপায়ও আপনাদের পাশে অনেককে পাবেন তাদের প্রতিরোধে। এই বিশ্বাসটা রাখুন অন্তত। আর তা না হলে খান্নাসদের দাপট আরও বাড়বে এবং আপনারা যখন আবার তাদের প্রতিরোধের কথা, ভোট পাবার কথা, ক্ষমতায় যাওয়ার কথা ভাববেন তখন দেখবেন আশেপাশে অনেকেই নেই। কেউই থাকবে না। শুভার্থীরাও

৪ এপ্রিল, ২০১১

ইতিহাস খুন করে মিথ্যা প্রতিষ্ঠা করা যায় না

বুদ্ধিজীবীদের এদেশে এখনও একটা গুরুত্ব আছ। রাজনৈতিক দল যখন হালে পানি পায় না তখন প্রায় দলের নেতারা বলতে থাকেন, দেশ এখন ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। বুদ্ধিজীবীরা চুপ কেন? আওয়ামী লীগ, বিএনপি-দু'দলের ক্ষেত্রেই তা সত্যি। এবার জামায়াত থেকেই একই বক্তব্য দেয়ার পর গুরুত্বটা আরও বেশি অনুধাবন করছি। জামায়াত নেতা আজহার ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী দিবস পালন উপলক্ষে এক সভায় বলেছেন, 'আজকের বুদ্ধিজীবীরা যেন সরকারের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে যে কারণে জাতির এই ক্রান্তিকালেও তারা কোনো কথা বলছেন না' *(জনকণ্ঠ ১৫..১২.১০)*। জামায়াত ও যখন বুদ্ধিজীবী এবং তারপর বিজয় দিবস পালন করে তখন বলতে হবে বৈকি যে, আমরা একটি ক্রান্তিকালীন সময় পৌঁচেছি।

গত কয়েক বছর হঠাৎ জামায়াত বুদ্ধিজীবী দিবস পালন শুরু করেছে। কেন তা করছে তা বোঝার জন্য কৌটিল্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। সবাই জানে জামায়াত খুনী বা যুদ্ধাপরাধীদের দল। দাঁড়ি রেখে, টুপি-আলখাল্লা পরে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ও ইসলাম সম্পর্কে বুলি কপচানোর পরও এই সত্য থেকে যাচেছ যে জামায়াত নেতৃবৃন্দ ১৯৭১ সালে ব্যাপক খুন, লুট ও ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত যার কোনটিই ইসলাম অনুমোদন করে না। এ ছাড়া এর নেতৃবর্গ সবসময় মিথ্যা বলে যা ইসলাম কেন কোনো ধর্মই অনুমোদন করে না। এ ছাড়া এর নেতৃবর্গ সবসময় ইসলাম ইসলাম করে এবং অনুসারীও পায় তখন ধরে নিতে হয় আমাদের দেশে ভণ্ড, ফন্দিবাজ, মিথ্যাবাদী, লুট-ধর্ষণ অনুমোদনকারী লোকজনও বেশ আছে। বাসে উঠলে দেখবেন লেখা থাকে 'পকেটমার হইতে সাবধান।" সারাদেশে এরকম একটা ক্যাম্পেন করা উচিত 'জামায়াত থেকে সাবধান।

জামায়াত কেন হঠাৎ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন শুরু করল তা বোঝার জন্য কৌটিল্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। সবাই জানে জামায়াত যুদ্ধাপরাধী বা খুনীদের দল। ১৪ ডিসেম্বর পালিত হয় জামায়াতীদের কারণে। কারণ, বর্তমান জামায়াতি নেতারাই এই হত্যাককাণ্ড চালিয়ে ছিল। যুদ্ধাপরাধের কারণে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। বাংলাদেশে এমনটি হতে পারে তা তারা কখনও কল্পনাই করেনি। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হতে পারে। পাকিস্তানীমনা জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ ঘটালে জামায়াত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কারণ, জিয়া পাকিদের মতো দেখাতে চেয়েছিলেন ১৯৪৭-ই হচ্ছে

এ দেশের মূল ধারা। জিয়া এরশাদ বেগম জিয়ার কুশাসনের পর দেশে স্বাভাবিকতা ফিরছে, ক্রান্তিকাল তো বটেই। এবং বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের মাধ্যমে জামায়াত সেটি স্বীকার করে নিচ্ছে। কারণ, বুদ্ধিজীবী দিবস তো নীতিগতভাবে তাদের পালন করার কথা নয়। এর অর্থ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন না করলে বাংলাদেশে রাজনীতি করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটিও প্রমাণিত হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল এবং নিজামীর আলবদররাই এতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

আমরা যখন বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করি তখন তা শ্রদ্ধাভরেই করি এবং খুনী হিসেবে নিজামী-জামায়াত নেতারা তো আর তা বলতে পারে না। তাই জামায়াত কী বলছে শুনুন–

"এটিএম আজহারুল ইসলাম বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য তৎকালীন শাসক এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতকে দায়ী করে বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশকে পরনির্ভরশীল করে রাখতে তখন দেশের বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তিনি বলেন, যেসব বুদ্ধিজীবী স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন সেসব বুদ্ধিজীবকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আজহার বলেন, ১৯৭১-এর ১২ ডিসেম্বর ঢাকা ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলে থাকার পরও ১৪ ডিসেম্বর কিভাবে বুদ্ধিজীবী খুন হলো তা জাতি আজও জানতে পারেনি। এ নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা অনেক বড় বড় কথা বললেও এ ব্যাপারে তখন তাঁরা কোনো মামলা করেননি। স্বাধীনতার দীর্ঘ ২৫ বছর পরে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ এ বিষয়ে মামলা করেছেন। তা হলে স্বাধীনতার পর পরই মামলা করতে আওয়ামী লীগের কি সমস্যা ছিল?

বুদ্ধিজীবী হত্যার পিছনে যারা জড়িত ছিল তাদের বিচারের মুখোমুখি করার দাবি করেন জামায়াতের এই নেতা" *(জনকণ্ঠ, ১৫.১২.১০)*

আমরা জানি, ১৬ ডিসেম্বর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিরা তাদের সহোযোগী শক্তিসমূহকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। তাহলে ঢাকায় ১২ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী আসে কোত্থেকে। সে সময় ঢাকা ছিল পাকি সেনা ও জামায়াতী আলবদরদের দখলে। খুন যে তারা করেছে পরোক্ষভাবে জামায়াতীদের এক সময়কার কমান্ডার রাও ফরমান আলী তা স্বীকার করেছেন। আর মামলা হয়নি কে বলল? ১৯৭১-৭২ এর সংবাদপত্রগুলো দেখুন বা আমার লেখা (*মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র*-১, সুবর্ণ, ২০১০)। সে সময় জামায়াতী খুনিদের বিরুদ্ধে এসব কারণে অনেক মামলা করা হয়েছে, বিচার ও শাস্তি হয়েছে। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান যখন ১৯৭৫ সাল থেকে এ দেশে পাকি-রাজ প্রবর্তন করতে থাকেন, তখন এই খুনীদের মুক্তি দেন এবং এ কারণেই এখন আজহার মকবুলরা রাজনীতি করতে পারছেন।

এটিএম আজহার অধ্যাপক কবীর চৌধুরীসহ আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন, 'এখন যারা নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হিসেবে দাবি করেন,

তাঁরা সেদিন পাকিস্তানীদের পক্ষে কাজ করেছেন। এরকম অনেকেই এখন জামায়াতের বিরুদ্ধে কথা বলে মুক্তিযোদ্ধা বনে গেছেন। একই সঙ্গে দেশের বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, আজকের বুদ্ধিজীবীরা যেন সরকারের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। যে কারণে জাতির এই ক্রান্তিকালেও তাঁরা কোনো কথা বলেছেন না।" [ঐ]

কবীর চৌধুরী তখন ছিলেন বাংলা একাডেমীর পরিচালক। জামায়াতীদের কথানুযায়ী যখন পাকিরা ১৯৭১ সালে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মাথা তাক করে বন্দুক রেখে তাদের পক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষর নিচ্ছিল তখন একমাত্র কবীর চৌধুরী ও সুফিয়া কামাল তাতে স্বাক্ষর করেননি। এ কথা মুক্ত বুদ্ধির সবাই জানে। অস্বীকার করে শুধু হারামজাদারা। দেশে যারা ছিল তারা সবাই পাকিদের পক্ষে থাকলেও ৩০ লাখ খুন হলো কেন, ৪ লাখের ওপর ধর্ষিতও বা হলো কেন?

আজহারের ঔদ্ধত্য এখানেই শেষ হয়নি। স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সমালোচনা করে বলেছেন, শহীদ মিনার তৈরি করে শহীদদের ছোট করা হচ্ছে।' [ঐ] দেশে যেন শহীদ স্মৃতিশোধ না করা হয়। কারণ, শহীদ মিনার না থাকলে হত্যার স্মৃতি/চিহ্ন থাকে না। জামায়াতী ও পাকিরা যে হত্যাকারী মানুষ তা ভুলে যাবে। এ প্রসঙ্গে ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে, বধ্যভূমি ও তার স্মৃতি রক্ষণে দেয়া হাইকোর্টের আদেশ সরকার মানছে না। এবং তাই জামায়াতীরা এখন এসব মন্তব্য করতে পারছে।

অনেকে বলবেন, জামায়াতী-বিএনপিরা তো এ ধরনের কথা বলবেই। আমি বলব, বললে সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের মিথ্যাচারের, প্রতিবাদ জানাতে হবে। কারণ, মিথ্যাচারের, বিকৃতির প্রতিবাদ না জানানো অপরাধ। এ প্রসঙ্গে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, এখন সময় এসেছে ইতিহাস বিকৃতি সংক্রান্ত একটি আইন-প্রণয়নের। দেশের দুটি যুদ্ধাপরাধী দল বিএনপি ও জামায়াত যেভাবে দেশের ইতিহাস বিকৃত করার প্রচেষ্টায় নামছে তা দেশদ্রোহিতার শামিল। ইতিহাস বিকৃতিকে এখন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করার সময় এসেছে। ইতিহাস খুন করে মিথ্যা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পাকিস্তানীরা পর্যন্ত আজ ১৯৭১ সালের জন্য লজ্জিত হচ্ছে। কারণ, তারা বুঝেছে আমরা বিজয় দেখেছি, তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন বিজয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছি। পৃথিবীর আর কোথাও বিজয় দিবস নেই এবং এটাও ঠিক সে সব দেশে পরাজিতরা এতো ক্ষমতাধর হওয়া সত্ত্বেও ট্রাজেডি এখানে যে, তারা পরাজয় দিবস বলে কিছু ঘোষণা করতে পারছে না। আমরা সোল্লাসে বিজয় দিবস পালন করছি এবং তাদের বাধ্য করছি বুদ্ধিজীবী দিবস, বিজয় দিবস পালনে। এবং এ সত্য তুলে ধরতে পারছি যে, পরাজিত শক্তি কোনো দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে না। কারণ, আদর্শের যুদ্ধে সে আগেই পরাজিত।

২২ *ডিসেম্বর*, ২০১১

অতিনিরপেক্ষতা জনস্বার্থবিরোধী

ক্লাসরুমে ভাল শিক্ষক গেলে ক্লাসের পরিস্থিতি পাল্টে যায়। ছাত্ররা মনোযোগী হয়, বিদ্যা গ্রহণে আগ্রহী হয়। শিক্ষার মান এভাবে বৃদ্ধি পায়। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর ক্লাস করতে অনেকেই যেত যদিও তিনি ছিলেন বাংলার অধ্যাপক।

আদালতের অবস্থাও তাই। দু'পক্ষের আইনজীবী যদি অভিজ্ঞ ও নিজের বিষয়ে জানেন তাহলে আদালত কক্ষের পরিস্থিতিও পাল্টে যায়। নবীন বিচারকরাও অনেক কিছু জানতে পারেন, শিক্ষণীয় অনেক কিছু থাকে বিভিন্ন নজির স্থাপনে। আমি নিম্নআদালত থেকে উচ্চ আদালতের বিভিন্ন শুনানিতে গেছি। নিম্নআদালতের অবস্থা হতাশাজনক। উচ্চ আদালতের অবস্থাও এমন কিছু উজ্জ্বল নয়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের একটি শুনানিতে গিয়ে আমার এসব কথা ফের মনে হলো। প্রসিকিউশন নিয়ে আমাদের অভিযোগ ছিল। আইনমন্ত্রী আগে তাঁর সুরাহা করেননি বা করতে চাননি। স্কাইপি ঘটনায় অনেকে হতাশ। যে নিরাপত্তা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম সেগুলো সঠিক প্রমাণিত। এখন অনেকটা হ-য-ব-র-ল অবস্থা। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী কিসের ওপর ভিত্তি করে এত মন্ত ব্য করেন জানি না। প্রধানমন্ত্রীর হয়ত, হয়ত একটি ধারণা দেশের যাবতীয় বিষয়ে। এমনকি জনগণের মনের বিষয়ে তার খুব ভাল ধারণা আছে। অভিজ্ঞতায় বলব, ভাল ধারণা থাকতে পারে, অনেক বিষয়ে তাঁকে যে জানানো হয় না সেটি তাঁর ধারণার বাইরে। জেদ করে সব কিছু কার্যকর করা যায় না। কেউ পারেনি যদি না মানুষ সঙ্গে থাকে।

স্কাইপি ঘটনা জামায়াত-বিএনপি ষড়যন্ত্রের প্রথম সাফল্য। মীর কাশেম আলীর ২৫ মিলিয়ন ডলারের লবিস্ট নিয়োগ, বিএনপি-জামায়াতের দেশের ভেতর পুলিশের ওপর হামলা, ভাংচুর, পাকিস্তান-সৌদি-তুরস্ক লবির চেষ্টা কোন কিছুই সাফল্য এনে দেয়নি যা দিয়েছে স্কাইপি ঘটনা। এর জন্য কত টাকা খরচ করতে হয়েছে জানি না। তবে ঘটনাটি প্রথমে সবাইকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাগজে যা ছাপা হয়েছে [তা জাল না জুয়াচুরি জানি না] তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট– প্রসিকিউশনে ঝামেলা হচ্ছে। মামলা চলছে বটে, কিন্তু

শ্লথগতিতে। প্রসিকিউশনে নেতৃত্ব নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব হচ্ছে। এসব কিছুর, যদি অঘটন ঘটে, তবে বলাবাহুল্য আইন মন্ত্রণালয়ের ওপর দায়দায়িত্ব পড়বে এবং সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়কে তার অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভোগ করতে হবে। কেউ তাদের পাশে দাঁড়াবে না।

স্কাইপির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে স্বাভাবিকভাবে আসামি পক্ষ আরও ফায়দা লুটতে চেয়েছে। বিচারপতি নিজামুল হক পদত্যাগ করে সেই সুযোগটা বৃদ্ধি করেছেন। তারা রি-ট্রায়াল বা পুনর্বিচার চেয়েছে। বিএনপির মওদুদ আহমদ এই দাবি করেছেন। তাঁদের আরেক স্তম্ভ খন্দকার মাহবুব হোসেন হাইকোর্ট থেকেও নিজামুল হকের পদত্যাগ চেয়েছেন। এই নিয়ে আসামি পক্ষ ভোম্বা সাইজের নথিপত্র দিয়ে আবেদন করে। তারা যে কোনভাবে আর আট মাস বিচার প্রক্রিয়া ও রায় প্রদান স্থগিত রাখতে চায় বা শ্লথ করতে চায়। তাদের ধারণা, আগামী নির্বাচনে তারা জয়লাভ করবে। এবং তারপর ট্রাইব্যুনাল বাতিল করবে। এবং তখন তাদের 'অপমান' করার জন্য ট্রাইব্যুনালের উদ্যোক্তা ও জড়িতদের বিচার করবে।

গোলাম আযম, সাঈদীর মামলার পুনর্বিচারের শুনানিতে গিয়েছিলাম যুক্তিতর্ক শুনতে। নতুন কিছু জানা যায় কি না সে বিষয়েও আগ্রহ ছিল। এ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সরকারের পক্ষাবলম্বন করবেন। অন্যপক্ষে ব্যারিস্টার রাজ্জাকসহ বাকি আইনজীবীরা। আসামি পক্ষের মূল যুক্তি ছিল, বিচারক বাইরের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন; সেই 'বিশেষজ্ঞ' যেভাবে বলেছেন সেভাবে নিজামুল হক কাজ করেছেন, তিনি প্রসিকিউশনের সঙ্গে আলাদা আলাপ করেছেন। সুতরাং নির্দেশিত হয়ে তিনি কাজ করছেন। প্রমাণ হিসেবে তারা স্কাইপির কথোপকথন ও ই-মেইলের ভোম্বা প্রমাণপত্র দাখিল করে। এ্যাটর্নি জেনারেল এই প্রথম ট্রাইব্যুনালে এলেন কি না জানি না। আগে এলেও হয়ত সামান্য সময়ের জন্য এসেছেন। এবার এলেন দীর্ঘ শুনানিতে। সরকারপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি আসতে পারেন; কিন্তু এটি একদিকে তুলে ধরে প্রসিকিউশনের দুর্বলতা।

ব্যারিস্টার রাজ্জাকের যুক্তি আমি এখানে শুনিনি, তবে উচ্চ আদালতে তার যুক্তি আমি শুনেছি এবং আমার মনে হয়েছে জোরালভাবে এবং খুব শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেন। এবার শুনলাম মাহবুবে আলমের যুক্তি। এবং তখন আমার মনে হলো, প্রসিকিউশনে যদি তাঁর মতো আইনজীবী থাকতেন তাহলে এই বিচারের মান নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারতেন না, আইনের ব্যাখ্যার নতুন দিক উন্মোচিত হতো এবং আদালতের শুনানি উপভোগ্য হতো। কারণ আসামি পক্ষও তখন বাধ্য হয়ে সমমাপের আইনজীবী দিত। অবশ্য দিচ্ছেও। তাদের পক্ষে অনিয়মিত খন্দকার মাহবুব, রাজ্জাক, মওদুদ আসেন। বাদীপক্ষে

ওই মাপের কেউ আসেন না। এতে আমাদের কর্তাদের মনের দারিদ্র্য, সঙ্কীর্ণ চিন্ত া, অদূরদর্শিতা, অজ্ঞতা এবং উপযুক্ত পরামর্শ না নেয়ার প্রবণতা [যার ভিত্তি ঠুনকো দম্ভ] প্রকাশিত হয়েছে মাত্র।

আসামি পক্ষের আইনজীবীরা আবেগ, নাটক করে অনেক কথা বললেন, একই কথা বার বার বলতে লাগলেন একঘেয়ে সুরে। বিচারকরাও মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। তখন বুঝলাম, আইনজীবী বা বিচারক হওয়ার উচ্চাশা পোষণ না করে ভালই করেছি। আজেবাজে যুক্তিতর্ক শোনায় বিচারকদের অসীম ধৈর্য আমাকে শুধু বিস্মিত নয়, চমৎকৃত করেছে। আসামিদের মূল একটি বক্তব্য প্রায় দিন তিনেক শুনানি হয়েছে। মাঝে একদিন ব্যারিস্টার রাজ্জাক কিছু নজির দেখিয়ে যুক্তি স্থাপন করেছিলেন। মাহবুবে আলম মাত্র ঘণ্টা দুয়েক বললেন। আমার মনে হয়, শুধু আমি নই আসামিপক্ষও চমৎকৃত হয়েছিল। তিনি আসামিপক্ষের যুক্তিগুলো তো নস্যাত করলেনই বরং আসামিপক্ষ কী অন্যায় করেছে সেটিও তুলে ধরলেন। তখনই মনে হলো, আইনজীবী ও বিচারকের দক্ষতা নির্ধারণ করে আদালতের মান।

মাহবুবে আলম যখন যুক্তি উপস্থাপন করছিলেন তখনই বোঝা গেল ব্রিফ আদ্যোপান্ত পড়ে এসেছেন তিনি। আগে এ আদালতে এলে আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক দেখে তা মনে হতো না। তিনি আসামিপক্ষের মূল যুক্তির বিপক্ষে দুটি কথা বললেন। অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিধিতেই আছে, বিচারপতি দেশে-বিদেশে যে কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন। শুধু তাই নয়, এ আদালতেই বিচারপতিকে বার বার বলেছেন, আইনটি নতুন; সুতরাং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য সব পক্ষের সঙ্গেই প্রয়োজনে আলোচনা করতে হবে। আমার মনে আছে, আমি যখন গোলাম আযমের মামলায় সাক্ষ্য দিতে যাই, তখনও তিনি খোলা আদালতে একই মন্তব্য করেছিলেন। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও বাধ্য হয়ে বলেছিলাম, যে প্রক্রিয়ায় আদালত চলছে তা ফৌজদারী আদালতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আন্তর্জাতিক আদালতের আইনের সঙ্গে নয়। এখানে জনান্তিকে বলে রাখি, আইনটি যথেষ্ট ছিল। বিচারকদের এত বিধি তৈরি যথার্থ হয়নি। তখন বিচারপতি নিজামুল হক বলেছিলেন, 'ট্রায়াল এ্যান্ড এরর' পদ্ধতিতেই আমরা এগোচ্ছি। তখন সবাই বিষয়টি এপ্রিসিয়েট করেছেন। এখন আসামিপক্ষ উল্টো কথা বলছে। আসলে বিচারপতি হকের সারল্য তাঁর কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জামায়াত কী জিনিস সে বিষয়ে তাঁর সম্যক কোন ধারণা নেই।

এ্যাটর্নি জেনারেল বললেন, সুতরাং বিচারপতি যদি কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলেও থাকেন সেটি আইনের অন্তর্গত। এক্ষেত্রে ব্যারিস্টার রাজ্জাকের নজিরগুলো যে অপ্রাসঙ্গিক তাও তুলে ধরেন। তাছাড়া যে চার্জশীট নিয়ে তাঁরা

আপত্তি তুলছে সেটিও তো যথার্থ নয়। আসামিপক্ষের দাবি ছিল চার্জশীট বাইরে থেকে লিখে দেয়া হয়েছে। এ সময় বিচারপতি ফজলে কবির বলেন, চার্জশীটের খসড়া তো তাঁর নিজের লেখা। আসলে মূল আইনে চার্জশীট নিয়ে এত ঝামেলা নেই। মাহবুবে আলম হেসে বললেন, আসামিপক্ষের ধারণা এত বিশাল নথি কে পড়বে। কিন্তু আমি পড়েছি। মিলটা কোথায় বলুন? তারপর প্রায় আধাঘণ্টা অমিলগুলো তুলে ধরলেন। তারপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন যা আমরা আইনজীবী না হয়েও গত তিন বছর বলে আসছি। মাহবুবে আলম বললেন, টিক্কা খানের সঙ্গে আলোচনারত গোলাম আযমের একটি ছবিই এই আইন অনুযায়ী তাকে অভিযুক্ত করার জন্য যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, তদন্ত কর্মকর্তারা ১৯৭১ সালে গোলাম আযমের বিভিন্ন কার্যাবলী ও বক্তব্যের যে ডকুমেন্টেশন ও ইনডেক্স করে দিয়েছে তাতে তো এত সাক্ষীসাবুদ আর শুনানির দরকার পড়ে না। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের কোন পক্ষ এই আইনের মূল স্পিরিটটা নিতে চায়নি। বাদী ও আসামিপক্ষের ফৌজদারী আদালতের মনোভাব ও বিচারকদের অতিনিরপেক্ষতা দেখানোর প্রবণতা বিচার প্রক্রিয়া শ্লথ করেছে। এ প্রসঙ্গে শাহরিয়ার কবিরের একটি মন্তব্যের উল্লেখ করছি। কোন এক টকশোতে তিনি এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়াস করিম ছিলেন। আমি টকশোতে খুব একটা যাই না এবং দ্রুত ঘুমিয়ে পাড়ি দেখে তা দেখাও হয় না। কয়েকজন বললেন, ড. পিয়াস করিম খুবই স্মার্ট এবং ঝকঝকে বুদ্ধিজীবী। তাঁর মতো এত সুন্দর করে জামায়াতের পক্ষে জামায়াতীরাও বলতে পারবে না। তা ওই দিনের টকশোতে এই স্কাইপি নিয়েই বোধহয় কথা হচ্ছিল। শাহরিয়ার এক পর্যায়ে বলেছিলেন যে চুরি করে, চোরাই মাল রাখে, বিক্রি করে এবং কেনে সবাই অপরাধী। এটা কমনসেন্সের ব্যাপার। এটি আমার কাজের বুয়াও জানে; তার জন্য ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে হয় না।

এ্যাটর্নি জেনারেল আরেকটি যুক্তি দিয়েছিলেন। সাইবার ক্রাইম দেশী ও বিদেশী আইনে অপরাধ। স্কাইপি পয়সার বিনিময়ে চুরি করা হয়েছে হয় ঢাকা না হয় ব্রাসেলস থেকে। সেটি আদালতে পেশ করা তো অপরাধ।

এই বিষয়টি নিয়েও আমরা লেখালেখি করেছি। দৈনিক আমার দেশে কয়েক দিন ধরে স্কাইপির কথোপকথন প্রকাশিত হয়েছে। এটি অপরাধ। এই অপরাধের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সাংবাদিকরা প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে দাবি তোলেন। পরামর্শ দেন, কিন্তু সংবাদপত্রের এই সাংবাদিকরা সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে টু শব্দটিও করেননি। অর্থাৎ তাঁরা নিরপেক্ষ তো ননই, বরং নিজেদের অপরাধ এড়িয়ে যেতে চান। আর সরকারে, সাংবাদিকদের মাঝে মাহমুদুর রহমানের নিশ্চয় অনেক লোক আছে। যেমন মীর কাশেমের মানি লন্ডারিংয়ের

ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়, রাজস্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক বা দুদক- সবাই নিশ্চুপ। যিনি ২৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করতে পারেন বিদেশে তিনি ১ মিলিয়ন হয়ত ঢাকায়ও খরচ করেছেন। শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কালোদের কিনতে খরচ কম লাগে।

এ্যাটর্নি জেনারেল যা বলেছেন এবং যেভাবে বলেছেন তা পুরো আদালত নিশ্চুপে শুনেছে। আর আমার মতো প্রান্তিক মানুষের চোখেও ধরা পড়েছে, প্রসিকিউশনের ঘাটতি। ওই পর্যায়ে যুক্তিতর্ক করা তাদের পক্ষে দুরূহ। আর পড়াশোনা তো আরও কষ্টকর।

সুতরাং স্কাইপি হামলায় সরকারের বিচলিত হওয়ার কিছু ছিল না; তবুও হয়েছে যেহেতু তাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কম, সমন্বয়ও নেই। আর তাদের হয়ত ধারণা, অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করলে যদি নিজের কৃতিত্ব হ্রাস পায়!

এরপর দেখি, খন্দকার মাহবুব বার কাউন্সিলের নেতা হিসেবে হাইকোর্টের জজ পদে থেকেও নিজামুল হকের পদত্যাগ চান। কারণ নৈতিকতা। তা খন্দকার মাহবুবের নৈতিকতা কতটুকু? ১৯৭৩ সালে রাজাকারদের বিরুদ্ধে তিনি কোর্টে দাঁড়িয়েছেন। আর এখন দাঁড়াচ্ছেন রাজাকার-আলবদরদের পক্ষে। আসলে আমাদের মধ্যে খবিশদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে স্যুট-কোট পরা লোকদের মধ্যে। যার নৈতিকতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই তিনি দাবি তোলেন বিচারকের পদত্যাগের।

এ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, আসামিপক্ষের আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন ১৯৭৩ সালের দালাল আইনে যাদের বিচার হয়েছিল তিনি তখন প্রসিকিউটর ছিলেন। দালাল আইনে বিচারে প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পালন করে তিনিই আজ কিভাবে আসামিপক্ষ হয়ে শুনানি করতে আসেন এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এ্যাটর্নি জেনারেল।

মাহবুবে আলম বলেন, দালাল আইনে যাদের বিচার হয়েছিল তারা ’৭১-এ অপরাধ করেছিল ব্যক্তিগতভাবে। আর এখন যাদের বিচার করা হচ্ছে তারা অপরাধ করেছে দলের নেতা হিসেবে। ক্ষমার বিষয়ে খন্দকার মাহবুব হোসেনের উক্তির প্রতিউত্তরে মাহবুবে আলম বলেন, তিনি কি বলতে চান চোরের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে তাই বলে কি ডাকাতির অপরাধের বিচার হবে না। *জনকণ্ঠ* ১-১-১৩

ট্রাইব্যুনাল আসামি পক্ষের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্ন তো মানুষ করতে পারে, পুনর্বিচারের আইন যেখানে নেই সেখানে শুনানি কেন হবে? চোরাই মাল আদালতে পেশ করলে তা অপরাধ হবে না কেন? এবং যারা এ কাজটি করেছে তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেয়া হবে না? চোরাই ই-মেইল ও স্কাইপি আদালতে পেশের অনুমতি ও শুনানি সাইবার ক্রাইমকে প্রশ্রয় দেয়া হলো

কি না? এই যে মূল্যবান সময়টুকুর অপচয় হলো এর দায়দায়িত্ব নেবে কে? ট্রাইব্যুনাল-২ সময়ক্ষেপণের জন্য কাদের মোল্লাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে একটি ভাল নজির স্থাপন করেছে।

এত ঘটনার পরও ট্রাইব্যুনালের অবকাঠামোগত উন্নয়নে, যে কাঠামো তিন বছর আমাদের চিৎকারের পর এবং বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আমলে অনুমোদিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর তাঁর সচিবালয়ে আটকে রাখা হয়েছিল শোনা গেছে ২৭ দিন এবং তারপর অর্থসচিব আটকে রেখেছেন। একই পরিণাম হয়েছে আইন মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে। জনপ্রশাসনের কোন কর্মকর্তা জনবল কেটে দিয়েছেন। এখানে জনবল যে মিনিমাম, কাটার উপায়ও নেই এ কথা তাদের বোঝানো দুষ্কর। দুঃখও হয় শেখ হাসিনার জন্য, এমন সব লোকদের দিয়ে কাজ করাতে হয় যারা গাধা ও গরুর পার্থক্যও বোঝে না। প্রসিকিউশনে নাকি নতুন যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে দুজন বিএনপিপন্থী এবং একজন ব্যারিস্টার মওদুদের জুনিয়র। এতে অনেকেই ক্ষুব্ধ। স্কাইপির ঘটনার পর এটিকে স্যাবোটাজ মনে করেন অনেকে। নিরাপত্তা ব্যবস্থারও পদ বাদ দেয়া হয়েছে স্কাইপি এবং তুরস্কের ঘটনার পরও। ট্রাইব্যুনালের তিন বছর পরও যদি অবকাঠামো উন্নয়নের অবস্থা এমন হয় তখন মন্ত্রী থেকে কর্মকর্তার সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। জামায়াত যে পরিমাণ টাকা বিলাচ্ছে বলে শুনছি সে কারণেও যুদ্ধাপরাধ বিচারের প্রক্রিয়া বার বার থেমে যাচ্ছে কি না কে জানে! আরও আছে, যদি রায় সরকারের পক্ষে যায় তাহলে অপর পক্ষ সুপ্রীমকোর্টে যাবে। এই প্রসিকিউশন দিয়ে আর যাই হোক সুপ্রীমকোর্টে লড়া যাবে না। এবং বিচারের রায় যদি না হয় এবং হওয়ার পর তা যদি কার্যকর না হয় তাহলে কোন কর্মকর্তার বা মন্ত্রীর কিছু হবে না। কিন্তু শেখ হাসিনা অনেক কিছু হারাবেন। এর মধ্যে একটি হলো মানুষের বিশ্বাস। তাঁর ওপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে। পিতা হারানোর মতোই শোকাবহ ঘটনা হবে এটি।

এত কিছু বলার পরও আমরা তাঁর কর্মক্ষমতা ও ট্রাইব্যুনালের ওপর বিশ্বাস হারাতে চাই না। চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে পারলে এখনই আবার সবার মনোবল চাঙ্গা হয়ে উঠবে। স্কাইপিতে নাকি বিচারক হক বলেছিলেন, সরকার রায়ের জন্য পাগল হইয়া গেছে। তিনি সামান্য ভুল করেছিলেন। জামায়াত-বিএনপি ছাড়া সারাদেশের মানুষই রায় শোনার জন্য পাগল হয়ে গেছে। তাদের আর্তির কারণেই মন্ত্রীদের রায়ের বিষয়ে বিভিন্ন বক্তব্য দিতে হচ্ছে যা তাদের দেয়া উচিত নয়।

আসামিপক্ষের বিচার শ্লথ করার প্রক্রিয়া এবং তাতে প্রশ্রয় দেয়ায় মানুষ খুব ক্ষুব্ধ। বিচারপতি নিজামুল হক যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করলেও আসামিপক্ষকে

এত বেশি সুযোগ দিয়েছেন, যে কারণে সময়ের অনেক অপচয় হয়েছে। বিদ্যমান আইনেও আসামিপক্ষকে অনেক সুবিধা দেয়া হয়েছে যা এ ধরনের আন্তর্জাতিক কোন আইনে নেই। নিরপেক্ষতা ভাল। কিন্তু অতিনিরপেক্ষতা জনস্বার্থবিরোধী। এ দেশের মানুষ ক্ষেপ্‌লে কী করবে তা কেউ বলতে পারে না। এ কথা আমাদের জন্য যেমন, তেমনই প্রধানমন্ত্রী থেকে বিচারক সবার জন্যই প্রযোজ্য। নুরেমবার্গ বিচারে বিচারকরা ৯ মাসে ২৪ জনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন এটি যেন আমরা মনে রাখি।

১৬ জানুয়ারি, ২০১৩

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আইন ও বিচার বিশ্বে মানবতাবিরোধী বিচারের মান নির্ধারণ

রাজশাহীর মতো শিবির-অধ্যুষিত জায়গায় এমন একটি আলোচনাসভা নির্বিঘ্নে শেষ হতে পারে, তাও আবার খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তা অনেকের কল্পনার বাইরে ছিল। বিষয়টি ছিল গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ। স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল। কানায় কানায় তা প্রায় পূর্ণ। আয়োজক ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ। প্রধান বক্তা ছিলেন মফিদুল হক ও শাহরিয়ার কবির। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন শিক্ষক থেকে নবীন কর্মকর্তা, আগ্রহী যুবক, মধ্যবয়সী পেশাজীবী সবাই ছিলেন। আইবিএসের কৃতিত্ব এই যে, এ বিষয়ে কোন বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত কোন আলোচনা সভা করেনি। তারা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আর কী বলব! এগুলো এখন আমলাতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে। দুয়ার তার বন্ধ। আদর্শের স্থান এখন ছাত্রলীগ বা ছাত্রদলের আদর্শের মতো স্বল্প। একটি উদাহরণ দিই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হটানো থেকে [সব ভিসি যে উত্তম কাজ করছেন তা তো নয়] অন্যান্য আন্দোলনে আওয়ামী-বিএনপি-জামায়াত শিক্ষকরা একজোট হয়ে যাচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের অবদান ছিল প্রভূত। অথচ একটি জরিপ করে দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সবচেয়ে কম গবেষণা করেছেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। যুদ্ধাপরাধ বিচার ও তা বানচালের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাদের গলার স্বর খুব কমই শোনা যায়। ইতিহাস বিভাগগুলিতে বাংলাদেশ বিষয়ক কোর্সে ১৯৭১ সালের পর পড়ানো হয় না, যদিও ৪০ বছর হয়ে গেছে। কারণ, পড়ালে যদি জিয়া-এরশাদের নষ্টামির কথা পড়াতে হয়। আর কাকে কী বলবেন! জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট গত আওয়ামী আমলে খোলা হলো। শেষের দিকে তা বন্ধ করে দেয়া হলো। এই আওয়ামী আমল প্রায় শেষ, কিন্তু সেই ইনস্টিটিউট ইচ্ছে করে আর খোলা হলো না।

আলোচনাসভায় মফিদুল হক ও শাহরিয়ারের প্রাঞ্জল আলোচনা আমাদের অনেক কিছু বুঝতে সহায়তা করেছে। মফিদুল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনটির ইতিহাস ব্যাখ্যা করছিলেন। কীভাবে বঙ্গবন্ধু আমলে আইনটি হয়েছিল এবং তাকে সাংবিধানিক সুরক্ষা দেয়া হয়েছিল। শাহরিয়ার যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক তার

গ্রন্থে অবশ্য বিস্তৃতভাবে তা আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন দেশের মানবতাবিরোধী ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে একটি তুলনামূলক আলোচনা করে মফিদুল দেখালেন, আমাদের ট্রাইব্যুনাল কীভাবে অন্যগুলোর থেকে বৈশিষ্ট্যময় এবং ভাল। অপরাধীর রায় নিয়ে আমরা বিচলিত ও অধৈর্য। মফিদুল জানালেন, কম্বোডিয়ার ট্রাইব্যুনালের ৭ বছর হয়ে গেল, একটি বা দু'টি রায় তারা মাত্র দিতে পেরেছে। রুয়ান্ডার অবস্থা এর থেকে উত্তম নয়। আজ পর্যন্ত সরকারের নীতি নির্ধারকদের কেউ বা মন্ত্রীবর্গ–কেউ এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

বিচারের মান নিয়েও আলোচনা হয়েছে। শাহরিয়ার বললেন, মার্কিন একজন পররাষ্ট্র সচিব কয়েকদিন পর পর জামায়াত লবিংয়ের কারণে এখানে এসে বিচারের স্বচ্ছতা ও মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আমেরিকা তো রোম স্ট্যাচুটরই স্বাক্ষর করেনি। গুয়ানতানামোর বিচার নিয়ে [আটক ও নির্যাতন] কথা তুললে আমেরিকার উত্তর কী হবে? মফিদুল হক একটি মন্তব্য করেছিলেন যা আমাদের ভাল লেগেছে, তা হলো ১৯৭৩ সালের আইনটি পরে অনেক দেশ ও আন্তর্জাতিক আদালত মডেল হিসেবে নিয়েছে। এই আইনে ধর্ষণকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা আগে কখনও করা হয়নি। এই আইনে আসামি পক্ষকে যে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে তা অন্য কোন দেশের আইনে নেই। এই আইনে দণ্ডপ্রাপ্তকে সুপ্রীমকোর্টে আপীলের সুযোগ দেয়া হয়েছে যা যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক কোন আইনে নেই। এত স্বচ্ছতা কোথাও নেই। আমাদের কিছু লেফটি ও মধ্যরাতের বুদ্ধিজীবী ও সুজন প্রায়ই বলেন, বিচারে আপত্তি নেই, বিচার স্বচ্ছ হতে হবে। অবিকল বিএনপির নেতাদের ভাষা। আমরা আগেও বলেছি, বিচার এত স্বচ্ছ হচ্ছে যে, বিচারকরা এত ধৈর্য দেখাচ্ছেন যে, আসামি পক্ষকে এত সুযোগ দেয়া হচ্ছে যে, বিচার প্রক্রিয়া শ্লথ হয়ে যাচ্ছে। মফিদুল আরও বললেন, এই আইন ও বিচার বিশ্বে একটি মান তৈরি করবে। আমরাও তাই মনে করি। যদি ট্রাইব্যুনালকে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা ও নিরাপত্তা দেয়া হতো তা হলে এই খাতে শেখ হাসিনা অনেক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু তা করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়। নির্মূল কমিটি বার বার দাবি করছে ট্রাইব্যুনালকে স্থায়ী রূপ দিয়ে আইন পাস করে তা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে এবং সাক্ষী সুরক্ষা আইন পাস করতে। শ্রোতাদের অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন, জামায়াত বিএনপি বা সামরিক সরকার এলে তো ট্রাইব্যুনাল বাতিল করে দেয়া হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না। তখন কী হবে? বিভিন্ন সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, সাক্ষীরা এখন সাক্ষী দিতে আসছেন না। আসতে চাচ্ছেন না। কারণ, তারা আশঙ্কা করছেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন তাদের যেভাবে হুমকি দিচ্ছে জামায়াত-বিএনপির নেতা কর্মীরা,

আওয়ামী লীগ না থাকলে অবস্থা কী হবে! ১৯৭১ সালে কোনরকমে জান বাঁচলেও এবার তো আর তা বাঁচবে না। সুরক্ষা আইন করতে সরকারের অসীম উদাসীনতা অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। মীর কাসেম আলীর ডলার কি এদিক ওদিক দিয়েও সরকারের কারো পকেটে যাচ্ছে? অবস্থা এখন কেমন তার একটি উদাহরণ দিই। এই জনকণ্ঠের রাজশাহী সংবাদদাতা আলোচনাসভায় আমার বক্তব্য উল্লেখ করে জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন [মানে আমি] যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই। এটি ছাপা হলে আপনারা নিশ্চয়ই ভাবতেন কাসেম আলীর ডলার আমার পকেটেও গেছে।

আলোচনাসভায় গণহত্যার সংজ্ঞা, সংখ্যা ইত্যাদি নিয়েও অনেক আলোচনা হয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চার ধারা পরীক্ষা করলে দেখব, বেশি লেখা হয়েছে যুদ্ধ নিয়ে। বীরত্ব নিয়ে। গণহত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন, নারী লাঞ্ছনা নিয়ে লেখা হয়েছে কম। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, তা মনস্তাত্ত্বিক। চিরদিন আমরা শুনে এসেছি বাঙালী ভীরু, কাপুরুষ, বুজদিল। সেই বাঙালী দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ একটি সশস্ত্র বাহিনীকে হারিয়ে দিল! এর চেয়ে অসামান্য কাহিনী আর কী হতে পারে? বাঙালী বীরের জাতি। সুতরাং বীরত্ব গাথা অমর করে রাখতে হবে। কিন্তু সময়ের ধারে বীরত্ব গাথা এক সময় ক্ষয় হয়ে যায়। কিন্তু নিপীড়ন, অপমান, লাঞ্ছনা, হত্যার কাহিনী মানুষ মনে রাখে।

ইউরোপে ফ্যাসিবাদ বা নাজিবাদের উত্থান আর হলো না কেন? এর একটি কারণ গণহত্যা, ধর্ষণ, নিপীড়ন, সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ নিয়ে অসংখ্য এবং অসাধারণ সব চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, গ্রন্থ লেখা হয়েছে। হ্যাঁ, বীরত্বব্যঞ্জক চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। কিন্তু ঐ অপমান-নির্যাতন মানুষকে বার বার মনে করিয়ে দেয় নাজী বা ফ্যাসিস্টরা এলে কী হতে পারে! আমাদের এখানে নিপীড়ন, লাঞ্ছনা বা ধর্ষণের ঘটনা চেপে রাখা হয়েছে-বর্ণিত হয়নি। গণহত্যার কথা ধরুন। বঙ্গবন্ধু ৩০ লাখ শহীদের কথা বলার পর তা ব্যাপক প্রচার পায়। অ্যাপলজিষ্টরা বলেন, বঙ্গবন্ধু তো ইংরেজী খুব একটা বুঝতেন না। কী বলতে কী বলে ফেলেছেন। আমি বলি, পাকিস্তান আমলে আইন পরিষদে বঙ্গবন্ধু ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করেছেন। বাংলায় আত্মজীবনী লিখেছেন। এরকম ইংরেজী অনেক সার্টিফিকেটধারীও বলতে পারেন না। অনেক শিক্ষক, হ্যাঁ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে বলছি, ও রকম বাংলা লিখতে পারবেন না। থ্রি মিলিয়ন বা ত্রিশ লাখ শহীদের কথা প্রথম লেখে প্রাভদা। আমি গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি, এ সংখ্যা ৩০ লাখের বেশি হবে। ধর্ষিতার সংখ্যা ধরা যাক। এক সময় বলা হতো ৪ লাখ। এখন তা কমে হয়েছে দুই লাখ। নেতাজীর নাতনি পাকিস্তানীদের পোষ্য শর্মিলা নামে এক মহিলার হিসাব-হাজার তিনেক। আমার গবেষণায় দেখেছি এ সংখ্যা ৬

লাখের মতো। কেন গণহত্যা ও ধর্ষণের সংখ্যা নিয়ে লুকোচুরি বা প্রশ্ন তোলা? এর কারণ, পাকিস্তানী ও তার সংযোগীদের অপরাধটা খাটো করে দেখা। শাহরিয়ার যেমন এক টক শোতে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধ বিচার এখন এমন একটি পর্যায়ে যখন বিভিন্ন ব্যক্তি বা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান উচ্চ স্বরে বলছে, এই সরকারের আমলে যত হত্যা, খুন গুম হয়েছে তা আর কখনও হয়নি। অর্থাৎ ১৯৭১ সালেও এমনটি হয়নি, আওয়ামী লীগ আমলে যা হয়েছে। এসব কিছুর পেছনে একটি রাজনীতি আছে। সেই রাজনীতিটা হলো, মনোজগত থেকে মুক্তিযুদ্ধের আধিপত্যটা হ্রাস করা। জিয়া-গোলাম আযমকে স্থান করে দেয়া।

আমার মনে হয়েছে, গণহত্যার ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন, নারী লাঞ্ছনা নিয়ে ছোট ছোট এলাকা ধরে কাজ করা। আশার বিষয় অনেক তরুণ এ ধরনের কাজ করছেন। এগুলো মুক্তিযুদ্ধকে বোঝার, মুক্তিযুদ্ধের জন্য যে আত্মত্যাগ এসব বিষয় তুলে ধরবে। এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াস একত্রিত করে পরে গণহত্যা ও নির্যাতন নিয়ে বিশাল জাতীয় দলিল প্রস্তুত করা যাবে। অধ্যাপক ফায়েক উজ জামান খুলনার একটি পরিবার নিয়ে এরকম একটি প্রবন্ধ পড়লেন যা আমার ভালো লেগেছে। শুধু তাই নয় আমি তো বটেই, আমাদের অনেকে মনে করি, ১ মার্চ বা ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হোক। পাকিস্তান বাহিনী ১ মার্চ থেকে হত্যা শুরু করে। ১-২৫ মার্চ পর্যন্ত তারা প্রায় ৩০০ জনকে হত্যা করে। নির্মূল কমিটিও ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালনের আহ্বান জানিয়েছিল।

আজ বিচার প্রক্রিয়া, বিচার নিয়ে জাতি দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীর কোন দেশে যুদ্ধাপরাধ বিচার নিয়ে মানুষ বিভক্ত হয়নি। এবং বিএনপি-জামায়াতের নেতারা, মিডিয়ার মালিকরা সূক্ষ্মভাবে স্থূলভাবে ঢালাওভাবে বিচারের বিরোধিতা এবং যারা বিরোধিতা করছে তাদের সমর্থন করছে। কিন্তু তৃণমূল মানুষ বা লুঙ্গিপরা মানুষরা কী ভাবছে?

আমি দু'একটি উদাহরণ দিই। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের যত ছবি দেখবেন, তাতে দেখবেন মুক্তিযোদ্ধারা সব লুঙ্গি পরা। আমার প্রয়াত ছাত্র তারেক মাসুদ। মুক্তিযুদ্ধের কথা নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিল। সেখানে একটি দৃশ্য আমার মনে গেঁথে আছে। এক ইউনিয়নে এক কৃষককে তারেক মাসুদ মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের উত্থান নিয়ে প্রশ্ন করছিলেন। কৃষকটি একটু স্মিত হেসে বললেন, 'আমাদের ইউনিয়নে চেয়ারম্যান বানাইছি এক রাজাকারকে যার ভয়ে আমরা পলাইয়া থাকতাম। তো দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যদি আমরা একজন রাজাকারকে চেয়ারম্যান বানাই তা হইলে তো আমরা কুত্তা হইয়া গেছি? কী বলেন?' ভোট দিয়ে এলাকার লোকেরা এ কাজ করেছে, তিনি নিজে হয়ত এর

সঙ্গে যোগ দেননি। কিন্তু এ রকম একটি কাজ যে হলো তাতে তার নিজেকে কুকুরের মতো মনে হচ্ছে। এখন টিভিতে যখন দেখেন বিএনপি-জামায়াত লেফটি সুজন সুশীলরা নানাভাবে বিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখন তাদের তৃণমূল কীভাবে দেখে তা হয়ত অনুধাবন করবেন।

বেশ কিছুদিন আগে আমি এক মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিকথা পড়েছিলাম। এ মুহূর্তে লেখকের নাম মনে পড়ছে না। ছাত্রাবস্থায় তিনি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন এক সুবাদার। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে ছিলেন। অবসর নিয়ে গ্রামের বাড়িতে বসবাস করছিলেন, স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও এক নাতনিকে নিয়ে। প্রশিক্ষককে সবাই 'ওস্তাদ' বা 'স্যার' বলে সম্বোধন করে। তো সুবাদার যোদ্ধাদের বলেছিলেন তাকে 'ওস্তাদ' বা 'স্যার' বলা যাবে না। মুক্তিযোদ্ধারা জিজ্ঞেস করলেন তা হলে কী নামে তাকে সম্বোধন করতে হবে। তিনি বললেন, 'হারামজাদা'। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে ঐভাবে সম্বোধন করতে পারতেন না। 'ওস্তাদ' বললে তিনিও সাড়া দিতেন না। তবুও দিন চলছিল। এক বৃষ্টির দিনে লেখক তাকে ভুলে 'ওস্তাদ' ডেকে ফেললেন। এই 'ভুলের' জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হলো। শাস্তি শেষ হওয়ার পর লেখক বললেন, তারা মুক্তিযোদ্ধা স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে এসেছেন। তাদের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ বিধেয় নয়। সুবাদার যদি 'হারামজাদা' বলার রহস্য ভেদ না করেন তা হলে তারা প্রশিক্ষণ নেবেন না।

সুবাদার জানালেন, তাদের গ্রামে তখনও বড়সড় কোন হামলা হয়নি। কিন্তু একদিন গোলাম আযমের অনুচররা পাকিস্তানী সৈন্যদের তার বাড়ি দেখিয়ে দেয়। সুবাদার হিসেবে তখন সে টার্গেট। সেনাবাহিনী এসে তাকে কাঠের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে। ছেলে বাধা দিতে গেলে তাকে গুলি করে হত্যা করে। মা তখন এগিয়ে গেলে তাকে ধর্ষণ করে হত্যা করে। তারপর পুত্রবধূকে ধর্ষণ করে হত্যা করে। কিশোরী নাতি তখন খালি আকুল হয়ে 'দাদা' 'দাদা' বলছিল। তাকেও ধর্ষণ করা হয়। সুবাদার চোখে পানি নিয়ে বলেছিলেন, আমি কিছু করতে পারি নাই। কিছু করতে পারি নাই। আমি হারামজাদা না কি মানুষের বাচ্চা?

টিভিতে যারা বলে এত বছর পর বিচার কেন, টিভিতে যারা বলে বিচার স্বচ্ছ হতে হবে; মওদুদ বা খোন্দকার মাহবুব বা রাজনৈতিক নেতারা এখন যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থনে এগিয়ে যায়, এ প্রজন্মে যে যুবক তরুণী তাদের সমর্থনে মানববন্ধন করে, যে সব এ্যাকাডেমিশিয়ান এ বিষয়ে বলে নিরপেক্ষ থাকতে হবে বা এগুলো রাজনৈতিক ইস্যু, হে পাঠক, তারা কি মানুষের বাচ্চা?

ধর্ষণের কথা বলি। ১৯৭২ সালের বীরাঙ্গনাদের কেসস্টাডিগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত এর ৮০টি আমি পেয়েছি যা নিয়ে ফেব্রুয়ারিতে একটি বই প্রকাশিত হচ্ছে। সেখানকার একটি কেস স্টাডির কথা বলি।

মেয়েটি থাকত ধানমণ্ডিতে বাবা-মার সঙ্গে। মে মাসের দিকে সে নিউমার্কেটে গিয়েছিল কিছু কেনাকাটা করতে। তারপর সে ফিরে আসে। কিন্তু গোলাম আযমের অনুচররা তাকে অনুসরণ করে বাসা চিনে যায়।

রাতে পাকি ও গোলামের অনুচররা বাসা ঘিরে ফেলে। কিশোরীটিকে তুলে নিয়ে যায় ক্যান্টনমেন্টে। সেখানে তাকে প্রতিদিন ৬/৭ জন ধর্ষণ করত। নিয়মিত খাবার দিত না। মেয়েটি মরণাপন্ন হয়ে ওঠে। তখন তারা তাকে তার বাবা মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। কিশোরীটি মাস দুয়েক পর সুস্থ হয়ে ওঠে তখন গোলামের অনুচররা আবার পাকিদের নিয়ে আসে। এবার তারা বলে, প্রতিদিন বিকেলে তারা মেয়েটিকে নিয়ে যাবে এবং সকালে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। বিজয়ের আগ পর্যন্ত এরকমটি চলে।

এখন যারা যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থন করে তাদের মা-বোন, স্ত্রী বা কন্যাকে যদি প্রতিদিন বিকেলে নিয়ে সকালে ফেরত দিত তাহলে কি তারা বিচার চাইত? আপনারা ভাববেন এটি রাগের কথা। না, আমার মনে হয় তারা খুশি হতো। কারণ মা বোন স্ত্রী কন্যাকে তো পাকিস্তানীরা ভোগ করছে। তাদের কাছে এটি সম্মানের, গর্বের।

বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় এলে ঠিক এই কাজটিই করবে। মওদুদ, খোন্দকার, মাহবুব, তরিকুলের মতো প্রাক্তন লেফটি টকশোর লেফটি মিডিয়ার লেফটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাধিকার বলে বুদ্ধিজীবীদের কাছে তা উপভোগ্য? আপনার কাছে? এদের আপনি কী বলে সম্বোধন করবেন? তৃণমূল যেভাবে সম্বোধন করে সেভাবে। সুবেদার তার স্ত্রী, পুত্রবধূর সম্মান বাঁচাতে পারেনি বলে নিজেকে হারামজাদা বলে; আর যারা এটি সমর্থন করে তাদের মতো হার্ডকোর হারামজাদা পাওয়া দুষ্কর।

পুরনো কথায় ফিরে আসি। মফিদুল, শাহরিয়ার যেভাবে আইন-আদালতের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাতে সবাই উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। সরকারের কোন মন্ত্রী বা সরকারদলীয় কোন নেতা এত পরিচ্ছন্নভাবে যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেননি। তাদের কথা শুনে যে সবাই হাসাহাসি করে এটি বোঝার ক্ষমতাও তাদের নেই। ট্রাইব্যুনাল করে এ সরকার অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছে বটে, কিন্তু ট্রাইব্যুনালের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে মনে হয়, মানুষ তেমনভাবে না চাইলে তারা এটি করত না। বিএনপি-জামায়াতের জনসমর্থন মিডিয়ার মতে বাড়তে পারে। তাতে কিছু আসে যায় না। শিবির-অধ্যুষিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শাহরিয়ার, মফিদুল বা যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে যদি এত মানুষ আগ্রহ সহকারে শুনতে আসে তাহলে বুঝতে হবে এই বিচার প্রক্রিয়া চাইলেই বন্ধ করা যাবে না। করলে বাংলাদেশ গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হবে।

২০ জানুয়ারি, ২০১৩

বাচ্চু রাজাকার মামলার রায় ইতিহাসের অধিকার ফিরে পাওয়া

মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের প্রথম ধাপ ইতিহাসের ন্যারেটিভ। ১৯৪৭ সালের আগে ভারতের মুসলিম নেতারা ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন। তারা মুসলমান নৃপতিদের কথা তুলে ধরেছেন যারা শৌর্যে-বীর্যে ছিলেন অতুলনীয় এবং মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, ভারতীয় মুসলমানরা তাদেরই বংশধর। ইসলামী শাসকদের আমল ছিল স্বর্ণযুগ। ব্রিটিশ ও হিন্দুদের চক্রান্তের কারণে আজ তারা হীনবস্থায়। এই অবস্থা থাকবে না যদি মুসলমানদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা হয়। ইতিহাসের এই ব্যবহার মুসলমান তরুণদের সংগঠনে ভূমিকা রেখেছিল এবং পাকিস্তান মানসিকতা তৈরি করেছিল। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, পাকিস্তান : ইসলাম। ভারত : হিন্দু।

এই ন্যারেটিভ ভাঙতে বিপরীতে বঙ্গবন্ধুকে সোনার বাংলার মিথের কথা বলতে হয়েছিল। নানা বঞ্চনার কথা তুলে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সংহত করেছিলেন। পোস্টারে লেখা হয়েছিল– 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?'

১৯৭১ সালের বিজয়ের পর দাঁড়াল বাঙালিদের রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এই রাষ্ট্র সেক্যুলার। এই রাষ্ট্রে থাকবে সিভিল কর্তৃত্ব। এই রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা আছে ৩০ লাখ শহীদ, ৬ লাখ বীরাঙ্গনা, অগনন আহত– প্রায় সব বাঙালির আত্মত্যাগ, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং সবশেষে তাজউদ্দীন আহমদের বাংলাদেশ সরকার। ন্যারেটিভের অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং স্বাধীনতাবিরোধীরা পরিত্যাজ্য।

জিয়াউর রহমান ও সামরিক বাহিনী, এরশাদ ও সামরিক বাহিনী এবং খালেদা জিয়া আবার এই ন্যারেটিভ বিনষ্ট করতে চেয়েছেন। জিয়া ১৯৪৭ সাল ফিরিয়ে আনলেন। অস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে এই ন্যারেটিভ চাপিয়ে দিলেন। বলা হলো, ধর্ম প্রধান, রাষ্ট্র হবে ধর্মীয়; এই রাষ্ট্র হবে মুসলমানদের, রাজাকার আর আলবদরা কেন পরিত্যাজ্য হবে? তারা আমাদের সহযাত্রী, অর্থাৎ ১৯৭১ সালে হত্যা ধর্ষণ কিছুই হয়নি। এই তত্ত্বে নতুন প্রজন্মকে বিশ্বাসী করার জন্য শান্তি কমিটির সদস্যকে প্রেসিডেন্ট, স্বাধীনতাবিরোধী দালালদের প্রধানমন্ত্রী, সিনিয়র মন্ত্রী; রাজাকার, আলবদরদের সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী বানানো হলো। গত ৩০ বছর এই

তিনজন এ কাজটি করেছেন। দুটি নতুন প্রজন্ম এই ন্যারেটিভে বিশ্বাস করে। পুরনোদের অনেকে এটি মেনে নিয়েছে। যেটা মুক্তিযুদ্ধপন্থীরা জানে না কিন্তু বিরোধীরা জানে, তা হলো, ইতিহাসের সূত্র ছিন্ন করে দিতে হবে যাতে মনোজগতে ইতিহাসের সত্য স্থান না পায়, যেটি করা হয়েছে পাকিস্তানে। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, শেখ হাসিনা সরকারও এ বিষয়ে একমত পোষণ করে স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রম থেকে ইতিহাস হটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বলা হচ্ছে– তারা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী। কপাল আমাদের! ইতিহাসের অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল, আর সেই অধিকার যাতে আমরা ফিরে না পাই সে ব্যবস্থাই করা হলো ২০১২ সালের বিজয়ের মাসে ইতিহাস বাদ দিয়ে!

এই পটভূমি দিতে হলো, দীর্ঘ হলেও একটি কারণে। আমরা যা হারিয়েছিলাম তা আইনগতভাবে আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচার বিষয়ক ট্রাইব্যুনাল। এর আগে বিচারপতি খায়রুল হকও দুটি রায়ে ১৯৭১ সালের ন্যারেটিভকেই সত্য বলেছিলেন, কিন্তু তার দিকে দৃষ্টি পড়েছে কম। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এখন দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সব ধরনের রাজনীতির জন্য। ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও অন্যরা আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু রাজাকারের মামলার রায় দিয়েছেন। অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায় হিসেবে দেশ-বিদেশে এ নিয়ে আগ্রহ ছিল। বিচারপতিত্রয় নিরাশ করেননি। আঁটোসাঁটো একটি রায় দিয়েছেন, যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আদৃত হয়েছে। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি এই রায়টিকে বহুমাত্রিক মনে করি।

২.

এই রায়ে প্রথমেই বাঙালিদের ইতিহাসের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিক্রম করেছে। এ পথ পরিক্রমা ছিল যন্ত্রণাময়, রক্তাক্ত, স্বেদ ও আত্মত্যাগের। সমসাময়িক ইতিহাসে মুক্তির জন্য বাঙালিরা যে দাম দিয়েছে আর কোন জাতি তা দেয়নি।

[Undeniably the road to freedom for the people of Bangladesh was arduous and torturous, smeared with blood, toil and sacrifices. In the contemporary world history, perhaps no nation paid as dearly as the Bengalees did for their emancipation.]

অর্থাৎ ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এত মানুষ শহীদ হলেন কী ভাবে? তাদের হত্যা করেছে পাকিস্তানী সেনা এবং তাদের সহযোগীরা। এই সহযোগী শক্তি কারা? এরা হলো রাজাকার, আলবদর প্রভৃতি। এবং এরা প্রায় সবাই উদ্ভূত জামায়াতে ইসলামী থেকে। এভাবে বিচারের আওতায় চলে আসে পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগীরা। এভাবেই চলে আসে

সংগঠন হিসেবে জামায়াতে ইসলামী। আর এভাবেই পুনরুজ্জীবিত হয় ১৯৭১ সালের ন্যারেটিভ, যা ভুলিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল বিএনপি-জামায়াত ও তাদের সমমনারা। এ কারণে তারা ইতিহাস বিকৃত করেছিল রাষ্ট্রীয় দলিলে, পাঠ্য বইয়ে। ন্যারেটিভ সঠিক হলে, জামায়াতে ইসলামী যে হত্যাকাণ্ড, নিপীড়ন, ধর্ষণ চালিয়েছিল তা আসতে হবে। সে প্রশ্ন এলে বিচারের প্রশ্ন আসবে। যে কারণে, নির্মূল কমিটির আন্দোলনে বার বার বাধা দেয়া হয়েছে; মিথ্যা মামলা দিয়ে শাহরিয়ার কবির ও আমাকে গ্রেফতার, রিমান্ড ও জেলে দেয়া হয়েছে; জাহানারা ইমামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা হয়েছে। এ কারণেই জিয়াউর রহমান ও বিএনপি নেতারা বলেছেন, কবে কি হয়েছে তা ভুলে যেতে হবে, ভুলে যাওয়া উচিত, দেশের উন্নয়নে সমন্বয়ের রাজনীতি প্রয়োজন। আমরা বলেছি, অপরাধীর শাস্তি না হলে ৩০ লাখ শহীদের আত্মদান তুচ্ছ হয়ে যায়, তাদের ও আমাদের অপমান করা হয়। ৬ লাখ বীরাঙ্গনাকে অপমান করা হয় আর খুনের বিচার তো তামাদি হয় না। বিচারকরাও সেই সত্যের প্রতিধ্বনি করেছেন– আমাদের ভোলা উচিত নয় যে, লাখ লাখ ভিকটিমের পাওনা তাদের নিপীড়কদের শাস্তি। সময়ের স্রোত অপরাধ মুছে দেয় না। আন্তর্জাতিক অপরাধ যখন বিচার প্রক্রিয়ার অধীনে আনা হয় তখন বলা যেতে পারে বিচারের দেরি হওয়াটা আর বিচার বঞ্চিত নয়।

[We should not forget it that the millions of victims who deserve that their tormenters are held accountable; the passage of time doesnot diminish the guilt. Therefore, justice delayed is no longer justice denied, particularly when the perpetrators of core international crimes are brought to the process of justice.]

এভাবে মুক্তিযুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় রায়ে। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এ সত্য যে, জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতাবিরোধী দল এবং তার সমর্থক-কর্মীরা যে অপরাধ করেছে তার বিচারও বাঞ্ছনীয়। এভাবে আমরা ইতিহাসের অধিকার ফিরে পাই।

জামায়াতে ইসলামী মানবতাবিরোধী/যুদ্ধাপরাধীদের দল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাজি পার্টি ছিল এরকম একটি দল। নুরেমবার্গ মামলায় চারটি সংগঠনেরও বিচার হয়েছিল। ট্রাইব্যুনাল যখন গঠিত হয় তখন আমরা বলেছিলাম, দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীরও বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। তখন কেউ কর্ণপাত করেননি। নির্মূল কমিটি দু'যুগ ধরে বলে আসছে, জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি, জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা হোক। স্বাভাবিকভাবেই কেউ কর্ণপাত করেননি। বঙ্গবন্ধু করেছিলেন, তাঁর সে সাহস ও দূরদর্শিতা ছিল। জিয়াউর রহমান জামায়াতকে সিদ্ধ করলেন এ কারণে যে, পাকিস্তান সৌদি অক্ষ, যার প্রতিভূ জামায়াত–তারা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যায় সাহায্য করেছে। আর জিয়া তো পাকিস্তানবাদ

প্রতিষ্ঠা করতে চান, জামায়াত ছাড়া তাকে কে সেই দর্শন শেখাবে? তাছাড়া দেশ ও জাতিকে দু'ভাগ করা ছিল তার রাজনৈতিক লক্ষ্য, যাতে এক ভাগের 'রাজা' হতে পারেন তিনি। আর বঙ্গবন্ধু যা করেছেন তা নস্যাত না করলে তার স্থান থাকে কোথায়? সে কারণে, জামায়াত ও জামায়াতী দর্শন সিদ্ধ হলো। দেশ বিভক্ত হলো স্বাধীনতার পক্ষ-স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তিতে।

২০০৮ সালের নির্বাচনের সময় যখন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের প্রশ্ন এলো, তখন, অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে নির্মূল কমিটি একটি স্মারকলিপি দিয়েছিল জামায়াতকে নিবন্ধন না দেয়ার আহ্বান জানিয়ে। কারণ, মানবতাবিরোধী অপরাধের দল ছাড়াও নিবন্ধনের শর্ত তারা পূরণ করছিল না। নির্বাচন কমিশন তখন অবৈধভাবে জামায়াতকে নিবন্ধন দিয়েছিল। কোন রাজনৈতিক দল তার প্রতিবাদ করেনি।

জামায়াতকে যাতে নিষিদ্ধ না করা হয় সে জন্য, এ্যাপলজিস্টরা একটি যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। তা হলো, জামায়াত আন্ডারগ্রাউন্ডে গেলে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল হবে। জামায়াত ষড়যন্ত্রে বিশ্বাসী একটি দল। আন্ডারগ্রাউন্ড, ওভারগ্রাউন্ড যেখানেই থাকুক না কেন জামায়াত ষড়যন্ত্র করবেই। মৌলবাদী জঙ্গী প্রায় ১০০টি সংগঠন আছে যা আন্ডারগ্রাউন্ডে এবং তারা কোন না কোনভাবে জড়িত জামায়াতের সঙ্গে। জঙ্গীদের দমন তো এ সরকার ভালভাবেই করেছে। ওভারগ্রাউন্ডে থেকে কি জামায়াত নাশকতামূলক কাজ করছে না? ২০১২ সালের শেষ থেকে এখন পর্যন্ত যে পুলিশ হত্যার জন্য আক্রমণ, গাড়ি ভাংচুর ও জ্বালিয়ে দেয়া, দাঙ্গা, বোমাবাজি—এগুলো কি জামায়াত/বিএনপি করছে না?

ট্রাইব্যুনালের এই রায়ের ফলে, এই প্রশ্নটি আবার চলে এসেছে সামনে। যুদ্ধাপরাধীদের একটি দল কীভাবে রাজনীতি করবে? রাজনৈতিক দলগুলো অবশ্য বাস্তবতার দোহাই তুলবে। কিন্তু নৈতিক প্রশ্নটি তো থেকেই যাবে। কারণ, রায়ে বলা হয়েছে: যখন মুক্তিযুদ্ধ চলছে তখন কিছু বাঙালি বিহারী, পাকিস্তানপন্থী, ধর্মভিত্তিক দলের সদস্য, বিশেষ করে জামায়াত এবং এর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে পাকিস্তানী মিলিটারির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বা সহযোগিতা করে। এবং তারা প্রায় সবাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন [গণহত্যা, ধর্ষণ] করেছে।

[And most of them committed and facilitated the commission of atrocities in violation of customary international law in the territory of Bangladesh.]

আর জে রুমেল নামে একজন গবেষক একটি বই লিখেছেন যার নাম-

'স্ট্যাটিসটিকস অব জেনোসাইড এ্যান্ড মাস মার্ডার সিন্স ১৯০০।' তিনি লিখেছেন, আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ও তার জেনারেলরা পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক এলিটদেরও হত্যা করতে চেয়েছিল। তারা হিন্দুদের নির্দিষ্টভাবে হত্যা করতে চেয়েছে আর বাকিদের ভারতে ঠেলে দিতে চেয়েছে। তারা বাঙালিদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে যাতে কমপক্ষে আরেক জেনারেশন তারা পশ্চিম পাকিস্তানের অধস্তন থাকে।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের মিলিটারিদের সঙ্গে মিলে এ কাজটি করেছে। তাদের ক্ষমা করবেন কী ভাবে? তাদের রাজনীতি করতে দেবেন কী ভাবে? জামায়াত এখনও মুক্তিযুদ্ধ স্বীকার করেনি। তাই গ্রেফতারের আগে পর্যন্ত আলবদরের ডেপুটি আলবদর আলী আহসান মুজাহিদ সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, এ দেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই।

৩.

এ রকম একটি দেশে, যে দেশে বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা বলে কিছু নেই, সে দেশে মানবতা [যুদ্ধাপরাধ] বিরোধী অপরাধের বিচার হবে সে কথা কেউ ভাবেনি। অবশ্য, বলতে পারেন, যেখানে সত্য-মিথ্যার ধার ধারে না কেউ, সে রকম দেশেই হয়ত এটি সম্ভব। কিন্তু কেন যেন মনে হয়, যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতে ইসলামী ও খুনীদের সমর্থনকারী বিএনপি স্বপ্নেও ভাবেনি যে, এরকমটি হতে পারে বা হবে। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি।

আলবদর নিজামী একবার এক টিভি সাংবাদিককে আলোচনার জন্য বাসায় আসতে বলেছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন। আলোচনার পর নিজামী তাকে খেয়ে যেতে বললেন। সাংবাদিক রাজি হলেন না। ঠাণ্ডা পানীয় অফার করলেন। তাও তিনি গ্রহণ করলেন না। নিজামী বললেন, আপনি কি আমাকে ঘৃণা করেন? দেখেন, আগামী ১৫ বছর পর আমরাই–এই জামায়াতে ইসলামীই সব নিয়ন্ত্রণ করবে, বিএনপিও থাকবে না। সাংবাদিক যে কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বলতে পারেননি ভয়ে, তা' হলো, আলবদর আবার মানুষ হলো কবে? আর জামায়াত যখন সব নিয়ন্ত্রণ করবে তখন দেশত্যাগ করব।

নিজামীর কথা কিছুটা হলেও ফলেছে। জামায়াত ক্ষমতায় এসেছিল। বিএনপি আছে; এখন তারা জামায়াতের কমান্ড কাউন্সিলের অধীন। এদের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা বিএনপির কারও, এমনকী খালেদা জিয়ারও নেই। কিন্তু, সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বদলে জামায়াত নেতারা জেলে থাকবেন সেটি বোধহয় তাদের কল্পনায়ও ছিল না। জামায়াত-বিএনপি কি ভেবেছিল, যুদ্ধাপরাধ বিচার করার কথা? দেশটাকে তো তারা হাফ পাকিস্তান বানিয়ে ফেলেছে। সেখানে আবার কে এই বিচার করবে? ট্রাইব্যুনাল গঠিত হওয়ার পর বিষয়টি তারা সিরিয়াসলি

নেয়নি। বিচার শুরু হওয়ার পরও ভেবেছে, আওয়ামী লীগ পাঁচ বছর ধরে এ বিচার চালাবে [ট্রাইব্যুনাল সরকারের কথামতো চলে না এ ধারণা কারও নেই] নির্বাচনে সুবিধা পাওয়ার জন্য। কিন্তু, নির্বাচনে তো তারা আসবে না। সুতরাং এসব ট্রাইব্যুনাল তখন থাকবে না। বেগম জিয়া তো নাকি ঘোষণা করেছেন ক্ষমতায় গেলে এসব বিচার-টিচার হবে না। কিন্তু, বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যে রায় হয়ে যাবে এটি তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। যুদ্ধাপরাধীদের দু'টি দলের নেতাদের বক্তৃতায় বিষয়টি স্পষ্ট। নতুন কোন বক্তব্য তারা দেননি। আশঙ্কা করা হয়েছিল, গাড়ি ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, বোমা বিস্ফোরণ অনেক কিছু হতে পারে। কিছুই হয়নি।

অন্যদিকে এই রায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষদের উজ্জীবিত করেছে। মিছিল হয়েছে, কোলাকুলি, মিষ্টি খাওয়া হয়েছে। ৪০ বছরের সংগ্রামে হঠাৎ রায় এক ধরনের অবসাদও এনে দিয়েছে অনেকের মনে। আনন্দাশ্রু অনেকের চোখে। মৃত্যুর আগে খুনীদের বিচার দেখে যাওয়া যাবে এটি অনেকেই ভাবেননি। সবাই আশা করছেন, দ্রুত আরও কিছু রায় হবে; তারপর দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ আপীলে যাবে এবং তারপর তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ রায় কার্যকর হবে।

এ রকম ভাবনা- চিন্তার কারণ কী? কারণ আর কিছুই না, দায়মুক্তি। বাংলাদেশে দায়বদ্ধতার বদলে দায়হীনতা বা দায়মুক্তির বিষয়টি শুরু হয়েছে জেনারেল জিয়ার আমলে। শুধু শুরু হয় তিনি সেটা ভালভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। জামায়াতীদের মুক্তি দিয়ে, রাজনীতি করতে দিয়ে, ক্ষমতায় বসিয়ে। একই কাজ করেছেন তার শিষ্য এরশাদ ও তার পত্নী খালেদা জিয়া। শুধু তাই নয়, সপরিবারে বঙ্গবন্ধু ও চার নেতাকে যারা খুন করেছিল তাদের সবাইকে রাষ্ট্রীয় পদ দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পৃথিবীর কোন দেশে এরকম অভাবনীয় ও জঘন্য কাণ্ড কেউ ঘটায়নি। সভ্য দেশে কেউ ভাবতে পারে না যে, হত্যাকারীর বিচার হবে না। শুধু তাই নয়, মারাত্মক যে কাণ্ডটি করা হয়েছিল তা'হলো, সংসদে আইন করে খুনীদের দায়মুক্তি দেয়া হয়েছিল।

এর অর্থ সামরিক শাসকরা এ বার্তা দিতে চেয়েছেন জামায়াত ও বঙ্গবন্ধুর খুনীদের পুনর্বাসন করে যে, খুন করা ধর্ষণ করা লুট করা অগ্নিসংযোগ করা, এথনিক ক্লিনজিং- কোন কিছুই অপরাধ নয়। জিয়া তো এ পথে এসেছিলেন, এরশাদও। আর স্বামীর দল বিএনপির কাণ্ডারী খালেদা জিয়া তো এর বাইরে যেতে পারেন না। সমাজে এভাবে ভায়োলেন্স ছড়িয়ে দিয়েছিল এই দায়হীনতা। রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে রাজনীতিতে যাওয়ার জন্য ওই খুনীদের ব্যবহার শুরু করে, রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। এর উদাহরণ জিয়াউর রহমানের আমল থেকে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমতা দখলের জন্য সেনাবাহিনীতে

বিভিন্ন ক্যু, জামায়াত-বিএনপি আমলে শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য প্রকাশ্যে গ্রেনেড হামলা, জঙ্গীদের প্রশ্রয় দান। বাংলাদেশকে খুনীদের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছিলেন জেনারেল জিয়া।

বিচারহীনতা থেকে বিচারমুখিতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেন শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে। ইনডেমনিটি বাতিল করা হয়, বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে দেয়া রায় কার্যকর হয়। এবারও, আগেই বলেছি, এই রকমটি হবে কেউ ভাবেনি। কিন্তু হয়েছে। বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, মুজিবুর রহমান মিঞা ও শাহীনুর ইসলাম প্রদত্ত রায়ে বিচারমুখিনতা ও দায়হীনতা বন্ধের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, এ সংস্কৃতি চলতে পারে না; কারণ, বিচার না হওয়া দেশের রাজনৈতিক এবং পুরো জাতির মনস্তত্ত্বে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। এই দায়হীনতা সৃষ্টি করেছিল রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার এবং ধ্বংস করেছিল শাসনতন্ত্র।

[The perpetrators of the crimes could not be brought to book and this left a deep wound on the country`s political psyche and the whole nation. The impunity they enjoyed held back political stability was the ascend of militancy and destroyed the nations constitution.]

আমরা অনেকবার বলেছি, জামায়াতী সংস্কৃতির কারণেই দেশে মৌলবাদ জঙ্গীবাদের সৃষ্টি এবং বিকাশ। কারণ, জঙ্গীদের অধিকাংশ জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও জামায়াতী দর্শনে বিশ্বাসী এবং তারা দেখেছিল গণহত্যা, গণধর্ষণ, গণঅগ্নিসংযোগ, গণলুটপাটে কোন শাস্তিই হয় না, বরং ক্ষমতায় যাওয়া যায়। এই প্রত্যয় গত প্রায় চার দশক বাংলাদেশের মানুষের মনোজগতে গেঁথে দেয়া হয়েছে। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য এটি যথেষ্ট। বিএনপি-জামায়াত তো বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়নি। তারা চেয়েছে এবং চাইছে পাকিস্তানবাদের প্রতিনিধিত্ব করতে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের রেশ খানিকটা থাকলেও এটি সম্ভব হবে না। সেজন্য তারা বাঙালি প্রত্যয় ধ্বংসের জন্য এ প্রত্যয় চেয়েছে। সংবিধানও বিনষ্ট করতে চেয়েছে; কারণ, ১৯৭২ সালের সংবিধান বাঙালি জাতি ও রাষ্ট্রের মৌলিকত্ব ধারণ করে। যে কারণে জিয়াউর রহমান প্রথমে এসেই ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌলিকত্ব বিনষ্ট করলেন। মুক্তিযুদ্ধ বদলে করলেন স্বাধীনতা যুদ্ধ।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারকরা বিশেষভাবে দায়হীনতার উল্লেখ করেছেন। এই রায়/বিচার সমাজে বিচারহীনতা থেকে বিচারমুখিনতা সৃষ্টি করবে। এই রায় বাঙালির মৌলিকত্ব ঘোষণা করে ইতিহাসে আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশী শব্দ সংবিধানে প্রোথিত করে জিয়াউর রহমান ইতিহাসে আমাদের

অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন।

এই বিচারহীনতা কী ভাবে প্রভাবিত করে মনস্তত্ত্ব? ২০০১-০৬ সালে বিএনপি-জামায়াত যখন ক্ষমতায় তখন ১৯৭১ সালের মতো বিরোধী দলের ওপর নিপীড়ন নেমে এসেছিল; জেল, হত্যা, ধর্ষণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং এথনিক ক্লিনজিং শুরু হয়েছিল। আমি জানি না কেন আমরা ইতিহাসের সূত্রগুলো ভুলে যাই। মাহফুজ আনাম খুব সুন্দরভাবে একটি বাক্যে লিখেছেন– বঙ্গবন্ধু-উত্তরকালে আমাদের সংগ্রামের সাংস্কৃতিক দিকটি কখনও আমাদের মনস্তত্ত্বে আসেনি।

[The cultural aspect of our struggle never occupied thinking of the post-Bangabandhu regimes.]

৪.

এই রায়ের একটি পরোক্ষ দিক বিবেচনায় আনা বাঞ্ছনীয়। ১৯৭১ সালের বিভিন্ন দিক যারা অস্বীকার করেছে তারা ইতিহাসকে অস্বীকার করছে। সবচেয়ে বড় কথা, যারা অপরাধী তাদের যারা কারাগার থেকে মুক্ত করে ক্ষমতায় বসায় তারাও তো অপরাধী। অর্থাৎ জিয়া যখন জামায়াতকে অবমুক্ত করেন, আলবদর রাজাকারদের ক্ষমতায় বসান তখন তো তিনি এক ধরনের অপরাধই করেন। এরশাদও একই কাজ করে অপরাধ করেন। খালেদা জিয়া অপরাধী ব্যক্তিকে নয়, অপরাধী দলটিকেই ক্ষমতায় আনেন সেটি তো আরও অপরাধ। বিচারহীনতা বা দায়হীনতার বিষয়টিকে আরও এগিয়ে নেয়া যায়। বঙ্গবন্ধুকে যারা খুন করল সেই আত্মস্বীকৃত খুনীদের জিয়া-এরশাদ-খালেদা রাষ্ট্রীয় পদে আসীন করে বিদেশ পাঠালেন, সংসদ সদস্য করলেন। যেই তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ হলো তার হত্যাকারীদেরও জিয়া এরশাদ খালেদা সমর্থন করলেন। বেগম জিয়া ১৫ আগস্ট তাঁর জন্মদিন ঘোষণা করলেন। মনে হলো, তিনি বঙ্গবন্ধুর রক্তে স্নান করে তৃপ্ত হলেন। দেখুন, দায়হীনতা মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়

স্বাধীনতার চার বছরের মাথায় এই যে কাণ্ডগুলো হলো তাতে জাতি লজ্জিত হলো না। এদেখে একবার লিখেছিলাম, এক অনিচ্ছুক জাতিকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা জিয়ার অনুসারী হলেন, বামপন্থীরা অনুগামী হলেন। খন্দকার মাহবুব হোসেন ১৯৭২ সালে জামায়াতের দালালদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আদালতে মামলা লড়েছেন। এখন খালেদা জিয়ার নির্দেশে তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধীদের পক্ষে লড়ছেন। দায়হীনতা এভাবে নির্লজ্জতার সৃষ্টি করে। আমরা যে দীর্ঘদিন বিচারহীনতা ও দায়হীনতাকে সমর্থন করেছি সেজন্য আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

মাহফুজ আনাম আরও বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, এই নির্লজ্জতা হচ্ছে

সমষ্টিগত লজ্জা বা 'কালেকটিভ শেম'। তিনি লিখেছেন, এভাবে পরিকল্পিতভাবে মানুষের মন থেকে বঙ্গবন্ধু ও ঐ আমলের নেতৃত্বকে তারা মুছে ফেলতে চেয়েছে। এমন একটা সময় ছিল যখন আমরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনী না বলে শুধু হানাদার বাহিনী বলেছি। যে বিষয়টি আগে উল্লেখ করেছি, রায়েও বলা হয়েছে, সেটি মাহফুজও বলছেন, আমাদের সংগ্রামের গুরুত্ব ও বিস্তৃতি সচেতনভাবে গুরুত্বহীন করা হয়েছে। এর কারণটি তারা উল্লেখ করেননি; কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সংগ্রামের গুরুত্ব দিলে বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের নায়ক হয়ে ওঠেন। একজন মেজরের সেখানে স্থান কোথায়?

এই রায় পরোক্ষভাবে ঘোষণা করেছে– অপরাধীকে অবমুক্ত করে, প্রশ্রয় দিয়ে ঐ তিনজন অপরাধ করেছেন। আর কিছু না হোক, নৈতিক মানদন্ডে তো তারা দায়ী বা অপরাধী। এই রায়ের এটিই গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৫.

মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচারের জন্য যখন ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়, তখন থেকে তাদের বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের সব পক্ষ থেকেই বিদ্যমান ফৌজদারি মামলার ধারণা দূর করতে সময় লেগেছে। বিচার যতই এগিয়ে চলেছে ততই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। বিএনপি সরাসরি যুদ্ধাপরাধী মানবতাবিরোধী দল জামায়াতকে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে ট্রাইব্যুনাল বানচাল ও অভিযুক্তদের মুক্ত করার জন্য। ফৌজদারি আইনেও অপরাধীকে কেউ আশ্রয় দিলে সেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে। এখন আইন কর্তৃক স্বীকৃত ১৯৭১ সালের খুনীদের দল জামায়াতকে নিয়ে মানবতাবিরোধী বিচারের বিরোধিতা করলে তার বিচার হবে না কেন? এ প্রশ্নও জাগবে এ রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে।

জিয়াউর রহমান ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন বাতিল করলেন না কেন? হয়ত তিনি এর গুরুত্ব বোঝেননি, বা ভুলে গেছেন; বা ভেবেছেন, জামায়াতীরা তো এখন মুক্ত; সুতরাং, এর গুরুত্ব আর কী? অনেকে বলতেন এবং বিএনপির অনেকে এখনও বলেন, ঐ সব ব্যক্তির অপরাদের বিচার তো ফৌজদারি দন্ডবিধি অনুযায়ীই করা যায়। আমরা তখন এর বিরোধিতা করেছি। কারণ ঐ ধরনের বিচার হতো ইতিহাসকে অস্বীকার করা। সামগ্রিক অপরাধের বিচার তো হতো না এবং হয়েছিলও তাই। অনেকে মামলা করেছিলেন। কোন নিষ্পত্তি হয়নি। আরেকটি বিতর্ক উত্থাপন করা হয় এভাবে যে, এত বছর পর এ মামলা হবে কিভাবে? তামাদি কি হয়ে গেল না তা? বিবাদী পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল এ বলে যে, এই আইনে অপরাধ যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি। ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে রায়ে এসব প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছে। বিচারপতিরা

বলেছেন, এ সব প্রশ্নের কোনটিই যথার্থ নয়, গণহত্যা কখনও পুরনো হয় না। আর এর বিচারের সময়ের সীমাবদ্ধতা নেই।

[In absence of any statutory limitation, as a procedural bar, only the delay itself does not preclude prosecutorial action to adjudicate the culpability of prepetrator of core international crimes.]

এমনকি রোম চুক্তি স্ট্যাটুটও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। রোম সনদের কথা তোলা হয় এ কারণে যে, বাংলাদেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবাইকে বড় বড় উপদেশ দেয়। এই রায় হবার পরও বিএনপির মতো স্বচ্ছতা ও মানদণ্ডের কথা তুলেছে। তারা কিন্তু ঐ সনদে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছে। ট্রাইব্যুনাল পরিষ্কার ভাষায় এগুলো নাকচ করে দিয়েছে। [The Rome Statute is not binding upon this tribunal for resolving the issue of elements requirement.]

এবার আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩-এর কথা বলি। যখন এটি আইনে পরিণত হয় তখন বলা হয়েছিল, নুরেমবার্গ বিচারের জন্য প্রণীত আইনের পর এত ভাল আইন আর তৈরি হয়নি। বঙ্গবন্ধু এই আইনের খসড়া করতে বলেন। তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ও ড. কামাল হোসেনকে এর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। খসড়া তৈরি করেছিলেন বিচারপতি মুনীম, এ্যাটর্নি জেনারেল ফকির শাহাবুদ্দিন, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ব্যারিস্টার হারুনুর রশীদ, মাহমুদুল ইসলাম প্রমুখ। খসড়াটি প্রস্তুত হলে তা পরীক্ষার জন্য দেয়া হয় আয়ান ম্যাকডরমাটকে, যিনি জেনেভার আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। অধ্যাপক অটোফন ট্রিফটারারকেও খসড়া দেখানো হয়, যিনি নুরেমার্গ বিচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সংবিধানে এটি সুরক্ষা পায় কীভাবে? সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে বলা হয় "এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারিতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করিবার বিধানসংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা, কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।"

৪৭ ক ধারায় এই আইনের সুরক্ষা দেয়া হয়েছে এইভাবে " (১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের ৩১ দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীনে কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীমকোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।"

পরবর্তীকালে যখন যুদ্ধাপরাধ বিচারে আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠার রূপরেখা তৈরি হয় তখন এই আইনের সহায়তা নেয়া হয়েছিল। অন্যান্য যুদ্ধাপরাধ বিচারের আইনে গণহত্যা আছে, কিন্তু আমাদের আইন আরো এক ধাপ এগিয়ে আছে। কারণ এখানে ধর্ষণকেও অপরাধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং আইনটি রাতারাতি গজায়নি এবং এটি আন্তর্জাতিক মানের যে কোন আইনের সেরা একটি আইন। আসলে আমরা না জেনে কথা বলি এবং মূর্খদের কথাগুলোই সত্য বলে মনে করি।

আরো আছে। আমরা দিব্যি ভুলে গেছি, ১৯৭৩ সালের মার্চে জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের ২৯ অধিবেশনে বাংলাদেশের গণহত্যা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাস হয়েছিল; বিচারপতি গোলাম রাব্বানী এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন :

"যে হাজার হাজার বাঙালি নির্যাতন কক্ষে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, নির্যাতনে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের লক্ষ লক্ষ বিধবা ও এতিম সন্তান এবং যারা বেঁচে গেছেন তাদের এটা আশা করার অধিকার রয়েছে যে, যারা এসব ঘৃণ্য অপরাধের জন্য দায়ী, তারা যেন বিচার থেকে রেহাই না পায়।" এই অধিবেশন নিম্নোক্ত ঘোষণা দেয়

১. যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ যখন যেখানে সংঘটিত হবে, তার তদন্ত করতে হবে এবং সে অপরাধে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হলে শাস্তি দেয়া যাবে।
২. উপরোক্ত অপরাধীদের বিচার যে দেশে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে দেশে সে দেশের বিধানমতো হবে।
৩. উপরোক্ত নীতিদ্বয়ের প্রেক্ষিতে যেসব ব্যক্তি গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, সুপরিকল্পিত হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগসহ মারাত্মক অপরাধ করেছে বলে প্রমাণ আছে তাদের বিচার করার অধিকার ও কর্তব্য বাংলাদেশের আছে।

সুতরাং এ বিষয় নিয়ে কারও কোন, এমনকি বিদেশী কোন রাষ্ট্রের কথা বলার অধিকার নেই। মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচারের জন্য ৪০ বছর আগে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে ম্যান্ডেট দিয়ে রেখেছে।

এই পূর্ব ইতিহাস বিবেচনা করে ট্রাইব্যুনাল এই বিচার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, প্রচলিত আইন অমান্য করে যেসব অপরাধ করা হয়েছে তার

বিচারের জন্য আইনগত প্রচেষ্টা সঠিক তো বটেই, বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার প্রক্রিয়াও সাহসী এক প্রচেষ্টা।

[In Bangladesh, the efforts initiated under a lawful legislation to prosecute, try and punish the prepetrators of crimes committed in violation of customary international law are an indicia of valid and courageous endeavour to come out from the culture of impunity]

এই বিচার কেন এখন হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে, বিশেষ করে বিএনপি প্রেমিকরা। কয়েকদিন আগে এক টেলিভিশন আলোচনায় বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার মাহবুব প্রশ্ন করেছিলেন, আওয়ামী লীগ কেন আগে এ বিচার করল না। এখন কেন করছে? প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। বিএনপির তরিকুল ইসলাম বলেছেন, আওয়ামী লীগ একটি এজেন্ডা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

খন্দকার মাহবুবকে বলেছিলাম ১৯৭৩ সালে এই আইন করার জন্য পাকিস্তানপন্থীরা যার নেতৃত্ব দিয়েছেন জেনারেল জিয়া, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। না হলে বিচার হতো। কিন্তু এরপর দীর্ঘদিন বিএনপি শাসন করেছে। জিয়া আবার 'মুক্তিযোদ্ধা' ছিলেন, তো তিনি করলেন না কেন? এর উত্তর তিনি দিতে পারেননি। আর এই ইস্যু রাজনৈতিক কোন ইস্যু নয়। জাতিসংঘের ম্যান্ডেট কি রাজনৈতিক ইস্যু? এটি জাতীয় ইস্যু। আর এই জাতীয় ইস্যু সরকারকে এই শুভ প্রচেষ্টায় সমর্থন না জানিয়ে বিএনপি তার রাজনৈতিক এজেন্ডা কার্যকর করতে চাচ্ছে যা বাধা দেয়া সওয়াবের কাজ।

বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে জামায়াত সব সময় বিরোধিতা করেছে। ইতিহাসের সত্য অবলেপনের চেষ্টা করেছে। এ সত্য বহাল থাকলে তাদের অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়তে হয়। পাকিস্তানবাদ যেহেতু বিএনপিরও আদর্শ সে জন্য জামায়াতকে ত্যাগ করা তাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে রাখার জন্য তারা খানিকটা সতর্কতা অবলম্বন করে, বলছে, তারা বিচার চায় তবে তা হতে হবে স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিক মানের। খন্দকার মাহবুব হোসেন সেই টিভি আলোচনায় বলেছিলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, এখানে অন্য দেশের বিচারক নেই (মানে শ্বেতাঙ্গ)। তা'হলে এটি আন্তর্জাতিক হলো কিভাবে?

প্রথমে দেখা যাক ট্রাইব্যুনালের আইনে মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহ কিভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে

(ক) বেসামরিক জনসমষ্টির যে কাহারো বিরুদ্ধে কৃত নরহত্যা, উচ্ছেদ, ক্রীতদাসতুল্য জবরদস্তি, বিতাড়ন, কয়েদ, অপহরণ, আটক, শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, কিংবা অপর মানবিক কার্যসমূহ কিংবা রাজনৈতিক, গোষ্ঠীগত, উপজাতিগত বা ধর্মীয় কারণে শাস্তি প্রদান যেখানে অপরাধ সংঘটন হইয়াছে তাহা সে স্থানে

প্রচলিত আইন বিরুদ্ধ হোক কিংবা না হোক....

(খ) গণহত্যা ইহার অর্থ ও ইহার অন্তর্ভুক্ত নিম্নবর্ণিত যে কোন কার্য করা যাহার উদ্দেশ্য একটি জাতি, উপজাতি, নরগোষ্ঠী, ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তি সমষ্টিকে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক হত্যা করা। যেমন.....

(গ) আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে যে কোন অপরাধসমূহ......"

১৯৪৮ সালের জেনেভা কনভেনশনের ধারা ৩৫, ৭০ ও ৭৫-এ, এইসব অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালে বার বার যে আন্তর্জাতিক অপরাধের কথা বলা হয়েছে তা উল্লিখিত এইসব অপরাধ? এই অপরাধ কী? গণহত্যা, ধর্ষণ, প্রভৃতি। যেহেতু এগুলো আন্তর্জাতিক অপরাধ সে জন্য এগুলো বিচারের জন্য আইন করা হয়েছে যার নাম আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ আইন /ট্রাইব্যুনালস। এখানে আন্তর্জাতিক বিচারকের প্রশ্ন অবান্তর। সুপ্রীমকোর্টে শ্বেতাঙ্গ বিচারক দিলে বোধহয় মাহবুব হোসেনরা কৃতার্থ বোধ করবেন, কৃষ্ণাঙ্গ আইনবিদদের সম্মান বাড়বে। এমন হীনম্মন্যতাবোধ পৃথিবীতে বিরল।

আন্তর্জাতিক মানের কোন সংজ্ঞা প্রশ্নকারীরা দিতে পারেননি। ড. তুরিন আফরোজ লিখেছেন "যে কোন আইন সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক বিশ্বে গ্রহণযোগ্য কি না, নাকি ওই আইন আন্তর্জাতিক বিশ্বের মৌলিক ধ্যান ধারণা ও নৈতিকতার পরিপন্থী। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, ১৯৭৩ সালের আইনটি মোটেও আন্তর্জাতিক বিশ্বের মৌলিক ধ্যান-ধারণা বা নৈতিকতার পরিপন্থী নয়।"

এছাড়া ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইসরাইল, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স নিজস্ব আইনে যুদ্ধাপরাধ বিচার করেছে। ফ্রান্স এবং ইসরাইল এখনও নিজস্ব আইনে করছে। সেসব দেশে তরিকুল বা ফখরুলরা আছে। কিন্তু তাদের নৈতিকতা বোধ আছে খানিকটা। তারা এ নিয়ে কখনও প্রশ্ন তোলেনি। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি।

খন্দকার মাহবুব হোসেন রুয়ান্ডার অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে আন্তর্জাতিক বলেছেন, কারণ বাংলাদেশ থেকে এডভোকেট টিএইচ খানকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রুয়ান্ডা বা কম্বোডিয়ায় বিচারক ছিলেন না, তাই তাদের নিতে হয়েছে। বাংলাদেশের সৌভাগ্য, এখানে ঘাটতি নেই। এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় এখানে কখনও কবি, রাজনীতিবিদ, এডভোকেটের ঘাটতি হবে না। আর স্বচ্ছতা?

পৃথিবীর কোন যুদ্ধাপরাধ/মানবতাবিরোধী আইনে জামিনের বন্দোবস্ত নেই। বাংলাদেশের আইনে আছে এবং মানবতাবিরোধী আব্দুল আলীম জামিনে আছেন। গোলাম আযমের মতো লোককে ভিআইপি কেবিনে রাখা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত সবাইকে জেলে তো নয়, মামার বাড়িতে রাখা হয়েছে। পৃথিবীর কোন দেশের

আইনে আপিলের বন্দোবস্ত নেই। এখানে এক মাসের মধ্যে আপিলের বিধান আছে। এরপর স্বচ্ছতা চাইলে, ঐ বিষয়টি আমদানিযোগ্য পণ্য হলে আমদানি করতে হবে।

৬.

রায়ের মর্মার্থ ধরলে এত সাক্ষী-সাবুদ এবং এত শুনানির প্রয়োজন নেই। প্রতিদিন বিনা কারণে একটি আবেদন করেন বিবাদীর আইনজীবী। বিচারক ধৈর্য ধরে তা শোনেন। প্রথমদিকে, সব পক্ষই ফৌজদারি ধারায় চলেছিল; এখন অবশ্য সেটি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা হচ্ছে। এত বেশি স্বচ্ছতা দেখানো হচ্ছে, এত বেশি নিরপেক্ষতা দেখানো হচ্ছে যে, বিচার প্রক্রিয়া শ্লথ হয়ে যাচ্ছে যা জনস্বার্থবিরোধী। বিএনপি-জামায়াত চায়, বিচার প্রক্রিয়া থমকে দাঁড়াক বা শ্লথ হোক; আর কয়েকটি মাস কেটে গেলেই হয়ত পটপরিবর্তন হবে। তারা মনে করে, পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে না, তখন বিচার বন্ধ করে দেয়া হবে। বিএনপি তা ঘোষণাও করেছে। জানি না, ট্রাইব্যুনাল এ দিকটা ভেবে দেখবে কিনা।

এ মুহূর্তে আমরা বলতে পারি বিচারের এই আইন ও রায় একটি আন্তর্জাতিক মানদন্ড তৈরি করেছে। সীমিত অবকাঠামো, নিরাপত্তার শৈথিল্য, ভবিষ্যতের ভয়, সব কিছুকে এই তিন বিচারক অতিক্রম করে অনবদ্য এক রায় দিয়েছেন। সব মহলে এ রায় আদৃত হয়েছে। বাঙালির ইতিহাসের অধিকার তাঁরা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের ইতিহাস আমরা নির্মাণ করেছিলাম। সেই ইতিহাস কেড়ে নেয়া হয়েছিল। মাহফুজ আনাম যথার্থই লিখেছেন এবং তাঁর এই বাক্য ক'টি আমার খুবই ভাল গেলেছে এই রায় সঠিকভাবে অমোচনীয় ও অভ্রান্তভাবে, আইনগত এবং ইতিহাসের দিক থেকে যারা আমাদের মানুষের বিরুদ্ধে লড়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে তাদের সেইসব অপরাধ তুলে ধরেছে। যে কারণে শুধু বাঙালি নয়, পৃথিবীর তাবত স্বাধীনতাকামী এবং ন্যায় বিচারকামী মানুষের তা স্বীকার করে জয়োল্লাস করা উচিত। এ কারণেই আমরা এই রায় উদযাপন করছি।

[We celebrate the verdict because it correctly, irrevocably, legally and historically set out the role, those who opposed our war, committed genocide against our people and crimes against humanity that not only we, the Bangladeshis, but the freedom loving and justice seeking world needs to recognise and applaud us for Daily Star, ২৩.১.২০১৩]

২০১৩ সালের ২১ জানুয়ারি আমরা আবার আমাদের ইতিহাস ফিরে পেলাম। এটি একটি বড় ঘটনা। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ যেমন মাইলফলক আমাদের ইতিহাসে ২০১৩ সালের ২১ ডিসেম্বর তেমনি একটি মাইলফলক।

৭.

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচারের জন্য আগে কখনও এ ধরনের আইন করা হয়নি এবং ঐ রকম আইন অনুযায়ী বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়নি–যেমনটি করা হয়েছিল বাংলাদেশে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সংবিধান করে ধর্ম ব্যবসায়ীদের দল জামায়াত, মুসলিম লীগ প্রভৃতিকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। দালাল আইন যথাযথ মনে না হওয়ায় ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন করা হয়েছিল। কিন্তু এই আইন দ্বারা কখনও বিচার করা সম্ভব হয়নি। কারণ, সর্বত্র বিজয়ীরা পরাজিতদের বিচার করে। এ দেশে পরাজিতদের ক্ষমতায় এনে জিয়া বরং বিজয়ীদের বিচার ও হত্যা শুরু করেন। পৃথিবীতে এ ধরনের ট্র্যাজেডি খুব কম।

১৯৭২ সাল থেকে সিভিল সমাজ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চেয়েছে। ১৯৯২ সালে নির্মূল কমিটি এই বিচার দাবি কার্যকর করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গণআদালত বিচারের দাবিটির ভিত্তি সুদৃঢ় করে। এই আন্দোলনে কখনও ভাটা পড়েছে, কখনও জোয়ার এসেছে; কিন্তু নির্মূল কমিটি মূলত শাহরিয়ার কবিরের নেতৃত্বে এই দাবিতে অটল থেকেছে। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে আশা করা হয়েছিল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। কিন্তু তিনি করেননি। রাজনৈতিকভাবে সময় হয়েছে বলে তিনি হয়ত মনে করেননি। কিন্তু সেই সময় ইনডেমনিটি বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু করেন, চার জাতীয় নেতার বিচারও শুরু হয়।

২০০১ সালে বেগম জিয়া জামায়াতীদের নিয়ে ক্ষমতায় আসেন। সারা জাতির জন্য ছিল এটি একটি অপমান। আমাদের মতো নির্লজ্জ বুড়ো আমরা আগে ইতিহাসের অস্বীকৃতি, অপমান মেনে নিয়েছি। নতুন প্রজন্ম তা মানতে রাজি হয়নি। শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইতিহাসের সত্যটি তারা জেনেছিল। বুদ্ধিজীবীদের লেখালেখি, কিছু মিডিয়ার ইতিবাচক ভূমিকা ক্রমেই বিচারের দাবি জোরালো করে তুলেছিল। পরাজিত খুনীদের ক্ষমতায় নেয়াটা কিছুতেই মানতে পারেনি নতুন প্রজন্ম। ১৯৯২ সালেই শেখ হাসিনা বলেছিলেন, প্রয়োজনে তিনি বুকের রক্ত দিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ সমাপন করবেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে তাই আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটি রেখেছিলেন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার এক বছর পর ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। আজ অনেক ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে রায় পর্যন্ত আমরা পৌঁছেছি। আমরা যেমন উদ্বেলিত, তেমনি শঙ্কিতও। জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপি স্বার্থ ক্ষুন্ন হলে কী করতে পারে তা আমরা জানি। তারা ট্রাইব্যুনালকে লুপ্ত করার জন্য এখন প্রয়োজনে খুনখাবারিতে নেমে পড়বে। ইতিহাসের যে পতাকা আমাদের হাতে

তুলে দেয়া হয়েছে তা আবার কেড়ে নেয়া হবে। বিচারমুখিনতা এবং কলঙ্কমোচনের এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য ট্রাইব্যুনালের তাই স্থায়ী রূপ দেয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু স্থায়ীরূপ নয়, এর স্বায়ত্তশাসন দেয়া এবং সাংবিধানিক সুরক্ষা দেয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে সাক্ষী সুরক্ষা আইনও জরুরি। সরকারের এ দিকটি বিবেচনা করা উচিত।

ট্রাইব্যুনালে এখন বিপুল পরিমাণ নথিপত্র জড়ো হয়েছে। ইতিহাসের এই দিকটা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। তদন্ত দল গণহত্যার বিপুল পরিমাণ দলিল-দস্তাবেজ হস্তগত করেছে। এগুলো আমাদের ইতিহাসের ঐতিহ্য অংশ। ট্রাইব্যুনালকে অনুরোধ জানাব, এসব নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য এখনই বিধিব্যবস্থা করা উচিত। ১৯৭২-৭৩ সালে সংগৃহীত সব দলিল দস্তাবেজ হারিয়ে গেছে এবং স্বাধীনতাবিরোধীরাও সিস্টেম্যাটিকালি সব বিনষ্ট করে ফেলেছে। সরকারের কাছে আগেও আবেদন করেছি, এখনও করছি: পুরনো হাইকোর্ট ভবনে এসব নথিপত্র সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করে 'গণহত্যা জাদুঘর ও আর্কাইভ' প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করুন। এটিই উপযুক্ত জায়গা। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্র। এ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ও ছাত্ররাই প্রথম হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছিলেন। ইতিহাসের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার এটি একটি উপাদান।

গণহত্যাকে আমাদের ইতিহাসের ন্যারেটিভ থেকে বাদ দেয়ার চেষ্টা করেছে এক সময় সামরিক বাহিনী, বিএনপি এবং জামায়াত। গণহত্যা ন্যারেটিভ থেকে হারিয়ে যাওয়ার কারণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্ব, আমেরিকা, চীন গণহত্যা সমর্থন করেছিল। সে কারণে তারা বাংলাদেশের গণহত্যাকে এড়িয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের গণহত্যাবিষয়ক কোন গ্রন্থে বাংলাদেশের গণহত্যার কোন উল্লেখ নেই ভাবা যায়? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের আর কোথাও এত কম সময়ে এত বিশাল গণহত্যা হয়নি। গণহত্যার কথা ভুলে গেলে আমাদের স্বাধীনতার ন্যারেটিভে আর সত্যতা থাকে না। ইতিহাস বিকৃত হয়। ইতিহাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় সাধারণ মানুষ।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের রায় আমাদের ইতিহাসে গণহত্যা শব্দটি ফিরিয়ে এনেছেন। ত্রিশ লাখ বা তার বেশি শহীদ হয়েছিলেন এটিই সত্য। এটি অস্বীকার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতায় আনা উচিত। ইউরোপে 'হলোকাস্ট' অস্বীকার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমাদের প্রস্তাব আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তি অটুট রাখা ও সারা পৃথিবীর গণহত্যায় নিহতদের স্মরণার্থে ১ মার্চ অথবা ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করা। ১ মার্চের কথা বললাম এ কারণে যে, ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান গণহত্যার প্রস্ত

ূতি নিয়েছিল এবং ঐ সময়ে প্রায় ৩০০ জনকে তারা হত্যা করেছিল। ২৫ মার্চ তো ব্যাপক আকারে গণহত্যা শুরু হয়। আমরা আহ্বান জানাব, সরকার না চাইলেও আমরা এ দু'টি দিনের যে কোন একটি গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন শুরু করি। কাউন্টার ন্যারেটিভের জন্য এটি প্রয়োজন।

সমসাময়িককালে অনেকে নানা কারণে পরিচিতি লাভ করেন। বিখ্যাত হন। কিন্তু, সময় এত নিষ্ঠুর যে, কালের ক্যানভাসে কিছুই থাকে না। যেমন ৫০ বছর পর বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা হলে জাতির পিতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদের নাম থাকবে। কোন মেজরের নাম থাকবে না। শেখ হাসিনার নাম থাকবে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বেরকালের জন্য নয়, অন্য কারণে। সেটি হলো, বাংলাদেশে বিচারহীনতার ও দায়হীনতার যে সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল তিনি তা থেকে বেরিয়ে বিচারমুখিনতা ও দায়বদ্ধতার সংস্কৃতি শুরু করেছিলেন যা সভ্য সমাজের সংস্কৃতি। আর বিচারিক ইতিহাসে ট্রাইব্যুনাল-২-এর রায় বারবার উল্লেখিত হবে রাষ্ট্রে দায়বদ্ধতা ও রাষ্ট্রের মানুষদের কাছে ইতিহাসের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য।

২৭ জানুয়ারি, ২০১৩

আসলেই কি আমরা জামায়াত নিষিদ্ধ করতে চাই?

জামায়াত নিষিদ্ধ করা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বিমত নেই। আরও অনেকেরই দ্বিমত নেই। তবু জামায়াত নিষিদ্ধ হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। জামায়াত নিষিদ্ধের দাবি গত দু'দশকের বেশি সময় ধরে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি করে আসছে। দাবি জানাতে জানাতে আমরা অনেকে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও অন্তত শাহরিয়ার কবির ক্লান্ত হননি। অক্লান্তভাবে জামায়াতের অপকর্ম তুলে ধরেছেন, নিষিদ্ধকরণের কথা বলেছেন। ১৯৯৪ সালেই তিনি প্রকাশ করেছেন 'জনতার আদালতে জামায়াতে ইসলামী।' কিন্তু সবাই তো আর শাহরিয়ার কবির নয়, সবারই সমস্যা আছে। এটি অবশ্য শাহরিয়ারের বোধের মধ্যে নেই। গত দু'মাস জামায়াতের আসল রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। তারপর থেকে জামায়াত নিষিদ্ধকরণের দাবি ব্যাপকতা পেয়েছে বটে কিন্তু স্থিতাবস্থা এখনও বজায় আছে। এমনকি যে গণজাগরণ মঞ্চ নিয়ে তরুণ ও প্রবীণরা উচ্ছ্বসিত সেই মঞ্চের একটি দাবিও সরকার কেন, যাঁরা উচ্ছ্বসিত তাঁরাও মানেননি। সে কারণেই এতদিন পর মনে হয়েছে, বাস্তবতা বড় কঠিন। এবং সে কারণেই প্রশ্ন জেগেছে সত্যিই কি আমরা চাই জামায়াত নিষিদ্ধ হোক? নাকি এটি নিছক একটি স্লোগান। যে স্লোগান দিলে নিজের প্রগতিশীলতা প্রমাণ পেল, আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হলো কিন্তু সত্যিকার আন্দোলনে যেতে হলো না।

প্রথমে যে বিষয়টি বলা দরকার, বার বার অবশ্য বলেও এসেছি যে, জামায়াত যা ছিল ১৯৭১ সালে এখনও তা আছে। ১৯৭১ সালে তার হিংস্রতার কোন মাপকাঠি ছিল না। এবং গোলাম আযম নিজামী মুজাহিদরা কাউকেই ছাড় দেয়নি। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি না থেকেও তা উপলব্ধি করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের শত্রুদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছেন। সমাজরাষ্ট্রে অশুভ ছায়া যাতে বিস্তার না করে তা তিনি চেয়েছেন। কারণ তাঁর কাছে মানুষের স্বার্থটা ছিল বড়। অন্যদিকে জিয়াউর রহমানও জামায়াতকে বুঝেছিলেন। এই জন্য তাদের অবমুক্ত করে তাদের হিংস্রতাকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন নিজ স্বার্থে। মুক্তিযুদ্ধের সব অর্জন তিনি নষ্ট করতে চেয়েছেন নিজ মহিমা বাড়ানোর জন্য। সেজন্য এদের দরকার ছিল। খালেদা জিয়ার দরকারও সেই একই রকম। মুক্তিযুদ্ধের মৌল অর্জন স্বীকার

করলে তাঁর রাজনীতি থাকে না। চৌদ্দ দলের অনেকে আহ্বান জানাচ্ছেন খালেদাকে যে, গোলাম আযমদের ত্যাগ করতে। তাঁদের একটি ধারণা, খালেদা নিজামী আলাদা হলে বোধহয় তাঁদের ভোটের বাক্স ভরে উঠবে। এঁদের আমাদের অর্বাচীন মনে হয়। এঁদের রিসাইকেল্ড রাজনীতিবিদ বলা যেতে পারে। দু'টি দল আলাদা থাকলেও তারা কখনও আওয়ামী লীগে ভোট দেবে না। ভোট ভাগও হবে না। এদিক থেকে তাদের কমিটমেন্ট মৃদু বাম, কঠিন বাম এবং আওয়ামী লীগ থেকে বেশি।

গত দু'মাসে জামায়াত-বিএনপি যা করেছে তা আমার কাছে ইতিবাচক মনে হয়েছে। লক্ষ্য করবেন আমি জামায়াত-বিএনপির কথা এক সঙ্গে বলছি। কারণ রাস্তায় তারা যৌথভাবে অপারেট করছে। তাদের আলাদা করে দেখার কোন সুযোগ নেই। তারা যে মানুষ নয় বা মানবিক গুণাবলী যে তাদের নেই সেটি প্রতিভাত হয়েছে। আওয়ামী লীগের যাঁরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন তাঁরাও হয়ত বুঝেছেন জামায়াত-বিএনপির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈবাহিক সম্পর্ক গড়লেও রাজনীতির প্রশ্নে তারা আপোসহীন। সুশীল সমাজের অনেকেও ধাক্কা খেয়েছেন এই হিংস্রতা দেখে কিন্তু তাঁরা এদের ওপর থেকে আস্থা হারিয়েছেন তা বলা যাবে না। যারা নিরপেক্ষ তারাও ভাবছে সত্যি সত্যি জামায়াত এলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বসবাস করা যাবে তো। নাকি '৭১-এর মতো স্ত্রী-কন্যা-মাতা গনিমতের মাল হয়ে যাবে। লক্ষ্য করবেন, সবাই জামায়াতকে দোষারোপ করছে, বিএনপিকে নয়। দুটিই অশুভ শক্তি– এ কথা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁরা জামায়াতকে শুধু অশুভ মনে করেন। এটি একটি ফ্যালাসি। আমাদের কপালে আরও দুর্ভোগ আছে। কেননা চৌদ্দ দলের, সুশীল সমাজের অনেকে এই ফ্যালাসি বিশ্বাস করেন।

রাজনীতির গভীরে যাঁরা যেতে চান না, তাঁরাও বলেছেন, গত এক সপ্তাহ বাদ দিলে গত ৭ সপ্তাহ, চৌদ্দ দল বা আওয়ামী লীগের কাউকে রাস্তায় দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের অধিকাংশ ওই সময় নিজ এলাকায় যাননি বা যাওয়ার সাহস পাননি। এর কারণটি কী? চৌদ্দ দল বা আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড কি তা ভেবে দেখেছে? আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যাকে আমরা সবাই পছন্দ করি, তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারদের মতো অনুপস্থিত থাকেন। এত বড় ক্রাইসিসে এত বড় দলের এত বড় সম্পাদক ও এত বড় বড় নেতার এত অসহায় অবস্থা আর চোখে পড়েনি। দলীয় সভানেত্রী আমাদের মন্তব্য উপেক্ষা শুধু নয়, ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কিন্তু তা বলে বিষয়টা অসত্য তা তো বলতে পারেন না বরং কখনও ভেবে দেখেছেন কেন তাদের এ রকম আচরণ? সুতরাং আমরা যদি ভাবি জামায়াত প্রতিরোধে ১৪ দল/আওয়ামী লীগ

তেমন প্রমাণিত হয় না। উৎসাহী নয় তা কি ভুল হবে। ১৪ দলের ওপর তাদের বিশ্বাসের জায়গাটা একটু নড়বড়ে হয়ে গেছে।

মিডিয়ার দৌলতে এ রকম একটি বিষয় দাঁড়িয়েছে যে, ৬৪টি জেলায় জামায়াত-বিএনপি এমন করার ক্ষমতা রাখে। আসলে তা ঠিক নয়। বিশেষ কিছু স্থানে সহিংসতা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতিবিদদের খতিয়ে দেখা উচিত কেন ওইসব জায়গায় হিংস্ররা হিংস্রতা দেখাতে পারল? সেখানের সংসদ সদস্য ও নেতাদের বিষয়ে তাদের দুবার ভেবে দেখা উচিত। সব কথার সারমর্ম– যেসব রাজনৈতিক দলের ওপর আমরা আস্থা রাখি তাঁরা সিভিল সমাজকে নিয়ে দূরে থাকুক নিজের দলীয় কর্মীদের নিয়েও মাঠে নামতে পারেননি। একটি যুক্তি দেয়া হয়, নামলে আরও ক্ষয়ক্ষতি হতো। সব পুড়িয়ে, ধর্মান্তর করার পর আর কী ক্ষতি হতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়।

গত দু'মাসের ঘটনায় আরেকটি মজার বিষয় চোখে পড়েছে। সরকারী দলের নেতানেত্রী, সংসদ সদস্য, মন্ত্রী সবাই অন্দরে বাইরে, এমনকি সংসদে উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, জামায়াত নিষিদ্ধ করতে হবে। তারাই তো নিষিদ্ধ করবেন। দাবি তো তুলব আমরা। যাঁরা নিষিদ্ধ করবেন তাঁরাই যখন নিষিদ্ধকরণের দাবি তোলেন তখন ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে এ দাবি কতটা আন্তরিক বা কতটা সিভিল সমাজের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঠোঁট সেবা বা লিপ সার্ভিস?

এরপর আসি মিডিয়ার ব্যাপারে। বিদ্যুতায়িত মাধ্যমে টকশোতে এ বিষয়ে প্রচুর আলাপ-আলোচনা হয়েছে। জামায়াতের সহিংসতা দেখান হয়েছে, বিএনপির সহিংসতাও খানিকটা স্থান পেয়েছে। বিশ্বজিতের ঘটনা যতবার দেখান হয়েছে, এই ঘটনা যে কত খারাপ [খারাপ তো বটেই মর্মান্তিকও যা কোনক্রমে গ্রহণযোগ্য নয়] তা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। জয়পুরহাটে মুসলমানদের যে তওবা পড়ান হলো ও 'ইসলামে' আবার দীক্ষা দেয়া হলো বা কীভাবে পিটিয়ে কুপিয়ে পুলিশ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষদের মারা হলো তা কিন্তু বারংবার দেখানো হয়নি, টকশোতেও আসেনি। বিশ্বজিৎ হত্যায় যে ২০ জনেরও ওপরে 'ছাত্রে'র বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়া হয়েছে তাও উল্লিখিত হয়নি। ১৯৯৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর শিবির আক্রমণ করে এবং অনেকে খুন হন। যদ্দুর মনে পড়ে, বিএনপির এক নেত্রীর পুত্র রিমুও খুন হন। সংসদে বিএনপি নেতারা জামায়াত নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন। লক্ষণীয়, শিবিরের হত্যাকারীদের কখনও গ্রেফতার করা হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অর্থাৎ এ আমলে হত্যাকারীকে সম্ভব হলে ধরা হয়। খালেদা নিজামী আমলে ধরা হয় না এটি কেউই উল্লেখ করেননি। খালেদা যাদের টিভি লাইসেন্স দিয়েছেন তারা এ ধরনের কাজ করতেই পারে কিন্তু হাসিনা যাদের লাইসেন্স দিয়েছেন তারাও এমনটি করবেন? নিশ্চয় প্রধানমন্ত্রী জানেন তাঁরা

লাইসেন্স কাদের কাছে বিক্রি করেছেন? তাদের তিনি কেন এখনও আনুকূল্য দেখাবেন? শেখ হাসিনার আমলে যাদের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে তারাও একই রকমের কাজ করেছে। টকশোর নামে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের তারা নিয়ে এসেছে এবং আসছে ও তাদের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বক্তব্য দেয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। এটি জামায়াত-বিএনপিকে এক ধরনের সমর্থন। লক্ষ্য করবেন, অনেক টিভির স্ক্রলে এখন লেখা হয় না জামায়াত-বিএনপি আক্রমণ করেছে। লেখা হয়– দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধাপরাধ বিচার তো নেগোশিয়েবল নয়, আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যাপারও নয়। কিন্তু কেন এই মতলববাজি? কারণ ব্যবসায়িক সম্পর্ক। খবরের কাগজেও একই ব্যাপার। প্রধান কাগজগুলো জামায়াতের বিরুদ্ধে লেখা/খবর ছাপতে রাজি হলেও বিএনপির ব্যাপারে নয়। সেখানেও টাকার সম্পর্ক। কিন্তু তরুণরা যখন জেগে উঠেছিল তখন তারা লিপ সার্ভিস দিচ্ছিল।

এ রকম একটা সময়ে আমি আবেদ খানকে ফোন করে জানিয়েছিলাম, এটিএন নিউজ সুখের বিষয় একটি পক্ষ নিয়েছে, কিন্তু বারবার ইসলামী ব্যাংকের বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে, ব্যাপারটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল না? তিনি জানালেন, 'আমি খেয়াল করিনি, এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি।' সেখানে ও সময় টিভিতে শুধু আমি ইসলামী ব্যাংকের বিজ্ঞাপন দেখিনি। *জনকণ্ঠ* যে নিরপেক্ষ নয় তা সবার জানা। সেখানেও একদিন এমন বিজ্ঞাপন ছাপা হওয়ার পর স্বদেশকে প্রশ্ন করি। *জনকণ্ঠের* প্রবল অর্থকষ্ট সত্ত্বেও তারা সেই বিজ্ঞাপন আর ছাপেনি। সুতরাং কমিটমেন্ট এক জিনিস স্লোগান অন্য জিনিস, বিষয়টিও অনুধাবনের সময় এসেছে। সুতরাং মিডিয়া যে লিপ সার্ভিস দিচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। ইকবাল সোবহান চৌধুরীর সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই, সৌজন্যমূলক সম্পর্ক অটুট। কিন্তু যখন জানা গেল তিনি গোলাম আযমভক্ত তখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সাংবাদিকরাও কতটা কমিটেড সে প্রশ্ন জাগে। কারণ জনাব চৌধুরী এখনও তাদের নেতা। পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদেরও নেতা।

গণজাগরণ মঞ্চের অবস্থা যখন তুঙ্গে তখন আমি খুলনা গিয়েছিলাম। স্বাচিপের নেতা ডা. বাহার আমাকে খুলনা মেডিক্যালে নিয়ে গিয়েছিলেন কিছু বলার জন্য। সেখানে কয়েক শ' ডাক্তার, ছাত্র, ইন্টার্নি ছিলেন। সবাই জামায়াত নিষিদ্ধ চান। আমি বললাম, তরুণ তুর্কি হওয়ার দরকার নেই। সামান্য কয়েকটি কাজ করুন। ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখবেন না। কারণ তা জঙ্গীবাদে পুঁজি যোগায়। তাদের হাসপাতালে প্র্যাকটিস করবেন না বা ইবনে সিনার ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে লিখবেন না এবং যারা [টিভি, খবরের কাগজ বা অন্যরা] এদের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের বর্জন করুন। তার আগে খান এ সবুরের নামে যে রাস্তা সেটি বাতিল করুন। কারণ হাইকোর্ট এটি স্থগিত করার কথা বলেছে মেয়র সে আদেশ অস্বীকার করেছেন। এবং হাইকোর্টও সে

ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তাদের উৎসাহ দেখে মনে হলো এখনই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমার চার দশকের অভিজ্ঞতায় এ রকম উত্তেজনা অনেক দেখেছি তাই উত্তেজিত হইনি। আজ প্রায় ১ মাস হয়ে গেল, তাদের কোন সাড়াশব্দ পাইনি। এই হচ্ছে অবস্থা।

গণজাগরণ মঞ্চ থেকে এ ধরনের বর্জনের ডাক দেয়া হয়েছিল। উদ্যোক্তারা কখনও খতিয়ে দেখেননি, সে আহ্বান কতটা সাড়া ফেলেছে। শুধু স্লোগানে সমাজ বদলায় না। বিপ্লবও হয় না। চার দশক বিভিন্ন আন্দোলন করে অন্তত এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। শুনেছি জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ডা. ইমরান সরকার স্বাচিপের সঙ্গে যুক্ত। এ মুহূর্তে জামায়াত নিষিদ্ধ চান এ রকম কয়েকজন স্বাচিপ নেতাকে অনুরোধ করেছি ব্যক্তিপর্যায়ে এ তিনটি দাবি মানতে, কেউ সাড়া দেননি। অথচ এঁরা সবাই জামায়াত নিষিদ্ধ চান।

সিভিল সমাজের যাঁরা নেতা হিসেবে আওয়ামীবিরোধী সংবাদপত্র ও টিভিতে পরিচিত তাঁদের একজনও জামায়াত নিষিদ্ধের কথা উচ্চারণ করেননি। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ থেকে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য কাউকে তো টু শব্দটি করতে দেখিনি। সংস্কৃতি জগতের কতজন সোচ্চার হয়েছেন?

সরকার জামায়াত নিষিদ্ধ করছে না বলে আমরা ক্ষুব্ধ হতেই পারি। সরকার বা পুলিশের পক্ষে একা জামায়াত-বিএনপির নাশকতা ঠেকানো মুশকিল। আমরা যে বাস্তবতা ভুলে যাই তাহলো দেশের কমপক্ষে ৫০ ভাগ মানুষ আওয়ামী লীগ বিরোধী। আমি যে উদাহরণগুলো দিলাম তা অস্বীকার করতে পারবেন? এদেরও মৃদু জামায়াতী ধরলে সে সংখ্যা কত দাঁড়ায়? শেখ হাসিনা রাজনীতি করেন। তাঁর পক্ষে এ হিসাব গণনায় না নেয়া মুশকিল। আমরা যখন এত হিসাব কেতাব করি, তো একজন রাজনৈতিক নেতা তা করবেন না এটি তো বাস্তব নয়। আমরা যারা জামায়াত নিষিদ্ধ করার কথা বলছি তারা স্ব স্ব অবস্থান থেকে নিজের কাজটুকু করছি কি না সেটা আগে দেখা উচিত। জামায়াত যে আজ তাণ্ডব করে পার পেয়ে যাচ্ছে তার কারণ তার অর্থনৈতিক শক্তি। ডা. আবুল বারকাত গত পাঁচ বছর এই কথা বলেছেন, লিখছেন। যে তাহমিদ গণজাগরণ মঞ্চের একনিষ্ঠ কর্মী ছিল সিলেটে, সে কেন জামায়াতের পক্ষে মিছিলে নেতৃত্ব দেয় এবং মারা যায় তা কখনও ভেবেছেন? আমাদের সবাইকে এভাবে অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে বিএনপি-জামায়াত। সে কারণে আমরা ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকা উঠাই না, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব ভাংচুর হয়, বিএনপি-জামায়াতের হয় না, ইবনে সিনা ক্লিনিকে সবার আগে যাই। গণজাগরণ মঞ্চের ব্যাপারে আকুল হই কিন্তু স্ব স্ব অবস্থানে থাকি তাদের দাবি মানি না। আবার গণজাগরণ মঞ্চে জামায়াতের ব্যাপারে সোচ্চার কিন্তু যে বিএনপির জোরে জামায়াত দাঁড়িয়ে, যে বিএনপি তাদের

প্রায় নর্দমার সঙ্গে তুলনা করছে তাদের ব্যাপারে সোচ্চার হবে না কারণ তাহলে রাজনীতি হবে, বিএনপি-জামায়াতের মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলি আর শেখ হাসিনাকে বলি জামায়াত নিষিদ্ধ করতে। বলিহারি বাস্তবতা!

আমরা আমাদের কাজটুকু করি, সামান্য অহিংস কাজ, দেখবেন আগামী কয়েক মাসে জামায়াতের হিংস্রতা অনেক কমে গেছে। ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন একটি রাষ্ট্রকে অবলুপ্ত করেছিল। তখনকার মানুষ কত কমিটেড ছিলেন এবং নেতাদের কতটা বিশ্বাস করতেন, ভেবে দেখুন! আওয়ামী লীগের জামায়াত অংশকে চিহ্নিত করুন এবং জামায়াত নিষিদ্ধের দাবিতে অটুট থাকুন, দেখবেন সরকার বাধ্য হবে কাজ করতে। আওয়ামী লীগকে ভেবে দেখতে বলুন, আমাদের ভোট তাদের জন্য জরুরী কি না?

শুরুতেই এ কারণে বলেছিলাম, আসলেই কি আমরা জামায়াত নিষিদ্ধ করতে চাই?

১৪ মার্চ, ২০১৩

ধর্ম ও রাষ্ট্র বিশেষ কাউকে ইজারা দেয়া হয়নি

হেফাজতে ইসলামের নাম তেমন পরিচিত নয়। বাংলাদেশে মাদ্রাসাকেন্দ্রিক এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কম নয়। হাটহাজারীর কওমি মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে মূলত এ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কওমি মাদ্রাসা বা হেফাজতে ইসলামকে বিবেচনা করা হয় জামায়াতবিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে। হতে পারে। কিন্তু আধুনিক বাংলাদেশের কি তারা সমর্থক? মননে? আসলে এই প্রশ্নের মীমাংসা আগে করা দরকার। যদি না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে, মাদ্রাসা থেকে যাঁরা বেরুচ্ছেন তাঁদের মানস গঠনে মৌল কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা আধুনিক মননের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এমনকি মওলানা মাসউদ, টিভিতে সুললিত কণ্ঠে যিনি জামায়াতে ইসলামীর ফেরেববাজির বিষয়ে বললেন, তিনিও তো এমন স্লোগান তুলছেন যা জামায়াতে ইসলামীর স্লোগানের সমর্থক। অর্থাৎ ব্লগাররা নাস্তিক। তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। হ্যাঁ, সম্মিলিতভাবে তারা একটি শক্তি। কিন্তু যেটি অনেকের ভাবনার মধ্যে নেই তাহলো এরা রাষ্ট্রশক্তির ওপরও নির্ভরশীল।

মধ্যযুগে ইউরোপে ধর্মের প্রভাব বেড়েছে রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায়। চার্চ ও রাষ্ট্র পরস্পর পরস্পরকে দেখভাল করেছে। আমাদের এখানেও রাষ্ট্রশক্তি যখন প্রশ্রয় দেয়নি তখন ধর্মীয় উন্মাদনা এভাবে ছড়াতে পারেনি বা ধর্মকে স্বার্থের কারণে এভাবে ব্যবহারের সাহস তারা পায়নি। যখনই সরকার তাদের প্রতি নমিত আচরণ করেছে বা তোষামোদ করেছে তখনই তারা তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে।

হেফাজতে ইসলাম যদি জামায়াতের একান্তই বিরোধী হয়, তাহলে সপ্তাহ তিনেক আগে তাদের বিশাল বিজ্ঞাপন জামায়াত ও জামায়াত-বিএনপির মুখপত্র দৈনিক *আমার দেশ*, *নয়া দিগন্ত* আর *সংগ্রামে* কেন প্রকাশিত হলো? মৌলানা শফি কর্তৃক এই বিজ্ঞাপনে শাহবাগের তরুণদের প্রতিও বিষোদ্গার করা হয়েছে। দৈনিক *আমার দেশ*, *নয়া দিগন্ত* তখন বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, ধর্মান্ধ ও ধর্মব্যবসায়ীদের উসকে দিচ্ছে এবং রাস্তায় রাস্তায় দাঙ্গা শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয়। আমি জনাব হাসানুল হক ইনুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই যে দাঙ্গা উসকে দেয়া হচ্ছে, আপনারা এই পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন, ব্যবস্থা নেয়ার উপায় নেই। রাষ্ট্র তাহলে এতই অসহায় ও দুর্বল! তারপর

তিনি পরামর্শ দিলেন, মামলা করুন। বললাম, আমি মামলা করব কেন? আপনারা আছেন কেন? দাঙ্গা যে উসকে দিচ্ছে সে সম্পাদকের বিরুদ্ধে তো সরকার ব্যবস্থা নিতে পারে। তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন হয়ত, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দেননি। আসলে আমরা সবাই সবার কাঁধে বন্দুক রেখে গুলি করতে চাচ্ছি। যেন বলতে পারি, ও কী, আমি তো কিছু করিনি।

গত দু'সপ্তাহ যে রাস্তায় দাঙ্গা হয়েছে তার প্রধান কারণ এ তিনটি পত্রিকা ও কয়েকটি টিভির আচরণ। গত শতকের ষাটের দশকে যখন পাকিস্তানীরা এ রকম দাঙ্গা বাধিয়েছিল তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি শুধু নয়, সব কটি পত্রিকা একযোগে দাঙ্গার বিরুদ্ধে 'পূর্ববঙ্গবাসী রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক সম্পাদকীয় লিখেছিল। না, আজ রাজনীতিবিদ বা সম্পাদকদের সে সাহস খুব একটা নেই। হাহুতাশ করে কোন লাভ নেই। আমরা যে রকম, আমাদের রাজনীতিবিদ বা মিডিয়াও তেমন হবে। প্রগতিশীলতা বাইরে, ভেতরে থিকথিক করছে প্রতিক্রিয়া, লোভ।

হেফাজতে ইসলামের কথা বলছিলাম। ওই বিজ্ঞাপনে নানা কটূক্তির পর শাহরিয়ার কবির, জাফর ইকবাল, অজয় রায় ও আমাকে মুরতাদ ঘোষণা করে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। এবং আমাদের ওপর হামলার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। মৌলানা শফি কি জানেন যে, অজয় রায় মুসলমান নয়? তাকে মুরতাদ ঘোষণা করেন তিনি কীভাবে?

মুরতাদ বড় কঠিন শব্দ। এ নিয়ে আমাকে কয়েকবার মুরতাদ ঘোষণা করা হলো। বিষয়টিকে খেলো করে তুলছেন এসব মৌলানা। গত দুই দশকে এই ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠান আমাদের মুরতাদ ঘোষণা করেছে, জামায়াতীরা বলছে আমরা নাস্তিক। তা হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে জামায়াতের পার্থক্য কী রইল? আসলে ধর্মব্যবসায়ীরা যখন দেখে তাদের যুক্তি বৃহত্তর সমাজে অগ্রাহ্য হচ্ছে বা কারো যুক্তির কাছে তারা পরাভূত তখন তারা যাকে-তাকে মুরতাদ ঘোষণা করে।

মুরতাদ মানে কী? ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ফিরে যাওয়া। মৌলানারা মনে করেন, অর্থাৎ তারা যদি মনে করেন, ইসলাম কেউ ত্যাগ করেছে তাকে মুরতাদ বলা ও তার ওপর হামলা করা। এইটি উলেমাদের মত। কোরান বা রাসূলের (স) নয়। 'উলেমাদে'র কাছে আমরা তো দেশ আর ধর্ম ইজারা দিইনি। আর আমি মনে করি সবাই উলেমা হতে পারে না। এ দেশে শব্দটির অপব্যবহার হচ্ছে।

পাকিস্তানে (১৯৭১ সালের আগে) জামায়াত নেতা মওদুদী প্রথম মুরতাদ শব্দটি ব্যবহার শুরু করেন। তার প্রতিষ্ঠার জন্য বিরুদ্ধবাদীদের দমনের ক্ষেত্রে মুরতাদ ঘোষণা করা ছিল এক ধরনের হাতিয়ার। মওদুদী 'মুরতাদ কী সাজা' নামে একটি বইও লিখে ফেলেন। এবং সেখানে নানাভাবে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন

মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। কাদিয়ানীদের মুরতাদ ঘোষণা করে প্রথম তিনি দাঙ্গা লাগিয়েছিলেন। সামরিক বাহিনী তা মানতে রাজি হয়নি। দাঙ্গা দমন করে মওদুদীর বিচার করে তাঁর মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল। হাত-পা ধরে মাফ চেয়ে তিনি প্রাণ রক্ষা করেন। জেনারেলরা পরবর্তীকালে ব্যবহারের জন্য তাঁকে ফাঁসি দেয়নি। পরে ১৯৭১ সালে তারা জামায়াত ও মওদুদী এবং গোলাম আযমকে ব্যবহার করে।

মৌলানা শফি ও তাঁর অনুসারীরা বা অন্য 'উলেমা'রা ইসলাম সম্পর্কে আমাদের চেয়ে সহস্রগুণ বেশি জানেন। কিন্তু ধর্মে অশিক্ষিত হয়েও আমি একটি প্রশ্ন তো করতে পারি। কোরানে কোথায় লেখা আছে ধর্মত্যাগীকে মৃত্যুদন্ড দিতে হবে? যেসব মৌলানা কথায় কথায় যাকে-তাকে নাস্তিক বলেন, মুরতাদ বলেন, তাঁদের অত্যন্ত তাজিমের সঙ্গে বলতে চাই, বিভিন্ন বই পড়ে কোরানের কয়েকটি সূরার উদ্ধৃতি পেয়েছি। প্রথমে তাঁদের বলতে হবে কোরানে এসব লাইন আছে কি না–

১. 'ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার জোর জবরদস্তি নাই' (বাকারা)
২. 'যার ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা হয় অস্বীকার করুক' (কাহাফ)
৩. 'উপদেশ গ্রহণ করে যে চায় সে তার প্রভুর পথে চলতে পারে' (দহর)
৪. 'যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ইচ্ছামতো অন্যের উপাসনা করতে পারে' (যুমার)
৫. 'ইমান আনার জন্য কাউকে বাধ্য করা যায় না।' (ইউনুস)
৬. 'মহানবী (স) একজন উপদেষ্টা মাত্র' (আ'রাফ)
৭. 'তাঁকে ধর্মের ব্যাপারে দারোগা করে পাঠানো হয়নি' (জামিয়া)
৮. আমি বিচারপতি হাবিবুর রহমানের 'কোরানসূত্র' ঘেঁটে দেখেছি, সেখানে 'মুরতাদ' বলে কোন শব্দ নেই।

যদি কোরানে এসব আয়াত থাকে তাহলে মওলানা শফি কীভাবে 'মুরতাদ' শব্দটি ঘোষণা করলেন? তাহলে কি তাঁকে পুরো বিষয়টি না জানিয়ে জামায়াত বিজ্ঞাপনটি ছেপেছে? যদি তাই হয় তাহলে জামায়াতের সঙ্গে তাঁর কী নিয়ে আঁতাত হয়েছে? হুঙ্কার নয়, যুক্তি দিয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন। আল্লাহ যেখানে তাঁর প্রিয় বান্দা আমাদের প্রিয় রাসূল (স) সম্পর্কে বলছেন, 'ধর্মের ব্যাপারে তাঁকে দারোগা করা হয়নি সেখানে 'ইসলামপন্থী' বলে ব্যক্তিরা কীভাবে ধর্মের দারোগা সাজেন!' জামায়াত করতে পারে; কারণ তাদের ইসলাম প্রকৃত ইসলাম থেকে আলাদা। এই যে সূরাগুলো, সেখানে কি নাস্তিকদের বিচার বা ফাঁসির কথা বলা হয়েছে? তাহলে মৌলানারা কি সত্য বলছেন না? তাঁরাও কি জামায়াতের মতো হয়ে গেলেন, অথচ তাঁরা আরও বলছেন, জামায়াত নিষিদ্ধ করতে হবে। ব্যাপারটা

খুব গোলমেলে হয়ে গেল না?

আ. ত. ময়মনী লিখছেন, মওদুদী বলেছেন ইসলাম বর্জন করে অন্য মতাদর্শ গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করতে হবে। ধর্ম রাষ্ট্র [মুসলিম] কোন মুসলমান তার ধর্ম প্রচার করা দূরে থাকুক তার মতাদর্শও কারো কাছে বলতে পারবে না। তাহলে প্রশ্ন– আল্লাহ কেন সূরা নিসাতে লিখেছেন– 'সুম্মা আমানু সুম্মা কাফারু সুম্মা আমানু সুম্মা কাফারু।' অর্থাৎ 'ইমান এনে আবার কার্যকর হয়ে গিয়ে আবার বিশ্বাস স্থাপন করে আবার যে কেউ অবিশ্বাসী হতে পারে।' এখানেও তো মুরতাদের কোন উল্লেখ করেননি। মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে যদি মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় তাহলে সে আবার বিশ্বাসী হবে কী করে?

মৌলানা শফির জ্ঞাতার্থে বলি, শাহরিয়ার কবির মৌলবাদী বা জামায়াতের রাজনীতির ব্যাপারে অনেক লিখেছেন, কিন্তু তাঁর কোন লেখা কি দেখাতে পারবেন যেখানে আল্লাহ, রসূল সম্পর্কে কোন কটূক্তি আছে? যদি না পারেন তাহলে তাঁকে অসত্য অপবাদ দেয়া কেন? জাফর ইকবাল কারো আগেপিছে নেই; বাস্তব জগতে কম্পিউটার ও শিশুসাহিত্য ছাড়া আর কিছু চেনেন কি না সন্দেহ। তাঁর কোন রচনায় বা বক্তৃতায় রসূল (স) বা আল্লাহ সম্পর্কে কোন কটূক্তি আছে? কটূক্তি দূরে থাকুক এ প্রসঙ্গই নেই। তাহলে তাঁকে এই অসত্য অপবাদ দেয়া কি ঠিক হলো? এটা ক্ষমতার অপব্যবহার নয়? আল্লাহ কি ক্ষমতার অপব্যবহার পছন্দ করেন?

নিজ প্রসঙ্গ আনতে চাইনি। কিন্তু হেফাজতে ইসলাম তা আনতে বাধ্য করল। বছর দুয়েক আগে আমি হজে যাওয়ার আগে জামায়াতের এক চেলার দীর্ঘ চিঠি পাই। নানা কটূক্তির পর তিনি মন্তব্য করেন, আমার যে হেদায়েত হয়েছে তাতে তিনি খুশি। যেন তিনি আমার জীবনের সব কথা জানেন। সবশেষে লিখেছেন, সে ব্যক্তিরই হজে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় আল্লাহ যার হজ কবুল করেন। এটি কোন হাদিস কি না জানি না। মৌলানা শফি আল্লাহর ঘরে গেছেন, আমিও গেছি। তিনি আমাকে ইসলাম থেকে খারিজ করেন কীভাবে? খারিজের মালিক তো আল্লাহ্। আল্লাহ্র ক্ষমতা যখন কেউ নিতে আকাঙ্ক্ষী হয় [নাউজুবিল্লাহ] তখন তার অবস্থান কোথায় তা জানার ইচ্ছা রইল।

কওমি, নন-কওমি, আহলে হাদিস, সাধারণ জঙ্গী, মধ্যপন্থী সব 'ইসলামী' আজ মসজিদকে বেছে নিয়েছে রাজনীতির কেন্দ্র হিসেবে। শুধু তাই নয়, জামায়াতীরা মসজিদ থেকে যুক্তিবাদীদের ওপর শুধু ঢিল পাটকেল নয় গুলিও চালায়; হত্যা করে, ভাংচুর করে এবং জায়নামাজ পোড়ায়। আল্লাহ বা রসূল (স) কোথায় বলেছেন মসজিদে বসে এসব অপকর্ম করে বলা যাবে– আল্লাহর পথে মানুষকে নেয়ার জন্য এসব করতে হচ্ছে? যারা এসব বিশ্বাস করে তারাও তো একই পাপের ভাগীদার হবে। মসজিদে রাজনীতি কখনও চলতে পারে না। প্রতি

শুক্রবার ইমামদের যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে বয়ানের রাজনীতি বৈধ নয়। কোরান বা হাদিসের কোথায় সিয়াসতের স্থান আছে?

বাংলাদেশে ধর্মব্যবসায়ীরা মনে করে মসজিদ একান্তই তাদের। তাই যেভাবে খুশি সেভাবে তারা মসজিদকে ব্যবহার করতে পারবে। আল্লাহ কোথাও এ কথা বলেননি। অবৈধভাবে জমি দখল করে মসজিদ করাও বিধেয় নয়। এসব বন্ধ হওয়া উচিত। আমরা যে এত মুসলমান মুসলমান করি, তাহলে ৭১টি ফিরকায় আমরা বিভক্ত কেন? এই ৭১টি ইসলামের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে বলেই তো বিভক্ত। ৭১টি ফিরকার সবাই মসজিদে নামাজ পড়তে যান। সেক্ষেত্রে একটি ফিরকার ইমাম শুধু তার ফিরকার পক্ষে বয়ান করতে পারেন না। তাহলে প্রতিটি ফিরকার জন্য ভিন্ন মসজিদ করা কি বিধেয় নয়?

এখানকার ধর্মব্যবসায়ীরা সৌদিকে মানেন গুরু হিসেবে। সেখানে তো রাজনীতি একেবারে নিষিদ্ধ। তাহলে সৌদিদের তারা অনুসরণ করেন না কেন? আমাদের এসব বীর 'মৌলানাদের' গিয়ে বলব মক্কায় বা মদীনায় গিয়ে রাজনীতির কথা বলতে। পিঠের চামড়া তুলে ফেলা হবে। মৌলানারা এসব বোঝেন না তা নয়। এখানকার সরকার দুর্বল, রাজনীতিবিদদের বড় অংশ ফেরেববাজ; তাই তাঁরা এখানে রাজনীতি করেন। তাঁদের একমাত্র লোভ সৌদি রিয়েলের প্রতি।

ইসলাম কি অন্য ধর্মের উপাসনালয় ভাঙতে বলেছে? মায়মনী জানাচ্ছেন, 'পবিত্র কোরান এবং হাদিসে স্রষ্টার উপাসনার জন্য নির্মিত সব প্রার্থনালয়কেই মসজিদ বলা হয়েছে। উক্ত আয়াতে [বাকারা-১১৫] মসজিদ বলতে ইসলামপূর্ব যুগের ইহুদীদের উপাসনালয়কেও বোঝান হয়েছে।' এমনকি মওদুদীও খ্রীস্টান ও ইহুদীদের উপাসনালয়কে মসজিদ বলেছেন। আমাদের বায়তুল মোকাররম থেকে জামায়াতী এক খতিব জামায়াত-বিএনপি রাজত্বের সময় ফতোয়া দিয়েছিলেন– মসজিদ ভাঙ্গা নাকি জায়েজ। সেটি আবার তাদের মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম* ১ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে ছেপেছিল। এরপর পরই জামায়াতীরা ঢাকায় আহমদীয়া মসজিদে আগুন দেয়, পবিত্র কোরান জ্বালিয়ে দেয়। আল্লাহ কখনও তা বলেননি। বরং যারা অন্যের উপাসনালয় রক্ষা করবে আল্লাহ তাদের নিজের বান্দা মনে করবেন। সূরা হজে বলা হয়েছে– 'আল্লাহ যদি এসব মানুষের [যারা মসজিদ, মন্দির, গির্জা] একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়া হতো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদের সাহায্য করবেন যাঁরা তাঁর সাহায্য করে (৪০ আয়াত)। ময়মনী জানাচ্ছেন, এ পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা মসজিদ, মন্দির, গির্জা প্রভৃতিকে ধ্বংসকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে, আল্লাহ স্বয়ং তাঁদের আল্লাহর সাহায্যকারীরূপে উল্লেখ করেছেন।

মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয় রক্ষাকারীদের আল্লাহ সাহায্য করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

১. সূরা দ্বীনে আল্লাহ ফরমাইয়াছেন, 'মসজিদগুলো আল্লাহর জন্য। তাই সেখানে আল্লাহর সঙ্গে তোমরা অন্য কাউকেও ডাকবে না।' কিন্তু আজকাল প্রায় প্রতি বৃহস্পতিবার ধর্মব্যবসায়ীরা শুক্রবারে আহ্বান জানায় মসজিদে গিয়ে জড়ো হতে যেখানে বয়ান করা হবে যারা তাদের অন্য ইসলামের সঙ্গে একমত নয় তাদের বিরুদ্ধে এবং তাদের আক্রমণে প্ররোচনা দেয়া হবে। তখন সেই মসজিদ আর আল্লাহর জন্য থাকে না।

২. সূরা তওবায় মসজিদ নিয়ে বেশ কিছু আয়াত আছে। যেমন-

'তুমি এর মধ্যে কখনও দাঁড়িও না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই ধর্মকর্মের জন্য স্থাপিত সেখানে নামাজের জন্য দাঁড়ানো তোমাদের জন্য উচিত হবে। ওখানে পবিত্র হতে চায় এমন লোক পাবে; আর যারা পবিত্র হয় আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন।'

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তাঁর ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে সে ভাল, না সেই লোক ভাল, যে তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে পড়ন্ত ধসের ধারে যা ওকে নিয়ে পড়বে নরকের আগুনে? আর আল্লাহ্ তো অনাচারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।' [উদ্ধৃতিগুলো কোরানসূত্র থেকে নেয়া]

অনেকে বলেন, জামাতে (পোশাকে) যারা ইসলামী অথচ আমলে বা কর্মে যারা ইসলামী নয় তারাই জামায়াতে ইসলামী। সে দিক থেকে মৌলানা শফি বা অন্যান্য 'ইসলাম'পন্থী দল জামায়াতকে নিষিদ্ধ করতে বলছে তা প্রশংসনীয়। কিন্তু একই সঙ্গে খালেদা জিয়ার মতো যখন তরুণদের বা ব্লগারদের 'নাস্তিক' বলে শাস্তি দাবি করছেন তখনই তারা সিয়াসত করছেন যা কাম্য নয়। বিএনপির রাজনীতি কেন তাঁরা করছেন? তা ছাড়া তারা নাস্তিক এ কথা তো জামায়াত ও বিএনপি বলেছে। মৌলানারা তাহলে তাদের কথায় রাস্তায় নামবেন? এটি কি কোন গোপন আঁতাত? যারা তাদের নাস্তিক বলছেন তাঁরা ইন্টারনেটে তরুণদের কোন লেখা দেখাতে পারবেন যা আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধে? রাজীবের মৃত্যুর পর তার ব্লগে জামায়াতীরা বিকৃত কিছু লেখা দিয়ে কু-প্রচার করল আর আপনারা আল্লাহর বান্দা মনে করেন, অথচ আল্লাহর অন্য বান্দাদের বিরুদ্ধে অসত্য বলবেন–এটি জায়েজ নয়। আল্লাহ অন্যান্য পাপ থেকেও মিথ্যাবাদীদের পাপ বড় করে দেখেছেন। অনেক উদ্ধৃতি দেয়া যায়। আমি তা দেব না। শুধু বলব, সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ বলেছেন– 'অতীতে তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ছিল; সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে সফর করো ও দেখো যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল তাদের কী পরিণাম হয়েছে।'

বিনা কারণে তরুণদের বা ব্লগারদের যে সন্দেহ করা হচ্ছে সেটিও ধর্ম স্বীকার করে না। আল্লাহ বলেছেন- 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তা অনুসরণ করো না। কান, চোখ, মন প্রত্যেকের কৈফিয়ত তলব করা হবে।' (বনি ইসরাইল)

এখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে এসেছে যে, ইসলামপন্থী বলে পরিচিত একটা বড় অংশ জামায়াতের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হয়ে কাজ করছে। ওইসব ইসলামী নেতার অনেকে নাকি হঠাৎ বড়লোক হয়ে উঠেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। আমাদের যাঁরা এ কথা স্বীকার করেন না বা এদের হুজুর হুজুর বলেন তাঁদের এজেন্ডা অন্য। যতক্ষণ এরা তরুণদের বিরুদ্ধাচরণ বন্ধ না করবে ততক্ষণ বুঝতে হবে এরা ইসলামের পক্ষে নয়, জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে কাজ করছে।

আমাদের দাবি করা উচিত, যারা অধর্মকে ধর্ম বানিয়ে চিৎকার করছে তারা আয়কর দেয় কি না? আমরা আয়কর দিলে এসব নেতা ও পীররা আয়কর দেবে না কেন? তারা যদি আয়কর না দেয়, আমরা দেব কেন? এখন এ প্রশ্নগুলো জরুরী হয়ে উঠছে। কারণ জামায়াত-বিএনপি টাকা দিয়ে প্রায় প্রত্যেককে কিনে নিয়ে লেলিয়ে দিচ্ছে ১৪ দল ও গণজাগরণ মঞ্চের বিরুদ্ধে।

'ইসলামীরা' মাঠে নামলে, মাঠ ছেড়ে দিতে হবে তাদের এর কোন মানে নেই। 'ইসলামী' বিএনপি-জামায়াত রাস্তায় নামলে রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে তার কোন অর্থ নেই। শুধু স্লোগান নয়, তরুণদের এটাও ভাবতে হবে, যারা তাদের চরিত্র হনন করে প্রতিদিন অপমান করছে তা তারা মেনে নেবে কি না? মেনে নিলে বলতে হবে, তাদের আন্দোলনেও ঝামেলা আছে। এখন নির্দল, নিরপেক্ষ কোন আন্দোলন হতে পারে না। হয় তরুণদের থাকতে হবে জামায়াত, 'ইসলাম ব্যবসায়ী' ও বিএনপির পক্ষে, না হলে অপর পক্ষে। এবং প্রত্যুত্তর দিয়েই বোঝাতে হবে তারা শক্তিশালী। তাদের স্লোগান হতে হবে রাষ্ট্র ও ধর্ম আমরা ইজারা দিইনি। এটি আমাদের রাষ্ট্র এবং আমরা যার যার ধর্মে আছি। এবং এখন থেকে শুধু স্লোগান নয়, প্রতিহতেরও ডাক দিতে হবে। সরকার 'ইসলামী'দের পক্ষ নিলে নিজেদের মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে। এ রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে তরুণরা, বয়োবৃদ্ধ নেতানেত্রীরা নয়।

১৭ মার্চ, ২০১৩

বিএনপিও সংসদে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছিল

১৯৯৩ সালে খালেদা জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী তখন জামায়াত-শিবির ক্যাডাররা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালায়। এই হামলায় এক বিএনপি নেত্রীর পুত্র রিমু মারা যান। তখন শুধু আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপির সংসদ সদস্যরা সংসদে জামায়াত নিষিদ্ধের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ঐ দিন যাঁরা সোচ্চার ছিলেন জামায়াতের বিরুদ্ধে আজ তাঁরা যুদ্ধাপরাধী জামায়াতের পক্ষে। এই হচ্ছে বিএনপি এবং যারা বিএনপি করে তাদের মৌল চরিত্র। পাঠকদের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য সেই সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন সংকলন করা হলো]ঃ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর জামায়াত-শিবিরের নৃশংস হামলা ও একজনকে খুন করার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার সংসদের পূর্ব নির্ধারিত দিনের কার্যসূচী মুলতবি করে বিষয়টির ওপর ৪ ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। সরকারী ও বিরোধী দলের ৩৩ জন সদস্য এতে অংশ নেন এবং প্রায় সবাই ওই ঘটনায় তাঁদের ঘৃণা প্রকাশ করে দেশে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। সরকারী দলের একজন সদস্য এ ব্যাপারে বিল আনার আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রয়োজনে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে তিনি ওই বিলে ভোট দেবেন। সরকারী দলের পক্ষে সমাপনী বক্তৃতায় সংসদ উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে বলেন, [এক্ষেত্রে সংবিধান কি বলে তা দেখতে হবে; তবে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন] রগ কাটা ও জবাই করার রাজনীতি চলতে দেয়া যায় না। আলোচনার মাঝামাঝি সময়ে রাত সোয়া ১০টায় সামান্য হৈচৈ করে জামায়াতের এমপি'রা ওয়াক আউট করেন। তার আগ পর্যন্ত তাঁরা মুখ কালো করে বসেছিলেন। ওয়াক আউট করার সময় তাঁদের একজন এমপি 'পরে মজা টের পাবেন' এ হুমকি দিয়ে গেছেন বলে আওয়ামী লীগের আবদুল আওয়াল মিয়া সংসদে অভিযোগ করেন।

সংসদ মুলতবি করে বিষয়টির ওপর আলোচনার জন্য ৩৩ জন বিরোধীদলীয় সদস্য নোটিস দিয়েছিলেন। আলোচনা শুরুর আগে সংসদ উপনেতা বলেন, সরকারী দলের সদস্যরাও বক্তব্য রাখতে চান। স্পীকার ৬২ বিধিতে আওয়ামী লীগের অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মুলতবি প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বিএনপি

সদস্যরা যাতে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন সেজন্য অন্য সকল বিধি স্থগিত রাখেন। বর্তমান সংসদে বিরোধী দলের মুলতবি প্রস্তাবের ওপর উভয়পক্ষের আলোচনা এই প্রথম। জামায়াত বাদে অন্যান্য দলের সদস্যদের একই ধারার বক্তব্য দেয়ার এই ঘটনা একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাসের পর আর ঘটেনি। সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ আলোচনার সময় অনুপস্থিত ছিলেন।

সংসদ উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী সমাপনী বক্তৃতায় বলেছেন, জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব সংবিধানের মাধ্যমে পরীক্ষা করার অবকাশ রয়েছে। জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদ যে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার দৃঢ়ভাবে সে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সংসদ উপনেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, আপনাকে ক্ষমাহীন পদক্ষেপ নিতে হবে। যারা মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। সীমা লঙ্ঘন করেছে তাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও এদের পেছনে যারা রয়েছে তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। তিনি শিক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়ের উদ্দেশে বলেন, শিক্ষাঙ্গনগুলোকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য যেকোন কঠোরতম পদক্ষেপ নেয়া হলে সংসদ আপনাদের পক্ষে থাকবে। আমরা এই সংসদ সদস্যরা আমাদের সন্তানদের হত্যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। এর পরে যেন আর কোন মায়ের বুক খালি না হয় এ ধরনের কোন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ। আমরা ধর্মকে বিকৃত করে ফায়দা লোটার যেকোন অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধেও ঐক্যবদ্ধ। তিনি বলেন, সকলের সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে রাজনীতি করার। কিন্তু সংবিধান হত্যা বা সন্ত্রাসের অধিকার দেয়নি। দেয়নি গণতন্ত্র বিপন্ন করার অধিকার। যারা ধর্মকে ব্যবহার করে, ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে ঘুমন্ত ছাত্রদের হত্যা করে তাদের বিরুদ্ধে এই সংসদ তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করছে। এ ধরনের ঘটনা বর্বর ও পৈশাচিক।

তিনি বলেন, যে রাজনীতি হত্যার, রগ কাটার, হাত কাটার, জবাই করার সেটা কি ধরনের রাজনীতি। এটা স্বাধীন দেশের রাজনীতি হতে পারে না। সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ রাজনীতি চলতে দেয়া যায় কিনা। তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে, এটা অসুস্থ ও বিকৃত রাজনীতি। মানসিক বিকৃতরা ছাড়া হত্যার রাজনীতি কেউ করতে পারে না। যারা হত্যা করে উল্লসিত হয় তারা স্বাভাবিক মানুষ নয়, সাইকোপ্যাথ। এই অস্বাভাবিক মানুষরা ভোটার হতে পারে না। যারা ভোটার হতে পারে না তারা রাজনীতি করবে কি করে? তোফায়েল আহমেদ বলেন, শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বপদে থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলও তা চেয়েছে।

বিএনপি'র যেসব এমপি মামুলি কথা বলেছেন তাঁদের উদ্দেশে তোফায়েল

বলেন, নিজের দলের মধ্যে স্বাধীনতা বিরোধী যারা আছে তাদেরকে পদত্যাগে বাধ্য করুন। ১২ অনুচ্ছেদ (ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ) সংবিধানে পুনর্বহাল করতেও তিনি তাদের সাহায্য কামনা করেন।

আওয়ামী লীগের আবদুর রাজ্জাক বলেন, আজকের দিনটি ঐতিহাসিক। কারণ সরকারী দলও উপলব্ধি করছে অশুভ জামায়াত-শিবির টিকে থাকলে দেশ ধ্বংস হবে। তিনি বলেন, সংসদে যে ৪ দফা চুক্তি হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হলে আজকের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ করেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার পদত্যাগের যে দাবি করা হয়েছে তিনি তার বিরোধিতা করে তার আমলে শিক্ষা ব্যবস্থায় কি কি উন্নতি হয়েছে তার বর্ণনা দেন। স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে খ্যাত অধ্যাপক আবদুল বারী প্রসঙ্গে একটি অভিযোগের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তিনি রাজাকার নন। তিনি খুবই মেধাসম্পন্ন লোক। শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় একেবারে জামায়াত-শিবিরের কথা বলেননি।

বিরোধী দলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম বলেন, ঘাতকদের কোন ধর্ম নেই, নীতি নেই, আসুন ওদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই। তিনি বলেন, মতিন নামের মানুষগুলো বিএনপি'র রাজনীতিতে কোনদিন বিশ্বস্ত ছিলেন না। আজকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতিনের নির্লিপ্ততায় তার নিজের দলের ছেলেরা খুন হচ্ছে। এ ঘটনায় শুধু নিন্দা নয়, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। এ অধিবেশনে সম্ভব না হলে আগামী অধিবেশনে এ ব্যাপারে বিল আনতে তিনি সরকারী দলের প্রতি আহ্বান জানান। আপনাদের প্রয়াত নেতা আপোস করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন। এ কথা উল্লেখ করে বিএনপি'র উদ্দেশে তিনি আপোসের পথ পরিহার করার আহ্বান জানান। তিনি ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বরখাস্ত করার দাবিও জানান।

বিএনপি'র হুইপ অধ্যাপক শাজাহান বলেন, জামায়াত-শিবির সীমা লঙ্ঘন করেছে। তিনি নিজের এলাকার কথা উল্লেখ করে বলেন, ধর্মের নামে এমন কিছু নেই যে ওরা করতে পারে না। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে জামায়াত-শিবিরের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, '৭১-এ ওরা যেভাবে আমাদের মা-বোনদের ধর্ষণ করেছে, সেইভাবে তারা আজ ধর্মকে ধর্ষণ করছে। ইসলাম ধর্মকে তিনি জামাতের হাত থেকে রক্ষা করার আবেদন জানান। তিনি বলেন, বিএনপি'র বন্ধুরা আজ মনের কথা বলেছেন। প্রস্তাব নিয়ে আসুন, ওদের নিষিদ্ধ করুন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে বলতে হবে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ঐ মৌলবাদী ধর্মাশ্রয়ীদের বিরুদ্ধে।

বিএনপি'র শাহাজান ওমর বলেন, একটি স্বাধীন দেশের সংসদে প্রতিদিনই

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে হয়, এটা লজ্জাজনক। জামায়াত নেতা মাওলানা নিজামীর উদ্দেশে তিনি বলেন, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দেবেন না, কিভাবে রাজাকার নিধন করতে হয় আমরা জানি। এই সংসদেও কোন প্রেতাত্মা থাকলে তাও ধ্বংস করতে জানি। নিজের দলসহ বিভিন্ন দলের এমপিদের উদ্দেশে তিনি বলেন, জামায়াতকে কেন আপনারা এসব কাজ করতে দেন? আলোচনার সময় সংসদে শিক্ষামন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, তাহলে এ আলোচনার অর্থ কি?

বিএনপি'র হুইপ আশরাফ হোসেন বলেন, লেখাপড়া করতে গিয়ে ছাত্ররা লাশ হয়ে বাড়ি ফিরবে এ অবস্থা দুঃখজনক। শিবির বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করছে তিনি তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান।

জাতীয় পার্টির আবু লেইস মবিন চৌধুরী বলেন, আজ নিজের ঘরে আগুন লেগেছে বলে বিএনপি এখন জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে বলছে। এতদিন মুখ বন্ধ করে ছিল।

শাজাহান সিরাজ বলেন, গোলাম আযমের বংশধররা কি করতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। বিএনপি গোলাম আযমকে দুধ-কলা দিয়ে পুষছে। কি হবে তাও টের পাচ্ছেন বিএনপি'র বন্ধুরা। জামায়াত-শিবিররা বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্গ করে গড়ে তুলছে। পুলিশ কি করে? আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে– হয় স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বাংলাদেশে বেঁচে থাকবে, না হয় ওরা থাকবে। আমরা যদি আমাদের সন্তানদের সত্যিই ভালবাসি তাহলে জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করতে হবে। সারা জাতি আমাদের দিকে চেয়ে আছে কবে আমরা রগ কাটার রাজনীতি বন্ধ করব।

তিনি বলেন, রাজশাহী ছাত্রদলসহ সকল রাজনৈতিক দল এক হয়েছে। এই ঐক্যের মতো আসুন আজ সংসদের সকল দল মিলে জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব নিই।

আওয়ামী লীগের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, যে মুহূর্তে আজানের ধ্বনি সে মুহূর্তে জামায়াত-শিবির যারা ধর্মান্ধ রাজনীতি করে তারা হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। জুবায়েরকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। ৬টি হলে একযোগে হামলা চালানো হয়। '৭১ সাল থেকে তারা শুরু করে এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা। আজও তারা সেটা চালিয়ে যাচ্ছে। এদেশকে মেধাশূন্য করার জন্যই এটা করা হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে।....

বিরোধী দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, শিক্ষামন্ত্রী জামায়াত-শিবিরের নাম উচ্চারণই করলেন না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর [মুখ থেকে শব্দ দুটো বের করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তাদের শক্তির উৎস কোথায় সবাই জানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর] বিরুদ্ধে কথা বলায় উনি হুমকি দিয়েছেন পরে জবাব দেবেন।

আমরাও ওনার জবাবের প্রতীক্ষায় থাকলাম। রাজশাহী ছাত্রদলের ২ হাজার নেতা-কর্মীর পদত্যাগের খবর সরকার সমর্থক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তা অস্বীকার করায় সামাদ আজাদ [নিজে পদত্যাগ করেননি বলে কি পদত্যাগ করার মতো বিবেকবান মানুষের অভাব আছে?] বলেন, আমরা পুলিশের বিরোধিতা করি না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশকে দিয়ে উল্টোপাল্টা কাজ করাচ্ছেন। অধ্যাপক বারীর মতো রাজাকারের সাফাই গেয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী, এতে আমরা অবাক হইনি- একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২/৪ জন জমিরউদ্দিন সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দেশবাসীকে সরাতে পারবেন না। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনার জন্য দায়ী জামায়াত-শিবির এবং ব্যর্থ প্রশাসনিক কর্মচারীদের শাস্তি, তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা এবং সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের পুনরুজ্জীবন দাবি করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী বলেন, গত দু'দিনে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার নায়করা গণতন্ত্র ও মানবতার শত্রু (বিরোধী দলের এমপিরা জিজ্ঞেস করেন, তারা কারা? এই পর্যায়ে জামায়াত-শিবিরের নাম উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন) যারা এ ঘটনার সাথে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। জামায়াত নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনাদের কর্মীরা গ্রেফতার হলে তদবির করবেন না তাদের ছাড়ানোর জন্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেসব কথা বলা হয়েছে সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে এখন কিছু বলব না। (ভবিষ্যতে জবাব দেব)। বিরোধী দলের একজন এমপি মন্তব্য করেন, (সে জবাব কি লাঠিচার্জ)? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ হাজার ছাত্রদল নেতা-কর্মী পদত্যাগ করেছেন। এ কথা ঠিক নয় বলে তিনি দাবি করেন।[কিন্তু ঘটনা ঘটলেই সরকার ব্যর্থ-বিরোধী দলের এ কথাও ঠিক নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।] সন্ত্রাস বন্ধে তিনি সকল দলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, এ দায়িত্ব তার একার নয়। রাজশাহীর ঘটনায় পুলিশ নীরব ছিল একথা অস্বীকার করে তিনি বলেন, জামায়াত-শিবিরের ২৪ জনকে এবং খুলনার ঘটনায় ৩৯ জনকে গ্রফতার করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ অভিযোগ করেন, শিক্ষামন্ত্রী জামায়াত-শিবিরের নাম একবারেও উচ্চারণ না করে হাস্যরসের মাধ্যমে পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয় স্বাধীনতাবিরোধীরা যখন যে অবস্থানেই থাকেন না কেন শেকড়ের কথা ভুলতে পারেন না।

শওকত আলী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন, তিনি সংসদের সকলের ঐকমত্যের ব্যাপারটি এড়িয়ে ভিন্ন সুরে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, জামায়াত পশু ও হিংস্র। কারণ তারা মানুষ হত্যা করে আনন্দ-উল্লাস করে। তারা ধর্মের আবরণে নিজেদের কুৎসিত চেহারা ঢেকে রাখে। কিন্তু তাদের কুৎসিত চেহারা বার বার প্রকাশ পেয়েছে। অথচ সরকার তা আড়াল করে প্রশ্রয় দিয়েছে। আজ স্বাগতঃ

জানাই সকলেই জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের জন্য ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আশা করি সরকার এই মতের সঙ্গে এক হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, যেদিন জামাতের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করা হয় সেদিনই মনে হয়েছিল দুর্ভোগ আছে। বিএনপি'র [ভুলের মাসুল আজ জাতিকে দিতে হচ্ছে। এই ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তির সহায়তা নেয়ার জন্য যে দু'জন বিএনপি] নেতা তোজজোড় করেছেন তার একজন সংসদে উপস্থিত আছেন। তিনি হচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিকৃত রাজনীতির ধারকরাও শুধু রাজশাহী নয়, আরো অনেক স্থান দখল নেয়ার পাঁয়তারা করছেন।

তিনি বলেন, রাজশাহীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগসহ যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ সংসদে তাই প্রতিফলিত হয়েছে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা শক্তি ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এক হতে পারে না। যেমন তেল আর জল মিলতে পারে না। বিএনপি ঐ বিকৃত রাজনীতির ধারক গণতন্ত্রের শত্রুর পক্ষে থাকতে পারে না। ভারতের মত 'ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ' করার বিল সংসদে আনার জন্য সরকারী দলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এ বিল আমরা পাস করে দেব।

আওয়ামী লীগের বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, যে ছাত্রদলকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী গর্ববোধ করেন সে ছাত্রদলের সদস্যদের হত্যা, রগকাটা হলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। এর কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এক সময় জামায়াতের সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, জামায়াত-শিবির ধর্মান্ধ ও ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি করছে '৭৮ সাল থেকে। মানুষ অপরাধ করে লজ্জা পায়, জামায়াত-শিবির অপরাধ করে আনন্দ পায়। এরা হত্যা করে উল্লাস করে। এখন প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে বিবেচনা করার-মানবতার পক্ষে থাকব না পশুত্বকে প্রশ্রয় দেব। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রস্তাব নিতে হবে এদের বিরুদ্ধে। ৪ দফা চুক্তি বাস্তবায়ন করে গোলাম আযমের বিচার করতে হবে।

ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন বলেন, খুনীদের এ দেশে ক্ষমা করা যাবে না, এটা আজ সমস্বরে সকল সদস্য বলেছেন। তিনি বলেন, সরকারের মধ্যে ওদের বন্ধু আছে। রাজশাহীর ভিসি নামে, জিয়া পরিষদ বেনামে জামায়াতে ইসলামী। পুলিশকে শিবিরের পক্ষে নামানো হয় সে প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। তিনি বলেন, প্রক্টর-প্রোভিসি জামায়াতের কর্মী। ... ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর এই নির্মম আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যর্থতার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। এরা আমাদের সন্তানদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারছেন না।

বিএনপি'র আবদুল আলী মৃধা বলেন, এটা কলঙ্কজনক ঘটনা। এরা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। এরা রগকাটা ও গলাকাটার দল। এরা 'জামায়াত-

শিবির'। তারা আমাদের সন্তানদের লেখাপড়া করতে দিচ্ছে না। এরা পাক বাহিনীর মতো। জামায়াত-শিবির চাচ্ছে বাংলাদেশকে শেষ করে দিতে। জাতির চাহিদা স্বাধীনতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া। এই রাজাকার ও আলবদররা তাদের সন্তানদের দিয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের হত্যা করছে। এই জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এদের বিরুদ্ধে '৭১ সালের মতো কবর রচনা করতে হবে। যারা আমাদের সন্তানদের হত্যা করছে তারা মানুষ নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয় ছিল। পুলিশকে ওদের দোসর হিসেবে চিহ্নিত করে বিচার করতে হবে। শোককে শক্তিতে পরিণত করে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে জামায়াত-শিবির দেশে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

আওয়ামী লীগের তাজুল ইসলাম ফারুক বলেন, জামায়াত-শিবির যখন নারকীয় আক্রমণ চালায় তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। তারা সহায়তা করেছে শিবিরকে। কারা নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ? সরকার না শিবির?

তিনি বলেন, পাকিস্তানের প্রেতাত্মারা রাজশাহীর কৃতী ছাত্রদের হত্যা করছে। জাতির স্বার্থে জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করা হোক।

বিএনপি'র মেজর (অব.) হাফিজ বলেন, আজ জাতি চায় জামায়াত-শিবিরের বিচার। '৭১-এর হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবে এদেশবাসীকে হত্যা করেছে। তারা পাকিস্তানের রাজনীতি করে। এই রাজনৈতিক দলটি চিরকাল গণবিরোধী রাজনীতি করেছে। দিনের পর দিন তারা ছাত্রদের হত্যা করেছে। আজ তাদের বিচার চাই। আমরা এই অশুভ শক্তির তাণ্ডব বন্ধ চাই। '৭২ সালে স্বাধীনতাবিরোধীদের ক্ষমার ফল এটা। এটাই জাতির জন্য কাল হয়েছে। যারা আজ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে সেই জামায়াত-শিবিরের ধর্ম নিয়ে রাজনীতি চিরতরে নিষিদ্ধ করতে হবে। ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনীতির ধারক জামায়াত-শিবিরের উৎখাত চাই।

আওয়ামী লীগের শামসুল হক বলেন, স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই কি জবাব দেবেন ঐ ছাত্রের পিতা-মাতাকে।

তিনি বলেন, আর যদি আমার কোন ভাই বা ছেলেকে হত্যা করা বা রগ কাটা হয় আমরাও ওদের সংসদ থেকে বের করে দেব। জাতির আশা অনুযায়ী জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করতে হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সন্ত্রাসের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএনপি'র দু'জন সদস্য বিরোধী দলের প্রতি জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি বিল আনার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, প্রয়োজনে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে হলেও তাঁরা ঐ বিলের পক্ষে ভোট দেবেন। এ

দু'জন হচ্ছেন মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান ও সিরাজুল ইসলাম সরদার। দু'জনেই তাঁদের বক্তব্যের সময় বিরোধী দল ছাড়াও নিজ দলের অনেক সদস্যের টেবিল চাপড়ানোর সমর্থন পান। বক্তব্য শেষের পর অনেক সদস্য উঠে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করেন।

মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান বলেন, দুর্ভাগ্য আমাদের স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করতে হয়। ক্ষমতার এমনই নেশা।

তিনি বলেন, দুঃখ ও দুর্ভাগ্য আমার স্পীকার, আপনার কাছ থেকে সময় ভিক্ষা করে কথা বলতে হয়। '৭১ সালে যদি আপনার সঙ্গে দেখা হতো তবে আপনি কোথায় থাকতেন আর আমি কোথায়, জানি না।

তিনি বলেন, একটি স্বাধীন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়া উচিত ছিল একজন মুক্তিযোদ্ধার। তা হয়নি। তিনি বলেন, দোষ দেয়া হয় পুলিশের, পুলিশের দোষ নেই। ওদের ওপর বসিয়ে দেয়া হয়েছে স্বাধীনতাবিরোধীদের। তিনি জামায়াত-শিবিরকে সামাজিকভাবে বয়কট করার জন্য আবেদন জানিয়ে বলেন, এখন থেকে প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ওদের সঙ্গে কোন সমঝোতা নেই।

১৯ মার্চ, ২০১৩

কাবা শরীফ ও তার ইমামদের নিয়ে জামায়াত-বিএনপির মশকরা ও অবমাননা

বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর কাবা জাহেলি যুগেও আরব ও অন্যদের কাছে আধ্যাত্মিক স্থান হিসেবে বিবেচিত হতো। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর কাবা পরিণত হয় শুধু মুসলমানদের পবিত্র স্থানে। আগে কাবা সন্দর্শনে অমুসলমানরা যেতে পারলেও ৯ম হিজরীতে হযরত আলীকে (রা) রসুল (স) তাঁর প্রতিনিধি করে হজে পাঠান। হযরত আলী তখন ঘোষণা করেন কাবায় তখন থেকে শুধু মুসলমানরাই যেতে পারবেন।

বায়তুল হারাম, 'বাক্কা', 'বায়তুল আতিক'- এসবই আমাদের প্রিয় কাবার নাম। কাবা বিদ্রোহীদের চূর্ণ করে তাই বাক্কা। বাক্কা অর্থ ছিঁড়ে ফেলা। এটি সম্মানিত তাই বায়তুল হারাম। এটি পৃথিবীর প্রথম মসজিদ, মর্যাদাপূর্ণ, তাই বায়তুল আতিক।

বলা হয়ে থাকে ফেরেশতারা কাবা নির্মাণ করেন। তারপর আবার তা নির্মাণ করেন হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়া। হযরত নূহ (আ) এখানে হজ পালন করেন। কাবা অনেক বার বিনষ্ট হয়েছে। পুনর্নির্মিত হয়েছে।

আগে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে হতো। পরে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ হয়। রসুল (স) সব সময় মনে পোষণ করতেন কাবার দিকে তাকানোর। নবুয়ত পাওয়ার ১২ বছর পর আল্লাহ জানালেন- "আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাইয়া দিতেছি যাহা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা নিশ্চতভাবে জানে যে, উহা তাহাদের প্রতিপালনের প্রেরিত সত্য।"

প্রাচীনকাল থেকেই কাপড় দিয়ে কাবাকে আচ্ছাদিত করা হয়। সব সময় মহার্ঘ্য কাপড় দিয়েই কাবাকে আচ্ছাদিত করা হয়েছে। একে বলা হয় গিলাফ। এই গিলাফও মুসলমানদের কাছে পবিত্র। এখন সৌদি আরবের বিশেষ কারখানায় শুধু এ গিলাফ তৈরি করা হয় ও বছরে একবার বাদশাহ এসে তা বদলান।

অতিসংক্ষেপে কাবার ও গিলাফের ইতিহাস বর্ণনা করলাম শুধু এ কথা

বোঝাতে যে, একজন মুসলমানের কাছে কাবা বা গিলাফ কত পবিত্র।

আমরা বেশ কিছু দিন ধরে শুনছিলাম বাংলাদেশের বৃহত্তম আইনী সন্ত্রাসী গ্রুপ জামায়াতে ইসলামী ইবনে সিনা, ফোকাস, রেটিনা, ইসলামী ব্যাংক থেকে যে টাকা উপার্জন করে তা দু'হাতে বিলাচ্ছে। সরকারবিরোধী, ইসলাম, নাস্তিক- কোন তফাত নেই। শুধু তাই নয়, ইন্টারনেটেও জালিয়াতি করছে এবং এ জন্য অর্থ দিয়েও মানুষজন নিয়োগ দিয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ দিয়ে আবার কাবার প্রসঙ্গে আসব।

ব্লগার তাহমিদ যে ছিল জামায়াতী-বিএনপির ভাষায় নাস্তিক, হঠাৎ কয়েক দিন পর দেখা গেল শিবিরের নেতৃত্বে মিছিল করতে গিয়ে গুলি খেল। যে লেখিকা গরম গরম লেখা লিখে, বিজ্ঞাপন দিয়ে লেখিকা হিসেবে নাজেল হলেন বিদেশ থেকে, হঠাৎ দেখি তিনি ঘোষণা করলেন, যুদ্ধাপরাধীদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। শোনা গেছে, হঠাৎ তিনি প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়েছেন বিদেশে। হেফাজতে ইসলাম নামে যে গ্রুপ জামায়াতবিরোধী হিসেবে পরিচিত ছিল এখন দেখা যাচ্ছে তারা জামায়াতের রক্ষক। তাদের নেতাদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নাকি হঠাৎ স্ফীত হয়ে গেছে। আগে গ্রুপটি ছিল হাটহাজারীতে, এখন ঢাকায়ও তার শাখা তৈরি হয়েছে। ইনকাম ট্যাক্সের বিশাল বিশাল অফিসার আমাদের নাস্তানাবুদ করেন। দুদক সবার ওপর ছড়ি ঘোরায় কিন্তু তাদের এ্যাকাউন্টে যে বিস্তর টাকা এবং তারা যে ট্যাক্স দেয় না, সে ব্যাপারে নিশ্চুপ। হঠাৎ দেখা গেল, আওয়ামী লীগের কিছু নেতা মোলায়েম সুরে বিএনপির সমালোচনা করছেন। ভাবটা এমন যে, না করতে পারলেই ভাল হতো। হঠাৎ দেখা গেল, আওয়ামী এমপিরা সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে নিশ্চুপ। নিজ এলাকায় তারা যাননি। কেউ কেউ আবার হেফাজতের খুব ভক্ত হয়ে গেছেন। সাংবাদিক নেতাদের মধ্যেও গোলাম আযমের প্রতি এত ভক্তি আগে কেউ দেখেনি। তাদের দেখা গেল, যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাস্তায় নামতে। পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদে নেতৃত্ব দিতে, চাকরিবাকরি না থাকলেও চকচকে গাড়িতে ঘুরতে। অধিকাংশ মিডিয়া এমনকি কবি-সাহিত্যিক পরিচালিত সংবাদপত্রও দেখা যাচ্ছে বেশ মোলায়েম সন্ত্রাসীদের প্রতি। তারা ক্রুদ্ধ শেখ হাসিনা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি, যারা প্রতি মুহূর্তে বিএনপি-জামায়াত নেতাদের মানবাধিকার ক্ষুন্ন করছেন। সংবাদপত্রের ভারসাম্য রক্ষার ট্রপিজ খেলা থেকে বেরিয়ে এসেছে সম্প্রতি '*দি ডেইলি স্টার*।' বাংলাদেশের প্রগতিমনাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে পত্রিকাটি। তাদের 'ব্যালেন্স' খেলায় মানুষ যতটা না প্রশংসা করেছে পক্ষ নেয়ায় তারা তারচেয়ে বেশি প্রশংসিত হচ্ছে। একইভাবে এটিএন নিউজ ও সময় টিভি ব্যালান্স না করায় [অর্থাৎ সন্ত্রাসী, যুদ্ধাপরাধীও ভাল, আওয়ামী লীগও খানিকটা ভাল] বেশি দর্শক টানছে। *ডেইলি স্টার* সম্প্রতি ধর্ম

অবমাননাকারীদের নিয়ে জুলফিকার আলী মানিকের একটি চমৎকার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যা প্রমাণ করেছে এ দেশে এখন অপসাংবাদিকতা ও অপরাজনীতি হাত ধরাধরি করে চলছে। এ প্রতিবেদন আরও তুলে ধরেছে জামায়াত-বিএনপি আসলে ধর্মের নামে কেমন অধর্ম করছে।

গত দু'মাস জামায়াত-বিএনপির ব্লগাররা ব্লগ ও ফেসবুকে নানা জালিয়াতি করেছিল। তথ্য মন্ত্রণালয় অবশ্য এগুলো জানে না। তারা আরও জানে না, *আমার দেশ*, *নয়া দিগন্ত* ও *সংগ্রামের* সম্পাদকরা দাঙ্গা ছড়িয়েছে, প্রায় ১০০ মানুষ হত্যায় তাদের সুপিরিয়র রেসপনসিবিলিটি আছে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সুদর্শন মন্ত্রী ও সচিব জানেন না, দেশে একটি সন্ত্রাসবিরোধী আইন আছে। জানলে নিশ্চয় তারা ব্যবস্থা নিতেন। আমাদের প্রিয় মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এসব বিষয়ে আগে সংসদে, সেমিনারে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে যত না বক্তব্য রেখেছেন, এখন এসব বিষয়ে কেমন যেন উদাস হয়ে গেছেন। মন্ত্রী হওয়ার জ্বালা অনেক! যারা দাঙ্গা ছড়ায় তারা দোষী না, যারা বাস পোড়ায় তারা দোষী- এ রকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি এ সরকারেরই আছে। যা হোক, এই ফেসবুকের কিছু তথ্য, উল্লিখিত তিনটি পত্রিকা আবার সংবাদ আকারে ছাপিয়েছে। আমাদের সংবাদপত্র মালিক ও সম্পাদকদের আলাদা সমিতি আছে। তারা এই অনাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছে। সমিতি সমষ্টিগতভাবে বা সমিতির কেউ ব্যক্তিগতভাবেও দাঙ্গা সৃষ্টিকারী, ধর্মবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী, সুস্থ সংবাদপত্রবিরোধী এসব পত্রিকার সম্পাদক/মালিকদের কাছ থেকে এসব বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা চায়নি, নিন্দা করেনি। বাংলাদেশে একমাত্র নিরপেক্ষ টাকা। জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপি সেটা বুঝেছে।

ফেসবুকে কয়েক দিন ধরে বেশ কিছু ছবি চালাচালি হচ্ছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, একটি ছবিতে কাবা শরীফের গিলাফ হাতে কয়েকজন সম্মানিত সৌদি নাগরিক দাঁড়িয়ে আছেন। ওপরে শিরোনাম- 'বাংলাদেশের আওয়ামী কুকুরগুলো [ভাষা লক্ষ্য করুন] যেখানে মাওলানা সাঈদীর চরিত্রে কালিমা দেয়ার জন্য মরিয়া! সেখানে মাওলানা সাঈদীর সৎ চরিত্রের সাক্ষ্য দিচ্ছে পবিত্র কাবার ইমাম।' এ ছবি দেখলে স্বাভাবিকভাবে অনেকের মনে হবে, সাঈদী তো ধর্ষক, লুটেরা, তাবিজ বিক্রেতা নয়। সে তো মহান চরিত্রের নয়ত কাবা শরীফের ইমামরা তার পক্ষে এসে ব্যানার নিয়ে দাঁড়ায়! কারণ কাবা ও কাবার ইমাম ধর্মপ্রাণদের কাছে আল্লাহ-রসুলের (দ) পর মর্যাদা জ্ঞাপক।

এই একই ছবি ব্যবহার করে ৬ ডিসেম্বর *আমার দেশ* যে সংবাদটি করে তাহলো-

"আলেমদের নির্যাতনের প্রতিবাদে কাবার ইমামদের মানববন্ধন

আবুল কালাম আজাদ, সৌদি আরব

বিশ্বজুড়ে বিতর্কিত ট্রাইব্যুনালের নামে বাংলাদেশের আলেমদের ওপর যে নির্যাতন চলছে তার প্রতিবাদে গতকাল বাদ জুমা কাবার খতিব বিখ্যাত ক্বারী শাইখ আবদুর রহমান আল সুদাইসির নেতৃত্বে মানববন্ধন করেছে ইমাম পরিষদ। মানববন্ধনে শাইখ বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সঙ্গে পরিচিত। সারা দুনিয়ার যত সম্মানিত মানুষ কাবা শরীফের ভেতরে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করেছেন তিনি তার মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া মাওলানা নিজামীসহ যেসব আলেমকে কারাগারে নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত নির্যাতন করা হচ্ছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই। বাংলাদেশের মানুষ জানে, এই আলেমদের দোষ একটাই, তাহলো কোরানের খেদমত করা। আর যারা ইসলাম ও কোরানের খেদমত করে তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন নতুন কিছু নয়। মানবতাবিরোধী অপরাধের ধুয়া তুলে আলেমদের প্রতিহত করা কোন সচেতন মানুষ মেনে নেবে না। যে আদালতে স্বচ্ছতা নেই সেখানে কোন আলেম তো দূরে থাক সাধারণ মানুষেরও বিচার হতে পারে না। তিনি আরও বলেন, আল্লামা সাঈদী শুধু বাংলাদেশের মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব নন, তিনি সারা দুনিয়ার মানুষের প্রিয় মানুষ। যার নমুনা আমি লন্ডনের জাতীয় মসজিদে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেখেছি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে কুবা মসজিদের খতিব শাইখ আহমদ ইবনে আলী আল হুজায়ফিসহ বিভিন্ন মসজিদের খতিব ও সাধারণ মুসল্লিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা বাংলাদেশের আলেমদের ওপর সরকারের নির্যাতনে ক্ষুব্ধ হয়ে নানা ধরনের বাণী নিয়ে প্রতিবাদ করেন।"

আসলে ছবিটি কার? আগেই উল্লেখ করেছি কাবার গিলাফও পবিত্র। নতুন বছরে কাবার গিলাফ বদলানো হবে। বাদশাহর বিশেষ কারখানায় এই গিলাফ তৈরি হয়। যে গিলাফটি কাবাকে আচ্ছাদিত করবে ছবিটি ছিল সে ঘটনার। সেটি হয়ে গেল কাবার ইমামদের প্রতিবাদ! জামায়াত-বিএনপি ইন্টারনেটে এ জালিয়াতি করেছে দাঙ্গা বাধাবার জন্য, রাজনীতির জন্য। মাহমুদুর রহমান পত্রিকায় ছবিটি ছেপেছেন প্রতারণা করে। নিজেকে একজন প্রতারক হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন। প্রতারক মাহমুদুর ব্লগারদের নাস্তিক বলে প্রচার চালিয়েছেন, দাঙ্গা বাধিয়েছেন। তিনি এখন কাবা নিয়ে মশকরা করছেন।

রসুলের (দ) কার্টুন ছাপলে জামায়াত ও ধর্ম ব্যবসায়ীরা রাস্তায় নামে। ডেনমার্ক বাংলাদেশ থেকে অনেক দূর। সেখানে কী ছাপা হয়েছে তা নিয়ে ধর্মভিত্তিক দলগুলো কত না ব্যাকুল! আমেরিকার কোন খ্রীস্টান কোরান পোড়ানোর হুমকি দিলে জামায়াত ও ধর্মব্যবসায়ীরা রাস্তায় নেমে ভাংচুর করে। এই দেশে, যেখানে এখন কে বেশি মুসলমান তা নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছে, সেখানে পবিত্র কাবা,

গিলাফ ও ইমামদের নিয়ে প্রতারণা, ফেরেববাজি, মশকরা করা হয়েছে। এরা ধর্মদ্রোহী হিসেবে কেন চিহ্নিত হবে না? কেন এদের বিচার হবে না? ধর্মব্যবসায়ীদের অন্যান্য দল এবং জামায়াতবিরোধী ধর্মভিত্তিক দল তারাও কিন্তু কাবার এই অবমাননার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামেনি, কোন বক্তব্যও দেয়নি। তাঁরা বলবেন তাঁরা জানতেন না। কিন্তু এখন তো জানলেন। দেখি এবার তাঁদের মুরোদ! নাকি জামায়াতীদের টাকা সেই মুরোদও খেয়ে ফেলেছে। সৌদি আরবে রাজনীতি নিষিদ্ধ, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ, কাবার অবমাননা নিষিদ্ধ, তারাও কিন্তু জামায়াত-বিএনপির ব্যাপারে কোন বক্তব্য রাখেনি। কী কারণ? ১৯৭১ সালে তারা গণহত্যা সমর্থন করেছে। জামায়াত-বিএনপিকে নিয়মিত অর্থ যোগানদাতা হিসেবেও তাদের নাম শোনা যায়। ওহাবীবাদ প্রচারের জন্য এই টাকাটা দেয়া হয়। মওদুদীকে যখন জেলে রাখা হয়েছিল তখন সৌদি বাদশাহকে সমর্থন করায় পাকিস্তান তাকে মুক্তি দেয় এবং তখন থেকে জামায়াত সৌদি এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। প্রশ্নটা হচ্ছে কাবার এ রকম অবমাননার পরও কেন জামায়াতবিরোধী হিসেবে পরিচিত ধর্মভিত্তিক দল ও গ্রুপগুলো প্রতিবাদ করল না? এ বিষয়টিও কিন্তু ভেবে দেখা উচিত।

একইভাবে ডিসেম্বর ২০১২ সালের পত্রিকায় ছাপা হয়েছে 'তুরস্কে লাখো মানুষের সমাবেশ বাংলাদেশের জামায়াত নেতাদের মুক্তি দাবি। এ সংবাদটিও আবুল কালাম আজাদ ও এজাজ কাদরী তুরস্ক থেকে পাঠিয়েছেন। আবুল কালাম আজাদ মনে হয় খুব মালদার সাংবাদিক। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে খবরাখবর যোগাড়ে। তাঁরা বলেছেন কাদের মোল্লা ও সাঈদী প্রমুখ জামায়াত নেতাদের মুক্তির দাবিতে তুরস্কের কাদিকার স্কয়ারে শাদাত পার্টি লাখো জনতার সমাবেশ করে। আসলে সমাবেশটি ছিল নবীর (দ) প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। খুব সম্ভব ঈদ-ই মিলাদুন্নবীর র‍্যালি বা সমাবেশ।

ইসলামের নতুন ঠিকাদার হিসেবে খালেদা জিয়া এখন দায়িত্ব নিয়ে তরুণদের নাস্তিক হিসেবে উল্লেখ করছেন। বলেছেন, ভিটামিন-এ খাইয়ে সরকার শিশুদের মারছে। ফেসবুকে এ সংক্রান্ত একটি ছবিও ছাপানো হয়েছে। আসলে সেটি ছিল রোহিঙ্গা এক শিশুর, যার সঙ্গে ভিটামিন-এ'র কোন সম্পর্ক নেই। ফেরেববাজিতে তিনিও কম যান না!

রাজীব হায়দার নাস্তিক অতএব ব্লগাররা নাস্তিক অতএব শাহবাগের তরুণরা নাস্তিক- এ দাবি প্রথম তোলেন মাহমুদুর রহমান, তারপর *নয়া দিগন্ত* বা জামায়াত। এতে সুর মেলান খালেদা জিয়া ও বিএনপির নেতৃবৃন্দ এবং সবশেষে হেফাজতে ইসলাম। রাজীবের মৃত্যুর পর এভাবেই জামায়াত ও বিএনপির ব্লগাররা রাজীবের ব্লগে রসুলের (স) নামে কুৎসাপূর্ণ কিছু রচনা অনুপ্রবেশ করায়। *দৈনিক*

আমার দেশ কাল্পনিক সে ব্লগ ছেপে দেশজুড়ে দাঙ্গা সৃষ্টি করে। হেফাজতে ইসলাম এখন বিএনপি-জামায়াতের হয়ে সে আন্দোলন করছে। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য জামায়াত-বিএনপি ও তাদের অনুসারী ধর্মভিত্তিক দলগুলো আল্লাহ রসুলকে (স) নিয়ে তামাশা করছে, প্রতারণা করছে, ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে- তারা ধর্মদ্রোহী নয়, ধর্মদ্রোহী হলাম আমরা, যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের? আমেরিকার প্রিয় মডারেট রিলিজিয়াস পার্টি জামায়াত যে কী তার প্রমাণ ড্যান মোজেনাও যে পেলেন এ জন্য *স্টারকে* ধন্যবাদ।

কারণ মজেনাও নিজামী ও খালেদার মতো যুদ্ধাপরাধ বিচারের আন্তর্জাতিক মান ও স্বচ্ছতা চান। আপনারা নিশ্চিত থাকুন। সরকার এসব বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নেবে না, বিশেষ করে মাহমুদুর রহমান ও *নয়া দিগন্তের* ব্যাপারে। সেখানেও পয়সা খাওয়া লোকের অভাব নেই।

তাই যাঁরা ধর্মের পক্ষে, এসব প্রতারকের বিপক্ষে, যাঁরা দেশে সুস্থ সংস্কৃতি চান, তাঁদের কাছে আবেদন আমাদের লড়াই আমাদেরই চালাতে হবে। সে জন্য শুধু আধুনিক প্রযুক্তি নয়, বিভিন্ন মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী, বিএনপি ও তাদের নেতাদের ধর্মবিরোধী এবং জালিয়াতির প্রমাণ তুলে ধরুন।

২০ মার্চ, ২০১৩

মানি পানি বিরিয়ানি
ও
হেফাজতে জামায়াত ইসলামের রাজনীতি

ফার্স্ট রাউন্ডের খেলা এখন শেষ। দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা শুরু হলো মাত্র। আজকাল কোন একটি খেলা শেষ হলে, কম্পিউটার বিশ্লেষকরা ভিডিও দেখে প্রতিপক্ষের দুর্বল বা শক্তির জায়গাটা পরীক্ষা করেন। তারপর পরবর্তী খেলার কৌশল ঠিক করেন। এখন যে যত কথা বলুন, মেঠো বক্তৃতার দিন শেষ, দেশ দু'ভাগে বিভক্ত এবং পুরোটাই রাজনীতির অন্তর্গত। এক পক্ষে বিএনপি-জামায়াত এবং জামায়াতের নতুন সংগঠন হেফাজতে ইসলাম, যার নতুন নামকরণ করা হয়েছে হেফাজতে জামায়াত ইসলাম ও জাতীয় পার্টি। আর এদের ক্ষুদকুঁড়ো খেয়ে বেঁচে আছে যারা অর্থাৎ তাদের সমর্থনকারী ছোটখাটো দল। এ দলগুলো এখন থেকে হেফাজতের প্ল্যাটফর্মও ব্যবহার করবে। অন্যপক্ষে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সমস্ত দল, গ্রুপ, মানুষ। দেশ বিভক্ত করার যে বিষবৃক্ষ জেনারেল জিয়া বপন করেছিলেন তা এখন মহীরুহ। তাঁর স্ত্রী খালেদা এতদিন সেই মহীরুহের ডালে বসে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সেই নিরাপদ ডালটি এখন জামায়াত-হেফাজত কাটার আয়োজন করেছে। জামায়াত অনেকটা মাফিয়া চক্রের মতো। একবার তার সংস্পর্শে এলে বেরোবার উপায় থাকে না। খালেদা চাইলেও এখন সেই চক্র থেকে বেরোতে পারবেন না। তাঁকে জামায়াতের নির্দেশ মেনে কাজ করতে হবে। মতিয়া চৌধুরী ঠাট্টা করে বললেও, অবাক হব না, বাস্তবে যদি বেগম জিয়াকে জামায়াতে বিএনপির আমীরান হিসেবে ভার গ্রহণ করতে হয়। হেফাজতকেও এখন থেকে জামায়াত বা পাকিস্তান থেকে যে নির্দেশ আসবে তা মানতে হবে। জনাব শফি এতদিন প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেননি, তাই আমাদের রাজনীতির অন্তর্নিহিত নোংরামিটা বুঝতে পারেননি। এখন তিনি রাজনীতিতে এসেছেন, বিভিন্ন সাক্ষাতকার দিচ্ছেন এবং তাতে একটি লাভ হচ্ছে হেফাজতের রহস্য ঘুচে যাচ্ছে। স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে জামায়াতের মানি, বিএনপির বিরিয়ানি আর এরশাদের পানি ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। কিন্তু মজাটা হচ্ছে, হেফাজত বিএনপি ও জাতীয় পার্টির ভোটব্যাংক নষ্ট করছে। বিএনপির পক্ষের 'নিরপেক্ষ' ভোটও নষ্ট হবে। হেফাজত যত কথা বলবে, রাজনীতি করবে ততই আওয়ামী লীগ লাভবান হবে। তবে আওয়ামী লীগ ঘরে ফসল তুলতে পারবে কি

না সন্দেহ। এই দলে বিরোধী পক্ষের মৃদু সমর্থক একটি গ্রুপ আছে যারা পৃষ্ঠপোষকতার কারণে নেতা; যারা বিদ্যমান কাঠামো অর্থাৎ বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতা করে থাকতে চায়– কারণ, তাদের প্রতিপত্তি ও সম্পদ যাতে বিরোধী পক্ষ ক্ষমতায় এলে নষ্ট না হয়। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে তাদের সম্পর্কিত বিভিন্ন খবর ও বক্তব্য চৌদ্দ দল সম্পর্কে ঘোলাটে ধারণার সৃষ্টি করছে। এটি আবার চৌদ্দ দলের জন্য ক্ষতিকর। এঁরা বলেন, বাস্তব অবস্থা অত্যন্ত কঠিন যা তারা ছাড়া কেউ বুঝতে পারছেন না। হায়, বাকিরা সব অনভিজ্ঞ, নাদান, গজদন্ত মিনারে বাস করছেন! আমরা বরং বলব, বর্তমান পরিস্থিতিতে চৌদ্দ দলের যে কোন দোদুল্যমানতা হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের শামিল।

অনেকে বলছেন, বিশেষ করে সরকারী দলের নেতারা যে, হেফাজত একটি সামাজিক সংগঠন। বৃহত্তর অর্থে সব দলই সামাজিক সংগঠন। হয়ত হেফাজত এক সময় তা-ই ছিল। কিন্তু এখন আর তারা সামাজিক সংগঠন নয়, বরং জামায়াতের মতো ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠন। যদি তা না হতো, তাহলে তারা ১৩ দফা দাবি ওঠাত না, যার চরিত্র রাজনৈতিক। তারা জামায়াত, বিএনপি, জাতীয় পার্টির প্রতিনিধি পরিবেষ্টিত হয়ে সরকারকে হুমকি-ধমকি দিত না। ৬ তারিখ নির্মূল কমিটি ও গণজাগরণ মঞ্চে এবং ৮ তারিখ বিভিন্ন জায়গায় সহিংস ঘটনা ঘটাত না। সুতরাং সরকার যেভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহিংস ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে, হেফাজতকেও সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

হেফাজত কিভাবে রাজনৈতিক দল তা একটু বিশ্লেষণ করা যাক। শুধু ধর্মীয় সংগঠন হলে হেফাজত মাও সে তুংয়ের অনুসরণে 'লংমার্চ' কর্মসূচী গ্রহণ করত না। কারণ হেফাজত কমিউনিজমের বিরুদ্ধে। কিন্তু কেউ যখন রাজনীতি করে শত্রুকেও তখন তারা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। হেফাজত গত ৪০ বছর লংমার্চ কর্মসূচী দেয়নি, রাস্তায়ও নামেনি। কখন নামল? যখন জামায়াত-বিএনপি-জাতীয় পার্টি বিষোদ্গার শুরু করল শাহবাগের বিরুদ্ধে। এসব দলের নেতারা ক্রমেই অপাঙতেয় হয়ে উঠছিল। আর তাদের নোংরা অতীত তো সবার জানা। তারা স্পেস ফিরে চাচ্ছিল। যুদ্ধাপরাধ বিচার বানচালে তারা সুবিধা করতে পারছিল না। ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে ইসলামের নতুন ঠিকাদার মাহমুদুর রহমান মিথ্যা খবর ছাপা শুরু করলেন। সরকারে তার শক্তিশালী বান্ধব হয়ত আছে। না হলে মিথ্যা সংবাদ, মিথ্যা ব্লগিং ছাপার কারণে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয় না, কিন্তু তিনজন তরুণ ব্লগার গ্রেফতার হয়। হয়ত তারা এমন কিছু লিখেছে যা রুচিবিরুদ্ধ। কিন্তু *আমার দেশ* ও *নয়া দিগন্ত* যা করেছে তা কি রুচিসম্মত? গ্রেফতারকৃত তিন ব্লগার যদি ধর্মানুভূতিতে আঘাত দিয়ে থাকে তাহলে কাবার ছবি বিকৃত করে, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর ছবি বিকৃত করে ছেপে তো মাহমুদুর ও *নয়া দিগন্ত* শুধু ফেৎনা নয়

গোমরাহ সৃষ্টি করেছে। জানি না তথ্যমন্ত্রী এত সদয় কেন তাদের ওপর! জামায়াত ও মাহমুদুর অনবরত একতরফা প্রচার করে শাহবাগের আন্দোলন নাস্তিকতার আন্দোলন হিসেবে তুলে ধরে। উল্লেখ্য, মিডিয়া তাদের টক শোতে এই প্রচারকে বিস্তৃত হতে আরও সাহায্য করে। আরও উল্লেখ্য, সাগর-রুনীর হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থকদের সঙ্গে দু'বছর ইকবাল সোবহান চৌধুরীর সুযোগ্য নেতৃত্বে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসম্পন্ন' সাংবাদিকরা আন্দোলন করলেও, ধর্ম বিকৃতকারী, দাঙ্গায় উস্কানিদাতা, মিথ্যা ও বিকৃত রুচির সংবাদ পরিবেশন করা সত্ত্বেও 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসম্পন্ন' সাংবাদিকরা তার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এ পৃথিবীতে টাকা একমাত্র দলনিরপেক্ষ– যাকে বলে নির্দলীয়। ওপর থেকে ছেড়ে দিলেই হলো, কেউ লুফে নিলে তো বলা যাবে না সে টাকা খেয়েছে। জামায়াত প্রচুর টাকা ছড়িয়েছে, পত্রপত্রিকায় এমনও খবর এসেছে যে, হেফাজতের অনেক নেতার ব্যাংক এ্যাকাউন্ট স্ফীত হয়ে উঠেছে।

টাকা হলো এনার্জি ড্রিঙ্কের মতো। হেফাজত নেতাদের হঠাৎ জামায়াত-বিএনপি-জাতীয় পার্টির মতো মনে হলো শাহবাগ নাস্তিকে ভরা, শেখ হাসিনা নাস্তিক; শুরু হলো তাদের ভাষায় 'নাস্তিক' 'আস্তিকের' লড়াই– ঠিক যেমনটি চেয়েছে জামায়াত। হেফাজত তখন চট্টগ্রামে তরুণদের জনসভা ভন্ডুল করে দেয় এবং জামায়াতের নির্দেশে লংমার্চ ও ১৩ দফার ঘোষণা দেয়।

যখন ধর্ম নিয়ে কেউ ব্যবসা শুরু করে তখনই তার বিচ্যুতি শুরু হয়। টাকা খাওয়ার রাজনীতিটা তাই গোলমেলে। তখন ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার বানাতে হয়। হেফাজতের সভায় কী হয়েছিল? বাংলাদেশের চিহ্নিত সব ব্যভিচারী ও দুর্নীতিবাজ নেতাদের মঞ্চে সাদরে ডেকে নিয়েছে, স্বাগত জানিয়েছে। অথচ চরমোনাইর পীরের প্রতিনিধিকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে বা উঠতে দেয়া হয়নি। রাজনীতি না করলে বিএনপির সর্বোচ্চ সভার দু'জন সদস্য ও জাতীয় পার্টির একজনকে মঞ্চে নিয়ে বসাত না।

জামায়াত যেভাবে আচরণ করে হেফাজতও সেভাবে আচরণ করেছে। প্রথম দিন তারা লাঠিসোটা নিয়ে নির্দিষ্টভাবে নির্মূল কমিটির ও গণজাগরণ মঞ্চ আক্রমণ করেছে। পরের দিন ককটেল ফুটিয়েছে, গাড়ি ভেঙ্গেছে, রেললাইন অবরোধ করেছে, রেলগাড়ি আক্রমণ করেছে, সংবাদপত্র পুড়িয়েছে। দু'দিনই তারা সাংবাদিক ও তাদের গাড়ি আক্রমণ করেছে। শিবির রগ কাটে। হেফাজত পা কেটে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, জানা গেছে, মফস্বলে এক এলাকায় রিকশা থামিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ধর্ম পরিচয় জানতে চেয়েছে।

সবশেষে বলতে হয় লোক সমাগমের কথা। হেফাজত ৫০ লাখ লোক জড়ো

করবে বলেছিল। দেড় লাখের বেশি লোক হয়নি। যদি স্কয়ার ফুট হিসাব করেন তাহলে লোক আরও কমবে। এক লাখ স্কয়ার ফুট জায়গা যদি ধরি (বেশি ধরলাম) তাহলে কত লোক হয়। দুই স্কয়ার ফুটে ২ থেকে ৩ জন লোক ধরে। এটি অঙ্কের ব্যাপার, ভাবালুতার কোন অবকাশ নেই। এর মধ্যে ফখরুল বলেছিলেন এক লাখ দেবেন। সেটি হয়ত পারেননি। তবে বিএনপি-জামায়াত-জাতীয় পার্টি ও ধর্মব্যবসায়ীদের অন্যান্য দল কমপক্ষে ঢাকা থেকে এক লাখ লোক সাপ্লাই করেছে। সে কারণে, মানি, পানি ও বিরিয়ানির বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। তাহলে হেফাজতের লংমার্চে ৫০ থেকে ৭০ হাজার হেফাজতী এসেছে। এটি হলো বাস্তবতা এবং এ কারণেই একজন ব্যক্তি– যিনি 'স্বৈরাচারী', কামরুল হাসান কথিত 'বিশ্ববেহায়া', পত্রপত্রিকায় উল্লেখিত 'লম্পট' হিসেবে খ্যাত তাকে, দুর্নীতির বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত চোর ছ্যাচ্চোড় হিসেবে দু'জন বিএনপি ও চিনিচোর হিসেবে খ্যাত একজন স্বঘোষিত কমিউনিস্টকে মঞ্চে বসাতে হয়েছে। প্রতিটি জিনিসের একটি দাম আছে। হেফাজতকে রাজনীতি করতে হয়েছে; সুতরাং তাকে একটি দাম দিতে হয়েছে। আরও কারণ আছে, অনেক আলেম-ওলামা অভিযোগ করেছেন, হেফাজতের নেতারা ১৯৭১ সালে মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেছিল। এ অভিযোগের তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটি ঠিক হলে বোঝা আরও সহজ হবে– কেন তারা বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টিকে পছন্দ করে।

২.

জামায়াতের টাকা খেয়ে যখন আন্দোলন শুরু করছে হেফাজত এরকম অভিযোগ ওঠার পরই হেফাজত নেতারা বলতে শুরু করেন জামায়াতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। তাদের নেতা আল্লামা শফি পত্রিকায় দু'টি সাক্ষাৎকার দিয়ে জোরের সঙ্গে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। *কালের কণ্ঠে* ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, জামায়াতের সহযোগী বলার চেয়ে তাকে গুলি করা হোক। *দৈনিক সমকালের* সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেছেন "হেফাজতে ইসলাম একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত কখনও কোনো রাজনৈতিক বা কোন দলের পক্ষে বা বিপক্ষে যায়, এমন কোনো দাবি বা কর্মসূচি দিইনি আমরা। আমাদের এখনকার ১৩টি দাবিও ঈমান আকিদা ইসলাম ও নৈতিকতা সংশ্লিষ্ট। আসলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই একটি মহল হেফাজতে ইসলাম ও আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও জঙ্গীবাদের কল্পনাটক সাজিয়ে বিষোদগার করছে। জামায়াত থেকে টাকা নেয়ার কল্পকাহিনীও বলছে কিছু মিডিয়া। আসলে যত মিথ্যাচার ও অপপ্রচারই করা হোক না কেন, দেশের ইসলামপ্রিয় জনতা এতে মোটেও বিভ্রান্ত হবে না। তবু জামায়াতের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততা প্রমাণের চ্যালেঞ্জ দিলাম সরকারকে।" [৮-৪-২০১৩]

সমস্যা হলো ইউটিউবে একটি ফোনালাপ প্রচারের জন্য দেয়া হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে জামায়াত নেতা বুলবুল হেফাজতের এক নেতাকে ৫৬ মিনিট ধরে পরামর্শ দিচ্ছেন কীভাবে লংমার্চ করতে হবে। কীভাবে মঞ্চ ব্যবহার করতে হবে, ফখরুলের সঙ্গে দেখা করে লোক সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সর্বশেষে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে হবে। আপনি বলতে পারেন, ফোনালাপ হয়েছে, নির্দেশ দিয়েছে তো কী হয়েছে, জামায়াতের সঙ্গে তারা নেই। টাকা খাওয়া নিয়ে বলতে পারেন, টাকা খাইনি। প্রমাণ তো কেউ করতে পারবে না। হেফাজত ঘোষণা করেছিল ৩০ হাজার টাকা করে ১০০০ বাস তারা রিজার্ভের চিন্তা করেছিল। এখানেই লাগে ৩০ কোটি। ১০০০ বাসে ৫০ জন করে আনলে ৫০ হাজার লোক। তাদের থাকা খাওয়া বাবদ কত লাগে? এত বড় প্যান্ডেলের খরচ? হেফাজত করেন সাধারণ গরিব ঘরের মাদ্রাসার ছাত্ররা। তারা এত কোটি টাকা কী ভাবে যোগাড় করবেন? এখানে একটি প্রশ্ন করতে চাই। হেফাজতের নেতাদের কতজন আয়কর দেন? তাদের টিন নম্বর আছে কিনা? না থাকলে কেন নেই? এরা যদি আয়কর না দেন তাহলে আমরা কেন আয়কর দেব? আমার মনে হয়, তথ্য কমিশনে এ প্রশ্নটি করা উচিত।

জামায়াতে ইসলামের শত্রু বলে পরিচিত কওমী মাদ্রাসা। আল্লামা শফির হেফাজতকে সবাই তাই জানত। দুই কারণে তারা মওদুদী ইসলামের বিরুদ্ধে। এক মওদুদী ইসলামকে বিকৃত করেছেন। জামায়াত তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুরু হিসেবে মানে মওদুদীকে। বাংলাদেশে মওদুদীবাদ প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন মওলানা রহিম। জামায়াতের প্রথম আমির তিনিও। গোলাম আযমকে তিনিই রিক্রুট করেছিলেন। মওদুদীর বিভিন্ন রচনা বাংলায় অনুবাদ করতে করতে মওলানা রহিম তার ভুল বুঝতে পারেন এবং এসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তখন গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ তাকে দল থেকে বের করে দেয় এবং গোলাম আযম আমির হয়ে বসেন। মওলানা ফরিদউদ্দিন মাসউদকে মওলানা রহিম দুঃখ করে বলেছিলেন, ওরাতো আমাকে সুযোগ পেলে হত্যা করবে। মওদুদী ইসলাম কী ভাবে ফেতনা করে তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছে বাংলাদেশ ওলামা মাশায়েখ তৌহিদী জনতা সংহতি পরিষদ। আমি খানিকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি-

মওদুদী জামায়াতের মতাদর্শগত ভ্রষ্টতা নিছক রাজনৈতিক নয় বরং ইসলামের মৌল আক্বিদাগত। অতীত ইতিহাস সাক্ষী এরাই উগ্র জঙ্গীবাদের স্রষ্টা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের লালনকারী। নিম্নে এদের ভ্রষ্টতার কতিপয় উদাহরণ মওদুদী রচিত গ্রন্থাদি পেশ করা হলো-

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কটূক্তি

ইসলামের সুস্পষ্ট আক্বীদা হলো আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের জুলুমের

ঊর্ধ্বে। অথচ মওদুদী সাহেব আল্লাহর আইন যিনা করার শাস্তি রজমকে নিঃসন্দেহে জুলুম বলে উল্লেখ করেছেন। [তাফহীমাত-২ : ২৮১]

কুর্আন শরীফ সম্পর্কে কটূক্তি

আল-কুরআনুল কারীম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো, এতে কোনরূপে বিকৃতি ও অস্পষ্টতা নেই। অথচ মওদুদী সাহেব বলেন, পবিত্র কুরআনুল কারীমের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি বরং এর মূল প্রাণটিই দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে পড়েছে। [কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহে]

নিষ্পাপ নবী রাসূল সম্পর্কে মওদুদীর কটূক্তি

১.নবীগণ নিষ্পাপ নন, প্রত্যেক নবী গুণাহ করেছেন। [তাফহীমাত-২য় খন্ড, পৃষ্ঠা : ৪৩]

২.হযরত ইউনুস আ. নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেছেন। [তাফহীমুল কুরআন-২য় খ-, পৃষ্ঠা-১৯]

৩.হযরত মুহাম্মদ (সা) রিসালতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেন। [তাফহীমুল কুরআন, সুরা নাসর]

হযরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে কটূক্তি

মওদুদী সাহেব হযরত ইউসুফ আ. কে একজন স্বৈরশাসক হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, তিনি শুধুমাত্র একজন ডিক্টেটরই ছিলেন না। তিনি ইতালির মুসোলিনীর মতো একজন ডিক্টেটর ছিলেন। [তাফহীমাত-২য় খন্ড]

ন্যায়পরায়ণ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কটূক্তি

১. সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন এবং তারা অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য নয়। [দস্তুরে জামায়াতে ইসলামী, পৃষ্ঠা ০৭]

২. হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. দুর্বলমনা ও খেলাফতের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। [তাজদীদ ও ইহইয়ায়ে দ্বীন : পৃষ্ঠা : ২২]

৩. হযরত আলী রা. এমন কিছু কাজ করেছেন যাকে অন্যায় বলা ছাড়া উপায় নেই। খেলাফত ও মুলকিয়াত-১৪৩]

পীর-আউলিয়া এবং ওলামা-মাশায়েখ সম্পর্কে কটূক্তি

১. বর্তমানে যিনি তাজদীদে দ্বীন বা দ্বীনের সংস্কারের কাজ করতে চাইবেন, তাকে অবশ্যই সুফীদের ভাষা, পরিভাষা, রূপক উপমা, পীর-মুরিদী এমন জিনিস থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

২. বহুমূত্র রোগীকে যেমন চিনি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, মুসলমানদেরকে অনুরূপভাবেই পীর-আউলিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখা প্রয়োজন। [তাজদীদ ও ইহইয়ায়ে দ্বীন, পৃষ্ঠা : ৯৩]

আল্লামা শফি দেওবন্দ তরিকার। এই তরিকার বিখ্যাত সাধক আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী (র:)। আল্লামা শফি তার ছাত্র। খুব সম্ভব মওলানা

আশরাফ আলী থানভীর ছাত্রও তিনি। দেওবন্দের অনেকে জামায়াতের বিরোধিতা করেছেন। এমনকি শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক, হাটহাজারী মাদ্রাসার মুফতি ফয়জুল্লাহ, পাকিস্তানের মুফতি মুহম্মদ শফি মওদুদীর ইসলাম সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি–

১. মওদুদী জামায়াত পথভ্রষ্ট, তাদের আক্বীদা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও কুরআন হাদিসের পরিপন্থী। তাদের দলে শরিক হওয়া, সাথে কাজ করা, সহযোগিতা করা জায়েজ হবে না। [আওলাদে রাসূল, আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.]

২. মওদুদী নাপাক মিশ্রিত কথা বলে। [হাকীমুল উম্মত, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.]

৩. মওদুদী ইসলামী ফিকাহ [ইসলামী আইন শাস্ত্র] বাদ দিয়ে নিজের মনগড়া ফিকাহ তৈরি করেছেন। [আল্লামা ক্বারী তৈয়্যব রহ. দেওবন্দ, ভারত]

৪. মওদুদী জামায়াত কাদিয়ানী ফেতনা থেকেও মারাত্মক। [শায়খুল আদব মাওলানা ইজাজ আলী রহ. দেওবন্দ, ভারত]

৫. মওদুদী ফেতনা কাদিয়ানী ফেতনা থেকেও কম নয়। [ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম রহ.]

৬. জামায়াতে ইসলামী ও মওদুদীপন্থীদের ইমাম বানিয়ে নামাজ পড়া ঠিক জায়েজ হবে না। [মুফতি মুহাম্মদ শফী, পাকিস্তান]

৭. মওদুদী ধর্মভ্রষ্ট এবং ধর্মভ্রষ্ট মতবাদের প্রতি আহ্বানকারী। [আল্লামা ইউসুফ-বিন-নূরী, পাকিস্তান]

৮. মওদুদী জামায়াতে যোগদান করা নাজায়েজ, তাদের পিছনে নামাজ পড়া মাকরুহে তাহরিমী। অবস্থাভেদে নাজায়েজেও বটে।-শর্ষিনা আলীয়া মাদরাসার ফতোয়া।

৯. মওদুদী আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিপরীত আক্বীদা পোষণ করেন। মওদুদী দলের সঙ্গে ওঠা বসা ও সংশ্রব রাখা মুসলমানদের জন্য জায়েজ নয়। [মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ, হাটহাজারী মাদরাসা, চট্টগ্রাম]

১০. স্বার্থান্ধদের পক্ষে সবকিছু করাই সম্ভব। শুধু দুনিয়ার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার হীন মানসে তারা ইসলামের মূল ভিত্তিতে কুঠারাঘাত করে নড়বড়ে করে দিয়েছে দ্বীনের সৌধকে। পরিতাপ এই জন্য যে, এক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে তারা ইসলামকেই। নিঃসন্দেহে তারা সীমালঙ্ঘনকারী, তারা বাতিল। শুধরে নেবার যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছে। মিথ্যার বেসাতী করতে গিয়ে তারা সম্পূর্ণই অসত্যের ওপর অবস্থান নিয়েছে। বাতিলের ওপর কি জঘন্য দৃঢ়তা। এ কুখ্যাত সংকলক মাওলানা মওদুদী এবং তার পদলেহীরা দলিল প্রমাণ, সমালোচনা-

অনুরোধ কোনটিরও মূল্য দেয় না। [শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক; *বোখারী শরীফ* পরিশিষ্ট,পৃষ্ঠাঃ ২৪২।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মওলানা শফি জামায়াতের বিরোধিতা করবেন। এমনকি তিনি এবং হেফাজতের সম্পাদক এক ফতোয়ায় বলেছেন, ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখাও নাজায়েজ। কারণ, তারা সুদের ব্যবসা করে।

যুদ্ধাপরাধ বিচারের সঙ্গে সঙ্গে জামায়াত নিষিদ্ধের দাবি উঠেছে। শাহবাগ থেকে সে দাবি সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু হেফাজত এই দাবিতে সুর না মিলিয়ে যারা সেই দাবিতে সোচ্চার তাদের নাস্তিক বলেছে। এর মাজেজাটি কী? তাদের ১৩ দফায় এ দাবি নেই। তা হলে কি আল্লামা মাদানী ও আল্লামা থানভীর শিক্ষা বা দেওবন্দ তরিকা থেকে চ্যুত হয়েছে হেফাজত। এই জবাবটা পাওয়া জরুরী। জরুরী আরও এই কারণে যে, ৬ তারিখ হেফাজতের সভা থেকে এক বক্তা বলেছেন, "আমাদের ধমনীতে মাদানীর রক্ত।" (দেখুন, ইউটিউব]

ধমনীতে আল্লামা মাদানীর রক্ত থাকলে, জামায়াতের কার্যাবলীর সঙ্গে তাদের এত মিল কেন? আমাদের মুরতাদ ঘোষণা করে শাহবাগ সম্পর্কে কটূক্তিতে ভরা বিজ্ঞাপন কেন শুধু *নয়াদিগন্ত; সংগ্রাম* আর *আমার দেশে* ছাপা হলো প্রথমে।

আপনারা জানেন কিনা জানি না, শাহরিয়ার কবিরের একটি চলচ্চিত্রে মওদুদীর এক পুত্র বলেছেন, তার বাবা তাদের বলেছিলেন, জামায়াতে ইসলাম থেকে দূরে থাকতে কারণ তা মতলবি ইসলাম। মওদুদী কোন পুত্রকে জামায়াতে আনেননি এমনকি মাদ্রাসায়ও পড়াননি। গোলাম আযমও পুত্রদের জামায়াতে আনেননি, মাদ্রাসায়ও পড়াননি, বরং নাছারাদের দেশে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। কট্টর ইসলামী রাষ্ট্র সুদান বা সৌদিতেও নয়। হেফাজত কি শেষে এই মতলবি ইসলাম মেনে নিল?

কেন একথা বলছি? তারও একটি উদাহরণ দিই। হেফাজতের সভা থেকে আরেকজন বক্তা বলেছেন, আল্লাহ হযরত মুসাকে (আঃ) যেমন পাঠিয়েছিলেন ফেরাউনকে ধ্বংস করার জন্য। তেমনি আল্লামা শফিকে পাঠিয়েছেন শাহবাগীদের ধ্বংস করার জন্য [দেখুন, ইউটিউব] নাউজুবিল্লাহ্ যে ব্লাসফেমি আইনের আবদার করছে হেফাজতে জামায়াতী ইসলাম, সেই ব্লাসফেমি আইনে তো তারাই অভিযুক্ত হবেন। সাধারণ মানুষ কিন্তু, ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করে না। নীরবে যার যার ধর্ম তারা পালন করেন। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেই তখন মিথ্যা বলে, অর্ধ সত্য বলে, বিভ্রান্তিকর কথা বলে মানুষকে উত্তেজিত করতে হয়। শাপলা চত্বরে হেফাজত ও ১৮ দলের মানুষজন দেখেই তাদের মাথা পাগল পাগল লাগা শুরু হয়েছে। পাঁচ লাখ লোক দেখলে কী হবে? হযরত মুসা (আ:) আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় নবী, যিনি আল্লাহকে চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করেন। রসুল (দঃ) আল্লাহ্‌র

হাবিব। দুটোতে পার্থক্য আছে। সেই মূসা (আঃ) এর সঙ্গে হাটহাজারির এক মাদ্রাসার মৌলানা শফির তুলনা! আল্লাহ আর কত গোমরাহ দেখতে হবে।

হেফাজতের সঙ্গে যে জামায়াতের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে তার প্রমাণ সিলেটের তালেবান নেতা হাবিবুর রহমানের মঞ্চে উপস্থিতি। ইনি আফগানিস্তানে ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি বাংলাদেশকেও তালেবান রাষ্ট্র বানানোর ইচ্ছায় ভক্ত অনুসারী নিয়ে কওমী মাদ্রাসাগুলোয় জঙ্গী প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেন। গত শনিবারের লংমার্চ পরবর্তী সমাবেশে মাওলানা হাবিবুর রহমান বলেন, (শনিবারের) "সমাবেশ থেকে এক ঘোষণাতেই নবুয়ত কায়েম হতে পারে।" [*আমাদের সময়* ৮.৪.১৩] তালেবানদের সঙ্গে জামায়াতের গভীর সম্পর্ক। জঙ্গীদের সঙ্গে জামায়াতের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ। শাহরিয়ার কবিরের এক প্রামাণ্যচিত্রে দেখান হয়েছে, কওমী মাদ্রাসাগুলোতে বিশেষ করে হাটহাজারি মাদ্রাসায় কীভাবে জঙ্গী উৎপাদিত হচ্ছে। মওলানা শফির উল্লিখিত সাক্ষাৎকারে যা বলেছেন এবং আমি যে বিবরণ দিলাম তাতে কি মনে হয় না তিনি সত্য এড়িয়ে গেছেন?

৩.

হেফাজত হঠাৎ করে ১৩ দফা দাবি তুলেছে। এ দাবিগুলোর কিছু বিভিন্ন সময় জামায়াতী নেতারা তুলেছেন। দেশে এখন এই ১৩ দফা নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে।

দাবিগুলো হচ্ছে–

১. সংবিধানে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' পুনঃস্থাপন এবং কোরআন-সুন্নাহবিরোধী সব আইন বাতিল।

২. আল্লাহ, রাসূল (সা.) ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাস।

৩. শাহবাগ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী স্বঘোষিত নাস্তিক-মুরতাদ এবং প্রিয় নবী (সা.)-এর নামে কুৎসা রটনাকারী ব্লগার ও ইসলামবিদ্বেষীদের সব অপপ্রচার বন্ধসহ কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা।

৪. ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতার নামে সব বেহায়াপনা, অনাচার, ব্যভিচার, প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, মোমবাতি প্রজ্বলনসহ সব বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

৫. ইসলামবিরোধী নারীনীতি, ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাতিল করে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা।

৬. সরকারিভাবে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা এবং তাদের প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রমূলক সব অপতৎপরতা বন্ধ করা।

৭. মসজিদের নগর ঢাকাকে মূর্তির নগরে রূপান্তর এবং দেশব্যাপী রাস্তার মোড়ে ও কলেজ-ভার্সিটিতে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন বন্ধ করা।
৮. জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সব মসজিদে মুসল্লিদের নির্বিঘ্নে নামাজ আদায়ে বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং ওয়াজ-নসিহত ও ধর্মীয় কার্যকলাপে বাধাদান বন্ধ করা।
৯. রেডিও. টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে দাড়ি-টুপি ও ইসলামী কৃষ্টি-কালচার নিয়ে হাসিঠাট্টা এবং নাটক সিনেমার নেতিবাচক চরিত্রে ধর্মীয় লেবাস-পোশাক পরিচয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মনে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব সৃষ্টির অপপ্রয়াস বন্ধ করা।
১০. পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত এনজিও এবং খ্রিস্টান মিশনারিগুলোর ধর্মান্তরকরণসহ সব অপতৎপরতা বন্ধ করা।
১১. রাসুলপ্রেমিক প্রতিবাদী আলেম-ওলামা, মাদ্রাসার ছাত্র ও তৌহিদি জনতার ওপর হামলা, দমন-পীড়ন, নির্বিচার গুলিবর্ষণ এবং গণহত্যা বন্ধ করা।
১২. সারাদেশের কওমী মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক, ওলামা-মাশায়েখ ও মসজিদের ইমাম-খতিবকে হুমকি-ধমকি, ভয়ভীতি দানসহ তাঁদের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র বন্ধ করা।
১৩. অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত সব আলেম-ওলামা, মাদ্রাসাছাত্র ও তৌহিদি জনতাকে মুক্তিদান, দায়ের করা সব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং আহত ও নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণসহ দুষ্কৃতকারীদের বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। [*কালের কণ্ঠ*.৭-৪-১৩]

দাবিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এগুলোতে সারবস্তু তেমন নেই। যারা এ দাবি তৈরি করেছেন তারা যে এদেশে ও তার মানুষজন সম্বন্ধে খুব কম জানেন এটি তারই উদাহরণ। এখানে লক্ষণীয়, তাদের ভাষায় শাহবাগের যে 'নাস্তিক'দের বিরুদ্ধে আন্দোলন সেটি নেমে এসেছে তিন নম্বরে। ১ নং দাবির বিরুদ্ধে সংবিধানে কিছু নেই। ২ নং দাবি সম্পর্কে বলা যায় ধর্ম অবমাননাকারীর জন্য শাস্তি র বিধান রেখে আইন আছে। ৩ নং দাবি মানা হয়েছে। অর্থাৎ সরকার যাদের মনে করে 'কুৎসা রটনাকারী তাদের ধরা হয়েছে। ৫ নং দাবির আংশিক ইতোমধ্যে মানা হয়েছে। আপনারা জানেন কিনা– কওমীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য যে কারিকুলাম করা হয়েছে তাতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সব পর্যায়ে বাধ্যতামূলক। অথচ, কারিকুলামের প্রস্তাবনায় আছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত করতে হবে। এই কারিকুলাম থেকে ইচ্ছা করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাদ দেয়া হয়েছে। আমরা সবসময় দাবি করে এসেছিলাম বাংলাদেশের (১৯৪৭-১৯৭০) ইতিহাস যেন সব পর্যায়ে সব শাখায় বাধ্যতামূলক করা হয়। আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি, এই

কারিকুলাম কমিটিতে আমাদের প্রিয় তিনজন সেক্যুলার ব্যক্তিত্ব আছেন– ড. খলীকুজ্জমান, ড. জাফর ইকবাল ও সচিব ড. কামাল চৌধুরী। যেদিন এটি অনুমোদিত হয় সেদিন তারা ছিলেন কিনা জানি না। না থাকলেও পরে তারা এর প্রতিবাদ করেননি। আপনারা কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবেন? নিজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছাড়া তো উপায় দেখছি না। ধর্ম শিক্ষা দেয়া হোক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু জাতীয় ইতিহাস কেন পড়ানো হবে না? সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর হয়তো ইচ্ছা দেশে হেফাজতির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাক।

৬নং দাবিটি প্রতিবছর জামায়াতীরা একবার করে। ৭নং দাবির ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। হেফাজতের একজন নেতা সিলেটের উল্লিখিত সেই জঙ্গী মওলানা হাবিবুর রহমান এ আন্দোলন করেছেন এবং করবেনও। ৮নং দাবির বিরুদ্ধে সরকার কিছু করেনি। বরং জামায়াত মসজিদে আগুন দিচ্ছে, মসজিদকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করছে। হেফাজত আগামী শুক্রবার যে কর্মসূচী দিয়েছে তাও জামায়াতের অনুরূপ।

৯ নং ও ১০ নং দাবি প্রায়ই উত্থাপন করা হয়। ৯ থেকে ১৩ নং দাবির কোন সারবত্তা নেই। সরকার এখন অনায়াসে বলতে পারে হেফাজতের দাবি মেনে নেয়া হচ্ছে, বাকিগুলোও বিবেচনা করা হবে।

হেফাজতের যে দাবি নিয়ে বিতর্ক চলছে তা হলো নারী সংক্রান্ত ও ব্লাসফেমি আইনের প্রবর্তন। প্রথমে বলে নেয়া ভাল এদের ২, ৪, ৫, ৬, ৭ দাবি মানতে গেলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। বর্তমান সরকারের পক্ষে তা সম্ভব হবে না। বিএনপি-জামায়াত জাতীয়পার্টি যদি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠ নিয়ে ক্ষমতায় আসে তা হলে হয়ত সংবিধান সংশোধন করে এ দাবিগুলো মেনে নেয়া হতে পারে।

হেফাজতের নারীনীতি আফগান তালেবানী সরকারের নীতির অনুরূপ। এ নীতি গ্রহণ করলে গ্রামীণ ব্যাংক, বাংলাদেশের সমস্ত গার্মেন্টস সেক্টর, তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেক্টর, প্রাথমিক শিক্ষা, বিভিন্ন পেশা বন্ধ করে দিতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতির সমস্ত প্রবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে। এই দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি। লক্ষণীয়, এই দাবি মানলে বাংলাদেশের দরিদ্র পরিবারগুলো সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে বিএনপির নেতৃত্বের কিছু আসে যায় না। তারা যথেষ্ট সম্পদ পাচার করেছে, ছেলেমেয়েরা তাদের বিদেশে থাকে। এরশাদ তো নারী ছাড়া থাকতে পারেন না; এটি তার প্রাক্তন স্ত্রী বিদিশাই তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন। সেই এরশাদও এখন এই দাবি সমর্থন করেন। কারণ, টাকা দিয়েও এখন আর নারী- বেষ্টিত থাকা যাচ্ছে না। টাকার জন্য আজকাল লোলচর্ম বৃদ্ধ কেউ আর পছন্দ করে না। জামায়াতের নেতৃবৃন্দের ছেলেমেয়েরাও

নাছারাদের দেশে থাকে। তারা চাচ্ছে ধর্মীয় উন্মাদনা জাগিয়ে তুলে সরকার পতন ও ক্ষমতা দখল। দেশে নারীদের, গরিবদের কী হলো তাতে কিছু আসে যায় না। দেশের সম্পদ লুট করার সুযোগ পাবে এবং তা পাচার করে চলে যাবে। দেশ তাদের কাছে বড় ব্যাপার নয়, নিজে এবং নিজের পরিবার বড় ব্যাপার। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, হেফাজতের দাবি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রের বিরোধী।

হেফাজত ঘোষণা করেছে তাদের ১৩ দফা না মানলে কেউ ক্ষমতায় আসতে পারবে না। থাকতেও পারবে না। ইতোমধ্যে হেফাজতের মধ্যে ক্ষমতার মদমত্ততা চলে এসেছে। এর একটি উদাহরণ দিই। একটি টেলিভিশন চ্যানেলে আলোচনাসভায় হেফাজতের এক নেতা-বাচ্চা এক মৌলানা সদম্ভে শোলাকিয়ার ইমাম প্রবীণ মুহাদ্দেস আল্লামা ফরিদউদ্দিন মাসউদকে বললেন, মৌলানা মাসউদ হচ্ছেন তসলিমা নাসরিনের মতো, বিতর্কিত।

নারী নেতৃত্ব নিয়ে বিতর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল– খালেদা জিয়ার স্থান কী হবে? হেফাজতের দাবি মানা হলে খালেদা কি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন? সেই বাচ্চা মৌলভী টেলিভিশনে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, খালেদার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হবে। তবে, বিএনপি জামায়াত ও আওয়ামীবিরোধী মহিলাদের ক্ষেত্রে কোন ছাড় দেয়া হবে না। ফ্যাশন প্যারেড করে ঘোরাফেরা বন্ধ। সিনেমা-ফ্যাশন তো বন্ধ হবেই। কিন্তু মূল কথা হলো, ক্ষমতায় যেতে হলে যদি ধর্মের ক্ষেত্রে খানিকটা ছাড় দিতে হয়, তা হলে দেয়া যাবে। জামায়াতও তাই মনে করে। তারা এও মনে করে, প্রয়োজনে মিথ্যা বলা জায়েজ।

ব্যতিক্রম আরো করা হচ্ছে। স্বঘোষিত নাস্তিক কবি ফরহাদ মাজহার যেহেতু জামায়াত-বিএনপি চিন্তা- আধারের [থিংক ট্যাংক] প্রধান সেহেতু জামায়াত-হেফাজত তার বিরুদ্ধে নিশ্চুপ। শুধু তাই নয় ইসলামের স্বঘোষিত ঠিকাদার মাহমুদুর রহমানের *দৈনিক আমার দেশ* ও যুদ্ধাপরাধী আলবদর মীর কাশেম আলীর *নয়া দিগন্তে* নিয়ত তার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। হেফাজত ও জামায়াতে ইসলামী কি ফন্দিবাজ ইসলাম মনে হচ্ছে না? কারণ, জামায়াত বিএনপি প্রতিদিন শাহবাগের তরুণদের নাস্তিক বলে উল্লেখ করছে। হেফাজত তাদের সভায় 'শেখ হাসিনার গালে জুতা মার' স্লোগান দিয়ে তাকে নাস্তিক ঘোষণা করছে, কিন্তু স্বঘোষিত নাস্তিক, লম্পট, চোর-ছ্যাচ্চড়দের বিরুদ্ধে তারা আশ্চর্যজনকভাবে নিশ্চুপ। না, এখানেই শেষ নয়। আল্লামা শফি *সমকালের* সেই সাক্ষাতকারে যা বলেছেন তা আরও বিভ্রান্তিকর, অনেকাংশে পুরো সত্য নয়। আমি খানিকটা উদ্ধৃত করছি–

"আল্লামা শফি হেফাজতে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপের জোরালো প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে।

সংবিধান থেকে আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা ও বিশ্বাসের নীতি তুলে দেয়া, নতুন প্রবর্তিত ধর্মহীন শিক্ষানীতি, হিজাব পালনে নারীদের বাধ্য করা যাবে না বলে হাইকোর্টের রায়, রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রতিষ্ঠা, ফতোয়াবিরোধী হাইকোর্টের রায়, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহ বাদ দেয়ার চেষ্টা, ঢালাওভাবে আলেম-ওলামা ও কওমী মাদ্রাসার সঙ্গে জঙ্গীবাদের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে অপপ্রচার, হাইকোর্টে কোরান সংশোধনের জন্য মামলা এবং ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের চেষ্টার বিরুদ্ধে আগেও আন্দোলন করেছি আমরা। এখন আন্দোলন করছি আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা) অবমাননাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে। খেয়াল করলে দেখবেন, হেফাজতের কোন আন্দোলনেই নেই রাজনীতির বীজ। হেফাজতে ইসলাম তার এই অরাজনৈতিক ভূমিকা ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে।" [ঐ]

এবার বিশ্লেষণ করা যাক-

১. 'সংবিধান থেকে আল্লাহর...'-এটি ঠিক নয়, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম এখনও আছে।
২. 'নতুন প্রবর্তিত ধর্মহীন শিক্ষানীতি'-এটি ঠিক নয়। নতুন শিক্ষানীতিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ধর্মকে।
৩. 'হিজাব পালনে'... এই রায় সম্পর্কে জানা নেই। যদি রায় আদালতের হয় তা হলে সরকারের কিছু করার নেই।
৪. 'রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি'... এটি আংশিক সত্য। তবে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল থাকায় এই নীতি কার্যকর নয়।
৫. 'ফতোয়াবিরোধী হাইকোর্টের...' এখানে সরকারের করার কিছু নেই। তাছাড়া মাদ্রাসায় যারা পড়বে তারাই ফতোয়া দিতে পারবে– এমন ইসলামী আইন কোথাও নেই।
৬. 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহ বাদ দেয়া'– এটি ঠিক নয়।
৭. 'ঢালাওভাবে কওমী...' এটি অস্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে কথাটা অসত্য নয়।
৮. 'হাইকোর্টে কোরান সংশোধন...' এটি সঠিক নয়।
৯. 'ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ...' এটি ঠিক নয়। জামায়াত নিষিদ্ধ মানেই ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ– এটি ভেবে নিলে অন্য কথা।
১০. 'আন্দোলন করছি আল্লাহ...' এটি বিভ্রান্তিকর উক্তি। এটি ঠিক হলে ব্যভিচারি, স্বঘোষিত কমিউনিস্ট, চোর হিসাবে খ্যাতদের মঞ্চে নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করা হতো না এবং ইসলামী চিন্তা ট্যাংকির প্রধান হিসাবে স্বঘোষিত নাস্তিকদের মেনে নেয়া হতো না। আগে ফরহাদ মজহার বা শফিক রেহমানকে নাস্তিক ঘোষণা করে যদি অন্যদের ঢালাওভাবে নাস্তিক বলা হয়,

তা হলে তার না হয় একটা যৌক্তিকতা খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে।

১১. 'হেফাজতের কোন আন্দোলনেই নেই রাজনীতির...' এটি ঠিক নয়। আল্লামা শফির সমস্ত বক্তব্যই রাজনৈতিক এবং জামায়াতধর্মী। লক্ষ্য করুন, মওলানা শফির সাক্ষাতকারে উল্লিখিত ১১টি পয়েন্টের মধ্যে ৮টি ঠিক নয়। বাকি তিনটি আংশিক সত্য। জামায়াত এসব 'দাবি' প্রায়ই তোলে। এই হচ্ছে জামায়াত। এই হচ্ছে হেফাজত। এরপরও যদি কেউ বলে বা বিশ্বাস করে জামায়াতের সঙ্গে হেফাজতের কোন সম্পর্ক নেই তাহলে সেই পুরনো প্রবচনটিই আবার উদ্ধৃত করতে হবে 'হায়রে কপাল মন্দ, চোখ থাকিতে অন্ধ।'

৪.

বর্তমান রাজনৈতিক আলোচনায় হেফাজত ও ভোটের সমীকরণের বিষয়টিও চলে এসেছে। খালেদা এরশাদ ও নিজামীর শিষ্যরা যে মানি পানি ও বিরিয়ানি নিয়ে হাজির হচ্ছে তার বড় কারণ ভোট। এদের সম্মিলিত ইচ্ছা, হেফাজতের ভোট যাতে আওয়ামী লীগে না যায়- সব ভোট যেন তাদের বাক্সে পড়ে। এতে কোন জটিলতা নেই। কিন্তু জটিলতা অচিরেই দেখা দেবে। প্রশ্ন, হেফাজত নারীদের যেভাবে শেকল পরাতে চায় বিএনপির ও জাতীয় পার্টির নারীরা তা মেনে নেবেন কিনা? গ্রামাঞ্চলের গরিব নারীরা মেনে নেবেন কিনা? এরশাদের তো লাজলজ্জা বলে কিছু নেই, কখনও ছিল না। হেফাজতের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার পরও [যা বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গেও সংহতি প্রকাশ] কেন মন্ত্রিসভায় তার ভাইকে রেখে দিচ্ছেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

আওয়ামী লীগও যথেষ্ট তোয়াজ করছে হেফাজতকে ভোটের জন্য। বারবার বলা হচ্ছে, হেফাজতে জামায়াত ও বিএনপি ঢুকে যাচ্ছে। তাতে কি? হরতালের দায়দায়িত্ব যদি বিএনপি-জামায়াত নেতাদের ওপর বর্তায়, তাহলে হেফাজতের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায়িত্বও বর্তায় হেফাজতের নেতাদের ওপর। হেফাজতের সঙ্গে আলোচনা চলছে, তাতে আপত্তি নেই; সেই আলোচনা বিএনপির সঙ্গেও চলতে পারে। কোন কোন মন্ত্রী নিজেদের এলাকার কথা চিন্তা করে হেফাজতকে অতিমাত্রায় তোয়াজ করছেন যা দল, নেত্রী ও দেশের জন্য ক্ষতিকর। মহিউদ্দিন চৌধুরীর অনেক কার্যকলাপ আমাদের পছন্দ নয়; কিন্তু তৃণমূলে মহিউদ্দিন নেতা, হাছান মাহমুদ নন। সেখানে মহিউদ্দিন চৌধুরীকে বাদ দেয়ার বিষয়টিও সবাই মনে করছে পৃষ্ঠপোষকতার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হিসেবে। আওয়ামী লীগও হেফাজতকে তোয়াজ করতে পারে, করেছেও। এবং এর ইতিবাচক ফলও পেয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে তারা ঢাকা ছেড়েছে খালেদা জিয়ার বুক ভেঙ্গে। কিন্তু তোয়াজ মানে নিজের জমি ছাড় দেয়া নয়। বেশি তোয়াজ বিপত্তি ঘটাবে যার

লক্ষণ ইতোমধ্যে দেখা যাচ্ছে। হেফাজত নেতারা ঘোষণা করছেন, শাহবাগ মঞ্চ ভেঙ্গে তারা ইসলামী মঞ্চ করবেন এবং ব্লাসফেমি আইনের পরিপ্রেক্ষিতে হাসিনার দেয়া বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। ধারণা হচ্ছিল, আওয়ামী লীগ জমি ছেড়ে দিচ্ছে; এতে তৃণমূলে অনেকে ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। কিন্তু শেখ হাসিনার বিবিসির সাক্ষাতকার অনেক কিছু স্পষ্ট করেছে। অনেকে আশ্বস্ত হয়েছেন। আসলে মূল কথা হলো, শেখ হাসিনা ছাড়া আওয়ামী লীগের কোন নেতার ওপর তৃণমূলের আস্থা বা বিশ্বাস কোনটাই নেই। তাদের ধারণা নেতারা, বিশেষ করে পৃষ্ঠপোষকতায় যারা নেতা তারা যে কোন সময় দল ও নেত্রীকে বেচে দিতে পারে নির্দলীয় নিরপেক্ষ অর্থের বিনিময়ে।

ভোটের অন্য সমীকরণও আছে। কওমীরা দু'ভাগে বিভক্ত। আল্লামা শফি বিরোধী কওমী ও অন্যান্য ধর্মভিত্তিক দল ও গ্রুপের এখন এলাকাভিত্তিক ও মহাসমাবেশ করে তাদের শক্তি প্রদর্শন করা উচিত। কারণ, ইসলামী দলগুলোর কেউ কোন বিষয়ে একমত নয়। সুতরাং তাদের সব দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যান্য ইসলামী দল জামায়াত ও হেফাজতকে ইসলামী দল মনে করে না। তারা যদি এরকম মহাসমাবেশ করে দাবি তোলে জামায়াত ও হেফাজত নিষিদ্ধ করতে হবে। হেফাজত নেতাদের ইনকাম ট্যাক্স পরীক্ষা করতে হবে এবং তাদের নেতারা মানবতাবিরোধী অপরাধ ও জঙ্গীবাদের সঙ্গে যুক্ত কিনা তা তদন্ত করতে হবে,– তা হলে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান কী হবে? কারণ হেফাজতের দাবি মানলে এদের ভোট পাওয়া যাবে না এবং সেটির পরিমাণ হেফাজত থেকে কম নয়।

সমীকরণ আরো আছে। বিএনপি-জামায়াত-জাতীয়পার্টি নারী, বিশেষ করে গরিব নারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। নারী সংগঠন ও উন্নয়ন কর্মীদের অঞ্চলভিত্তিক ও পরে মহাসমাবেশ করে ঘোষণা করা উচিত যারা হেফাজতকে সমর্থন করেছে তাদের ভোট দেয়া হবে না। কারণ তারা ক্ষমতায় এলে নারী পণ্যদ্রব্যে পরিণত হবে। এবং যারাই হেফাজত ও জামায়াতের দাবি মানবে তাদের ভোট দেয়া হবে না। কমপক্ষে মোট ভোটের ৪০ ভাগ নারীদের। খালেদা এরশাদ যেমন নিজ স্বার্থে নারীদের ত্যাগ করেছেন। সব নারী এককাট্টা হয়ে তাদের ত্যাগ করুন। সরকার হেফাজতকে তোয়াজ করলে তারাও ভোট পাবে না। দেখা যাক সরকার ও রাজনৈতিক দল ৪০ ভাগে আগ্রহী নাকি এক ভাগে আগ্রহী?

সমীকরণ আরো আছে। গতবার আওয়ামী লীগ, অনুমান করা হয় তরুণদের প্রায় দেড় কোটি ভোট পেয়েছিল। গত ৫ বছরে এর সঙ্গে আরও প্রায় কোটিখানেক তরুণ ভোট যোগ হয়েছে। এরা সব অবলোকন করছে। আওয়ামী লীগ যদি তাদের নাখোশ করে তাহলে তিন কোটি ভোট হারাবে। তরুণদেরও এখন বোঝা

উচিত রাজনীতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাদের বুঝতে হবে বিএনপি-জামায়াত, জাতীয় পার্টি ও হেফাজত তাদের বিরুদ্ধে। তাদের এখন মেঠো স্লোগান আর পতাকা মিছিল নয়, পরিষ্কার ভাষায় বলতে হবে, যারা তাদের বিরোধিতা করছে তরুণরা তাদের ভোট দেবে না। এখন সরাসরি পক্ষ নিতে হবে। এ দেশে নির্দলীয় নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই। কেউ একথা বলার অর্থ যে, সে দোদুল্যমান। তরুণদের আন্দোলনে দোদুল্যমানতা ক্ষতিকর। তাদের পক্ষের ছাত্রনেতাদের নিয়ে তাদের অগ্রসর হতে হবে। না হলে তারুণ্যের জাগরণ নিছক কথার কথা থেকে যাবে; আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা তাই বলে। তরুণরা যদি এখন বলে, তরুণ চেতনাবিরোধী জামায়াত-বিএনপি-হেফাজত; জাতীয় পার্টিকে ভোট দেব না তখন দেখব এরা আর কটূক্তি করে কিনা। বা সরকার যদি জামায়াত বা হেফাজতকে ছাড় দেয় তাহলে ১৪ দলকে ভোট দেব না, তখন দেখা যাবে আওয়ামী লীগের অর্থশালী সমঝোতা গ্রুপের অবস্থান কী হয়।

সুতরাং ভোটের সমীকরণটা এত সোজা নয়। আমি বা আমাদের অনেকে ১৪ দলের সমর্থক। রাজনীতির স্বার্থে এক পা পিছিয়ে, দু'পা এগুলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু মৌলিক প্রশ্নে ছাড় দিলে আমরা তা মানব না। ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায়ও তা মানবে না। সুতরাং আওয়ামী নেতৃত্বের সে বিষয়টিও মনে রাখা উচিত। তারা আজকাল প্রায়ই একটি কথা বলেন, আচ্ছা, এরা ভোট না দিয়ে যাবে কোথায়? তারাতো বিএনপি-জামায়াতকে ভোট দেবে না। না, তা দেবে না; তবে, না ভোট দেয়ার এবং ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার বিকল্প কিন্তু আছে।

১০ এপ্রিল, ২০১৩

মৌলবাদী হলে এ রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই

অপরিমিত কোন কিছুই জীবনচর্চার জন্য প্রীতিপদ নয়। পরিমিতিবোধ জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর রাখে। এটি কোন আপ্তবাক্য নয়, বহু দিনের অভিজ্ঞতার ফল।

আমাদের দেশে এখন পরিমিতিবোধ লুপ্তপ্রায় শব্দে পরিণত হয়েছে। রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ কোনখানেই পরিমিতি শব্দটির দেখা মিলবে না। রাজনীতিতে যাঁরা আছেন তাঁদের সবাই কখনও না কখনও ক্ষমতায় ছিলেন। সামরিক শাসকরা ছিলেন। কে পরিমিতবোধ দেখিয়েছেন? জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় থাকার জন্য কয়েক হাজার সেনা খুন করিয়েছেন বিচারের নামে, বাংলাদেশের মৌল চরিত্রের বদল ঘটিয়েছেন এবং ধর্মকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছেন, ঘাতকদের ক্ষমতায় বসিয়েছেন, ঋণখেলাপীদের সৃষ্টি করেছেন। একাত্তরের ঘাতক শুধু নয়, বিভিন্ন শ্রেণীর ঘাতককে ছাড় দিয়েছেন। জাগপা নামে কয়েকটি ব্যক্তির পার্টির প্রধান শফিউল আলম প্রধানকে বঙ্গবন্ধু আমলে কয়েকজন ছাত্রকে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন দেয়া হয়েছিল। জিয়া তাকে ছেড়ে দেন।

এরশাদ একই কাজ করেছেন। তবে জিনা, টাকা চুরিতে বাংলাদেশে কেউ তাকে এখনও হারাতে পারেনি। এসব ব্যভিচার আড়াল করতে তিনি রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করেন। বাঙালী তাকে ধরে নিল ইসলামের রক্ষক হিসেবে। অথচ এই বাঙালী ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য ১৯৭১ সালে প্রাণ দিয়েছিল।

বেগম জিয়ার দুই আমল দুর্নীতি, এথনিক ক্লিনজিং, ঘাতকদের ক্ষমতায় আসীন, প্রতিষ্ঠান বিনষ্ট করার সময়। তার আশপাশের লোকজন ঠগ, খুনী, বর্ণচোরা হিসেবে সমাজে পরিচিত। তার দুই পুত্র আন্তর্জাতিকভাবে দুর্নীতিবাজ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তিনি হচ্ছেন ইসলামের রক্ষক। 'ইসলাম বিপন্ন' এই বুলি প্রায়ই তার মুখে শোনা যায়। অথচ জীবনচর্চায় ইসলামের কোন চিহ্ন আছে বলে তার কোন বন্ধুও বলবে না।

আওয়ামী লীগের দুই আমলেই দুর্নীতি হয়েছে, পরিমাণে কম হতে পারে, হয়েছে এবং হচ্ছে- এটি প্রধানমন্ত্রী ছাড়া সবাই কমবেশি জানেন। দুই আমলই, বিশেষ করে এই আমলে ধর্মবাজদের ও সামরিক বাহিনীকে তোষণ ছিল সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। পার্টিতে এবং সরকারে অযোগ্য লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার জন্য

আওয়ামী লীগ বিশেষভাবে খ্যাত। বিশেষ করে ব্যক্তিটি যদি খানিকটা বিএনপি ও জামায়াত ঘেঁষা হয় তা হলে তো কথাই নেই। গোপালগঞ্জ হলে সব মাফ। এ কথা কারও মনে থাকে না, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু জন্মেছেন বটে, কিন্তু সেখানে 'মুফতি' হান্নানের মতো পাষ-ও জন্মেছে, যে বঙ্গবন্ধুকন্যার হত্যার সঙ্গে জড়িত।

এসব কারণে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ধর্মনিরপেক্ষ যে রাষ্ট্র গঠনের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজ প্রায় ধর্ম [ইতিবাচক অর্থে নয়] রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। যেসব ঘটনা ইদানীং ঘটছে, তাতে কারও যদি সন্দেহ হয় ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। তাহলে বোধহয় দোষ দেয়া যাবে না।

পাকিস্তান আমলে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় পোষকতা দেয়া হয়েছে। তারপরও বলব ধর্ম নিয়ে এত বাড়াবাড়ি হয়নি। তা সত্ত্বেও লড়াইটা হয়েছিল ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার জন্য। ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞাও বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন যা যুক্তিযুক্ত। ১৯৭১ সালে ধর্মের নামে এ রকম অধর্ম হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতিবিদদের ধর্মের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়েছিল। পাকিস্তানী মানস ১৯৭১ সালে মুছে ফেলা যায়নি। যে কারণে খুব সম্ভব ১৯৭৩ সালে ১৯৭১-এর অন্যতম পরিকল্পনাকারী ভুট্টো ঢাকা এলে বাঙালীরা রাস্তার দু'পাশে লাইন করে দাঁড়িয়েছিল, বঙ্গবন্ধুকে ওআইসিতে যেতে হয়েছে। সুতরাং জাতি হিসেবে ১৯৭১ সাল ছাড়া গর্ব করার কিছু আমাদের নেই এবং সেটিও থাকবে না, কারণ; ১৯৭১ সালে যারা যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের একটা বড় অংশ খুনী জামায়াতীদের সঙ্গে শুধু হাতই মেলাননি, তাদের সঙ্গে থেকে গর্ববোধ করছেন।

বঙ্গবন্ধু ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি। করতে দেনওনি। তিনিই বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান যিনি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। কেউ কোন আপত্তি করেনি। হয়ত ১০টি বছর ধারাবাহিকভাবে তিনি শাসন করতে পারলে ধর্মব্যবসাটা হতো না। ধর্মবোধটা থাকত।

ধর্মটাকে ব্যবসা হিসেবে প্রথম গ্রহণ করেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। বলা নেই কওয়া নয়, তিনি আমাদের মুসলমান করাতে চাইলেন। যেমন, জামায়াত এখন কোথাও কোথাও আওয়ামী লীগারদের মসজিদে নিয়ে তওবা করিয়ে মুসলমান বানাচ্ছে। সংবিধানের ওপর নিজের মুসলমানত্ব জাহির করার জন্য বিসমিল্লাহ বসালেন। যে লোকটি রক্তগঙ্গা বইয়ে ক্ষমতায় এলেন তিনিই ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করলেন। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন এবং দেশটি যে পাকিস্তানে বা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করে সে জন্য রাজাকার আলবদরদের ক্ষমতায় আনলেন।

এরশাদের মতো স্বৈরাচারী, ব্যভিচারী আটরশির পীর, আলবদর আবদুল

মান্নান, মসজিদ নিয়ে এমন মাতামাতি শুরু করলেন যে, মাদ্রাসাভিত্তিক দল/গ্রুপ তার সমর্থক হয়ে উঠল। এরশাদ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে কাজটি করলেন, তাহলো রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করে। এ রকম একটা খবিশ এ রকম একটা খচরামি করলেন কিন্তু দিব্বি এখনও রাজনীতি করে যাচ্ছেন। এ জন্য বলছিলাম বাঙালীর দিলে প্রবল সমস্যা আছে। এ জাতি ভ-ামি পছন্দ করে।

ইসলামবিরোধী যত কাজ আছে তার সব কিছু বিএনপি ও খালেদা জিয়া করেছেন। রাষ্ট্রীয় পোষকতায় তিনি জঙ্গীবাদের প্রসার ঘটিয়েছেন। অনবরত মিথ্যা বলেছেন। নিজে, পরিবার ও দল দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেছে। তার সবচেয়ে বড় ধর্মবিরোধী কাজ জামায়াতকে ক্ষমতায় বসান এবং রাষ্ট্রীয় পোষকতায় বিরোধী দলের নেতাকে হত্যার চেষ্টা।

গত তিন দশক দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্ম শুধু পোষকতা পেয়েছে এবং ধর্ম যাতে, 'অটুট' থাকে বিভিন্নভাবে তার বন্দোবস্ত নেয়া হয়েছে। যেমন, রাষ্ট্রীয় ভবনগুলোর দেয়ালে আয়াতের অংশ, বিমানবন্দরে আরবী হরফে নাম, বক্তৃতা-বিবৃতির আগে যাতে সবাই শুনতে পায় সে রকমভাবে 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ ইত্যাদি। গণমাধ্যমের দুই অংশেই পত্র-পত্রিকা এবং দূরদর্শনে ধর্ম সম্পর্কে একটি পৃষ্ঠা বা স্লট বরাদ্দ, এমপিদের হাজিরা দিতে হয় নিয়মিত ওয়াজ মাহফিলে। প্রাথমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বেশি নজর দিতে হয় মাদ্রাসায়। এর কিছু ব্যত্যয় হলেই চিৎকার ওঠে ধর্ম গেল ধর্ম গেল।

আওয়ামী লীগ বা মৃদু বাম দলগুলোকে সাধারণত ধরে নেয়া হয়- তারা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করবে না বা করে না। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের ধারকবাহক হিসেবে তাদেরই বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ধর্মব্যবসা ও ধর্ম বিভ্রান্তির টাইফুনে তারাও জেরবার। যে কারণে শেখ হাসিনা তাহাজ্জুদের নামাজ থেকে শুরু করে ধর্মকর্মের সব মানলেও তাকে ধরা হয় কম মুসলমান, কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু হিন্দুদের রক্ষক হিসেবে। আর খালেদা জিয়ার সঙ্গে নিত্যধর্ম পালনে ঘাটতি থাকলেও তাকে মনে করা হয় সাচ্চা মুসলমান, মুসলমানদের রক্ষক- যিনি জিহাদ রক্ষা করবেন। ১৯৭৫ সালের পর থেকেই এই অবস্থা, তা নয়। সেই চল্লিশ দশক থেকেই অদ্ভুত এক মানসিক গড়ন তৈরি হয়েছে উপমহাদেশে। দ্বিজাতিতত্ত্ব যতই জোরালো হয়েছে ততই সে তত্ত্ব ধমনীতে একেবারে মিশে গেছে। সে কারণে হ্যাম খাওয়া, ইসলামের সঙ্গে অসম্পর্কিত, মদ্যপানে অভ্যস্ত, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হয়ে ওঠেন ইসলামের ধারক। আর গড়ের মাঠে এক দশক ঈদের নামাজে ইমামতি করা, সমসাময়িককালে সবচেয়ে বড় ইসলামী প-িত হিসেবে পরিচিত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাধারণ্যে প্রতিভাত হন হিন্দুদের রক্ষক, অবুঝ মুসলমান হিসেবে।

মৌল এবং জঙ্গীবাদী এ ধারণা আরও ব্যাপ্ত হয়েছে ভোটের রাজনীতির

কারণে। সামরিক শাসক, বিএনপি ও জামায়াতী নেতারা ভোটের কারণে, ধর্মব্যবসায়ী উগ্রপন্থী এই দলগুলোকে উসকেছেন এবং নিয়ত এই প্রক্রিয়া চালু রেখেছেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতারা এর বিপরীতে তোষামোদের পন্থা অবলম্বন করেছেন। তারাও 'বিসমিল্লাহ' বলে সব বক্তৃতা শুরু করলেন, মাদ্রাসা ব্যবস্থাকে যতটা পারা যায় সুবিধা দিলেন এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম অক্ষুণ্ণ রাখলেন। অবশ্য তাদের পক্ষের যুক্তি আজকের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাদ দিলে আজ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হতো যে, আওয়ামী লীগকে বিজেপি বলতেও কেউ দ্বিধা করত না। কারণ, নিয়ত ধর্ম ধর্ম করায় গ্রামীণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত মহলেও এর প্রভাব পড়েছে। জামায়াত ও বিএনপির এবং মাদ্রাসাসেবীদের একটি অংশের আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ক্রোধের কারণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা এসেছে বা পাকিস্তান ভেঙ্গেছে। সুতরাং সবমিলিয়ে পরিস্থিতি একেবারে সরল নয়, বরং জটিল।

জামায়াত বা বিএনপির ইসলামপ্রীতি কেন ভ-ামি তার একটি উদাহরণ দিই। ব-্যাসফেমি আইন পাস করার জন্য আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেই জোর দাবি ওঠে। বা তের দফার মতো দাবিগুলো উত্থাপিত হয়। বিএনপি দু'বার জামায়াত একবার ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু ব-্যাসফেমি আইনের কথা তোলেনি, ইসলামী দলগুলো তাদের কাছে কোন 'ইসলামী দাবি' তোলেনি, বেলেল্লাপনাকেও এক ধরনের জায়েজ বলে ধরে নিয়েছে তখন। আওয়ামী লীগকে সব সময় এদের তোষণ করতে হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে হেফাজতে ইসলামের কথা ধরা যাক। এটি এখন প্রমাণিত যে হেফাজতে ইমান বা হেফাজতে বাংলাদেশ না হয়ে হেফাজতে জামায়াতী ইসলামী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রমাণ সাম্প্রতিককালে জামায়াতী ধরনের হিংস্রতা, জামায়াত-বিএনপির পক্ষে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান ও টাকা খাওয়া। সরকার তাদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আপোসরফা করতে চেয়েছে হেফাজত মানেনি। মানবেও না। কারণ, সরকারের আলোচনা প্রক্রিয়া ও নমনীয়তাকে তারা দুর্বলতা হিসেবে ভাবছে। ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী। শেখ হাসিনা কৌশলী বক্তব্য রেখেছেন যে, মদিনা সনদ অনুসারে দেশ চলবে। ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলে এ বক্তব্যে সন্তোষ প্রকাশ করত। কিন্তু লক্ষ্য করবেন হেফাজত ঘোষণা করেছে, শেখ হাসিনা তামাশা করছেন। বা অধিকাংশ ধর্ম-দল এতে সন্তে াষ প্রকাশ করেনি। কারণ তারা ধর্মপ্রাণ নয়, ফন্দিবাজ মুসলমান।

আওয়ামী লীগের মাথায় একটি ভোটের হিসাব আছে যা দ্বিজাতিতত্ত্বের মতো অপরিবর্তনীয়। এই শব্দটি ব্যবহার করছি এ কারণে যে, স্বাধীন হওয়ার পরও রাজনীতিবিদরা এর চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। সেটি হলো বিএনপি-জামায়াত

বিচ্ছিন্ন হলে আওয়ামী লীগের লাভ। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বিচ্ছিন্ন হলেও জামায়াত কখনও নৌকায় ভোট দেবে না। কারণ সেটি মওদুদীবাদের বিরোধী। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগ পাকিস্তানকে হারিয়ে স্বাধীন হয়েছে, এটি তাদের কাছে এক ধরনের ধর্মদ্রোহিতার মতো। কওমীদের একাংশ ভোট দেবে না। ফন্দিবাজ মুসলমানদের যতই তোষণ করা হোক না কেন তারা ভোট দেবে না। আওয়ামী লীগ জেতে দোদুল্যমান ভোটাররা বিএনপির ওপর নাখোশ হলে। সংখ্যালঘু ভোটেও বিভক্তি এসেছে। গয়েশ্বর রায়রা এর প্রমাণ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিকল্প এখন খোলা ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি নিশ্চিত যে, জামায়াত আর কখনই আওয়ামী লীগে ভোট দেবে না। কারণ ১৯৭৫ সালের পর এই প্রথম শেষ বছর জামায়াতকে সাইজ করছে সরকার। তারা এখন দুর্বল। যুদ্ধাপরাধ বিচারে বিএনপি ছাড়া সবাই পক্ষে। এমনকি হেফাজতীরাও। হেফাজতকে এখন ভাল হওয়ার উপদেশ দেয়া শ্রেয় এবং বলে দেয়া ভাল- না হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কারণ হেফাজতবিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রুপ খানকাহ শরীফ, আহলে সুন্নত, তরিকত প্রমুখ তরিকার যারা জামায়াতকে মুসলমান মনে করে না। এমনকি জামায়াতী ইমামের পেছনে নামাজ পড়াটাও নাজায়েজ মনে করে। হেফাজত জামায়াত বিএনপি জাতীয় পার্টি নারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এতে তরুণরা বিক্ষুব্ধ। এ সমস্ত মিলে ভোটের পাল্লা জামায়াত-হেফাজতীদের বিরুদ্ধে। আশ্চর্য এই যে, আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলো এ সুযোগে এসব গ্রুপকে সংঘবদ্ধ করতে পারত।

এই সুযোগ না নিয়ে আওয়ামী লীগ কেমন যেন স্থাণু হয়ে গেছে। ধর্মীয় ফন্দিবাজদের তোষণের বদলে এদের তোষণ করা ভাল। ফন্দিবাজরা যদি টাকার বদলে কাজ করে, তাহলে এদের বিরুদ্ধ গ্রুপদেরই টাকা দেয়া শ্রেয়। কারণ ফন্দিবাজদের টাকার চাহিদা মেটান যাবে না। এ রকম একটা বিকল্প কেন আওয়ামী নেতৃত্ব নষ্ট করছে, তা একমাত্র সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বই বলতে পারবে।

একটি কারণ হতে পারে তাদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। সরকারী নেতৃত্ব নির্ভরশীল গোয়েন্দা রিপোর্ট ও নিরাপত্তাকর্মীদের ওপর। গোয়েন্দা রিপোর্টই একমাত্র সঠিক তা নয়। এবং ডিজিএফআই সব সময় নিজের বিকল্প খোলা রাখবে। প্রধানমন্ত্রী ও সরকার এবং দলকে একমাত্র শর্তহীন সমর্থন দেবে সিভিল সমাজের একটি বড় অংশ যারা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে তাকে শুধু সজীব নয় ক্ষমতায় যেতে সহায়তা করে। সিভিল সমাজে কুশীলব থেকে দল ও সরকার মোটামুটি বিচ্ছিন্ন।

আরেকটি ধারণা কাজ করে সরকারে থাকলে যে, তারা যা বলছে বা যা শুনছে

তা সঠিক। সঠিক হলে আওয়ামী লীগকে আজ এত বিপাকে পড়তে হতো না। এই ধারণাও কাজ করে যে, সিভিল সমাজের বড় অংশ যেহেতু আদর্শের প্রতি অনুগত সেহেতু তারা জামায়াত-বিএনপিতে ভোট দেবে না। সামনের নির্বাচন হতে পারে সহিংস। আওয়ামী লীগকে বাঁচাতেই হবে- এ দৃঢ়তা নিয়ে কেউ ভোট দিতে যাবে না এটি নিশ্চিত। আর ভোট দিতেই হবে এ গ্যারান্টি কেউ কাউকে দেয়নি।

তরুণরা যুদ্ধাপরাধ প্রশ্নে যেভাবে জেগে উঠেছিল তাও অতিকৌশলের কারণে ম্লান। হেফাজতের দাবি তরুণদের আরও বিক্ষুব্ধ করেছে। এই ভোট সংখ্যা নারী ভোট সংখ্যার সমান। এটি উপেক্ষা করে মৌলবাদীদের সঙ্গে যে কোন ধরনের সমঝোতা আত্মঘাতী।

সরকার ও আওয়ামী লীগ হেফাজতে জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতায় আগ্রহী। কিন্তু সেই সমঝোতা নিজের জমি ছাড়ার সমঝোতা হতে পারে না। সেটি ছাড়লে মৌলবাদকে শুধু প্রশ্রয় নয় আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংকে ধস নামবে। তৃণমূল ও মধ্য পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী, তরুণ, নারী কেউ জমি ছাড় দিয়ে সমঝোতা মানবে না। যতই আপ্তবাক্য শোনান দলের অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়বে। সময় বদলেছে, বদলাচ্ছে- এটি যত দ্রুত নেতৃত্ব বুঝবেন তত ভাল।

অন্তিমে বলব, মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদ সব সময় আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়ে আজ এক বিধ্বংসী দৈত্যে পরিণত হয়েছে। হেফাজত এর উদাহরণ। আমাদেরও ইসলামের ঢাল ব্যবহার করতে হচ্ছে এবং ইসলামতত্ত্ব প্রচার করতে হচ্ছে। এভাবে দেশটি ক্রমেই মৌল-জঙ্গীবাদের দেশে পরিণত হচ্ছে। আওয়ামী লীগ, ১৪ দল, সরকার সবার এখন বলা উচিত- যথেষ্ট হয়েছে আর নয়। দৈত্যকে বোতলে ঢোকানোর জন্য হেফাজত-জামায়াতবিরোধী মৌলানা, তরুণ ও নারীদের নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। যদি সরকার, ১৪ দল এ প্রশ্নে ছাড় দেয় তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমাদেরই যার যার অবস্থান থেকে নামতে হবে। দেশটি শুধু আওয়ামী লীগ বা ১৪ দলের নয়। এ দেশ মৌলবাদী দেশে পরিণত হলে এ দেশ থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই।

২১ এপ্রিল, ২০১৩

রাজাকার, রাজাকারপন্থী, রাজাকারের বাচ্চাদের কর্তৃত্ব এ দেশে আর হবে না

৩ মে শাপলা চত্বরের জনসভায় শিফন পরিহিত খালেদা জিয়ার হাসি ও ঠাট্টা করার ভঙ্গিতে বক্তৃতা শেষ করায় চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। তার হাসি ও ঠাট্টা জীবননাশী। এমনিতে শুধু আমরা নই, মধ্যবিত্ত ও রাজনীতি বিমুখ অনেকে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন হেফাজতে ইসলামের ঢাকা অবরোধ ঘোষণায়। বিএনপি জামায়াত ঘেঁষা বা নিরপেক্ষ অনেক বিজ্ঞ, টিভিতে এই তত্ত্ব দিচ্ছিলেন যে, এতদিনে একটি তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব হলো এবং তা হলো হেফাজতে ইসলাম। তাদের খুশির কারণ, হেফাজত জামায়াত-বিএনপির অনুগত।

আমরা ঘরপোড়া গরু। ৩ মে খালেদা জিয়া যখন চকচকে পোশাক-আশাকে প্রফুল্ল চিত্তে জনসভায় এলেন তখনই শঙ্কিত বোধ করলাম। এর আগে তার সহযোগী শক্তি হেফাজতে ইসলাম ঘোষণা করেছিল, ৬ তারিখে নতুন সরকার গঠন করবে। শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সহযোগী, হাটহাজারী মাদ্রাসার আহমাদ শফীকে। হাসিনাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে অর্থাৎ আওয়ামী লীগকে হানাদারদের সহযোগীর কাছে আবার আত্মসমর্পণ করতে হবে- এটি অশেষ তৃপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল খালেদার কাছে। তার প্রয়াত স্বামী বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন পাকিস্তানকে পরাজিত করার জন্য। আর তিনি প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর কন্যার বিরুদ্ধে। এটি তার জন্য আরও আনন্দের, কারণ, ১৯৭২ সালে তাকে যেতে হয়েছিল মাথা নিচু করে বঙ্গবন্ধু কন্যার কাছে সাংসারিক সমস্যা মেটানোর জন্য।

যাক, খালেদা জিয়া জনাব শফীর অনুচরদের সে ঘোষণা মনে রেখেছিলেন। তাই সমবেত সমর্থকদের জিজ্ঞেস করেছিলেন তারা ২৪ ঘণ্টা অবস্থান করবেন কীনা। তিনি, খালেদা একটি ঘোরের মধ্যে ছিলেন, তাই হেফাজতের নামটি পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন। তার সহকারী একজন যিনি এখন নেতা তবে প্রাক্তন লাঠিয়াল ও হাইজ্যাকার, তাকে হেফাজতের নাম মনে করিয়ে দিলেন এবং তারপর খালেদা ঘোষণা করলেন, যেহেতু হেফাজত সমাবেশ করবে সেহেতু সরকারকে তাদের দাবি মেনে নেয়ার ৪৮ ঘণ্টা আল্টিমেটাম দেয়া হলো।

আমরা অনেকেই তখন শঙ্কিত। খালেদার ঘোষণার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আমি ও আমার বন্ধুরা সেলফোন কোম্পানির খাতে মোটা টাকা গচ্চা দিলাম। আমরা অনুমান করছিলাম, হেফাজত যে কোনভাবে ঢাকায় ঢুকবে এবং অবস্থান নেবে। ৫ তারিখ সন্ধ্যায় ৪৮ ঘণ্টা পুরো হলে বিএনপি-জামায়াত (হেফাজতেও তারা আছে সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি ও টুপি পরে) মিলিত হবে হেফাজতীদের সঙ্গে। তাদের মিলিত শক্তি পতন ঘটাবে 'নাস্তিক' হাসিনার। বিজয়ী হবেন শফী-খালেদার নতুন প্যানেল। *দৈনিক জনকণ্ঠে* ওইদিনই একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিএনপি নেতাদের সঙ্গে ইতোমধ্যে হেফাজতী নেতাদের আলাপ-সালাপ হয়েছে এবং হেফাজতীদের কোন্ কোন্ মন্ত্রণালয় দেয়া হবে সে সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। খালেদার মুখে হাসি থাকবে না তো আমাদের থাকবে!

সেদিন রাতে বহুদিন পর খালেদা চমৎকার ঘুম ঘুমিয়েছেন বলে অনেকের অনুমান। আমাদের কেটেছে বিনিদ্র রজনী। সকালে তাই ফোন করে ঘুম ভাঙ্গালেন আমার বন্ধু শাহরিয়ার কবির। শাহরিয়ার সবসময় বিপ্লবী উত্তেজনায় আক্রান্ত এবং প্রায় সময়ই এ কারণে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন এবং তার রাতের চিন্তা ও তত্ত্ব সকালে আমাদের কাউকে না কাউকে শুনতে হয়। খুব সকালে ফোন করলে ধরে নিতে হবে, বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সারারাত তিনি জেগেছিলেন। দেরিতে ফোন করলে বুঝতে হবে, বয়সের কারণে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শাহরিয়ারের তুলনায় আমি খানিকটা ভীতু। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লন্ডনের ভিসা আছে? শাহরিয়ার জানালেন, ভিসা আছে, টিকেট নেই। আমি জানালাম, দু'টার কোনটিই আমার নেই। কী হবে? উদ্বেগের হেতু হিসেবে জানালাম, ৬ তারিখ শফী-খালেদার সরকার হবে। আমাদের তো বাঁচার উপায় নেই। আর ১৪ দলের নেতারা তো সবার আগে পালাবেন ২০০১ বা ২০০৬-এর মতো। শাহরিয়ার জানালেন, ভিসা টিকেট থাকলেও তিনি ১৪ দলের নেতাদের মতো আচরণ করবেন না। তিনি জনগণের সঙ্গেই থাকবেন। তাছাড়া এ সরকারের দুঃসময়ে পাশে থাকা নৈতিক কর্তব্য। বুঝলাম, তার সঙ্গে আলোচনা চালানো বৃথা। বাস্তব বোঝা তার পক্ষে কঠিন। ১৪ দল বা নির্দিষ্টভাবে আওয়ামী লীগ যে অনেক আগে থেকেই কোটারির বাইরের সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে এবং পরামর্শ, সাহায্য-সহায়তা যে অনাকাঙ্ক্ষিত এটি বোঝার ক্ষমতা আমার বন্ধুটি ক্রমেই হারাচ্ছে বলে আমার ধারণা। অবশ্য, এটিও বলি তার কথা কখনও কখনও আবার ঠিকও হয়ে যায়।

আসলে, সব আমলেই আমাদের অবস্থা খারাপ। আমরা বলতে পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী যারা মুক্তিযুদ্ধ ও ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিশ্বাসী। বঙ্গবন্ধু আমলে, সম্পত্তি হারানো থেকে মাঝে মাঝে ধাওয়া খাওয়া ছিল আমাদের অনেকের

ললাট লিপি। অন্তত আমাদের পরিবারের। জাতীয় পার্টির আমলে প্রায় সময়ই দৌড়াতে হয়েছে, লাঠির বাড়িও পড়েছে পিঠে, হাতে। স্বৈরাচারী ও ব্যভিচারী জেনারেল এরশাদ আমলের একটি দিনের কথা মনে পড়লে দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়। অধিক ওজনের জনপ্রিয় নাট্যশিল্পী আলী যাকের হাঁসফাঁস করে দৌড়াচ্ছেন, পিঠে এরই মধ্যে পুলিশের লাঠির একটি বাড়ি খেয়েছেন। তার পাশে থাকা শিল্পী হাশেম খান ও তার পিছে থাকা আমি হাতে লাঠির বাড়ির জ্বালা সামলাতে সামলাতে দৌড়াচ্ছি। ওই আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার রুমে বোমা পেতে রাখা হয়েছিল। অল্পের জন্য বেঁচে যাই। খালেদা জিয়ার প্রথম আমলে মুরতাদ ঘোষিত হই এবং উদ্যমী ছাত্রদল সমর্থকের পিস্তলের গুলি ও আরেকবার তাদের ছোঁড়া ভারি পাথর থেকে রক্ষা পাই। দ্বিতীয় আমলে অনেকে জেলে যাই, শাহরিয়ার দু'বার। আওয়ামী লীগ আমরা যাই বলি বা যাই করি তাই ধরে নেয়া হয় সরকার বিরোধিতা হিসেবে এবং ১/১১-এর আগে থেকে যারা শেখ হাসিনার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় লড়েছেন তাদের সযতনে পরিহার করা হয়। আমি যে শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত তার কথা বলি। গত কয়েক বছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য পদে (শিক্ষকদের সবচেয়ে আকাক্ষিত পদ) প্রায় ক্ষেত্রে বেছে বেছে তাদেরই নিয়োগ দেয়া হয়েছে যারা সবসময় শেখ হাসিনার ব্যাপারে নিশ্চুপ বা নিষ্ক্রিয় থেকেছেন অথবা বিরোধিতা করেছেন এবং তাদের শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতাও এমন আহামরি কিছু নয়। তবে, মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, শেখ হাসিনার আমলেই আমরা নিরাপদ মনে করি। ৬ তারিখের নতুন সরকার নিয়ে তাই ছিল শঙ্কা। কারণ, ইতোমধ্যে আমাদের অনেককে মুরতাদ ঘোষণা করা হয়েছে। ক্ষমতায় এলে তারা মুরতাদদের ক্ষমা করবে এমন ভাবা বোকামি। তবে একজন মুসলমান হিসেবে অন্তিমে নিয়তিবাদী হয়ে বসে থাকি।

আমাদের শঙ্কার, শুধু আমাদের নয় দেশজুড়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজন ক্রমাগত সরকারের নতজানু নীতিতে হতাশা ও বিরক্ত হয়ে উঠছিল। সরকার নানা কারণে নানা নীতি করতে পারে, কিন্তু, তাই বলে দলও? এ কারণে, বঙ্গবন্ধু দল ও সরকার প্রধান ভিন্ন রেখেছিলেন অন্তত কাগজপত্রে ও প্রকাশ্যে। সরকারপ্রধান ও তার পার্শ্বচররা বার বার হেফাজতের মধ্যে জামায়াত দেখছিলেন। সেটি সত্য কিন্তু হেফাজত যে স্বেচ্ছায় জামায়াতী হয়ে যাচ্ছিল তাও তো সত্য। সরকার প্রধানের মিনতি দেখে এ অনুমান দেখা দিয়েছিল যে, ১৪ দল প্রধান ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুত। তবে, বিএনপিরা নিশ্চিত ছিল, সরকার পতন হচ্ছেই, হেফাজতীরাও। ৫ মে টাকা না পাওয়া হেফাজত কর্মীরা লং মার্চ করে কমিউনিস্টদের মতো জেহাদের বা সরকার উৎখাতের বাসনায় শহরে ঢুকছিল তখন নাকি বিএনপি নেতাদের অনেকে টিপটপ থেকে সদ্য ইস্ত্রি স্যুট আনতে

পাঠিয়েছিলেন। টাকা খাওয়া পান খাওয়া ঠোঁট লাল করা হেফাজতী নেতারা এর আগে রোদ-বৃষ্টিতে লং মার্চ করার ভয়ে দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে আহমাদ শফীকে নিয়ে প্লেনে ঢাকায় পৌঁছেছিলেন। অবশ্য এর কারণও ছিল, সরকার গঠনে তারা দর কষাকষি করেছিলেন। আহমাদ শফীকে প্রেসিডেন্ট করার শর্ত নাকি মেনে নেয়া হয়। যে কারণে, দুপুরে, জানিয়েছেন আমাকে যুবক কমিশনের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম, হেফাজতীরা তার ও অন্য আরও গোটা দশেক গাড়িতে গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন দেয়ার সময় গ্যাংনাম স্টাইলে নাচতে নাচতে উল্লসিত হয়ে স্লোগান দেয়- 'রাষ্ট্রপতি হবে কে, আহমাদ শফী আবার কে?'। 'শেখ হাসিনার গদিতে আগুন দে, পুড়িয়ে দে', 'আমরা হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগান।' রফিকুল ইসলাম ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে গাড়িটি কিনেছিলেন এবং হেফাজতীদের সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী অরাজনৈতিক ও ঈমানী শান্ত মুসলমান ভেবেছিলেন। গাড়ি পুড়তে দেখে তা মনে করে অনুশোচনায় ভুগছিলেন। হেফাজতী নেতারাও নাকি লন্ড্রি থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি ইস্ত্রি করে এনেছিলেন এবং ক্ষমতা নেয়ার সময় টুপি পরবেন না পাগড়ি পরবেন এ নিয়ে নাকি মৃদু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। এর প্রতিফলন দেখি ৫ তারিখে হেফাজতের জনসভায় যেখানে কিছু নেতার মাথায় ছিল টুপি, কিছু নেতার মাথায় পাগড়ি।

২

৫ মে সকাল থেকে অধিকাংশ ঢাকাবাসী ছিলেন টেলিভিশনের সামনে। বিদ্যুতায়িত মাধ্যম এখন অতি শক্তিশালী। প্রায়ই আমি এ তত্ত্বটি উল্লেখ করি তা'হলো, বাঙালিরা জেনেটিক্যালি গণ্ডগোলে জাতি এবং তাদের ঝোঁক ডানপন্থার দিকে। আওয়ামী লীগকে ধরা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। আসলে তা' নয়। সম্মিলিতভাবে আওয়ামী লীগবিরোধী ভোটের সংখ্যা বেশি। সে জন্য আওয়ামী লীগ নেতারা সবসময় ভোটার নিয়ে চিন্তিত থাকেন বেশি। আওয়ামী লীগেও ডানপন্থার ঝোঁক প্রবল, হেফাজতী ইস্যুতে যা ফুটে উঠেছে। শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্বের দু'টি দিক আছে। তার বর্তমান আমলে, সবচেয়ে বেশি নাশকতামূলক ঘটনা ঘটেছে এবং এর পিছে কোন না কোনভাবে বিরোধীদের চক্রান্ত ছিল। এত চক্রান্ত দমন করে টিকে থাকা দুষ্কর। সে কারণে তিনি মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন গুটিকতক নেতা-আমলা ও সেনাবাহিনীর ওপর। তার পৃষ্ঠপোষকতায় যারা নেতা বা ক্ষমতাবান তারা সবাই যোগ্য ও বিশ্বস্ত এমন কথা শেখ হাসিনার একান্ত শুভার্থীরা তার সামনে বললেও, অপ্রকাশ্যে বলেন না। পৃষ্ঠপোষকতায় যারা নেতা হয়েছেন তারা 'ইয়েস মিনিস্টার' ছাড়া কোন পরামর্শ দেয়ার সাহস রাখেন না বা নেতা সেই সুযোগও দেন না। শুধু তাই নয়, মধ্যবিত্ত সিভিল সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন। এ কারণে, তার অবস্থান

এখন দুর্বল, যদিও তিনি ভাবেন সবল। এর প্রতিফলন দেখি, আওয়ামী লীগের মিছিলে যেখানে ৫০ জনের বেশি হয় না বা সমাবেশে যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কতজন আসে সন্দেহ। এ দুর্বলতাগুলো তার মতো রাজনীতিবিদ একেবারে অনুভব করেন না তা নয়, কিন্তু উপেক্ষা করেন। তার আমল শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু গ্রেনেড হামলা, দশট্রাক অস্ত্র মামলা, মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলা এখনও শেষ করা গেল না বা রায় কার্যকর হয়ত করা যাবে না। একদিন এজন্য তিনি আফসোস করবেন।

এ দুর্বলতাগুলো পরিস্ফুট হয়েছিল দেখেই বিএনপি-জামায়াত এমনভাবে মাঠে নামার সুযোগ পেয়েছিল। সব গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী দেয়াতে চমক থাকতে পারে কিন্তু তা নারীর ক্ষমতায়ন নয়, ভোট আকর্ষণও নয়। মাদ্রাসা আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক নয়। তাদের তোষামোদ করলেও নয়। এ কথা নীতি নির্ধারকরা বিশ্বাস করেন না- এমন এক কল্পনার জগতে তারা বাস করেন। আওয়ামী লীগ আমলে দু'টি প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়- এক. মিলিটারি, দুই. ধর্ম (মাদ্রাসা ইত্যাদি)। আওয়ামী নেতৃত্বের ধারণা এদের সন্তুষ্ট রাখলেই মোক্ষ হাসিল হবে। দু'টি ধারণাই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তুলনামূলকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা যত লাভবান হয়েছে এ আমলে, অন্য কোন আমলে তা হয়নি। শুধু তাই নয়, শিক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭৫) বাধ্যতামূলক না করে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ধর্ম শিক্ষা যা দেশকে আরও মৌলবাদী করবে। এ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল আহমাদ শফীর কারণে। তিনি প্রতিদান কী দিলেন?

জামায়াতের বিরোধী আরও 'ইসলামী' দল আছে যারা একটা পর্যায় পর্যন্ত আওয়ামী লীগ বা ১৪ দলকে সমর্থন দেয়। ইসলামী দল মানেই ইসলামের ব্যবহার। আমাদের এখানে ইসলামী চিন্তার ক্ষেত্রে ধারা দুটি- দেওবন্দী ও বারলেভি। দু'টিই হানাফি ফিকাহ্ অনুসরণকারী এবং দুটিই বিশ্বাসী তকলিদে ইজতেহাদে নয়। দেওবন্দীরা নবী (স.) অতীন্দ্রয়বাদীতায় বিশ্বাসী নয়। মাজার, মিলাদ পীর প্রভৃতি দেওবন্দী ধারায় বিদ'আ। তারা পছন্দ করে না বারলেভি, আহমদিয়া, আহলে হাদিস ও শিয়াদের। দেওবন্দীদের প্রতিক্রিয়ায় বারলেভির আহমেদ রেজা খান (১৮৪৪-১৯২১) গড়ে তোলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত। তারাও তকলিদে বিশ্বাসী, কিন্তু নবী (স)-এর অতীন্দ্রয়বাদ, মাজার, পীর তারা মানেন। তারাও বিরোধী তবলিগ, আহমদিয়া, আহলে হাদিস, শিয়া ও দেওবন্দীদের। সুতরাং তফাত সামান্য। মওদুদীবাদের সঙ্গে দেওবন্দীদের কী খুব একটা বিরোধ আছে তাত্ত্বিক দিক থেকে? ওই রকম বিরোধ থাকলে কিন্তু হেফাজতীরা জামায়াতী হতো না। আহমাদ শফী অনেক লিখেছেন জামায়াতীদের

বিরুদ্ধে, কিন্তু অন্তিমে মওদুদীবাদকেই গ্রহণ করেছেন- এটি মনে রাখা বাঞ্ছনীয়। বরং এখন দেখা যাচ্ছে বারলেভিদের সঙ্গে বরং তাদের বিরোধটা তীব্র। শাসকদের অধিকাংশ বারলেভিপন্থী; তাই তাদের উচিত ছিল দেওবন্দীদের তোষণ করা নয়, কৌশলগত কারণে বারলেভিদের পৃষ্ঠপোষকতা করা- একথা মনে রেখে যে, অন্তিমে এরা কেউ ১৯৭২ সালের সংবিধান বা সেক্যুলার সমাজে রাজি নয়। কিন্তু, তা না করে দেওবন্দীদের অতি তোষণের ফলে আজ এরকম হযবরল অবস্থা। শোনা যায়, মিথ্যাও হতে পারে- সরকার ও বিরোধী দল দুতরফ থেকেই টাকা খেয়েছে হেফাজতীরা।

ইসলামের ইতিহাসে ইয়াজীদ যে ভূমিকা পালন করেছেন, জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের ইতিহাসে সে ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন মাদ্রাসা থেকে সেক্যুলার ইস্কুলের সংখ্যা ছিল বেশি। জিয়াউর রহমান ইয়াজীদের মতো ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য ইসলাম ব্যবহার শুরু করলেন। আসলে নবী (স)-এর পর থেকেই ক্ষমতায় থাকার জন্য ধর্মের ব্যবহার শুরু, ইয়াজীদ তার একটি পর্যায় মাত্র। সেই থেকে এখন পর্যন্ত সে ধারায়ই চলছে। তবে, জিয়ার কাছে জাতি কৃতজ্ঞ যে, পাকিস্তানীদের মতো তিনি সবার লুঙ্গি পরীক্ষা করে মুসলমানি করাননি। পাকিস্তানীরা আমাদের মুসলমানত্ব দেখার জন্য ওই পর্যন্তও যেত। ভিকারুননিসা নূন যখন গবর্নর পত্নী তখন তার নামাঙ্কিত স্কুলের নামকরণ করতে এসে বলেছিলেন, বাঙালিরা খতনাও করে না, সুতরাং তারা মুসলমান নয়। পরের দিন পোস্টার পড়েছিল তার সাহসের প্রশংসা করে যে, তার মতো একমাত্র পাঞ্জাবি মহিলাই পারে এতজনের মুসলমানত্ব পরীক্ষা করতে। এরপর থেকে মুসলমানত্ব সম্পর্কে তার যাবতীয় বাতচিত বন্ধ হয়ে যায় এবং এর কিছুদিন পরই ওই দম্পতি ঢাকা ত্যাগ করেন। আসলে এই স্কুলের নামটি বদল হওয়া উচিত। যিনি বাঙালির খতনায় বিশ্বাসী নন তার নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

যাহোক, জিয়া-এরশাদ ইসলামের নামে খুন-জখম-লুট-ব্যভিচার কিছুই বাদ রাখেননি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এতে রক্ষণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা যে মুসলমান এটি বিএনপি ও জাতীয় পার্টি বা জামায়াতের কাছে পরীক্ষা দেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এভাবে ব্যবহারকারী ও যারা ধর্মকে ব্যবহার করতে চায় না, দু'পক্ষই ধর্মকে স্পেস ছেড়ে দিতে লাগল, সঙ্কুচিত হয়ে গেল ধর্ম-সহিষ্ণুতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গাটা। আমরা কখনও চ্যালেঞ্জ করে বলিনি, যারা আমাদের ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে তারাই ধর্মবিরুদ্ধ, তারাই ধর্মদ্রোহী।

এই স্পেস ছেড়ে দেয়ার ফলে চারদিকে শুধু ধর্ম শিক্ষা নিয়ে আলোচনা।

পাকিস্তান আমলে যা ছিল না বাংলাদেশ আমলে তা দেখা গেল। বিদ্যুতায়িত মাধ্যমে প্রতিদিন ধর্ম শিক্ষা, রোজার দিন পারলে সারাদিন, কাগজে ধর্ম শিক্ষা, স্কুলে বাধ্যতামূলক ধর্ম শিক্ষা– এসব কিছু আমাদের অজান্তে আমাদের মানসিকতায় মৌলবাদের স্পেস করে দিচ্ছে। একটি উদাহরণ দেই। সাংবাদিকরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সাহসী ভূমিকা রেখেছেন, ইতিবাচকও, কিন্তু বিরাট সংখ্যক সাংবাদিক জেনে না জেনে যা করেছেন গত ফেব্রুয়ারি থেকে, তা হেফাজতীকেই তুলে ধরেছে বা মৌল জঙ্গীবাদকে উজ্জীবিত করছে। হেফাজতের দু'টি সমাবেশই লাইভ ব্রডকাস্ট করা হয়েছে। আহলে সুন্নতের নয়, যদিও তাদের সমাবেশও কম বড় ছিল না। মহিলাদের বড় সমাবেশ হয়েছে মফস্বলে হেফাজতীদের বিরুদ্ধে, সেটিও গুরুত্ব পায়নি। বিভিন্ন টকশোতে হেফাজতীদের এনে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দেয়ানো হয়েছে। ভারসাম্যের নামে মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে মিথ্যা তথ্যের বয়ান করা হয়েছে। ৫ মে, ঢাকার উপকণ্ঠ থেকে এক সাংবাদিক আবেগাপ্লুত কণ্ঠে জানালেন, দলে দলে তৌহিদী জনতার সমাবেশ ঘটছে। মনে হচ্ছিল পারলে তিনিও সেখানে যোগ দেন। ওই সাংবাদিক 'তৌহিদে'র মানে জানেন কী না সন্দেহ। আরেক সাংবাদিক জানালেন, 'লাখো কোটি' মানুষের সমাবেশ হচ্ছে উপকণ্ঠে। বিশ্বাসযোগ্য? '৭১-এর মতো টিভি, সবার মতে যা '৭১-এ বিশ্বাসী, তাদের সাংবাদিক জানালেন, ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছোঁড়া হয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুড়লে মৃতের সংখ্যা হতো কতো? একই দিনে বিএনপির এক পাতি নেতা, যাকে প্রায় বিভিন্ন টকশোতে আনা হয়, তিনি বিজ্ঞের মতো জানালেন ১ কোটি মানুষের সমাবেশ হয়েছে। তিন মিটারে আটে দুজন। যদি আয়তন এক লাখ মিটারও হয় আটে কয়জন? এদের সঙ্গে বাহাস করতে যান আওয়ামী লীগ নেতারা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজন। লজ্জার ব্যাপার আমাদের জন্য যে, ৪২ বছর পর মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল কিনা, যুদ্ধাপরাধী আছে কিনা তা নিয়ে আমাদের বাহাস করতে হবে। এ ভাবে, আমরা সবাই মিলে বিএনপি-জামায়াত হেফাজতী ও অন্য ধর্ম ব্যবসায়ীদের জায়গা ছেড়ে দিয়েছি এবং এ কাজগুলো করছে সমাজে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হিসেবে পরিচিত টিভি চ্যানেলগুলো। বিরোধীরা এ ভাবে জায়গা ছেড়ে দেয় না। এখন কে যে জামায়াতী পয়সা খাচ্ছে না, আর কে খাচ্ছে, বলা দুষ্কর।

হেফাজতী যখন আমাকে, শাহরিয়ার বা জাফর ইকবালকে মুরতাদ বলে তখন আমাদেরও বলা উচিত তারা মুসলমান কিনা সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কাউকে নাস্তিক বললে, যে বলে তাকেও নাস্তিকই বলতে হবে। আহমাদ শফী বা তার দলের নেতারা যখন শেখ হাসিনার মতো ধর্মপ্রাণ মহিলাকে নাস্তিক বলেন এবং বলেন, কেবিনেটের ১৩ জন নাস্তিক তখন তাদের ধরে এনে

বলা উচিত, তুমি যে আস্তিক প্রমাণ দাও। খালেদা জিয়ার মধ্যে এসব বদমায়েশগুলো আস্তিকতার চিহ্ন খুঁজে পায়, তাকে বোরখা না পরিয়ে এমনি অবলোকন করতে চায়, আর অন্য পক্ষের হলে নাস্তিক। এ চক্র থেকে আমাদের বেরুতে হবে।

যখন জামায়াত ও হেফাজত খালেদা জিয়ার মধ্যে ইসলাম খুঁজে পায় আর শেখ হাসিনার মধ্যে হিন্দুত্ব খুঁজে পায় তখন প্রকাশ্যে বলার সময় এসেছে, এরা ইসলাম দূরের কথা ধর্মপ্রাণও নয়। মতলবি লোকজন শ্বাপদের মতো শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে। হেফাজতের প্রত্যেক নেতাকে সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, তারা মক্কার হারাম শরীফ মানেন কিনা? সেখানে নামাজ পড়া সওয়াব কিনা? সেখানে মেয়ে- পুরুষ গাদাগাদি করে নামাজ পড়ে সেটি জায়েজ কিনা? আমি সেখানে সোমালীয় ও ইন্দোনেশীয় মহিলাদের ধাক্কায় কয়েকবার ভূপাতিত হয়েছি। আল্লাহর ঘরে মহিলা-পুরুষ এক সঙ্গে নামাজ পড়লে গুনাহ্ হয় না আর বাংলাদেশী আহমাদ শফী নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষক বললেন, নারী পুরুষ এক সঙ্গে কাজ করতে পারবে না- সেটি কী ভাবে ঠিক? এই লোক কি আল্লার ওপর খোদকারি করতে চায় (নাউজুবিল্লাহ)?

আমরা এসব প্রশ্ন না করে হুজুর হুজুর করি। আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। সাংবাদিকরা হেফাজতীকে অনেক বড় করে দেখিয়ে, তাদের এসব বিষয় না তুলে এনে এক ধরনের অন্যায় করেছেন। হেফাজতীদের মার খেয়েও শিক্ষা হয়নি প্রথমবার। লক্ষ্য করবেন, তারা যেসব চ্যানেলের সাংবাদিকদের ওপর হামলা করেছে তারা অধিকাংশ সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ হয়ে কাজ করে– মালিকানা একেবারে জামায়াত-বিএনপি ঘেঁষা নয়। সৎ সাহস থাকলে সাংবাদিকদের বলা উচিত হেফাজতকে আর মিডিয়া প্রচার দেয়া যাবে না। হ্যাঁ, যাবে যদি তাদের অপকর্মগুলো প্রচার করা হয়।

এখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তির বলা উচিত আমরা আর এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না। প্রয়োজনে সবাই মিলে যৌথ ফ্রন্ট করা উচিত এবং সে আহ্বান আসা উচিত এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে শেখ হাসিনার কাছ থেকে। শেখ হাসিনা যেমন একলা নিরাপদ নন- অন্যরাও একা নিরাপদ নন। একথা আর কেউ না বুঝুক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম নিশ্চয় বুঝছেন।

৩

৫ মে যে মুহূর্তে হেফাজতকে ঢাকায় সমাবেশ করার অনুমতি দেয়া হলো সে মুহূর্তে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীসহ সিভিল সমাজের তাদের সমর্থকরা প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এতটা নতিস্বীকার তাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। অনেকে এও বলেছিলেন, আওয়ামী লীগকে আর সমর্থন করা যায় না। এবং সেটি

অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরপর হেফাজতী তাণ্ডব।

হেফাজতী তাণ্ডবের একটি প্যাটার্ন লক্ষ্য করুন। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে জামায়াতীরা বিভিন্ন জায়গায় যে তাণ্ডব করেছে হেফাজতের তাণ্ডবও সে রকম– গাছ কেটে ফেলা, ডিভাইডার ভেঙ্গে ফেলা, গাড়িতে, দোকান-পাটে আগুন, বোমা ও ককটেল ছুঁড়ে মারা; বিশেষ করে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মৃত্যু নিশ্চিত করা। তারাও ছিল অস্ত্রসজ্জিত, না হলে নিরাপত্তারক্ষীদের মৃত্যু হলো কিভাবে? ঐ দিন রাত পর্যন্ত যাঁরা এ দৃশ্য দেখেছেন, তাঁদের অনেকে বলেছেন, এ রকম ঘটনা বাংলাদেশে আর ঘটেনি। আসলে তরুণ প্রজন্মের সদস্য সংখ্যা বেশি, তাই তাদের কাছে এটি ভয়ানক মনে হচ্ছে। না এর আগেও দু'বার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে ১৯৭১ সালের পর। ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু ও পরে ইয়াজিদ জিয়ার নেতৃত্বে জাতীয় চার নেতা ও কয়েক হাজার সৈন্যকে হত্যা ছিল ১৯৭১ সালের পর সবচেয়ে বড় হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনা।

২০০৪ সালে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউতে গ্রেনেড হামলা ছিল আরো ভয়াবহ। কারণ রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে মন্ত্রী ও প্রশাসন মিলে গ্রেনেড ছুঁড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ২৭ জনকে হত্যা করে।

এরপর ৫ মের ঘটনা। তুলনামূলক হিসেবে নিহত কম। প্রথমটি যিনি ঘটান বলে সবার অনুমান তিনিও বিএনপি সৃষ্টি করেন। গ্রেনেড ঘটনা ঘটায় বিএনপি-জামায়াত মিলে। ৫ মে'র ঘটনা ঘটিয়েছে হেফাজত-জামায়াত-বিএনপি মিলে। এবং প্রতিটি ঘটনা ঘটানো হয়েছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। এর অর্থ একটি। সেটি হলো শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে থাকতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি পাকিস্তান তারা মেনে নেয় তাহলে তাদের থাকতে দেয়া যাবে। গত ৩৫ বছরে আমাদের জায়গা ছেড়ে দিতে দিতে আজ তারা এ দুঃসাহস দেখাতে পারছে। হেফাজতকে যারা অরাজনৈতিক বলতেন তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নয়। যে সব মন্ত্রী বারবার বলেছেন, হেফাজতে বিএনপি- জামায়াত ঢুকে নাশকতা চালিয়েছে তাঁরাও মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। তাঁরা হেফাজতের দোষ ঢাকতে চেয়েছেন। এসব রাজনৈতিক কৌশল যে ভ্রান্ত, হেফাজত তা প্রমাণ করেছে। হেফাজত প্রথম থেকে রাজনৈতিক কথা বলে আসছে। হেফাজতের আমির ছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে– এ কথাটা মনে রাখা জরুরী। তারা এতদিন নীরব ছিল, এখন সরব হয়েছে মাত্র। তথাকথিত আল্লামা সাঈদীর জায়গা নিয়েছেন আল্লামা আহমেদ শফি– তফাত এটুকুই মাত্র। হেফাজতের সব দাবিতে যদি রাজনৈতিক মতলব না থাকত বা যৌক্তিক হতো তাহলে তারা বিএনপির ১৮ বছর রাজত্বে সেগুলো তুলল না কেন? এমনকি জামায়াত-বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে কেন ব্ল্যাসফেমি আইনের কথা তোলা হলো না? কেন সাঈদীর বা কাদের মোল্লার রায়ের পর জামায়াতের মতো

হেফাজতীরা দাবি তুলে আন্দোলন শুধু নয় সরকার উৎখাতের আহ্বান জানায়? সরকার উৎখাতের দাবি ও ৬ তারিখে সরকার গঠনের দাবি কি রাজনৈতিক না অরাজনৈতিক?

হরতালের সময় জামায়াত-বিএনপি প্রথমে ককটেল ছুঁড়ে মারে, তারপর গাড়িতে আগুন লাগায়। এবং ভাংচুর করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর চালায়। তাদের লক্ষ্য অর্থনীতি পংগু করে দেয়া। শেখ হাসিনার আমলের প্রবৃদ্ধি তারা গ্রহণ করতে পারছে না। এই পাকিস্তানীমনা লোকগুলোর মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ পাকিস্তানকে ডিঙ্গিয়ে যাবে– তা হতে পারে না। পাকিস্তান ব্যর্থ রাষ্ট্র হলে বাংলাদেশকেও ব্যর্থ রাষ্ট্র হতে হবে। লক্ষ্য করুন, হেফাজত জনতা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংকে আগুন দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ব্যাংক, ইবনে সিনাট্রাস্টে নয়। জামায়াত-বিএনপির কাছে ক্রেডিবিলিটি তারা তাদের তুলে ধরতে চেয়েছে, আলেমদের একাংশ ও পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী আহমেদ শফির চেলারা প্রচুর টাকা খেয়েছে। সুতরাং যারা টাকা দিয়েছে তাদের কাছে নিজেদের যোগ্যতা তুলে ধরতে হয়। তারা যদি জামায়াতবিরোধী হতো তা হলে জনতা, সোনালী, ব্র্যাক বা গৃহঋণ সংস্থায় আগুন নয়, ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ বা ইবনে সিনাতেও আগুন দিত। তারা জামায়াত-বিএনপি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করতে চায়নি। তারা চেয়েছে বিরুদ্ধ পক্ষ এবং পরিণামে বাংলাদেশের যাতে ক্ষতি হয়, যাতে তারা ভিক্ষুক হয়ে যায়। এখানে বিএনপি জামায়াত নেতাদের একটি প্রশ্ন করতে চাই– যদি এখন ইসলামী ব্যাংক, ইবনে সিনার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মালিকদের টেলিভিশন অফিস ও অর্থ প্রতিষ্ঠান একই রকম হামলার শিকার হয় তারা বুঝতে পারছেন অবস্থা কী হবে? যদি বেছে বেছে খোকা, মওদুদ ও জামায়াতী নেতাদের গাড়ি টার্গেট করা হয় তখন কী হবে? ধরা যাক, শেখ হাসিনার বদলে বিএনপি ও হেফাজতীরা ক্ষমতায় এলো। পরদিন থেকে ১৪ দল ও সমমনারা যদি একই কাজ করে, ক্ষমতায় থাকতে পারবেন? অর্থনীতি যদি একেবারে ভেঙ্গে পড়ে তাহলে ক্ষমতায় থাকা যাবে? সুস্থমনা বা গণতান্ত্রিক রাজনীতি করতে চাইলে এ ধরনের কর্মকাণ্ড কেউ করত না। কিন্তু বিএনপি, এরশাদ, জামায়াত আমলে তো গুন্ডারাজই প্রতিষ্ঠিত হয়; সুতরাং তারা এ ধরনের বিকৃত রাজনীতি করবে তাই স্বাভাবিক। ৫ মে'র সমাবেশের ইতিবাচক দিক হলো হেফাজতীরাও যে বিকৃতমনা, অসুস্থ রাজনীতির বাহক সেটি প্রমাণিত হলো।

দুপুর পর্যন্ত ঢাকার মানুষরা ভেবেছিলেন সত্যিই হেফাজতীরাজ বোধহয় প্রতিষ্ঠিত হলো। বিএনপি সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করছিল– যখন তারাও যোগ দেবে হেফাজতীদের সঙ্গে। খালেদা জিয়ার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গিয়েছিল, পুরো

বিষয়টি পরিকল্পিত এবং কেন ৩ মে বেগম জিয়া এত উৎফুল্ল ছিলেন তাও স্পষ্ট হলো। সে প্রসঙ্গ পরে।

৪.

এমনকি নাসারাদের দেশ আমেরিকার মৌলবাদী এক নাসারা কোরান পোড়ানোর হুমকি দেয়ায় স্বয়ং বারাক ওবামা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেছিলেন। কওমিরা কেমন মুসলমান তা প্রমাণিত হলো। হেজাবিরা আমাদের মুসলমানত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কোরান পোড়ানোর অর্থ, তারা আর ইসলাম মানে না। আমরা ধর্ম থেকে কী খারিজ হব, এখন বাবুনগরী ও কওমি ও হেজাবিদের প্রমাণ করতে হবে তারা আদৌ ধর্মে বিশ্বাস করে কিনা? তারা শাহবাগের তরুণদের নাস্তিক বলে, কিন্তু এখন প্রমাণ হলো তারা কোরান পোড়ানো নাস্তিক। এক দোকানদার চিৎকার করে বলছিলেন (টিভি ফুটেজ) -এরা 'আল্লাহর শক্র' এরা ধর্মের শক্র, এরা নবীর (স.) শক্র। এ কথার যৌক্তিকতা উড়িয়ে দেয়া যায় না। এক তরুণ বিক্রেতাও বলেছিলেন, শফির গুন্ডারা এ কাজ করেছে অর্থাৎ হেজাবিরা। আল্লামা নয়, হজরত নয়, মৌলানা নয় একেবারে শফি। যে সম্মান অর্জন করতে জনাব শফির লেগেছে ৭০/৮০ বছর। এক নিমিষে তা ধুলায় লুটাল। আল্লাহ্ বান্দাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। আমরা অধিকাংশ সাধারণ বান্দা তাতে পাস করতে পারি না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ক্ষমতার মোহে আহমেদ শফিও অন্ধ হয়ে গেলেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাহিনী কোরান পুড়িয়েছিল। গত ফেব্রুয়ারি থেকে বিএনপির সহযোগী জামায়াতীরা কোরান ও জয়নামাজ পোড়ানো শুরু করে, মসজিদে আগুন লাগানো শুরু করে। বিএনপিও তা পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করে। হেজাবিরাও এখন তা করল। আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে হয়, হেফাজতের নির্দেশে হেজাবিরা কোরান পোড়াল।

এখানেই শেষ নয়, এরপর এরা বায়তুল মোকাররমের সোনার ও অন্যান্য দোকানে আগুন লাগায়, লুট করে। প্রমাণিত হলো হেজাবিরা কোরান পোড়ায়, আগুন লাগায় ও লুট করে। যদি কার্যকর কোন সরকার থাকে তাহলে এ পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ব্যবস্থা নিতে হয়। সরকারও সে ব্যবস্থা নিয়েছে। আওয়ামী লীগও ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষ নেয়। বিকেলে সৈয়দ আশরাফুলের বক্তব্যে অধিকাংশ মানুষ চমৎকৃত ও বিস্মিত হয়। অনেকে বিস্মিত হয়ে বলেন, দেশের এ অবস্থা দেখে আশরাফুলও আর ঘুমোতে পারেননি। অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা বক্তব্যের বদলে প্যান প্যান করেন। আশরাফুল মাপা কথায়, ঠাণ্ডা গলায় যেভাবে বক্তব্য দিলেন, তাতে প্রাণ খুলে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে হয়। রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের কথা তিনি বলেননি। যে রকম কথা আমরা পছন্দ করি, সরাসরি সে রকমই বলেছেন। মূল বক্তব্য- হেফাজতীদের আর ঢাকায় আসতে দেয়া হবে না।

বাড়াবাড়ি করলে বাড়ি থেকে বেরুতে দেয়া হবে না। যারা এসব করছে তারা রাজাকার, রাজাকারের বাচ্চা। মুহূর্তে দৃশ্যপট পাল্টে যায়। দেশের যাবতীয় সেলফোন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ সরকারের নমনীয়তার কারণে যারা বিমর্ষ, হতাশ হয়ে মুষড়ে পড়েছিল তারা নিমিষে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তবে সংযম দেখায়। চাঙ্গা হয়ে যদি তারা রাস্তায় নামত তাহলে হেজাবিদের খবর ছিল। সাদেক হোসেন খোকাকে ১৯৭২ সালের মতো, মওদুদ আহমেদকে ১৯৯০ সালের মতো দৌড়াতে হতো। আশরাফের বক্তব্য অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাকি কাজ সম্পন্ন করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'ধাক্কাতত্ত্ব' দিয়ে যে জমি হারিয়েছিলেন, ৬ মে সকালে সে জমি পুনরুদ্ধার করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম এত বড় একটি অভ্যুত্থান বিনা রক্তপাতে দমন করা হলো।

৫.

লন্ড্রি থেকে কাপড়চোপড় এনে, খোশ দিলে বিরিয়ানি খেয়ে বাবুনগরী, জুনায়েদীরা গাড়ি করে দ্বিপ্রহরে শাপলা চত্বরে পৌঁছান। অন্যদিকে, এতিমখানা ও মাদ্রাসা থেকে, ঢাকা শহরে দেখানো, ক্ষমতায় গেলে তারা যা খুশি করতে পারবে, ইসলাম কায়েমের তারা হবে সেনানি- এসব প্রলোভন দেখিয়ে আনা তালেবএলেমরা রৌদ্র বৃষ্টি উপেক্ষা করে দীর্ঘ পথ হেঁটে শাপলা চত্বরে পৌঁছায়। গতবার তাদের জন্য বিরিয়ানি, ফল-মূল, পানি ছিল। এখন সে সব কিছু না দেখে তারা ক্ষুব্ধ হয়। বিরিয়ানি খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে বাবুনগরীরা তালেবএলেমদের শহীদ হওয়ার আহ্বান জানায় বার বার। নাস্তিক সরকারকে উৎখাত করে হয় তারা শহীদ হবে নয় গাজী হবে। একদিকে বাবুনগরীদের নির্দেশে শহরের একদিকে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছিল অন্যদিকে তারা প্রায় লাখখানেক লোক মজুদ রাখছিলেন রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, শহরের অন্যপ্রান্তে আমি রাত ৯টা পর্যন্ত ঘুরে দেখেছি, দোকানপাট খোলা, রাস্তাঘাটে মানুষজন, সব স্বাভাবিক। এর অর্থ কি এই যে, শহরের অনেকে এই সব নিয়ে চিন্তিত নন? পুরো বিষয়টিই কিন্তু কেমন অস্বাভাবিক ঠেকেছে।

সৈয়দ আশরাফের ঘোষণার পর সুর করে বাবুনগরীরা বলতে থাকেন, 'আশরাফ আগামীকাল কোন্ পথ দিয়ে পালাবে তা ঠিক করো।' হেজাবিরা তো নিশ্চিত যে, তারা ক্ষমতায় যাচ্ছে। তাই ক্ষমতার দম্ভে নানা ধরনের উপহাস করছিলেন। এবং বাচ্চা ' জেহাদী'দের উন্মত্ত করে গাছ কাটা, ফুটপাথ তুলে ফেলা, ল্যাম্পপোস্ট উপড়ে ফেলার কাজে লাগাচ্ছিলেন। খেলায় যাকে ওয়ার্ম আপ বলে সে রকমভাবে নিরাপত্তা রক্ষীদের বিরুদ্ধে 'লড়াই' করার জন্য তাদের প্রস্তুত করছিলেন।

পুলিশ হেজাবিদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং

বিকেল পাঁচটার মধ্যে তাদের স্থান ত্যাগ করতে বলেছিলেন। এই শর্ত মেনে চুক্তিপত্র করেই হেজাবিরা সমাবেশ করছিলেন। যাঁরা কোরান পোড়ায় তাদের কাছে কথার বরখেলাপ কোন ব্যাপারই নয়। এবং ঠিকই দেখা গেল, হেজাবি নেতারা ঘোষণা করলেন, তাঁরা নড়বেন না। তাদের আল্লামা শফীর বক্তব্য না শুনে তারা নড়বেন না। আমরা যা অনুমান করছিলাম তাই ঠিক হলো। শুধু সমাবেশ নয়, তাঁরা চারদিকে তখনও আগুন লাগাচ্ছিলেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যেভাবে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছিল হেজাবিরাও তাই করেছিলেন। হেজাবিদের প্রায় সব নেতা ১৯৭১ সালে হানাদার পাকিদের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। পোড়ামাটি নীতি তাঁরা সেখান থেকে শিখেছিলেন। সরকার হেজাবিদের ধমকির বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই নিতে পারছিল না। বাবুনগরীরা ক্ষমতা দখলে আস্থাবান ছিলেন একটি কারণে– তা'হলো, হাটহাজারী, লালবাগ ও লালখান বাজারে জঙ্গী ট্রেনিং দেয়া হয়। শাহরিয়ার কবিরের চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে, আহমাদ শফী ও ইজহারুল ইসলাম জঙ্গী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আফগানিস্তানে বাংলাদেশী জঙ্গী পাঠিয়েছেন এবং সে জঙ্গী মারা গেলে তার নিঃস্ব পরিবারকে কোন সাহায্য করেননি।

হেফাজতের স্লোগানই বলে দেয় তারা কী চেয়েছিল। তারা তালেবানী রাষ্ট্র করবে, আহমাদ শফী হবেন যার প্রধান। এখন বাবুনগরীর কনফেশনে জানা যাচ্ছে, তাঁরা ঠিকই তালেবানী রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন যার প্রধানমন্ত্রী হবেন বাবুনগরী আর আধ্যাত্মিক গুরু আহমাদ শফী। [*আমাদের সময়*, ৮-৫-১৩]

ইরানের খোমেনী স্টাইলে আর কি! এখানেও আমরা ষড়যন্ত্রের মধ্যে ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করি। খালেদা চাচ্ছিলেন জামায়াত-হেফাজতকে দিয়ে সরকার পতন ঘটিয়ে তিনি তখতে তাউসে বসবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আহমাদ শফীরা বিএনপিকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছিলেন– যেখানে খালেদার স্থান নেই। ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এমনই হয়। পরস্পর পরস্পরের পিঠে ছুরি মারে।

রাত আটটায় খালেদা ঢাকাবাসীকে জানালেন, হেফাজতের পাশে দাঁড়াতে। ৪৮ ঘণ্টার মাথায় খালেদা এই ঘোষণা দিলেন। বোঝা গেল তাদের পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা পৌঁছেছেন। আহমাদ শফী গাড়ি করে রওনা হচ্ছিলেন ক্ষমতা দখলের ঘোষণা দিতে। তবে হেজাবি নেতাদের অনেকে মনে করছিলেন, তিনি হেজাবিদের ফিরে যেতেও বলতে পারেন। পথে আহমদ শফীর মোবাইল ফোনে দু'টি ফোন আসে। তিনি ঘোষণা করেন, তিনি আর যাবেন না। এটিও প্রচারিত হয়ে পড়ে। কিন্তু, তিনি নির্দেশ দেন হেফাজতিরা যেন স্থান ত্যাগ না করে। দশটা-এগারোটার সময় দেখা গেল খালেদার নির্দেশ সত্ত্বেও মওদুদ, খোকা, আনোয়ার, দুদুরা খাবার, পানি নিয়ে নামছেন না। পরে ভাড়া করা জেহাদীদের কনফেশনে

জানা গেছে, তারা প্রায় ২৪ ঘণ্টা অভুক্ত। পেশাব-পায়খানা করতে পারেননি। খাওয়ার পানিও পাননি। ঢাকার রাস্তাঘাট তাঁরা চেনেন না। বাতি নেই, অন্ধকার, কী করবেন বুঝতে পারছেন না। অনেকে ভয়েও স্থান ত্যাগ করতে লাগলেন। স্বদেশ রায় রাত ১১টায় ফোন করে আমাকে জানালেন, পত্রিকার প্রতিবেদক জানিয়েছেন, সমাবেশ থেকে লোকজন চলে যাচ্ছে।

বাবুনগরীরা এবং হেজাবিরা ভেবেছিলেন, এই সমাবেশ ভঙ্গ করার সাহস কারও নেই। আর বিএনপি-জামায়াত ক্যাডাররা যোগ দিলে তো কথাই নেই। সবই তো পরিকল্পনা মাফিক এগুচ্ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি বড় বৈশিষ্ট্য অনিশ্চয়তা। এ কথা অনেকবার লিখেছি, ইতিহাসের পটভূমিকায় এই অনিশ্চয়তা বাঙালিকে অনেক বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়েছে। এবারের অনিশ্চয়তা ছিল নিরাপত্তা বাহিনী সমাবেশ ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করবে কী করবে না। এক পুলিশ অফিসার আমাকে বলেছেন, পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত এত বৃহৎ আকারের সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার কোন পরিকল্পনা কখনও করা হয়নি। এটি ছিল এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। কারণ, এ ধরনের পরিকল্পনা সফল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

মাঝরাতের পর অভিযান শুরু হয়। ১৫ মিনিটের মধ্যে শাপলাচত্বর মুক্ত। সবার আগে পালান বাবুনগরী, লতিফ নেজামী ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা। নিজের সাথীদের ফেলে এ ভাবে পলায়ন তাদের চরম স্বার্থপরতা তা তৃণমূল পর্যায়ের হেজাবিদের মনে রাখা উচিত। তাদের তো লড়াই করে শহীদ হওয়ার কথা। শহীদ না হয়ে পালালেন কেন? এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে জঙ্গীগুরু শাইখ আবদুর রহমানের কথা। জঙ্গী শাইখ ধরা পড়লে তাঁর স্ত্রী আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি তো শহীদ হবেন বলেছিলেন, তিনি তো শহীদ হলেন না!

তাঁরা তো লড়াই করে গাজী হবেন বলেছিলেন। কিন্তু লড়াই দূরের কথা, জলকামানের পানি, শব্দবহুল গ্রেনেড আর ফাঁকা রবার বুলেটেই শাপলা চত্বর খালি। একদল এক দৌড়ে যাত্রাবাড়ী হয়ে কাঁচপুরের পথে। বাকিরা এদিক-সেদিক গলি-ঘুপজি আর বিভিন্ন ভবনে। পরের এক চিত্রে দেখা যায়, কান ধরে একদল হেফাজতী বা হেজাবি বসে আছেন। তারা শহীদও হননি। গাজীও হননি; বরং মানুষের কাছে পাজি হিসেবেই পরিচিত হয়েছেন। হেফাজতে শহীদ নয়, হেফাজতে গাজী নয়, এখন তারা হেফাজতে পাজি।

৬.

যা সবাই মনে করেছিল অসম্ভব, তাই হলো সম্ভব। বাংলাদেশে তাই বলি দুইয়ে দুইয়ে কখনও চার হয় না। একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। ভোরে ঢাকাবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

নিরাপত্তা বাহিনী যখন শাপলা চত্বর মুক্ত করতে যায় তখন সব টেলিভিশন

কর্মী, সংবাদকর্মীরা সঙ্গে ছিলেন। চারটি লাশ পাওয়া যায়, যা হেজাবিরা স্টেজের কাছে রেখেছিলেন পরে জনমনে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য। একজন পুলিশ মারা যায়। মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনকারী হিসেবে খ্যাত অধুনা হেজাবিদের মুখপত্র *নয়াদিগন্তের* খবর অনুসারে পুলিশ-র‍্যাব হেজাবিদের পালানোর জন্য পথ করে দিয়েছিলেন বা কিভাবে পালাতে হবে সে পথ নির্দেশ করে দিচ্ছিলেন। তাদের খবর অনুযায়ী সারাদিনে শহরে মৃত্যুর সংখ্যা ১৬।

পরে সিদ্ধিরগঞ্জ-কাঁচপুরে মাইক দিয়ে মিথ্যা প্রচার করলে আবার সংঘর্ষ বাঁধে এবং তাতে কিছু মৃত্যু হয়। আমার এক সহকর্মী, যার বাড়ি রাউজানে, জানালেন, তাদের গ্রামের মসজিদের ইমাম তাকে ফোন করেছিলেন। ইমামকে টাকা দিয়ে ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় হেজাবিরা এভাবে টাকা দিয়ে লোক পাঠায়। অনেক মাদ্রাসা ও এতিমখানা থেকে অভিভাবকদের না জানিয়ে কিশোর ছাত্রদের ঢাকায় নিয়ে আসে। সেই ইমাম কাউকে না জানিয়ে ঢাকায় আসেন এবং শহীদ বা গাজী না হয়ে পাজি হিসেবে এক দৌড়ে যাত্রাবাড়ী আসেন। সকালে গ্রামে ফোন করে জানেন, না জানিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করায় তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। ইমাম এখন তদবির করছেন চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য।

হেফাজতীরা পিছু হটলেন কেন? কারণ হেফাজতীদের নেতারা প্রচুর টাকা খেয়েছিলেন। তাঁদের কর্মীদের মাঝে সে টাকা ভাগ করে দেননি। কোন কোন ক্ষেত্রে যাওয়া-আসার খরচ দিয়েছেন। টাকা খেয়ে একটা পর্যায় পর্যন্ত আন্দোলন করা যায়। টাকা খেয়ে ইসলাম নিয়ে তারা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু, কোরান পোড়ানো, লুটপাট আর আগুন লাগিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ করার পর টাকা খেয়েও আর আন্দোলন করতে পারবেন না। ইতোমধ্যে বাবুনগরীদের বিরুদ্ধে টাকা খেয়েও টাকা আত্মসাতের মামলা হয়েছে।

ইসলামের হেফাজত করার বিধান নেই। সৃষ্টিকর্তাই বলেছেন, তিনি এর হেফাজত করবেন। কিন্তু রসুল (স.) ও চার খলিফার পর ইসলামের স্বঘোষিত হেফাজতকারীরা মাঠে নেমে পড়েন এবং ইসলাম শান্তির ধর্ম থেকে অশান্তির ধর্মে পরিণত হয়। নানাজনের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যায় নবীর (স.) শান্তির ইসলাম তিরোহিত হয়। এ অবস্থা চলে নবম শতক পর্যন্ত। আব্বাসীয় যুগে খলিফা মামুন তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে এ ভুল বুঝতে পারেন। আমীর আলী লিখেছিলেন, 'মানুষের মনকে অপরিবর্তনীয় মতবাদের বন্ধনে আবদ্ধ করার ফলে মামুন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। রাজত্বের শেষ চার বছর রাষ্ট্রকে ধর্ম-প্রভাব থেকে মুক্ত করতে এবং পণ্ডিতবর্গ ও শাস্ত্রজ্ঞগণ মানুষের বুদ্ধিকে যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিলেন তা ছিন্ন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।' এ মুতাজিলাদের বা যুক্তিবাদীদের ধারণা ছিল এরকম। মামুন মুতাজিলা মতবাদ গ্রহণ করেন যার মূল কথা

হলো–'মানুষ ভাল ও মন্দের বিচারে স্বাধীনতার অধিকারী...আল্লাহর গুণাবলী তাহার সত্তা থেকে পৃথক নয় এবং কোরান সৃষ্ট বস্তু। মানুষের কার্যাবলী সম্পর্কে কোন চিরস্থায়ী বিধি নেই, যে স্বর্গীয় অনুশাসনসমূহ মানবের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে তা উন্নতি ও পরিবর্ধনেরই ফল এবং বিশ্বনিয়ন্তা সমগ্র বিশ্বকে যে পরিবর্তনের অধীন করেছেন তাও ঐ পরিবর্তনের অধীন।'

এর ফলে বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্যে অভাবনীয় উন্নতি হয়। এই সময়টুকুকে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়। মুসলমানরা যে সব বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্য সম্পর্কে গর্ববোধ করেন তাঁরা ঐ সময়ই বিকশিত হয়েছিলেন। মুতাজিলাদের প্রভাব বেশিদিন ছিল না। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের উত্থানের ফলে মুতাজিলারা হটে যান। হাম্বলী অনুসারীদের কারণে পরবর্তীকালে অসহিষ্ণুতা, অবিরত বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গা ও রক্তপাত শুরু হয়, যা আজও বহমান।

পাকিস্তান আমলেও শাসকগণ ইজতেহাদের পথ বন্ধ করে দেয়। গুরুত্ব দেয় তকলিদের ওপর। ইজতেহাদ প্রতিষ্ঠা করতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যায় বাঙালি। বঙ্গবন্ধুর আমলটুকুকে ইজতেহাদের সময় বলা যায়। ১৯৭৫ সালের পর থেকে ইজতেহাদ লুপ্ত হয় এবং তকলিদের প্রভাব বাড়তে থাকে। নানা ব্যক্তি, গোষ্ঠী ইসলামের স্বঘোষিত ঠিকাদার হয়ে দাঁড়ায়, হেফাজত যার নবতম সংস্করণ। আজ ইজতিহাদের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হেজাবিরা। বর্তমান সরকারকে ইজতিহাদের পথই বেছে নিতে হবে এবং এ কারণে প্রয়োজনে যতটা কঠোর হওয়া প্রয়োজন ততটা কঠোর হতে হবে।

বিএনপি করতে হলে প্রধান যে বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তা'হলো অবিরত মিথ্যাচার করার ক্ষমতা ও মানুষের প্রধান গুণ লাজলজ্জা বিসর্জন দেয়া। যে যত মিথ্যাচার করতে পারবে সে তত বড় নেতা হতে পারবে। হেফাজতী ঘটনা থেকে কয়েকটি উদাহরণ–

বিএনপির এক নেতা সাদেক হোসেন খোকাকে দেখলাম ৬ তারিখ সংবাদ সম্মেলনে বলছেন, হাজার হাজার লোক মারা গেছে। সিএনএন, আল জাজিরা বলেছে, আড়াই হাজার লোক মারা গেছে। এর আগে হেজাবিদের তরফ থেকে রটানো হয়েছিল, আট হাজার মারা গেছে। অবাক হলাম, সারারাত টিভি দেখলাম, সংবাদ দেখলাম, কোথাও তো এই সংখ্যা শুনলাম না। তাড়াতাড়ি আল জাজিরা ধরলাম। বাংলাদেশ সম্পর্কিত খবরে বলা হলো মৃতের সংখ্যা ১৪।

৫ তারিখ মোহনা টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে ১৯৭১ সালে সুন্দরবন সাব-সেক্টরের অধিনায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে ছিলাম। তিনি শ্রোতাদের এক প্রশ্নের জবাবে জানালেন, সাদেক হোসেন খোকা ও শাহজাহান ওমর (বিএনপি নেতা) টেলিভিশনে বলেছেন, সাঈদীকে তিনি চেনেন, তার সঙ্গে

সাঈদীর যোগাযোগ ছিল। জিয়াউদ্দিন জানান, খোকা আরেকটি অনুষ্ঠানে জানান, টেলিফোনে তার সঙ্গে জিয়াউদ্দিনের কথা হয়েছে। জিয়াউদ্দিন জানিয়েছেন, সাঈদীর ব্যাপারে খোকা যা বলছেন [অর্থাৎ সাঈদী যুদ্ধাপরাধী নন] তা সত্য নয়। জিয়াউদ্দিন বললেন, "এরা দু'জনই ডাহা মিথ্যা বলছেন। তাদের সঙ্গে গত ১০ বছর আমার কোন দেখা- সাক্ষাত নেই। মুক্তিযোদ্ধারা এ রকম মিথ্যাচার কী ভাবে করেন?" ৯ তারিখ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর সঙ্গে দেখা। বাচ্চুকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলাম, "বাচ্চু তোর জিগরি দোস্ত খোকা এত ডাহা মিথ্যা বলেন কীভাবে? টেলিভিশনে, সংবাদ সম্মেলনে চোখ খোলা রেখে নির্ভয়ে মিথ্যা বলছেন।"

বাচ্চু বললেন, "খোকা হিসেবে সাদেক হোসেন রাজনীতিতে জয়েন করেছিল। এখন তো তার পরিচিতি হয়ে গেছে সাদেক হোসেন ধোঁকা।"

অর্থাৎ, বিএনপি করলে মিথ্যাচার করতে হয়, ধোঁকাবাজ হতে হয়।

৬ তারিখ রাতে ২৪টা টেলিভিশনে ২৪টি টক শো হয়েছিল। প্রত্যেকটিতে বিএনপির পাতি নেতা বা সহানুভূতিশীল নেতাদের আনা হয়েছিল। প্রত্যেকে বলতে লাগলেন যে, কমপক্ষে আড়াই হাজার ব্যক্তি মারা গেছেন। অনেক লাশ গুম করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চালক ফুটেজ দেখালেন। ভবি ভুলবার নয়। এক টিভিতে ব্যারিস্টার খোকন এই অভিযোগ তোলার পর তথ্যমন্ত্রী ইনু বললেন, নাম ঠিকানা দেন। খোকন জানালেন, তার প্রত্যেক এলাকার উপজেলায় মানুষ মারা গেছে। ইনু বললেন, নাম ঠিকানা দেন। এক পর্যায়ে খোকন দুটি ছবি দেখালেন। একজন দর্শক পরে জানালেন, ছবিটি নাকি ছিল হাইতির কলেরায় মৃতদের লাশের ছবি। যুক্তিতে না পেরে খোকনের মতো চিৎকার করে ব্যারিস্টার বলতে লাগলেন, গুলি হলো কেন? গুলি হলো কেন?

অর্থাৎ বিএনপি করলে যুক্তি মানা চলবে না, গায়ের জোর দেখাতে হবে।

এমকে আনোয়ারকে তার সহকর্মীরা জানতেন মাথা খালি আনোয়ার হিসেবে। ইদানীং প্রথম সারির নেতা হওয়ার বাসনায় তিনি বেশি কথা বলছেন। সংবাদ সম্মেলনে এমকে বললেন, স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা দেবাশীষের নেতৃত্বে কোরান পোড়ানো হয়েছে। চিন্তা করুন, বাংলাদেশে হিন্দুরা এখন শুধু নাগরিক হিসেবে থাকতে চায়, ভোটাধিকার চায় না, সেখানে এক হিন্দু নাগরিক সবার সম্মুখে কোরান পোড়াবে, একথা কোন পাগলও বিশ্বাস করবে না। এই নির্জলা মিথ্যাচারের উদ্দেশ্য ছিল ৬ মে থেকে যাতে দাঙ্গা লাগানো যায় এবং হেজাবিরা যে কোরান পুড়িয়েছে সে নিয়ে যাতে আলোচনা অন্যখাতে যায়।

অর্থাৎ, বিএনপি করলে মনেপ্রাণে সাম্প্রদায়িক হতে হবে অথবা দাঙ্গা লাগাতে হবে।

অনেক বিএনপি নেতা বারবার বলছেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চেও নাকি এমনটি হয়নি, যা হয়েছে ৫ মে রাতে। এরকম বর্বর গণহত্যার কথা চিন্তা করা যায় না। গণহত্যা শব্দটি বার বার তারা ব্যবহার করছে। এর একটি উদ্দেশ্য, ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে খাটো করে দেখানো এবং জনমানসে এ ধারণার সৃষ্টি করা যে, ১৯৭১ সালে তেমন কিছু হয়নি। ফলে, যুদ্ধাপরাধ মামলা জিঘাংসামূলক। প্রকৃত গণহত্যা এখন হচ্ছে এবং এর জন্য মানবতাবিরোধী অপরাধে বিচার করা হবে। ২৫ মার্চ ঢাকা শহরেই প্রায় দু'লাখ শহীদ হয়েছেন।

অর্থাৎ বিএনপি করলে সংবিধান বিরোধী হতে হবে। সংবিধানে উল্লেখিত মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় শব্দাবলি উপেক্ষা করতে হবে।

৬ মে বিকেলে আমরা অনেকেই একটি এসএমএস পেয়েছি। তাতে লেখা ছিল, ভারতীয় এজেন্টরা মতিঝিলে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এবং এখনও চালাচ্ছে। এর অর্থ এই সরকার ভারতের দালাল। অবশ্য সংবাদ সম্মেলনে এই উক্তি করা হয়নি।

বিএনপি বা হেজাবি হলে পাকিস্তানমনা হতে হবে।

টেলিভিশনের টক শোতে বিএনপি/হেজাবি সমর্থকদের সাংবাদিকদের অনেকে বলেছেন, তাঁরা ঘটনাস্থলে ছিলেন। টেলিভিশনে ধারণকৃত চিত্র তাঁরা দেখালেন। কিন্তু বিএনপি সমর্থক বা নেতারা বার বার জানালেন, ঘটনা সত্য নয়। তাঁরা তখন *নয়া দিগন্ত*, *ইসলামী টিভি* কেন বন্ধ করা হয়েছে এ প্রশ্ন তুলতে লাগলেন। এ দু'টি টিভি যে হেজাবিদের মুখপত্র হিসেবে অনবরত মিথ্যা এবং ৫ ও ৬ মে এমনভাবে সংবাদ পরিবেশন করছিল যে, সারাদেশে দাঙ্গা লেগে যেত। টিভিতে দেখান হলো হেজাবিরা মৃতের ভান করে পড়ে আছে। লাঠির খোঁচা খেয়েই চটপট উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়াচ্ছে। সেটিও মানতে তাঁরা রাজি নন। সত্য কোনভাবে গ্রাহ্য করা যাবে না।

অর্থাৎ বিএনপি করলে নির্লজ্জ বা বেহায়া হতে হবে। আমার এক বন্ধু অনেক আগে বলেছিলেন, ভদ্রলোক হলে বিএনপি করা যাবে না।

হেফাজতী/হেজাবি সমাবেশ ও পরবর্তী ঘটনা নিয়ে বিএনপি নেতারা যা বলছেন এসব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিএনপি যে আড়াই হাজার মৃত্যুর কথা বলছে তার কোন প্রমাণ তারা দেখাতে পারেনি। আড়াই হাজার মানুষ হত্যা করতে হলে কত বুলেটের প্রয়োজন এ হিসাবও তাদের নেই। রবার বুলেট আর বুলেট এক হলে এক ধরনের বুলেটের নাম রবার বুলেট হতো না। কাঁদানেগ্যাস দিয়ে মানুষও হত্যা করা যায় না। আড়াই হাজার মৃতদেহ সরাতে গেলে কত ট্রাক লাগে। টিভিতে কিন্তু কোন ট্রাকই দেখায়নি। ২৫০০ মানুষ মারা গেলে পুরো ঢাকা শহরের একাংশ স্বজনহারাদের

আহাজারিতে ভরে যেত। স্বজন হারাদের প্রায় দেখাই যায়নি। আড়াই হাজার কেন এক শ' লাশও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গুম করা সম্ভব নয়। ডিএমপি কমিশনারের ব্রিফিং বিশ্বাস না করলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম দেখুন। ২৫০০ মারা গেলে সারা পৃথিবীর সাংবাদিকরা ঢাকায় চলে আসতেন। হেজাবিরা ভেবেছিলেন, তাঁদের অনেক মিথ্যাচারের মতো বা ক্রমাগত মিথ্যাচার করলে মানুষ তা বিশ্বাস করবে। কিন্তু সরকার একটি কৌশলী পদক্ষেপ নিয়েছিল। এই অভিযানের সময় দেশী-বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদেরও সঙ্গে নেয়া হয়েছিল। ফলে, এ বারের মিথ্যাচার সফল হয়নি।

আমার মনে হয়েছে, টক শো বা খবরের কাগজে বিএনপির নেতাদের মন্তব্যের বিপরীতে একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়নি; বিষয়টি উল্লেখ জরুরী ছিল। সংঘর্ষে যাঁরা মারা গেছেন তার জবাবদিহিতা সবাই চাইছেন। কিন্তু পটভূমিটা সবাই এড়িয়ে গেছেন। একজন নাগরিকের মৃত্যুও কারও কাম্য নয়। কিন্তু সে যদি নিজে আত্মহত্যা করতে চায়?

সৈয়দ আশরাফ সন্ধের আগে শাপলা চত্বর খালি করে দিতে বলেছিলেন। হেজাবি নেতারা তো তা করেনইনি বরং আশরাফকে নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। সারাদিন তারা যে তাণ্ডব চালিয়েছে সেটি কি আন্দোলনের মধ্যে পড়ে? আগুন লাগানো, ভাংচুর, লুট কী অপরাধ নয়? অপরাধ হলে তো ব্যবস্থা নিতে হবে। লক্ষ্য করবেন, হেজাবিরা যখন ঢাকা শহর অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করছে, পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ও বোমা ছুঁড়ছে তখনও কিন্তু পুলিশ প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেনি। করলেও তা অপরাধ হতো কিনা সন্দেহ। গভীর রাতে পুলিশ গিয়ে প্রথমে অনুরোধ করে তাদের চলে যেতে। হেজাবি নেতারা রাজি হয়নি। কারণ তারা তো সরকার গঠন করতে এসেছে, চলে যেতে নয়। এর পর পুলিশ এ্যাকশনে যায়। অতর্কিতে যদি পুলিশ হামলা করত তা'হলেও না হয় দোষ দেয়া যেত। আর এ কেমন কথা, কিছু গুণ্ডাপাণ্ডা সারা শহরে অরাজকতা চালাবে কিন্তু সরকার কিছু বলতে পারবে না!

অনেকে বলেছেন, বিদেশে এরকম সমাবেশ ভাঙতে গিয়ে সমাবেশকারীদের বেশ মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু, এত বড় সমাবেশ প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার না করে এত কম সময়ে কোথাও মানুষ সরান যায়নি। এই প্রথম অনেকে পুলিশের প্রশংসা করে বলছেন, হেজাবিদের হাত থেকে ঢাকা শহর বাঁচানো যাবে কেউ আশা করেননি। অনেকে এও বলছেন, স্বারাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রচুর নিন্দামন্দ করা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহকে ধন্যবাদ, আগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন না। ১৯৭৫ সালের পর আর কেউ ধর্ম ব্যবসায়ীদের এমনভাবে কোণঠাসা করার সাহস করেননি। তবে এটিও মনে রাখার দরকার, প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন না পেলে এ কাজ করা যেত না। এখন তিনি

আর দোদুল্যমানতায় ভুগছেন না। ভুল হোক ঠিক হোক তিনি একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এবং এখনও সেই সিদ্ধান্তে অটল আছেন। পাঠক, আপনারা বলতে পারেন, আমি ১৪ দলের সমর্থক। তাই অযথা তাদের প্রশংসা করছি। তাহলে বাংলাদেশের এখন সবচেয়ে সিনিয়র সাংবাদিক এবিএম মূসার কথা ধরা যাক। গত চার বছরে কোন লেখায় তিনি বর্তমান সরকারের কোন প্রশংসা করেননি। এখন তিনি অসুস্থ। তারপরও লিখেছেন, "গতকাল (৭ মে) আমি এই সরকারের প্রশংসা করেছি হেফাজত ও ধর্মাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে শক্ত হাতে দমন করার জন্য। মহাজোট সরকারের অনেক কিছুই সমর্থন করি না সত্য; তার মানে এই নয়, দেশে তালেবান সরকার চাই। হেফাজতী নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযানে দুঃখজনক প্রাণহানি ঘটলেও উপযুক্ত সময়ে সরকারের এই অভিযানকে আমি স্মরণ করি। কারণ তারা অবরোধ ও সমাবেশের নামে হত্যাসহ নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টির পাঁয়তারা চালিয়েছিল, তাতে আরও বেশি প্রাণনাশের আশঙ্কা ছিল। বাংলাদেশকে ধ্বংস করার ফন্দি এঁটেছিল হেফাজত।" [*আমাদের সময়*, ৮-৫-১৩]

বাংলাদেশ ব্যাংক লুটের পরিকল্পনা, অন্যান্য ব্যাংকের ক্ষতি সাধন, লুট, পুলিশ হত্যা, নারকীয় সব কর্মকাণ্ড, দেশের কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি, সর্বোপরি কোরান পোড়ানোর পরও শেখ হাসিনা হেফাজতী নেতাদের প্রধান আহমাদ শফী ও তার অনুচরদের সৌজন্যের সঙ্গে হাটহাজারী পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ কথাটি যেন হেফাজতী নেতারা মনে রাখেন। তাদের সবাইকে আদালতে চালান দিলেও হেফাজতীরা ছাড়া কেউ সমর্থন করত বলে মনে হয় না।

কওমি মাদ্রাসাগুলো চলে যাকাত, কোরবাণীর চামড়া ও অনুদানের ওপর। প্রশ্ন উঠছে, তারা যদি ১-২ লাখ মানুষের সমাবেশ ঘটিয়ে থাকে তা'হলে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করেছে। এ টাকা এলো কোত্থেকে? এবিএম মূসা সাহসী মানুষ। তিনি লিখেছেন, 'আমি নাম ধরে বলতে পারি ইসলামী ব্যাংক, ইবনে সিনা ট্রাস্ট, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক নাশকতার অর্থ জুগিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করছে।' [ঐ] সরকারের উচিত এ বিষয়ে আলাদা একটি তদন্ত করা। আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ্য, আমরা নিয়মিত ট্যাক্স দিই। এসব ধর্ম ব্যবসায়ীরা বা তথাকথিত ইসলামী দলগুলোর নেতারা কি ট্যাক্স দেয়? আমরা ট্যাক্স দিই কিনা তা সব সময় কর্তৃপক্ষ নজর রাখে, এসব নেতার ক্ষেত্রে? যদি এরা ট্যাক্স না দেয় তা'হলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া উচিত। না হলে, আমাদের বলতে হবে, সরকার পক্ষপাতিত্ব করছে, যা অসাংবিধানিক।

৭.

যার এখন গণভবনে থাকার কথা ছিল তিনি এখন ডিবি অফিসের কাঠের বেঞ্চে বসে রিমান্ডে অশ্রুপাত করছেন। কিন্তু এই অশ্রুতে সমব্যথী হওয়ার কোন

কারণ নেই। এই জুনায়েদ বাবুনগরী ১৯৭১ সালে মুজাহিদ বাহিনীর নেতা ছিলেন। হেফাজতের নায়েবে আমির মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী জুনায়েদের মামা। মামা-ভাগিনা ১৯৭১ সালের পরও আওয়ামী বিরোধিতা ছাড়েননি। ২০০৮ সালের নির্বাচনে তারা সা.কা. চৌধুরীর হয়ে কাজ করেছেন এবং এই জুনায়েদ বিভিন্ন বক্তৃতায় বলেছেন, যারা আওয়ামী লীগে ভোট দেয় তারা নাস্তিক। ঢাকায় তাদের প্রথম সমাবেশেও টাকা যোগায় সা.কা.র পরিবার [*জনকণ্ঠ* ১০.৫.১৩]। যার কথা ছিল এখন বঙ্গভবনে আয়েসে দিন কাটাবার, তিনি এখন হাটহাজারি মাদ্রাসায় কাঠের বেঞ্চিতে বসে কাঁদেন। কিন্তু এখানেও সমব্যথী হওয়ার বা সম্মান দেখাবার কোন কারণ নেই। কারণ, তিনিও ১৯৭১ সালে যুক্ত ছিলেন মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে।

ইতিহাস হচ্ছে অভিজ্ঞতা। সে কারণে আমরা বারবার বলি, ইতিহাসটা দেখ, তারপর সিদ্ধান্ত নাও। আমাদের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বলে, যে একবার রাজাকার সে সব সময় রাজাকার। ১৯৭১ সালে যারা রাজাকারী করেছে তারা কি ঐ পথ ছেড়েছে? একটা উদাহরণ দেখান যাবে? যাবে না। আমরা আরও বলি, যুক্তিযোদ্ধা হওয়া যতটা সহজ ছিল, আজীবন মুক্তিযোদ্ধা থাকা ততটা সহজ নয়। জিয়াউর রহমান ও তার সাথীরা এর বড় প্রমাণ, যাদের সঙ্গে ইয়াজিদের তুলনা করা যেতে পারে। বা সাদেক হোসেন খোকা, যিনি এখন পরিচিত সাদেক হোসেন ধোঁকা নামে; বা মওদুদ, সিভিলিয়ানদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি এ দেশের ক্ষতি করেছেন। তাই আমরা ইতিহাসকে অভিজ্ঞতা হিসেবে মানি এবং কঠিন সত্যে উপনীত হই যে, তাদের সহস্র তোষণ করলেও তাদের পক্ষে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়া সম্ভব নয়, আওয়ামী লীগকে সমর্থন করা সম্ভব নয়, ভান হয়ত করতে পারে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ কথা কখনও বুঝতে চাননি। প্রতিবার ক্ষমতায় গিয়ে তারা তাদেরই গুরুত্ব দিয়েছেন যারা তাদের হয়ে লড়াই করেননি বা তাদের হয়ে কাজ করেছেন বলে ভান করছেন। এও এক ধরনের অদ্ভুত মানসিকতা, যা হীনম্মন্যতার তুল্য এবং এ কারণেই তারা সব সময় সমস্যায় পড়েছেন।

বেগম জিয়াও প্রস্তুত ছিলেন। জনাব ধোঁকার বাসায়, বাবুনগরী টাকা পয়সা হেফাজতে নিতে ও সরকার পতনের বিষয়ে, ৫ মে-তেও আলাপ করেছেন বলে পত্রিকায় প্রকাশ। জানা যায় সরকার পতন ও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতায় যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মওদুদও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। শোনা যায়, সরকার পতন হলে তারাই দ্রুত বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে আসল ক্ষমতা হস্তগত করে বাবুনগরীদের হাটহাজারি পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু পতন হলো না। বাবুনগরীদের সাহায্যের জন্য খালেদার আহ্বান ঢাকাবাসী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তার গলার স্বর আর শোনা যায়নি।

খালেদা বা আহমাদ শফী ক্ষমতায় গেলে জামায়াতীরা জানত, তারাই হবে

চাবিকাঠি। সুতরাং বিএনপির চেয়ে তারাই মাঠে নেমেছিল বেশি। এবং সে কারণেই ইসলামী ব্যাংক আক্রান্ত হয়নি, অন্যান্য ব্যাংক আক্রান্ত হয়েছে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, আজ ইসলামী ব্যাংক আক্রান্ত হলে জামায়াত আন্দোলন থেকে সরে যাবে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা জামায়াত ও পাকিস্তানীদের মার দিতে পেরেছিল দেখে তারা নতজানু হয়ে বসেছিল। ৫ মের অভিজ্ঞতা বলে, রাজাকার, রাজাকারপন্থী বা রাজাকারের বাচ্চাদের সঙ্গে যদি নমিত ব্যবহার না করেন তাহলে তারা ঠিক থাকবে। পত্রিকার খবরে প্রকাশ, আহমাদ শফী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করে অনুরোধ করেছেন, তার পুত্র আনাছ ও দুই খাদেমকে যেন গ্রেফতার করা না হয় [*কালের কণ্ঠ*, ১০.৫.১৩]।

তার কারণে এতগুলো মানুষের মৃত্যু হলো, জখম হলো, গ্রেফতার হলো, কারও কথা তার মনে হয়নি; শুধু পুত্র ও দুই খাদেমের কথাই মনে হলো! ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার আগেও তিনি শুধু সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, যে অগণিত মানুষের ক্ষতি তিনি করেছেন তাদের কাছে নয়। মনে রাখা ভাল, মানবিকতা তাদের বড় গুণ নয়। হলে, ১৯৭১ সালে তারা নিজেদের মানুষদের হত্যা করতেন না, মা-বোনদের ধর্ষণ করতেন না।

এ সব রাজাকার ১৯৭৫ সালের পর মাদ্রাসা তৈরি করে তাতে আশ্রয় নিতে থাকে। এবং এভাবেই বাংলাদেশে সহস্র মিনি মাদ্রাসা তৈরি হয়। শুনেছিলাম আওয়ামী লীগের এক নেতা বলেছিলেন, জামায়াত বা কওমি এক ভোট, নারীও এক ভোট। আমাকে দু'ইটাই দেখতে হবে। এখানেই ফ্যালাসি। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা। জামায়াত বা মাদ্রাসা ভোট তার পক্ষে যাবে না, কিন্তু নারীর যাবে। সে ক্ষেত্রে মাদ্রাসা ভোট উপেক্ষা নয়, গুরুত্ব না দেয়াই সমীচীন।

সরকারের কঠোর অবস্থানের ফলে আপাতত মাদ্রাসাগুলো খুব একটা নড়াচড়া করবে না। এদের নেতারা এত টাকা খেয়েছে যে, নিজেদের স্বার্থ আরও ক্ষুন্ন হোক সেটি চাইবে না। কিন্তু তারা সব সময় পাকিস্তানী বাংলাদেশীদের পক্ষেই থাকবে। এছাড়া নিজেদের শক্তির দম্ভ ভেঙ্গে যাওয়ায়ও তারা হতবাক।

বিএনপি-জামায়াত এখন মরিয়া অবস্থায়। তাদেরও নিজেদের শক্তি সম্পর্কে যে বিশ্বাস ছিল তার ভিত নড়ে গেছে। তাদের হরতালের ডাক ব্যর্থ হয়েছে। তাদের লিডার আলবদর কামারুজ্জামানের ফাঁসির দণ্ড হওয়ার পরও তারা আর আগের মতো রাস্তায় সহিংসতা দেখাতে পারেনি। কিন্তু, তারা এও জানে যে, এবার ক্ষমতায় যেতে না পারলে হেজাবিদের সেই রাজনৈতিক শক্তি আর থাকবে না। সুতরাং এখন তারা দেশ ধ্বংসে যা যা করার তা তা করবে। অর্থাৎ সামনের দিনগুলো আরও রক্তক্ষয়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

৫-৬ মের ঘটনার অন্য একটি দিকও আছে। তা'হলো, পাকিস্তানী বাংলাদেশী

বা হেজাবিরা অপরাজেয় নয়। বরং এই ধারণা তৈরি করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি অপরাজেয়, তারা ফিনিক্স পাখির মতো। এই শক্তির জায়গা থেকেই আগামী নির্বাচন সামনে রেখে কাজ করে যেতে হবে।

এ জন্য প্রথম কাজটি হবে সব ধরনের মান-অভিমান ভুলে সরকার, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব দল, গ্রুপ, সংগঠন ও ব্যক্তিতে যৌথ ফ্রন্ট গড়তে হবে। লড়াইটা হবে হেজাবি অপশক্তির হাত থেকে দেশকে ও নিজেদের রক্ষা করা। সরকার আমাদের জন্য কী করল, তার চেয়েও বড় কথা আমরা কী করলাম, তা একবার ভাবা; সম্প্রতি বাংলাদেশ বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র দেখে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার ভিত্তিতে কাজ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা। সরকারেরও উচিত হবে এ ধরনের বিভিন্ন উদ্যোগ সমন্বয় ও সাহায্য করা।

না, আমি কাউকে পরামর্শ দেব সে রকম বিজ্ঞ নিজেকে মনে করি না এবং সে ধৃষ্টতাও দেখাব না। সিভিল সমাজের স্বার্থে শুধু বলব, রাজনৈতিক নেতৃত্বেই আমরা এগিয়ে যাব। শুধু আশা করব, রাজনৈতিক নেতারা সিভিল সমাজের আকাঙ্খার প্রতি আরও সংবেদনশীল হবেন এবং গুরুত্ব আরোপ করবেন। কারণ, আমরাও ভোটার। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরও তাদের জয়-পরাজয় নির্ভর করে। আমরাও একটি শক্তি এবং আমাদের চিরকালীন দাস হিসেবে ভাবার কোনও কারণ নেই। আমাদের অভিজ্ঞতা এ রকম-

১. ইসলামের নাম নিয়ে অনেকে রাজনৈতিক দল গঠন করে, ধর্ম ব্যবহার করে গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। এ কারণে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে এবং করবে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে না যাওয়ায় ও সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক রাষ্ট্রধর্ম অটুট থাকায় তাদের মনে এ প্রতীতি জন্মেছে যে, তারা অত্যন্ত শক্তিশালী। এ এক ধরনের জুজুর ভয়। সে কারণে, তারা মনে করে ধর্ম/ ইসলামের নাম ব্যবহার করে তারা যা খুশি তা করতে পারে। এমন কি বিএনপি ও জাতীয় পার্টি 'ইসলামী' দল না হয়েও অনবরত ইসলাম ব্যবহার করছে। ডানপন্থা এভাবে শক্তিশালী হচ্ছে। সুতরাং ভেবে দেখার সময় এসেছে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধানে রাখা উচিত কি উচিত নয়। সৌদি আরব পর্যন্ত ইসলামিক রিপাবলিক নয়, সৌদি এরাবিয়া। কিন্তু মুসলমানরা এ ব্যাপারে নিশ্চুপ।

এ যুক্তিও উড়িয়ে দেয়া যায় না, সংবিধান থেকে এসব সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো রাতারাতি উড়িয়ে দেয়া যাবে না। সময়টা ১৯৭২ নয়। এখন ধর্ম সমাজ-রাজনীতিতে অনেকটা স্পেস নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এ সাংঘর্ষিক অবস্থা কতটা হ্রাস করা যায় সেটি ভেবে দেখা দরকার। হয়ত, ১৪ দল আরেকবার ম্যান্ডেট পেলে এ বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে পারে। অথবা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী শক্তি যদি হেজাবিদের থেকে শক্তিশালী হতে পারে এবং হেজাবিরা যে ধর্মের নামে ধোঁকা দিচ্ছে সেটি তৃণমূলে বোঝানো যায়, তা'হলে বিষয়টি সহজ হবে।

হেজাবিদের কোরান পোড়ানো একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। আমাদের মনে রাখা দরকার, হেজাবিরা একটি দু'টি নয় কয়েক শ' কোরান, জায়নামাজ ও তসবি পুড়িয়ে ফেলার পরও হেজাবিদের তেমনভাবে ধোলাই দিতে কেউ নামেনি। কিন্তু অন্যপক্ষের কেউ যদি অসাবধানেও একটি কোরান পোড়ান তা'হলে ১৪ দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য হেজাবিরা বাংলাদেশ তোলপাড় করে ফেলত। মনে রাখা দরকার, সাঈদীর চাঁদে অবস্থানও এদেশের মানুষ বিশ্বাস করে। সুতরাং বাস্তবধর্মী এবং ইতিবাচক কী পদক্ষেপ নেয়া দরকার সেটি ভেবে দেখা উচিত।

৮

২. এ ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু মনে হচ্ছে তারা তা পারেনি। অথচ, বঙ্গবন্ধু সে কারণেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন করেছিলেন। এই ফাউন্ডেশনে নতুন নেতৃত্ব আসা দরকার এবং এর খোল-নলচে পাল্টে যুগোপযোগী করা দরকার। এটি একটি আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে। তৃণমূল পর্যায়ে তারা কী করতে পারে সে অনুযায়ী কার্যক্রম সাজানো দরকার। ইমাম প্রশিক্ষণ যদি সঠিক হতো তা'হলে বিভিন্ন মসজিদের ইমামরা সাঈদীর মৃত্যুদণ্ড হওয়ার পর থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে খতরনাক ব্যবহার করেছেন তা করতেন না। বিষয়টি জনগুরুত্বপূর্ণ।

৩. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চারটি রায়েই জামায়াতকে অপরাধী সংগঠন বা ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ রায়ে বিষয়টি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১৯৭১ থেকে এখনও এই দলটি একই ধরনের আচরণ করে আসছে। একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশে তারা কর্মকাণ্ড চালাতে পারে কিনা বিষয়টি সবার ভেবে দেখা উচিত। চতুর্থ রায়ের পর সরকার বাদী হয়ে ট্রাইব্যুনালে সংগঠনটি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে মামলা করতে পারে। এ দাবি আমরা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছি।

গত ৩৫ বছরের কথা বাদ দিই, গত ছয় মাসে তাদের যে হিংগ্র চেহারা আমরা দেখেছি, সে প্রেক্ষিতেও একটি সন্ত্রাসী দল হিসেবে জামায়াতের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। এর আগে আন্দোলনের নামে কোনও দল এত পুলিশ র‍্যাব আর সীমান্তরক্ষী হত্যা করেনি। এ দলটি এখন নিষিদ্ধ করা উচিত কি উচিত নয়?

৪. হেফাজতে ইসলাম জামায়াতী ধারায় একই ধরনের কাজ করছে। প্রকাশ্যে অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দাবি করলেও এর কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক। একমাত্র রাজনৈতিক দলই সরকার গঠন ও সরকার উৎখাতের দাবি ও আহ্বান জানায়। রাজনৈতিক কারণে, সংগঠনটির প্রধান আহমদ শফীকে কোন কিছুর জন্য দায়ী না করে সংগঠনটির মহাসচিব ও অন্যান্য– যেমন, বাবুনগরী, ফয়জুল্লাহকে দোষী বলা হয়। যে, যতই বলুক, দায়দায়িত্ব আহমদ শফীরই। সরকার বা দলের যে কোন কর্মকাণ্ডের জন্য শেখ হাসিনাকে নিন্দা বা নন্দিত করা হয়, সৈয়দ

আশরাফকে নয়।

আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন, বিএনপি-জামায়াত হেফাজতের ভেতর ঢুকে গেছে, অপকর্মগুলো তাদের। আওয়ামী লীগের টার্গেট যেহেতু বিএনপি সে জন্য এ রকম বক্তব্য তারা রাখতেও পারে। হেফাজতের মধ্যে বিএনপি-জামায়াতের-অনুপ্রবেশ ঘটেনি তা বলব না, কিন্তু হেফাজতের সব কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব বিএনপি-জামায়াতের এ ধরনের উক্তি বিভ্রান্তিকর অপকৌশল। হেফাজত যদি মনে করে বিএনপি-জামায়াত তাদের সংগঠন দখল করেছে তা'হলে আহমাদ শফী ও অন্য নেতাদের সংগঠনটি লুপ্ত করতে হবে। হেফাজতীরা জামায়াতী কাজকর্ম করবে আর বলা হবে তারা এর জন্য দায়ী নয়, এটি হতে পারে না। আর হেফাজতীদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড যদি অব্যাহত থাকে তা'হলে তাদেরও নিষিদ্ধ করার দাবি উত্থাপন করতে হবে।

৫. এ বিষয়টি এখন স্পষ্ট যে, মাদ্রাসাগুলোই জঙ্গী মৌলবাদের কেন্দ্র। ১৯৭৫ সালের পর থেকে আদর্শগত ও নির্বাচনী কারণে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগ এদের ব্যবহার করেছে এবং তোয়াজ করেছে। আর এই তোয়াজ করতে করতে মাদ্রাসাগুলো নিজের জমি দৃঢ় করেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে যারা এদের নিয়ে খেলছে ভাবছে, তারাই বিপদে পড়বে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাকিস্তান।

মাদ্রাসা তোয়াজের মধ্যে এক ধরনের ভণ্ডামি আছে। মাদ্রাসা শিক্ষা যদি এত ভাল হয় তাহলে এসব রাজনৈতিক দলের নেতাদের ছেলেমেয়েরা কেন ইংরেজী স্কুলে বা বিদেশে পড়ে? জামায়াত-বিএনপির কোন নেতার ছেলেমেয়েরা মাদ্রাসায় পড়েনি। আওয়ামী লীগেরও নয়। শুধু তাই নয়, আমি দেখেছি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাও প্রথমেই একটি মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতা করেন, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় করেন না। তাদের ছেলেমেয়েরাও মাদ্রাসায় পড়ে না। আল্লাহ কি বলেছেন, মাদ্রাসায় পড়লে বা টাকা দিলে সওয়াব বেশি হবে? সুতরাং, প্রতি বাজেটে মাদ্রাসা বাজেট বাড়ানো উচিত নয়। যেসব মাদ্রাসায় যুগোপযোগী শিক্ষা দেয়া হবে সরকার সেগুলোর ক্ষেত্রেই শুধু পৃষ্ঠপোষকতা দিতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষার কথা উঠলেই আঁতকে ওঠার কোন কারণ নেই। এবিএম মূসা যথার্থই লিখেছেন-

"মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা যাকাত ও কোরবানির চামড়া বেচা অর্থ, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দানের অর্থের ওপর নির্ভরশীল। মাদ্রাসা শিক্ষাকে এসব কিছুর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করে পুরোপুরি সরকারের নজরদারি, অনুদান প্রদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিকভাবে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বর্তমান অসাম্প্রদায়িক সরকারকেই নিতে হবে। এর জন্য দশ বা বিশ বছর মেয়াদী

পরিকল্পনা নিতে হবে। শুধু কোরবানির পশুর চামড়া বেচা অর্থ, যাকাত ও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল হলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা সমাজের বৃহত্তর কোনও উপকারে আসবে না। আর সে-কারণেই তাদের দিয়ে যে কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করিয়ে নেয়া সম্ভব।"

৬. কত রকমের এবং কত মাদ্রাসা আছে বাংলাদেশে তার সঠিক হিসাব সরকারের কাছে আছে কিনা জানি না- আলিয়া, কওমি, ফোরকানিয়া, হাফিজিয়া ইত্যাদি অনেক রকমের মাদ্রাসা। সব মাদ্রাসা মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে নয়। সব ধরনের মাদ্রাসার সংখ্যা হবে কমপক্ষে তিন লাখ। কারণ, কুড়ি বছর আগে এই সংখ্যা ছিল আড়াই লাখের কাছাকাছি। এ তথ্য দিয়েছেন সাহিত্যিক গবেষক হায়াৎ মামুদ টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে। ৫৬ হাজার বর্গমাইলে তিন লাখের কাছাকাছি মাদ্রাসা এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। এ মুহূর্তে আমি জানি না, সব ধরনের মাদ্রাসার রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন কী না। না হলে, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় করার জন্য যে সব নিয়ম কানুন মানতে হয়, একটি মাদ্রাসা স্থাপনের জন্যও তা চালু করতে হবে। এবং সরকারী শিক্ষাক্রম চালু না করলে সে মাদ্রাসার অনুমতি দেয়া যাবে না। খাস জমিতে মাদ্রাসা স্থাপন করা যাবে না। যত্রতত্র মাদ্রাসা স্থাপন করা যাবে না।

মাদ্রাসার হালহকিকত নিয়ে সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে একটি নিবিড় জরিপ করা জরুরি। অধিকাংশ মাদ্রাসার ক্ষেত্রে অভিযোগ, তারা জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা মাদ্রাসার জন্য অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ করেছে। যেসব মাদ্রাসায় জঙ্গী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ আছে সেসব মাদ্রাসা বন্ধ করে দিতে হবে এবং শিক্ষকদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৭. সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মীদের কি উচিত নয় তৃণমূল পর্যায়ে বোঝানো যে মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক স্কুল উত্তম? কোরবানির চামড়া বা দান ধ্যানের ওপর নির্ভরশীল না থেকে স্বাধীন জীবিকা উত্তম? সরকারী উপজেলা অফিসারের কাজ কী? তারা কি মাদ্রাসাগুলো পরিদর্শন করেন নাকি অফিসে বসে শুধু দরিদ্র প্রাথমিক শিক্ষকদের ওপর হম্বিতম্বিই করেন? শুধু তাই নয়, যে সব রাজনৈতিক দল হেফাজত/জামায়াত সমর্থক (এদের ভিত্তি মাদ্রাসা) বা জামায়াতের নেতাদের সন্তানরা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত কিনা সে বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা উন্নয়ন বা সামাজিক কর্মীদের কর্মকাণ্ডের অংশ হতে পারে ভন্ড রাজনৈতিক নেতাদের মুখোশ উন্মোচনের জন্য। এ ক্ষেত্রে মিডিয়া প্রবল ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮. রাজনৈতিক কারণে এবং মাদ্রাসা তোষণের স্বার্থে বিভিন্ন সরকার মাদ্রাসার ডিগ্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীর সমতুল্য করেছে। আরবী বিশ্ববিদ্যালয় করছে এবং এভাবে যুগোপযোগী শিক্ষার সর্বনাশ করছে। লক্ষ্য করবেন, সুশীল সমাজের নেতারা বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বললেও এসব বিষয়ে বাতচিত করেন না; কারণ,

তাদের সন্তানরা বিদেশে পড়ে।

মাদ্রাসার বিভিন্ন ডিগ্রীকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীর সমতুল্য করা হয়েছে। এটি হতে পারে না। মাদ্রাসায় দেয়া নম্বর আর সেক্যুলার স্কুলে দেয়া নম্বরে পার্থক্য আছে। এভাবে শিক্ষার উন্নয়ন করা যাবে না।

৯. মাদ্রাসা শিক্ষিত যে কেউ যে কোন সময় যে কারো বিরুদ্ধে মুরতাদ, মুশরিক, কাফের, নাস্তিক ইত্যাদি ফতোয়া দেয়। এ প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে এবং ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড শুধু সংবিধানবিরোধীই নয়, রাষ্ট্র বিরোধীও। এ ধরনের ফতোয়া আইন করে নিষিদ্ধ করার দাবি নাগরিক সমাজকেই তুলতে হবে।

১০. এখন থেকে আমরা যেন মুসলমানত্ব পরীক্ষা দিতে অগ্রসর না হই। যে ভাষায় মৌলবাদীরা কথা বলবে সে ভাষায়ই উত্তর দিতে হবে। যুক্তি বুঝলে কেউ জামায়াত-বিএনপি বা জঙ্গী মৌলবাদের সমর্থক হয় না। এরা শক্তি বোঝে।

১১. অধ্যাপক আবদুল মান্নান এক প্রবন্ধে জানিয়েছেন, চট্টগ্রামের বড় মাদ্রাসাগুলোতে সব সময় বড় রকমের সাহায্য করে আওয়ামী সমর্থক ব্যবসায়ীরা। তারা যদি একইভাবে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করত তা হলে কোন মন্তব্য ছিল না। কিন্তু, শুধু মাদ্রাসায় সাহায্য করবে এবং বাইরে পরিচিত হবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক হিসেবে তা কাম্য নয়, এটি এক ধরনের ভণ্ডামি। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক কিন্তু ইসলামী ব্যাংকে টাকা রেখে; ইবনে সিনায় চিকিৎসা নেয়াও এক ধরনের ভন্ডামি। আমি স্বাচিপের অনেক নেতাকে অনুরোধ করেছিলাম, আপনারা সংগঠনের সমর্থকদের আহ্বান জানান এসব প্রতিষ্ঠান বয়কটের জন্য। তারা সেটি পারেননি। এভাবে, আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে তুলে ধরি বৃহত্তর স্বার্থের বিপরীতে কিন্তু সমালোচনা করি নিয়ত সরকার ও মুক্তিযুদ্ধের দলগুলোকে। এও এক ধরনের ভণ্ডামি। এসব স্বার্থবুদ্ধি পরিহার না করলে মৌল-জঙ্গীবাদী ও এর সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

১২. রাজনৈতিক নেতা হলেই তিনি যা খুশি করতে পারবেন বা বলতে পারবেন- এ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। রাজনীতিবিদদের অসত্য ভাষণ, বিভ্রান্তিকর উক্তি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। যেমন, ২৫০০ মানুষের মৃত্যু। এই যে প্রচার এটি দেশবিরোধী। যখন-তখন 'গণহত্যা' শব্দ ব্যবহার 'গণহত্যা'কে খাটো করে দেখা। পৃথিবীর অনেক দেশে আইন আছে স্বাধীনতা বা মুক্তিসংক্রান্ত কোন কিছুকে অস্বীকার করা অপরাধ। আইনত দন্ডনীয়। ইউরোপে 'হলোকাস্ট ডিনাইল' অপরাধ। এখানেও সে ধরনের আইন করা বাঞ্ছনীয়।

একটি প্রস্তাব করা যেতে পারে। তরুণ কিছু আইনজীবী যদি একটি সংগঠন করেন 'প্রো বোনো' জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা করার জন্য তা'হলে ভালো হয়।

রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্তিকর প্রতিটি উক্তি যদি চ্যালেঞ্জ করা যায় তাহলে হয়ত রাজনীতিবিদদের সবার উর্ধে, আইনের উর্ধে কাজ করার মানসিকতা হ্রাস পাবে।

রাজনীতিবিদদের দায়িত্বহীন উক্তি নিয়ত চ্যালেঞ্জ করা হয় না দেখে আজ এই বিপত্তি।

১৩. হরতাল করা এবং না করার অধিকার সবার আছে। হরতালের সহিংসতা রোধে সুপিরিয়র রেসপনসিবিলিটির কথা বিবেচনা করা যায় কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। কয়েক মাস আগে আমি কুয়ালালামপুর ছিলাম। আমি যাওয়ার কয়েকদিন আগে এ রকম একটি হরতাল হয়েছিল। হরতালকারীরা কয়েকজন হকারের পণ্যের ও কয়েকটি (বোধ হয়) সাইনবোর্ডের ক্ষতি করেছিলেন। হরতাল যে দল ডেকেছিল সে দলকে বলা হয় ক্ষতিপূরণ দিতে। না হলে রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের নিবন্ধন বাতিল হবে। তাদের আদালত কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এখানেও যে দলের ডাকা হরতালে যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তিনি সে দলকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করার জন্য উচ্চ ও নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন কিনা তা বিবেচনা করুন।

৯

কোন সরকার এককভাবে এ ধরনের হিংস্রতা রোধ করতে পারবে না যদি না জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজেরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। খবরে পড়লাম, হেফাজতীরা যখন পালাচ্ছিল ট্রেনে করে, তখন একটি স্টেশনে ক্রুদ্ধ জনতা একত্রিত হয় এবং হেফাজতীকে বের করে গণধোলাই দেয়া হয়।

১৪. অনলাইনে হেজাবিরা কুৎসা রটনা থেকে দাঙ্গায় প্ররোচনা– এমন কোন কুকর্ম নেই যা করছে না। আমাদের কাছে খুবই অদ্ভুত লাগছে যে, এসব বিষয়ে হেজাবিরা যখন আক্রমণাত্মক কথাবার্তা বলে ১৪ দল, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজন এমনকি তথ্যমন্ত্রীও পরিষ্কারভাবে উত্তর দিতে কার্পণ্য করেন। দুয়েকটি উদাহরণ দিই। প্রত্যেকটি টকশোতে হেজাবি নেতা ও সমর্থকরা বারবার বলে যাচ্ছে, *আমার দেশ*, *দিগন্ত* ও *ইসলামিক টিভি* ইচ্ছে করে বন্ধ করে দিয়েছে। এসব গণতন্ত্র ইত্যাদির ওপর আঘাত। এমনকি তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক সিটিংয়েও চ্যানেল আইয়ের শাইখ সিরাজ বললেন, বন্ধের আগে তাদের সতর্ক করা উচিত ছিল।

মাহমুদুর রহমান, *দিগন্ত* ও *নয়াদিগন্ত* বাংলাদেশের প্রভূত পরিমাণ ক্ষতি করেছে। তারা মক্কা শরিফ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী ইত্যাদি বিষয়ে মিথ্যা ছবি ও খবর ছাপিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, দাঙ্গা বাধিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, মাহমুদুর তিন চারজনের একটি গ্রুপ করেছিলেন যারা ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ইন্টারনেটেও নিয়মিত তথ্য বিকৃতি বা সাইবার ক্রাইম করত। তার অফিসে টাকা আদান-প্রদান সম্পর্কেও প্রতিবেদন বেরিয়েছে। এগুলো গুজব হলেও, যেহেতু ব্যক্তিটি মাহমুদুর

রহমান তাই সব গুজব নাও হতে পারে। *দিগন্ত টেলিভিশন* ৫-৬ মে অসত্য ব্যাখ্যা শুধু নয়, তথ্য বিকৃতি ঘটিয়ে দাঙ্গা লাগাবার উপক্রম করেছিল। সুতরাং, যে সব পত্রিকা/টিভি, পত্রিকা বা টিভির মতো ব্যবহার করে না, দাঙ্গায় প্ররোচনা দেয় তাদের শুধু বন্ধ নয়, ডিক্লারেশন বাতিল করতে হবে। শিশুর হাতে আগুন দিলে সমূহ বিপদ, তেমনি যারা দায়িত্ববান নয় তাদের টিভি/পত্রিকার লাইসেন্স দেয়া বিধেয় নয়।

এইসব সাইবার ক্রাইম দমনে শক্তিশালী একটি বিভাগ খোলা উচিত যেখানে ভিন্ন বেতন স্কেলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ করা উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা উচিত, ইন্টারনেট অপব্যবহার চিহ্নিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে তদন্ত কমিটি করেছে সেখানে মৌলবাদের দুজন প্রতিনিধি রাখা হয়েছে; কিন্তু এর বিপরীতে মোস্তাফা জব্বার বা জাফর ইকবালের মতো কাউকে রাখা হয়নি। এটি ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

হেজাবিরা এখন রাজনীতির নামে সরাসরি সন্ত্রাস শুরু করেছে। তারা যে ভাষা বোঝে সে ভাষায় প্রতিরোধ করলে হয়ত তাদের বাড়াবাড়ি কমবে। তবে, আমাদের এ বিষয়ে কোন মতামত নেই। সেটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ার। তবে, স্ব-স্ব অবস্থান থেকে আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে এবং রাজনৈতিকভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে। সেটি কী হতে পারে?

বাবুনগরী জানিয়েছেন, তাদের সহিংস প্রচেষ্টাকে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কিছু নেতা সহায়তা করেছে। তদন্তে তা প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। বাবুনগরী বেশ কিছু সংস্থার নাম বলেছেন যারা তাকে আর্থিক অন্যান্য সহায়তা করেছে। সেগুলো হলো-

ইসলামী ব্যাংক, রাবেতা আল ইসলামী, ইবনে সিনা ট্রাস্ট, কেয়ারি গ্রুপ, মাকান গ্রুপ, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, চট্টগ্রামের আল আমিন ফাউন্ডেশন, কেয়ারি বাংলাদেশ, খুলনার হ্যামকো ব্যাটারি, আল আমিন জুয়েলার্স, তামান্না ট্রেডিং, মৌ-মার্কেট, রেটিনা, যশোরের এস এহসান মাল্টিপারপাস কোম্পানি সোসাইটি লিমিটেড, হাজী শরীয়তউল্লাহ ফাউন্ডেশন, আঁকাবা ফাউন্ডেশন এবং জেলা ইত্তেফাকুল উলামা, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, ইসলামী ঐক্যজোট, এমদাদুল উলুম মাদ্রাসা [*প্রথম আলো*, ১৯ বৈশাখ, ১৪২০]।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজনের প্রথম কাজ হবে এসব প্রতিষ্ঠানকে বয়কট করা, ইসলামী ব্যাংক সব সময় এসব কাজ করছে কিন্তু তাকে ছোঁয়াও যায় না। সরকারে কি তাদের শক্তিশালী এজেন্ট আছে? অনেক টিভির খবর স্পন্সর করবে বিভিন্ন চ্যানেল। তাদের আমরা অনুরোধ করব সে সব পরিহার করতে। সরকার তদন্ত করে যদি দেখে বাবুনগরী যা বলছে তা সত্য তাহলে কোরান পোড়ানো, পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি এবং সাধারণ মানুষ হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুট, সরকারী

সম্পত্তির ক্ষতি, নিরাপত্তার হুমকি স্বরূপ এসব প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দিতে হবে, কোন রকম দয়া-দাক্ষিণ্য দেখান যাবে না। যারা দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাবে তাদেরও আমাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

হেজাবিরা ক্ষমতায় এলে নারীকে শিকল দিয়ে ঘরে আটকে রাখা হবে। অত্যাচার করা হবে। তাদের রুটি-রোজগার, পড়াশোনা সব বন্ধ করে দেয়া হবে। সেখানে হেজাবি বলে খাতির করার কোনো সুযোগ থাকবে না। হেজাবিরা এলে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ও আওয়ামী লীগারদের শেষ করতে হবে। গয়েশ্বর রায়দের মতো দুতিনজনকে রাখা হবে বাইরে দেখানোর জন্য যে তারা অসাম্প্রদায়িক। হেজাবিরা এলে কোরান হাদিস সব পুড়িয়ে ফেলা হবে। খালি মওদুদীর অনূদিত কোরান বা তার বইপত্র চলবে। মসজিদগুলো ব্যবহৃত হবে হেজাবিদের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির মানুষজনের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া হবে। আপনারা যদি তা না চান তাহলে ভোটের বাক্সে এর জবাব দিতে হবে।

সরকারকে শুধু একটি অনুরোধ। আলোচনার দ্বার সব সময় খোলা রাখুন, এমনকি হেজাবিদের জন্যও। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে এদের কোন ছাড় দেবেন না। তাহলে আমাদেরকেও মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। শেখ হাসিনার যদি মুসলমানত্ব পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে আমাদের সবার জন্যই তা অপমান। তাদের কাছে পরীক্ষা দিয়ে, মিনতি করে আমাদের আর অপমান করবেন না। তরুণদের, গণজাগরণ মঞ্চের তরুণদের বলব, পক্ষ নিতে হবে। নির্দলীয় কোন আন্দোলন সফল হয় না। এবং একা কোন আন্দোলন করা যায় না। যে সব ব্যক্তি বা শক্তি সমর্থন দেবে তাদের নিয়েই আন্দোলন করতে হবে হেজাবিদের বিরুদ্ধে। এবং সেটি স্পষ্ট করতে হবে। না হলে মানুষ কেন যাবে শাহবাগে? খালি গান শুনতে আর পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে! ইতিহাস বলে, তোষণে কোন কাজ হয় না। অতি তোষণ, নির্দলীয় ভঙ্গি নিজের বিপদ টেনে আনে।

আজ আমাদের সবার একটি স্লোগানই হওয়া উচিত, এ দেশ আর রাজাকারদের হবে না। এ দেশ আর রাজাকারদের হাতে তুলে দেয়া যাবে না। জয় বাংলা!

১৭ মে, ২০১৩

গোলাম আযমের দণ্ড কি ঠিক হয় নি?

গোলাম আযমের রায়ের জন্য দীর্ঘদিন আমরা অপেক্ষা করেছি। রায় হয়েছে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজন এই রায়ে খুশি হতে পারেননি। না পারাটা খুব স্বাভাবিক। গোলাম আযম নিছক একটি নাম বা ব্যক্তি নন। বাংলাদেশে তিনি যুদ্ধাপরাধের প্রতীক। জামায়াতে ইসলামী নামে যে দল ১৯৭১ সালে সারা বাংলাদেশে যে কুকাণ্ড করেছিল তিনি তার প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ, ৬ লাখেরও বেশি ধর্ষণ, গণদেশত্যাগ, লুট, অগ্নিসংযোগের মন্ত্রদাতা তিনি। বিচারে তাঁকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হবে না– এটি মেনে নেয়া কষ্টকর। আমি, আমরা অনেকে এতে ক্ষুব্ধ হয়েছি। কিন্তু তাই বলে এ রায় মানি না, এ রায় প্রত্যাখ্যান করলাম, বৃথা আমাদের এই আন্দোলন-এ ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে চাই। কারণ, এ ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য আমাদের অর্জনকে বিনষ্ট করবে, আমাদের অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছনোর চেষ্টায় পথচ্যুত হব এবং তা কেবল মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের হাতই শক্তিশালী করবে। এই রায়ের প্রতিবাদ ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু তা যেন হঠকারিতা না হয় সেদিকে লক্ষ রাখাও বাঞ্ছনীয়। প্রতিবাদের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে রায়টি পর্যালোচনা করার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাব।

আমরা অনেকে যথেষ্ট উত্তেজিত এবং রায় নিয়ে নানাবিধ নেতিবাচক মন্তব্য করছি। আমরা ভুলে যাচ্ছি, এই রায়ের জন্য কী কঠিন পথ আমাদের পেরুতে হয়েছে। জেনারেল জিয়ার পাপ মোচনে কত মানুষকে আত্মত্যাগ করতে হয়েছে! যুদ্ধাপরাধ বিচারের সংগ্রামটা মুক্তিযুদ্ধেরই বয়সী। কয়েক পর্যায়ে আন্দোলনটি গতি পেয়েছিল। প্রথম পর্যায়ের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে আন্দোলন বেগবান হয়। দেশদ্রোহীর তকমা নিয়ে তাঁর মৃত্যু হলে আন্দোলনে ভাটা পড়ে। তৃতীয় পর্যায়ে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আন্দোলন এগিয়ে নেয়। এ পর্যায়ে কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক কবির চৌধুরী, বিচারপতি কেএম সোবহান, অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, শাহরিয়ার কবির থেকে কাজী মুকুল গত দীর্ঘ দু'দশক জোরালো আন্দোলন করেছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন। অনেকে এখন প্রয়াত। বিচার না দেখার আফসোস নিয়ে মরেছেন। আমরা সৌভাগ্যবান যে, যে আন্দোলন করেছি দীর্ঘ চার দশক, তার ফল দেখে যেতে পারছি। তাই রায় নয়, বিচার যে হচ্ছে এবং রায় হচ্ছে সেটিও কম অর্জন বলে মনে করি না।

আন্দোলনের পরের অবস্থাও বিবেচ্য। ১৪ দলের ম্যানিফেস্টোতে যুদ্ধাপরাধ বিচারের প্রতিশ্রুতি সুনির্দিষ্টভাবে দেয়া হয়েছিল। ২০০৮ সালের নির্বাচনে তরুণরা যে আওয়ামী লীগের ভোটের ঝুলি ভর্তি করে দিয়েছিলেন তার একটি কারণ, যুদ্ধাপরাধ বিচারে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পরই দাবি উঠেছিল যুদ্ধাপরাধের বিচারের। আওয়ামী লীগ এক বছর দেরি করেছিল। তার পর ট্রাইব্যুনালের কথা ঘোষণা করেছিল। তখন রব উঠেছিল, ট্রাইব্যুনাল হয়েছে, গোলাম আযমরা তো গ্রেফতার হবে না। তারা গ্রেফতার হলে বলা হলো তদন্ত হবে না, বিচার শুরু হলে বলা হলো বিচার হবে না, বিচার শুরু হলে বলা হলো বিচারে এত দিন কেন লাগবে, ইচ্ছে করে দেরি হচ্ছে যাতে রায় দিতে না হয়, এখন রায় দেয়া হলে বলা হলো, রায় মানি না। জামায়াতও রায় মানে না। আর এত দিন ওই ধরনের অপপ্রচারে জামায়াত-বিএনপির হাত ছিল না তা কিভাবে বলি। তবে, সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলাও দরকার এই সরকারই সমস্ত অপপ্রচারের সুযোগ দিয়েছে। তারা ট্রাইব্যুনালের অবকাঠামো সম্পর্কে আমরা যা বলেছি তার কোন গুরুত্ব দেয়নি, হেলাফেলাভাবে বিচার-প্রক্রিয়া চালিয়েছে, অথর্ব এবং সন্দেহভাজন লোকদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়েছে, অযোগ্য ও সুবিধাবাদী ও সুবিধাভোগীদের প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছে। সবশেষে গোলাম আযমের মুক্তি দাবিকারী ইকবাল সোবহান চৌধুরীকে অন্দরে জায়গা করে দিয়েছে। সুতরাং সরকার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার কারণও সরকার। কিন্তু, তার পরও তো বিচার হয়েছে এবং ছয়জনের রায় পাওয়া গেছে। এ লেখা যেদিন ছাপা হবে সেদিন সপ্তম জনের রায় পাওয়া যাবে। এ অর্জন কি একেবারে তুচ্ছ করার মতো?

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যা লিখেছেন তা যথার্থ। তিনি লিখেছেন, 'যুদ্ধাপরাধের বিচার কিন্তু কোন ব্যক্তির বিচার নয়, এটি হলো একটি অপরাধের বিচার। এ বিচার খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ, এটি ছিল মস্ত বড় এক অপরাধ। এমন নয় যে, কিছু ব্যক্তি একটি অপরাধ সংঘটন করেছে। এটি একটি সংগঠিত অপরাধ। যুদ্ধাপরাধের বিচার করার এই সংস্কৃতি সারাবিশ্বেই উদাহরণ তৈরি করছে। আমরাও তেমন একটি উদাহরণ তৈরি করছি। এটাই হচ্ছে যুদ্ধাপরাধের বিচার-প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় দিক।' [*জনকণ্ঠ* ১৬.৭.১৩]

প্রায় একই রকম মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান: 'আমি যুদ্ধাপরাধের বিচার দাবি করে এসেছি। কারও কোন নির্দিষ্ট শাস্তি দাবি করিনি। আদালতে উপস্থাপিত তথ্য ও সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে বিচারকরা যে রায় দিয়েছেন তা আমি সুবিচার বলে গণ্য করি।' [*প্রথম আলো* ১৬.৭.১৩]

যে বিচার হওয়ার কথা ছিল না, বিচার শুরু হওয়ার পর রায় হবে কি না এ সন্দেহ ছিল– সেই বিচার-প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। গোলাম আযম ও তাঁর দোসরদের

বিরুদ্ধে রায় দেয়া হচ্ছে। যুদ্ধাপরাধ যে হয়েছিল যা বিএনপি-জামায়াত এতদিন অস্বীকার করে আসছে, তার বিপরীতে সত্য শুধু প্রতিষ্ঠিত নয়, আইনী ভিত্তি পাচ্ছে, বিশ্বের মানুষ আবার জানছে জামায়াতে ইসলামী কত বড় ক্ষতিকর একটি প্রতিষ্ঠান, যার কাজ ধর্মের ফেরি করে মানুষ হত্যা আর ধর্ষণ। এটি আমাদের অর্জন, সরকারেরও অর্জন ও কৃতিত্ব। তার পরও একটি কথা বলি, ১৯৭১ সালে গণহত্যার যখন ভিডিওচিত্র দেখি তখন পাগল পাগল লাগে। মনে হয় ওই সব হত্যাকারীকে হত্যা করি। গোলাম আযমরা ১৯৭১ সালে যখন হত্যাযজ্ঞ চালায় তখন তাঁরা শিশু, নারী, অসুস্থ, বয়স্ক কিছুই বিবেচনায় আনেনি। মানবিকতা ইসলামের ধর্ম, জামায়াত বা হেজাবিদের [হেফাজত-জামায়াত-বিএনপি] নয়। সুতরাং আমাদের শুধু শুধু অনুকম্পা দেখাবার কী কারণ থাকতে পারে? হ্যাঁ, বর্তমানে বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদন্ড উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই দিক থেকে এ রায় আন্তর্জাতিকভাবে বিশেষ গ্রহণযোগ্য। আর ৯২ বছর বয়সে জেলে গিয়ে আমৃত্যু জেলে থাকা খুব আনন্দের ব্যাপার নয়। তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু, ফাঁসির চেয়ে অনেক বেশি কঠোর শাস্তি। যেমনটি লিখেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: 'যদিও তার প্রাণদন্ডাদেশ প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু এত দীর্ঘ সময়ের কারাদন্ডও চরম শাস্তিই।' [ঐ]

গোলাম আযমের দন্ড হতোই, কম বেশি, কিন্তু তার চেয়ে বিবেচ্য দন্ড দেয়া ছাড়া এই রায়ে আর কী বলা হয়েছে। দন্ডের ডামাডোলে এই রায়ের বিশেষ দিকগুলো ঢাকা পড়ে গেছে।

২.

যে ক'জন যুদ্ধাপরাধীর দন্ড দেয়া হয়েছে তাঁর মধ্যে গোলাম আযমই প্রথম, যার বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগের ৬১টি কাউন্ট প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে চারটি অভিযোগ নেতৃত্ব দানের উপাদান। বাকিটি সিরু মিয়া ও তার পুত্রকে খুন। সবকিছুই প্রমাণিত হয়েছে এবং বিচারকরা বলেছেন, এ কারণে তাঁর প্রাণদন্ডাদেশ যৌক্তিক কিন্তু বয়সের কারণে তা দেয়া হলো না। এখানে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কোন ধারা/বিধিতে বয়সের কারণে দন্ড লাঘবের কোন ব্যবস্থা নেই।

গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী এবং মুজাহিদের ক্ষেত্রে আমরা শুরু থেকে বলছিলাম, নেতৃত্বের দায় প্রযোজ্য হওয়া উচিত, ইংরেজীতে যাকে সুপিরিয়র রেসপনসিবিলিটি বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আমাদের বিচারশাস্ত্রে এ বিষয় নিয়ে তেমন কাজ হয়নি। গোলাম আযমের বিচারে প্রসিকিউশন এ বিষয়টির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করে এবং বিচারকরা তা গ্রহণ করেছেন। নেতৃত্ব দানের কারণেই গোলাম আযমের দন্ড দেয়া হয়েছে। এর ফলে, অন্যান্য অনেকের ক্ষেত্রে দন্ড দেয়ার বিষয়টি সহজ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, আমাদের বিচার শাস্ত্রেও নতুন

মাত্রা যুক্ত হলো।

এই রায়ে জামায়াত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, অন্য কোন রায়ে বিষয়টি তেমনভাবে বলা হয়নি। আগের রায়গুলোতে জামায়াতে ইসলামীকে শুধু অপরাধী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এই রায়ে আরও তিনটি পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে-

১. ১৯৭১ সালে জামায়াত যে রকম অপরাধী সংগঠন ছিল এখনও তাই আছে।

২.এই নেতৃত্ব তরুণদের বিপথগামী করছে।

৩. জামায়াতের কোন ব্যক্তিকে সরকারী বা বেসরকারী কোন পদে রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।

এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে স্বচ্ছ চিন্তার, মুক্ত- বুদ্ধির মানুষের চিন্তা মিলে যায়। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণ কতগুলো প্রশ্ন তুলেছে–

১. অপরাধী সংগঠনকে রাজনীতি করতে দেয়া উচিত কি না বা তার সেই অধিকার থাকে কিনা;

২. অপরাধী সংগঠনের সদস্যরাও তো অপরাধী [প্রতি হরতালে এই অপরাধীরা রাস্তায় গাড়ি পোড়ানো, বোমা নিক্ষেপ ও মানুষ ও পুলিশ হত্যা করছে];

৩. এই অপরাধীদের সামরিক-বেসামরিক চাকরিতে রাখা যায় কি না;

৪. বিএনপি এই অপরাধী সংগঠনের সঙ্গে রাজনীতি করছে। সুতরাং সেটিও অপরাধ কি না।

সরকারকে শুধু নয়, সমাজকেও এ বিষয়ে ভাবতে হবে, বিশেষ করে তরুণদের। অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষকতা শুধু নয়, তাদের সঙ্গে মিলে তারা যে রাজনীতি করছে, সেটি রাজনীতি কিনা? নাকি অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে। এ সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন :-

১. জামায়াত যে সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে সেগুলো মাফিয়া প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হবে কিনা

২. হলে সেগুলোর কার্যক্রম চালু থাকবে কিনা

৩. সেগুলো এফবিসিসিআইয়ের মতো বাণিজ্যিক সংগঠনে থাকতে পারবে কিনা

এ বিষয়গুলোরও ফয়সালা হওয়া উচিত। আদালতের আদেশে কিন্তু বিশ্বের অনেক জায়গায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটেছে। তবে আমাদের দেশের মানুষ মূলত আওয়ামী লীগবিরোধী। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই দাবিগুলো বিবেচনা না করলে সরকার একা এ কাজ করতে পারবে না, সাহসও করবে না। তবে, পদওয়ালা জামায়াতীদের পদ থেকে তো সরানো যেতে পারে। এ বিষয়ে কোন না কোন পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। বিশেষ করে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেসব জামায়াতী ও তাদের সমর্থক আছে তাদের এবং আমলাতন্ত্রে চিহ্নিত যারা আছে তাদের অপসারণের মাধ্যমে কাজটি শুরু করা যায় কিনা সেটি ভেবে দেখতে হবে।

অনেকে প্রশ্ন করবেন বা বলবেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে কথিত দল নিজের ঘর আগে পরিষ্কার করুক। এ ধরনের মন্তব্য করার সাহস মানুষ পাচ্ছে সম্প্রতি আওয়ামী লীগ প্রধানের উপদেষ্টা হিসেবে ইকবাল সোবহান চৌধুরীর নিয়োগের কারণে।

জনাব চৌধুরী ১৯৮৪ সালে এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন– "সরকার রাজনৈতিকভাবে এক্সপ্লয়েট করার জন্য গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নটিকে ঝুলিয়ে রেখেছে। নইলে অন্য সবার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া হলেও গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে না কেন?

নাগরিকত্ব জন্মগত অধিকার। জন্মভূমিতে বসবাস করার অধিকার সবার রয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশে কারও জন্মগত অধিকার কেড়ে নেয়া যায় বলে আমি মনে করি না। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যদি কেউ কাজ করে, তবে রাষ্ট্রের আইনে তার বিচার করা যেতে পারে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতই এই প্রশ্নে রায় দিতে পারেন অন্য কেউ নন। গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নটি নিয়ে ক্ষমতাসীনরা অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করছেন।

রাজনৈতিকভাবে আমি হয়ত গোলাম আযমের সঙ্গে একমত নই। এটাই গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে তাঁর মৌলিক বা নাগরিক অধিকার খর্ব হতে দেখলে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমি নিশ্চুপ থাকতে পারি না। গোলাম আযমের স্থলে অন্য কেউ এ পরিস্থিতিতে পড়লেও আমি অনুরূপ দাবি জানাতাম।'

ঢাকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে ১০৬ জন বিশিষ্ট সাংবাদিক এক যুক্ত বিবৃতিতে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন।

সাংবাদিকগণ বিবৃতিতে বলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক। সাবেক সরকার মৌলিক অধিকারের প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেই তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করেছেন। অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব অবিলম্বে পুনর্বহাল করার দাবি জানিয়ে তাঁরা বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, বর্তমান সরকারও এখন পর্যন্ত তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেননি। বিবৃতিতে স্বাক্ষর দানকারী সাংবাদিকগণ হচ্ছেন, জনাব আনোয়ার জাহিদ (*বাংলাদেশ টাইমস*), ইকবাল সোবহান চৌধুরী (*বাংলাদেশ অবজারভার*), সৈয়দ মোহাম্মদ জাফর (*দৈনিক দেশ*), আমিন আহমদ চৌধুরী (*বাংলাদেশ টাইমস*), আখতারুল আলম (*ইত্তেফাক*), সুলতান আহমদ (*দৈনিক আজাদ, বর্তমানে ইনকিলাব*), আবুল আসাদ (*দৈনিক সংগ্রাম*), মোহাম্মদ হোসেন (*দৈনিক দেশ*), খলিলুর রহমান (*বাংলাদেশ অবজারভার*), আমানুল্লাহ কবির (*নিউ নেশন*), শিহাব উদ্দিন আহমদ (*বাংলাদেশ টাইমস-নিউ নেশন*), ইউসুফ শরীফ (*আজাদ*),

মোজাম্মেল হক (*দৈনিক বাংলা*), আবদুল খালেক (*দৈনিক বাংলা*), আবদুল আউয়াল ঠাকুর (*সংবাদ*), সিরাজুল হক (*দৈনিক জনপদ*), ওবায়দুর রহমান (*দৈনিক আজাদ*), কাজী মাসুম (*দৈনিক বাংলা*), জনাবা সুলতানা (*বাংলাদেশ টাইমস*), জনাবা ফজলুন্ নাসিমা খানম (*দৈনিক আজাদ*)।

গোলাম আযম যেহেতু অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন এবং আমৃত্যু তাকে জেলে থাকতে হবে সে পরিপ্রেক্ষিতে ইকবাল সোবহান চৌধুরীর সে পদে থাকা আর বিএনপি-জামায়াতকে সঙ্গে রাখা একই ব্যাপার। এটির সুরাহা না হলে ব্যাপকসংখ্যক মিডিয়াকর্মী ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমর্থন হারাবে আওয়ামী লীগ। ভোটের প্রশ্নে একজন থেকে ১০০-এর গুরুত্ব বেশি। রাজনীতির ক্ষেত্রেও আদর্শের গুরুত্ব বেশি।

এই সঙ্গে আরও প্রশ্ন উঠতে পারে বিশেষ করে হেজাবিরা যে প্রশ্ন করতে পারে তা'হলো এটি তো পর্যবেক্ষণ, রায় নয়। তা'হলে বলতে হবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়েও তো আন্দোলন চলে না, কারণ হেজাবিরা যে বলছে, আদালতের রায় আছে তত্ত্বাবধায়কের পক্ষে তা তো ঠিক নয়। সেটিও তো পর্যবেক্ষণ।

গোলাম আযমের ৯০ বছরের দন্ড নিয়ে ক্ষোভের আরেকটি কারণ হচ্ছে এই যে, সবার আশঙ্কা, বিএনপি বা ১৮ দলীয় জোট ক্ষমতায় এলে গোলাম আযমকে ছেড়ে দেয়া হবে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। অনেক সাংবাদিকও। তাদের তা'হলে বলব, এই যদি শঙ্কা হয় তা'হলে স্বীকার করে নিতে হবে যে, এদেশে আওয়ামী লীগ বা ১৪ দলীয় জোট মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আর বিএনপি বা ১৮ দলীয় জোট মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের। সুতরাং, যুদ্ধাপরাধ বিচার অব্যাহত রাখা ও রায় কার্যকর করার জন্য তো ১৪ দলকেই আবার ভোট দিতে হয়। ১৪ দলকে ভোট দেয়ার ব্যাপারে অনীহা থাকবে আবার এদের বিচারও দন্ড কার্যকর নিয়ে আশঙ্কা করা হবে– দুটো তো এক সঙ্গে চলে না। আর এসব জঞ্জাল পরিষ্কার শুধু আওয়ামী লীগেরই দায়িত্ব, সুশীল বা সাধারণ বা অন্য কোন রাজনৈতিক দল বা মিডিয়ার নয়- তা'তো হতে পারে না।

গোলাম আযমের দন্ডাদেশ দেয়ার পর অনেকে বলছেন, আওয়ামী লীগ কেন সন্তুষ্ট এই রায়ে? এই সরকার ট্রাইব্যুনাল করেছে, এই সরকার ট্রাইব্যুনালের রায় নিয়ে কিভাবে প্রশ্ন তোলে? অনেকে বলেছেন, আওয়ামী লীগ যে জামায়াতের সঙ্গে আঁতাত করছে এ রায় তারই প্রমাণ। অনেক বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদও এ কথা বলেছেন।

এসব দায়িত্বহীন উক্তি। এসব উক্তির অর্থ দাঁড়ায়, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের নির্দেশে কোর্ট-কাছারি চলছে। এটি শুধু বিচার ব্যবস্থা নয়, বিচারকদের প্রতিও অবমাননাকর মন্তব্য। এ ধরনের সস্তা মন্তব্য না করা শ্রেয়। যদি বিচারকরা সেই মতো রায় দিতেন তা'হলে আমৃত্যু জেল না দিয়ে যাবজ্জীবন

দিতেন এবং জামায়াত সম্পর্কেও এত কঠিন কঠিন মন্তব্য করতেন না।

এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি টেলিভিশনে চট্টগ্রামের এক মুক্তিযোদ্ধার মন্তব্য আমার ভাল লেগেছে। তিনি বলছিলেন, শহীদ পরিবারের জন্য এই রায় অপ্রত্যাশিত। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ, ১৯৭১-৭২ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অস্ত্র ছিল। তাঁরা যুদ্ধাপরাধীদের নিধন না করে, শাস্তি না দিয়ে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। শুধু মুক্তিযোদ্ধারা নয়, সমাজ তাদের গত ৩৫ বছর আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে সে সমাজের অন্তর্গত আমরাও। বিচার বা দন্ডাদেশ প্রত্যাখ্যান করার আগে যেন আমরা এ বিষয়টিও চিন্তায় রাখি।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচার বিলম্বের কারণ ভূমিকায় বলেছেন। তিনি বলেছেন, রায় আরও দ্রুত হতো, ভাল হতো যদি তারা অবকাঠামোগত সুবিধা পেতেন। তিনি উল্লেখ করেছেন একটি রেফারেন্স লাইব্রেরী নেই, এক সেট মাত্র স্বাধীনতার দলিলপত্র আছে ছয় বিচারকের জন্য। এসব কথা আমরা অনেকবার বলেছি। সরকার এটিকে গুরুত্ব দেয়নি। হেলাফেলা করেছে। লাজলজ্জা থাকলে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করব বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে অবকাঠামোর উন্নয়ন করুন। এই সীমিত সাধ্যে তদন্ত, টিম, প্রসিকিউশন, বিচারকরা যে কাজ করছেন সে জন্য তাঁরা অবশ্যই সমাজের অভিনন্দর্ন পেতে পারেন।

সবশেষে বলি, যুদ্ধাপরাধের বিচার তো আমরা চেয়েছি। এর অর্থ আমরা 'ডিউ প্রসেস অব ল' বা নির্দিষ্ট বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে চেয়েছি। ট্রাইব্যুনাল হয়েছে, সুতরাং ট্রাইব্যুনালের রায়ও আমাদের গ্রহণ করতে হবে, মানতে হবে। দন্ড আমাদের পছন্দ না হলে আপীলের সুযোগ আছে।

আমাদের বরং এখন গোলাম আযমের মৃত্যুদণ্ডের জন্য আপীলের দাবি তোলা উচিত। বলা উচিত জামায়াত নিষিদ্ধ করা হোক যেহেতু এটি একটি মাফিয়া সংগঠন। দাবি তোলা উচিত, এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করতে হবে। নির্বাচন কমিশন এ বিষয় নিয়ে রাজনীতি করছে। এটি ঠিক নয়।

আমরা নির্দিষ্ট আইনী প্রক্রিয়ায় বিচার চেয়েছি দেখেই জামায়াতের কোটি কোটি টাকা খরচের পরও ট্রাইব্যুনালকে বিতর্কিত করা যায়নি আন্তর্জাতিকভাবে। প্রতিটি রায়ই প্রশংসিত হয়েছে। সুতরাং আমরা যেন প্রতিটি রায়ের পর আবেগে এমন কিছু না করি যাতে রায় বিতর্কিত হয়ে যায়, আমাদের অর্জনটুকুও বিনষ্ট হয়। তরুণদের প্রতি অনুরোধ থাকবে যতটুকু অর্জন হয়েছে তা যেন সংহত করে রক্ষা করা হয়।

১৮ জুলাই, ২০১৩

মুজাহিদের দণ্ডের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অপরাধমূলক রাজনীতি প্রতিরোধ

আলবদর আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ১৯৭১ সালে তার বাহিনী নিয়ে প্রথমে অসম পরে দিল্লী জয় করতে চেয়েছিলেন। কেন পারেননি সে প্রসঙ্গ পরে। পালিয়েছিলেন নেপাল তারপর পাকিস্তান। আলবদর বন্ধু জিয়াউর রহমানের আমলে ফিরে আসেন দেশে। জেনারেল জিয়ার স্ত্রীর আমলে মন্ত্রী। ট্রাইব্যুনালে ঢুকে দেখি কাঠের বেষ্টনীতে বসে। এত উত্থান-পতন একজনের জীবনে খুব কমই আসে। বিচারকরা যখন রায় পড়ছিলেন তখন মনে হলো এই আলবদর কমান্ডারকে ১৯৭১ সালে আমরা বলতাম আজরাইল।

মুজাহিদের পুরো পরিবার রাজাকার। তার পিতা শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে মানুষজন হত্যা লুটপাট করেছেন। তার পুত্র পৃথিবীর ইতিহাসে হিংস্রতম একটি বদর বাহিনীর উপপ্রধান ছিলেন। বদর বাহিনী যা করেছে তার জন্য মৃত্যুদন্ডও যথেষ্ট শাস্তি নয়।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগী হিসেবে বদর বাহিনীর সৃষ্টি হয়। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ রূপান্তরিত হয় আলবদর বাহিনীতে। এর বাইরেও যে কিছু লোকজন আলবদর বাহিনীতে যোগ দেয়নি তা নয়। ইসলামী ছাত্র সংঘের [সারা পাকিস্তান] প্রধান মতিউর রহমান নিজামী নিযুক্ত হন আলবদর বাহিনীর প্রধান। মুজাহিদ ছাত্রসংঘের হোমরা-চোমরা ছিলেন। ১৯৭১ সালেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রধান হন, সে হিসেবে আলবদরদের উপকমান্ডার। বস্তুত মাঠে মুজাহিদের দাপটই ছিল বেশি। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তার বিরুদ্ধে সাতটি অভিযোগ করা হয়েছিল। আসলে এত অভিযোগের দরকার ছিল না। বুদ্ধিজীবী হত্যায় জড়িত ও নেতৃত্ব দানের কারণেই তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতেন। আলবদর নেতা হিসেবে হত্যার পরিকল্পনা পন্থা সবই তার নির্দেশে হতো। মুজাহিদের মতো হিংস্র মানুষ খুব কমই দেখা মেলে। তার সেই হিংস্রতা বয়সের কারণেও হ্রাস পায়নি। তার অবয়ব দেখলেই তা অনুমান করা যায়।

প্রত্যেক আলবদরই যুদ্ধাপরাধী। তারা ছিল পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগী শক্তি তবে সরাসরি অধীনস্থ। তারা কখনও কখনও স্বাধীনভাবে কাজ করলেও

পাকিস্তানী সেনা কমান্ডের অনুমতি ছাড়া সাধারণত কাজ করতে পারত না। তাদের প্রশিক্ষণ, বেতন, অস্ত্রশস্ত্র সব পাকিস্তানী বাহিনীই যোগাত। সুতরাং, ১৯৭১ সালের খুন, ধর্ষণ, হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির দায়দায়িত্ব তাদের ওপরও বর্তায়। এ কারণে, নিজামী থেকে আশরাফুজ্জামান বা যে কোন আলবদরেরই বিচার হওয়া উচিত এবং হচ্ছেও।

পাকিস্তান বাহিনীর ওপর নির্ভরতা ও তাদের হয়ে কাজ করার প্রমাণও এখনও পাওয়া যাচ্ছে। মনসুর খালেদের বইয়ের একটি অধ্যায় আছে 'আলবদরদের অবদান।'তিনি বিভিন্ন সাক্ষাতকার, পত্র-পত্রিকা থেকে আলবদর সম্পর্কে পাকিস্তানীদের বিবৃতি, বক্তৃতা সঙ্কলন করেন।

এসব পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততাই তুলে ধরে এবং এগুলোও যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ।

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চ লাইটের' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেসামরিক প্রশাসনের দেখাশোনাও তিনি করতেন। বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য তিনি দায়ী– একথা অনেকেই বলেছেন। আমি ও মহিউদ্দিন আহমদ যখন তার সাক্ষাতকার নিই রাওয়ালপিন্ডিতে, তখন তিনি ১৯৭১ সালের গণহত্যার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, [১৯৯৮] আমাকে যে রাজাকার, আলবদর, আল শামস সব কিছু ছিল নিয়াজীর নিয়ন্ত্রণে। তিনি এর কিছুই জানেন না। ৯-১০ ডিসেম্বরের একটি ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তার ভাষায়–

'শুনুন, জেনারেল শামসের ছিলেন পিলখানার দায়িত্বে। তিনি আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তিনি জানান, আমাদেরকে জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সাধারণত আমাদের কোন বৈঠক হয় না। জেনারেল শামসেরকে বললাম, ঠিক আছে যাব। পিলখানায় পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। সেখানে দেখলাম কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে কেন? তিনি বললেন, বিশেষ উদ্দেশ্যে আমরা জেনারেল নিয়াজীর কাছে যাচ্ছি, সে জন্যই গাড়িগুলো এখানে। তারপর বললেন, কয়েকজন লোককে গ্রেফতার করতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? বললেন, কথাটা নিয়াজীকেই তুমি জিজ্ঞেস কর। এতে তোমার মত কি? আমি বললাম, স্যার, এখন কাউকে গ্রেফতারের সময় নয়, বরং এখন কত লোক আমাদের সঙ্গে আছে সেটিই দেখার বিষয়।'

এই যে গ্রেফতার ও গাড়িগুলোর কথা বলা হচ্ছে, এখানেই ইঙ্গিত আছে আলবদরদের। আলবদররা তখন বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে মানুষ তুলে নিচ্ছে। এ গাড়িগুলো আলবদরদের দেয়া হতো মানুষজনকে তুলে নেয়ার জন্য।

আমাকে যখন জেনারেল ফরমান এ কথাগুলো বলেন, তখন বোধহয় তিনি

ভুলে গিয়েছিলেন ১৯৮৩ সালে *দৈনিক জং* ও *দৈনিক নওয়ায়ে ওয়াক্তে* এক সাক্ষাতকারে তিনি কী বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আলবদর ও আল শামসের কার্যকলাপের আমি প্রত্যক্ষ দর্শক। এই দুটি সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবেলায় তাদের জান কুরবান করেছিল।'

জেনারেল নিয়াজী কিন্তু ব্যাপারটা অস্বীকার করেননি। আমাকে তিনি বলেছিলেন [১৯৯৮] 'আলবদর, আল শামস আমারই সৃষ্টি। এ প্রক্রিয়াটি আমি শুরু করি মে মাস থেকে। ওরা সরাসরি আমার কমান্ডে ছিল।'

২১ মে ১৯৭১ সালে আলবদর বাহিনীর যাত্রা শুরু। যে মেজর রিয়াজ এদের সংগঠিত করেছিলেন তিনি মনসুরকে জানিয়েছিলেন– 'তারা বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের অখন্ডতা ও প্রতিরক্ষাকে ঈমানের অংশ ও দ্বীনের দাবি বলে মনে করতেন।'

বিগ্রেডিয়ার সিদ্দিক সালিকের নাম আমাদের পরিচিত। ঢাকায় ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন। বইও লিখেছেন। 'ম্যায়নে ঢাকা ডুবতে দেখা' গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন, 'আলবদর, আলশামস ও রাজাকাররা পাকিস্তানের জন্য তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। যে কোন আদেশ তারা সম্পূর্ণভাবে পালন করত।'

ভাল বলেছেন আলবদরদের সুপার বস আবুল আলা মওদুদী। ১৯৭৩ সালে করাচীর *দৈনিক জসরত* পত্রিকায় তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে যখন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে তখন আলবদররা পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে কাজ করছিল। আর যখন পাকিস্তানী বাহিনী দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় বাহিনীর গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় তখন এই তরুণরা পাক বাহিনীর পুরোপুরি সহযোগিতা করে। এমনকি সেনাবাহিনীর সাফল্য এই তরুণদের ওপর নির্ভর করেই অর্জিত হচ্ছিল। কেননা সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। তারা পূর্ব পাকিস্তানের রাস্তা-ঘাট ও ভাষা জানত না বা চিনত না। ওই সময়ে এই তরুণরা ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও দেশপ্রেমে উদ্বেলিত হয়ে সামনে এগিয়ে যায় এবং তারা ভারতীয় বাহিনীর আগ্রাসী হামলা প্রতিহত করার জন্য স্বদেশী বাহিনীকে পূর্ণরূপে সাহায্য করে। তারা প্রচুর কুরবানী স্বীকার করে। এরাই ছিল সেই নওজোয়ান যারা পাক বাহিনীর অগ্রপথিক ছিল। তাদের মধ্য থেকে প্রায় ৫ হাজার ওই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে শহীদ হয়েছেন আর যারা জীবিত রয়ে গেছেন তারা আপন বাঙালি ভাইদের হাতে এখন শহীদ হচ্ছেন।'

৫০০০ আলবদর নিহত হলে তো আমরা বেঁচে যেতাম। নিহতের সংখ্যা অনেক কম। আর বাংলাদেশ হওয়ার পর তাদের কোথায় নিধন করা হয়েছে? হয়নি। তবে, ধরে নিতে হবে পাকিস্তানীরা বিশেষ করে পাকিস্তানের জেনারেল ও 'মৌলানা'রা মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত।

২

নিয়াজীর কথা তো আগে খানিকটা উল্লেখ করেছি। ১৯৭৮ সালে 'টাইগার বোল তা হ্যায়' শিরোনামে তার একটি সাক্ষাতকার বের হয় *কওমী ডাইজেস্টে*। সেখানে তিনি বলেন, 'আল বদর আল শামস চূড়ান্ত পর্যায়ের বিশ্বস্ত দেশপ্রেমিক প্রাণবন্ত ও উদ্বেলিত পাকিস্তানী ছিল। যারা মনে-প্রাণে পাক বাহিনীকে সাহায্য যুগিয়েছে। তারা আমাদেরকে কখনও ধোঁকা দেয়নি। আমাদের সঙ্গ ছেড়ে তারা মুক্তি বাহিনীতে চলে যায়নি। আমাদের দুশমনদের সঙ্গে কখনও আঁতাত করেনি। নিজস্ব কমান্ডোদের দুশমনদের এলাকায় পাঠানোর ক্ষমতা আমার ছিল না। তখন দুশমনের ভূখন্ডে অধিকাংশ ও বেশিরভাগ এ জাতীয় অভিযান আল বদরের রাজাকাররা পরিচালনা করত। তারা আগরতলায় (ভারতে) থিয়েটারে বোমা ফেলেছিল। এই ঘটনার দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণের মনোবল বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। এই জওয়ানরা কলকাতায়ও ভাল রকমের অভিযান পরিচালনা করছিল। পূর্ব পাকিস্তানের এ সকল রাজাকার ও ইসলাম পছন্দ নেতৃবৃন্দের খেদমতে আমার কেবল এটুকুই বলার আছে যে, যারা বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে জানবাজি রেখেছে তাদের কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিন যারা যেখানেই থাকুন।'

টাইগার নিয়াজী ওরফে বিল্লি নিয়াজীর অতিরঞ্জনের অভ্যাস পশ্চিম পাকিস্তানী জেনারেল ও বেসামরিক কর্মকর্তারাই উল্লেখ করেছেন। আগরতলায় আলবদরদের বোমা ফেলা ও কলকাতায় বোমা ফেলার কথা বলা তার ওই রকম কিছু অতিরঞ্জনের উদাহরণ।

পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা নসরুল্লাহ খান বলেছেন, আলবদর আল শামসের কারণে পাকিস্তানী বাহিনী অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বড় রকমের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।

ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ হায়াত খান ১৯৭১ সালে ছিলেন যশোর খুলনার দায়িত্বে। ১৯৭৮ সালে *উর্দু ডাইজেস্টে* এক সাক্ষাতকারে বলেন, 'আমাকে সালাম করতে দিন আলবদর ও আল শামসের ওইসব বীর সন্তান যারা পাকিস্তানীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই লড়াই করেছেন, যারা নিজেদের রক্ত লেখা দিয়ে অবিচলিত ও সাহসিকতার নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন। এ পর্যায়ে বিশেষভাবে ইসলামী ছাত্র সংঘের তরুণদের কথা উল্লেখ করব, যারা বীরত্বের বিরাট কৃতিত্ব গড়েছেন। কঠিন পরিস্থিতিতে যারা প্রত্যয়ের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অনেক শহীদ হয়ে গেছেন, অনেকে বার বার আহত হয়েছেন। তাদের ঘরবাড়ি লুটপাট হয়েছে। প্রিয়জনদের হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের চোখের সামনে তাদের পিতামাতা ও ভাইদের সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছে যা দেখে পাথরের বুকও ফেটে যেত। অথচ তাদের পা এটুকুও নড়েনি। এসব তরুণ

ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের জন্য যেসব ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং যে যে কীর্তি গড়েছেন তা নিশ্চিতভাবেই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের আলোকিত অধ্যায়।'

শান্তি কমিটির প্রধান খাজা খায়েরুদ্দীন এক সাক্ষাতকারে ১৯৭৭ সালে বলেন- 'যখন কারও খেয়াল ছিল না তখন মওদুদী একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের আদর্শবান কর্মচারী যোগাড় করা ও পাকিস্তানকে সঠিক পরিচালনার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার চেষ্টাসমূহের একটি ফল হচ্ছে ইসলামী জমিয়তে তালাবা (ইসলাম ছাত্র সংঘ) আমার সম্পর্ক এমন এক দলের (মুসলিম লীগের) সঙ্গে যেটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা নিজেরা নিজেদের পাকিস্তানের উত্তরাধিকারী বলেও দাবি করি। কিন্তু পাকিস্তানকে সঠিক অর্থে পাকিস্তান বানানোর জন্য যে কাজ করেছেন।

আমি প্রশ্ন করতে চাই যে, একথা স্বীকার করে নিতে আমাদের লজ্জা কেন হয়? এটা পরিষ্কার যে, এ কাজটি মাওলানা মওদুদী করেছেন। এই বুড়ো লোকটি তরুণদের এমন টিম গঠন করেছেন যা ইসলামের জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। আমার চোখগুলো ১৯৭১ সাল পূর্ব পাকিস্তানে দেখেছে যে, কিভাবে আল্লাহর নামে জমিয়তের (সংঘের) তরুণরা পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছে। পাকিস্তানী বাহিনীর উপায়গুলো তো শেষ হয়ে গিয়েছিল। অবস্থা বেগতিক হয়ে যাওয়ার কারণে অস্ত্রসমর্পণ করেছিল। কিন্তু ইসলামী ছাত্র সংঘের তরুণরা এখনও পর্যন্ত অস্ত্র সমর্পণ করেনি। আর এটা তাদেরই কৃতিত্ব যে, বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাম থেকে সেক্যুলার শব্দটি অপসারণ করতে বাধ্য হয়েছে।'

তিনি তাদের সাথী জেনারেল জিয়াউর রহমানের কথা উল্লেখ করেছেন যিনি সংবিধান সংশোধন করেছিলেন রাজাকার আলবদরদের বাংলাদেশের সমাজে রাষ্ট্রে পুনর্বাসন করার জন্য। সে পরিপ্রেক্ষিতে তাকে আলবদর বন্ধু বললে কি অতিরঞ্জন হবে?

৩.

যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্য তিনজন আলবদর কমান্ডারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রথমজন নিজামী, জামায়াতের আমির ১৯৭১ সালে আলবদর প্রধান হিসেবে সমস্ত হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। মুজাহিদ জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল, তৎকালীন বদর বাহিনীর উপপ্রধান। মাঠে থেকে হত্যা করেছেন, পরিকল্পনা করেছেন, আলবদরদের পরিচালনা করেছেন। তৃতীয় মীর কাশেম যিনি জামায়াতের একজন কর্মকর্তা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি, *নয়াদিগন্ত* পত্রিকা ও দিগন্ত টিভির মালিক। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের আলবদর কমান্ডার। তার হাতে চাঁটগার কত যুবক যে লাঞ্ছিত ও নিহত হয়েছেন তার সঠিক হিসাব এখন আর পাওয়া যাবে না।

সশস্ত্র আলবদররা রাজাকার, শান্তি কমিটি থেকেও ছিল বেশি সংগঠিত, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও বেশি হিংস্র। বস্তুত, যুদ্ধাপরাধী যতজন গ্রেফতার হয়েছেন তার মধ্যে মুজাহিদ ছিলেন সবচেয়ে হিংস্র। ১৯৭১ সালে তিনি বলেছিলেন– 'পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ পৃথিবীতে হিন্দুস্থানের কোন মানচিত্র স্বীকার করে না। ইসলামী ছাত্রসংঘ ও আলবদর বাহিনীর কাফেলা দিল্লীতে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রসংঘের একটি কর্মীও বিশ্রাম গ্রহণ করবে না।

এখন থেকে দেশের কোন পাঠাগার, গ্রন্থাগার, পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র বা দোকানে পাকিস্তানের আদর্শবিরোধী কোন পুস্তক রাখা চলিবে না। কোন স্থান, গ্রন্থাগার ও দোকানে পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতিবিরোধী পুস্তক দেখা গেলে তা আগুনে পোড়ানো হবে।'

আগে যে বলেছি, আলবদরের সর্বোচ্চ শাস্তিও যথেষ্ট নয় তার একটি কারণ আছে। একজন মানুষ আরেকজনকে খুন করতে পারে গুলি করে, ছুরিকাঘাত করে ও নানাভাবে। কিন্তু ঢাকার আলবদররা মুজাহিদের নির্দেশে সাত মসজিদ রোডের ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে মানুষজনকে জড়ো করত এবং নানাবিধ অত্যাচার করত, তারপর হত্যা করত বিচিত্র সব উপায়ে। আজ অনেক তরুণ যখন জামায়াতের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে তখন বলতে ইচ্ছে হয় এদের পিতা-মাতাকে মুজাহিদদের হাতে তুলে দিলে কেমন হয়? বা বিএনপির যেসব তরুণ জামায়াতের তরুণদের সঙ্গে গলাগলি করে গাড়ি পোড়ায়, পুলিশ হত্যা করে তাদের বা তাদের পিতা-মাতাকে আলবদরদের হাতে তুলে দিলে বা তাদের হাতে মৃত্যু হলে তারা জামায়াত সমর্থন করত?

আলবদররা কী করেছিল? এ প্রশ্ন শুনে অনেকে বলতে পারেন সবাই যা জানে সে বিষয়ে প্রশ্নের তাৎপর্য কী? আলবদর পাকিস্তানীদের সাহায্য করেছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ব্যক্তিদের দমনে। এ কারণে, একদিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে গেরিলা/সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। অন্যদিকে, নিরীহ বাঙালিদের বাড়িঘর লুট করেছে, হত্যা করেছে ও ধর্ষণ করেছে। এথনিক ক্লিনজিংয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু, আলবদর আরেকটি কাজ করেছে। তা হলো, সুনির্দিষ্টভাবে বুদ্ধিজীবী/পেশাজীবীদের হত্যা করেছে। আলবদর বাহিনী গঠন হওয়ার পর থেকেই এ হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে তবে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে অপহরণ ও হত্যাকাণ্ড তুঙ্গে ওঠে। সারা বাংলাদেশে একযোগে বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যা করা হয় পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে। অপহরণের পর নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার চালানো হয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, আলবদর হোক, রাজাকার হোক, মানুষ কি মানুষের ওপর এমন অত্যাচার করতে পারে? ১৯৭১-৭২ সালের দৈনিক পত্রপত্রিকাগুলো দেখলে আলবদরদের নিষ্ঠুরতার অনেক খবর জানা যাবে।

রায়েরবাজার ও মিরপুরের বধ্যভূমি যা আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর, আলবদরদের নৃশংসতার প্রতীক। দুয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক– 'আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত্-পা বাঁধা।...'

'আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। মুখ ও নাকের কোন আকৃতি নেই, কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটি অংশ কাটা... মেয়েটি সেলিনা পারভীন। শিলালিপির এডিটর।...

'মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি ফলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যস্থ কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোক যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।'

ঢাকার রায়েরবাজারের বধ্যভূমি দেখে এসে এই প্রতিবেদন লিখেছিলেন অধ্যাপিকা হামিদা রহমান। হামিদা রহমান ডা. ফজলে রাব্বীর লাশ দেখে লিখেছিলেন- 'ডা. রাব্বীর লাশটা তখনও তাজা, জল্লাদ বাহিনী বুকের ভিতর থেকে কলিজাটা তুলে নিয়েছে। তারা জানতো যে, তিনি চিকিৎসক ছিলেন। তাই তাঁর হৃৎপিন্ডটা ছিঁড়ে ফেলেছে। চোখ বাঁধা অবস্থায় কাত হয়ে দেহটা পড়ে আছে। পাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। রাব্বী সাহেবের পা দুখানা তখনও জ্বলজ্বল করে তাজা মানুষের সাক্ষ্য দিচ্ছে। নাক, মুখ কিছুই অক্ষত ছিল না। দস্যু হায়েনার নখের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত।... সামনে চেয়ে দেখি, নিচু জলাভূমির ভিতর এক ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য। সেখানে এক নয়, দুই নয় একেবারে বারো/তের জন্য সুস্থ সবল মানুষ। একের পর এক শুয়ে আছে।'

মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ বলেছিলেন- 'হানাদার পাক বাহিনীর সহযোগী আলবদররা পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের পর যখন পালিয়ে যায় তখন তাদের হেডকোয়ার্টারে পাওয়া গেল এক বস্তা বোঝাই চোখ। এ দেশের মানুষের চোখ। আলবদরের খুনীরা তাদের হত্যা করে চোখ তুলে বস্তা বোঝাই করে রেখেছিল।' [*দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৯.১.১৯৭২] উল্লেখ্য, ডা. আলীম চৌধুরীর চোখ আলবদররা উৎপাটন করেছিল। মওলানা তর্কবাগীশ আরও বলেছিলেন, 'খুনীদের নামে এই বাহিনীর নাম দেয়া হলো আলবদর বাহিনী। একি কোন মনঃপূত নাম? যে বদর যুদ্ধ ছিল আদর্শের জন্য, ইসলামের প্রথম লড়াই, সেই যুদ্ধের সঙ্গে কি কোন সংযোগ এই নৃশংসতার মধ্যে ছিল? হানাদারদের সহযোগী এই বদর বাহিনী শুধু ইসলামের শত্রু নয়। এরা হলো জালেম।'

অধ্যাপক আনিসুর রহমান শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমি দেখে এসে বলেছিলেন-

'ইতিহাসে পৈশাচিকভাবে হত্যার অনেক কাহিনী পড়েছি। কিন্তু

শিয়ালবাড়িতে ওই পিশাচরা যা করেছে এমন নির্মমতার কথা কি কেউ পড়েছেন বা দেখেছেন? কসাইখানায় কসাইকে দেখেছি জীবজন্তুর গোস্তকে কিমা করে দিতে। আর শিয়ালবাড়িতে গিয়ে দেখলাম কিমা করা হয়েছে মানুষের হাড়। একটা মানুষকে দুটুকরো করলেই যথেষ্ট পাশবিকতা হয়, কিন্তু তাকে কিমা করার মধ্যে কোন্ পাশবিকতার উল্লাস?

...সত্যি আমি যদি মানুষ না হতাম, আমার যদি চেতনা না থাকতো, এর চেয়ে যদি হতাম কোন জড় পদার্থ তাহলে শিয়ালবাড়ির ওই বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে মানুষ নামধারী এই দ্বিপদ জন্তুদের সম্পর্কে এতটা নিচু ধারণা করতে পারতাম না। মানুষ যত নিচই হোক, তবুও ওদের সম্পর্কে যে সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ ছিল তা একেবারেই উবে যেত না, আর মানুষ কেন কোন প্রাণীই কি পারে এত নির্মম, এত বর্বর, এতটা বোধহীন হতে?... শেষ পর্যন্ত আর দেখতে চাই না বলে মাটি, ভুল বললাম মানুষের হাড়ের ওপর বসে পড়তে হয়েছে। সারা এলাকার মানুষের হাড় ছাড়া অবিমিশ্র মাটি কোথায়?'

আমরা শিয়ালবাড়ির যে বিস্তীর্ণ বন-বাদাড়পূর্ণ এলাকা ঘুরেছি তার সর্বত্রই দেখেছি শুধু নরকঙ্কাল আর নরকঙ্কাল। পা বাঁচিয়েও হাড়হীন মাটির ওপর পা ফেলতে পারিনি। দেখেছি কুয়ায় কুয়ায় মানুষের হাড়।' [*দৈনিক পূর্বদেশ*, ৮.১.১৯৭২]

আলী আকবর টাবী দৈনিক আজাদ উদ্ধৃত করে লিখেছেন, গ্রেফতারকৃত এক আলবদর স্বীকার করেছিল- 'আর এক সপ্তাহ সময় পেলেই আলবদর বাহিনী সকল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে ফেলত।' [আলী আকবর টাবী, 'মতিউর রহমান নিজামী, আলবদর থেকে মন্ত্রী ঢাকা, ২০০৭]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী এক বছর খবরের কাগজের পাতা ওল্টালে এ ধরনের প্রচুর বধ্যভূমির খবর জানা যাবে। বধ্যভূমি থেকে কেউ ফিরে আসে না, আসেনি। ঢাকার রায়েরবাজারের বধ্যভূমি, যেখানে আমাদের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল তা বাংলাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেক বধ্যভূমির প্রতীক। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল স্বাধীনতাবিরোধীরা যাদের প্রধান অংশ ছিল জামায়াতে ইসলামের কর্মীরা। এদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল রাজাকার বাহিনী, ডেথ-স্কোয়াড নামে খ্যাত আলবদর ও আল শামস বাহিনী।

মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় বাঙালি এসব হত্যাকাণ্ড ভুলে গিয়েছিল। এসব দেখে বাঙালি মানসিকতা ভাবা নিয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। জেনেটিক্যালি এদের কোথায় যেন গণ্ডগোল আছে। ভুলে যাওয়ার এক অসম্ভব ক্ষমতা আছে বাঙালির। অনেকে বলেন, বাঙালি ক্ষমাশীল। আমি মনে করি, না তা নয়। তা হচ্ছে ভণ্ডামি, সুবিধাবাদ ও নিষ্ঠুরতা।

বাঙালির ভন্ডামির, ধর্মহীনতা, সুবিধাবাদ ও নিষ্ঠুরতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমানের কর্মকান্ডের। আমরা সেসব ভুলে গেছি। এ উপলক্ষে আরেকবার তা মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি। তবে তার আগে মুজাহিদদের কীর্তিকলাপের শেষাংশ বর্ণনা করি।

৪.

আলবদররা সুনির্দিষ্টভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা শুরু করেছিল, যাতে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও মুখথুবড়ে পড়ে। পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে পারে একথা আলবদররা কখনও ভাবেনি। কিন্তু সেই পাকিস্তানী বাহিনী যখন আত্মসমর্পণ শুরু করল তখন আলবদররা বিচলিত হয়ে পড়ে। পাকিস্তানী সেনারা নির্দেশ দেয় তাদের আত্মসমর্পণ করতে। তারা তাদের দায়-দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। তখন আলবদররা পালাতে শুরু করে।

তাদের শেষ সময়কার বর্ণনা পাই খালিদ মনসুরের লেখায়। তিনি লিখেছেন

"ঢাকার পতনের পর 'বীর' আলবদররা পালাতে থাকে। মনসুর লিখছেন, পতন যখন আসন্ন তখন আলবদররা দিশেহারা অবস্থায় নির্দেশনার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের প্রভুরাও পালাতে ব্যস্ত। কে কাকে নির্দেশনা দেয়! বিকেলে যখন রেসকোর্সে আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি চলছে তখন ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট বা সদর দফতরে ঢাকার আলবদররা মিলিত হলো, তাদের প্রভুদের আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তে তারা 'পেরেশান' এবং তাদের কী হবে এ ভেবে ছিল উদ্বিগ্ন ও 'ক্রন্দনরত'। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রধান নাজেম আলী আহসান মুজাহিদ আলবদরদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। খালেদ লিখেছেন, ঐখানে যেসব আলবদর উপস্থিত ছিল তাদের কাছ থেকে শুনে তিনি এই বক্তৃতাটি সঙ্কলন করেছেন এবং পরে মুজাহিদ তা সংশোধন করে সত্যায়িত করেছেন। ভাষণটি উদ্ধৃত হলো

'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু

ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ইন্না সালাতী'

নিশ্চয়ই, আমার নামাজ আমার কুরবানী আমার জীবন ও আমার মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য।

মুজাহিদ সাথীরা,

আমাদের দেহ ও প্রাণ শুধু এবং শুধুই ইসলামের জন্য, আমরা ইসলামের জন্যই এসব কাজ করছি। মাঝে আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত অনুযায়ী সঠিক বলে জানতাম। আমরা পাকিস্তানকে উপাস্য মনে করে নয়, মসজিদ মনে করে আমাদের ঝুঁকি ও আমাদের ভবিষ্যতকে এর ওপর ন্যস্ত

করেছিলাম। আমাদের এই কাজ কেউ গ্রহণ করল কি করল না এর পরওয়া করি না। যার কবুল করা উচিত তিনি তো জানেন যে, আমাদের সামনে তার সন্তুষ্টিই ছিল মুখ্য।

এটা আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল যে, আমরা জীবনবাজি রেখে বেরিয়ে পড়ব। পরীক্ষায় সেই মুহূর্তে আমরা তার কাছ থেকেই সাহায্য চেয়েছি এবং তার ওপর ভরসা করেই ঐ নাজুক পরিস্থিতিতে মিশে না যাওয়ার চেষ্টা করেছি।

ওহে মজলুম পাকিস্তানের অসহায় সন্তানরা,

আমাদের সঙ্গে আজকে যা-কিছু হওয়ার গতকাল সে সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ছিলাম। আর আজকে আমরা সে বিষয়ে ওয়াকেবহাল যা আসন্ন আগামীকাল আমাদের জন্য নিয়ে আসবে। আমরা চলে যাওয়া গতকালের জন্য না লজ্জিত, আর না আসন্ন আগামী দিনের জন্য নিরাশ। পরীক্ষা আল্লাহর শাশ্বত বিধান। আর আমাদের শিখানো হয়েছে যে, পরীক্ষার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে। কিন্তু পরীক্ষা যদি এসেই পড়ে তাহলে ধৈর্যের জন্য দোয়া ও কামিয়াবীর আশা নিয়ে আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়তে হবে।

আজকের সূর্যটি একটি কঠিন পরীক্ষা সামনে নিয়ে উদিত হয়েছে। আর আগামীকালটি উদিত হবে ধিকি ধিকি আগুনের কয়লা বৃষ্টি নিয়ে।...

আমরা বিশ্বাস করি যে, এই প্রাণ দিয়ে দেয়া এমন বিরাট সৌভাগ্য যার চিন্তাও করা যায় না। আপন খোদার সঙ্গে নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে বেহেশত ক্রয় করার আগে কি আমরা ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করিনি?

পরীক্ষার এ মুহূর্তগুলো এ জগতে সাফল্যের সুসংবাদও বটে। কাজেই এসব কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন হোন ঈমান, প্রত্যয় ও স্বাধীন চেতনার দোয়া নিয়ে। কেননা প্রত্যয় ও ঈমানের কখনও বিনাশ নাই।

ওহে দুনিয়া ভরা সকল সাফল্যের চেয়ে প্রিয় বন্ধুরা,

আপনারা আজকেও এক সময়ের অতি মূল্যবান সম্পদ দ্বীনকে কায়েম করা, সত্যের সাক্ষ্য দেয়া ও ইসলামী বিপ্লবের জন্য আপনাদের জীবনকে হেফাজত করা আপনাদের ওপর ফরজ। যদি আপনাদের ঘরের দহলিজগুলো আপনাদের জন্য বন্ধ এবং আরাম আলয়গুলির প্রশস্ততা আপনাদের জন্য সঙ্কীর্ণ করে দেয়া হয় তাহলে হিজরত করে চলে যাবেন। কেননা হিজরত হচ্ছে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পালন পথের অনিবার্য সফর। হিজরত আল্লাহর সর্বশেষ নবীর সুন্নত।...

ওহে আমার ভাইয়েরা,

কার জানা আছে যে, আগামীকাল আমাদের মধ্যে কে জীবিত থাকবে এবং কার সঙ্গে কার দেখা হবে। আর ওখানে তো অবশ্যই সাক্ষাত হবে। তবে এই জগতে ছড়িয়ে যাওয়ার আগে সেই চেহারাগুলো প্রাণভরে দেখে নিন, এই

রক্তগুলোর সঙ্গে শেষ বারের মতো আলিঙ্গনবদ্ধ হোন। কারণ হয়ত আরও একবার এখানে এভাবে একত্রিত হতে পারব না।

তবে আমাদের প্রতিপালক যদি চান আর যদি তিনি চান তাহলে আমরা আবারও এখানে মিলিত হতে পারি।

সাথীরা, বন্ধুরা, ভাইয়েরা,

এখন আমাদের পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে। আপনাদের অনুভূতিগুলো একত্রিত করে নিন। আল্লাহ আমাদের সহায় ও সাহায্যকারী। আসুন, আমরা একে অপরকে দোয়ার সঙ্গে বিদায় দেই। ফি আমানিল্লাহ।'

বক্তৃতা শেষ। আলবদরের ডেপুটি চীফ মুজাহিদকে সবাই 'অশ্রুসিক্ত নয়নে' ও 'কম্পিত ঠোঁটে' অনুরোধ জানাল পালাতে। কিন্তু মুজাহিদ বলেন, 'না, আপনাদের যাওয়ার পর আমি যাব। আমিই হব ক্যাম্পের শেষ ব্যক্তি।'

আলবদররা তখনও ক্যাম্প ছেড়ে নড়ছে না। গলাগলি করে হিক্কা তুলে কাঁদছে। তখন মুজাহিদ বললেন– 'আমি বাধ্য হয়ে আদেশ দিচ্ছি আপনারা হিজরতে বের হয়ে যান।' তাদের হিজরত ছিল লেজ গুটিয়ে পালানো।

তখন আলবদররা তাদের সদর দফতর ছেড়ে, তাদের ভাষায়, 'হিজরতে' গেল। আমাদের ভাষায় পালাল। নিরস্ত্র ব্যক্তিদের হত্যাকারী পাকিস্তানী সিপাহীদের ভৃত্য আলী আহসান মুজাহিদও বীরবিক্রমে ঢাকা ছেড়ে কাঠমান্ডুর পথে দৌড়াতে লাগলেন।

তার দিল্লী দূরে থাকুক অসম জয় করাও হলো না।

৫.

এইসব খুনীকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন জেনারেল জিয়া। বঙ্গবন্ধু রাজাকারদের বিচার শুরু করেছিলেন, দুই বছরের মধ্যে ৭৮০ জনেরও বেশি দালালকে দন্ড দেয়া হয়েছিল। এই সময় নিজামী-মুজাহিদদের মধ্যে ওপর দিকের পরিকল্পক ও খুনীরা পাকিস্তানে পালিয়ে ছিলেন। একটি যুক্তি দেয়া হয় আলবদর ও তাদের সমর্থক বিএনপির পক্ষ থেকে যে, নিজামী মুজাহিদ কাদের কামারুজ্জামানরা দোষী হলে বঙ্গবন্ধু সরকার তাদের গ্রেফতার করল না কেন? এর কারণ, তারা পালিয়ে ছিলেন।

এই খুনীদের যদি পুনর্বাসন না করা হতো তা হলে বাংলাদেশের রাজনীতি এত কলুষিত হতো না। খুনী সমর্থক এসব রাজনীতিবিদের উত্থান হতো না। বাংলাদেশ এখন বিভক্ত হতো না [মানসিক দিক থেকে]। কিন্তু জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন দেশটিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে। তাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নড়তে বাধ্য করা হয়েছিল, এ কারণে তার প্রতিশোধ তিনি নিতে চেয়েছিলেন। একজন সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা কি পারেন নিজ দেশ তচনচ করতে? আলবদরদের

বিচারকালে এ ইতিহাসটুকু মনে রাখা দরকার। এ কারণে, অনেক আগে লিখেছিলাম- মুক্তিযুদ্ধ করাটা যত সহজ ছিল, অন্তিমে মুক্তিযোদ্ধা থাকাটা সহজ ছিল না।

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ একসময় বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ও ক্ষমতা দখলকারী প্রেসিডেন্ট লে. জে. জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান ও তাঁর অনুসারী সামরিক কর্মকর্তাদের পরবর্তীকালে আচরণ দেখে এই প্রতীতি জন্মেছে যে, তাদের অধিকাংশ বাধ্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়। তৎকালীন ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম বা মেজর খালেদ মোশাররফরা আগে থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। জিয়াউর রহমান ২৫ মার্চ রাতেও সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র উদ্ধারে গিয়ে বাধা পেয়ে বলেছিলেন, 'আই রিভোল্ট।'

জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা দখলের সঙ্গে আলবদরদের একটি সম্পর্ক আছে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর, আমরা দেখেছি আলবদররা পালাচ্ছে। আলবদরদের বৃহৎ অংশ মিশে গেল সাধারণ মানুষের ভিড়ে। যারা পরিচিত তাঁরা চলে গেল পাকিস্তানে। আলবদররা ছিল সংঘবদ্ধ, শত্রুদের শায়েস্তা করার বিষয়ে তাদের একটা পরিকল্পনা ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোভাব ছিল সংঘবদ্ধ, তাদের ওপর কমান্ড থাকলেও তা ছিল শিথিল আর শত্রুদের নিয়ে কী করা হবে সে সম্পর্কে তাদের কোন পরিকল্পনা ছিল না। আলবদরদের আশ্রয় দিয়েছেন অনেকে, টাকার বিনিময়ে ছাড়াও পেয়েছে অনেকে। অনেককে গ্রেফতারে শৈথিল্য দেখান হয়েছে। দালাল আইনে কিছু আলবদর ধরা পড়লেও বৃহৎসংখ্যক ধরা পড়েনি। এরা চুপচাপ বসে ছিল না। এরা সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের সংঘবদ্ধ ও সংহত করছিল। পাকিস্তানে লুকিয়ে থাকা আলবদর নেতাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল। জামায়াতের নেতা গোলাম আযম লন্ডন থেকে তাদের নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। পাকিস্তান, সৌদি আরব ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী অনেক দেশ তাদের সহায়তা করছিল; ফলে তারাও একটি শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

এই ধারণার কারণ, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর জিয়াউর রহমান যে কাজগুলো করেছিলেন তা ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিপরীত। মুক্তিযুদ্ধের সময় আলবদররাও একই কাজ করছিল। শুধু তাই নয়, যেসব হীন অপরাধের জন্য শাস্তি হিসেবে আলবদরদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল মৃত্যুদন্ড। দন্ডত নয়ই তাদের বরং করা হয় পুরস্কৃত।

জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখল করে সংবিধান সংশোধন করেছিলেন প্রথম। বাংলাদেশে সংবিধানের ওপর প্রথম হামলাকারী তিনি, দ্বিতীয় লে. জে. এরশাদ। সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন করেছিলেন তাঁরা। আলবদররা

যেমন খুনের রাজনীতি করেছে এরাও তেমন খুনের রাজনীতি করেছেন।

জিয়াউর রহমান সংবিধান সংশোধন করে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিলেন, বঙ্গবন্ধু পৃথিবীর প্রথম স্টেটসম্যান, যিনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিরোধিতা করে ধর্ম ব্যবসায়ীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। রাজাকারবন্ধু জিয়া দালাল আইনেও যারা দন্ড ভোগ করছিলেন তাঁদের সসম্মানে মুক্তি দিলেন। অনেক আলবদর ছাড়া পেল। নেতৃস্থানীয় আলবদররা পাকিস্তান থেকে ফেরত আসা শুরু করল। গোলাম আযম ফিরে এলেন। আলবদররা জামায়াতে ইসলামী নাম ঠিক রেখে শুধু ছাত্রসংঘের নাম বদল করে ছাত্রশিবির করল। জিয়াউর রহমানের এইসব সংশোধনী আলবদর-রাজাকারদের এত খুশি করেছিল যে, 'বামপন্থী' নেতা কাজী জাফর আহমদ যিনি পরে জিয়ার দলে এবং আরও পরে এরশাদের দলে যোগ দিয়ে বিভিন্ন সময় সিভিল সমাজের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, তিনি পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'মওলানা সিদ্দিক [স্বাধীনতবিরোধী] বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার যে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন তার সুযোগ সরকারই করে দিয়েছেন। সংবিধানের ৩৮ ধারা বাতিলের ফলেই এরা রাজনীতিতে আসতে পেরেছে। এরা জাতি ও গণস্বার্থবিরোধী... সংবিধানের ৩৮ ধারা বাতিল করে এ সকল জাতীয় দুশমনকে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়া একটি অন্তবর্তীকালীন সরকারের উচিত হয়নি।' [*দৈনিক সংবাদ*, ৪.১১.১৯৭৬]

আলবদররা ১৯৭১ সালে খুনের পর খুন করেছিল। জিয়াউর রহমান তাদের অপরাধ শুধু মাফ করা নয়, তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দিলেন। এতদিন যেসব আলবদর ঘাপটি মেরে বসেছিল তারা প্রকাশ্যে বেরিয়ে জামায়াতকে সংগটিত করতে লাগল। ছাত্রশিবির বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে স্বাধীনতাপক্ষের ছাত্রদের রগ কাটতে লাগল। রাষ্ট্রে জামায়াতের রাজনীতি 'রগকাটা রাজনীতি' হিসেবে পরিচিত হয়ে গেল। জিয়া রাজাকার আলবদরদের সচিব, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ করলেন।

সামরিক শাসন জারি করে লে. জে. জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর করা যেসব আইন বাতিল করে আলবদরদের রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো হলো–

১. ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর Ordinance No 63 of ১৯৭৫-এর মাধ্যমে 'দালাল আইন' বাতিল করা।

২. ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর second proclamation order No. 3 of ১৯৭৫ প্রথম তফসিল থেকে দালাল আইনের যে সুরক্ষা দেয়া হয়েছিল তা বাতিল।

৩. ১৯৭৬ সালে second proclamation order No. 3 of ১৯৭৬-এর মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তাদি রহিতকরণ।

৪. ১৯৭৭ সালে proclamation order No. 1 of ১৯৭৭ জারি করে সংসদে আলবদরদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের কিছু অংশ রহিতকরণ।

৫. ১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারি যাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছিল, নাগরিকত্ব ফেরত পাওয়ার জন্য তাদের আবেদনের অনুরোধ।

৬. ১৯৭৭ সালে proclamation order No. 1 of ১৯৭৭ দ্বারা সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ রহিতকরণ।

এক কথায় জেনারেল জিয়াই আলবদর-রাজাকারদের শুধু ক্ষমা নয়, ঘরের ভিতর আশ্রয় দিয়েছিলেন।

একইভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের খুনের 'দায়মুক্তি' দেয়া হলো এবং তাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেয়া হলো। সুতরাং, বলা যেতে পারে, জিয়ার নীতিতে ধারাবাহিকতা আছে। বঙ্গবন্ধু খুনীদের শাস্তি দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। আলবদরবন্ধু জিয়া খুনীদের দন্ড মওকুফ করে সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। এভাবে আলবদর-রাজাকারদের ক্ষমা করে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশকে বিভক্ত করলেন জিয়াউর রহমান। আলবদরদের মতো তিনিও বাংলাদেশকে পাকিস্তান করতে চেয়েছিলেন।

৬.

আলবদররা তার ক্ষমতার উৎস ছিল। আলবদররা তাকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল দেখে তিনি আলবদরদের এভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন।

একইভাবে অপারেশন সার্চলাইটে অংশগ্রহণকারী লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও বেগম খালেদা জিয়া আলবদর-রাজাকারদের ক্ষেত্রে জিয়ার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া আলবদর-রাজাকারদের ক্ষেত্রে জিয়ার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া আলবদর-রাজাকারদের ক্ষমতায় এনেছেন এবং ১৯৭১ সালের আলবদর প্রধান ও উপপ্রধানকে মন্ত্রী করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। এভাবে নতুন শতকের শুরুতে দেখি, আলবদররা আবার ক্ষমতায়।

প্রচলিত আইনে, খুনীকে হেফাজত করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও বেগম খালেদা জিয়া খুনীদের হেফাজত করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। শহীদদের পরিবারের ন্যায্যবিচার থেকে বঞ্চিত করেছেন এই তিনজন ও তাদের সমর্থকরা। মুক্তিযুদ্ধের, শহীদদের, বাংলাদেশের কেউ যদি অবমাননা করে থাকেন তাহলে তারা হলেন জিয়া, এরশাদ ও খালেদা। তারা বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। অস্ত্রবাজ এই তিনজন একটি জাতির এবং সে জাতির গৌরবময় ইতিহাসের যে অবমাননা করেছেন তার

উদাহরণ ইতিহাসে বিরল।

খালেদা জিয়া বেছে বেছে দু'জন আলবদরকে মন্ত্রী করেছিলেন–নিজামী ও মুজাহিদকে। অন্য স্বাধীনতাবিরোধীদেরও মন্ত্রী করতে পারতেন, করেননি। কেন? সেটিও ভেবে দেখা দরকার। অপরাধমূলক রাজনীতিতে অভ্যস্ত জামায়াতে ইসলামী, তার সহযোগী হিসেবে বিএনপিও। সে কারণে, ২০০১ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ অপরাধমূলক, বিশেষ করে অস্ত্র চোরাচালান ও শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে আলবদরদের পুরনো সংগঠন যা এদের গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছিল এই দুজনের নিয়ন্ত্রণে। এরা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে, প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে কথা বলতে এরা কসুর করেননি।

মুজাহিদকে কাঠগড়ায় বসে থাকতে দেখে মনে হয়েছিল, এই আলবদর কি বলেন, যুদ্ধাপরাধ কিসের? বাংলাদেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই। আমার হাতে রক্তের কোন দাগ নেই। আমাদের এই কথা শুনতে হয়েছিল। খালেদা জিয়া যে কতভাবে আমাদের, বাংলাদেশকে অপমান করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

অনেক আগে লিখেছিলাম, একবার যে রাজাকার সে সব সময় রাজাকার। তেমনিভাবে বলা যায়, একবার যে আলবদর সে সব সময় আলবদর। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, আলবদরদের বিরুদ্ধে গণআদালত করার কারণে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার দেশদ্রোহের মামলা দায়ের। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদের উত্থান, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার জন্য আক্রমণ, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য বার বার চেষ্টা এবং সবশেষে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ের সামনে মিছিল-পূর্ব সমাবেশে গ্রেনেড হামলা, দশ ট্রাক অস্ত্র পাচার ইত্যাদি হলো আলবদর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বেগম জিয়া এভাবে ১৯৭১ সালের মতো অস্ত্রধারী একটি মিলিশিয়া বাহিনী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যারা ১৯৭১ সালের মতো সেনাবাহিনী ও পুলিশের কমান্ডে থাকবে, কিন্তু জামায়াত ও বিএনপির কমান্ডে কাজ করবে।

১৯৭১ সালে যে আলবদরদের প্রতিরোধ করা হয়েছিল ও তাদের রাজনীতির মৃত্যু ঘটানো হয়েছিল, সেনাবাহিনীর সাহায্যে জেনারেল জিয়া ও এরশাদ, সেনাবাহিনীর পরোক্ষ সাহায্যে খালেদা জিয়া একইভাবে সেই আলবদর রাজনীতি ও আলবদরদের ফিরিয়ে আনলেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের চালিকাশক্তি ছিল জনবিরোধী সেনাবাহিনী। ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ভূমিকাও ছিল এক। কিন্তু পাকিস্তান ফেরত আসবে? আলবদরদের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেই কি তা করা যাবে? এ শতকের মূল প্রশ্ন এগুলোই।

৭.

মুজাহিদের বিচারের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ওপরের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা' নয়। সামগ্রিক আলোচনাটি করলাম এ কারণে যে, গোলাম আযম ও মুজাহিদের রায়ে এমন কিছু বলা হয়েছে যা এই পটভূমির সঙ্গে যুক্ত।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মোট ছয়টি রায় দিয়েছে। ক্রমান্বয়ে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি রায়ে এমন কিছু উপাদান আছে যা আমাদের বিচার শাস্ত্রে নতুন মাত্রা যোগ করছে। যেমন– নেতৃত্ব দায়, কমন নলেজ, সামষ্টিক দায়, ধর্ষণকে আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা, নির্যাতনকেও গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত করা ইত্যাদি। সামষ্টিক দায়টি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও খুব একটা ব্যবহৃত হয়নি। এসব উপাদান শুধু আমাদের দেশের নয়, আন্তর্জাতিক জুরিসপ্রুডেন্সেও অবদান রাখবে।

প্রতিটি রায়ে জামায়াতে ইসলামকে অপরাধী সংগঠন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রায় না বলে পর্যবেক্ষণ বলাই সমীচীন, কিন্তু এক হিসেবে তা রায়েরই অংশ। গোলাম আযমের রায়ে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালে যেমন জামায়াত একটি অপরাধী সংগঠন ছিল এখনও তেমন আছে। অর্থাৎ তার ধারাবাহিকতা আছে। আগের আলোচনার সঙ্গে, এখন জামায়াত প্রায় প্রতিদিন যা করছে তা মিলিয়ে দেখুন। গত ক'দিনে জামায়াতের হাতে খুন হয়েছে ৯ জন। বাস, গাড়ি পুড়েছে অনেক। পুলিশ বেদম প্রহৃত হয়েছে। রোজার দিনে যুদ্ধক্ষেত্রেও যুদ্ধবিরতি হয়। এখানে রোজার দিনে জামায়াত হরতাল ডেকে গাড়ি ভাঙচুর, আগুন লাগানো ও মানুষ হত্যা করে। অর্থাৎ এটি ইসলামী নয়, রাজনৈতিক কোন জামায়াতও নয়। এটি ক্রিমিনালদের একটি জমায়েত।

আলবদরকেও এ রকম একটি শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মুজাহিদের মামলার রায়ে। সুতরাং, প্রশ্ন জাগে, সরকার একটি ক্রিমিনাল সংগঠনকে প্রকাশ্যে কাজ করতে দেবে কি-না? বা এটিকে বিলুপ্ত করার মানসে আইনের আশ্রয় নেবে কি না। আরও প্রশ্ন, গোলাম আযমের রায়ে বলা হয়েছে, এ দলের নেতারা তরুণদের পথভ্রষ্ট করছে এবং এদের সরকারী-বেসরকারী কোন পদে রাখা যাবে না। এ পর্যবেক্ষণের পর সরকারের করণীয় কী?

এই দু'টি রায়ের পর বিএনপি নেতাদের সাংবাদিকরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাদের কোন মন্তব্য আছে কি-না। বিএনপি নেতারা কোন মন্তব্য করেননি। সাংবাদিকরা আর কিছু বলার সাহস রাখেননি। বিএনপি-জামায়াতের সামনে সাংবাদিকরা কম্পমান থাকেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের সামনে এলে বাঘের বাচ্চা। সাংবাদিকতায় বস্তুনিষ্ঠতা ও সুস্থতা থাকলে খালেদা জিয়াকেই জিজ্ঞেস করা হতো, এই দুই রায়ের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? অপরাধী

সংগঠনের সঙ্গে কি রাজনীতি করবেন? যুদ্ধাপরাধী দল হিসেবে জামায়াতকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে রাজনীতি করবেন?

এ প্রশ্নগুলো জরুরী এবং এর উত্তর আমাদেরই খোঁজা দরকার। তরুণরা শাহবাগে ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি চাই বলে স্লোগান তুলছে, প্রতিবাদ জানাচ্ছে, সেটি সমর্থন করেও বলতে হয়, ফাঁসিই হলেই কি যথেষ্ট? গোলাম আযমদের কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য যার ভিত্তি তাদের আদর্শ। যা বাংলাদেশ বিরোধী। সুতরাং, বিএনপি শুধু এদের পৃষ্ঠপোষকতা নয়, এদের সঙ্গে আঁতাত করে রাজনীতি করছে। এর প্রতিবাদও জরুরী। কিন্তু এ প্রসঙ্গের ধারেকাছে কেউ যাচ্ছে না। এই হচ্ছে আমাদের বোধ, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

গোলাম আযম ও মুজাহিদের রায়ের পর অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, এই রায় তো কার্যকর করা গেল না। সরকারের আঁতাতের কারণে এসব হচ্ছে ইত্যাদি। তো আমি উত্তর দিয়েছি, এতই যদি শঙ্কা, তাহলে আওয়ামী লীগ বা ১৪ দলকে ভোট দিন। কিন্তু সেটাতেও তারা গররাজি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীদের অনেকের মনোভঙ্গি একই রকম। এটা আমাদের খুব আশ্চর্য রকম মনোভাব যে, যুদ্ধাপরাধী বিচার, জামায়াত নিষিদ্ধকরণ থেকে রায় কার্যকর করা সব আওয়ামী লীগকে করতে হবে। এতে বিএনপির কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না। এ মনোভঙ্গি তো সমাজ-রাষ্ট্রের জন্য শুভ নয়।

জামায়াত অপরাধমূলক রাজনীতি করছে। বিএনপি সেই অপরাধমূলক রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং এর বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে। ১৯৭৫ সাল থেকেই বিএনপি ও জামায়াত একত্রে বাংলাদেশে অপরাধমূলক রাজনীতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়েছে। মুজাহিদ ও গোলাম আযমের রায় এ প্রশ্নটিই রাখছে সবার কাছে যে, এই রাজনীতি করতে দেয়া যায় কি না? সবকিছুর দায় একটি রাজনৈতিক দলের ওপর আরোপ করা হবে আর অপ বা অপরাধমূলক রাজনীতি যারা করবে তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে না। এটাও একটি অপরাধ।

তরুণ ছিলাম যখন, তখন আমরা গোলাম আযম, মুজাহিদদের কাঠগড়ায় তোলার জন্য আন্দোলন শুরু করেছি। কত বৈরী পরিবেশে আমরা আন্দোলন করেছি! আমার মনে পড়ছে সুফিয়া কামাল, কর্নেল নুরুজ্জামান, আহমদ শরীফ, ব্যারিস্টার শওকত আলী, গাজিউল হক, কলিম শরাফী, শামসুর রাহমান, বিচারপতি কেএম সোবহান, কবীর চৌধুরী এবং জাহানারা ইমাম প্রমুখের কথা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তারা এই বিচার দেখে যেতে চেয়েছেন, পারেননি। কত শহীদ পরিবারের শহীদজায়া এ বিচার দেখে যেতে চেয়েছেন, পারেননি। আমাদের এই আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ও বামদলগুলো সব সময় সহায়তা করেছে। এ মুহূর্তে আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফের কথাও মনে পড়ছে। সবাই প্রয়াত।

আমরা সৌভাগ্যবান, জীবিতকালে দেখে গেলাম যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও রায়। কাঠগড়ায় গোলাম আযম ও মুজাহিদকে দেখব পাঁচ বছর আগে কেউ তা কল্পনা করেনি। এমনকি গোলাম আযম বা মুজাহিদও এই আশঙ্কা করেননি। কিন্তু দেখে তো গেলাম তারা কাঠগড়ায় অপেক্ষা করছেন রায় শোনার জন্য। এবং এসবই সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের কারণে। এ কথা স্বীকার করলে গৌরবহানি হয় না। এ আমাদের সবার অর্জন।

এই অর্জন রক্ষা করার দায়িত্ব শুধু আমরা যারা আন্দোলন করেছি বা আওয়ামী লীগ বা ১৪ দলের নয়। এর দায়িত্ব অন্য সবারও যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মনে করেন কিন্তু আওয়ামী লীগ বা ১৪ দলকে পছন্দ করেন না। শুধু ফাঁসির দাবির স্লোগানই নয়, তরুণদের ওপর এ দায়িত্বও বর্তেছে পূর্বসূরিদের এই অর্জন সংহত ও সংরক্ষণ করা। এর অর্থ, দন্ডের প্রতিবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে, অপরাধীদের রাজনীতি করতে দেয়া যায় না। যারা অপরাধীদের সঙ্গে হাত মেলাবে তারাও অপরাধী এবং দেশবিরোধী। আমাদের জেনারেশন যুদ্ধাপরাধ বিচারের দাবি দেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিয়েছিলাম [পড়ুন, নির্মূল কমিটি]। ১৮ দল যে অপরাধীদের পক্ষে রাজনীতি করছে, অপরাজনীতি করছে, গোলাম আযম-মুজাহিদদের সমর্থন করে যে দেশবিরোধী কাজ করছে তা প্রতিহত করতে হবে। তারা ক্ষমতায় এলে গোলাম আযম, মুজাহিদরা খাঁচা থেকে মুক্ত হয়ে ১৮ দলের সঙ্গে মিলে ১৯৭১ সৃষ্টি করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাদের এই রাজনীতি বাংলাদেশের মানুষের জন্য শুভ নয়। এর প্রতিরোধ জরুরী। মুজাহিদের দন্ড থেকেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এভাবে এক জেনারেশন আরেক জেনারেশনের ওপর দেশরক্ষা ও দেশ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার অর্পণ করে। যে দেশে উত্তরসূরিরা সে দায়িত্ব পালন করেছে সে দেশই এগিয়ে গেছে। উন্নতি করেছে। সভ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। আমরা বিশেষ করে তরুণরা যেন সে কথা মনে রাখি।

১৯ জুলাই, ২০১৩

পাকিস্তানী জারজদের রাজনীতিও মানতে হবে?

নাথান থর্নবার্গ চিলির সান্তিয়াগো থেকে *সাপ্তাহিক টাইম* পত্রিকার জন্য একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। চিলিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আসন্ন। সেখানে একজন প্রার্থী মিশেল বাখেলেত। বয়স ৬২। আগেও তিনি চিলির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মাঝখানে জাতিসংঘের মহিলা সম্পর্কিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। ৬২ বছরের এই মহিলার বাবা ছিলেন এক সময় চিলির বিমানবাহিনীর একজন জেনারেল। পিনোচেট ক্ষমতা দখল করলে তাঁকে হত্যা করা হয়।

সান্তিয়াগো থেকে খানিকটা দূরে তালাগান্তে নামক ছোট এক শহরের টাউন স্কোয়ারে মিশেলের নির্বাচনী সভা। তিনি বলছিলেন কোন অপর পক্ষ [প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর ছেলেবেলার বান্ধবী, যার বাবাও ছিলেন এয়ারফোর্সের জেনারেল। এবং রটনা আছে তাঁর বাবাই মিশেলের বাবাকে নিপীড়ন করে হত্যা করেন]-কে কী কী কারণে ভোট দেয়া উচিত নয়। কারণ, মিশেলকে বলতে হলো না, নিচ থেকে একজন চিৎকার করে বললেন, 'তাদের কোন স্মৃতি নেই।'

এই স্মৃতি এখন চিলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একটি ইস্যু। সেই স্মৃতি ইস্যুটি কী? ৪০ বছর আগে, ১৯৭৩ সালে চিলির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আলেন্দেকে হত্যা করে জেনারেল পিনোচেট ক্ষমতা দখল করে নেন। আমেরিকার সাহায্যে আলেন্দে চিলির অধিবাসীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন যা কহতব্য নয়। আধুনিক ইতিহাসে তা 'ডার্টি ওয়ার' নামে খ্যাত। ঐ সময় সরকারী হিসেবে হত্যা করা হয়েছে ৩,২০০ জন, ২৯,০০০ জনকে নির্যাতন করা হয়েছে এবং নির্বাসনে গেছেন দু' লাখ। পাবলো নেরুদাকে সে সময় নানা হেনস্থা করা হয় এবং সেই সময় তিনি মারাও যান। ঐ স্মৃতি চিলির লেখকরা, সাংবাদিকরা অমর করে রেখেছেন। ইসাবেলা আলেন্দের উপন্যাস সে সময়ের দুর্দান্ত দলিল। পিনোচেট এক সময় তাড়িত হয়, তাকে কাঠগড়ায়ও দাঁড় করানো হয়। কিন্তু স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ায় তার বিচার সম্পন্ন হয়নি। এরপর চিলিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চলছে। সেনা কর্মকর্তাদের বিচার হচ্ছে। তার ঢেউ আর্জেন্টিনা, ব্রাজিলেও লেগেছে।

এ বছর আবারও নির্বাচনে স্মৃতি কেন ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে? কেননা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইভালিন ম্যার্থেইর ওপর আলেন্দের ছায়া। সেই ছায়ায় বড় হয়ে ওঠা কাউকে চিলির বাসিন্দারা গ্রহণ করতে রাজি নন। যদিও ইভালিন ঐ সব ঘটনার

সঙ্গে যুক্ত নন এবং বলছেন এ কারণে জান্তার কৃতকর্মের জন্য তাঁর ক্ষমা চাওয়ারও কারণ নেই।

পিনোচেট যা করেছিলেন, আমাদের এখানে জেনারেল জিয়া তার চেয়ে ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছেন। পিনোচেট সেনাবাহিনী ও সিভিলিয়ান মিলে মাত্র ৩২০০ জন হত্যা করেছিলেন। জিয়া, বিভিন্ন বিবরণ অনুসারে এর চেয়ে বেশি সেনা হত্যা করেছিলেন। আমাদের সেনাদের মানস গঠন এমন ছিল যে, তাঁরা এরপরও জিয়াকে অবতার মনে করতেন। কিন্তু যে অপরাধে সবচেয়ে বেশি অপরাধী জিয়া সে কারণে তাঁর বিচার হয়নি, হওয়া উচিত ছিল। হয়ত এক সময় হবেও। তিনি ১৯৭১ সালে যুদ্ধাপরাধীদের দল ও রাজাকার-আলবদরদের ক্ষমতায় এনেছিলেন। এবং নামডাকঅলা আলবদর রাজাকারদের মন্ত্রী, স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। অর্থাৎ ৩০ লাখ হত্যাকারীর ক্লাবের সদস্য হয়েছিলেন। এটি কম গুরুতর অপরাধ নয়। দেশদ্রোহমূলক অপরাধ। তাঁর কারখানা থেকে বাংলাদেশে নও মুসলিমদের মতো নও রাজাকারদের উৎপাদন করা শুরু করলেন। রাজাকার ফ্যাক্টরির উৎপাদন বেড়েছে এবং তাদের জন্য বাংলাদেশে বাজার পেয়েছে এ কথা স্বীকার না করার অর্থ বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। যারা জিয়াকে ১৯৭৫ সালের পর সমর্থন করেছেন তাদের মুক্তিযোদ্ধা না বলাটা শ্রেয়। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা একটি প্রত্যয় যাকে খণ্ডিতভাবে শুধু ১৯৭১ সালের ৮/৯ মাসের ঘটনায় বিচার করা যাবে না। জিয়াউর রহমানই প্রথম মুক্তিযুদ্ধের শহীদ ও লাঞ্ছিতদের স্মৃতি অবলোপনের কাজটি শুরু করেন। এ কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছেন নিশানই পাকিস্তান প্রাপ্ত জেনারেল এরশাদ। স্বৈরাচারী এই বৃদ্ধ এখনও রাজনীতির মাঠ দাবড়ে বেড়াচ্ছেন। এরপর জেনারেলপত্নী ও যুদ্ধাপরাধীদের সময়। এই সময় ঠিক কতজনকে খুন, গ্রেফতার এবং নিপীড়ন করা হয়েছে তা জানা যাবে না। এদের দোসর তখনকার সেনাপতি [নাম ভুলে গেছি] সেনাবাহিনীর সাহায্যে ক্লিনহার্ট অপারেশনের নামে ৪৯ জনকে হত্যা করে যার বিচার হয়নি। এই জেনারেলকে নিয়ে কিছু মানবাধিকার কর্মীর তিন উদ্দিনের সময় নাচানাচি সবার চোখে পড়েছে। শেখ হাসিনার সম্পাদনায় বেশ কয়েক বছর আগে দু'খণ্ডে একটি বই বেরিয়েছিল—'বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নমুনা।' এর দু'খণ্ডে ৮০০ পাতায় বিএনপি-জামায়াত আমলে যেসব হত্যা করা হয়েছিল তার বিবরণ আছে। শেখ হাসিনা সম্পাদনা করেছেন দেখে তা উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কারণ, প্রতিটি ভুক্তি ডকুমেন্টেড, চিত্রের সংখ্যাও কম নয়। প্রতি পাতায় গড়ে ৪টি এন্ট্রি থাকলে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩,২০০। একেবারে পিনোচেটের রাজত্বকালের সমান।

আমাদের দেশেও নির্বাচন আসন্ন [যদি হয়]। শেখ হাসিনা প্রতিটি ভাষণে

খালেদা-নিজামীদের অত্যাচারের কথা, যুদ্ধাপরাধীদের কথা তুলে ধরছেন। অনেকে বলছেন, এসব বকওয়াজ আর কত? তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি, দুর্নীতি-মামলার দাবি যদি বকওয়াজ না হয়, এটি বকওয়াজ হবে কেন? এই প্রচারের কারণ, পুরনো ডানপন্থী শক্তিশালী এস্টাবলিশমেন্ট চায় না এসব প্রসঙ্গ আবার আলোচনায় আসুক।

চিলিতে এই স্মৃতির প্রসঙ্গ আবার অসছে কেন? কারণ, বিভিন্ন সরকার ও নাগরিকরা নিহতদের সমাধি, স্মৃতিচিহ্ন অক্ষতু রেখেছেন। নিপীড়ন কেন্দ্রগুলো সংরক্ষণ করেছেন। মানুষ এবং পর্যটকরা নিয়ত সেখানে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, চিলির টিভিতে 'প্রহিবিটেড ইমেজ' বা 'নিষিদ্ধ চিত্র' নামে একটি সিরিজ দেখানো হচ্ছে। পিনোশের ও সেনাবাহিনীর ডার্টি ওয়ারের অনেক অজানা ফুটেজ পাওয়া গেছে, যা মানুষকে আবার ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। ফলে এস্টাবলিশপন্থী ডানে-রা খানিকটা বিপদে আছে।

আমাদের এখানে কী হচ্ছে? জিয়াউর রহমান ও তাঁর উত্তরসূরিদের কথা দূরে থাকুক যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষেই এস্টাবলিশমেন্ট একটি শক্তি তৈরি করেছে। এবং টাকা কিভাবে আদর্শ বদলে দেয় তার নমুনা হরদম পাওয়া যাচ্ছে। এক সময় ডেভিড বার্গম্যানকে আমরা সমর্থন করেছি, তাঁর প্রচার করেছি যেহেতু যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে তিনি একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেছিলেন। সেই ডেভিড এখন নিয়ত যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে লিখছেন এবং মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচিতদের পত্র-পত্রিকা তা ছাপছে। কয়েকদিন আগেও ডেভিড *ডেইলি স্টারে* যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে লেখার সুযোগ পেয়েছেন। যদ্দুর মনে পড়ে তিনি কাদের মোল্লার বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিচার প্রক্রিয়ায় দু'একটি ত্রুটি থাকতেও পারে সে জন্য কাদের মোল্লা মুক্তি পেতে পারে না, কোন অনুকম্পা পেতে পারে না। কারণ, কাদের মোল্লা গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন– এটি তো সত্য। ডেভিড যে চারজনের ওপর তাঁর ডকুমেন্টারি করেছিলেন তার মধ্যে আশরাফ-মঈনুদ্দিন ছাড়া বাকিরা 'নামি' কোন যুদ্ধাপরাধী নয়। তাদের খুনী হিসেবে তুলে ধরে তখন তিনি আফসোস করেছেন তাঁদের বিচার হচ্ছে না বলে। তাঁরা খুনী হলে কাদের মোল্লা নন? বিচার প্রক্রিয়ার ত্রুটি ধরে যদি কাদের মোল্লা ছাড়া পান তা'হলে তা হবে ন্যাচারাল জাস্টিসের বিরুদ্ধে। আজ পর্যন্ত যে সব যুদ্ধাপরাধীকে হত্যা করা যায়নি, তাদের বিচার হয়েছে এবং প্রক্রিয়াগত ত্রুটি আছে কি না আছে সেগুলো বিচার না করে প্রত্যেকের দন্ড দেয়া হয়েছে এবং আশ্চর্য, বার্গম্যান হচ্ছেন ড. কামাল হোসেনের মেয়ের জামাই, যেই কামাল হোসেন যিনি ১৯৭৩ সালের আইনের একজন প্রণেতা।

এ প্রসঙ্গে আরেকজন ব্রিটিশ জুলিয়ান ফ্রানসিসের কথা ধরা যাক। তাঁকে

বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা দিয়েছে। ডেভিডের প্রবন্ধ পড়ে তিনি সেই *ডেইলি স্টারেই* লিখেছেন [লেখাটি ছাপা হয়েছে নিশ্চয় স্টারের নিরপেক্ষতা তুলে ধরার জন্য], "যে একজন বাংলাদেশের জন্ম দেখেছে, তার যাছে এটি কষ্টের এবং অসুবিধাজনক এটা বুঝতে যে, অনেক বাঙালি যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে। হ্যাঁ, ন্যায্য বিচার হতে হবে। [ডেভিডের ভাষা] অনেকে এখন গণহত্যা হয়েছে বলেও মানতে চান না। কেউ যখন এসব কথা আমাকে বলেন বা এসব কথা পড়ি তখন আমি শুধু ক্রুদ্ধ নয়, খুব অবাক হই।" আমাদের স্মৃতিহীনতা যে আমাদের একটা বড় অংশকে অসভ্য করে তুলেছে সেটিই এ মন্তব্যে স্পষ্ট। বিদেশী ও সভ্য মানুষ দেখে জুলিয়ান আমাদের সেই অংশটিকে জারজ বা হারামজাদা বলেননি।

এ প্রসঙ্গে জুলিয়ান লেখেন, ১৯৭১ সালে শরণার্থী ক্যাম্পে তিনি ১০ বছরের এক বালিকার মুখোমুখি হলেন। সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে। বালিকাটি নিষ্কম্পস্বরে বলছিল, আমার বাবা-মা, পাঁচ ভাই ও এক বোনকে হত্যা করেছে পাকিস্তানী সেনারা। আমি এখন কী করব? এ প্রশ্ন তার মতো ছিল আরও অনেকের। জুলিয়ান লিখেছেন, ১৯৭১ সালের গণহত্যার বিষয় তরুণদের ভালভাবে জানা উচিত।

শুধু জানা নয়, প্রত্যাখ্যান করা উচিত। যারা এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়ে নানা তর্ক করেন তাদেরও প্রত্যাখ্যান করা উচিত। রাজনীতির নামে তারা ঐসব স্মৃতিকে মুছে দিতে চায়।

বর্তমান নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক ইস্যু প্রধান ইস্যু নয়। অনেকে কৌশলীভাবে এটিকে মূল ইস্যু বলতে চান। এটি নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়ার ইস্যু। মূল ইস্যু, এখানে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রাজনীতি, যা মূল ধারার রাজনীতি চলবে, না বিচ্যুত ধারা, যার প্রতিভূ ১৮ দল, সেটি চলবে। যদি ক্ষমতায় না আসে ১৮ দল তবে তাদের রাজনীতির প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পাবে। আওয়ামী লীগবিরোধিতা থাকুক, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাদেশে সরকার ও বিরোধী দলের রাজনীতি হবে বাংলাদেশভিত্তিক। পাকিস্তানী মানসের, যুদ্ধাপরাধের রাজনীতি এখানে চলতে দেয়া যাবে না।

টাকার প্রশ্ন তুলেছিলাম। টাকা এখন যুদ্ধাপরাধী ট্রাইব্যুনালেও পৌঁছেছে। এতে অনেকের মতিভ্রম হবে, অনেকের মতলবী চেহারাটা পরিষ্কার হবে। হচ্ছেও। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, শুনেছি কাদের সিদ্দিকী আমাদের অনেকের প্রতি লেখার মাধ্যমে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করছেন। যার যা কাজ করবেন তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি যখন শাহরিয়ার কবির, নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুকে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তখন নিজেকেই খাটো করেন। বাচ্চু আমাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিল, কাদের সিদ্দিকী প্রশ্ন তুলেছেন আমি আবার মুক্তিযোদ্ধা হলাম কবে, কয় নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছি? এ ধরনের প্রশ্ন ওঠালে তিনি কোথায় যুদ্ধ করেছেন সে

প্রশ্নও উঠবে।

মহীউদ্দীন খান আলমগীর বা আমাকে নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। অবরুদ্ধ বাংলাদেশে থেকে আমরা অন্যায় করেছি। তা'হলে সে সময় দেশে অবস্থানরত ছয় কোটিও অন্যায় করেছিল। কবি ইকবালের ভাষায় বলতে হয়, 'আরে ভাই হাম ওফাদার নেহিতো তুভি দিলদার নেহি।' আমি বা ছয় কোটি বাংলাদেশের প্রতি 'অবিশ্বস্ত' ছিলাম, আপনি [ও কি মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী ছিলেন]? থাকলে, যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থনকারী ১৮ দল বা তাদের চাকর-বাকরদের সঙ্গে হাঁটাহাঁটির দরকার ছিল না। তিনি কি খোঁজ নিয়েছেন কেন তার উপাধি পাল্টে মানুষজন ব্রিজোত্তম সিদ্দিকী বলে? যত অপরাধই করি ভারতেশ্বরী হোমসের মতো দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দখল করতে যাইনি।

স্মৃতিহীন মানুষ পরিবারেও এক সময় বোঝা হয়ে ওঠে, ঘনিষ্ঠরাও তখন তার আশু মৃত্যু কামনা করে। যাঁরা ১৯৭১ ও ২০০১-৭ সালের স্মৃতি ভুলে যাবেন রাজনীতির স্বার্থে, রাজনীতিতে এক সময় তাঁরাও বোঝা হয়ে উঠবেন। আপাতত হয়ত স্বার্থ উদ্ধার হবে। মনে রাখা দরকার, জামায়াত গত তিন বছরে প্রকাশ্য রাজনীতির সুযোগ পেয়ে যা করেছে, ক্ষমতায় এলে দেশের মানুষের একটা বড় অংশকে হয় মরণপণ যুদ্ধ করতে হবে, নয় দেশ ত্যাগ বা মৃত্যুবরণ করতে হবে। মওদুদীপুত্র জামায়াতকে জারজ বলতে দ্বিধা করেন না আর পাকিস্তানের জারজ তাদের বন্ধু বলে ডাকতে দ্বিধা করে না।

সামনের বন্ধুর পথ মানি। ১৯৭১ ও ২০০১-৭ সালেও তাই ছিল। কিন্তু স্রেফ আদর্শ ও বিশ্বাসের জোর থাকায় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরা জিততে পারেনি। স্মৃতিও টাটকা ছিল। এ প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কয়েকটি মন্তব্য স্মর্তব্য। লিখেছিলেন তিনি, "এই নশ্বর দুনিয়ায় সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়, সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, বেঁচে থাকে কেবল ভাবনা, আদর্শ এবং স্বপ্ন।... যে ধারণার জন্য কোনও ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত থাকে। সহস্র জীবনের মধ্য দিয়েই সেই ধারণার বারংবার পুনর্জন্ম হয়। [আর] 'এই ভাবেই ভাবনা, আদর্শ ও স্বপ্ন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বাহিত হয়ে চলে...এ জগতে ত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকার ছাড়া কোনও আদর্শ পূর্ণতা পায়নি।"মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন কি এই মন্তব্যের উদাহরণ নয়?

২০ অক্টোবর, ২০১৩

আসলেই কি আমরা জামায়াত নিষিদ্ধ করতে চাই?

জামায়াত নিষিদ্ধ করা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বিমত নেই। আরও অনেকেরই দ্বিমত নেই। তবু জামায়াত নিষিদ্ধ হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। জামায়াত নিষিদ্ধের দাবি গত দু'দশকের বেশি সময় ধরে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি করে আসছে। দাবি জানাতে জানাতে আমরা অনেকে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও অন্তত শাহরিয়ার কবির ক্লান্ত হননি। অক্লান্তভাবে জামায়াতের অপকর্ম তুলে ধরেছেন, নিষিদ্ধকরণের কথা বলেছেন। ১৯৯৪ সালেই তিনি প্রকাশ করেছেন 'জনতার আদালতে জামায়াতে ইসলামী।' কিন্তু সবাই তো আর শাহরিয়ার কবির নয়, সবারই সমস্যা আছে। এটি অবশ্য শাহরিয়ারের বোধের মধ্যে নেই। গত দু'মাস জামায়াতের আসল রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। তারপর থেকে জামায়াত নিষিদ্ধকরণের দাবি ব্যাপকতা পেয়েছে বটে কিন্তু স্থিতাবস্থা এখনও বজায় আছে। এমনকি যে গণজাগরণ মঞ্চ নিয়ে তরুণ ও প্রবীণরা উচ্ছ্বসিত সেই মঞ্চের একটি দাবিও সরকার কেন, যাঁরা উচ্ছ্বসিত তাঁরাও মানেননি। সে কারণেই এতদিন পর মনে হয়েছে, বাস্তবতা বড় কঠিন। এবং সে কারণেই প্রশ্ন জেগেছে সত্যিই কি আমরা চাই জামায়াত নিষিদ্ধ হোক? নাকি এটি নিছক একটি স্লোগান। যে স্লোগান দিল নিজের প্রগতিশীলতা প্রমাণ পেল, আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হলো কিন্তু সত্যিকার আন্দোলনে যেতে হলো না।

প্রথমে যে বিষয়টি বলা দরকার, বার বার অবশ্য বলেও এসেছি যে, জামায়াত যা ছিল ১৯৭১ সালে এখনও তা আছে। ১৯৭১ সালে তার হিংস্রতার কোন মাপকাঠি ছিল না। এবং গোলাম আযম নিজামী মুজাহিদরা কাউকেই ছাড় দেয়নি। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি না থেকেও তা উপলব্ধি করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের শত্রুদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছেন। সমাজরাষ্ট্রে অশুভ ছায়া যাতে বিস্তার না করে তা তিনি চেয়েছেন। কারণ তাঁর কাছে মানুষের স্বার্থটা ছিল বড়। অন্যদিকে জিয়াউর রহমানও জামায়াতকে বুঝেছিলেন। এই জন্য তাদের অবমুক্ত করে তাদের হিংস্রতাকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন নিজ স্বার্থে। মুক্তিযুদ্ধের সব অর্জন তিনি নষ্ট করতে চেয়েছেন নিজ মহিমা বাড়ানোর জন্য। সেজন্য এদের দরকার ছিল। খালেদা জিয়ার দরকারও সেই একই রকম। মুক্তিযুদ্ধের মৌল অর্জন স্বীকার

করলে তাঁর রাজনীতি থাকে না। চৌদ্দ দলের অনেকে আহ্বান জানাচ্ছেন খালেদাকে যে, গোলাম আযমদের ত্যাগ করতে। তাঁদের একটি ধারণা, খালেদা নিজামী আলাদা হলে বোধহয় তাঁদের ভোটের বাক্স ভরে উঠবে। এঁদের আমাদের অর্বাচীন মনে হয়। এঁদের রিসাইকেল্ড রাজনীতিবিদ বলা যেতে পারে। দু'টি দল আলাদা থাকলেও তারা কখনও আওয়ামী লীগে ভোট দেবে না। ভোট ভাগও হবে না। এদিক থেকে তাদের কমিটমেন্ট মৃদু বাম, কঠিন বাম এবং আওয়ামী লীগ থেকে বেশি।

গত দু'মাসে জামায়াত-বিএনপি যা করেছে তা আমার কাছে ইতিবাচক মনে হয়েছে। লক্ষ্য করবেন আমি জামায়াত-বিএনপির কথা এক সঙ্গে বলছি। কারণ রাস্তায় তারা যৌথভাবে অপারেট করছে। তাদের আলাদা করে দেখার কোন সুযোগ নেই। তারা যে মানুষ নয় বা মানবিক গুণাবলী যে তাদের নেই সেটি প্রতিভাত হয়েছে। আওয়ামী লীগের যাঁরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন তাঁরাও হয়ত বুঝেছেন জামায়াত-বিএনপির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈবাহিক সম্পর্ক গড়লেও রাজনীতির প্রশ্নে তারা আপোসহীন। সুশীল সমাজের অনেকেও ধাক্কা খেয়েছেন এই হিংস্রতা দেখে কিন্তু তাঁরা এদের ওপর থেকে আস্থা হারিয়েছেন তা বলা যাবে না। যারা নিরপেক্ষ তারাও ভাবছে সত্যি সত্যি জামায়াত এলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বসবাস করা যাবে তো। নাকি '৭১-এর মতো স্ত্রী-কন্যা-মাতা গনিমতের মাল হয়ে যাবে। লক্ষ্য করবেন, সবাই জামায়াতকে দোষারোপ করছে, বিএনপিকে নয়। দুটিই অশুভ শক্তি– এ কথা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁরা জামায়াতকে শুধু অশুভ মনে করেন। এটি একটি ফ্যালাসি। আমাদের কপালে আরও দুর্ভোগ আছে। কেননা চৌদ্দ দলের, সুশীল সমাজের অনেকে এই ফ্যালাসি বিশ্বাস করেন।

রাজনীতির গভীরে যাঁরা যেতে চান না, তাঁরাও বলেছেন, গত এক সপ্তাহ বাদ দিলে গত ৭ সপ্তাহ, চৌদ্দ দল বা আওয়ামী লীগের কাউকে রাস্তায় দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের অধিকাংশ ওই সময় নিজ এলাকায় যাননি বা যাওয়ার সাহস পাননি। এর কারণটি কী? চৌদ্দ দল বা আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড কি তা ভেবে দেখেছে? আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যাকে আমরা সবাই পছন্দ করি, তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারদের মতো অনুপস্থিত থাকেন। এত বড় ক্রাইসিসে এত বড় দলের এত বড় সম্পাদক ও এত বড় বড় নেতার এত অসহায় অবস্থা আর চোখে পড়েনি। দলীয় সভানেত্রী আমাদের মন্তব্য উপেক্ষা শুধু নয়, ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কিন্তু তা বলে বিষয়টা অসত্য তা কখনও ভেবে দেখেছেন কেন তাদের এ রকম আচরণ? সুতরাং আমরা যদি ভাবি জামায়াত প্রতিরোধে ১৪ দল/আওয়ামী লীগ তেমন প্রমাণিত হয় না।

উৎসাহী নয় তা কি ভুল হবে। ১৪ দলের ওপর তাদের বিশ্বাসের জায়গাটা একটু নড়বড়ে হয়ে গেছে।

মিডিয়ার দৌলতে এ রকম একটি বিষয় দাঁড়িয়েছে যে, ৬৪টি জেলায় জামায়াত-বিএনপি এমন করার ক্ষমতা রাখে। আসলে তা ঠিক নয়। বিশেষ যত স্থানে সহিংসতা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতিবিদদের খতিয়ে দেখা উচিত কেন ওইসব জায়গায় হিংস্ররা হিংস্রতা দেখতে পারল? সেখানের সংসদ সদস্য ও নেতাদের বিষয়ে তাদের দুবার ভেবে দেখা উচিত। সব কথার সারমর্ম- যেসব রাজনৈতিক দলের ওপর আমরা আস্থা রাখি তাঁরা সিভিল সমাজকে নিয়ে দূরে থাকুক নিজের দলীয় কর্মীদের নিয়েও মাঠে নামতে পারেননি। একটি যুক্তি দেয়া হয়, নামলে আরও ক্ষয়ক্ষতি হতো। সব পুড়িয়ে, ধর্মান্তর করার পর আর কী ক্ষতি হতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়।

গত দু'মাসের ঘটনায় আরেকটি মজার বিষয় চোখে পড়েছে। সরকারী দলের নেতানেত্রী, সংসদ সদস্য, মন্ত্রী সবাই অন্দরে বাইরে, এমনকি সংসদে উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, জামায়াত নিষিদ্ধ করতে হবে। তারাই তো নিষিদ্ধ করবেন। দাবি তো তুলব আমরা। যাঁরা নিষিদ্ধ করবেন তাঁরাই যখন নিষিদ্ধকরণের দাবি তোলেন তখন ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে এ দাবি কতটা আন্তরিক বা কতটা সিভিল সমাজের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঠোঁট সেবা বা লিপ সার্ভিস?

এরপর আসি মিডিয়ার ব্যাপারে। বিদ্যুতায়িত মাধ্যমে টকশোতে এ বিষয়ে প্রচুর আলাপ-আলোচনা হয়েছে। জামায়াতের সহিংসতা দেখান হয়েছে, বিএনপির সহিংসতাও খানিকটা স্থান পেয়েছে। বিশ্বজিতের ঘটনা যতবার দেখান হয়েছে, এই ঘটনা যে কত খারাপ [খারাপ তো বটেই মর্মান্তিকও যা কোনক্রমে গ্রহণযোগ্য নয়] তা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। জয়পুরহাটে মুসলমানদের যে তওবা পড়ান হলো ও 'ইসলামে' আবার দীক্ষা দেয়া হলো বা কীভাবে পিটিয়ে কুপিয়ে পুলিশ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষদের মারা হলো তা কিন্তু বারংবার দেখানো হয়নি, টকশোতেও আসেনি। বিশ্বজিৎ হত্যায় যে ২০ জনেরও ওপরে 'ছাত্রে'র বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়া হয়েছে তাও উল্লিখিত হয়নি। ১৯৯৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর শিবির আক্রমণ করে এবং অনেকে খুন হন। যদ্দুর মনে পড়ে, বিএনপির এক নেত্রীর পুত্র রিমুও খুন হন। সংসদে বিএনপি নেতারা জামায়াত নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন। লক্ষণীয়, শিবিরের হত্যাকারীদের কখনও গ্রেফতার করা হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অর্থাৎ এ আমলে হত্যাকারীকে সম্ভব হলে ধরা হয়। খালেদা নিজামী আমলে ধরা হয় না এটি কেউই উল্লেখ করেননি। খালেদা যাদের টিভি লাইসেন্স দিয়েছেন তারা এ ধরনের কাজ করতেই পারে কিন্তু হাসিনা যাদের লাইসেন্স দিয়েছেন তারাও এমনটি করবেন? নিশ্চয় প্রধানমন্ত্রী জানেন তাঁরা

লাইসেন্স কাদের কাছে বিক্রি করেছেন? তাদের তিনি কেন এখনও আনুকূল্য দেখাবেন? শেখ হাসিনার আমলে যাদের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে তারাও একই রকমের কাজ করেছে। টকশোর নামে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের তারা নিয়ে এসেছে এবং আসছে ও তাদের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বক্তব্য দেয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। এটি জামায়াত-বিএনপিকে এক ধরনের সমর্থন। লক্ষ্য করবেন, অনেক টিভির স্ক্রলে এখন লেখা হয় না জামায়াত-বিএনপি আক্রমণ করেছে। লেখা হয়– দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধাপরাধ বিচার তো নেগোশিয়েবল নয়, আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যাপারও নয়। কিন্তু কেন এই মতলববাজি? কারণ ব্যবসায়িক সম্পর্ক। খবরের কাগজেও একই ব্যাপার। প্রধান কাগজগুলো জামায়াতের বিরুদ্ধে লেখা/খবর ছাপতে রাজি হলেও বিএনপির ব্যাপারে নয়। সেখানেও টাকার সম্পর্ক। কিন্তু তরুণরা যখন জেগে উঠেছিল তখন তারা লিপ সার্ভিস দিচ্ছিল।

এ রকম একটা সময়ে আমি আবেদ খানকে ফোন করে জানিয়েছিলাম, এটিএন নিউজ সুখের বিষয় একটি পক্ষ নিয়েছে, কিন্তু বারবার ইসলামী ব্যাংকের বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে, ব্যাপারটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল না? তিনি জানালেন, 'আমি খেয়াল করিনি, এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি।' সেখানেও সময় টিভিতে শুধু আমি ইসলামী ব্যাংকের বিজ্ঞাপন দেখিনি। জনকণ্ঠ যে নিরপেক্ষ নয় তা সবার জানা। সেখানেও একদিন এমন বিজ্ঞাপন ছাপা হওয়ার পর স্বদেশকে প্রশ্ন করি। জনকণ্ঠের প্রবল অর্থকষ্ট সত্ত্বেও তারা সেই বিজ্ঞাপন আর ছাপেনি। সুতরাং কমিটমেন্ট এক জিনিস স্লোগান অন্য জিনিস, বিষয়টিও অনুধাবনের সময় এসেছে। সুতরাং মিডিয়া যে লিপ সার্ভিস দিচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। ইকবাল সোবহান চৌধুরীর সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই, সৌজন্যমূলক সম্পর্ক অটুট। কিন্তু যখন জানা গেল তিনি গোলাম আযমভক্ত তখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সাংবাদিকরাও কতটা কমিটেড সে প্রশ্ন জাগে। কারণ জনাব চৌধুরী এখনও তাদের নেতা। পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদেরও নেতা।

গণজাগরণ মঞ্চের অবস্থা যখন তুঙ্গে তখন আমি খুলনা গিয়েছিলাম। স্বাচিপের নেতা ডা. বাহার আমাকে খুলনা মেডিক্যালে নিয়ে গিয়েছিলেন কিছু বলার জন্য। সেখানে কয়েক শ' ডাক্তার, ছাত্র, ইন্টার্নি ছিলেন। সবাই জামায়াত নিষিদ্ধ চান। আমি বললাম, তরুণ তুর্কি হওয়ার দরকার নেই। সামান্য কয়েকটি কাজ করুন। ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখবেন না। কারণ তা জঙ্গীবাদে পুঁজি যোগায়। তাদের হাসপাতালে প্র্যাকটিস করবেন না বা ইবনে সিনার ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে লিখবেন না এবং যারা [টিভি, খবরের কাগজ বা অন্যরা] এদের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের বর্জন করুন। তার আগে খান এ সবুরের নামে যে রাস্তা সেটি বাতিল করুন। কারণ হাইকোর্ট এটি স্থগিত করার কথা বলেছে মেয়র সে

আদেশ অস্বীকার করেছেন। এবং হাইকোর্টও সে ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তাদের উৎসাহ দেখে মনে হলো এখনই একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমার চার দশকের অভিজ্ঞতায় এ রকম উত্তেজনা অনেক দেখেছি তাই উত্তেজিত হইনি। আজ প্রায় ১ মাস হয়ে গেল, তাদের কোন সাড়াশব্দ পাইনি। এই হচ্ছে অবস্থা।

গণজাগরণ মঞ্চ থেকে এ ধরনের বর্জনের ডাক দেয়া হয়েছিল। উদ্যোক্তারা কখনও খতিয়ে দেখেননি, সে আহ্বান কতটা সাড়া ফেলেছে। শুধু স্লোগানে সমাজ বদলায় না। বিপ্লবও হয় না। চার দশক বিভিন্ন আন্দোলন করে অন্তত এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। শুনেছি জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ডা. ইমরান সরকার স্বাচিপের সঙ্গে যুক্ত। এ মুহূর্তে জামায়াত নিষিদ্ধ চান এ রকম কয়েকজন স্বাচিপ নেতাকে অনুরোধ করেছি ব্যক্তিপর্যায়ে এ তিনটি দাবি মানতে, কেউ সাড়া দেননি। অথচ এঁরা সবাই জামায়াত নিষিদ্ধ চান।

সিভিল সমাজের যাঁরা নেতা হিসেবে আওয়ামীবিরোধী সংবাদপত্র ও টিভিতে পরিচিত তাঁদের একজনও জামায়াত নিষিদ্ধের কথা উচ্চারণ করেননি। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ থেকে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য কাউকে তো টু শব্দটি করতে দেখিনি। সংস্কৃতি জগতের কতজন সোচ্চার হয়েছেন?

সরকার জামায়াত নিষিদ্ধ করছে না বলে আমরা ক্ষুব্ধ হতেই পারি। সরকার বা পুলিশের পক্ষে একা জামায়াত-বিএনপির নাশকতা ঠেকানো মুশকিল। আমরা যে বাস্তবতা ভুলে যাই তাহলো দেশের কমপক্ষে ৫০ ভাগ মানুষ আওয়ামী লীগবিরোধী। আমি যে উদাহরণগুলো দিলাম তা অস্বীকার করতে পারবেন? এদেরও মৃদু জামায়াতী ধরলে সে সংখ্যা কত দাঁড়ায়? শেখ হাসিনা রাজনীতি করেন। তাঁর পক্ষে এ হিসাব গণনায় না নেয়া মুশকিল। আমরা যখন এত হিসাব কেতাব করি, তো একজন রাজনৈতিক নেতা তা করবেন না এটি তো বাস্তব নয়। আমরা যারা জামায়াত নিষিদ্ধ করার কথা বলছি তারা স্ব স্ব অবস্থান থেকে নিজের কাজটুকু করছি কি না সেটা আগে দেখা উচিত। জামায়াত যে আজ তাণ্ডব করে পার পেয়ে যাচ্ছে তার কারণ তার অর্থনৈতিক শক্তি। ডা. আবুল বারকাত গত পাঁচ বছর এই কথা বলেছেন, লিখছেন। যে তাহমিদ গণজাগরণ মঞ্চের একনিষ্ঠ কর্মী ছিল সিলেটে, সে কেন জামায়াতের পক্ষে মিছিলে নেতৃত্ব দেয় এবং মারা যায় তা কখনও ভেবেছেন? আমাদের সবাইকে এভাবে অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে বিএনপি-জামায়াত। সে কারণে আমরা ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকা উঠাই না, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব ভাংচুর হয়, বিএনপি-জামায়াতের হয় না, ইবনে সিনা ক্লিনিকে সবার আগে যাই। গণজাগরণ মঞ্চের ব্যাপারে আকুল হই কিন্তু স্ব স্ব অবস্থানে থাকি তাদের দাবি মানি না। আবার গণজাগরণ মঞ্চে জামায়াতের

ব্যাপারে সোচ্চার কিন্তু যে বিএনপির জোরে জামায়াত দাঁড়িয়ে, যে বিএনপি তাদের প্রায় নর্দমার সঙ্গে তুলনা করছে তাদের ব্যাপারে সোচ্চার হবে না কারণ তাহলে রাজনীতি হবে, বিএনপি-জামায়াতের মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলি আর শেখ হাসিনাকে বলি জামায়াত নিষিদ্ধ করতে। বলিহারি বাস্তবতা!

আমরা আমাদের কাজটুকু করি, সামান্য অহিংস কাজ, দেখবেন আগামী কয়েক মাসে জামায়াতের হিংস্রতা অনেক কমে গেছে। ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন একটি রাষ্ট্রকে অবলুপ্ত করেছিল। তখনকার মানুষ কত কমিটেড ছিলেন এবং নেতাদের কতটা বিশ্বাস করতেন, ভেবে দেখুন! আওয়ামী লীগের জামায়াত অংশকে চিহ্নিত করুন এবং জামায়াত নিষিদ্ধের দাবিতে অটুট থাকুন, দেখবেন সরকার বাধ্য হবে কাজ করতে। আওয়ামী লীগকে ভেবে দেখতে বলুন, আমাদের ভোট তাদের জন্য জরুরী কি না?

শুরুতেই এ কারণে বলেছিলাম, আসলেই কি আমরা জামায়াত নিষিদ্ধ করতে চাই?

১৪ মার্চ, ২০১৩

তিনি ক্ষমা করার কে ক্ষমা তো তাঁকেই চাইতে হবে

শাহরিয়ার কবির কয়েকদিন আগে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার সাম্প্রতিক হিন্দুপ্রীতি নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছেন দৈনিক জনকণ্ঠে। খালেদার এই সদিচ্ছাকে 'ভূতের মুখে রামনাম' বলে মন্তব্য করেছেন। শুধু তাই নয়, এটিকে তিনি এক ধরনের ভাঁওতাবাজি বলে মনে করছেন। খালেদা এখন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য খড়কুটো যা পাচ্ছেন তাই আঁকড়ে ধরছেন এবং সেটি স্বাভাবিক। এ অবস্থায় এতটা কড়া মন্তব্য না করলেও তিনি পারতেন। বরং এভাবে বললে বোধ হয় ভাল হতো যে, সব রাজনীতিবিদই এক আধটু ভাঁওতাবাজিতে অভ্যস্ত। কম আর বেশি। খালেদাও রাজনীতিবিদ, ফেরেশতা নন। আসলে, খালেদার প্রতি তার একটা ক্রোধ আছে। সেটিও স্বাভাবিক। দু'দুবার খালেদা তাঁকে জেলে পুরেছেন, অত্যাচার করেছেন তার 'হিন্দুপ্রীতি' ছাড়াবার জন্য। না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এখন সেই খালেদাই হিন্দুপ্রীতিতে গলগল, এটি খানিকটা গোলমেলে তো বটেই। শাহরিয়ার কবিরের বোঝা দরকার, সিচ্যুয়েশন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে। এখানে সবাই দাবার ঘুঁটি। আবার সবাই কিস্তিমাতের জন্য চাল দেয়ার সুযোগ খুঁজছে। শাহরিয়ারের মধ্যে এখনও শিশুসুলভ ইনোসেন্স বিরাজ করছে। এই যে ডেভিড বার্গম্যান, যিনি প্রথম যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে ডকুমেন্টারি করে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন, আমরা তার কত না ভক্ত ছিলাম। শাহরিয়ার তো তাকে নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিলেন। সেই ডেভিড এখন বাংলাদেশে বসে নিয়মিত যুদ্ধাপরাধের পক্ষ নিয়ে চর্চা করছেন। আচ্ছা, আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ড. কামাল হোসেনের কথাই ধরুন। খালেদা-নিজামীর আমলে তিনি বলেছিলেন, 'যে সংবিধানের কারণে আজ বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী, সে সংবিধানের ওপর হামলা করায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর লজ্জিত হওয়া উচিত। আমরা এমন একটি দেশে বাস করছি, যেখানে কোন আইনের শাসন নেই।... এ দেশে সাংবিধানিক শাসন নেই, আইনের শাসনও নেই। জনগণের নিরাপত্তা প্রদানের কথা বলে জোট সরকার ক্ষমতায় বসেছে, অথচ সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা রাস্তায় চলাচল করার উপায়ও রাখছে না।' এখানেই থেমে থাকেননি, বলেছেন, 'তারা [বিএনপি জোট] নাকি সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সমঅধিকারের আন্দোলন করছে। ওই সকল ক্রিমিনালের সঙ্গে আমাদের সমঅধিকার হতে পারে না।' [*জনকণ্ঠ* ২৪.০২.২০০৪]

আর আজ ড. কামাল হোসেন কি বিএনপি-জামায়াত জোটের হয়ে সংবিধান সংশোধনের পরামর্শ দিচ্ছেন না? আসলে, শাহরিয়ার অর্থ বা ক্ষমতার স্বাদ কোনদিন পায়নি।

আমার তো বেগম জিয়ার বক্তব্য শুনতে বেশ লাগে। বক্তব্য দেয়ার আগে পরিপাটি সুসজ্জিত হয়ে আসেন। তারপর সুন্দর সাজানো একটি রোবোটের মতো বলে যান। তাঁর গলা অবশ্য খানিকটা গনগনে, পরিপাটি সাজের সঙ্গে মেলে না, কিন্তু তাঁর অন্য একটি এ্যাফেক্ট আছে, কেমন যেন ক্রুর, ক্রুর। আর বক্তব্য তো এন্টারটেইনিং। কোন বক্তব্যের সঙ্গে পূর্ববর্তী কাজের মিল নেই। বর্তমান কাজের সঙ্গে তার অনুভবের মিল নেই। থিয়েটারের কি বলে যেন, বীভৎস রসের স্বাদ পাওয়া যায়, নাটকের দর্শকরা কি তা উপভোগ করেন না?

যাক, ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে গেল। কী করব, বাঙালীর টিপিক্যাল স্বভাব আর গেল না। ফিরে আসি পূর্ব প্রসঙ্গে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় যে খালেদা আগে কখনও করেননি তা নয়, করেছেন। কিন্তু বিজয়ার শুভেচ্ছা বোধহয় এই প্রথম। প্রশ্ন, হঠাৎ তিনি বিএনপির মৌলিক আদর্শ থেকে পিছিয়ে এলেন কেন? তারপরের প্রশ্ন, বিএনপির মৌলিক আদর্শ কী? দু'টি প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দেয়া যায়। মৌলিক আদর্শ হলো, বাবু কালচারের বাবুদের বাংলায় বলা যায়, ঘোমটার নিচে খেমটা নাচ। সামনে ঘোমটাটা হচ্ছে ইসলাম, ঐ আফিম দিয়ে বা ঐ নামে জিকির তুলে মানুষকে 'ঐক্যবদ্ধ' করা ও আওয়ামী এবং হিন্দুদের নিকেশ করা। পাকিস্তানীদের মতো আওয়ামী লীগার ও হিন্দুদের তারা একই মনে করেন। পাকিস্তানীদের মতো ভুল বললাম, এদের দেহ বাংলাদেশী, দিল পাকিস্তানী। এ কারণে তারা ব্যবহার করে দা, কুড়াল, বর্শা। খোকা বাবু এসব নিয়ে সম্প্রতি এই সব পাকিস্তানীদের তৈরি থাকতে বলেছিলেন। সুতরাং, তার এই হিন্দুপ্রীতি শাহরিয়ার কেন, সবাইকে চমকে দিয়েছে। এর কারণ, অনুমান করছি, আসন্ন নির্বাচনে, খালেদার হয়ত ধারণা, যদি হয়, তাহলে বহুল পরিমাণে অন্যান্য সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোট দরকার। নির্বাচনে শুধু জয়ী হওয়ার জন্য নয়, এটাও প্রমাণ করা যে, তিনি শুধু রাজাকারদের বা পাকিস্তানীমনাদের নেতা নন, তিনি হিন্দু বা 'ভারতীয়মনা'দেরও নেতা। এই ভঙ্গি করা বিশেষ জরুরী হয়ে পড়েছে এ কারণে যে, জামায়াত পিতা মওদুদীর পুত্র সম্প্রতি ঢাকায় বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে এসে বলে গেছেন, খালেদার পার্টনার জামায়াত নেতারা অবৈধ। জারজ শব্দটা তিনি বলেছেন, আমি আর সেটা উল্লেখ করলাম না। হিন্দু চাকরবাকর দু'একজন আছে অবশ্য খালেদার কিন্তু তাদের সবাইকে হিন্দু রাজাকার হিসেবেই জানে। যা হোক খালেদা যে শুধু পাকিস্তানীমনা জারজদের নয়, বাঙালীদেরও নেতা এই ইমেজটা

আন্তর্জাতিক পটভূমিকায়ও খুব জরুরী হয়ে উঠেছে। তাঁর অতীত কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রমাণিত যে তিনি, দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসীদের নেতা, এও পাকিস্তানীদের নেতা, পুরনো পাকি বা যুদ্ধাপরাধীদের নেতা। আরও আছে, তিনি জঙ্গীদের নেতা, তিনি মৌলবাদী জঙ্গীদের নেতা, ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মাতা।

বিজয়ার অনুষ্ঠানে যারা গিয়েছিলেন তাদের একজন এসে বিস্ফোরিত চোখে জানালেন, ভাই একি কাণ্ড! খালেদা জিয়া হলে ঢুকলেন আর হিন্দু রমণীরা উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন। এই উলুধ্বনিকে হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে খালেদা জিয়া একসময় তুলনা করে চিৎকার করে বলেছেন, আওয়ামী লীগ এলে মসজিদে মসজিদে উলুধ্বনি হবে। এখন তিনি যে অবগাহন করলেন উলুধ্বনিতে তার কী হবে? তাঁর কাছে কি এই উলুধ্বনি আযানের চেয়ে মধুর শুনিয়েছে? পরে কি তিনি শুদ্ধ হওয়ার জন্য কয়েকবার স্নান করেছেন? উলুধ্বনি বিষয়ে তার ব্যাখ্যা জরুরী। নাহলে প্রকাশ্যে তিনি আমাদের বলতে বাধ্য করবেন যে, তিনি একজন ভাঁওতাবাজ। মিথ্যাবাদী। অন্য রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তাঁর কোন তফাত নেই। শাহরিয়ার লিখেছেন, এই উলুধ্বনি খালেদার কানে নিশ্চয় গরম সিসা ঢেলে দিয়েছে। হিন্দু নারীরা উলুধ্বনি দিয়ে খালেদার হিন্দু নিধনের জবাব দিয়েছেন। শাহরিয়ারের জ্ঞাতার্থে বলি, ধর্মমতে, মুনাফেকদের কানে গরম সিসা আগে থেকেই ঢালা আছে।

খালেদা-নিজামীর আমলে যত হিন্দু নারী ধর্ষিত হয়েছেন, সেটি ১৯৪৭ সালের পর বিভিন্ন দাঙ্গায়ও হয়নি। এই ধর্ষিতাদের প্রতীক পূর্ণিমা, সীমা আরও অনেকে। খালেদা-নিজামীর আমলে যত হিন্দু দেশ ত্যাগ করেছেন, ১৯৪৭ সালের পর এত হিন্দু কখনও ভিটেমাটি ত্যাগ করেননি। আপনারা মফস্বলের খবর রাখেন কিনা জানি না। সাদেক হোসেন খোঁকার দা কুড়াল বর্শার থিওরির পর বরিশালের প্রচুর হিন্দু ইতোমধ্যে দেশত্যাগ করেছেন। জনকণ্ঠের মফস্বলের পাতায়ই সে খবর বেরিয়েছে। যে সব হিন্দু বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করতে গিয়েছিলেন তারা যেন এসব তথ্য মনে রাখেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই সম্প্রতি খালেদার একটি বিখ্যাত উক্তি আমি ক্ষমা করে দিলামের কথা মনে হলো। নির্বাচন বিষয়ে সরকারের প্রস্তাবের বিপরীতে, না, না, না, বলার সময় তিনি হঠাৎ ঘোষণা করেন, 'আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে যারা আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অতীতে নানারকম অন্যায়-অবিচার করেছেন, ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন, আমি তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করছি। আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। সরকারে গেলেও আমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ নেব না।

আমি কথা দিচ্ছি, আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে বাংলাদেশের জন্য একটি উজ্জ্বল ও অধিক নিরাপদ ভবিষ্যত নিশ্চিত করার কাজে। প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিহিংসা

চরিতার্থ করার মতো কোন ইচ্ছা ও সময় আমার নেই। [*কালের কণ্ঠ*, ২২.১০.১৩]

এ প্রসঙ্গটি ছিল সেই সংবাদ সম্মেলনে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। এই ক্ষমাতত্ত্ব এত জরুরী মনে হলো কেন? তার একটি কারণ, তিনি জানেন, তিনি যত পরিপাটি হয়েই বক্তৃতা মঞ্চে আসুন না কেন, তাঁর ক্রুরতার যে জবাব নেই তা মানুষজন জানেন। জেনারেল জিয়া যে রকম ক্রুর ছিলেন, তিনিও তার চেয়ে কম নন। জেনারেলের যোগ্য স্ত্রী। তাঁর ২০০১-০৬ সালের শাসন যে মানুষ ভোলেনি এটি আর কেউ না হলেও তিনি ভাল জানেন। অপরাধী সবসময় আগ্রাসী হয়। কেন তিনি হঠাৎ এমন বলছেন সেটি জিজ্ঞাসার দায়িত্ব ছিল ক্ষমতাবান সাংবাদিকদের। কিন্তু তারা হচ্ছেন এমবেডেড জার্নালিস্ট। খালেদা বা বিএনপির নেতারা কোন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দেন না। সাংবাদিকরা সেটা জেনেও যান। প্রেস রিলিজটা নিয়ে আসার জন্য। কারণ, খোকার দা কুড়াল যে সত্যি তা তারা জানেন। আরও জানেন, বিএনপি নেতারা অর্থ খরচে কার্পণ্য করেন না।

খালেদার ক্ষমাতত্ত্বে অনেকে উদ্বেলিত হয়েছেন। তার বদান্যতায় তারা আপ্লুত। সব নবীই তো ক্ষমা করে গেছেন মূর্খদের। খালেদাও করলেন। উদ্বেল অবস্থা কেটে গেলে তার বক্তব্যটি পর্যালোচনা করে দেখুন। এমন স্বার্থপর ক্ষমা প্রদর্শন আগে কেউ করেছেন কী না সন্দেহ। তিনি তাঁর ও তাঁর দুই পুত্রের যারা সমালোচনা করেছেন তাদের ক্ষমা করেছেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও মার্কিন সরকারকেও। কারণ, তারা তাঁর এক পুত্রের চুরি ধরে টাকা ফেরত দিয়েছে সরকারকে। সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের টাকা খাওয়া ভবন, যা হাওয়া ভবন নামে পরিচিত, তার সমালোচনা করেছেন, তাদের তিনি ক্ষমা করলেন। কিন্তু এগুলো কি ছিল ব্যক্তিগত আক্রমণ? না, সত্য তথ্য। সত্য তথ্যকে অবলীলাক্রমে তিনি অপবাদ আখ্যা দিলেন! তাঁর পুত্রদের প্রতি কে অন্যায় অবিচার করেছে? আমরা বা আওয়ামী লীগ? না জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল ও আদালত। তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চান না? তাঁর রাজনৈতিক ইতিহাসই হচ্ছে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ইতিহাস। এখনও তিনি বলছেন, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন [*জনকণ্ঠ*, ২১.১০.১৩]। অর্থাৎ এখনও মিথ্যা বলছেন। তিনি আমলাতন্ত্রকে ইঙ্গিত করে বলছেন, তাদেরও তিনি ক্ষমা করলেন।

অথচ একতরফা ক্ষমা ঘোষণার দু'তিন দিন আগে বলছেন, কোর্ট চলছে সরকারী নির্দেশে। সরাসরি অবমাননা। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদালত অবমাননার রুল জারী করলেও বেগম জিয়ার ক্ষেত্রে চুপ। খোকার দা কুড়াল যে কথার কথা নয় বিচারকরাও তা জানেন। সোহরাব হাসানের ভাষায় বলতে হয় 'তিনি ক্ষমা করলেন, ক্ষমা চাইলেন না।'

না, বেগম জিয়া ক্ষমা চাইতে পারেন না। তিনি জেনারেল পত্নী, আত্মগর্বে বলীয়ান। তাদের ক্ষমা চাইতে বাধ্য করতে হয়। এবং একমাত্র সাধারণ মানুষই পারে নির্বাচনে যথাযথভাবে পরাজিত করে তাঁকে ক্ষমা চাওয়াতে। এই পরাজয় হবে, তাঁর কৃতকর্মকে ক্ষমা না করা। অন্য অর্থে, তাঁর ক্ষমা চাওয়া। ক্ষমতাগর্বী এই মহিলা ঘোষণা করেছেন, তাঁর ভবিষ্যত সরকার [তিনি ধরেই নিয়েছেন তিনি জয়ী হবেন] হবে সব নাগরিকের প্রতিনিধিত্বকারী সরকার। অর্থাৎ রাজাকার জামায়াতী, হেফাজত বা এক কথায় হেজাবি ও ধর্মব্যবসায়ীদের সরকার। আসলে, তিনি কোন ক্ষেত্রে কোন ছাড় দিতে রাজি নন। ছাড় অন্যদের দিতে হবে। না হয় সেখানে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক কেউ স্থান পাবে না। অর্থাৎ হেজাবিদের তিনি ছাড়বেন না।

আমি বরং বেগম জিয়াকে ক্ষমা করে দিলাম। তিনি আমাকে রিমান্ডে নিয়ে [তাঁর ভাষা ধার করে বলতে হয় তখন তাঁর নির্দেশে কোর্ট চলত] জেলে পুরে অত্যাচার নির্যাতন করেছেন। তাঁকে তো জেলে নেয়ার নাম করে বিলাসবহুল অট্টালিকায়ই রাখা হয়েছে। রিমান্ডেও নেয়া হয়নি। তার থেকে ক্ষমা করার অধিকার আমার বেশি। আমি ব্যক্তি হিসেবে তাকে ক্ষমা করলাম। প্রশ্ন হচ্ছে, অন্যরা তাকে ক্ষমা করছে কিনা? বা অন্য কথায় তিনি ক্ষমা করার কে? এই ক্ষমার অধিকার তিনি পেলেন কীভাবে? সেটি কি ঈশ্বর প্রদত্ত না খোকা বা ধোঁকার রাম দা, চাইনিজ কুড়াল আর তীক্ষ্ণ বর্শার জোর?

সমষ্টিগতভাবে খালেদা জিয়া ও তাঁর ঠ্যাঙ্গাড়ে দল বা বাহিনীকে ক্ষমা করা যায় না অন্তত কয়েকটি কারণে-

১. তিনি বাংলাদেশে জন্ম নিয়ে মিথ্যা বলছেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক এটি মানতে তিনি রাজি নন। তিনি ইতিহাস বিকৃত করছেন। অতএব বাঙালী জাতির কাছে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে।
২. ইচ্ছাকৃতভাবে বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহীদ হওয়ার তারিখটি নিজের জন্মদিন হিসেবে ঘোষণা করে ৬০/৬৫ পাউন্ডের কেক কাটছেন। এটি জাতির জনকের শুধু অবমাননা নয়, তাঁর লেফটেন্যান্ট মওদুদের ভাষায় রুচি বিগর্হিত। আমরা বলব ধৃষ্টতা।
৩. তিনি যুদ্ধাপরাধী বা আলবদর রাজাকারদের ক্ষমতায় এনেছেন। তারা যখন রাষ্ট্রীয় পতাকা গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় পতাকা গাড়িতে লাগিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন তখন তা ছিল ৩০ লাখ শহীদের স্মৃতি ও ৬ লাখ বীরাঙ্গনার বুকে লাথির মতো। রাজাকারদের আলবদরদের নেতাকে আর যাই হোক ক্ষমা করা যায় না।
৪. ধর্ম নিয়ে মিথ্যা বলা যা ধর্মদ্রোহিতার সমান। যেমন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়

এলে মসজিদে উলুধ্বনি হবে।

অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করা যাবে কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে-

১. তার আমলে হিন্দু মুসলমান নারী। বিশেষ করে নির্যাতিতা হিন্দু নারীদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।
২. যে সব খ্রীস্টানের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।
৩. তাঁর নির্দেশে তাঁর ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীর নেতাদের অত্যাচারে যে সব হিন্দু পরিবার সর্বস্ব হারিয়েছেন, দেশ ত্যাগ করেছেন তাদের লুণ্ঠিত টাকা, মালামাল ফেরত ও ক্ষতিপূরণ দিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে।
৪. তাঁর ও রাজাকারদের আমলে যে ৩২০০ জনকে হত্যা করা হয়েছে ও আওয়ামী লীগার ও সমর্থকদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, তাঁদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে।
৫. জঙ্গী মৌলবাদী ও হেফাজতীদের সাহায্যে মানুষ হত্যা, দমন-নিপীড়ন, ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা, কোরান পোড়ানোতে সাহায্য করার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।
৬. তাঁর দুই পুত্রের অপকর্মের জন্য সরকার ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের অপকর্মের সাজা দিয়ে তাদের দুর্নীতি ও ক্ষমতাগ্রাসী প্রবণতাকে বন্ধ করতে হবে এবং এ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।
৭. যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থন করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

না, ক্লান্ত লাগছে। বাংলাদেশে আর কোন মহিলা দেশ জাতি মানুষের এত ক্ষতি করেননি। এত দুষ্কর্মও করেননি। তাঁর ক্ষমা চাওয়ার ফিরিস্তি দিতে গেলে বড়সড় একটি বই লিখতে হবে। আমি তো মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করলাম। তিনি ক্ষমা করার কে? আমরা তাকে ক্ষমা করব কিনা সেটাই বিবেচ্য।

২৪ অক্টোবর, ২০১৩

সংখ্যালঘিষ্ঠ রাজাকার না সংখ্যাগরিষ্ঠ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ- কারা শাসন করবে বাংলাদেশ?

বিবিসি সংলাপে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজেনা বিএনপির স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য। আপাতদৃষ্টিতে মন্তব্যটিকে তীর্যক মনে হলেও, এটি অত্যন্ত কঠোর একটি মন্তব্য। জনাব ইমাম প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, দায়িত্ব নিয়েই এ কথা বলেছেন। এতে স্পষ্ট হয় যে, মজেনাকে সরকার কী চোখে দেখেন। অনেকে বলতে পারেন, এটি শিষ্টাচারবিরোধী। এর উত্তর হবে, মজেনাও যেভাবে কূটনীতিক হিসেবে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করেন, তা তিনি করতে পারেন না। তিনি সীমা লঙ্ঘন করেছেন দেখেই এ মন্তব্য। উল্লেখ্য, এ প্রতিবেদনটি একটি পত্রিকা ছাড়া কেউ ছাপেনি। এতে আবারও প্রমাণিত আমেরিকার অনেক সামন্ত বাংলাদেশে বসবাস করেন।

মজেনার গত এক বছরের কর্মকাণ্ড ও মন্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এইচটি ইমামের তির্যক এ মন্তব্যের খানিকটা ভিত্তি আছে। মজেনার আমন্ত্রণে যাঁরা নিয়মিত দূতাবাসের পার্টিতে যান বা মজেনা যাদের বাসায় যান, তাঁরা সবাই বিএনপি-জামায়াত ও কয়েকটি পত্রিকা/টিভির পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। কয়েকজন জামায়াত-বিএনপি রাজনীতিবিদও প্রায়ই তাঁর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বিএনপি-জামায়াতের ভাবাদর্শে তিনি প্রভাবিত দেখে নির্বাচনের ব্যাপারে মাথা গলাতে শুরু করেন। নিজ সরকারের নির্দেশে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাও করতে যান। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, সংবিধান অনুযায়ী যা করা হবে তাই তারা সমর্থন করবে। মার্কিন পজিশন হলো, তত্ত্বাবধায়ক না হলে 'একতরফা' নির্বাচন হবে।

মজেনা যখন এ ধরনের মন্তব্য করেন সাংবাদিকদের সামনে, তখন কেউ জিজ্ঞেস করেন না– যুক্তরাষ্ট্রে কি রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধানের বাইরে নির্বাচনের প্রস্তাব মেনে নেবে? যদি না মানে তাহলে তাদের প্রেসক্রিপশন এ ধরনের কেন?

এর একটি কারণ হতে পারে, মান্ধাতা আমলের কিছু নীতি। সেই নীতি ছিল সন্ত্রাসী বা জঙ্গীদের তোয়াজ করতে হবে। তাদের ক্ষমতায় আনতে হবে। মার্কিনী

ধারণা এতে তারা বশে থাকে। এভাবে তারা তালেবান সৃষ্টি করেছে, পাকিস্তানকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে, মিসরে বিস্ফোরণমূলক অবস্থা সৃষ্টি করেছে, সিরিয়া নিয়েও ঝামেলা শুরু হয়েছে। ইসরাইলের সমস্ত দুর্বৃত্ত নীতি তারা সমর্থন করে। গণহত্যায় সব সময় তারা একটি ভূমিকা রাখে। তারা বিশ্বে এ ধরনের পক্ষকে সমর্থন করে গোলযোগ সৃষ্টির আশায়। গোলযোগ হলে আমেরিকার একটি ভূমিকা থাকে, তারা অস্ত্র বেচতে পারে, নতুন অস্ত্রের পরীক্ষা করতে পারে। ইরাকে খুব সম্ভব এবং আফগানিস্তানেও সুযোগ নিয়ে তারা হয়ত এ কাজ করেছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের গোলযোগপূর্ণ আবহাওয়া হয়ত মার্কিনী নীতিনির্ধারকরা সৃষ্টি করতে চান। শাহরিয়ার কবির বলছিলেন, অস্ত্রপরীক্ষা নিয়ে এ ধরনের বিস্ফোরণমূলক সব তথ্যসহ একটি প্রবন্ধ তাঁর হাতে এসেছে। হয়ত এ নিয়ে তিনি লিখবেনও। আমেরিকার প্রতি আমাদের কোন দ্বেষ নেই কিন্তু মনে রাখা দরকার মার্কিন সরকারগুলো জঙ্গী সরকার, যুদ্ধাপরাধের জন্যও দায়ী।

বিএনপি-জামায়াত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সমর্থনের আশা আর করে না বলেই বিশ্বাস। সে জন্যই হয়ত বিএনপির নেতৃবৃন্দ তাদের প্রভাবাধীন মজেনাকে পাঠিয়েছিলেন ওয়াশিংটনে গিয়ে তদবির করতে। কিন্তু বারাক ওবামার মন্তব্য শুনে মনে হলো না এ ব্যাপারে তাঁর খুব একটা আগ্রহ আছে। মজেনাকে হয়ত ধারণা দেয়া হয়েছিল, বিএনপির দাবি মেনে নেয়া হবে এবং বিএনপি-জামায়াত জিতবে। এ ধারণার কারণেই হয়ত মার্কিন কংগ্রেসের এশিয়া ও প্রশান্ত অঞ্চল বিষয়ক সাব-কমিটির চেয়ারম্যান স্টিভ খালেদা জিয়াকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে টুইট করেছেন। [মিজানুর রহমান খান, *প্রথম আলো*, ১৮.১১.১৩] আর মির্জা আব্বাস বলছেন, পঙ্কজ শরণ নামে একজন [ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে] তিনি দেখছেন বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় বসাতে চেষ্টা করছেন।

এ সব ঘটনার মধ্যেই আরও নানা ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য, তারেক জিয়ার খালাস পাওয়া। এ নিয়ে নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে। একটি হলো, টাকা খাওয়ার ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমাদের কোন মন্তব্য নেই। যেদিন থেকে যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু হয়েছে সেদিন থেকে বিএনপি-জামায়াতের টাকা সবাই খাচ্ছে কম-বেশি। বিদেশীরাও। রায় প্রদানকারী বিচারক শীঘ্রই অবসরে যাবেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ লন্ডনের এক আইনজীবী ও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। তারা এমন সব মন্তব্য ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে যে সাধারণ মানুষ তা সিরিয়াসলি নেয় না, কারণ ওই সব প্রতিবেদনের সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই, ইচ্ছা পূরণের কথা আছে। তারেকের দুর্নীতি প্রমাণ হয়নি, আদালত তা বললেও কেউ-ই তা সিরিয়াসলি নেয়নি। কেউ যদি বলে জামায়াতে যুদ্ধাপরাধী নেই। আদালতও যদি তা বলে, তা কতটা বিশ্বাসযোগ্য হবে। তাহলে তো প্রমাণিত হবে মুক্তিযুদ্ধই

হয়নি। আমাদের বন্ধু শফিকুর রহমান *জনকণ্ঠে* এ বিষয়ে সুন্দর একটি নিবন্ধ লিখেছেন নো ওয়ান কিলড জেসিকা। ভারতীয় এই সাংবাদিককে হত্যার অভিযোগে যাদের বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছিল সবাই তারা ছাড়া পেয়ে যায়। তার মানে জেসিকাকে কেউ খুন করেনি। গোলাম আযমের নাগরিকত্বের সময়ও বিজ্ঞ বিচারপতিরা এ ধরনের রায় দিয়ে ১৯৭১-কে অস্বীকার করেছিলেন।

অনেকে মনে করেন, সরকারের সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা হয়েছে। তারেক শাস্তি পাবেন না বদলে বিএনপি নির্বাচনে যাবে। এটি সত্য হলে খুব মারাত্মক ব্যাপার। কারণ শেখ হাসিনা তারেকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বার বার বলেছেন। তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। আদালতকে কেউ আর স্বাধীন মনে করবেন না। অন্যদিকে এটি প্রমাণিত হবে তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে আন্দোলনের মূল বিষয় হলো তারেকের মুক্তি।

যে বিচারক এ রায় দিয়েছেন তিনি লজিকের খুব একটা ধার ধারেননি। এফবিআইয়ের সাক্ষ্যপ্রমাণও তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছে। ঠিক আছে তাঁর যুক্তি মানা গেল যে, তারেক তো ঘুষ নেননি, তিনি বন্ধুর কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। সে টাকা ঘুষের না বৈধ তা তাঁর জানার কথা নয়। কিন্তু বিদেশে আমাদের ক্রেডিট কার্ডের বাংলাদেশ ব্যাংক উল্লেখিত অর্থের পরিমাণ ছাড়া বেশি কিছু দেয়া হয় না যদি না বিশেষ পরিস্থিতি থাকে এবং সে অর্থের পরিমাণ নগণ্য। বিদেশে যদি ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা হয়ে থাকে, তবে তা উপার্জনের ভিত্তিতে করতে হয় এবং আয়কর বিবরণীতে দেখাতে হয়। সেটি কি দেখান হয়েছে? পূর্ণাঙ্গ রায় দেখে উকিলরা কূটতর্ক করবেন। পত্রপত্রিকার প্রতিবেদনই আমাদের মন্তব্যের ভিত্তি। তারেক টাকা খাননি, তাহলে হাওয়া ভবন ছিল না। হয়ত হাওয়া ভবন ছিল কিন্তু বিচারক দেশে ছিলেন না। তাই এ বিষয়ে জানেন না।

বিচারকরা যখন এ ধরনের রায় দেন তখন তাদের কিন্তু কোন দায় থাকে না। আমাদের সমাজে একমাত্র বিচারকদেরই কারও কাছে দায়বদ্ধতা নেই, আর নেই সামরিক বাহিনীর। তবে শাসন বদল হলে সামরিক বাহিনীর অনেকের চাকরি যায়, বিচারকদের যায় না। তিন উদ্দিনের আমলে দেখেছি, আদালতগুলোতে ছোট চুলঅলা তরুণদের দাপট। তাদের নির্দেশে চলেছে বিচারকাজ, কেউ কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি তাদের। শাসন বদল হওয়ার পর তাদের চাকরি গেছে কিনা জানি না। বিচার হয়নি, চাকরি গেলেও কিছু আসে যায় না, যা বানাবার তা দুই বছরেই বানিয়েছিল। বিচারকরাও। কিন্তু তাদের চাকরি যায়নি। বিচারও হয়নি। এই দায়হীনতা এ ধরনের রায় দিতে প্ররোচনা যোগায়। তবে আইনমন্ত্রী এখন বিরোধী দলের নিত্য সমালোচনার বিরুদ্ধে বলতে পারবেন যে, সরকার বিচার ব্যবস্থায় হস্ত ক্ষেপ করে না। আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলে।

রাজনীতি এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, মানুষ বীতশ্রদ্ধ এটি বললেও কম শোনায়। জেনারেল এরশাদ এমন করবেন এটি জানা কথা। এটি জেনারেলের ঐতিহ্য। তার থুতু ও বেইমানতত্ত্ব তাঁর বেলায়ই প্রযোজ্য। গণতন্ত্রে এ সব মানুষকেও সমাদার করতে হয়। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এই পারফরম্যান্সকে বলেছেন রাজনীতি। এগুলো রাজনীতি হলে ভণ্ডামি, নোংরামি, ইতরামি, ভাঁড়ামি কাকে বলা হবে?

বিএনপি-জামায়াত হরতালের নামে কমপক্ষে ১৪ জনকে পুড়িয়ে মেরেছে। পেট্রোল বোমায় আহত হয়েছে শুধু ঢাকায় ৫০ জনের মতো, আর কত টাকা ক্ষতি হয়েছে তা বলার নয়। হরতাল আমরা অসমর্থন করি না। ছাত্রজীবন থেকে গণতন্ত্রের জন্য অনেক হরতাল করেছি। হরতালে কেউ বেরোলে গাড়ি করে, বেবিট্যাক্সি করে তাকে অনুরোধ করেছি। কিন্তু বাসে আগুন দিতে হবে যেদিন হরতাল নয় সেদিন থেকে, মানুষ পুড়িয়ে মারতে হবে যেমন মধ্যযুগে মারা হতো ওঝা আর ডাইনি সন্দেহে অনেককে, ভাবা যায়। হরতালে বিএনপি-জামায়াতের কোন নেতাকর্মীকে দেখা যায় না। বিভিন্ন স্পটে ভাড়া করা লোকরা থাকে। এ সব ধ্বংসযজ্ঞের জন্য অনেককে হুকুমের আসামি করা হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতলববাজি থাকতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে বর্তমান সরকার শিক্ষা নিয়েছে খালেদা-নিজামী-মওদুদ থেকে। সবাই ভুলে যান এত তাড়াতাড়ি। মোহাম্মদ নাসিম, মতিয়া চৌধুরী বা আসাদুজ্জামান নূরকে কিভাবে ওই আমলে কোহিনূরের নেতৃত্বে পুলিশ পিটিয়েছিল। বর্তমান সরকার কোহিনূরকে ধরেনি। সরকারের কোন না কোন পর্যায়ে কেউ টাকা খেয়েছে, না হলে কোহিনূরের মতো দুর্বৃত্তকে ধরা গেল না কেন, যাকে যুক্তরাষ্ট্র বা ইইউ পর্যন্ত ভিসা দেয়নি। আওয়ামী লীগ নেতারা হরতালের সময় রাস্তায় থাকতেন। বিএনপি-জামায়াত নেতারা ঘরে বসে রাজা উজির মারেন, তাদের গার্মেন্টস বা কারখানা চলে। টাকা পেয়ে তাদের কিছু ক্যাডার ও ভাড়াটে গুণ্ডারা রাস্তায় রাস্তায় মানুষ পোড়ানোর জন্য মওকা খোঁজে। মির্জা ফখরুল যে অনবরত মিথ্যা বলেন, যা এখনকার রাজনীতির মূলভিত্তি তার প্রমাণ তিনি নিজেই দিলেন এ বলে যে, শুধু বাস-গাড়ি পোড়ালে চলবে না। অর্থাৎ তাদের ক্যাডাররাই বাস-গাড়ি-ট্রাক মানুষ পোড়াচ্ছে। প্রতিদিন জামায়াতী বোমা প্রস্তুতকারকদের ধরা হচ্ছে। অনেকে বলছেন, মির্জা ফখরুল বা তাঁর সাঙ্গাত এখন হরতালের কথা বলে তখন মনে হয় এদের কাউকে ধরে এনে বাসে বসিয়ে আগুন লাগিয়ে দিই। আমরা এগুলোর পক্ষে নই। কিন্তু বাংলাদেশে যে বাড়াবাড়ি করলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। আসলে তখন বিএনপি নেতৃবৃন্দ বুঝবেন, বাসে মানুষ পোড়াতে কেমন লাগে। মানুষ যদি রাস্তায় নেমে রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ান গুটিকয় দুর্বৃত্তকে ধরে রামধোলাই দিয়ে পুলিশে

হস্তান্তর করে, তাহলে মির্জা ফখরুল বা গর্জন সিংয়ের ক্যাডাররা টাকা খেয়েও রাস্তায় নামবে না। এখন আসলে শুধু সরকার নয় সাধারণেরও এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়া যায়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মার্কিন এক সহকারী মন্ত্রী এসেছেন সে কারণে বিএনপি কয়েক দিন মানুষ পোড়ানো বন্ধ রেখেছে। এর অর্থ দেশে এতজন মানুষ থেকে মার্কিন এক সহকারী মন্ত্রীর দাম বেশি, এই যাদের মনোভাব– এ দেশে রাজনীতি করতে দিতে হবে, যেহেতু তারা রাস্তায় মানুষ পোড়াচ্ছে, গাড়ি পোড়াচ্ছে সেহেতু তাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে এটি যৌক্তিক কোন কথা নয়। আসলে সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মুক্তিযুদ্ধ সমর্থক বলে যাদের জানি, যাদের মধ্যে আমাদের পুরনো বন্ধুবান্ধবও আছেন, তাঁরা যুক্তি দেন। বিএনপি-জামায়াতের দাবি শোনা হবে না, রাখা হবে না, এ কেমন গণতন্ত্র? এ তো স্বৈরতন্ত্র। সরকার একদলীয় নির্বাচন করছে। সরকার যদি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে এবং সেখানে গত নির্বাচনে যারা সম্মিলিতভাবে ৫০ ভাগেরও বেশি ভোট পেয়েছিল, তারা যদি নির্বাচনে এগিয়ে আসে তাহলে সেটি একদলীয় নির্বাচন হবে কিভাবে? পাকিস্তানী শত্রুদের কৌশলী সমর্থক যাদের আমরা সুশীল বাঁটপার বলি তারা জিয়াউর রহমান বা তার পত্নীর শাসনকাল নিয়ে পারত পক্ষে কিছু বলেন না। এ প্রসঙ্গে তারা যুক্তি দেন, বঙ্গবন্ধু একদলীয় শাসন কায়েম করেছিলেন। জিয়া বহুদলীয়। স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসা তিনটি দল নিয়ে বঙ্গবন্ধু একটি দল করেছেন এবং সেখানে সব দলমতের মানুষজনকে নিয়েছেন। যাঁরা আসতে চাননি তাদের নেননি। সেই দৃষ্টিভঙ্গি অপছন্দ করতে পারেন। কিন্তু জিয়া তাঁর বিপরীতে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এটি ডাহা মিথ্যা কথা। জিয়া আগে বন্দুক পিঠে ঠেকিয়ে নিজের আসন পাকাপোক্ত করেছেন কিন্তু সেটিও পাকাপোক্ত নয় ভেবে যারা তাঁকে ক্ষমতায় এনেছিল সেই আইএসআইয়ের প্রতিভূ ১৯৭১ সালের খুনীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। সেই খুনী জামায়াত মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনীতি করতে দেয়া হবে, অন্যদের হবে না, সেটি তো গ্রহণযোগ্য হতো না। সে কারণে তিনি ঘোষণা করেন, অন্যরা রাজনীতি করতে পারবে তবে লাইসেন্স নিয়ে। বন্দুকের ভয়ে কেউ তখন আপত্তি করতে পারেনি। বন্দুককে সবাই ভয় করে। এখন যদি মানুষ পোড়ানো বা বাস পোড়ানোর সময় সরকার গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দেয়, কাল থেকে কেউ রাস্তায় নামবে না, কারণ এখানে আদর্শের প্রশ্ন নেই, আছে টাকার প্রশ্ন। আর কিছু টাকার জন্য কেউ জান খোয়াতে রাজি হবে না। তো জিয়া এভাবে হলেন গণতন্ত্রের প্রবক্তা আর সব দল একত্রিত হয়ে কিছু করলে তা হয়ে যায় অগণতান্ত্রিক! সুশীল বাঁটপারদের কাউকে শুনেছেন এ কথা বলতে যে যারা বাংলাদেশ স্বীকার করে না তারা এ দেশে রাজনীতি করার অধিকার পায় কিভাবে? এবং যারা তাদের সমর্থক

তাদেরও রাজনীতি করার অধিকার থাকে কিভাবে? এ মৌল প্রশ্ন কখনও কী ড. ইউনূস থেকে শুরু করে ছোট মাপের যেসব বক্তা আছেন তারা কখনও তুলেছেন? কয়েকটি সংবাদপত্র/টিভিতে কিছু ব্যক্তিকে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যেন তারা সিভিল সমাজের প্রবক্তা। তারা এমন সব বক্তব্য দেন যাতে মনে হতে পারে বিএনপি-জামায়াতের দাবির ন্যায্যতা অধিক। এরা কখনও খালেদা বা জিয়ার দুরাচারের কথা, আইন ও সংবিধান লঙ্ঘনের কথা বলেন না। কখনও বলেন না, নির্বাচনের জন্য কি বার বার সংবিধান সংশোধন করা হবে? এদের মৌলিক এই চেহারা বা শয়তানিটা কেউ তুলে ধরে না। কেননা ছোট এই সমাজে সবাই সবার পরিচিত। গত লেখায় আমি এদের বলেছিলাম সুশীল টাউট। আমার বন্ধু আহমেদ মাহফুজুল হক এটি ঈষৎ পরিবর্তন করে আরও ভাল নামকরণ করেছেন– সুশীল বাঁটপার। আশার কথা, আজকাল মানুষ এই সব প্রশ্ন তুলছেন, সুশীল বাঁটপারদের চিনতে পারছেন।

এই সুশীল বাঁটপাররা এখন খানিকটা ক্ষুন্ন। তাদের অনেকে লিখেছেন, যা তা কথা, খোদ আমেরিকা থেকে একজন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছেন আর শেখ হাসিনা তাঁকে গুরুত্ব দিলেন না। তাঁর কথা শুনলেন না। তাঁরা খুব কষ্ট পেয়েছেন শেখ হাসিনার ব্যবহারে। কেননা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে মার্কিনীরা আপাতত নিজেদের এজেন্ডা স্থগিত রাখছে। নিশা দেশাই পরিষ্কার বলেছেন, সহিংসতা তাঁরা সমর্থন করেন না। কেননা আমেরিকানরা প্রকাশ্যে মানুষ পোড়ানোর ব্যাপারটা সমর্থন করতে পারছে না। আশ্চর্য, হিউম্যান রাইট ওয়াচ নামে একটি সংস্থা প্রায়ই যুদ্ধাপরাধী বা বিএনপির কেউ গ্রেফতার হলে মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে বিবৃতি দেয়। তারা কিছু বলেনি। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও না। এর অর্থ জবেহ করলে [১৯৭১ সালে] মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। পুড়িয়ে মারলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় না। এর কারণ কি এই যে ইউরোপ আমেরিকায় এ ঐতিহ্য ছিল! যা হোক, মজেনাও বলছেন– বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে বিদেশীদের নাকগলানো উচিত নয়। তবে এ সব আপ্ত বাণীতে কারও উল্লসিত হওয়ার কারণ নেই। আমেরিকা এখন অপেক্ষা করবে কোন্ সুযোগে শেখ হাসিনাকে উৎখাত করা যায় [১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার মতো] এবং জামায়াত-বিএনপিকে ক্ষমতায় আসীন করা যায়। ইতোমধ্যে মার্কিন পত্রপত্রিকায় শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণার ইঙ্গিত দিয়েছে। তারা ভাবছে এ ধরনের অবরোধ হলে সরকারের পতন হবে ও রাজাকারদের ক্ষমতায় বসান যাবে।

যাঁরা নির্বাচন চাচ্ছেন এবং নির্বাচনে যেতে ইচ্ছুক তাদের একটা যুক্তি আছে। সংবিধানের আওতায় তাঁরা নির্বাচন করতে চান। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতের যুক্তি কী? সুশীল বাঁটপাররা এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। কেন যুদ্ধাপরাধী ও তাদের সমর্থকদের

যুক্তি মানতে হবে, এ বিষয়েও তারা নিশ্চুপ। তাদের জেদ, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। বিএনপি-জামায়াত যুদ্ধাপরাধী ও যুদ্ধাপরাধ সমর্থন করে বটে কিন্তু আওয়ামী লীগ তো নয়। আর আছে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত জেদ। তাঁর পুরনো ঘাঁটি সেনানিবাসের এত দামি সম্পত্তি হাতছাড়া হয়েছে [সুশীল বাঁটপারদের কাউকে আমি এ প্রশ্ন তুলতে দেখিনি খালেদা জিয়াকে গুলশানে একটি বাড়ি দেয়া হয়েছে যার দাম এখন কমপক্ষে ১০০ কোটি। শেখ হাসিনা বা রেহানাকে কেন একটি বাড়ি তাহলে দেয়া যাবে না?]। দুই পুত্র চুরির দায়ে বাইরে, এটি তিনি মানতে পারছেন না। তাঁকে ক্ষমতায় যেতে দিতে হবে। তিনি অন্তত এই শেষবার ক্ষমতায় এসে সবকিছুর ফয়সালা করতে চান এবং এমন ব্যবস্থা করতে চান, যাতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে কেউ না থাকে। তত্ত্বাবধায়ক তিনি মনেপ্রাণে চান তা নয়, এটি একটি অজুহাত মাত্র। কারণ এ ব্যবস্থায় এরশাদের মতো তিনিও বিরোধী।

তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা কি খালেদার মনের কথা? না। তিনি কখনও তা চাননি। বলেছেন, পাগল বা শিশু ছাড়া কেউ নির্দলীয় নয়। লক্ষ্য করবেন, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন নিয়ে খালেদা জিয়ার আমলে বেশি কথা উঠেছে। হাসিনার আমলে নয়। এই আমলে ৫০০০ নির্বাচন নিয়ে কেউ কথা বলেনি। এমন কী বিএনপিও না। বিএনপি কিন্তু শুধু তত্ত্বাবধায়কই নয়, নির্বাচন কমিশন বদলেরও কথা বলছে। অথচ গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ৮ জানুয়ারি ২০০৭ সালে বলেছিলেন, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী- '২২ জানুয়ারির নির্বাচন পেছাতে সম্মত না হলেও বিএনপি নির্বাচনের পর পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে আরেকটা নির্বাচন করতে সম্মত হয়েছে। ৬ জানুয়ারি এই কূটনীতিক [ব্রিটিশ ও মার্কিন] চারদলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করে সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন করার স্বার্থে নির্বাচন তিন মাস পেছানোর কথা বলেছিলেন। কিন্তু সংবিধানের বাধ্যবাধকতার অজুহাতে বিএনপি চেয়ারপার্সন তাতে রাজি হননি। তবে ২২ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ৬ মাসের মাথায় আবারও নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নাকি তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি জানান, তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। এ ব্যবস্থা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। এ অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থারও কোন যৌক্তিকতা নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে ৬ মাসের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন স্বাধীন, ভোটার তালিকা, ভোটার আইডি কার্ডসহ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন খালেদা জিয়া।' [ফজলুল হক, *জনতার জয়*]

সুশীল বাঁটপাররা কি এর জবাব দেবেন? দিতে পারবেন না। ঘুরে ফিরে আগেও লিখেছি, ব্যাপারটা এক জায়গায় এসেই দাঁড়াবে। এ দেশ রাজাকাররা শাসন করবে, না রাজাকারবিরোধীরা করবে? নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের

মাধ্যমে এটি ফয়সালার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু রাজাকারপন্থী দলগুলো তা মানতে রাজি নয়। নিয়মের মধ্য কাজ করতে তারা ইচ্ছুক নয়, কখনও করেনি। ভায়োলেন্সই তাদের উপজীব্য। যে কারণে কোন দ্বিধা না করেই ফখরুল আহ্বান জানান জ্বালানো পোড়ানোতে আরও সক্রিয় হতে। সুশীল বাঁটপারদের ধারণা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলে সব সমস্যার সমাধান হবে। এ রকম একটি ধারণা তারা মিডিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি করছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ যে তখন নির্বাচনে তো নাও আসতে পারে, এ ধারণাটি তাদের মাথায় নেই।

এক ধরনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে, প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে

গিওর্গস কাতিদিসের বয়স ২০। গ্রীসের জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়। সামনে তার উজ্জ্বল অপার ভবিষ্যত। মাস কয়েক আগে এক খেলায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর তার দেয়া গোলে তার দল জিতে যায়। খুশিতে আত্মহারা হয়ে তিনি অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দর্শকদের দিকে ডান হাতটা সোজা করে বাড়িয়ে দিলেন। খেলা শেষে তাকে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। কারণ? নাজিরা একে অপরের সঙ্গে দেখা হলে এ ভঙ্গিতে অভিবাদন করে বলত 'হাইল হিটলার।' কাতিদিস বলেছেন, তিনি জানতেন না এটি নাজি স্যালুট। কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করেননি। নাজি স্যালুটের এক ভঙ্গি নিমিষে তার অপার উজ্জ্বল ভবিষ্যত ফুটো করে দিল। ইউরোপে নাজি আর ফ্যাসিস্টদের সভ্যতার শত্রু হিসেবে গণ্য করা হয় এবং কেউ বেচাল করলে চিরদিনের জন্য সমাজ রাষ্ট্রে অপাংক্তেয় হয়ে যায়। তাই বিশ্বযুদ্ধের সত্তর বছর পরও ইউরোপ বা আমেরিকার কোথাও নাজি বা ফ্যাসিস্টরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি।

আমাদের দেশে জামায়াতে ইসলামী ৩০ লাখ হত্যা ও ৬ লাখ ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত। অগণিত অগ্নিসংযোগ, লুট, জখম করার কথা বাদই দিলাম। আজ তারা এ দেশ শুধু শাসন করেনি, এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের সর্বান্তকরণে সমর্থন করছে বিএনপি এবং ইসলাম ব্যবসায়ী কিছু দল। এ দেশে তাদের প্রধান বিরোধী দল বলা হয়। তারা মিলে আবার দেশটিকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে চাচ্ছে। এ জন্য এই পর্যন্ত যৌথভাবে তারা পুড়িয়ে ৫০ জনকে হত্যা করেছে। আমাদের মিডিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এদের সোচ্চারে সমর্থন করছে। এরা সমাজে সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত। আর যারা পুড়িয়ে মারছে তারা রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। অনেক ফিটফাট ভদ্রলোক যাদের এখন সুশীল বাটপাড় বলা হয়, এদের ব্রিফ নিয়ে দিল্লী ওয়াশিংটন করে বেড়াচ্ছেন। বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছেন, হাস্য মুখে কথা বলছেন। মাঝে মধ্যে ভাবি– শুদ্ধ হারামজাদার সংজ্ঞাটা কী? মাঝে মধ্যে ভাবি– কোন্ মাতৃজঠরে এদের জন্ম? মাঝে মধ্যে মনে হয়– জারজ বা পাকিস্তানী জারজ শব্দটা কি গালি না প্রশংসাসূচক বাক্য? এদের দেখলে মনে হয়, সারাশরীরে তাদের পোকা কিলবিল করছে। সুবেশি কাপড়-চোপড়ে তারা তা ঢেকে রাখছে এবং কেন অন্যদের শরীরে পোকা কিলবিল করছে না– সে আক্রোশে দাপিয়ে

বেড়াচ্ছে। গ্রীসের ঘটনাটা শুরুতে এ কারণে উল্লেখ করলাম এ কথা বোঝাতে যে, বাঙালী হলেই (পশ্চিম বঙ্গের হলেও) ধরে নিতে হবে তার জেনেটিক গণ্ডগোল আছে।

অনেকের ধারণা আমাদের দেশে একটি সরকার আছে। যারা এ দেশে থাকে না তারা প্রতিনিয়ত জিজ্ঞেস করছে, প্রতিদিন রেললাইন তুলে ফেলা হচ্ছে, পেট্রোল বোমা মেরে নারী-শিশু মেরে ফেলা হচ্ছে, তার পরও বলছে সরকার আছে? হ্যাঁ সরকার আছে, যে সরকারের কর্তারা কথায় কথায় বলেন, আর একবার এ ধরনের কিছু হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। পাড়ার সেই গল্পটা মনে পড়ে। পাড়ার মস্তান প্রতিদিন কাউকে না কাউকে পেটাচ্ছে। যারা পিটুনি খাচ্ছে তারা বলছে, আরেকবার পেটাক তো দেখে নেব। তবে সরকারদলীয় অনেক নেতাকে বলতে শুনবেন, এটা নাকি পলিটিক্স। যদি এটি পলিটিক্স হয়, তা হলে সরকারকে এর জন্য মূল্য দিতে হবে।

আসলে পুরো জনসমষ্টির মনে হয় গহীন গভীরে পাকিদের জন্য এক ধরনের ভালবাসা রয়ে গেছে। তাই জামায়াত-বিএনপি যখন মানুষ পোড়ায়, ধ্বংস করে তখন আমরা আপ্লুত হয়ে বলি না, বললেও ভাবি– সেটি হচ্ছে আন্দোলন। দেখবেন বেতার টিভিতে, সংবাদপত্রে এদের বলা হয় দুর্বৃত্ত, জামায়াত-বিএনপি কর্মী নয়। কিন্তু সময়-সুযোগ হলেই বলা হয় বিশ্বজিৎ হত্যার জন্য দায়ী ছাত্রলীগ। সরকার যে বিশ্বজিৎ হত্যার জন্য ২০ জনকে ধরে বিচার করছে, সেটি কিন্তু বক্তব্যের মধ্যে নেই। যাদের নির্দেশে মানুষ পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, ধ্বংসযজ্ঞ চলছে, তাদের সম্মান করে বলি বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ জামায়াত-বিএনপি নেতাকর্মীদের দেখলে আমাদের শরীর আবেগে আন্দোলিত হয়ে ওঠে, চোখ ভরে ওঠে জলে, জড়িয়ে ধরে সবার বলতে ইচ্ছে করে সোনারা, বাবারা, তোমরা আছ দেখেই তো আমরা ভরসা পাই। পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা একবার মিলিত হবই। শেখ মুজিবুর রহমান নামে লোকটা আমাদের যে ক্ষতি করে গেছে, আমাদের যে বাঙালী বানাতে চেয়েছিল, তার প্রতিশোধ আমরা নেবই। আমরা জারজ হবই।

এ মন্তব্যে আপনাদের খারাপ লাগতে পারে। কারণ এ সব ভালবাসার সঙ্গে হয়ত আপনার পরিবার বা বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই জড়িত। হয়ত অস্বীকার করবেন। কারণ সত্যগুলো আমরা এমন মোড়কে পরিবেশন করছি, যা সত্য মনে হলেও সত্য নয়। বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে হয়ত বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

বর্তমানে যে খুনখারাবি চলছে, যা এখন মিডিয়া আন্দোলন নামে আপনাদের গেলাচ্ছে, তা কোন্ আন্দোলন? সে প্রশ্ন কি কখনও আপনাদের মনে জেগেছে?

যুদ্ধাপরাধী বিচার শুরু হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'আন্দোলন' শুরু হয়। অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে যুদ্ধাপরাধী বিচার যুক্ত। যুদ্ধাপরাধ বিচার যতই এগিয়ে গেছে, জামায়াত-বিএনপি ততই এতে গুরুত্বারোপ করেছে। এর কারণ আমরা কতটা

খতিয়ে দেখেছি?

যুদ্ধাপরাধী হিসেবে জামায়াতের পুরো নেতৃত্ব দায়ী হতে চলেছিল এবং হয়েছে। অধিকাংশকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। যুদ্ধাপরাধী বা তাদের দল কোনখানে গ্রাহ্য নয়। আদালত তাদের নিবন্ধন বাতিল করেছে। বিএনপি-জামায়াত আপাতদৃষ্টিতে দুটি দল হলেও পরস্পরের আদর্শ-প্রকৃতি এক। জামায়াত যেভাবে একটি ঘৃণিত দল হিসেবে পরিচিত হচ্ছিল তাতে বিএনপি-জামায়াত উভয়েরই ক্ষতি হচ্ছিল। সে কারণে বিএনপি প্রথমে যুদ্ধাপরাধ বিচার চায় না বলেছে অর্থাৎ ১৯৭১ সালকে অস্বীকার করেছে।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ জেনারেশন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। তরুণ প্রজন্মের সবাই রাজাকারের বাচ্চা নয়। সুতরাং শুধু যুদ্ধাপরাধ নিয়ে আন্দোলন করলে তো তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তাই শুরু হলো তত্ত্বাবধায়ক 'আন্দোলন।' এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার খালেদা জিয়া সব সময় অস্বীকার করেছেন এমন কী ২০০৭ সালেও। হঠাৎ তাঁর তত্ত্বাবধায়ক প্রীতি উথলে উঠল কেন? কারণ আর কিছু নয়, কিছু একটা বিষয় নিয়ে আন্দোলন তৈরি করতে হবে, যাতে আন্দোলন করে ক্ষমতায় যাওয়া যায় আবার জামায়াতকেও রক্ষা করা যায়। কেননা চতুর্দিকে আওয়ামী লীগের অর্জন এত বেশি যে, এ সব অর্জনের বিরুদ্ধে যুতসই আন্দোলন গড়ে তোলা মুশকিল।

বিএনপি এই আন্দোলনের পক্ষে যতটা না যুক্তি খাড়া করতে পেরেছে, তার চেয়ে বেশি যুক্তি খাড়া করতে পেরেছে সুশীল সমাজ। থুক্কু, সুশীল বাটপাড় এবং মিডিয়ার একটি বড় অংশ।

মিডিয়ার বিভিন্ন প্রতিবেদন, সুশীল বাটপাড়দের টকশো ও বিভিন্ন ভাষ্যের মূল কথা হলো-

১. বর্তমান অবস্থার জন্য সরকার দায়ী ২. বর্তমান অবস্থার জন্য দুই দলই দায়ী ৩. সরকার বলা নেই কওয়া নেই স্বর্গীয় বিধান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করেছে, সে জন্যই এ সমস্যা ৪. শেখ হাসিনা না থাকলে সব সমস্যার সমাধান হবে ৫. নির্বাচন হবে, যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার হয়।

সমস্ত দায়দায়িত্ব সরকারের ওপর চাপালে জামায়াত-বিএনপির বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকে না। দুই দল দায়ী বললে দুটি বিপরীতধর্মী আদর্শের দলকে এবং হাসিনা-খালেদাকে একই পাল্লায় মাপা যায়। শেখ হাসিনা তখন আর বিশেষ মর্যাদা পান না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা নেই কওয়া নেই বাতিল করা হয়নি। রায় ঘোষণার পর এর বিরুদ্ধে রিট হয় এবং সে রিটে বিচারপতি খায়রুল হকের রায় বহাল রাখা হয়। সুশীল বাটপাড়রা একটি কথা প্রায়ই বলে– বিচারপতি রায়ে বলেছেন, দুইবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার হতে পারে। আসলে এটি তিনি মূল আদেশে বলেননি। সেটি ছিল পর্যবেক্ষণ, যা নির্দেশ নয়। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণ

পালনেও বাধ্যবাধকতা ছিল। সংসদ চাইলে তখনই তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

পঞ্চদশ সংশোধনীর সময় সংসদের একটি কমিটি বিভিন্ন পেশার মানুষজনের সঙ্গে ওই সংশোধনীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছে, সেখানে সবপন্থী মানুষজন ছিলেন। সেসব সভার কার্যবিবরণী দেখলে দেখা যাবে, অধিকাংশই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের পক্ষে বলেছেন। সবচেয়ে বড় কথা সরকার এই প্রথা বাতিল করেনি। আদালতে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল করা হয়েছে। এখন আপনারা কী আশা করেন সরকারী দলের নেত্রী আদালতের রায় মানবেন না? সুতরাং বলা নেই কওয়া নেই তা বাতিল করা হয়েছে বলে যাঁরা লিখছেন তারা মিথ্যা তথ্য দিয়ে জামায়াত-বিএনপির পক্ষে ওকালতি করছেন।

খালেদা জিয়া ও জামায়াত চাচ্ছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। তাদের বক্তব্য সংসদে বিল এনে তা বহাল করতে হবে। মনে হচ্ছে সংসদ সদস্যরা সব তার গৃহের পরিচারক-পরিচারিকা। বিল যদি আনতে হয় তাকে সংসদে এসে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিল আনতে হবে। এটি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নয়। বিএনপি সংসদে আসবে না, খালেদা জিয়া সংসদে আসবেন না। তিনি খালি হুকুম করবেন আর সবাইকে তা তামিল করতে হবে? অন্তত এই ঔদ্ধত্যের জন্যই বিল আনা উচিত নয়।

প্রথমে আমাদের ঠিক করতে হবে আমরা সংবিধান মানব কিনা। যদি বলি মানব না, তাহলে যা খুশি বলা ও করা যেতে পারে। যদি বলি মানব, তাহলে একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

খালেদা জিয়ার স্বামী পাকিস্তানী মানসের প্রতিনিধি লে. জেনারেল জিয়া প্রথমে সবার দিকে বন্দুক তাক করে বিভিন্ন বেআইনী ফরমান জারি করেছিলেন। পরে সেগুলো পঞ্চম সংশোধনীর মারফত সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর ঔদ্ধত্য এমন ছিল যে, ৩০ লাখ শহীদের রক্তে যে সংবিধান তৈরি হয়েছিল তার মূল চরিত্র তিনি বদল করেছিলেন। ভায়োলেন্সে ছিলেন তিনি বিশ্বাসী। তাঁর মতো বাংলাদেশের ক্ষতি তো কেউ করেনি। তিনি বাংলাদেশের মিত্র নন।

আমরা দীর্ঘদিন ওই বিকৃত সংবিধান মেনে চলেছি। দুই বুটঅলা বন্দুকধারী আক্ষরিক অর্থে সংবিধান ধর্ষণ করেছেন। শেখ হাসিনা সিভিল সমাজের বাংলাদেশপন্থী অংশ দল দীর্ঘদিন পঞ্চম সংশোধনী বাতিল চেয়েছেন। নিদেন পক্ষে ইনডেমনেটির বাতিল চেয়েছেন, যাতে বঙ্গবন্ধুর বিচার করা যায়। কারণ জিয়া খুনীদের পুনর্বাসন করেছিলেন। এদের সম্মানজনক চাকরি ও অন্যান্য সুবিধা দিয়েছিলেন। পরে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হলে সংসদে সেই ইনডেমনেটি বাতিল করেন। সুপ্রীমকোর্ট পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে। অর্থাৎ একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে।

৮ ডিসেম্বর, ২০১৩

এ দেশে কি সত্যিকারের বাঙালীরা বসবাস করে না?

এরিক প্রাইবেক জার্মান। নাজি সেনাবাহিনীতে ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এরিক ইতালির রোমে। ১৯৪৩ সালে রোমের আর্ডিটাইনে নাজি বাহিনী গণহত্যা চালায়। ৩৩৫ জন নিহত হয়, তার মধ্যে ৭৫ জন ছিলেন ইহুদী। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে এরিক ধরা পড়েন। কিন্তু ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দীদের শিবির থেকে পালাতে সক্ষম হন। এক ক্যাথলিক বিশপ তাঁকে ভ্যাটিকানের একটি ভ্রমণপাস দেন। আরও অনেকের মতো এরিক পালিয়ে যান আর্জেন্টিনায়।

লসএঞ্জেলেসের সাইমন ওয়েজেনথাল সেন্টার গত কয়েক দশক ধরে নাজি যুদ্ধাপরাধীদের খুঁজে বের করছে। যুদ্ধ শেষের ৫০ বছর পর ১৯৯৪ সালে সাইমন ওয়েজেনথাল সেন্টার আর্জেন্টিনায় এরিকের খোঁজ পায়। তাঁকে গ্রেফতার করে যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্য ১৯৯৬ সালে ইতালি পাঠানো হয়। এরিকের বয়স তখন ৮৩। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয় এরিক। তবে তাঁর বয়স ও অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে তাঁকে তাঁর আইনজীবীর বাসায় গৃহবন্দী করে রাখা হয়।

যুদ্ধাপরাধী এরিক এখন ১০০ বছর বয়সে মারা গেছেন। যেহেতু এরিক ক্যাথলিক, সেহেতু গির্জায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হওয়ার কথা। আর ভ্যাটিকান তো ক্যাথলিকদের সদর দফতর। কিন্তু, ভ্যাটিকান এখন বলছে, তারা গির্জায় অন্তে্যষ্টিক্রিয়া হতে দেবে না। চার্চ সাধারণত এরকম সিদ্ধান্ত নেয় না। ইতালিতে চার্চের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ কেউ করেনি।

এরিকের আইনজীবী পাওলো গিয়াচিনি ঘোষণা করেছেন, ঠিক আছে, এরিকের মরদেহ আর্জেন্টিনায় পাঠানো হবে। সেখানে তাঁর স্ত্রীর পাশে তাঁকে সমাহিত করা হবে। আর্জেন্টিনায় এরিক প্রায় ৫০ বছর বসবাস করেছেন। এখন আর্জেন্টিনার সরকার বলছে, না, যুদ্ধাপরাধীর মরদেহ আর্জেন্টিনায় আনা যাবে না।

গিয়াচিনি বলছেন, এরিকের সন্তানরা চান ক্যাথলিক মতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হোক। তাদের বাবা ছিলেন ক্যাথলিক, তাঁকে তো সম্মান দেখান উচিত। গিয়াচিনির দাবি, ক্যাথলিক মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এরিকের অধিকার। ওয়েজেনথাল সেন্টার বলছে, এই যুদ্ধাপরাধীর মৃতদেহ জার্মানিতে পাঠানো হোক। সেখানে তাঁকে দাহ করা যেতে পারে। হিটলারের মরদেহও দাহ করা হয়েছিল। কারণ, নাজিদের কোন চিহ্ন পৃথিবীতে রাখা যাবে না।

যুদ্ধাপরাধীদেরও দু'একজন ভক্ত থাকে। যেখানে এরিক মারা গেছেন সেখানে তারা ফুল নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিল। তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। ইউরোপে নিউ-নাজিদের রাজনীতির কোন অধিকার নেই।

এরিককৃত গণহত্যায় নিহত একজনের আত্মীয় বলছেন, ওই লোকটির মনে কোন করুণা ছিল না। সবচেয়ে ভাল হয় তাঁকে দাহ করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া এবং সেই ছাই কোথায় ছড়ানো হয়েছে তাও যেন গোপন থাকে। তাঁকে ভুলে যেতে হবে। তাঁর কথা কখনও উচ্চারণ করা যাবে না। রোমে তাঁকে সমাহিত করার অর্থ, নাজিবাদের চিহ্ন রাখা এবং নিউ-নাজিদের 'শ্রদ্ধা' জানানোর স্থান হবে সেটি। এটি হতে পারে না।

আরেকজন, যার শ্বশুর সেই গণহত্যায় নিহত হয়েছেন, বলেছেন, এই শহর কিভাবে তাঁর শত্রুর দেহকে আশ্রয় দেবে? এই ধরনের জঘন্য প্রাণীর আশ্রয়স্থল তো কোন শহর হতে পারে না।

১০০ বছরের যুদ্ধাপরাধী এরিক প্রাইবেকের মরদেহ এখন রোমের একটি মর্গে পড়ে আছে।

এরিক ছিলেন সামান্য একজন নাজি অফিসার। উচ্চমার্গের কেউ নয়। তাঁর আজ এ পরিণতি।

গোলাম আযম বাংলাদেশের একজন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দণ্ডিত হয়েছেন। তাঁর বয়স এরিকের থেকে কম। গোলাম আযম এ দেশে ৩০ লাখ মানুষের হত্যা, প্রায় ৬ লাখ নারী নির্যাতন, অগণতি মানুষকে আহত, এক কোটিরও বেশি মানুষের বাস্তু ত্যাগের জন্য দায়ী। এরিক পালিয়েছিলেন আর্জেন্টিনায়, গোলাম আযম পালিয়েছিলেন সৌদি আরবে। এরিককে আশ্রয় দিয়েছিল আর্জেন্টিনার সামরিক শাসকরা। গোলাম আযমকে পরে আশ্রয় দিয়েছিলেন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। সামরিক শাসকদের আমলে আর্জেন্টিনায় সুখেই ছিলেন এরিক, তারা থাকলে আর্জেন্টিনায়ই সমাহিত হতেন। কিন্তু, আর্জেন্টিনায় এখন গণতান্ত্রিক শাসন। যুদ্ধাপরাধীর স্থান সেখানে নেই। গোলাম আযম জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদের আমলে শুধু সুখে-শান্তিতে নয়, রাজনীতি করে বাংলাদেশের নাজি পার্টি জামায়াতকে শক্তিশালীও করেছেন। প্রকাশ্যে, দম্ভভরে। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি তার গণবিচার করায় জেনারেল জিয়ার স্ত্রী খালেদা জিয়া এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, গণআদালতের ২৪ জন উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা করেছিলেন। জেনারেল-পত্নীরা জেনারেলদের মতোই হয়, আচরণ করে, যারা এটি ভুলে যায় তারা মূর্খ এবং বেকুব দুটোই।

শেখ হাসিনার আমল সামরিক আমল নয়। তাই যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার হয়েছে। এ পর্যন্ত ঠিক আছে; তারপরই আর কিছু ঠিক নেই। এই ঠিক না

থাকাটা প্রমাণ করে আমরা বাংলাদেশকে এখনও সম্পূর্ণভাবে জাতিরাষ্ট্রে পরিণত করতে পারিনি; আমাদের মধ্যে দেশপ্রেমের ঘাটতি আছে, আমাদের মনের গহীন গভীরে এখনও পাকিস্তানীদের প্রতি মোহ জমা আছে, বঙ্গবন্ধুর বদলে কায়েদে আযমকে জাতির পিতা বলতে পারলে আমাদের কণ্ঠ খুলে যাবে, বাইরে বেশ মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা ভাব, ভেতরে হেজাবি [হেফাজত+জামায়াত+ বিএনপি]দের জন্য প্রীতি, হাড়ে হারামজাদা বলতে পারছি না, অনেকে ক্ষুব্ধ হবেন ভেবে, এই হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশীদের অবস্থা।

গোলাম আযমকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়নি করুণা করে। বিচারকরা করুণার আধার। যে বৃদ্ধদের/বৃদ্ধাদের গোলাম আযমের সহযোগিতায় হত্যা করা হয়েছিল তারা অবশ্য পাকিস্তানী গোলামের করুণা পায়নি। গোলাম আযমকে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যালে বাড়ির চেয়ে ভাল অবস্থায় রাখা হয়েছে। বাড়িতে এত ভালবাসা ও যত্ন এ বয়সে তিনি পেতেন কিনা সন্দেহ। ২৪ ঘণ্টা ডাক্তারি সেবা। বাড়ি থেকে প্রেরিত খাবার। প্রতিদিন ১৬টি খবরের কাগজ। শাহরিয়ার কবির এক প্রবন্ধে লিখেছেন, তাঁকে যখন জেলে নেয় এই গোলাম আযম ও খালেদার সরকার, তখন তাঁকে বিন্দুমাত্র করুণা করা হয়নি। পাকিস্তানী গোলামরা সানন্দে ঈদ করে, যুদ্ধাপরাধী হলেও। আসলে, বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী হওয়া খারাপ কিছু না!

এরিক কতজনকে হত্যা করেছে আর আবদুল আলীম? মুক্তিযোদ্ধাদের শরীরের চামড়া ছিলে নুন মাখাতেন আলীম। বাঘের খাঁচায় মুক্তিযোদ্ধাদের ঢুকিয়েছেন। গর্ভবতী হত্যায় সাহায্য করেছেন বলেও শুনেছি। সেই আবদুল আলীমকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়নি তার বাতের ব্যথার কারণে। তিনিও বহাল তবিয়তে আছেন গোলাম আযমের মতো হাসপাতালে। তাঁকে কি সুবিধা দেয়া হচ্ছে তা আমরা এখনও জানতে পারিনি। আলীম ছিলেন বিএনপির মন্ত্রী।

আমাদের মিডিয়া যারা এত শক্তিশালী যে তাদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা করা যাবে না। মোবাইল কোম্পানির মতো। তারা যা খুশি করতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর প্রসাদধন্য মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা, প্রধানমন্ত্রীর করুণায় টিভি চ্যানেল পাওয়া ব্যক্তিত্বরা, বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বলে যারা যখন তখন ডুকরে ওঠেন সেইসব মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে দাবিদার টিভির কর্তাব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে টিভিতে দেখিয়ে এসেছেন গোলাম আযম, আলীম বা কখনও কখনও সা.কা. চৌধুরী অশক্ত, নিজামী কারও কাঁধে ভর দেয়া ছাড়া সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না, হাত নেড়ে তাঁদের অভিনন্দন ও ভি-চিহ্ন দেখানো–ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে এবং আংশিক সফল হয়েছে যে, গোলাম আযমরা বৃদ্ধ, তারা অশক্ত, তাদের নিয়ে এত টানা হেঁচড়া কেন। তাঁরা যুদ্ধাপরাধ করে থাকতে পারেন, হয়ত করেছেন ভুলবশত এখন জামায়াত করেন, করতেই পারেন তাতে দোষের কি, তারা তো আওয়ামী

লীগ করেন না। আলীম মুক্তিযোদ্ধাদের চামড়া তুলে লবণ মাখিয়েছেন, মাখাতেই পারেন কারণ তারা তো ছিল আওয়ামীপন্থী, পাকিস্তানপন্থী নয়। পরে তিনি তো বিএনপি করেছেন। তাতে দোষ স্খলন হয় না? আমাদের অনেকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রতিটি চ্যানেলের সম্পাদক-মালিকরা এ কাজগুলো করেছেন। ইচ্ছে করেই করেছেন নিরপেক্ষতার নামে। পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে দেশপ্রেমের কারণে মিডিয়া এ ধরনের আচরণ করে না। টিভি/খবরের কাগজে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিভিন্ন আখ্যান, কর্মকাণ্ড প্রচার করেছে, কিন্তু কোন প্রতিবেদন কি দেখানো হয়েছে বা ছাপা হয়েছে এ বিষয়ে যে, দণ্ডিত হওয়ার পরও গোলাম আযম বা আলীম কি আরামে আছে ? বেআইনীভাবে [আইন দেখিয়ে] যে সুবিধা পাচ্ছে বা এতদিন দেয়া হয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের তা কেউ প্রচার করেনি। যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে এতদিনের সৃষ্ট 'সমবেদনা' যদি নষ্ট হয়ে যায় !

যুদ্ধাপরাধী এরিক এমন কোন নামকরা যুদ্ধাপরাধী নয়, অথচ কোন দেশে তাঁকে সমাহিত করতে দেয়া হচ্ছে না। কেননা, এইসব দেশের জনগণের দাবি– এদের দাহ করে মর্ত্যে যে এরা ছিল সে চিহ্ন মুছে ফেলা হোক। বাংলাদেশের মানুষ ও শাসকদের এখন একথা ভাবার সময় এসেছে। বিচারের রায়ের কপি পাওয়া যায়নি এ অজুহাতে সরকার হয়ত গোলাম আযমদের রায় কার্যকর করবে না। সরকারের ভেতর হেজাবিদের প্রতি সহানুভূতিশীলরা, অনেকের মতে, চাচ্ছেন যে, রায় কার্যকর না হোক। নির্বাচনের আগে এসব ঝামেলায় না যাওয়া ভাল। অন্যদিকে, আমজনতা মনে করে রায় কার্যকর করলে ভোটাধিক্যের সৃষ্টি হতে পারে। এ বিতর্কে নাই বা গেলাম। জীবনে একমাত্র সত্য মৃত্যু। এবং যে কোন সময় যে কোনখানে মৃত্যু। এই যে আমি, এখন এ লেখা লিখছি, লেখাটি ছাপা হলো কি না তা নাও দেখে যেতে পারি। গোলাম আযমদেরও মৃত্যু হবে। তখন কি হবে? যেহেতু যুদ্ধাপরাধ বিচারের পক্ষের সরকার, সেহেতু তাদের এ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। জেনারেল জিয়া/এরশাদ/খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকলে এ প্রশ্ন উঠত না। তারা পারলে এদের কবরে স্মৃতিসৌধ তৈরি করতে কসুর করবেন না। আমেরিকা এ সব বিবেচনা করে বিন লাদেনের মৃতদেহ পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। বিন লাদেন এখন বিস্মৃত। কিন্তু, তার মরদেহ পাকিস্তানে থাকলে এখন আজমীরের মতো মাজার শরিফ বানিয়ে ফেলা হতো। আমাদের রাজাকার ও রাজাকারপন্থী পার্টিগুলো কিন্তু এখন থেকেই প্ল্যান ছকে রেখেছে, নবীনগরে গোলাম আযমের মাজার হবে, পিরোজপুরে সাঈদীর আর সাঁথিয়ায় নিজামীর। রাউজানে সাকার স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ হবে। যাতে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের কাছে যুদ্ধাপরাধ কোন বিষয় বলে পরিগণিত না হয়। এবং এক দশক পর হজরত শাহ গোলাম আযম পাকিস্তানীর নামে উরস হবে। যেভাবে জিয়াউর রহমানের কবর

মাজারে পরিণত করা হয়েছে। এবং এখন খবরের কাগজ ও টিভি প্রতিবেদনে একে মাজার বলেও উল্লেখ করা হয় যদিও তা শরিয়তবিরোধী। এ গুলো হতে পারে, বাংলাদেশী তো। গোলাম আযমের প্রকাশ্য সমর্থনকারী যদি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হন তাহলে সাকার স্মৃতিস্তম্ভ হতে দোষ কি ! আর যাই হোক আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ তথাকথিত মওলানাদের আর যাই থাকুক ভ্যাটিকানের মওলানাদের মতো সাহস আর ধর্মবোধ নেই। তারা যে এরিকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অস্বীকৃতি জানিয়েছে তার কারণ নৈতিকতা, ধর্মবোধ ও মানবতা এবং সভ্যতা বোধ। একটা উপায় হতে পারে, যুদ্ধাপরাধীদের জন্য আলাদা ছোট গোরস্তান।

নিউ নাজিদের যাতে রবরবা না হয় সে কারণে এরিককে সমাহিত করতে কেউ রাজি নন। কারণ নিউ নাজিরা সেটিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জায়গা করে ফেলবে। আমাদের এখানেও আছে নিউ নাজিরা, যারা একত্রে ১৮ দল হিসেবে পরিচিত। এদের প্রধান বিএনপি, যার নেতারা প্রকাশ্যে যুদ্ধাপরাধ বিচারের বিরোধিতা করছেন। তাঁদের দণ্ডের বিরোধিতা করছেন। এদের নব্য রাজাকার সংক্ষেপে রাজাকারের দল বলা যেতে পারে। গণতন্ত্রের নামে মিডিয়া এই রাজাকারদের সমর্থন করছে, রাজনীতিবিদরা করছেন, সাধারণ মানুষ করছেন, সরকারও করছে [এর প্রমাণ গোলাম আযমদের সুবিধা দেয়া। বলা হয় সৌদি আরবের ভয়ে সরকার এ কাজ করছে। সৌদিরা শক্তিশালীকে বাবা ডাকে, একটু নরম হলে পায়ের নিচে রাখতে চায়। সৌদিদের কখনও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলতে শুনেছেন?] ইতালিতে ফ্যাসিবাদের জন্ম। সেই ইতালির মানুষরা কিন্তু ফ্যাসিবাদকে শুধু ছুঁড়ে ফেলা নয়, তার চিহ্নও রাখতে চায় না। আমরা জামায়াতকে রাখতে চাই, বিএনপিকে রাখতে চাই। বিএনপি যেন নির্বাচনে যায় সে জন্য সাধ্যসাধনা করি।

তারা যাতে জয়ী হয় সে প্রচার করি। যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থকরা তো দেশপ্রেমী হতে পারে না, রাজনীতিও করতে পারে না সভ্য দেশে। এখানে পারে। এখানেই সভ্যদের সঙ্গে, দেশপ্রেমীদের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশীদের ফারাক। এখানে বীরোত্তম সিদ্দিকী হয়ে যায় ব্রীজোত্তম সিদ্দিকী।

প্রবাসে যে সব বাঙালী আছেন ১৯৭১ সালে তারা জান প্রাণ দিয়ে দেশ মুক্ত করতে চেয়েছেন। সভ্য দেশে ছিলেন, সভ্যতা তাদের স্পর্শ করেছিল; তাই খুনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এখনও তারা সভ্য দেশে আছেন, তারা অন্তত ইউরোপ-আমেরিকায় এ প্রচার চালান, বাংলাদেশী যুদ্ধাপরাধী তো বটেই যারা তাদের সমর্থন করছে সে সব রাজনীতিক/বুদ্ধিজীবীরাও যুদ্ধাপরাধী; অতএব, তাদের ভিসা দেয়া বন্ধ হোক। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির লণ্ডন শাখা এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে ব্রিটেনে সাঈদীর প্রবেশ বন্ধ করেছিল। এই প্রতিবাদ প্রচার কিন্তু

কাজ দেবে। আমরা সবাই মিলে এখন যে ধারণার সৃষ্টি করছি [বিচার করেও, যুদ্ধাপরাধীর পক্ষেও এ দেশে রায় হয় বিচারের নামে] তাতে এ দেশ পৃথিবীর একমাত্র যুদ্ধাপরাধী সমর্থক দেশ হলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। দেশপ্রেম, গণতন্ত্র, নৈতিকতা কোন নিরিখে যুদ্ধাপরাধী ও যুদ্ধাপরাধী সমর্থকদের রাজনীতি করতে দেয়া যায় না। তাদের পক্ষে প্রচার চালানোও যায় না। বাংলাদেশে এ ভেদরেখা মুছে ফেলা হচ্ছে যা একটি অপরাধ।

ইতালিতে এরিকের পক্ষে কোন মিডিয়া নেই, কোন বিচারক নেই, গির্জা নেই, মানুষ নেই। কারণ সে এক 'জঘন্য প্রাণী' যার পৃথিবীতে থাকার অধিকার নেই। এ দেশে যুদ্ধাপরাধীর পক্ষে মিডিয়া আছে, বিচারক এবং বিচারকের করুণা আছে, মসজিদ আছে, মানুষও আছে।

এ দেশে গণতন্ত্রের নামে, নিরপেক্ষতার নামে যুদ্ধাপরাধী ও তাদের সমর্থকরা সমান স্পেস পায় তাদের বিরোধীদের সঙ্গে, সব খানে এবং এ কারণে কারও লজ্জাবোধ হয় না, ধর্মবোধ আহত হয় না। সাধারণ অপরাধী ও খুনীদের থেকেও যুদ্ধাপরাধীদের কর্মকাণ্ডকে হাল্কা করে দেখান হয়। তাদের পক্ষে বলার জন্য নানা কৌশলে টিভিতে টকশোর অনুষ্ঠান করা হয়, কাগজে নিবন্ধ ছাপা হয়। এ দেশটি কি আর বাংলাদেশ আছে? এ দেশে কি মানুষের বাচ্চারা বসবাস করে?

১৯ অক্টোবর, ২০১৩

বাংলাদেশ দখল করতে হবে

পাকিস্তানের সাংসদ, মন্ত্রী, ক্রিকেট খেলোয়াড় ইমরান খান ও জামায়াতে ইসলামী আমাদের একটি বড় ধরনের উপকার করেছে। গত চল্লিশ বছর আমরা বলে এসেছি এবং নির্মূল কমিটি হওয়ার পর আরও জোরেশোরে যে জামায়াত পাকিস্তানপন্থী একটি অপরাধী সংগঠন এবং মানবতাবিরোধী সংগঠন। এর নেতারা গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটের সঙ্গে জড়িত। জিয়াউর রহমান তাদের সসম্মানে পুনর্বাসিত করে জাতির সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন, তিনি একজন অপরাধী। জামায়াত সব সময় দাবি করেছে, তারা এ ভূখণ্ডের অধিবাসী। হ্যাঁ, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় অবিশ্বাস করে না। ১৯৭১ সালে যে গণহত্যা ও গণধর্ষণ হয়েছে তার সঙ্গে তারা জড়িত নয়। শুধু তাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তারা একটি আদর্শবাদী দল। আর ১৯৭১ সালে যেহেতু তারা কোনকিছুতে অংশগ্রহণ করেনি সুতরাং, তারা কেন অনুতপ্ত হবে। তাদের এ বক্তব্য অনেকে বিশ্বাস করেছে, বিশেষ করে বাচ্চা জামায়াতী ও বিএনপির ছেলেবুড়ো সবাই এবং তাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ এক পয়সা দু'পয়সার ১৬টি দল।

কসাই কাদেরের ফাঁসিতে বিএনপি-জামায়াত নেতাকর্মীরা দিলে খুব চোট পেয়েছেন। তাদের হৃদয়ের ব্যথা উপশম করতে তারা ঢাকাসহ সারাদেশে নতুনভাবে আবার মানুষ হত্যা ও পোড়ানো শুরু করেছে। তারা গাড়ি পোড়াচ্ছে, বাস পোড়াচ্ছে। তাদের আক্রোশ এখন এত ভয়ঙ্কর যে, তারা পুরনো বৃক্ষ কেটে ফেলছে।

কসাই কাদেরের ফাঁসি কার্যকর হওয়ার পর জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমির মকবুল আহমেদ আরও হত্যাকাণ্ডের হুমকি দিয়ে বলেছেন, 'শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার প্রতি ফোঁটা রক্ত তাঁর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের প্রত্যেকের জন্য অভিশাপ বয়ে আনবে। তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাদের করুণ পরিণতি দেশবাসী অতি শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করবে। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণ এ হত্যার বদলা নেবে।' [*সংগ্রাম*, *২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২০*]

কসাই কাদের যাদের হত্যা করেছে সেই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কাদেরকে তারা এক সারিতে ফেলে ঘোষণা করেছে। সারাদেশে শনিবার তারা 'শহীদ বুদ্ধিজীবী

দিবস, শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাসহ সকল শহীদের জন্য দোয়া অনুষ্ঠান' করবে। [ঐ]

কসাই কাদেরের রায় কার্যকর হওয়ার পর তাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ১৯৭১ সালের 'জখম' বাংলাদেশ আবার উন্মুক্ত করেছে। কাদের ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ছিল দেখে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে অনেকের আদর্শ ক্রিকেটার ইমরান খান একই ধরনের কথা বলেছেন। কয়েকটি শহরে তার জন্য জানাজা পড়া হয়েছে। পাকিস্তান জামায়াতের প্রধান বলেছেন, 'কাদের তো আমাদেরই [অর্থাৎ পাকিস্তানের] লোক। তাকে হত্যা করা হয়েছে। তার জন্য বাংলাদেশের আরেকটি দল লড়াই করছে [অর্থাৎ বিএনপি]। বাংলাদেশে এখন অস্থিতিশীল অবস্থা। এ সুযোগে পাকিস্তানের উচিত হবে বদলা নেয়া। বাংলাদেশকে দখল করে নেয়া। পাকিস্তানের সিনেটও শোকপ্রস্তাব করেছে।

এর আগে, কসাই কাদেরকে রক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তুরস্কের প্রেসিডেন্টও আবদার করেছেন। পাকিস্তানের অনেক রাজনীতিবিদ কাদের মোল্লার আইডেনটিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জামায়াত থেকেও অবশ্য বলা হয়েছিল, এই কাদের সেই কাদের নয়।

জামায়াতে ইসলাম যে পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর বাংলাদেশ শাখা তা জামায়াতের পাকি আমিরই বলেছেন। তিনি যেমন কাদেরকে পাকিস্তানের লোক বলছেন, তেমনি জামায়াতের লোকও বলছেন। তার জন্য গায়েবানা জানাজাও পড়ানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলেন, পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের জন্য ফাঁসি দেয়া হয়েছে তখন জামায়াতীরা যে পাকিস্তানী বাংলাভাষী তাও পরিষ্কার করা হয়েছে। আমরা জানি পাকিস্তানী হলেই অনবরত মিথ্যা বলতে হয়, জামায়াতী হলেও; এখনও সে ঐতিহ্য তারা বজায় রেখেছে।

কসাই কাদেররা, পাকিরা এখন বলে, পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের কারণে তার ফাঁসি হয়েছে সেটি ১০০ ভাগ মিথ্যা। বিএনপি বার বার 'স্বচ্ছতা', 'আন্তর্জাতিক মান' ইত্যাদি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। সব সময় এবং এখনও বলে আসছে। সরকার বিরোধীদের আন্দোলন দমনের জন্য নিপীড়ন চালাচ্ছে। তাদের সঙ্গে দেশের ও বিদেশের কিছু মিডিয়া একই সুরে সুর মিলিয়েছে। এর একটি কারণ যে টাকা, তা বুঝতে জ্ঞানী হওয়ার দরকার হয় না। বাংলাদেশে গণহত্যার বিচার একটি বিষয় তুলে ধরেছে। বর্তমান সময়ে আদর্শ একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। অর্থই হচ্ছে মূল আদর্শ। এ সব প্রতিবেদন, বিবৃতিতে সুশীল সমাজ, তরুণ ও অনেকে যে প্রভাবিত হন না, তা বলা যাবে না।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি হচ্ছে গণহত্যার রাজনীতিকরণ। গণহত্যা যখন

রাজনীতির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন গণহত্যা তার প্রকৃত অর্থ হারায়। বিষয়টি লঘু হয়ে দাঁড়ায়। লঘু হলে দণ্ড লঘু হতে পারে, দণ্ড নাও হতে পারে। গণহত্যা না থাকলে ১৯৭১ থাকে না। ১৯৭১ না থাকলে জামায়াতকে কিভাবে দোষী করা যায়? ১৯৭১ না থাকলে পাকিস্তানে একজন কাদের বা সাকাচৌ তো পাকিস্তানী হয়েই থাকে, তাহলে তার বিচার হবে কেন?

সম্প্রতি হাইডেলবার্গে বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে। এখানে যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন তাঁরা দ্রাবিড় নন, ককেশীয়। আমাদের সুশীল বাটপাড়রা বা রাজনৈতিক নেতারা দ্রাবিড়দের থেকে ককেশীয়দের কথায় বেশি গুরুত্ব দেন। মফিজুল হক প্রমুখের সম্পাদনায় সম্মেলনের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ব্রাসেলসের সাউথ এশিয়া ডেমোক্র্যাটিক ফোরামের পরিচালক পাওলো কাসাকা একটি প্রবন্ধে এ বিষয়টি আরও বিস্ত ারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের গণহত্যায় নিহতের সংখ্যাটি এখন স্বীকৃত। কেউ এ নিয়ে তেমন কথা তোলেনি। বিষয়টি লঘু করার জন্য বিরোধীরা যা বলেছে তাতে সহায়তা করেছে পাকিস্তান, আমেরিকা ও চীন; যাদের তিনি `well well determined quarters' বলেছেন। এখন এটি বেশ চলতি হয়ে উঠছে এবং ২০১০ সালের পর এটি পরিণত হচ্ছে একটি 'Vast movement of dinial'-এ। বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ পড়ছে এবং যারা গণহত্যা চালিয়েছে তারা 'violent action-এ যাচ্ছে। তাদের যুক্তি তিনটি-

১. আদালতের লক্ষ্য রাজনৈতিক, কেননা যারা অভিযুক্ত তারা রাজনৈতিক দলের সদস্য। [লক্ষ্য করবেন বিবিসি, আল জাজিরাসহ সব আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে অপরাধীদের রাজনৈতিক দলের সদস্য অথবা বিরোধী ইসলামী নেতা হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে]।

২. গণহত্যার সংখ্যা, গণহত্যার উদ্দেশ্য, সংঘাতের প্রকৃতি এ সবই কিন্তু এতদিন ছিল 'বিষয় established'. এখন এগুলোকেই বিতর্কিত করে তোলা হচ্ছে। [আমাদের অধিকাংশ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় টকশোতে প্রতিষ্ঠিত সত্যকে বিতর্কিত করে তোলার জন্য জামায়াত-বিএনপিপন্থীদের নিয়ে আসা হয়। এর একটি উদ্দেশ্য তাদের পলিটিক্যাল স্পেস করে দেয়া। দুই, গণহত্যাকে লঘু করে তোলা]।

৩. এত বছর পর এ ধরনের বিচার সমীচীন নয়।

পাওলো লিখেছেন, ২ ও ৩ নম্বর যুক্তি সব জেনোসাইড রিভিলিনিস্টরাই দেয়। হলোকাস্টের বিরুদ্ধে যারা বলে তাদের যুক্তিও এরকম। তবে প্রথম যুক্তিটি একটু ভিন্ন ধরনের।

এই ভিন্নতার কারণ হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তন। হলোকাস্ট যারা ঘটিয়েছে তাদের ক্ষমতায় আসতে দেয়া হয়নি। বাংলাদেশে গণহত্যাকারীরা শুধু ক্ষমতায় আসেনি, একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। [উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, মানবতাবিরোধী অপরাধী মীর কাশিম আলী মার্কিন এক লবিস্ট ফার্মকে প্রথম কিস্তিতে ২৫০ কোটি ডলার দিয়েছে। এটি শুধু একটি কিস্তির হিসাব]। এ কারণে, তাদের অতীত তদন্ত করতে গেলে বলা হচ্ছে বিরোধীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়াটিই রাজনৈতিক। পাওলো জোরাল ভাষায় জানাচ্ছেন, কূটনৈতিকভাবে, বিরুদ্ধ মিডিয়া ও উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের সখ্যের মাধ্যমে ভয়ঙ্কর একটি প্রচারণা চালাচ্ছে। [This argument was supported in an overwhelming diplomatic campaign, other than the direct pressure of states, a bruttac publicity campaign was done through opposition friendly media and certain high-level associations]

পাওলো এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইকোনোমিস্ট' এবং হিউম্যান রাইটসের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরাও দেখেছি প্রায় প্রতিসপ্তাহে ইকোনোমিস্ট শেখ হাসিনা, তাঁর সরকার ও যুদ্ধাপরাধ নিয়ে বিকৃত সব প্রতিবেদন ছাপাচ্ছে। হিউম্যান রাইটস বিবৃতি দিচ্ছে- পাওলো বলছেন, বিএনপির এক নেতার বিবৃতিকে অবলম্বন করে রাজনীতির সঙ্গে মানবাধিকার মিশিয়ে, তার পর অন্যদের একই কারণে অভিযুক্ত করছে। তাদের একটি প্রেস রিলিজের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি-

Bangladesh Upgrade War Crimes Law Failure to Meet International Standards could undermind credibility of Trials for 1971 Atrocities.' লক্ষ্য করুন গণহত্যা বা জেনোসাইড হয়ে গেল এ্যাট্রোসিটিস। যেমনি ২৫ মার্চ মধ্যরাতের গণহত্যা বাংলাদেশে অনেকে প্রবল পিটুনি বা গণ্ডগোল বলে উল্লেখ করেন। পাওলো লিখেছেন, 'That an organisation which was supposed to fight impunity and to act independently on behalf of human rights does exactly the opposite in perhaps the biggest drama of our present times.'

একইভাবে আমাদের দেশেও গণহত্যার রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে এ কারণে যাতে বিএনপি-জামায়াতের রাজনৈতিক সুবিধা হয়। লক্ষ্য করবেন, একদল সুশীল বাটপাড় ও সুশীল সংস্থা যেমন সুজন ইত্যাদি প্রায় নির্বাচন নিয়ে আমাদের সবক দেয় যেন আমরা নাবালক। এই নির্বাচন যে তত্ত্বাবধায়কের নয়, এটি আদর্শগত

হয়ে দাঁড়িয়েছে এটি তারা উল্লেখ করেন না। তত্ত্বাবধায়ক সুপ্রীমকোর্ট বাতিল করেছে, তা আর কখনও সংবিধানে আনা যাবে না এটি কি তারা বোঝেন না? বোঝেন। নাহলে বিদেশী পয়সায় সংস্থা [এনজিও] চালান কিভাবে? আন্দোলন ও সন্ত্রাসের তারা পার্থক্য বোঝেন না? শিশু নয় যে তারা নাক টিপলে দুধ বের হবে। এই যে গত এক মাসে জামায়াত-বিএনপি ২০০ লোক হত্যা করল, পুড়িয়ে মারল, কত পরিবারের সর্বনাশ করল, একজনও প্রতিবাদ জানিয়েছে। এত যে মানবাধিকার সংস্থা, একজনও প্রতিবাদ জানিয়েছে? জানায়নি। বরং, তারা 'একদলীয় নির্বাচন' 'গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর' ইত্যাদি বলে পত্রিকা ভরে ফেলেছেন, টিভিতে আর্তনাদ করেছেন। লক্ষ্য একই- যুদ্ধাপরাধী ও তার সমর্থকদের স্পেস করে দেয়া। এ দেশে কেউ কখনও এ সব উচ্চকণ্ঠ সুশীল বাটপাড়কে জিজ্ঞেস করেননি, যুদ্ধাপরাধী ও তার সমর্থকরা নির্বাচনে না এলে ক্ষতি কী? গণতন্ত্র কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়? আসলে ওই যে একমাত্র বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমতায় আনা হয়েছে, আর্থিক ভিত্তি দেয়া হয়েছে। এরা তার বেনেফিশিয়ারি। প্রভুর জন্য তাদের হা-হুতাশ করতেই হয়।

পাকিস্তান সরকার এই একই প্রক্রিয়ায় গণহত্যার রাজনীতিকরণ করতে চাচ্ছে। কারণ তারা এর জন্য দায়ী। এই মুসলিম লীগ [যারা এখন ক্ষমতাসীন] ও জামায়াতই তো পাকিস্তানী সেনাদের হয়ে গণহত্যা চালায়। কাদের মোল্লা কেন কসাই কাদের মোল্লা তার কারণ কি তারা জানে না? পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতকে তলব করে প্রতিবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বলা উচিত ছিল কাদের মোল্লাদের যেহেতু তারা তাদের দেশের নাগরিক মনে করে সুতরাং, তাদের বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে নিয়ে যাক। বাংলাদেশের মানুষের এখন সিদ্ধান্তে আসা উচিত, পাকিস্তানীদের এখানে রাজনৈতিক দল করতে দেয়া উচিত কিনা? পাকিস্তানীদের এখানে ভোটাধিকার দেয়া উচিত কিনা? এ কথা আজ পরিষ্কারভাবে সবাইকে জানানো উচিত যে, জামায়াতকে যে সমর্থন করবে, সে পাকিস্তানকেই সমর্থন করছে।

পাকিস্তানীরা বলছে [সরকার] যে, কসাই কাদেরের ফাঁসি জুডিসিয়াল মার্ডার। এরা কখনও বলার সাহস রাখে না যে, ভুট্টোর ফাঁসি ছিল জুডিসিয়াল মার্ডার। কারণ, সেটি সেনাবাহিনী করেছিল। তারা জানে যে, সেনারা তাদের বেয়নেটের ওপর বসিয়ে রাখবে। বাংলাদেশ তো তা করতে পারবে না। কারণ, সেখানে তাদের মানুষজনও প্রচুর।

কোন্ জুডিসিয়াল মার্ডার? কারণ, একজন বিরোধী 'ইসলামী' নেতা হিসেবে তাকে হেনস্থা করা হয়েছে। পাকিস্তান সমর্থন রাজনীতির অংশ। কিন্তু আপনারা সবাই জানেন, কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ছিল তাতে পাকিস্তানের

প্রতি আনুগত্য নামে কোন অভিযোগ ছিল না। কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো একবার বিবেচনা করে দেখুন। ৫ এপ্রিল ১৯৭১ সালে কলেজছাত্র পল্লবকে দু'দিন মিরপুরে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল কাদের, তারপর হত্যা করা হয়েছিল। এ অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে সন্দেহাতীতভাবে। ২৭ মার্চ কাদের ও তার বিহারী সহযোগীরা কবি মেহেরুননেসার বাড়িতে ঢুকে তাঁকে, তাঁর মা ও দুই ভাইকে হত্যা করে। মেহেরুননেসার মাথা কেটে ঝুলিয়ে রাখে। এই অভিযোগও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। ২৯ মার্চ পয়গামের সাংবাদিক খন্দকার আবু তালেবকে নিয়ে যাওয়া হয় মিরপুরের জল্লাদখানায়। আবু তালেবের মেয়ে জানিয়েছেন, কোরবানির গরুর মতো তালেবকে জবাই করে মাংসগুলো টুকরো টুকরো করে উল্লাসে তারা মেতে ওঠে। এই অভিযোগও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় কাদের মিরপুরের হযরত আলী লস্কর ও তাঁর পরিবারের পাঁচ সদস্যকে হত্যা করে ও ১১ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে। এই অভিযোগও প্রমাণিত। ২৪ এপ্রিল মিরপুরে আলোকদী গ্রামে ৩৪৪ জনকে নির্যাতন করে খুন করে। মামা বাহিনীর শহীদুল হক মামা জানিয়েছেন, আজলা ভরে মানুষের চোখ তিনি সমাহিত করেছেন। এই অভিযোগও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। প্রমাণিত হয়নি ঘাটের চরের গণহত্যায় কাদেরের ইনভলভমেন্ট।

সুপ্রীমকোর্ট সব অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে বিবেচনা করেছে এবং সবগুলোর জন্যই সর্বোচ্চ সাজা প্রাপ্য বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু একজনকে তো বার বার ফাঁসি দেয়া যায় না সেজন্য একটি অভিযোগের কারণেই ফাঁসির রায় বহাল রেখেছে। এখানে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের কোন প্রশ্নই আসেনি। একজনকে খুন করলে ফাঁসি হতে পারে আর ৩৫৫ জনকে খুন করলে ফাঁসি হবে না এটি কী ধরনের লজিক? যে পাকিস্তান জুডিসিয়াল মার্ডারের কথা বলছে সেই পাকিস্তানে হরদম 'পঞ্চায়েত' বসিয়ে মানুষজকে খুন করা হচ্ছে কোন বিচার না করেই।

অর্থাৎ পাকিস্তান সরকার যা বলেছে তা মিথ্যা। একই ধরনের মিথ্যাচার করছে জামায়াত এবং হ্যাঁ, আপনাদের কষ্ট লাগতে পারে বিশেষ করে বিএনপির এ্যাপোলজিস্টদের। যে বিএনপিও একইভাবে মিথ্যাচার করছে এবং এ্যাপোলজিস্টরা 'প্রধান বিরোধী দল' বলে তাদের রাজনৈতিক স্পেস দেয়ার চেষ্টা করছে।

পাকিস্তানীদের প্রতিক্রিয়ায় খুব আনন্দিত হয়েছি। এক. তারা যা বলছে তার সঙ্গে জামায়াত ও বিএনপির বক্তব্য ও অবস্থানের মিল আছে। দুই. ১৯৭১ সালের পরাজয়ের বেদনা জামায়াত, মুসলিম লীগ বা পাকিস্তানী এসটাবলিশমেন্ট এখনও ভুলতে পারেনি। একইভাবে বাংলাদেশের জামায়াত ও বিএনপি ও সেই

'হিউমিলিশিয়েন' বা পরাজয়ের খাদ ভুলতে পারেনি এবং সেই একই কারণে দুটি দল মানবতাবিরোধী অপরাধীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

আমরা জামায়াতকে মানবতাবিরোধী অপরাধীর দল বলি বা যুদ্ধাপরাধীদের [চলতি জনপ্রিয় শব্দ] দল বলি। কিন্তু বিএনপিকে বলি না। গণজাগরণ মঞ্চ যা নিয়ে সবাই আশাবাদী তারা জামায়াতের নাম ধরে স্লোগান দেয় বটে; কিন্তু বিএনপির বিরুদ্ধে চুপ। আমাদের বন্ধুরা, একই ফ্যাদর্শের বন্ধুরাও অবলীলাক্রমে জামায়াতকে গালাগাল করেন বিএনপির কথা এলেই নিশ্চুপ। এর কয়েকটি কারণ আছে বলে আমার মনে হয়।

এক. জামায়াত ১৯৭১ সালে গণহত্যা চালিয়েছে, এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। সুতরাং জামায়াতের বিরুদ্ধে সবাই বলে, নিজে বললে অসুবিধা নেই। তা ছাড়া প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত হওয়া যায়।

দুই. বিএনপি আওয়ামী লীগবিরোধীদের সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম। জিয়াউর রহমান থেকে শুরু করে তারেক রহমান পর্যন্ত সব সময় বিএনপি তাদের সমর্থকদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ধনী বানিয়েছে। ব্যাংক, বীমা, মিডিয়া অনেক কিছু তারা নিয়ন্ত্রণ করে। বিপরীত মতাদর্শের অনেকে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছেন, ব্যবসা করেছেন। যেমন এই আমলে আওয়ামী লীগের এমপি, মন্ত্রী ও নেতারা প্রায় ক্ষেত্রে বিএনপির মানুষজনকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছে, শোনা যায় অর্থের বিনিময়ে। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে স্লোগান দিলেও এ ধরনের সম্পর্ক অটুট। সেজন্য বিএনপিকে কোন কারণে তারা অভিযুক্ত করতে চায় না।

তিন. আওয়ামী লীগের মধ্যে একটি গ্রাম্য মোড়লী ভাব আছে। গ্রামের সালিশীর মাতব্বরের মতো। ভাবটা এ রকম এসো হে, ঝগড়া-ফ্যাসাদ হয়েছে, আচ্ছা মিটমাট করে দিচ্ছি। তার পর সালিশী শেষে পান চিবুতে চিবুতে ঘরে ফেরা। বিএনপি কিন্তু তা নয়। তারা আমেরিকার মতো। কে কখন কী বলেছে, কী করেছে তারা তা রেকর্ড করে রাখে এবং সময়মতো শোধ নেয়। যেমন, নাজমুল হুদা ১৯৯১ সালে মন্ত্রী হয়েই শাহরিয়ার কবিরকে চাকরিচ্যুত করে কেননা, বিচিত্রার শাহাদাত চৌধুরী ও অন্যরা যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর বনাবনি হয়নি। নাজমুল হুদা কোর্টকাছারি, প্রতিবাদ কোন কিছুই গ্রাহ্য করেননি। আমি অনেকবার ভেবেছি ২০০২ সালে কেন খালেদা-নিজামী আমাকে শাহরিয়ার কবির বা সাবের হোসেন চৌধুরীকে গ্রেফতার করল? পরে মনে হলো, ২০০১ সালের নির্বাচনে যে প্রবল রকম কারচুপি করেছে সেনাবাহিনী, এ নিয়ে আমি এবং শাহরিয়ার কবির প্রথম বিবৃতি দেয়ার উদ্যোগ নিই। এর আগে তারা যে এথনিক ক্লিনজিং করছিল তার প্রতিবাদের উদ্যোগও আমরা এবং নির্মূল কমিটি নিয়েছিল।

বিএনপি-জামায়াত তা ভোলেনি। এ ছাড়া, আমরা তো সব সময় জামায়াতবিরোধিতা করেছিও। সাবের ছিলেন আওয়ামী লীগের উদীয়মান নেতা, ভাল ইমেজের, যার কারণে মির্জা আব্বাস সুবিধা করতে পারছিলেন না। মির্জার সুবিধার জন্য সাবেরকেও হেনস্থা করা দরকার ছিল। তাই এক সঙ্গে আমাদের গ্রেফতার করেছিল। আওয়ামী লীগ এসব কখনও মনে রাখে না বরং পারলে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক করে এবং এখনও করছে। খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, সংবাদকর্মীরা কখনও খালেদা জিয়াকে কোন প্রশ্ন করার সাহস রাখে না।

চার. অনেকের ধারণা, জামায়াত-বিএনপিকে আলাদা করতে পারলে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সুবিধা হয়। এটি যারা বলে তাদের মূর্খ বলব না, কারণ, আমরা কেউ-ই মূর্খ নই, তবে জ্ঞানপাপী বটে। এ তত্ত্বের ধারকরাও একদিক থেকে বিএনপি এ্যাপোলজিস্ট। বিএনপি-জামায়াত আলাদা হতে পারে না আদর্শগত কারণে, এখন তো আরও পারবে না, কারণ তারা একত্রে না থাকলে অচিরেই তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। একজন জামায়াতী কখনও ১৪ দলীয় কাউকে বা আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে না। মৃত্যু হলেও। এটি তাদের কমিটমেন্ট, যে কমিটমেন্ট এ আমলের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে নেই। তবে মূল কারণ, পেশী এবং অর্থের কারণে বিএনপির বিরুদ্ধে সরাসরি কেউ বলতে চায় না এবং যেহেতু বড়লোক ও মধ্যবিত্তরা অনেকে বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে যুক্ত নানা কারণে, তারা বিএনপির বিরুদ্ধে কিছু বলতে বিব্রতবোধ করেন। সত্যের মুখোমুখি হওয়া আসলেই কঠিন।

জামায়াতের নেতৃত্বে যদি মানবতাবিরোধী অপরাধীরা থেকে থাকে এবং সে কারণে তাদের যুদ্ধাপরাধীদের দল বা মানবতাবিরোধী অপরাধীর দল বলি, তাহলে একই অভিধায় বিএনপিকেও ভূষিত করতে হবে। বিএনপির বড় নেতা, স্থায়ী কমিটির সদস্য সাকাচৌ এখন অভিযুক্ত। বিএনপির এক সময়ের প্রভাবশালী মন্ত্রী ও নেতা এখন অভিযুক্ত। তা হলে?

বিএনপি যেভাবে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের সমর্থন করেছে সে উদাহরণ পৃথিবীতে বিরল। এ ধরনের অনেক বিরল ঘটনা ঘটিয়েছে বিএনপি। যেমন, বেতারবার্তা পাঠকারী একজন তাদের স্বাধীনতার ঘোষক। এটি নাকি 'মুক্তিযোদ্ধাদের দল।' পৃথিবীতে এমন উদাহরণ নেই যে একজন নাকি পার্টি করে আর বাইরে বলে সে গণতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট। পরাজিত এবং দেশবিরোধী শক্তি/দলকে ক্ষমতায় এনে বসানোর নজিরও পৃথিবীতে নেই। যে আমেরিকা তাদের সমর্থক তারাও নিজেদের দেশে এ ধরনের দলকে রাজনীতি করতে দিত না।

বিএনপি-জামায়াতের আদর্শগত মিলটা কোথায়? জেনারেল জিয়া যখন

ক্ষমতায় আসেন তখন বেছে বেছে কেন শুধু মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকগুলো নষ্ট করলেন সে প্রশ্ন কেউ করেন না এবং করলেও উত্তর দেন না।

জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে প্রথম যে কাজটি করেন, তা হলো জেলহত্যা তদন্ত কমিটি বাতিল। মোশতাক ৫ নবেম্বর জেলহত্যা তদন্ত কমিটি করেছিলেন। জিয়ার চাপে পড়ে ৯ তারিখ সে কমিটি বাতিল করা হলো কেন? হয় তিনি এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন অথবা যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের রক্ষা করা যা পরোক্ষভাবে নিজেকে জড়িত করা।

১৯৭৬ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত জিয়ার মন্ত্রিসভায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের ৩১ জন ছিলেন দলছুট। এই দলছুটদের মধ্যে ১৯ জন ছিলেন বাংলাদেশবিরোধী অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশের বেশি।

১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে এক সামরিক ফরমানের মাধ্যমে জিয়া সংবিধানের ৬৬ ধারার একটি উপধারা ও ১২২ ধারা বিলুপ্ত করান, যার ফলে পাকিস্তানী দালালরা ভোটার হওয়ার সুযোগ পেল। ৩৮ ধারায় সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক দলসমূহের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯৭৬ সালের মে মাসে তা বাতিল করা হয় যাতে জামায়াত, মুসলিম লীগ ইত্যাদি রাজনীতি করার সুযোগ পায় এবং পাকিস্তানী মানস বিস্তৃত করতে পারে।

সংবিধানের মূল উপাদানগুলো তিনি বাতিল করেন। বঙ্গবন্ধুর খুনীদের শুধু ইনডেমনিটি নয়, বড় পদ দিয়ে বিদেশ পাঠান। বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জড়িত না থাকলে এটি কেন করা হবে? তিনিই ত্রাস রাজাকার আলবদরদের মন্ত্রী করলেন।

আজ প্রায়ই একটি কথা বলা হয়, খালেদা-নিজামীর আসন থেকে যে, মুক্তিযুদ্ধপন্থী সবার হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে যুদ্ধাপরাধীর গাড়িতে দেশের পতাকা উড়ছে দেখে। হৃদয় ভেঙ্গে গেলেও জোরালো প্রতিবাদ কোন সুজন সুশীল বা প্রগতিশীল/মুক্তিযুদ্ধপন্থীরা করেননি। কিন্তু খালেদাকে দোষী করা কেন? ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমান প্রথম আলবদর, রাজাকারদের গাড়িতে, বাড়িতে পতাকা তুলে দেন। এ কথা আমরা বলা দূরের কথা, স্মরণ করতেও চাই না। কারণ, আমাদের অনেকেই তা সমর্থন করেছিল।

জিয়াউর রহমান যা করেছিলেন তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তিনি বীতরাগ ছিলেন। এর কারণ, তিনি বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। পাকিস্তানী সংস্কৃতিতে মানুষ, যিনি বাংলা প্রায় লিখতে পারতেন না তাঁকে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দিলে তাঁর কেমন লাগে? তখনকার নেতৃত্ব এটি বুঝেছিলেন দেখে তাঁকে একজন সেক্টর কমান্ডারও করেননি। এমনকি বাংলাদেশে সেনাপ্রধানও করতে চাননি। জিয়া তাতে আরও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ঐ ক্রোধের ফল বিএনপি। আর ভালবাসার ফল স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে আদর্শগত ঐক্য।

বেগম জিয়া স্বামীর আদর্শই শুধু অনুসরণ করেছেন। তিনি এই কারণে যাঁরা গোলাম আযমের বিচার চেয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করেছেন। ২০০১ সালে জামায়াতের সঙ্গে নিজের দলকে এমনভাবে মিলিত হয়েছিল যে, তাঁর পুত্র তারেক মোল্লাকে বলেছিলেন, জামায়াত একই বৃন্তে দুটি ফুল। সুতরাং জামায়াতকে লাঞ্চিং ব্যাগ করব বিএনপিকেও নয়- তা শুধু এক ধরনের ফ্যালাসি নয়, সুবিধাবাদ এবং বিএনপিকে রাজনৈতিক স্পেস দেয়ার প্রচেষ্টা মাত্র।

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার শুরু হওয়া মাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'আন্দোলন' করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিএনপি নেতৃবৃন্দ বুঝেছিলেন, এই ট্রাইব্যুনাল দীর্ঘস্থায়ী হলে তাদের অনেককেও অভিযুক্ত হতে হবে। জামায়াতের অনেক নেতা দণ্ডিত হবেন। জামায়াত শুধু দুর্বল নয়, ঘৃণিত দল হিসেবে পরিগণিত হবে। তা হলে বিএনপির রাজনৈতিক সুবিধা ক্ষুণ্ন হবে। আর জামায়াত তো অভিযুক্ত। তারা ১৯৭১ সালের মতো হত্যা লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ করবে তাতো জানা কথাই। সুতরাং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিষয়টির যাতে রাজনীতিকরণ করা যায়, এর গুরুত্ব যাতে কমে যায় এবং এক ধরনের 'আন্দোলনের' ঢেউ যদি তোলা যায় তা হলে মানুষ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেবে না। যতই অপরাধীদের রায় দেয়া হতে লাগল বা অন্য কথায় ট্রাইব্যুনালের গতি বাড়ল ততই বিএনপি-জামায়াতের 'আন্দোলনের' তীব্রতা বাড়তে লাগল।

বিএনপি কি জানে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর সংবিধানে আনা যাবে না। বিলক্ষণ জানে। কারণ দলটির নেতৃত্বে অনেক আইনজীবী আছেন। সুতরাং, যা আনা যাবে না তা নিয়ে কেন আন্দোলন করছেন। খুব অবাক হই যখন ড. কামাল হোসেনের মতো আইনজ্ঞও বলেন, একটি সংশোধনী করলেই ব্যাপারটি মিটে যায়। যে কোন সংসদ এ ধরনের সংশোধনী আনলে তা বাতিল হতে বাধ্য। বিএনপি এটি জানে, তাই সে জামায়াতের সঙ্গে এই আন্দোলন করছে নিজের এবং জামায়াতের কারণে।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিএনপি কখনও যুদ্ধাপরাধের নিন্দা জানায়নি, ট্রাইব্যুনালকে সমর্থন জানায়নি বরং সব সময় বিচার ও ট্রাইব্যুনালকে অভিযুক্ত করেছে। কসাই কাদেরের রায়ের পর খালেদা জিয়া কী বলেছেন সেটি দিয়েই শুরু করা যাক এ পর্ব।

কাদের মোল্লার দণ্ড কার্যকর হওয়ার পর বেগম জিয়া বলেছেন, এ দেশে "স্বাধীন বিচারব্যবস্থার স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেছে। বিচার নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে" (*দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩-১২-২০১৩)।

খালেদা জিয়ার 'চিন্তা ট্যাংকি'র সদস্যরা আরও জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তব্য

রেখেছেন। আমি নিশ্চিত এসব বক্তব্যের অধিকাংশ আপনাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। কিছু কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করছি, দীর্ঘ হলেও, এ কারণে যে, যুদ্ধাপরাধ বিচার যে তাদের মধ্যে কী জ্বালার সৃষ্টি করেছে এবং বিএনপি যারা করে তাদের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য।

সাংবাদিক নেতা রুহুল আমিন গাজী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর পরই মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে কাদের কসাই মারা গেছে। এখন কাদের মোল্লাকে কাদের কসাই সাজিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। অথচ এই কাদের মোল্লা '৭১ সালে ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। ইসলামী আন্দোলন করার কারণে তাকে জোর করে হত্যা করতে চায় সরকার। তিনি আদালতের রিভিউ আবেদন খারিজ করার সমালোচনা করে বলেন, এখন সরকার ও আদালত একাকার হয়ে গেছে। গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকারকে হত্যা করা হয়েছে। শেখ হাসিনা দেশকে ধ্বংস করার এসাইনমেন্ট পালন করছেন অভিযোগ করে তিনি বলেন, ভয় পাওয়ার দিন শেষ। এখন প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময়। সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরোধ আন্দোলন চলবে। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত (*সংগ্রাম* ১৩-১২-২০১৩)।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদ বলেন, "দেশে নাগরিকদের কোন অধিকার নেই। মানবাধিকার সর্বনিম্ন পর্যায়ে। ফ্যাসিস্ট সরকার জনগণের ওপর চেপে বসেছে। গণআন্দোলনে এ সরকারকে বিদায় করতে হবে।

বর্তমান সরকারকে 'ফ্যাসিস্ট' উল্লেখ করেন বিশিষ্ট টিভি ব্যক্তিত্ব ড. পিয়াস করিম। তিনি বলেন, দেশের ইতিহাসে এমন নিপীড়নকারী সরকার আর ছিল না। রাষ্ট্র নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে লুণ্ঠন করেছে।" [ঐ]

সাবেক সচিব সোলায়মান চৌধুরী বলেন, "৭১ সালে কাদের মোল্লা ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে পড়াশোনা করতেন। সেখানে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। '৭২ সালে ঢাকায় আসেন। অথচ তাকে '৭১ সালে মিরপুরের ঘটনায় জড়িয়ে জোর করে অপরাধী বানানো হচ্ছে। একজন নাগরিক হিসেবে তার জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। অন্য নাগরিকরাও একই শঙ্কায় রয়েছেন। নাগরিকদের জীবন রক্ষায় সবাইকে সম্মিলিতভাবে রাজপথে নেমে আসতে হবে।" [ঐ]

এ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া বলেন, জাতিসংঘ বলেছে, বাংলাদেশে যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে তা আন্তর্জাতিক মানের নয়। এ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশী। কাদের মোল্লার রিভিউ পিটিশন খারিজ করে আদালত তাই প্রমাণ করেছে। অথচ আন্তর্জাতিক আদালতে রিভিউ করার সুযোগ দেয়া হয়। তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনার পদত্যাগ ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

প্রকৌশলী হারুনুর রশীদ বলেন, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। '৭১ সালে

কাদের মোল্লা নামে কারও নাম শুনিনি। তাকে 'কসাই কাদের' সাজিয়ে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি আরও বলেন, সরকার জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর মতো যুদ্ধ করছে।

কবি আবদুল হাই শিকদার বলেন, শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত অভিলাষের কারণে দেশ আজ চরম সঙ্কটে। তিনি আরও বলেন, কাদের মোল্লা একজন নিরপরাধ ও সহজ সরল মানুষ। গায়ের জোরে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চেষ্টা চলছে। ঢাকার মিরপুরের 'কাদের কসাই' মুক্তিযুদ্ধের সময়ই মারা গেছে। অথচ মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে কাদের মোল্লাকে ঝুলিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সরকার বিচারালয় শেষ করে দিয়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, সীমা লঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন।" [ঐ]

বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের গুরু, খন্দকার মাহবুব এর আগে বলেছেন, যারা এ বিচার করছে তাদের সবার বিচার হবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পাকিস্তান সরকার, পাকিস্তানের কিছু রাজনৈতিক দল এবং জামায়াত যে বক্তব্য দিয়েছে তার সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে জামায়াত ও বিএনপির বক্তব্যের। শুধু একটি অমিল আছে। তাহলো, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামায়াত নেতৃবৃন্দ কাদের মোল্লাকে 'শহীদ' বলে উল্লেখ করেছেন, বিএনপি নেতৃবৃন্দ শুধু 'শহীদ' শব্দটি বাদ দিয়েছেন।

'শহীদ' শব্দের একটি ধর্মীয় অনুষঙ্গ আছে। 'শহীদ' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁরা বলতে চান, কসাই কাদের ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, একজন যে প্রায় ৪০০ খুনের সঙ্গে যুক্ত, ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত তিনি ধার্মিক হন কোন সুবাদে? কোন ধর্ম খুন ধর্ষণ সমর্থন করে? আর কসাই কাদেরকে বিচার করে দণ্ড দেয়া হয়েছে এবং সে কার্যকর হয়েছে। এখানে তো লুকোছাপার কোন ব্যাপার নেই। হত্যারও ব্যাপার নেই। তাঁরা আসলে কসাই শব্দটির বদলে শহীদ শব্দটি প্রতিষ্ঠা করতে চান, যা এক ধরনের রাজনীতিকরণ।

বিএনপির যাঁরা মন্তব্য করেছেন, তাঁদের মূল বক্তব্য কসাই কাদেরের বিচার ন্যায়সঙ্গত হয়নি এবং এ কাদের কসাই কাদের নয়। পাকিস্তানীরাও তাই বলেছিলেন, শুধু তাই নয়, জামায়াতীরা এ কথাও বলছেন যে নকল মোমেনার সাক্ষ্যে হয়েছে মোল্লার মৃত্যুদণ্ড। [ঐ]

এ সব বক্তব্যের ভিত্তি দুটি বিষয়– এক. উদ্দেশ্যমূলক; দুই. আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনটি না পড়া। প্রথম থেকেই এ দুটি দল থেকে ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে সে কারণে উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্য সব সময় রাখা হয়েছে। যেমন, প্রথমে বলা হয়েছে, নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে বিচারের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ এ নয় যে বিচার হবে। ট্রাইব্যুনাল হলে বলা হয়েছে, ট্রাইব্যুনাল হলে কী হবে গ্রেফতার তো

হবে না। গ্রেফতার হলে বলা হয়েছে জামায়াত-বিএনপিকে চাপে রাখার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে।

জামায়াত যদি সমঝোতা করে ১৪ দলের সঙ্গে তাহলে ছেড়ে দেয়া হবে। বিচার শুরু হলে বলা হলো, বিচার অনেকদিনের ব্যাপার। এটি নির্বাচন পর্যন্ত টেনে নেয়া হবে যাতে জামায়াত সমঝোতা করে। আর বিচার হলেই রায় হবে এমন কথা কে বলল? রায় হলে বলা হলো, রায় হলেও দণ্ড কার্যকর করা হবে না। বলা হবে, ভোট দিন রায় কার্যকর হবে। এখন রায় কার্যকর হওয়ার পর বলা হচ্ছে, বিচারব্যবস্থা স্বাধীন নয়, বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয় এবং কাদের মোল্লার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো থেকেও এ কথা বলা হয়েছে। ৩০ লাখ যখন শহীদ হয়েছেন বা ৩০ লাখ শহীদের মানবাধিকার নেই, মানবাধিকার থাকবে একজন খুনীর– এই বক্তব্য উদ্দেশ্যমূলক নয়ত কি?

এই কাদের যদি সেই কাদের না হয় তাহলে পাকিস্তানীরা কেন এই কাদেরকে তাদের লোক, শহীদ ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে ক্রোধ প্রকাশ করল। আর ট্রাইব্যুনালের রায়ে এর যথাযথ উত্তর আছে।

ইউরোপীয় দেশগুলো নাখোশ হয়েছে মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে। সৌদি আরবে যে সামান্য কারণে কাশাস কার্যকর করা হয় জনসমক্ষে নাঙ্গা তালোয়ার দিয়ে তখন ইউরোপীয় দেশগুলো সম্মিলিতভাবে কি সৌদি বাদশাহকে নারাজি জানাতে পারবে? বা আমেরিকাকে, যে দেশের অনেক রাজ্যে মৃত্যুদণ্ড এখনও বহাল।

মৃত্যুদণ্ডের মুহূর্তেও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি বা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট কাদের মোল্লার রায় কার্যকর না করার জন্য বলেছেন। আমেরিকা সবসময় গণহত্যাকে মদদ দিয়েছে। ১৯৭১ সাল থেকেই এই দেশটি বাঙালীর বিরুদ্ধে। তুরস্ক যেভাবে কুর্দিদের হত্যা করেছে, বাংলাদেশ সে হত্যা বন্ধ করতে বললে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট কী বলতেন? তুরস্ক শাসন করছে এখন ব্রাদারহুড বা তুরস্কের জামায়াতীরা। মুর্সিও ছিলেন ব্রাদারহুডের। এবং ব্রাদারহুডের সঙ্গে জামায়াতীদের এক ধরনের সখ্য আছে।

খালেদা জিয়া থেকে সানাউল্লাহ মিয়া পর্যন্ত কেউ এই আইনটি পড়েছেন কিনা জানি না। এই আইন নাকি আন্তর্জাতিক মানের নয়। এই আইন যখন করা হয় তখন ন্যুরেমবার্গ বিচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের মতামত নেয়া হয়। গত এক দশকে যে সব দেশে মানবতাবিরোধী আইন হয়েছে তার সব ভিত্তি বাংলাদেশের আইন। অন্য দেশে এ ধরনের কোন আইনে জামিনের বা সুপ্রীমকোর্টের আপীলের বা রিভিউ পিটিশনের কোন ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশের আইনে এগুলো আছে। অর্থাৎ একজন মানবতাবিরোধী অপরাধ করলেও বিচারের সময় যাতে তিনি সব রকমের সুযোগ সুবিধা ও মানবিক সুযোগ-সুবিধা পান তার

সব ব্যবস্থা এই আইনে আছে। ধর্ষণকে আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। এ আইনে তা, এবং সামাজিক দায়কে বিবেচনায় আনা হয়েছে যা এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে আন্তর্জাতিক আইনে। ট্রাইব্যুনাল এ পর্যন্ত যত রায় দিয়েছে তার প্রত্যেকটিই একটি মান নির্ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা একটি স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে পরিগণিত হবে। সুতরাং দ্বিতীয় যে প্রচারণা সেটিও উদ্দেশ্যমূলক।

এই রায় কার্যকর হওয়ার পর দেশজুড়ে মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেছে শুধুমাত্র বিএনপি-জামায়াত নয়। পাকিস্তান যখন কাদের মোল্লাকে নিয়ে বাংলাদেশবিরোধী প্রস্তাব পাস করেছে সংসদে ও বক্তৃতা বিবৃতি দিয়েছে তখনও বিএনপি এর কোন নিন্দা করেনি। বিএনপির এক নেতা নজরুল ইসলাম বললেন, সরকারের তো আগেই করার কথা ছিল। সরকার তো করেছে, কিন্তু, বিএনপি কেন করল না। আপনাদের কি মনে পড়ে ২০০১ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের খবর কাগজে সংবাদ বেরিয়েছিল যে, নির্বাচনের আগে কয়েক শ' কোটি টাকা আইএসআই সরবরাহ করেছে বিএনপি ও সামরিক বাহিনীকে। এ নিয়ে সে সময় অনেক লেখালেখিও হয়েছিল।

বিএনপি কেন এসে জঙ্গীবাদকে উসকে দিয়েছিল? কারণ আইএসআই তাই চাচ্ছিল। আইএসআই চায় ভারতের পূর্ব সীমান্তে একটি মিনি পাকিস্তান গড়তে। কেন চায়? কারণ, ১৯৭১ সালের পরাজয় ভোলা পাকিস্তানের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। প্রায় এক লাখ সৈন্যসামন্তের আত্মসমর্পণ! এটি তারা মানতে পারেনি। কাদের মোল্লার ফাঁসি আবার ১৯৭১কে সামনে নিয়ে এসেছে। সুতরাং পাকিস্তান ক্রোধান্বিত হবে সেটিই স্বাভাবিক।

আইএসআই [মানেই পাকিস্তান। তারাই সরকার চালায়] চায় বাংলাদেশ দখল করতে। ভৌগোলিকভাবে এটি আর সম্ভব নয়। সে জন্য তারা চায় তাদের এজেন্টরা ক্ষমতা দখল করুক এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিক।

আইএসআইয়ের প্রথম ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করছে জামায়াত। দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে বিএনপি। উপরের বিবরণ তার প্রমাণ। সবশেষে কাদের মোল্লার ফাঁসিতে সন্তোষ প্রকাশ না করা ও পাকিস্তানের বেয়াদবির প্রতিবাদ না করা হচ্ছে এর সর্বশেষ প্রমাণ। এবং উপরের বিবরণ এটিও প্রমাণ করে যে, বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে মৌলিক কোন তফাত নেই। জামায়াত নিষিদ্ধ করলে জামায়াতীরা সব বিএনপির সভ্য হয়ে যাবে।

বিএনপি ও জামায়াত পাকিস্তানের হয়ে বাংলাদেশ দখল করতে চায় আক্ষরিকভাবে। সে জন্য বিজয়ের সারাটা মাস তারা হরতাল ডেকেছে। যানবাহনে পেট্রোলবোমা ছুঁড়েছে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে জামায়াত যেমন মরণকামড় দিয়ে

বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। জামায়াত-বিএনপি একইভাবে আওয়ামী লীগ, হিন্দু ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। আসাদুজ্জামান নূরের ওপর আক্রমণ, সাতক্ষীরা, নাটোর, কোম্পানিগঞ্জ বা রাজশাহীতে আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া, আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের পুড়িয়ে বা গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। ১৯৭১ সালে বিজয়ের মাসে জামায়াতীরা শেষ গণহত্যায় মেতে উঠেছিল। এবারও দুইদিন একই কায়দায় প্রায় ২০০ মানুষ হত্যা করেছে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে হানাদার ও তার দালালদের হাত থেকে মুক্তিযোদ্ধারা একেকটি অঞ্চল মুক্ত করছিল। তেমনি জামায়াত-বিএনপি বা ১৮ দল একেকটি এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিচ্ছে।

তারা আওয়ামী লীগ/১৪ দল/প্রগতিশীল/সংখ্যালঘুদের হত্যা ধর্ষণের মাধ্যমে পদানত করতে চায় সে জন্যই গত দু'মাস সারাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে আন্দোলনের নামে। নির্বাচন এখন আর মূল ইস্যু নয়। সরকারের পতন হলে যেভাবে হোক তারা ক্ষমতায় আসবে, তারপর সবাইকে পদানত করে আইএসআইয়ের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে।

সুতরাং বাংলাদেশের পক্ষে যাঁরা আছেন তাঁদের লড়াইটা শুধু জামায়াতের বিরুদ্ধে করলেই চলবে না, সেটি হতে হবে বিএনপি-জামায়াতের বিরুদ্ধেও। তারা কম শক্তিশালী নয়। অর্থনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা সবখানে তাদের লোক আছে যারা প্রয়োজনে পথে নামবে। সুতরাং, খালি জামায়াতের কথা বলা হবে একদেশদর্শী এবং জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।

শেখ হাসিনা যদি না থাকতেন, আমরা অনেকে নিশ্চিত ট্রাইব্যুনালও হতো না, কাদের মোল্লার রায়ও কার্যকর হতো না। আমেরিকার মজেনা ও কেরি এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘ আরও ইত্যাদির চাপে নত হতে হতো। মজেনার ঔদ্ধত্য এখনও কী প্রবল যে তিনি অর্থমন্ত্রীর কাছে নির্বাচনের ব্যাপারে বক্তব্য চান। অর্থমন্ত্রীর বলা উচিত ছিল, তিনি তাদের পররাষ্ট্র নীতির ব্যাখ্যা চান। আসলে এরা শক্তি বোঝে। ভারতকে দেখুন। তাদের কূটনীতিবিদকে হেনস্থা করায় তারা দিল্লীতে মার্কিন কূটনীতিবিদদের সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করেছে। এখন জামায়াত-বিএনপিকেও শক্ত হাতে প্রতিরোধ করা।

মিডিয়া ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা একটি রব উঠিয়েছিলেন বিএনপি জিতবে নির্বাচনে। তাদের ছাড়া নির্বাচন ও গণতন্ত্র সিদ্ধ নয়। জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল হয়েছে, তারা নির্বাচন করতে পারবে না। সেটি যদি সিদ্ধ হয় তাহলে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ফ্রন্ট নির্বাচনে না এলে গণতন্ত্র রসাতলে যাবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। পাকিস্তানীদের সঙ্গে গণতন্ত্র ভাগাভাগি করতে হবে–এ ধরনের আগ্রহ যত কম থাকবে গণতন্ত্রের জন্য ততই তা হবে উত্তম।

বিএনপি-জামায়াত বাংলাদেশ দখল করতে চায়? নিঃশব্দ সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সাইলেন্ট মেজরিটি পাকিস্তানের পক্ষে এমন ভাবার কোন কারণ নেই [এটি জামায়াত বুঝেছে। সে কারণে তাদের ওয়েবসাইটে কাদের মোল্লা সংক্রান্ত পাকিস্তানের কোন বক্তব্য নেই]। বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করবেন তাদের সবাইকে বাংলাদেশের পক্ষে থাকতে হবে। পাকিস্তানী দালালদের বা ব্রিফধারীদের এ দেশে রাজনীতি করার অধিকার থাকতে পারে না।

কাদের মোল্লার রায়ের পর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়ার জন্য কত লোক হয়েছিল? ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ যখন আমরা সোহরাওয়ার্দী গিয়েছিলাম তখন যে পরিমাণ মানুষ দেখেছিলাম তারপর আর সেরকম জনসমাবেশ দেখিনি। এখন আমি প্রৌঢ়। ৪৩ বছর পর আমি আবার সেই একই দৃশ্য দেখলাম। না, বঙ্গবন্ধু নেই। কিন্তু সবার মুখে ছিল মুক্তিযুদ্ধের সেই ধ্বনি– জয়বাংলা! কাদের মোল্লার ফাঁসির পর আমি যত এসএমএস পেয়েছি তাতে দু'টি শব্দই শুধু ছিল– জয়বাংলা! বাংলাদেশের পাকিস্তানীরা যেন শব্দ দুটি মনে রাখে।

আন্দোলন যখন প্রতিষ্ঠান

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আজ ২৩ বছরে পা দিল। শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে যারা প্রথমে গিয়েছিল তাদের অনেকের বয়স ছিল ১৮ থেকে ২২-এর মধ্যে। বাংলাদেশের সিভিল সমাজের আর দু'টি প্রতিষ্ঠান বোধহয় নির্মূল কমিটির বয়সী এবং সক্রিয়। এর একটি জাতীয় কবিতা পরিষদ অপরটি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। এরা পরস্পরের পরিপূরক, লক্ষ্য প্রায় এক- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, স্বৈরাচার প্রতিরোধ, মৌলবাদ-জঙ্গীবাদ নির্মূল, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের শাখা ও সদস্য সংখ্যা বাংলাদেশের অধিকাংশ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের চেয়ে বেশি। এখন ওয়ানম্যান পার্টিও সরকারে অংশ পায়। অচিরে সরকার গঠনে আমাদের লাগবে না তা কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় না।

আমার মনে পড়ে, নির্মূল কমিটি গঠিত হওয়ার পর মধ্যবিত্ত সমাজের অনেকে, বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ 'নির্মূল' শব্দটির ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিলেন। আজ কিন্তু অনেকে সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গীবাদ-মৌলবাদ নির্মূলের কথা বলছেন। আমরা আসলে সরল সত্যটি সরলভাবে বলতে চেয়েছিলাম। কারণ, আমরা অনুধাবন করেছিলাম, বাংলাদেশে সমস্ত অশুভ শক্তির উৎস জামায়াতে ইসলাম ও তার রাজনীতি এবং উত্তরোত্তর এর সমৃদ্ধির কারণ যুদ্ধাপরাধের বিচার না হওয়া এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সর্বাত্মক সহায়তা। সে কারণে আমরা প্রাথমিক লক্ষ্য ঠিক করেছিলাম যুদ্ধাপরাধের বিচার। সঙ্গে পরিপূরক দাবি ছিল জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা।

আমরা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জন করেছি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখে এখন জনপ্রিয় স্লোগান জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা, যুদ্ধাপরাধীদের দন্ড কার্যকর করা ও জামায়াতের রাজনীতি নির্মূল করা।

আন্দোলনে থাকলে সময়ের পরিমাপ করা যায় না। যুদ্ধাপরাধ বিচারে আমরা কতদিন ধরে জড়িত? হিসাব করে দেখিনি। আজ ১৯ জানুয়ারি, হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখি চার দশক পেরিয়ে গেছে। ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করা আন্দোলন যে সব সময় একই গতিতে চলেছে তা নয়, জোয়ার ভাটার মতো কখনও কূল প্লাবিত করেছে, কখনও বা ঢেউ মরে গেছে। এই আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য যে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দল এই আন্দোলনে জড়ো হয়েছে, সরে গেছে, নতুনরা এসেছেন,

সরে গেছেন, আন্দোলন চালু রয়েছে। এতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, এই আন্দোলনে মানুষের সায় ছিল। সাড়া সব সময় সবার পক্ষে দেয়া সম্ভব হয় না কিন্তু সায় সব সময় থাকতে পারে। সাধারণ মানুষ যে দলই করুক না কেন, রাজাকার আলবদরদের বিচার হবে না এটি মন থেকে মানতে পারেনি। বোধ আছে দেখে মানুষ, মানুষ। একেবারে বোধহীন হওয়াটা কষ্টকর। যারা বোধহীন, যেমন জামায়াতী বা বিএনপি তারা সাময়িক কিছু লাভ করতে পারে বটে কিন্তু অন্তিমে হটে যেতে হয়। চেঙ্গিস খানের শাসন, হিটলারদের শাসন, ইয়াহিয়া খানদের শাসন, জিয়াউর রহমানদের শাসন অনন্তকাল চললে সভ্যতা আর এগুত না।

যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রথমে দাবি করেছিলেন বুদ্ধিজীবীরাই। জহির রায়হান বেসরকারীভাবে তদন্ত শুরু করেছিলেন। প্রধানত, বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলবদরদের খোঁজ করে শাস্তির জন্যই তদন্ত শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে, দালালদের বিচারের দাবিও উঠছিল। সরকারের এতে নিশ্চুপ থাকার অবস্থা ছিল না। যে কারণে দালাল আইন করে বিচার শুরু হয় এবং তখন সব অপরাধই দালাল আইনের অন্তর্গত হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে আরেকটি আইন করেছিলেন যা আজ আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচার আইন হিসেবে পরিচিত। আন্দোলনও ধীরে ধীরে ব্যাপ্তি পায়। জামায়াতে ইসলাম কাঠগড়ায় দাঁড়ায় এবং ক্রমে তা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায় যাকে আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নামেও অভিহিত করি। মিলিটারি যেমন একসময় পরিচিত হয়ে উঠেছিল মেলেটারি হিসেবে। গোলাম আযমের রেজাকার যেমন পরিচিত আমাদের কাছে রাজাকার হিসেবে।

রাজাকার বিচার আন্দোলন যখন নিম্নমুখী তখন নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠা হয়। রাজাকার বন্ধু জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সময় আন্দোলন করা দুরূহ ছিল। কারণ, সিভিল সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেকে ভাবতেন, সিভিলিয়ানদের থেকে তারা উত্তম। তবুও, যুদ্ধাপরাধীদের ইস্যুতে তারা একমত হয়েছিলেন। নির্মূল কমিটির কৃতিত্ব এই যে, এই ইস্যুতে অনেককে একত্রিত করতে পেরেছিলেন বিশেষ করে সংস্কৃতি সেবীদের। বাংলাদেশে এমন কোন নামী সাহিত্যিক, শিল্পী ছিলেন না যিনি কোন না কোন সময় এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ বিষয়টিও উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে সমস্ত গণআন্দোলনের সূত্রপাত সংস্কৃতিসেবীরাই করেছেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আন্দোলনও। আর এ আন্দোলনকেও গণআন্দোলন বলতে আমার দ্বিধা নেই। গণআন্দোলন না হলে আওয়ামী লীগ ও জোট যুদ্ধাপরাধ বিচারে একমত হতো না।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, আন্দোলন কি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে পারে? অধিকাংশের উত্তর হবে না, কারণ কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে

আন্দোলন হয়। তা স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে, স্বল্পস্থায়ীও হতে পারে। লক্ষ্যে না পৌঁছলে, রাজনৈতিক দল যুক্ত থাকলে তা দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। যেমন, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা আন্দোলন। কিন্তু, সিভিল সমাজ উদ্ভূত আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার উদাহরণ খুব কম। ব্যতিক্রম একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন। এর কারণ নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া ব্যতিক্রম। আর এই ব্যতিক্রমী কাজটি হয়েছিল দেখে নির্মূল কমিটি এতদিন কাজ করে আসতে পেরেছে এবং মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে।

সেক্টর কমান্ডার অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল কাজী নূরুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির ও জাহানারা ইমামের উদ্যোগে ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি নির্মূল কমিটি গঠিত হয়। প্রথম সভায় আমরা কয়েকজন উপস্থিত ছিলাম। পরে সবার সম্মতি নিয়ে ১০১ জন বিশিষ্ট নাগরিককে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। নির্মূল কমিটির বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলাদেশের পরিচিত বিশিষ্টজনরা সবাই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন যেমন সুফিয়া কামাল, বিচারপতি সোবহান, কলিম শরাফী, শামসুর রাহমান, আহমদ শরীফ, শওকত ওসমান, নীলিমা ইব্রাহিম, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান কে নয়? অধ্যাপক কবীর চৌধুরী তো মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন এর উপদেষ্টা মন্ডলীর সভাপতি।

নির্মূল কমিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচার। আমরা তখন থেকে অনুধাবন করেছিলাম বিচার হতে হলে রাজনৈতিক দলের সমর্থন জরুরী। সে জন্য কিছুদিনের মধ্যেই ৭২টি সংগঠন নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়। জাহানারা ইমাম হন আহ্বায়ক। সংক্ষেপে এই কমিটি সমন্বয় কমিটি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। নির্মূল কমিটি তখন আর আলাদাভাবে কাজ করেনি। সমন্বয় কমিটির কাজ পরিচালনার জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিলেন আবদুর রাজ্জাক, জাসদের প্রয়াত কাজী আরেফ আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির নূরুল ইসলাম নাহিদ, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী চক্র প্রতিরোধ মঞ্চের' পক্ষে আহাদ চৌধুরী ও অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, নির্মূল কমিটির পক্ষে সৈয়দ হাসান ইমাম ও শাহরিয়ার কবির। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ১৯৭২ সালের দু'দশক পর ফের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে জনমত কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল। তবে এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের কথা বলতে হয়। এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নিয়েছিলেন কাজী নূরুজ্জামান ও শাহরিয়ার কবির। এই কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় অবদান 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ। এর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী কামরুল

হাসান। এই গ্রন্থটি সারাদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এখন পর্যন্ত ঘাতক-দালালদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি হিসেবে এই গ্রন্থটি ব্যবহৃত হয়। গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব প্রদান করলে কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় নির্মূল কমিটি গঠিত হয়।

নির্মূল সমন্বয় কমিটির বড় অবদান ঘাতকদের বিরুদ্ধে দুটি গণদণ্ড কমিশন গঠন ও রিপোর্ট প্রকাশ এবং ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ গোলাম আযমের বিরুদ্ধে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণআদালতের বিচার। এ ধরনের উদ্যোগ এ দেশে প্রথম। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি সরকার জাহানারা ইমামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা করেছিল। এই মামলা মাথায় নিয়েই জাহানারা ইমাম ১৯৯৪ সালে পরলোক গমন করেন। আর বিএনপি নিজেকে যুক্ত করেছিল পাকিস্তানমনা দল হিসেবে।

জাহানারা ইমামের আকস্মিক মৃত্যুর পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে খানিকটা ভাটা পড়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে শাহরিয়ার কবির ও কাজী মুকুলের উদ্যোগে নির্মূল কমিটির কার্যক্রম বেগবান হয়েছে। শামসুর রাহমান দীর্ঘদিন এর সভাপতি ছিলেন। আমরাও অনেকে কমিটিতে ছিলাম এবং আছি। তবে শাহরিয়ার ও মুকুলই এখনও নির্মূল কমিটির প্রাণশক্তি। দু'জন দু'জনের পরিপূরকও। শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর অবদানের কথাও মনে রাখার মতো।

১৯৯৫ থেকে নির্মূল কমিটির আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়। ঘাতকদের বিচার অনুষ্ঠান একটি পর্যায় বটে, কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা অক্ষত্ন রাখা, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। এ কারণে নির্মূল কমিটির দু'টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হয়। এর একটি হলো 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র ট্রাস্ট' অন্যটি হলো 'সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন,' (২০০১) ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত আছেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম (পরলোকগত), ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, শিল্পী হাশেম খান প্রমুখ। এর প্রধান সমন্বয়কারী কাজী মুকুল। প্রধানত তাঁর চেষ্টায় সারাদেশে ৭০টি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। মৌলবাদ/জঙ্গীবাদবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠাই পাঠাগারের মূল উদ্দেশ্য। জোট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন ২০টি পাঠাগারের ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ মেলাও প্রথম শুরু করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিই। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর উদ্বোধন করেন।

দক্ষিণ এশিয়া সম্মেলন বা 'সাউথ এশিয়ান পিপলস ইউনিয়ন এগেইনস্ট ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড কমিউনিজম' ২০০১ সালে ঢাকায় দু'দিনব্যাপী

আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে। বিষয় ছিল, ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড কমিউনিজম : রোল অব সিভিল সোসাইটি। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা থেকে জি এ সাংমা, হামজা আলাভী, দামান দুঙ্গানা, এম. জে আকবর, আইকে গুজরাল, সুনীল উইজেসি সার্ধানায় প্রমুখ যোগ দেন। বছর কয়েক আগে এর উদ্যোগে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল 'পিস জাস্টিস অ্যান্ড সিকিউলার হিউমিনিজম'। এবার জার্মানি, সুইডেন, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, রাশিয়া এবং পাকিস্তান থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, তারা এক বাক্যে 'ঢাকা ঘোষণায়' যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সমর্থন করে গেছেন।

না, এখানেই শেষ নয়। সারা বছর নির্মূল কমিটি ঢাকা ছাড়াও সারাদেশে সভা-সমিতি, সেমিনার করেছে যার সংখ্যা হাজারের ওপর। যুদ্ধাপরাধ, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গীবাদ, সংবিধান বিষয়ে ১৩০টি পুস্তিকা/ গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এ রেকর্ড আর কোনো বেসরকারি সংস্থার আছে কী না সন্দেহ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জোট সরকার সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল। তার ওপর তিন খন্ডে ৩০০০ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট প্রকাশ। নাম 'শ্বেতপত্র বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন'। যুদ্ধাপরাধী আইনের ওপরও কয়েকটি পুস্তিকা এবং হেফাজতের তাণ্ডবের ওপর ছ'খন্ডে শ্বেতপত্র।

নির্মূল কমিটির উদ্যোগে শাহরিয়ার কবির চারটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেছেন যা দেশে-বিদেশে আদৃত হয়েছে। এগুলো হলো সংখ্যালঘু নির্যাতনের ওপর 'আমাদের বাঁচতে দাও', 'যুদ্ধাপরাধ ৭১' 'দুঃসময়ের বন্ধু' এবং 'পোট্রেট অব জিহাদ'। বীরাঙ্গনাদের নির্মূল কমিটিই প্রথম সম্মাননা জানিয়েছে। এরপর বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি দিতে অন্যান্য সংস্থা এগিয়ে এসেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিভিন্ন জায়গায় নির্মূল কমিটি ত্রাণ পরিচালনা করেছে। এখনও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে নির্মূল কমিটি দেশের দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনাদের নিয়মিত সাহায্য করেছে। যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে একটি ডাটা ব্যাংক গড়ে তুলেছে। Bangladesh.org নামে একটি ওয়েবসাইটও আছে।

১৯৯৫ সাল থেকে নির্মূল কমিটি জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছে। এ বক্তৃতা দিয়েছেন কবীর চৌধুরী, কামাল লোহানী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান, কে এম সোবহান প্রমুখ। এ পর্যন্ত ১২টি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। সম্প্রতি অধ্যাপক কবীর চৌধুরী পরলোকগমন করলে তাঁর স্মরণে ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা হয়েছিল কবীর চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা যা প্রদান করেছেন জনাব এএমএ মুহিত। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ, অসাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে নির্মূল কমিটি ১টি প্রতিষ্ঠান ও

একজন ব্যক্তিকে 'জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদক' প্রদান করে। এ পর্যন্ত ১৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। এর মধ্যে আছেন প্রয়াত সুফিয়া কামাল, শওকত ওসমান, শামসুর রাহ্মান, শওকত আলী খান প্রমুখ। প্রতিষ্ঠান হিসেবে পদক পায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, টোয়েন্টি টোয়েন্টি টেলিভিশন (লন্ডন), মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সময় প্রকাশন প্রভৃতি। যুদ্ধাপরাধ, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ নিয়ে অনেক পোস্টার এবং লিফলেট প্রকাশ করেছে কমিটি।

নির্মূল কমিটির শাখার সংখ্যা এখন ২০০। বিদেশে ১২। সে হিসেবে বলা যায়, সিভিল সমাজের সবচেয়ে বড় সংগঠন নির্মূল কমিটি। জাতীয় হিসাবে ধরলে চারটি বড় রাজনৈতিক দলের পরই নির্মূল কমিটির অবস্থান।

গত দুই দশক থেকে, আগেই বলেছি, বাংলাদেশের বিশিষ্টজনরা এর সঙ্গে জড়িত। এই সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দিতে কোন প্রতিষ্ঠান বা ধনীরা সবসময়ে অপারগতা প্রকাশ করেছে। কমিটির শুভানুধ্যায়ী ও সদস্যদের চাঁদায় সংগঠন চলছে যা খুবই কষ্টকর। একমাত্র প্রয়াত শিল্পী নিতুন কুণ্ডু জাহানারা ইমাম স্মৃতিপদকের ক্রেস্ট নিয়মিত তৈরি করে দিয়েছেন। স্থপতি, কবি রবিউল হোসাইন এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে, এ দেশে পাকিস্তানের এজেন্ট প্রাক্তন দু'জন রাষ্ট্রপতি এলিট সমাজকে ভালভাবে বিভক্ত করতে পেরেছেন। তারা বোঝাতে পেরেছেন, যুদ্ধাপরাধের বিচার চাওয়া, অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে আন্দোলন কোন সুস্থ চাওয়ার বিষয় নয়, এটি রাজনীতি। ডিজিএফআইয়ের সহায়তায় প্রকাশিত বলে অনুমিত (এ বিষয়ে কখনও কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা যাবে না। উইকিলিকস যদি কখনও পারে) 'র ইন বাংলাদেশ' নামে একটি বইয়ে নির্মূল কমিটিকে র-এর এজেন্ট হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের ঘাঁটি যে কত শক্ত এটি তার প্রমাণ। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বা মহাজোটের পক্ষে নির্মূল কমিটি বিভিন্ন জায়গায় (বিশেষ করে যেখানে যুদ্ধাপরাধীরা দাঁড়িয়েছিল) সভা করে জনমত সংগঠন করেছিল।

এই সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দেয়ার একটা কারণ আছে। নির্মূল কমিটির অনেক কর্মকাণ্ডের কথা আমারও মনে নেই। আজ মুক্তিযুদ্ধের যে নতুন প্রজন্ম তৈরি হয়েছে তাতে অনেক ব্যক্তি, সংস্থার অবদান স্বীকার করেও বলতে হয়, এতে নির্মূল কমিটির অবদান বেশি। কারণ এক্ষেত্রে এত বেশি কাজ কেউ করেনি। অনেকের কাজ মার্চ বা ডিসেম্বরে সীমাবদ্ধ। নির্মূল কমিটির কাজ চলে সারা বছর। আমরা অনেকে শুরু থেকে ছিলাম নির্মূল কমিটির সঙ্গে, এখনও আছি অনেকে, তবে নির্মূল কমিটির এই যে আন্দোলন যা এখনও সজীব, তার কারণ এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

এ কারণেই এটি আলোচনার বিষয় যে, যা পারিনি তা করা যেতে পারে যদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যায়। আর নির্মূল কমিটির এই কৃতিত্বের জন্য আমরা সবাই দাবিদার হতে পারি, কিন্তু আমি মনে করি শাহরিয়ার কবিরের উদ্যম ও কাজী মুকুলের সাংগঠনিক শক্তি না থাকলে আজ নির্মূল কমিটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতো না। জোট আমলে মন্ত্রী, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ব্যক্তিগত আক্রোশে শাহরিয়ারকে চাকরিচ্যুত করেন। সে থেকে আর তিনি কোন চাকরি পাননি, করেনওনি। সারাটা সময় খালি যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে কাজ করে গেছেন। শাহরিয়ারের সঙ্গে আমাদের মতানৈক্য হয়। অনেকে আমরা তাকে অপছন্দ করি। পছন্দও করি, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে আনা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি বাস্তবায়নে তাঁর অবদান অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আমি তো মনে করি, 'স্বাধীনতা পদক' পাওয়ার অন্যতম দাবিদার তিনি।

আজ কুড়ি বছর পর মনে হচ্ছে, খুব কম দেশে এ ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন শিল্পী সাহিত্যিকরা। কবি শামসুর রাহমান দীর্ঘদিন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রবীণ শওকত ওসমানকে যখন ডেকেছি তখনই সাড়া দিয়েছেন। হাশেম খান বা রফিকুননবীর কাছে যখন পোস্টার চেয়েছি নির্দ্বিধায় করে দিয়েছেন। বিচারপতি কে.এম. সোবহান তো আমাদের বয়সীই হয়ে গেছিলেন। মনে পড়ছে ব্যারিস্টার শওকত আলীর কথাও, সব সময় যিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল। বক্তা হিসেবে কামাল লোহানী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর কখনই বিমুখ করেননি। কবীর চৌধুরী ও নির্মূল কমিটি তো একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। কলিম শরাফীর কথাও বা কিভাবে ভুলি? শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী বা সালমা হক, মমতাজ লতিফকে আজ পর্যন্ত দেখিনি একটি সভা বা মিছিলে অনুপস্থিত থাকতে। এভাবে সবাই মিলে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয়েছে আজ প্রায় তিন বছর হলো। যুদ্ধাপরাধের বিচার শুধু নির্মূল কমিটি চেয়েছে তা' নয়। বাংলাদেশের অনেক সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যুদ্ধাপরাধের বিচার দাবি করেছে। কিন্তু নির্মূল কমিটির বৈশিষ্ট্য হলো এ আন্দোলনের পথ থেকে কখনও বিচ্যুত না হওয়া এবং বিরতি না দেয়া এবং তা জনদাবিতে পরিণত করতে পারা। যতদিন পর্যন্ত বিচারের ট্রাইবুনাল গঠিত না হয়েছে ততদিন পর্যন্ত নির্মূল কমিটি জনমত জাগ্রত রেখেছে। এবং ট্রাইব্যুনাল ও আইন সংক্রান্ত নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও শৈথিল্যের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে। বিদেশে যখন জামায়াতের লবিংয়ের কারণে, সরকার, ব্যক্তি, সংগঠন ট্রাইব্যুনালের সমালোচনা করেছে তখন আমরা বারবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এর একটি বিহিত করার জন্য অনুরোধ করেছি। তারা ব্যর্থ হলে, নির্মূল কমিটি

চাঁদা তুলে, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যয়ে শাহরিয়ার কবির ও তুরিন আফরোজ লন্ডন, ব্রাসেলস প্রভৃতি শহরে গিয়েছেন, সংসদীয় সভায় ট্রাইব্যুনালের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন দন্ডাদেশ নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দই রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। এখনও আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচার আইন, ট্রাইব্যুনালের অপূর্ণতা, এখনই গণহত্যা আর্কাইভস ও জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কথা নির্মূল কমিটিই নিরন্তর বলে যাচ্ছে, দাবি তুলছে এবং তুলে যাবে যতদিন না সমস্ত দন্ডাদেশ কার্যকর হয়।

জামায়াত নিষিদ্ধকরণের দাবি গত প্রায় তিন দশক ধরে নির্মূল কমিটি করে আসছে। প্রথম দিকে এ দাবি যখন করা হয় তখন সবাই এটি অবাস্তব দাবি বলে মনে করেছে। গত এক বছর ধরে জামায়াতের সহিংসতা এই দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ এটি বাস্তব সত্য যে জামায়াত ধর্মকে পুঁজি করে একটি দানবীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের প্রতিটি রায়ে জামায়াতকে অপরাধী সংগঠন বলা হয়েছে। একটি রায়ে এমনও মন্তব্য করা হয়েছে যে জামায়াত আদর্শে বিশ্বাসী কেউ সরকারে যাতে প্রবেশপত্র না পায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলেছে। জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল হয়েছে। আমাদের আন্দোলন যদি নিরন্তর হয় তাহলে, সরকার অবশ্যই জামায়াত নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হবে।

জামায়াত নিষিদ্ধ করার দাবির সঙ্গে আমরা আরেকটি দাবি করছি তা হলো, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধান থেকে অপসারণ করা।

অনেকে বলতে পারেন, যুদ্ধাপরাধ বিচার শেষ হচ্ছে, সুতরাং নির্মূল কমিটির আন্দোলনের আর কী আছে? আমরা মনে করি না যুদ্ধাপরাধের রায় কার্যকর হলেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। কারণ, যুদ্ধাপরাধীদের দলতো থেকে যাবে। তাদের রাজনীতি তো থেকে যাবে। যুদ্ধাপরাধের সমর্থকরাও তো এক ধরনের যুদ্ধাপরাধী। তাদের রাজনীতি আর জামায়াতের রাজনীতির মধ্যে তো পার্থক্য নেই। আর এই অপরাজনীতি কী তাতো এখনও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। পেট্রোল বোমা মেরে, পুড়িয়ে, কুপিয়ে প্রায় ২০০ মানুষ হত্যা করা হয়েছে গত তিন মাসে। পুলিশ, বিজিবির সদস্যদের হত্যা করা হয়েছে। তিন হাজার বৃক্ষ কর্তন করা হয়েছে। দখল হয়েছে অগণিত। ৫৩১টি স্কুল, মাদ্রাসা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ট্রাক ভর্তি গরু পুড়িয়ে মারা হয়েছে। নির্বাচনের আগে পরে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর পোড়ানো হচ্ছে, তাদের ওপর নিরন্তর আক্রমণ চলছে। জামায়াত-বিএনপির অপরাজনীতির কারণে ধর্মীয় মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ, সাম্প্রদায়িকতা যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে তার বিরুদ্ধে আমাদের নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না এই অপরাজনীতির বিনাশ হবে। নির্মূল কমিটির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার কারণ হলো, আমরা মনে করি যুদ্ধাপরাধের বিচারের মাধ্যমেই এ দেশ থেকে

সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গীবাদ বিলুপ্ত হবে না। যুদ্ধাপরাধ বিচার মুক্তিযুদ্ধের একটা পর্যায় মাত্র। মুক্তিযুদ্ধের বাকি লক্ষ্যগুলো অর্জন দীর্ঘ সময়ের আন্দোলনের ব্যাপার। আমরা যদি না থাকি তাহলে আমাদের উত্তরসূরিরা যাতে এ আন্দোলনটি সজীব রাখতে পারে সে জন্যই এত পরিশ্রম। আমরা বলতে পারি গর্ব করে, অনেক কিছু না পারলেও কিছু কাজ তো করতে পেরেছি।

১৯ জানুয়ারি, ২০১৪

জাওয়াহিরির বার্তা, বিএনপি-জামায়াতের তাচ্ছিল্য এবং সুশীল বাঁটপাড়দের প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা

আয়মান জাওয়াহিরির ভিডিও বার্তা নিয়ে আলোচনা এখনও থামেনি। সরকার, সরকারী দল, বিরোধী দল ও ভাষ্যকারদের বক্তব্য বিষয়টিকে খানিকটা জটিল করে তুলছে এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বার্তাটি সবার নজরে আসে ১৫ ফেব্রুয়ারি।

বার্তাটি নজরে এলে তথ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রথম প্রতিক্রিয়া জানান। তাঁরা জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে, আল কায়েদা যদি কিছু করে তা হলে বাংলাদেশ প্রতিরোধে সম্পূর্ণ প্রস্তুত বা বাংলাদেশ দেখে নেবে। সব বিষয় নিয়ে না বুঝে বক্তব্য রাখাটা সমীচীন নয়। আমি মাঝে মাঝে যখন এসব ভাবি তখন বাংলাদেশের প্রবাদসমূহে যথার্থতা মনে পড়ে। কত বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরি হয়েছে একেকটি প্রবাদ! যেমন, হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল। সন্ত্রাস নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, এমন কি রাশিয়া জেরবার হয়ে যাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ প্রতিরোধে সম্পূর্ণ প্রস্তুত কথাটি ফালতু কথারই প্রতিধ্বনি। গত বছর সাতক্ষীরাসহ অন্যান্য অঞ্চলে জামায়াত-বিএনপি যে তাণ্ডব চালিয়েছে তা আয়ত্তে আনতে কতদিন লেগেছে এবং এই কয়দিনে কত মানুষ মারা গেছেন নিরাপত্তাকর্মীসহ এবং ঐ নৃশংস হামলার মুখে সরকার কতজনকে কার্যকর নিরাপত্তা দিতে পেরেছে? আর বক্তব্যটি খতিয়ে দেখারইবা কি আছে? বক্তব্যটি যদি জাওয়াহিরির নাও হয় তাহলেও সরকারের জানা উচিত, বিশেষ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর যে, ক্লিনটন কেন তার বাংলাদেশ সফর মার্কিন দূতাবাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। জাওয়াহিরি দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের কথাবার্তা বলে আসছেন। নতুন কিছু নয়। আর বক্তব্যটি ১৫ ফেব্রুয়ারির নয়, ৩০ নবেম্বর ২০১৩ সালের। যদি তা জাওয়াহিরির নাই হতো তা'হলে অবশ্যই এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হতো। কয়েকদিন আগে পত্রিকার প্রতিবেদনে দেখলাম, মার্কিন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কণ্ঠস্বরটি জওয়াহিরির। সরকার অবশ্য এখনও বলছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

জাওয়াহিরির বার্তার একটি ক্রমপঞ্জি তুলে ধরেছে ডেইলি স্টার। পাকিস্তানের বালাকাত মিডিয়া পরিচালিত দাওয়াহিলাল্লাহ ব্লগে এই বার্তাটি প্রথম আপলোড

করা হয়। পরে সেই সূত্র পাঠানো হয় টাঙ্গাইলের রাসেলকে [যাকে র‍্যাব গ্রেফতার করেছে]। রাসেল তার ব্লগ ইসলামের আলোতে তা অন্তর্ভুক্ত করে। যুক্তরাষ্ট্রের জিহাদ সংক্রান্ত খবরাখবরের ওয়েবসাইট জিহাদোলজিতে তা প্রকাশ করা হয়। শাহরিয়ার কবির লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারী সন্ত্রাস নিরূপণ সংস্থা জেমসটাউন ফাউন্ডেশনেও তা আপলোড করা হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি করাচির সেই দাওয়াহিলাল্লাহ নতুন শিরোনামে তা আবার প্রচার করে। শিরোনামটি ছিল– 'বাংলাদেশ জেনোসাইড বিহাইন্ড এ ওয়াল অব সাইলেন্স।' ৮ ফেব্রুয়ারি রাসেল শিরোনামটি ছোট করে 'সাইলেন্ট জেনোসাইড বাংলাদেশ' নামে আবার সেই একই বক্তব্য প্রচার করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি তা মিডিয়ার নজরে আসে। মাহফুজ আনাম যৌক্তিক প্রশ্ন রেখেছেন। "আমাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত এজেন্সিসমূহ কী করছিল? যেখানে আমাদের জাতীয় স্বার্থ বিঘ্ন হওয়ার পথে।" তিনি যর্থাথই প্রশ্ন রেখেছেন, যেখানে নিয়ত তারা নাগরিকদের ফোনালাপ রেকর্ড করে, ওয়েবসাইট মনিটর করে, তাদের তিন মাস লাগল কেন এ বিষয়ে। তিনি আরও লিখেছেন, এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত এবং যাদের শৈথিল্যে এমনটি ঘটেছে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। বিজ্ঞ মাহফুজ আনাম জানেন কিনা জানি না, কোন দলই সরকারে গেলে নিরাপত্তা এজেন্সিসমূহ এবং সেনাবাহিনী সংক্রান্ত সব বিষয়ে কোন তদন্ত করা দূরে থাকুক, করের অধিকাংশ টাকা তাদের পিছে ব্যয় করতে আনন্দ পায় এবং এ সব বিষয়ে কোন নাগরিকের প্রশ্ন করার মৌল অধিকারকে দেশদ্রোহিতামূলক মনে করে। এবং প্রতিটি সরকার পতনে নিরাপত্তা সংস্থাসমূহের তথ্য গোপন, ভুল তথ্য ও বিশ্লেষণ সহায়তা করে। বর্তমান সরকার তো নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ ও সেনাবাহিনীর ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল। এর একটি কারণ, জামায়াত-বিএনপির সরকার উৎখাতে সংবিধানবিরোধী সহিংস আন্দোলন এবং সুশীল বাঁটপাড় ও মিডিয়ার প্রভাবশালী অংশের সর্মথন।

জাওয়াহিরি বা আল কায়েদার সঙ্গে বাংলাদেশের সন্ত্রাসীদের [জেহাদী নামে যারা পরিচিত] মাখামাখি অনেক দিনের। আয়মান জাওয়াহিরি মিসরীয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানোর দায়ে ১৯৯৭ সালে মিসরীয় আদালত তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। সন্ত্রাস বিশেষজ্ঞ ব্রুম রিডেল লিখেছেন,

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সালে বিন লাদেন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সন্ত্রাসী গ্রুপ ও তার গ্রুপ একত্রিত হয়ে গঠন করে জিহাদের জন্য বিশ্ব ইসলামিক পক্ষ বা ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট। এরপর তারা নেমে পড়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসী হামলায়। এর অর্থ ১৯৯৮ সালের আগেই এবং পরে বাংলাদেশে এ সব সন্ত্রাসী গ্রুপ গঠন করা হয়। যদি স্মৃতিভ্রম না ঘটে থাকে তা'হলে বলতে হয়, ঐ আমলেই অর্থাৎ শেখ হাসিনার আমলেই প্রথম হরকত-উল-জেহাদ কবি শামসুর রাহমানকে আক্রমণ

করে। তারপর শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা, কমিউনিস্ট পার্টির সভায় বোমা হামলা, উদীচীর সভায় হামলা প্রভৃতি শুরু হয়।

রিডেল দেখিয়েছেন জাওয়াহিরি বিভিন্ন সময় ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। জাওয়াহিরি মনে করেন, পশ্চিমে আমেরিকা, ইউরোপ, [ইসরাইল তো আছেই] এবং পূর্বে ভারত ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ভারতীয়দের খুশি করেনি। এবং ভারতের হিন্দু সরকার শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করতে চায় না, তারা পুরনো সীমান্তে ফিরে যেতে চায় এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে সেই সীমার অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।

জওয়াহিরি বার বার বলেছেন, পাশ্চাত্যের লক্ষ্যই হচ্ছে পাকিস্তানকে বিভক্ত করে দুর্বল করা যাতে ভারত সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। এর উদাহরণ হিসেবে তিনি ১৯৭১ সালের কথা উল্লেখ করেন। ঐ সময় বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। জাওয়াহিরি যে সময় এই উক্তি করেন সেই সময় মুশাররফ ছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। জওয়াহিরি বলেছিলেন, মুশাররফকে হত্যা না করলে পাকিস্তান আবার ১৯৭১ সালের মতো গাড্ডায় পড়বে। যখন এক লাখ পাকিস্তানী সৈন্যকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। লক্ষণীয় জামায়াতও সেই ১৯৭১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত একই ধরনের কথাবার্তা বলে আসছে।

সুতরাং যে বার্তা আমরা এখন পাচ্ছি তা নতুন কিছু নয়। পার্থক্য এই যে, বার্তাটি একটু বিস্তৃত, নির্যাস একই– তা' হলো, হিন্দু ভারত দখল করতে চায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। সুতরাং হিন্দু ভারতকে ধ্বংস করতে হবে। এবং তা করতে হলে দুই দেশেই ইসলাম পছন্দ সরকার থাকতে হবে। এর অর্থ ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা ইসলামবিরোধী এবং যারা রাখে তাদের হত্যা করতে হবে।

আল কায়েদা প্রকল্পটি লাদেন, জাওয়াহিরি প্রমুখের সাহায্যে, আমেরিকা ও তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পৃথিবীর একমাত্র আইনী সন্ত্রাসী সংস্থা আইএসআইয়ের সাহায্যে তালেবানদের সংগটিত করে। তালেবানদের একরকম মুখপত্র ছিল আল কায়েদা। বেনজীর ভুট্টো লিখেছেন, তার দলের এমপিদের ঘুষ দিয়ে সরকার পতনের জন্য আইএসআই বিন লাদেনকে ১০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল। ১৯৯৫ সালে সন্ত্রাসী রামজী বিন ইউসুফ স্বীকার করেন ১৯৯৩ সালে আইএসআই ও বিন লাদেনের সহায়তায় দু'বার বেনজীরকে তিনি হত্যার চেষ্টা করেন এবং অবশেষে সফল হন।

২০০০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ভারত সফর করেন। একদিনের জন্য তার ঢাকায় আসার কথা। ব্রুস রিডেল তখন হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টা। আত্মস্মৃতিমূলক রচনায় লিখেছেন। যাত্রা শুরুর আগের দিন সিআইএ জানাল, তারা খবর পেয়েছে প্রেসিডেন্টের প্লেন ঢাকায় অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে

ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ (সারফেস টু এয়ার মিসাইল) করে তাকে হত্যা করা হবে। হোয়াইট হাউসে তখন সভা বসল, সফর থেকে ঢাকা বাদ যাবে কিনা তা নিয়ে সমস্যা হলো, প্রেসিডেন্ট পাকিস্তান যাবেন বাংলাদেশ যাবেন না, তা'হলে উপমহাদেশে তা কি বার্তা দেবে যেখানে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন করে এগিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে? রিডেল স্পষ্ট ভাষায় বললেন, বাংলাদেশ যেতে হবে hy headed by Sheik Hasina, a female prime minister and thus a rare commodity in the Islamic world, it was also a poster child for the microcredit concept developed by Clinton long time friend mohammad yunus in his Grameen Bank in Bangladesh. Further more, the country didnot support terrorism. didnot seek to acquire weapons of mass destruction and was not a threat to regional peace. In other words it was the kind of muslim democracy wanted to Supporter

রিডেলের যুক্তি অবশেষে গ্রাহ্য হয়। এবং ঠিক হয় দিল্লি থেকে ক্লিনটন একা আসবেন। দিনের বেলাটুকু থাকবেন। শেখ হাসিনা তাকে অনুরোধ করেছিলেন টুঙ্গিপাড়া যেতে, আর ড. ইউনূসের জয়পুরা গ্রাম। কোনটিতেই তিনি যাবেন না। যানওনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ বিদেশী বিভিন্ন মাধ্যমের প্রতিবেদন সংকলন করে লিখেছে, জাওয়াহিরি ২০০২ সালে 'মক্কা' নামক জাহাজে করে ৪০ জন সশস্ত্র লোক ও অস্ত্রের চোরাচালান নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। এক মাসের বেশি সময় বাংলাদেশে ছিলেন। এবং এক মৌলবাদী নেতার বাসায় ছিলেন। সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গেও তার আলাপ হয়। এর আগের বছর সেই এমভি মক্কা আফগানিস্তানে প্রশিক্ষিত ৫০ জনকে বাংলাদেশে পৌঁছে দেয়।[২২-২-২০১২]

সুতরাং হঠাৎ করে জওয়াহিরি বার্তা প্রদান করলেন তা' নয়। এর ধারাবাহিকতা ও কারণ আছে। ভুলে গেলে চলবে না ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সালে এই সন্ত্রাসীদের যে চুক্তি হয় সেখানে ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশে জেহাদী আন্দোলন জোরদার করা হবে। এবং সেখানে সই করেন বিন লাদেনের পক্ষে পাকিস্তানের ফজলুর রহমান।

জিয়াউর রহমান যখন বঙ্গবন্ধুর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা বাতিল করেন ধর্মভিত্তিক রাজনীতির তখন থেকেই জামায়াতে ইসলামীর প্রাক্তন সদস্যরা বিভিন্ন সংগঠনের নামে রাজনীতি শুরু করেন এবং সৌদি আরব ও প্রবাস থেকে প্রকাশ্যে চাঁদা নেয়া শুরু করেন। ১৯৮৪ সাল থেকে সেই সময় *সাপ্তাহিক বিচিত্রা* ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণসহ বিষয়গুলো তুলে ধরে। কিন্তু কেউ তা গ্রাহ্য করেনি। আর রাজনীতি প্রতিকূল থাকায় রাজনীতিবিদরাও খুব উচ্চবাচ্য করেননি। যখন যুদ্ধাপরাধ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়, জানিয়েছেন শাহরিয়ার, তখন ১৯৯২

সালের এপ্রিল মাসে হরকত-উল-জেহাদ আত্মপ্রকাশ করে। এবং জামায়াত সদস্যরাই সেটি গঠন করে। তারপর থেকে বিভিন্ন উপায়ে তারা বাংলাদেশ দখলের পরিকল্পনা নেয়। এ কারণেই আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে জামায়াত কর্মীরা প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করে। হুসাইন হাক্কানী লিখেছেন, আইএসআই পরিকল্পনা নিয়েছিল ভারতকে ঘিরে ফেলতে হবে। সে কারণেই তাদের পরিকল্পনা ছিল বাংলাদেশে জিহাদী নামে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর লালন-পালন শুরু করে এবং তারা নিশ্চিত করতে চেয়েছে ক্ষমতায় যেন সব সময় আওয়ামীবিরোধীরা থাকে অর্থাৎ, বিএনপি-জামায়াত। ১৯৭১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত যেসব পাকিস্তানী প্রশিক্ষিত সেনাকর্মকর্তা ছিলেন তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাদের নিরাপত্তা সংস্থা ডিজিএফআইয়ের সঙ্গে আইএসআইয়ের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। আমার লেখা 'বাংলাদেশী জেনারেলদের মন'-এ এ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হয়েছে, তাই এখানে তা আর লিখলাম না।

ফজলুর রহমানের চুক্তি স্বাক্ষরের পর হুজি তার শক্তি প্রদর্শনে নেমে পড়ে। ১৯৯৯ সালের ২৮ জানুয়ারি তাদের সদস্যরা কবি শামসুর রাহমানের ওপর হামলা করে। শেখ হাসিনা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। টিপিক্যাল আওয়ামী লীগাররা যা বলেন বা করেন প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া তাদের ছিল এরকম। অর্থাৎ শামসুর রাহমান পাবলিসিটির জন্য এরকম করেছেন। কিন্তু শেখ হাসিনা তখনই কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন জঙ্গীদের বিরুদ্ধে। ৪৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার মধ্যে বিদেশীও ছিল। এবং হুজিই যে কবিকে হত্যা করতে চেয়েছিল তা স্বীকার করে। শুধু তাই নয়, একজন স্বীকারোক্তি দেয় যে, আইএসআই তাদের ২ কোটি টাকা দিয়েছে ৪২৫টি মাদ্রাসা থেকে সদস্য রিক্রুট করতে। ২০০০ সালে শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য টুঙ্গিপাড়ায় বোমা পেতে রাখা হয় এবং একই সময় কোটালিপাড়ায় বোমা হামলা করা হয়। এতে অনেকে নিহত হন। এর পর পর কমিউনিস্ট পার্টির জনসভায় হামলা হয়। লক্ষ্য করবেন, কমিউনিস্টদের জামায়াত বা পাশ্চাত্য বিশেষ করে আমেরিকা সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে। এদিক থেকে জামায়াত, সন্ত্রাসী ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দর্শনের মিল আছে। সেই বোমা হামলায়ও অনেকে নিহত হন। খুলনায় কাদিয়ানী মসজিদে বোমা হামলা হয় ১৯৯৯ সালে। নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় শামীম ওসমানের কর্মীসভায় বোমা হামলা হয় ২০০১ সালে।

জামায়াত-বিএনপি ক্ষমতায় আসে ২০০১ সালে। তারা কীভাবে ক্ষমতায় এসেছিল সে পটভূমি আমাদের জানা। সংক্ষেপে শুধু বলব, সেই সময় পাকিস্তানী পত্রিকায় খবর ওঠে ছাপা হয় যে, বাংলাদেশের সেনাকর্মকর্তাকে প্রচুর টাকা দেয়া হয়েছে উপঢৌকন হিসেবে। নির্বাচনে জামায়াত-বিএনপির পক্ষে সেনাবাহিনী

বিশেষ ভূমিকা রাখে। মিডিয়া, আমলাতন্ত্র, বড় ব্যবসায়ী সবাই ছিল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে।

বিএনপি-জামায়াত আমলে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য দুটি– একটি দেশজুড়ে প্রকাশ্যে জঙ্গী মৌলবাদীদের সাহায্য। দুই. ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্য। এর মধ্যে হঠাৎ ধরা পড়ে ১০ ট্রাক অস্ত্র, আরও পরে এক ট্রাক গোলাবারুদ। এসবই ছিল আইএসআই তথা সন্ত্রাসবাদী বা জিহাদী বা আল কায়েদা নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। সেই সময়ই স্লোগান দেয়া হয়– আমরা সব তালেবান, বাংলা হবে আফগান। শাহরিয়ার কবির সেই সময় এই ধরনের গোপন সংগঠনগুলোর যে তালিকা তৈরি করেন তাতে দেখা যায়, ২০০১ সালের আগে যেখানে এ ধরনের গোপন সংগঠনের সংখ্যা ছিল ৩টি। ২০০১-৬ সালে তা দাঁড়ায় ১২৫টিতে।

এ সময় বড় ধরনের যেসব বোমা হামলা হয় সেগুলো হলো–

২০০২ সাতক্ষীরা সিনেমা হল
২০০২ ময়মনসিংহ সিনেমা হল
২০০৩ লক্ষ্মীপুর সিনেমা হল
২০০৪ শাহজালাল (র) মাজার
২০০৪ ব্রিটিশ হাইকমিশনারের গাড়ি
২০০৪ সিলেট সিনেমা হল
২০০৪ বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউতে গ্রেনেড হামলা
২০০৪ আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা
২০০৫ এসএএমএস কিবরিয়া হত্যা।

এ সমস্ত হামলায় অনেকে নিহত হন। এসব হামলার একটা প্যাটার্নও লক্ষণীয়। হামলার লক্ষ্যবস্তু সিনেমা, মাজার, সার্কাস মেলা ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহ এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। আদর্শগতভাবে জেহাদীরা এর বিরোধী। আর আওয়ামী লীগ তো রাজনৈতিক দল হিসেবে শত্রু, যেহেতু তারা পাকিস্তানে বিশ্বাস করে না। দুই. ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লালন পালন।

জামায়াত-বিএনপি এভাবে দেশটিকে আফগানিস্তান/পাকিস্তান বানাবার পরিকল্পনা নিয়ে ভালভাবে এগুচ্ছিল। যেসব বিদেশী শক্তি বিএনপি-জামায়াতের পক্ষে ছিল প্রাথমিকভাবে তার মধ্যে ভারত, আমেরিকাও ছিল। তারা প্রমাদ গোনে। কারণ যে দানবকে বোতলের ছিপি খুলে বের করা হয়েছে তাকে বোতলে ঢোকানো মুশকিল হয়ে পড়ে। মিডিয়াও এক সময় হতাশ হয়ে পড়ে। কারণ, সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতন সমানতালে চলছিল। এমনকি ক্লিনজিংয়ের তো কথাই নেই। ক্ষমতায় থাকার জন্য বিএনপি যেসব কুমতলব করেছিল সেগুলোও ফাঁস হয়ে পড়ে। এবং এক সময় বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়।

জামায়াত-বিএনপি নেতৃবৃন্দ প্রায়ই বলেন, তাদের আমলে জঙ্গীদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের আমলে বাধ্য হয়ে শায়খ আব্দুর রহমান এবং বাংলাভাইকে গ্রেফতার করতে হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ আমলে গ্রেফতারকৃতদের জামিনে ছেড়ে দেয়া হয়। শামসুর রাহমান হত্যা চেষ্টা মামলায় বিএনপির আমলে যে চার্জশীট দেয়া হয়, বিচারক তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, যেখানে, যতিচিহ্নহীন একটি বাক্য ১৫০ লাইন দীর্ঘ এবং সেখানে প্রায় লেখা হয়েছে 'শোনা যায়', 'নাকি,' সেখানে চার্জশীট টেকে কিভাবে? তাকে তো বাধ্য হয়েই জামিন দিতে হয়। গ্রেনেড হামলায় বিএনপি-জামায়াত গ্রেফতার করেছিল জজ মিয়াকে, ময়মনসিংহ বোমা হামলায় শাহরিয়ার ও আমাকে। এই হচ্ছে জঙ্গী দমনের নমুনা। উল্লেখ্য, শামসুর রাহমানের মামলায় আওয়ামী লীগ সরকারের গ্রেফতারকৃত ৪৮ জন জামিন পান বিএনপি আমলে।

যুদ্ধাপরাধ বিচারে জামায়াত-বিএনপি বিরোধিতা করেছে এবং পাকিস্তান তাদের সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছে। এমনকি সংসদে নিন্দা প্রস্তাব পাস করেছে। গত এক বছরে এ কারণেই তারা সহিংস আক্রমণ চালিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ওপর।

জাওয়াহিরির বার্তার পর অনেকে বলেছেন, জামায়াত-বিএনপি এবং বিএনপি না হলেও জামায়াতের কোন না কোন হাত আছে এ ব্যাপারে। নবেম্বরে যেহেতু বার্তাটি প্রচারিত হয়েছে সেহেতু এই সন্দেহ। অনেক ভাষ্যকারও আপত্তি তুলেছেন এ বলে যে, সব ঘটনার জন্য বিএনপি-জামায়াতকে দোষী করা ঠিক নয়। আওয়ামী লীগ থেকেও বলা হয়েছে, এর পেছনে প্ররোচনা যুগিয়েছে বিএনপি-জামায়াত। সরকার থেকে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।

জামায়াত-বিএনপি যে এদেশে জঙ্গীবাদের উদ্যোক্তা, প্রশ্রয়দাতা এ ব্যাপারে তো লুকোছাপার কোন ব্যাপার নেই, ডিফেন্ড করার ব্যাপার নেই। আমি যে সব ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি তাতে নিশ্চয়ই একটা প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

জাওয়াহিরি ১৯৭১ থেকে সবকিছুর জন্য হিন্দু ভারতকে দায়ী করেন। জামায়াত-বিএনপিও তাই করে। তারা বলছে, ভারতগামী ট্রেনে আছে সরকার। তারা ভুলে যায়, ভারতে মুসলমানের সংখ্যা বাংলাদেশ থেকেও বেশি। পাকিস্তান যুদ্ধাপরাধ বিচার সমর্থন করেনি। বিএনপি-জামায়াতও না। অধিকাংশ গোপন জঙ্গী সংগঠন জামায়াতের সঙ্গে কোন না কোনভাবে যুক্ত। জাওয়াহিরি যেমন মনে করেন, বাংলাদেশ হবে মুসলমানদের স্থান বিএনপি-জামায়াতও তাই মনে করে। জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি সেই কারণে। এবং 'আমরা হবো তালেবান' এই স্লোগান তো আওয়ামী লীগের নয়, ১৯ দলীয় জোটভুক্ত কয়েকটি দলের। এই স্লোগানের কারণে খালেদা জিয়া কি তাদের তিরস্কার করেছিলেন?

জাওয়াহিরির বার্তা সম্পর্কে মির্জা ফখরুল বলেছেন, বর্তমান সরকার আমেরিকাকে কাছে আনতে চায় সে জন্য এই বার্তার দায় তাদের ওপর চাপিয়েছে। রাজনীতিবিদরা ফালতু কথা যত কম বলবেন ততই ভাল। মির্জা ফখরুলের ভাষ্য অনুযায়ী আমেরিকা তাহলে তাদের পক্ষে আছে। সেটি স্বাভাবিক। ১৯৭১ সালে ছিল, ২০১৪-তে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। আমেরিকা নিজ দেশে জিহাদী বা সন্ত্রাসীদের ঠাঁই দেবে না কিন্তু অন্য দেশে থাকলে সমর্থন করবে। তালেবান আমেরিকানদের সৃষ্টি। বিভিন্ন দেশে অস্থিতিশীলতা থাকলে আমেরিকার সুবিধা। সন্ত্রাসকে যদি মন থেকে আমেরিকা নির্মূল করতে চাইত তাহলে জামায়াত-বিএনপিকে গণতন্ত্রের নামে সমর্থন দিত না। নিজ দেশে তারা এ সমর্থন দেয় না। মজেনাকে কেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভ্য আখ্যা দেয়া হয় মির্জা ফখরুল কি তা জানেন না?

যাহোক, আমাদের মূল বিষয় তা নয়। জাওয়াহিরির বার্তাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। এই ক্ষেত্রে শোভন হতো যদি সব রাজনৈতিক দল বলত, এই বার্তা আমাদের জন্য অশনি সংকেত, আসুন আমরা একসঙ্গে তা প্রতিহত করি তাহলে তা যুক্তিযুক্ত হতো। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতের পক্ষে তা সম্ভব হবে না। কারণ, পূর্ব ইতিহাস।

বাংলাদেশ তালেবানী রাষ্ট্র হলে কি জামায়াত-বিএনপির সুবিধা হবে? বিন্দুমাত্র নয়, বিএনপির তো নয়ই। এখন বিএনপির যেসব নেতা লাফালাফি করেন তাদেরও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। এ কথা কি তারা বোঝেন? জওয়াহিরির বার্তার বিরুদ্ধে যদি তারা বার্তা দিতেন তাহলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন হতো। সমঝোতার একটি জায়গা তৈরি হতো। দেশের স্বার্থ রক্ষা হতো। এ দিকটা রাজনীতিবিদরা কখনও ভেবে দেখবেন কিনা কে জানে।

সবচেয়ে আশ্চর্য, আমাদের সেই বিখ্যাত মিডিয়া সৃষ্ট সিভিল সমাজ। নির্বাচনের আগে পাকিস্তানপন্থী মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াত-বিএনপির সংবিধান বিরোধী দাবি কেন মেনে নেয়া হচ্ছে না সে জন্য তাদের বিশাল ক্রোধ, পাকিস্তানীরা নির্বাচনে আসছে না দেখে হাহাকার। তাদের ছাড়া নির্বাচন হয়ে গেল বলে গণতন্ত্র ভেঙ্গে গেছে বলে আর্তচিৎকার। জওয়াহিরির বার্তার পর তারা পিরামিডের মতো নিস্তব্ধ। একটি নিন্দা বাক্যও বের হয়নি তাদের মুখ থেকে। এর কারণ কি? তারা তো 'নিরপেক্ষ।' শুধু আওয়ামী লীগের যে কোন কর্মকাণ্ডে তাদের শরীর চুলকায়, পাকিস্তানীরা, জঙ্গী মৌলবাদীরা যাই বলুক মনে যেন তাদের প্রশান্তি এনে দেয়। সুশীল বাঁটপাড় শব্দটির উদ্ভব কেন হয়েছিল পাঠক নিশ্চয় তা অনুমান করতে পারছেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

নিজেদের নিয়েই বিতর্ক আইসিটিতে

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যে সব ঠিকঠাকমতো চলছে না তা সংবাদপত্র ও বিদ্যুতায়িত মাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে। ট্রাইব্যুনালের দুই প্রসিকিউটর, প্রধান প্রসিকিউটর ও সমন্বয়কের বিভিন্ন বক্তব্যে বোঝা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে যে দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এখন তার বহির্প্রকাশ ঘটছে। রাজনৈতিক প্রভুরা হয়ত এতে খুব আনন্দিত, আওয়ামী লীগের মধ্যে জামায়াত সমব্যথীরাও আনন্দিত। কিন্তু আমরা নই। কেননা, এই আন্দোলনের সঙ্গে আমরা দীর্ঘদিন ধরে জড়িত এবং আওয়ামী লীগ এতে যোগ দিয়েছে পরে এবং শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য সব নেতার এ বিচারের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। ভোটের রাজনীতির কারণে, অনেকে বিচারের বিপক্ষে ছিলেন। শুধু শেখ হাসিনার কারণেই বিচার শুরু হয়েছিল।

শুরু থেকেই ট্রাইব্যুনাল নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। না, আমি জামায়াত-বিএনপি সৃষ্ট বিতর্কের কথা বলছি না। আমি বলছি, সরকার ও আওয়ামী লীগ সৃষ্ট বিতর্ক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অনেকে জানিয়েছেন, সব জানেন। সবই যদি জানেন, তাহলে শুরু থেকে যে সব অনভিপ্রেত ঘটনাবলী ঘটছে তা হতে দিলেন কেন? তাঁর কাছে কি শুধু মন্ত্রী বা পার্শ্বচরদের মন্তব্যই গ্রাহ্য। অন্যদের নয়? যদি ওপরেরটি সত্য হয় তা হলে বলতে হবে, আওয়ামী লীগ যে গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছে তা শুধু সরকার নয়, দলের জন্যও বিপজ্জনক হবে।

ট্রাইব্যুনাল যখন গঠিত হয় তখন প্রধান প্রসিকিউটর নিয়েই সমস্যা দেখা দেয়। তারপর বিতর্ক শুরু হয় প্রসিকিউটর নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া বোধহয় এ শহরের সবাই জানতেন, সাহারা খাতুন, ব্যারিস্টার শফিক আহমদ ও কামরুল ইসলামের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। আমরা বার বার এই দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরেছি, কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছি। প্রধানমন্ত্রী জানলে নিশ্চয় তখন ব্যবস্থা নিতেন। কিন্তু তিনি যে বলেন, তিনি সব জানেন। এখন যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে, তা দেখেও যদি কর্তৃপক্ষ না বোঝার ভান করেন, তা হলে তার চড়া মাসুল দিতে হবে। ক্ষমতায় থাকলে অনেকে সেটি বোঝেন না কিন্তু জীবনে অনেক ক্ষমতাবান দেখেছি। তাদের খোঁজ কে রাখে?

যে প্রসঙ্গ নিয়ে প্রায়ই প্রতিবেদন দেখছি, তার সূত্রপাত তৎকালীন আলবদর প্রধান ও জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামীর মামলা নিয়ে। মীর কাশেম আলী ও নিজামীর মামলা নিয়ে টানাপোড়েন দীর্ঘদিন চলছে। মীর কাশেম বাংলাদেশের অন্যতম ধনী। নিজামীর জন্য জামায়াতের প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের দরজা খুলে রেখেছে। গত একবছর ধরেই শুনছি, জামায়াতের অর্থ সরকার ও সরকারী দলে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও কিছু করতে পারবেন না। ঐ সময় শুনেছি, আটক জামায়াতের অনেক নেতাকর্মীর জামিন আবেদন নিয়ে প্রসিকিউটরদের কারও কারও উকিলালয় [চেম্বার] পেরেশান হয়েছে। যাঁরা এই কাজটি করেছেন তাঁদের সম্পর্কেও নানা কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে যা প্রধানমন্ত্রীর দফতর ছাড়া সংশ্লিষ্ট সবাই জানতেন। বা হয়ত বিষয়টি ছিল গুজব, তাই প্রধানমন্ত্রী তাতে গুরুত্ব দেননি। বর্তমান উপজেলা নির্বাচনে জামায়াত শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে তা কি টাকার জোরে না আদর্শের জোরে? তারা প্রায় ক্ষেত্রে একাধিক প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে। টাকা দিয়ে প্রায় প্রতিটি রাজনীতিবিদকে কেনা যায়- এটা রাজনীতিবিদরা ছাড়া সবাই জানেন। জিয়াউর রহমান ও পরবর্তীকালে এরশাদ কেনাবেচাটা ভালই করেছেন। বার বার কেনা এই রাজনীতিবিদরা যে রাস্তায় প্রহারের সম্মুখীন হন না তার কারণ বাঙালির নিস্পৃহতা, যা সহনশীলতা হিসেবেও পরিচিত।

বর্তমান দ্বন্দ্বের বহির্প্রকাশ ঘটেছে নিজামীর মামলার শুনানির ঘটনায়। বিচারপতি ইনায়েতুর রহিম ট্রাইব্যুনাল ১-এর সভাপতি হিসেবে যোগ দিয়েছেন। ইতোমধ্যে নিজামীর মামলার শুনানি, যুক্তিতর্ক শেষ। রায়ের অপেক্ষায় ছিল মামলাটি। ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের যুক্তিতর্কের আবেদন জানান। পত্রিকার ভাষ্যানুযায়ী- 'রায়ের জন্য দিন ধার্য করতে রাষ্ট্রপক্ষের স্বাভাবিক আরজির বদলে কৌঁসুলি মোহাম্মদ আলী মামলাটিতে নতুন করে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য তারিখ নির্ধারণের আরজি জানান। এতে এজলাসে উপস্থিত রাষ্ট্রপক্ষের অন্য কয়েক কৌঁসুলি বিস্ময় প্রকাশ করেন। এক কৌঁসুলি তাঁর এক সহকর্মীকে ফিসফিস করে বলেন, এটা কী হচ্ছে? তিনি তো আসামিপক্ষের আইনজীবীর মতো কাজ করছেন।

যেহেতু রাষ্ট্রপক্ষই নতুন করে যুক্তি উপস্থাপনের আরজি জানিয়েছে, ফলে আসামিপক্ষের আইনজীবী তাজুল ইসলামকে আর কিছুই করতে হয়নি। তিনি শুধু বলেন, যুক্তি উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি নিতে তাদের এক সপ্তাহ সময় প্রয়োজন। ট্রাইব্যুনাল নতুন করে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ১০ মার্চ দিন ধার্য করে।' [*প্রথম আলো*, ২৮.২.২০১৪]

আসলে আইনানুযায়ী। নতুনভাবে যুক্তিতর্কের উপস্থাপনের বিধান নেই। তবুও বিচারপতি ইচ্ছে করলে তা পারেন এবং বিচারপতি নতুনভাবে দিন ঠিক করেন।

সাধারণত এ রকম দাবি করেন আসামিপক্ষ। সরকার পক্ষ তাতে আপত্তি জানান। ফলে, ঘটনাটি সবার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকেছে। ঐ দিন টেলিভিশনে এবং পরদিন সংবাদপত্রে তা প্রচারিত হয়। নির্মূল কমিটির প্রধান শাহরিয়ার কবিরকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন– 'যে প্রসিকিউটর (কৌঁসুলি) আসামিপক্ষের আইনজীবীদের মতো আরজি জানান, প্রসিকিউশনে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই।' তিনি বলেন, 'বিচারের একেবারে শুরু থেকেই আমরা দক্ষ, যোগ্য ও সৎ আইনজীবীদের নিয়ে প্রসিকিউশন গঠন করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু সরকার ও প্রশাসন আজ পর্যন্ত আমাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। বিচার নিয়ে সরকারের এই গাফিলতি দেশের মানুষ ক্ষমা করবে না।' [ঐ]

তাঁর এই প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক নয়। তিনি চার দশক এ নিয়ে আন্দোলন করছেন। জীবন-যৌবন এ কারণেই বিসর্জন দিয়েছেন। মনে রাখা উচিত, গোলাম আযমের পরই গুরুত্বের দিক থেকে নিজামীর মামলা।

এ নিয়ে যদি কোন উচ্চবাচ্য না হতো তা হলে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যেত। আমাদের হয়ত ক্ষোভ থাকত। কিন্তু জনাব আলী ১ মার্চ *মাছরাঙা* টিভিতে একটি সাক্ষাতকার দিলেন। এখানে তাঁর ক্ষোভের বহির্প্রকাশ ঘটে। তিনি কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করেন।

১

শাহরিয়ার কবির কেন মন্তব্য করলেন- এটি তাঁর ক্ষোভের বিষয়। একটি পাবলিক ট্রায়াল হচ্ছে যেখানে পাবলিক মাত্রই তার ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারে। আমরা নিত্যদিন প্রধানমন্ত্রী, বেগম খালেদা জিয়া বা মন্ত্রীদের তুমুল সমালোচনা করি। তাঁরা কি প্রতিদিন আমাদের বিরুদ্ধে নাম ধরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন? করেন না। কারণ, তাঁরা পাবলিক ফিগার। সমালোচনা তাঁদের শুনতে হবে। গণতান্ত্রিক সমাজের এটিই নিয়ম। তিনি বলেছেন, 'আচ্ছা এখন আমি বলছি- আমি পত্রিকায় দেখেছি প্রথম আলোতে। জনাব, আমাদের খুবই শ্রদ্ধেয় জনাব শাহরিয়ার কবিরের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রথম আলোতে ছাপা হয়েছে- আমি একটি পেপারেই দেখেছি। কেন শাহরিয়ার কবির সাহেব এই ট্রাইব্যুনালের কোন কিছু না হয়েও ল'ইয়ার না হয়ে, উনি ট্রাইব্যুনালের কোন প্রসিকিউটর বা আসামিপক্ষের ল'ইয়ার কোন পক্ষেরই ল'ইয়ার না হয়ে, তিনি Completely একটা Unconcerned personal হয়ে তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয়- কেন এই বিষয়টা আমার কাছে জিজ্ঞাসা না করে বা কোর্টের সঙ্গে আলাপ না করে কেন তিনি বললেন, এই

বিষয়টা আমার কাছে বোধগম্য নয়।' [*মাছরাঙা*, সাক্ষাতকারের ভিডিও]

প্রথম কথা হচ্ছে, শাহরিয়ার বা আমি বা যে কেউ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে কথা বলতে পারি। শাহরিয়ার ট্রাইব্যুনাল ও এর আইন নিয়ে যথেষ্ট লেখালেখি করেছে। এটি তাঁর অর্জন। ইউরোপ ইউনিয়ন থেকে ইংল্যান্ডের সংসদীয় শুনানি- বিভিন্ন জায়গায় তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন এ বিষয়ে কথা বলার জন্য। তাঁরা জানেন, শাহরিয়ার আইনজীবী নন। তাহলে ট্রাইব্যুনালের কাউকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে তাঁকে কেন ডাকা হয়? আমি জানি, সরকারের অনেকেই তাঁকে পছন্দ করেন না, কিন্তু অন্তত এ বিষয়ে শাহরিয়ার সম্পর্কে তাঁরা কোন মন্তব্য করেন না। কেননা, সবাই মেনে নিয়েছেন, ভাল না লাগলেও যে, এটি তাঁর অর্জন। আর সংবাদপত্রের কোন প্রতিবেদন সম্পর্কে কেউ প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে, যার কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয় তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না বিষয়টি তদন্ত করার। সেটির দায়িত্ব সংবাদকর্মীর। সেটি তাঁরা করেছেন।

২.

তিনি এরপর অভিযোগ করেছেন। ট্রাইব্যুনালের আরেক প্রসিকিউটর তুরিন আফরোজ সম্পর্কে। জনাব আলী কিন্তু, সাক্ষাতকারে তুরিনের নাম বলেননি। তবে বিস্তারিত যা বলেছেন তাতে উল্লিখিত ব্যক্তি যে তুরিন আফরোজ সেটি বোঝা যায়। তাঁর ক্ষোভ, তুরিন শাহরিয়ারকে মিসরিপোর্ট করেছেন সে কারণে শাহরিয়ার এই বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁর ক্ষোভটা এখানে 'তবে আমার কাছে বোধগম্য হয়েছে আমাদের মধ্যে কোন বন্ধু যিনি কখনই জীবনে কোর্টে প্র্যাকটিস করেন নাই, যাকে আমার সুপ্রীমকোর্টের কোন বন্ধু/ফ্রেন্ড বলতে পারবে না তাঁকে কোন দিন সুপ্রীমকোর্টে প্র্যাকটিস করতে দেখেছেন এবং নিচের কোর্টের কোন বন্ধুও বলতে পারবে না তাঁকে কোনদিন নিচের কোর্টে প্র্যাকটিস করতে দেখেছেন- তিনি শিক্ষকতা করেন- তো তিনি অতি উৎসাহী হয়ে এবং তিনি জনাব শাহরিয়ার কবিরের অত্যন্ত প্রিয় এবং কাছের মানুষ। আমি ধারণা করছি, তিনি এইটা mis-report করেছেন। এই mis-reportation made over to him by that (by that) my friend. হ্যাঁ প্রসিকিউটর। হ্যাঁ যার কথা বলেছি তিনি একজন শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত বন্ধু এবং আমি মনে করি তিনি যেমন সুপেরিয়র রেসপন্সিবিলিটির ওপর তাঁর একটা ভাল অভিজ্ঞতা আছে, ভাল জ্ঞান আছে। এই কারণে আমার এই মামলায় তাঁকে আমি (Invited) Invite করেছিলাম যে আপনি সুপেরিয়র রেসপন্সিবিলিটির ওপর আপনি বক্তব্য রাখবেন, argument করবেন এবং accordingly তিনি তা করেছেন। I am happz with that Ges ZuvੈK Avg wbRB Personally invite করেছি।

তিনি যে কাজটি করেছেন মামলার স্বার্থেই করেছেন এবং একজন সিনিয়র

একজন জুনিয়রের সঙ্গে এ রকম আচরণ করবেন সেটিই কাম্য- যা অনেকে করেন না। তুরিনের কোন মন্তব্য কিন্তু কোথাও ছাপা হয়নি। মোহাম্মদ আলীর একটি বক্তব্য আমি সমর্থন করি। তিনি বলেছেন, প্রসিকিউটরদের মধ্যে মতভেদ হলে সেটি আলাপের মাধ্যমে মীমাংসা করা উচিত। কিন্তু তিনি তা করলেন না কেন? কারণটি হচ্ছে, প্রসিকিউটররা এ বিষয়ের ভেতরে মন্তব্য করেননি। সাংবাদিকরা সংবাদ করেছেন আর শাহরিয়ার তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। শাহরিয়ার কোথাও বলেননি, তুরিন তাঁকে 'রিপোর্ট', করেছেন। পত্রিকায় দেখে তিনি মন্তব্য করেছেন। কিন্তু মোঃ আলীর মনে হয়েছে তুরিনই মন্তব্য করেছেন।

'ব্যাপারটাও যদি উনি মনে করতেন যে এইটা ঠিকমতো হইছে কিনা আমাদের সঙ্গে বইসা এক সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন। কিন্তু outsider একজন শিক্ষাবিদ, তিনি একজন সুধীজন, তাঁর কাছে গিয়া report করা, এইটা আদৌ ঠিক হয় নাই। এইটা নীতিবহির্ভূত হইছে, অন্যায় হইছে' [ঐ]

৩.

তুরিনের প্রতি মোহাম্মদ আলীর ক্ষোভ আছে তা বোঝা গেল। কিন্তু, প্রসিকিউটরদের মধ্যেও যে রেষারেষি চলছে, যা চলা উচিত নয়। মোঃ আলীর আরেকটি বক্তব্যে তা বোঝা যায়- তিনি তুরিনকে এই মামালায় Personally invite করেছি। আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁরা নিষেধ করেছিলেন যে তাঁকে argument করতে দেয়া যাবে না।'

যে আজকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছি আমি উনার বিরুদ্ধে, যে উনি at all কোন Lawyer নন। উনি কখনও কোন প্র্যাকটিস করেন নাই। উনি লেখাপড়া ভাল জানেন, উনি ভাল শিক্ষক। কিন্তু কখনই তিনি কোন প্র্যাকটিস করেন নাই। তিনি না করে, এই trial সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই নেই। উনি এই সমস্ত কথাবার্তা কোর্টের অঙ্গনের বাইরের লোকদের বলে আমাদের ট্রাইব্যুনালের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করছেন। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আমার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমি আবার বলছি, repeat করছি আমার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে তিনি এসব কথা বলছেন এবং তিনি শুধু একা নন, তাঁর সঙ্গে আরও দুই-একজন বন্ধু আছেন।'

৪.

তুরিনের সঙ্গে কি তাঁর সম্পর্ক খারাপ? মোটেই না। তিনি জানিয়েছেন, "আপনারা জানেন খুবই ভাল সম্পর্ক। তিনি আমাকে 'দাদা' বলে ডাকেন, আমি তাঁকে 'নাতনি' বলে ডাকি। অত্যন্ত ভাই-বোনের মতো সম্পর্ক। খুবই ভাল। কিন্তু কোন একটা জায়গায়, আজকে আমাকে আপনি 'মাছরাঙা' টেলিভিশনকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমার মনের খেদ আরও বের করছেন। আমাদের এখানে একটা আছে আমাদের মধ্যে আমরা আছি একটা মনের আর একটা আছে

বামপন্থী। এই বামপন্থী ওয়ালারা আমাদের বার বার ডিস্টার্ব করছে। আমি জানি না, আজকে এই কথা বলতে চাই না। এই কথা বলতে গেলে পলিটিক্যাল কথা হয়ে যাবে। এই বামপন্থী ওয়ালারা এক জোট হয়ে আমাদের কোণঠাসা করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি কখনও কোন পন্থী হয়ে ঐখানে কোন কার্যকলাপ করার চেষ্টা করি নাই। হ্যাঁ আমি এগুলো নিয়ে করি না। আমি কোন গ্রুপিংয়ে নাই। আমি গ্রুপিংয়ে নাই। আমি একজন লিবারেল democrat। আমি খাঁটি আওয়ামী লীগার। আমি কোন বামপন্থীও না, ডানপন্থীও না। আমি মধ্যপন্থী। আমি একজন মডারেট ডেমোক্র্যাট। পরিষ্কার। সুতরাং এইটা নিয়ে এইটাও দুইটা কাজ করেছে যে একটা ঈর্ষা আর একটা হচ্ছে ঐ যে, বাম আর ডানের প্রশ্ন এখানে জড়িত আছে। এই কারণেই তিনি-তিনি [ড. তুরিন] নিজে বামপন্থী হয়ে আরেক বামপন্থী ঐ সুধীজনের [শাহরিয়ার কবির] কাছে গিয়ে এই সমস্ত mis-report করেছেন। I am sorry for that আমি আপনাদের কাছে একটু emotional হয়ে কথা বলছি এই জন্য আমি of you-thank you very much.' [ঐ]

ক্রোধ যে ভাল নয়- এটি আবার প্রমাণিত হলো। জনাব আলী এই ক্রোধ প্রকাশ না করলে ভাল করতেন।

যাঁরা নিজেদের খাঁটি আওয়ামী লীগার মনে করেন, তাঁদের একটি অভিযোগ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে, তিনি বামপন্থীদের আওয়ামী লীগে 'ঢোকাচ্ছেন' এবং আওয়ামী লীগের সর্বনাশ করছেন। যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে বলব, বিএনপিও এ ধরনের অভিযোগ করেছিল। জামায়াতের না পছন্দের দল কমিউনিস্ট পার্টি। জনাব আলী নিশ্চয় জানেন, বঙ্গবন্ধু নিজে ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলে শুধু কাজ করেননি, পরে নিজের দল লুপ্ত করে বাকশাল করেছিলেন। তা'হলে কি বঙ্গবন্ধু প্রাজ্ঞ ছিলেন না? শেখ হাসিনার দলে ও মন্ত্রিসভায় যে সব প্রাক্তন বামপন্থী আছেন তাঁদের দক্ষতা বা সততা নিয়ে কি কোন প্রশ্ন উঠেছে? যাবতীয় প্রশ্ন তো উঠেছে 'খাঁটি'দের সম্পর্কে।

মোঃ আলী যখন খোলাখুলি বললেন, তখন একটি কথা বলি। ট্রাইব্যুনালে যাঁরা প্রসিকিউটর হিসেবে আছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছাত্র ইউনিয়নের বা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোন না কোন সময় যুক্ত ছিলেন, তাঁরা হলেন গোলাম আরিফ টিপু, জেয়াদ আল মালুম ও রানা দাশগুপ্ত। তাঁরা কি জোট বেঁধে মোঃ আলীকে বাধা দিচ্ছেন? অভিযোগটি কিন্তু গুরুতর। বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন, তিনি একজন খাঁটি আওয়ামী লীগার। প্রশ্ন জাগে, প্রসিকিউটর কি নিযুক্ত করা হয়েছে দল দেখে না দক্ষতা দেখে? শুরুতেই বলেছিলাম তিন মন্ত্রীর কথা। তাঁদের দু'জন আওয়ামী লীগসংলগ্ন আইনজীবীদের সংগঠনের প্রভাবশালী নেতা। একজন দলবহির্ভূত বিভিন্ন বাঁ ধারার মতাবলম্বীদের

নেতা। তখন থেকেই কিন্তু এই প্রশ্নের শুরু। আমরা তিন মন্ত্রীর কাছে দেন-দরবার করেছি, দল নয়, যোগ্যতা দেখে নিয়োগ দিতে। তাঁরা যেহেতু মন্ত্রী সেহেতু এতে কর্ণপাত করেননি যার পরিণতি বর্তমান নাটক এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক আইনজীবীরা যে বার বার হারছেন, তার কারণও এই দ্বন্দ্ব। আওয়ামী লীগ যাঁরা করেন তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন সময়টা ১৯৭০-৭১ নয়। অন্যদের [যাঁরা আওয়ামী লীগ করেন না] সমর্থন না পেলে স্থানীয় বা জাতীয়ভাবে আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্পূর্ণ বিজয় সম্ভব নয়। শেখ হাসিনা সেটা বোঝেন দেখেই ১৪ দলীয় জোট করেছেন।

৫.

তবে, ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে জনাব মোঃ আলী ক্ষিপ্ত হয়ে যে দু'টি মন্তব্য করেছেন তা তার ইমেজের ওপর অভিঘাত হেনেছে। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কেও বিনা কারণে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। এর একটি হলো– ক. নিজামীর মামলাটি দুর্বল খ. মন্ত্রণালয় তাঁকে 'অথরিটি' দিয়েছে। তাঁর ভাষায়, **"নিজামীর কেসটাও যেইটা অত্যন্ত দুর্বল ছিল সেইটা অনেকেই করতে পারছিল না, সেইটা আমি করে ফেলেছি সাফল্যের সঙ্গে। এই সাফল্যের কারণেও ঈর্ষান্বিত হতে পারে। দুর্বল ছিল মানে, প্রসিকিউটর দুর্বল ছিল সেইভাবে Prepare করতে পারেনি। কারণ ঃৎরধষ একটা টেকনিক। Trial একটা Art। কী করে যড়ি to prepare the case. Hwo to make the witness prepared. কিভাবে তাদের দিয়ে উপস্থাপন করা হবে। এইগুলো Art-এর ব্যাপার। এই Art অনেকেই জানে না। অনেকেরই তাদের সেই অভিজ্ঞতা নেই Art-এর।"**

"কিন্তু আমি নিয়েছি মাত্র চারমাস আপনারা জানেন। আমি যখন পাঁচ নম্বর সাক্ষী হয়ে গেছি, Then I started from six এবং তখন থেকে witin আমি 4 to 5 months I Completed it. এইটা আগে পড়েছিল বিভিন্নভাবে– that was not my concern. As I was directed by the ministry, proper authorities. Avwg I took over the matter and then I deputed my whole energy and attention to the case। আমি accordingly prepared the case, placed the case before the court by exmination of chief."

১৯৭১ সালের জেনারেশন জানে যে, নিজামী কী করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে মামলা দুর্বল হওয়ার কথা নয়। তারপরও যদি প্রসিকিউটর মনে করেন, মামলা 'দুর্বল' তাহলে তিনি পুনর্তদন্তের আবেদন করতে পারতেন। আর কে কোন্ মামলা করবেন, যদ্দুর জানি তা চীফ প্রসিকিউরটরের এখতিয়ার। মন্ত্রণালয়ের নয়। মন্ত্রণালয় বড়জোর পরামর্শ দিতে পারে যেহেতু সরকার মামলাটি করেছে।

৬.

আসলে, শাহরিয়ার কবিরের প্রতি ক্ষোভ ঝাড়তে গিয়ে তিনি এতসব কথা বলেছেন। শাহরিয়ার প্রসঙ্গে তুরিনের কথা এসেছে– "যদিও আমার সঙ্গে যাঁরা

ছিলেন তাঁরা সবাই বিরোধিতা করেছিলেন উনাকে [তুরিন] দেয়া যাবে না। আমি এই কথাটা বলতে চাইনি, আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছি। তারপরও আমি উনাকে কতটুকু সম্মান করি এবং উনাকে আমি জানি। ও DonÕKnow. উনি বেশি মাতব্বরী করেন। উনি যেটা জানেন না, সেইটাও করেন। উনার তো এই trial অভিজ্ঞতা নাই। উনি তো court-এ Practice করেন নাই। উনি তো Teacher. উনি তো টিচারি করেন– তো উনি তাঁদের ওপর এই ধরনের আচরণ করেন। এটা তো সাংঘাতিক! উনি এইভাবে আমাকে হেয় করার জন্য উনি এইটা শাহরিয়ার কবির সাহেবকে কেন জানালেন? উনি আমাকে বলতে পারতেন, আমার প্রসিকিউটরদের সবাইকে ডেকে বলতে পারতেন যে এইখানে এইটা বোধহয় ঠিক হয় নাই বা ঠিক হয়েছে, আমি explain করতে পারতাম- যে explainationÚ আপনাকে আমি দিলাম।"

আইন খালি যাঁরা প্র্যাকটিস করেন তাঁরাই বোঝেন এই ধারণা বোধহয় ঠিক নয়। তাহলে, দেশে এত আইন কলেজ আছে কেন? শিক্ষকরা যা শিক্ষা দিচ্ছেন তা পুঁজি করেই তো সবাই প্র্যাকটিসে নামেন এবং অভিজ্ঞ হন। শাহরিয়ার তাঁকে জিজ্ঞেস না করায় তিনি যেমন ক্ষুব্ধ হয়েছেন তেমনি শাহরিয়ারের সঙ্গে কথা না বলে তিনিও যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তাঁর ভাষায়ই বলতে হয়। তা কতটা সমীচীন হয়েছে?'

শাহরিয়ার যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন কিন্তু, জনাব আলীও তো সেই একই কথা তুলেছেন- "সেইটা প্রশ্ন উঠছে, সেইটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না- সেইটা অনেকের আছে- আমি এইটা বললেও তো আমার জন্য খুব খারাপ হয় জিনিসটা। আপনারা জানেন যে, যাঁরা অনেকেই ভাল অভিজ্ঞ নয় trial-এ, তাঁদের অনেককে এখানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যাঁরা trial করেননি আগে, তাঁদেরও অনেককে এখানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তো এগুলো নিয়ে আমি কথা তুলিনি, এগুলো authority-এর ব্যাপার।"

তা হলে তো ব্যাপারটা দাঁড়াল শাহরিয়ার কবির খুব একটা ভুল বলেননি।

সবচেয়ে ভাল হতো সংবাদপত্রে প্রতিবেদনের পর চীফ প্রসিকিউটর যদি সবাইকে নিয়ে বসতেন বা সিনিয়র হিসেবে মোঃ আলীই সে অনুরোধ করতেন। যে কোন মামলা নিয়ে প্রসিকিউটরদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে কিন্তু নিজেদের ময়লা কাপড় বাইরে না ধোয়াই শ্রেয়।

নিজামীর মামলা সামনে। আমরা আশা করব মোঃ আলী ও তুরিন নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন এবং প্রয়োজনে ভেতরে-বাইরে সবার পরামর্শ নেবেন। আইন মন্ত্রণালয়ের ট্রাইব্যুনালসংক্রান্ত সব বিষয় একবার খতিয়ে দেখা উচিত। ২৩ প্রসিকিউটরের কয়জন কয়টা মামলায় জড়িত? যাঁরা জড়িত নন কোন

মামলায় তাঁদের ট্রাইব্যুনালে থাকা কতটা প্রয়োজন? ট্রাইব্যুনালের নিরাপত্তার বার বার বিঘ্ন ঘটছে? অবকাঠামোর উন্নয়ন কেন হচ্ছে না?

যে বিচারক অবসরে গেছেন তাঁকে পুলিশ কেন নিরাপত্তা দিচ্ছে না, এ ব্যাপারে আইন মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা নিয়েছে? নির্মূল কমিটির সভায় তিনমাস আগে গণহত্যা ও নিপীড়নবিষয়ক আর্কাইভ ও জাদুঘর গড়ার ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কী হলো? সব বিষয়ে খতিয়ে দেখে ট্রাইব্যুনালের তদন্ত ও প্রসিকিউশন টিমের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। সোর্স মানি নিয়ে কথা উঠেছে। ট্রাইব্যুনাল কতদিন কার্যকর হবে এসব বিষয়েও সিদ্ধান্ত আগে নেয়া উচিত। তদন্ত ও ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে যদি কোন অংশে গ্যাংগ্রিন ধরা পড়ে তাহলে তা কেটে বাদ দেয়া উচিত। যাঁরা গত দু'বছরে অফিসে আসেননি, কাজ করেননি, মামলা করেন তাদের যদি সুবিধা দিতেই হয়, তাহলে আইন মন্ত্রণালয় বা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যুক্ত করেন। ট্রাইব্যুনালের বোঝা বাড়াবেন না।

সরকারের অনুধাবন করা উচিত যে, নিজামীর মামলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তদন্ত ও প্রসিকিউশনের কারণে যদি এর নয়-ছয় হয় তা গুরুতর অভিঘাত হানবে সরকার এমনকি রাষ্ট্রের ওপর। রাষ্ট্রের এবং সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে। জামায়াত-বিএনপি কথা বলার সুযোগ পাবে।

মোঃ আলী বা অন্য কেউ বিষয়টি সেভাবে অনুধাবন না করতে পারেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ আইনমন্ত্রী ও অভিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি তা না অনুধাবন করেন তাহলে আমাদের নিয়তিবাদী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। রাজনৈতিক দল অনেক সময় অনেক ইস্যু ঝুলিয়ে রাখে, ভাবে, তাতে শাসনের সুবিধা, ইস্যু না থাকলে চলবে কিভাবে? আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিষয়ে কারও এ ধরনের মনোভাব থাকলে সবিনয়ে অনুরোধ করব, তা পরিত্যাগ করুন। সব সময় আগুন নিয়ে খেলা ভাল নয়।

১৯ জানুয়ারি ২০১৪

পাকিস্তানীদের জন্য বিএনপি-জামায়াতকে আর কত কাজ করতে হবে?

খালেদা জিয়া ইজ নাউ লুকিং ফর শত্রুজ। তার কুখ্যাত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাবর সবসময় শত্রুর খোঁজ করতেন, বলতেন লুকিং ফর শত্রুজ। এই শত্রু কারা? জঙ্গী শাইখ আবদুর রহমান, মুফতি হান্নান বা বাংলাভাই নয়। স্মাগলার, সন্ত্রাসীরা নয়। তাঁর শত্রু ছিল আওয়ামী লীগ, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকজন এবং হিন্দুস্তান। তাঁর শত্রু মানে দেশেরও শত্রু। তারেক জিয়া ছিলেন তাঁর ইমিডিয়েট বস আর সবার ওপরে ম্যাডাম তো ছিলেনই। ম্যাডামের স্নেহের পাত্র ছিলেন তিনি। না হলে রাস্তা থেকে তুলে এনে কাউকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বানানো হয় না। তার ওপর একজন মন্ত্রী ছিলেন বটে, যদ্দুর মনে পড়ে তাঁর নাম বায়ু সেনা আলতাফ হোসেন। কিন্তু বায়ু সেনার খুব একটা ক্ষমতাটমতা ছিল না।

শত্রু খুঁজতে গিয়ে বাবর প্রথম টার্গেট করেছিলেন হিন্দুস্তানকে। সে কারণে উলফার জন্য ১০ ট্রাক অস্ত্র এনেছিলেন। এরপরও কিন্তু এক ট্রাক গুলি ধরা পড়েছিল যার কথা সবাই ভুলে গেছেন। অনেকে আরও ভুলে গেছেন যে, ম্যাডাম ওরফে উস্কানি বেগম বলেছিলেন, উলফারা দেশপ্রেমী, নিজের দেশের জন্য লড়াই করছে। অর্থাৎ উলফাদের সাহায্য করা ফরজ। আর পাকিস্তান কি মিজোদের দীর্ঘদিন সাহায্য করে নি? সুতরাং, সেই ধারাবাহিকতায় উলফাদের সাহায্য করা যাবে না কেন?

এবার আসা যাক যুক্তির কথায়। ধরা যাক, উস্কানি বেগমের যুক্তি ঠিক [হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে এই ভাবে উস্কানিমূলক কথাবার্তায় তিনি দক্ষ]। তাঁর ক্যাডার-টকাররা খুব আবেগ ভরে একটি যুক্তি দেন মজেনার মতো, কেন, ভারত কি শান্তি বাহিনীকে অস্ত্র দেয়নি? ধরে নিলাম দিয়েছে। কিন্তু তফাতটা হলো, এই সশস্ত্র শান্তি বাহিনীকে দেশের শত্রু মনে করে সামরিক বাহিনী দীর্ঘ দুই দশক লড়াই করেছে। সিভিল প্রশাসনও তাদের বন্ধু মনে করেনি। জিয়াউর রহমান কৌশলে শান্তি বাহিনী তৈরিতে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন যাতে তৎকালীন পাকিস্তানমনা সেনাবাহিনীর যৌক্তিকতা দেয়া যায়। শেখ হাসিনা অস্ত্রের ঝনঝনানি থামিয়েছিলেন। এতে সেনা কর্মকর্তারা নাখোশ নন। কারণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল সোনার খনি। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ উপাধিগুলো আদিবাসী দলনের পুরস্কার হিসেবে

বিতরণ করা হয় যাতে মুক্তিযুদ্ধের উপাধির সম্মান ও যৌক্তিকতা হ্রাস হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ২০০১-এর নির্বাচনে সেনাবাহিনী সমস্ত নিয়মনীতি ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ভোটারদের পিটিয়ে লম্বা করে দেয়, যাতে উস্কানিদাতারা ক্ষমতায় আসে। কিন্তু, ১৯৯৬ সালের পর শান্তি বাহিনী আর কোন সমর্থন পায়নি ভারতের কাছে। ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি একই ধরনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি বিএনপি-জামায়াত। সমস্যাটা সেখানে। ভারত যদি যুক্তি দেয়, আদিবাসীরা তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে তাদের সাহায্য করা পবিত্র দায়িত্ব যেটি পালন করেছি আমরা ১৯৭১ সালে, তাহলে টকাররা তা মেনে নেবেন?

বাবরের বসদের কাছে সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ। গ্রেনেড হামলায় তাদের সবাইকে নিকেশ করার পরিকল্পনা এঁটেছিলেন তারেক জিয়ার নেতৃত্বে বাবর ও অন্যরা। এ খবরটি জানাজানি হলো কিভাবে? মুফতি হান্নান ও অন্যরা এই সংবাদটি দেয়নি। শাহরিয়ার কবির তাঁর একটি ডকুমেন্টারির জন্য যে ভাবেই হোক হান্নানের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। হান্নান জানান, দেখেন স্যার সবাই আমাকে নিয়ে শুধু টানাটানি করছে, এর পরিকল্পনা তো করেন তারেক জিয়া। তারপর গড়গড় করে হান্নান সব ফাঁস করে দেন। তদন্ত কর্মকর্তা তখনই হান্নানকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেন। তিনি নাকি বলেছিলেন, আমাদের চাকরি করতে হবে না। আওয়ামী লীগের পর বিএনপি এলে কী হবে? শাহরিয়ার ডকুমেন্টারিটি তৈরি করেন। কয়েকজনকে তা দেখতে দেন। তাঁর মধ্যে শেখ হাসিনার খুব ঘনিষ্ঠ একজন উপদেষ্টা ছিলেন। কয়েকজন আশা করেছিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি জানাবেন। তিনি জানিয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে, দীর্ঘদিন কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে শাহরিয়ার চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন করলে মিডিয়া ব্যাপক প্রচার করে এবং সরকার বাধ্য হয় তারেক জিয়ার নাম চার্জশীটে অন্তর্ভুক্ত করতে। জানি না, সরকারের তারেক ভক্তরা হয়ত চাননি বিষয়টি জানাজানি হোক। এই কারণে, প্রথম অভিযোগে বোধহয় তারেক জিয়ার নাম ছিল না। যা হোক, এ পরিপ্রেক্ষিতে বাবর শত্রু লুক করতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছেন ভারতকে। তিনি বলেছেন 'এ রায় ভারতের কারণে।' (*কালের কণ্ঠ* ১.২.১৪)

আওয়ামী লীগ বিএনপির প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, স্রেফ শত্রু। এই শত্রু নিধনে ২০০১-০৬ সাল পর্যন্ত খালেদা ও নিজামীর নেতৃত্বে ক্যাডারেরা বাংলাদেশে নরকের সৃষ্টি করেছিল। একজন মহিলা স্বামী হত্যার বিচার না চাইতে পারেন নানা কারণে। সেটি আমি নিষ্ঠুরতা বলব না। কিন্তু খালেদা জিয়া ২০০১-০৬ সালে একজন মহিলা হয়ে যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছেন, বাকি দুই নেত্রী শেখ হাসিনা ও রওশন এরশাদ তা দেখাতে পারেননি। পারবেন কিনা সন্দেহ, এ নিষ্ঠুরতার মিল

আছে তার স্বামীর কায়কারবারের সঙ্গে। কত পরিবার যে ছন্নছাড়া হয়ে গেছে, কত মেয়ের জীবন যে বরবাদ হয়েছে খালেদার আমলে তা বলার বাইরে। এ কারণে, খোদার গজব বলে যদি কিছু থাকে তবে তা বর্তেছে তার দুই পুত্রের ওপর। সে প্রসঙ্গ পরে।

দশ ট্রাক অস্ত্র যখন ধরা পড়ে তখন খালেদাকে তা জানানো হয় গোয়েন্দা সংস্থা থেকে, সচিব পর্যায়েও। তিনি নিশ্চুপ থাকেন। এর অর্থ, তাঁর ইঙ্গিতেই এ ধরনের কাজ হয়েছে। ভাবা যায়! বিএনপির ফিমেল টকার, সুশীল বাঁটপাড় টকাররা টিভির টক শোতে জোরে জোরে বলছেন, এই যে ১০ ট্রাক অস্ত্র ধরা পড়ল তা তো বিএনপির কৃতিত্ব। জ্ঞানের কী গভীরতা! এই কৃতিত্ব তখন তাঁদের দেয়া হলো না কেন যাঁরা এই অস্ত্র ধরেছিলেন। আসলে, নিয়মিত এসব চালান যেত। এতে রাষ্ট্রের এসব নির্বাহী অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। দৈবাৎ দু'জন অধস্তন পুলিশ অফিসার তা ধরে ফেলেন। যদ্দুর মনে পড়ে, এই কৃতিত্বের জন্য তাঁদের দু'জনকে ধরে, চাকরিচ্যুত করে র‍্যাবের হাতে তুলে দেয়া হয়। র‍্যাব তাদের মারাত্মকভাবে নির্যাতন করে। এই নির্যাতনের হোতা ছিলেন একজন মেজর। অস্ত্র ধরার জন্য এটি কি পুরস্কার না শাস্তি। শুধু তাই নয়, তদন্ত কর্মকর্তা কতবার বদল করতে হয়েছে এই মামলায়? পাঁচবার। শেষবার আদালতের নির্দেশনায় তদন্ত কার্য সমাপ্ত হয়। আজ যে যুগান্তকারী মামলার রায় হলো তার নায়ক এই দুজন পুলিশ অফিসার। এদের একজন চাকরি ফিরে পেয়েছেন, আরেকজনের খবর জানি না। ন্যায়বিচার হবে যদি সরকার এদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রমোশন দেয়, পুরস্কার ও পদক দেয় এবং সেই মেজরকে শাস্তি দেয়া হয়।

বিএনপি নেতারা বক্তৃতা বিবৃতিতে যা বলছেন, তাতে এই ইঙ্গিত থাকছে যে, পুরো বিষয়টি ভারতের কারসাজি এবং আওয়ামী লীগ বিএনপিকে নাজেহাল করার জন্য মামলা করেছে। খালেদাও এ বিষয়ে একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। কখনও তাঁরা পাকিস্তানকে নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। এমনকি রায়ে পাকিস্তান কানেকশন ফাঁস হওয়ার পরও। বিএনপির এক প্রাক্তন লেফটি নেতা আবদুল্লাহ আল নোমান বলেছেন, 'এই মামলার পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ছিল না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনেককেই মামলার আসামি করা হয়েছে। মামলার রায়েও সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে।' [ঐ]

এই মামলার এবং রায়ের তাৎপর্য আছে কয়েকটি।

১. বিএনপি নেতৃবৃন্দ যাই বলুন না কেন এটি পরিষ্কার যে, বিএনপি-জামায়াত যৌথভাবে অস্ত্র চোরাচালানের কাজটি করেছে, রাষ্ট্রের দুইজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী যাঁদের একজন ইসলামের কথা বললে কেঁদে ফেলেন, অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত, এই ঘটনা বিরল। নিজামী ও বাবর এ জন্য কত টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন তদন্ত

কর্মকর্তারা কিন্তু সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি।
২. কোন রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই প্রথম অস্ত্র চোরাচালানে সর্বোচ্চ দন্ড পেলেন।
৩. বাংলাদেশে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ও জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা যৌথভাবে এই কাজে জড়িয়ে পড়ে। সিআইএ বা কেজিবি আগে এ ধরনের কাজকর্মে দক্ষ ছিল। কিন্তু এখন এসব কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। পৃথিবীর একমাত্র আইনী সন্ত্রাসী সংস্থা আইএসআই এখনও এ ধরনের কাজে দক্ষ। আইএসআইয়ের নির্দেশে এই দু'টি গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করেছে এবং নিশ্চয় সরকারের রাজনৈতিক নির্দেশে। প্রতিষ্ঠান এভাবে ব্যবহার করলে তা গড়ে ওঠে না। নষ্ট হয়। খালেদা এই দু'টি প্রতিষ্ঠানকেই ব্যবহার করেছেন এই কাজে এবং পরবর্তীকালে গ্রেনেড হামলায়ও। তাঁর অগোচরে তারা কাজ করেছে এমন তো হতে পারে না। তদন্তে এই অফিসাররা কত টাকা খেয়েছেন তা আসেনি।
৪. জামায়াত-বিএনপি পাকিস্তানের এজেন্ট হিসেবে এ কাজ না করলে এ ধরনের চোরাকারবারি হতে পারে না। খালেদা ডিজিএফআই ও এনএসআইকে আইএসআইয়ের আজ্ঞাবহ করে ফেলেছিলেন।
৫. বিএনপি জামায়াতের নেতাদের সঙ্গে যে পাকিস্তানের সম্পর্ক কত নিবিড় তা এই অস্ত্র মামলা প্রমাণ করেছে। নিজামীর ফাঁসির প্রতিবাদে পাকিস্তানী জামায়াত যে বাংলাদেশকে 'সাইজ' করতে বলেছে তাতে জামায়াতকে পাকিস্তান দল বললে খুব বেশি অত্যুক্তি হবে না।
৬. প্রশাসনকে সামরিকায়ন করা যে সুস্থ নয়, এ মামলা তা প্রমাণ করেছে এবং তারা শক্তিধর হয়ে উঠলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় এটি রাজনীতিবিদদের বোঝার সময় এসেছে। বঙ্গবন্ধুর আমলে এনএসআই-কে কখনও সামরিক বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করা হয়নি। এটি চলে এসেছে জিয়ার সময় থেকে। শেখ হাসিনাও তা বহাল রেখেছেন এবং তাতে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায় না।

প্রশ্ন উঠেছে, খালেদা জিয়া যখন পুরো বিষয়টি জানতেন তখন তিনিও তো অপরাধী। তাত্ত্বিক দিক থেকে ঠিক। কিন্তু এক্ষেত্রে করণীয় সরকারের, আমাদের নয়। তবে, গ্রেনেড হামলার রায়টি হয়ে গেলে বোঝা যাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিরুদ্ধে বিএনপি-জামায়াত কত খড়গহস্ত। ধরে নেয়া যেতে পারে গ্রেনেড হামলার সঙ্গেও জড়িত ছিল আইএসআই। কারণ, তারা মনে করে শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে পারলে, আওয়ামী লীগের একটা অংশ বিএনপিকে মজবুত করবে ও বাকি অংশ সামান্য দল হয়ে যাবে এবং তাতে পাকিস্তানের লাভ হবে। পাকিস্তানের জন্য তারা কত কাতর এবং এ বিষয়ে যে কোন সমঝোতা হবে না তাও স্পষ্ট।

খালেদা গত পরশুও সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া তিনি কোন কিছু মানবেন না। বর্তমান সরকার অবৈধ

এবং এই সরকার ৩০০ জন বিএনপি কর্মীর গুম-খুনের জন্য দায়ী।

যে সরকার অবৈধ তার সঙ্গে আলোচনার কী প্রয়োজন তা তো বুঝি না। অবৈধ সরকারকে উৎখাত করা ফরজ। সেটি করলেই বোধহয় ভাল। যে সরকার অবৈধ তার অধীনে উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণই বা কেন? নির্লজ্জতার কোন সীমা নেই। বিএনপি নেতা-নেত্রীরা দিগম্বর হয়েও রাস্তায় হাঁটা লজ্জার নয় বরং ফ্যাশন স্টেটমেন্ট মনে করেন। যে ৩০০ জনকে গুম-খুন করা হয়েছে বলে বিএনপির দাবি তা তদন্ত হোক এতে আমরা একমত। তবে, গত ৫-৬ মাসে বিএনপি-জামায়াত সারাদেশে যে হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ ও ধর্মীয় উপাসনালয় ভেঙ্গেছে তারও তদন্ত হোক এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত হোক।

আমরা যে কথাটি ভাবছি এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে অনেকে যে, বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় এলে কী হতো? দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, এক কোটি মানুষকে হিজরত করতে হতো। গ্রামে গ্রামে রক্তগঙ্গা বইত, সেনা-পুলিশ কর্মকর্তাদের জিয়া আমলের মতো কোর্ট মার্শাল করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো, ট্রাক ট্রাক অস্ত্র পাচার হতো। সবচেয়ে বড় কথা আমেরিকা যেমন অনেক জায়গায় ঘাঁটি স্থাপন করে আত্মরক্ষা ও আধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থে বাংলাদেশকেও সে রকম ঘাঁটিতে পরিণত করত পাকিস্তান। ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা, যুদ্ধাপরাধ বিচারের রায় পাকিস্তানী কানেকশন ও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া তা প্রমাণ করে মাত্র।

সুশীল বাঁটপাড়রা মনে করছেন বিএনপি-জামায়াত নির্বাচন না করলে গণতন্ত্র নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের প্রশ্ন পাকিস্তানীরা এলে, এখানে ঘাঁটি করলে, রক্তের নহর বইয়ে দিলে কি গণতন্ত্র মজবুত হবে? তার চেয়ে বড় কথা বাংলাদেশ কি হয়েছিল পাকিস্তানীমনাদের অবাধে রাজনীতি করতে দেয়ার জন্য? এ প্রশ্নটির উত্তর আগে খালেদা ও তাঁর দল থেকে আমাদের পাওয়া দরকার। জামায়াত তো পাকিস্তানের এটি পুরনো কথা, কিন্তু সুশীল বাঁটপাড়রা ও তাদের মিডিয়ারা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে যে বিএনপি বাংলাদেশে ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি দল। সে জন্য এই প্রশ্নটি শুধু তাদের জন্যই।

৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

৩০ লাখ শহীদ ? এ সময়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কেন?

ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যান যখন যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে প্রথম ডকুমেন্টারিটি করেন তখন তিনি বাংলাদেশের আইনবিদ ও রাজনীতিবিদ ড. কামাল হোসেনের জ্যেষ্ঠ কন্যাকে বিয়ে করেননি। ডেভিডকে নিয়ে তখন আমরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছি স্বাভাবিকভাবেই। কারণ, যুদ্ধাপরাধ বিচার নিয়ে তখন আন্দোলনের শুরু। লন্ডনেও তখন ড. কামালের কন্যা সারাহ্ ও বাঙালি তরুণ-তরুণীরা এ প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছেন। ডেভিডকেও তখন তাদের সঙ্গে দেখেছি। এর পর ডেভিড এসেছেন এদেশে মাঝে মাঝে, যোগাযোগ হয়েছে আমাদের অনেকের সঙ্গে, তারপর একসময় ড. কামাল হোসেনের জামাতা হিসেবে এ দেশেই ফিরে এসেছেন। এখন ইংরেজী *দৈনিক দি নিউএজে* কাজ করছেন।

যুদ্ধাপরাধ বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়ে ডেভিড বিভিন্ন প্রতিবেদন লেখা শুরু করলেন পত্রিকায় এবং এ প্রতিবেদনগুলোতে আমরা দেখলাম, আগের ডেভিড নেই। যে প্যাশন নিয়ে তিনি এক সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে নেমেছেন এখন দেখা যাচ্ছে, সেই একই প্যাশন নিয়ে যুদ্ধাপরাধ বিচারের বিরুদ্ধে নেমেছেন। এর কারণটি কী তা আমরা বুঝতে অক্ষম। জামায়াতের লবিস্ট/আইনজীবীরা বিদেশে বিচার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে যা বলছিল, ডেভিডের ভাষাও ক্রমে দেখা গেল সেরকম হয়ে যাচ্ছে। জামায়াত প্রচুর পয়সা দিয়েছে এবং দিচ্ছে লবিস্টদের। এক প্রতিবেদনে দেখেছিলাম, মীর কাশেম আলী ২৫ মিলিয়ন ডলার দিয়েছেন লবিস্টদের। সত্য মিথ্যা জানি না। ডেভিডের মতো একইরকমভাবে ইকোনমিস্ট ও আল জাজিরাও যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে প্রচার করছে। একসময় আল জাজিরা যুদ্ধাপরাধের বিচারের পক্ষে বলেছিল। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই মালিক নাকি কাতারের শেখ পরিবার। এসবের সঙ্গে ডেভিডের সম্পর্ক আছে কী না জানি না, কিন্তু তার বক্তব্য তাদের মতোই।

যুদ্ধাপরাধ বিচার নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করায় ডেভিডকে ইতোমধ্যে আদালত তলব করেছে। ডেভিডকে দমানো যায়নি কারণ তার বোধহয় এই প্রতীতি জন্মেছে যে, দেশের সেরা আইনবিদ ও সুপরিচিত আইনবিদের তিনি পরিবারভুক্ত। তার কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

সম্প্রতি ট্রাইব্যুনালে আবারও ডেভিডকে তলব করা হয়েছে আদালত

অবমাননার জন্য। কোন একটি লেখায় ডেভিড মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ নিয়ে ২৪ তারিখে 'দি হিন্দু' পত্রিকায় ডেভিড একটি কলামও লিখেছেন। বর্তমান নিবন্ধ সেই প্রবন্ধ নিয়ে। প্রথমে দেখা যাক ডেভিডের বক্তব্য কী?

বাংলাদেশ সরকার সবসময় বলে আসছে পাকিস্তানী ও তার সহযোগীরা ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে এটি কি ঠিক? [তার ভাষায় এটি কি 'ফেয়ার এস্টিমেট'?]

এটিই মূল বক্তব্য এবং তারপর এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানা 'তথ্য প্রমাণ' হাজির করেছেন। তার মতে, স্বাধীনতার ৪০ বছর পেরিয়ে গেলেও বিষয়টি এখনও স্পর্শকাতর। এ স্পর্শকাতরতার কারণ, জন্ম থেকেই একটি শিশু এ কথা শুনছে স্কুলে এটি পড়ানো হয়। দেশের কবিতা সংস্কৃতির বুননে তা ঢুকে গেছে। সুতরাং এ নিয়ে প্রশ্ন করা একটি গভীর বিশ্বাসকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা।

ডেভিডের মতে, যিনি এ কথা প্রথম বলেছেন তিনি এদেশের স্বাধীনতার নেতা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। এভাবে বাক্য বিন্যাসের কারণে বোঝা যায়, আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনাকে তার খুব একটা পছন্দ নয়। কারণ, পরবর্তী বাক্যে লিখেছেন, এ সংখ্যাটি বেশি বলে আওয়ামী লীগের নেতা ও সমর্থকরা।

ডেভিড লিখেছেন, ১৯৭১ সাল নিয়ে রক্ষণশীল যে জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স তৈরি হয়েছে তা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অবস্থানের অংশ বা বিরোধী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিপরীত। এমনকী, তার মতে, এ সংখ্যা নিয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে অনেক আওয়ামী লীগার তাকে স্বাধীনতাবিরোধী বা 'অপজিশনাল মাইন্ডসেট' বলে আখ্যা দেবে।

সুতরাং বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ মৃত-কে নিয়ে যে প্রশ্ন করবে তার মাথা নিচু করে থাকতে হবে, ভীত থাকতে হবে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও ব্যক্তিগত আক্রমণের আশঙ্কায়।

ডেভিড বার্গম্যানের এ বক্তব্য নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাবে। এটি ঠিক, আমাদের হৃদয়ে এবং ১৯৭১ সালের পর যাদের জন্ম তাদের মাথায় ৩০ লক্ষ শহীদ শব্দটি গেঁথে গেছে। কিন্তু, এতে অস্বাভাবিক কী আছে? ডেভিডও নিশ্চয় বড় হয়েছেন 'হলোকাস্ট' শব্দটি শুনে। হলোকাস্ট বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার কর্তৃক ইহুদী ও নাজি বিরোধীদের নিধন হলো হলোকাস্ট। এটি বিশ্ববাসী বা ইউরোপীয়দের মধ্যে বিশ্বাস যে, ৩ লক্ষ মানুষ মারা গেছেন হলোকাস্টে। নাজি বা ফ্যাসিবিরোধী ডিসকোর্সের তা অন্তর্গত এবং ইউরোপের যেকোন রাজনৈতিক দল হলোকাস্টের কথা বললে কি মনে হয় যে তা অর্থোডক্স ন্যাশনালিস্ট

ডিসকোর্সের অংশ বা কোন দলের বিশ্বাস? হ্যাঁ, হলোকাস্টে মৃতের সংখ্যা নিয়েও মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু যারা এ প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা কি মেইনস্ট্রিম এ্যাকাডেমিকসে জায়গা পেয়েছেন? এবং জার্মানিতে, যে জার্মান সরকার একসময় এ নিধন চালিয়েছে, সে জার্মানিতে কেউ এ প্রশ্ন করলে কি তাকে জার্মান সমাজ গ্রহণ করবে? তাকে কি নাজি সমর্থক মনে করবে না? সে মনে করাটি কি 'অপজিশনাল' মাইন্ড সেট'? আমেরিকাতে ইহুদী বিদ্বেষী দু'একজন লেখক এ নিয়ে কথা তুলেছেন এবং খোদ আমেরিকাতে তাদের নিয়ে নিন্দার ঝড় বয়ে গেছে, হাসি ঠাট্টা করা হয়েছে তাদের 'পাণ্ডিত্য' নিয়ে। তারা পরিশীলিত তাই এ ধরনের ব্যক্তিদের রিভিশনিস্ট বলেছেন। আমাদের দেশের মানুষজন অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, অতটা পরিশীলিত নয়, তাই যারা ৩০ লক্ষকে অস্বীকার করে তাদের হারামজাদা বলে। শব্দগত বা ভাবগত তফাৎ আর কি!

ডেভিড তাঁর শ্বশুরের মতো আওয়ামী লীগকে পছন্দ করেন না। সেটি স্বাভাবিক। কিন্তু ৩০ লাখ শহীদ নিয়ে প্রশ্ন করলে কি শুধু আওয়ামী লীগ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়? না। ডেভিডের আওয়ামী লীগকে অপছন্দের কারণে মনে হয়েছে, খালি আওয়ামী লীগ-ই প্রতিক্রিয়া জানাবে। কমিউনিস্ট পার্টি তো ঘোর আওয়ামী লীগ বিরোধী। ডেভিড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, ৩০ লক্ষ শহীদে তিনি বিশ্বাস করেন কিনা? বিএনপি-জামায়াত ছাড়া আর কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন করে কিনা সেটি ডেভিড পর্যালোচনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করবেন না দেখেই আগে ভাগে জানিয়েছেন, এটি আমাদের সংস্কৃতির বুননে মিশে আছে। ডেভিড তাঁর শ্বশুর ড. কামাল হোসেনকে একবার জিজ্ঞেস করলে পারতেন, তিনি এটা বিশ্বাস করেন কিনা? আওয়ামী লীগ করার সময় তো নিশ্চয় বিশ্বাস করতেন। না করলে কি প্রকাশ্যে তিনি তা বলবেন?

ডেভিডের নিবন্ধের প্রথম ভাগ দেখে মনে হচ্ছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যে আওয়ামী লীগ করছে সে জন্য তিনি খানিকটা কুপিত। ডেভিড, তাঁর স্ত্রী শ্বশুর-শাশুড়ি, আমরা সবাই এতে বিশ্বাস করতাম এখনও করি। ডেভিড করেন না, তাঁর বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছে, আমাদের বিশ্বাস এখনও অটুট। ডেভিড কেন, আমাদের সবাইর একটি বিষয় মনে রাখা উচিত, এ বিচারটা আওয়ামী লীগ না করলে তাদের অনেক নেতাকর্মী হয়তো খুশি হতেন। আওয়ামী লীগ সবসময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চেয়েছে কিন্তু প্রথম আমলে তা করেনি। ২০০৮ সালে, তারা জনগণের ম্যান্ডেট চেয়েছে। বিচারে এবং তা পেয়েছে। তারপরেও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিচার কাজ শুরু হয়নি। পরে জনচাপে সেই ম্যান্ডেট আওয়ামী লীগ কার্যকর করছে মাত্র। এটি দলীয় কোন সিদ্ধান্ত কার্যকরের মতো নয়।

নিবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে ডেভিড বলছেন, সাংবাদিক বা গবেষকদের জন্য এটি

গুরুত্বপূর্ণ যে এই যে 'আইকনিক ফিগার' পর্যালোচনা করবেন। ডেভিড বুদ্ধিমান, পরের লাইনে লিখেছেন, এই পর্যালোচনা পাকিস্তানী ও তাদের সহযোগীদের নিষ্ঠুরতা কম করে দেখানোর জন্য নয়। তার ভাষায়, "This is not in order to minimise the extent of atrocities committed by the pakistan military and its collaborators which were undoubtedly very significant, but for the purposes of a more accurate representation of history that is not thrall to partisan interest. শেষ বাক্যটি লক্ষ্য করুন, ইতিহাসের স্বার্থে এবং যা পক্ষপাতমূলক স্বার্থের পক্ষে [পড়ুন আওয়ামী লীগ] যাবে না। অর্থাৎ ৩০ লক্ষ নিয়ে প্রশ্ন ওঠালেই তা আওয়ামী লীগের স্বার্থের বাইরে যাবে। এ ধরনের বাক্য গঠন দেখেই বোঝা যায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই লেখাটি রচিত হয়েছে- সেটি হচ্ছে অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া সুষ্ঠু নয়, অভিযোগগুলো বিশেষ করে হত্যার, সুষ্ঠু নয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশেই বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

৩০ লক্ষ শহীদের ব্যাপারটি কীভাবে এলো তারপর তা ব্যাখ্যা করেছেন ডেভিড। ১৯৭২ সালে ১৮ জানুয়ারি ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বঙ্গবন্ধু বলেন-'3 million people have been killed, including children, women, intellectuals, peasants, warkers, students...' "ফ্রস্ট তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, সংখ্যাটি যে ৩ মিলিয়ন তিনি তা কীভাবে বুঝলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি ফেরার আগেই আমার লোকজন তথ্য সংগ্রহ করছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে খবরা খবর আসছে, এখনও সঠিক সংখ্যায় উপনীত হইনি তবে তা কিন্তু ৩ মিলিয়নের নিচে হবে না।" এর আগে ১০ জানুয়ারিও তিনি একই সংখ্যার কথা বলেছিলেন।

এরপর ডেভিড এ প্রসঙ্গে কট্টর মুজিব ও আওয়ামী লীগ বিরোধী মাহমুদুর রহমান মার্কা সাংবাদিক, বিবিসির এককালীন কর্মী সিরাজুর রহমানের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। সিরাজ লিখেছেন, ৩ লক্ষকে শেখ মুজিব ইংরেজীতে ৩ মিলিয়ন বলেছেন। সিরাজ এ মন্তব্য করে বঙ্গবন্ধুর ইংরেজী জ্ঞানের প্রতি কটাক্ষ করতে চেয়েছেন। সিরাজুর রহমানের বই পড়েছি। ইংরেজী নিশ্চয় ভাল জানেন লন্ডনে থাকার কারণে। বঙ্গবন্ধুর ইংরেজী ভাষণও পড়েছি। সিরাজুর রহমানের ইংরেজী এর চেয়ে উত্তম এমন দাবি করা যায় না। বাংলা গদ্য তো নয়ই। সিরাজুর রহমানের যে দৃষ্টিভঙ্গি তাতে তিন লাখও তার কাছে বেশি মনে হওয়া স্বাভাবিক। সংখ্যাটি ৩০ হাজার হলে বোধহয় তিনি সন্তুষ্ট হতেন।

এসএ করিমের প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর জীবনী থেকেও ডেভিড উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনিও লিখেছেন, ৩০ লক্ষ 'no doubt a gross exaggeration'। এ বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, *প্রাভদায়* সংবাদটি ছাপা হয়েছিল।

বার্গম্যান বলছেন, প্রাভদার হিসেবটা গোলমেলে [কমিউনিস্টদের কাগজ সেজন্য; ইহুদী বা ইউরোপীয়দের হলে না হয় মানা যেত।] কারণ প্রাভদা লিখেছিল, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে [days immediately] ৮০০ বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হয়েছিল। আসলে ঠিক সংখ্যা হবে ২০।

বুদ্ধিজীবী নিধন শুরু হয়েছিল ২৫ মার্চ থেকে। এই বুদ্ধিজীবীর অন্তর্গত [দেখুন রশীদ হায়দার সম্পাদিত শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ] বিভিন্ন পেশার মানুষ। ১ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ২০ জন বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হয়েছে?

জামায়াতীদের কাছেও অপমানজনক মনে হবে। শেখ মুজিবুর রহমানকে সামান্য একটু প্রশংসা করেছেন ডেভিড। ফ্রস্টের সাক্ষাতকারের পর পরই তিনি দু'টি কমিটি করেছিলেন মৃতের সংখ্যা জানার জন্য। কমিটি নাকি প্রাথমিক রিপোর্টও দিয়েছিল। সে রিপোর্টে নাকি ৫৭,০০০ জন মৃতের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। সেজন্য এরপর সরকার এ নিয়ে এগোয় নি। প্রশ্ন জাগে, নিয়াজি যে ১৫ লক্ষের কথা বলেছিলেন সেটি কি কারণে?

এরপর ডেভিড কলেরা হাসপাতাল, যা এখন আইসিডিডিআরবি নামে পরিচিত তাদের একটি জরিপের উল্লেখ করেছেন। মতলব থানা নিয়ে জরিপটি পরিচালিত হয়েছিল। ঐ থানায় তাদের অনুমান ৮৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ঐ হিসাবে মৃতের সংখ্যা তারা ৫ লাখ বলে অনুমান করেছে। ২০০৮ সালে *ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল* অনুসারে, ১৯৭১ সালে নিহতের সংখ্যা ১,২৫,০০০ থেকে ৫,০৫,০০০ জন। আর জে রুমেল বলছেন ১৫ লক্ষ আর শর্মিলা বোসের হিসাব অনুযায়ী ৫০ হাজার ১০০,০০০।

এরকম আরও কিছু হিসাব দিয়েছেন তিনি। উপসংহারে তিনি লিখেছেন, যে কোন সংঘাতে নিহতের সংখ্যা নিরূপণ করা মুশকিল– বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি বেশি প্রযোজ্য এর 'পার্টিজান পলিটিকসের' কারণে। এবং এ কারণে এ বিষয়ে স্বাধীন গবেষণা করা কঠিন। এটা ঠিক পাকিস্তানীরা অনেক হত্যা করেছে। মৃতের সংখ্যা যাই হোক সরকারের বর্তমান নীতি যে অপরাধীর বিচার তাতে [এ সংখ্যা] কোন অভিঘাত হানবে না। তার ভাষায়-"This is pity- as the number of civilians who were killed in atrocities by the Pakistan military in 1971 was, without doubt, very high. Whatever might be the actual figure. it would not affect the government's current policy for the need for crimimal accountability for these offences."

২

বার্গম্যান যে সব যুক্তি দিয়েছেন এগুলো যে খুব নতুন তা নয়। আমরা এর বিপরীতে যেসব যুক্তি দেব তাও নতুন নয়। রর্বা পেইন সেই ১৯৭২ সালে যেমন

ম্যাসাকারে লিখেছেন- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেছিলেন. '৩০ লক্ষ হত্যা করো, বাকিরা আমাদের হাত থেকে খাবার খুটে খাবে।' এখন যদি বলি সামরিক বাহিনীর প্রধানের আদেশ তার সৈন্যরা মেনে ত্রিশ লক্ষ হত্যা করেছে তাহলে এ যুক্তি অসার এমন কথা কি বলা যাবে? প্রাভদা ইয়াহিয়ার কথার আলোকেও এই সংখ্যা উল্লেখ করে থাকতে পারে।

মুক্তমনা ওয়েবসাইটে আবুল কাসেম একটি প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, ১৯৮১ সালে জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার জরিপে লেখা হয়েছে, বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করা হয়েছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে। প্রতিদিন গড়ে ৬ থেকে ১২ হাজার মানুষ মারা হয়েছে। গণহত্যার ইতিহাসে এই হার সবচেয়ে বেশি।

["Among the genocides of human history, the highest number of people killed in lower span of time is in Bangladesh in 1971. An average of 6000 (six thousand) to 12000 (twelve thousand) people were killed every single day This is the higest daily average in the history of genocides."]

জাতিসংঘের হিসাব ধরে আবুল কাসেম একটি হিসাব করেছেন। তার মতে হত্যা হয়েছে ২৬০ দিন। সে হিসাবে জাতিসংঘের সর্বনিম্ন হিসেব ধরলে তা দাঁড়ায় ৬০০০X২৬০ = ১৫৬০ ০০০ বা ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার। আর সর্বোচ্চ মাত্রা ধরলে = ১২০০০X২৬০ = ৩১২০০০০ বা ৩১ লক্ষ ২০ হাজার। তার মতে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ৪০% পরিবারের কেউ না কেউ মারা গেছেন এবং পাকিস্তানী প্রতিটি সৈন্য প্রতি ১০ দিনে ১জন করে হত্যা করেছে। ১৯৭২ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক লিখেছিল, বাংলাদেশে ৩০ লক্ষের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এখানে রাজাকার, আলবদর কর্তৃক হত্যার সংখ্যা ধরা হয়নি।

পাকিস্তানী সেনা অফিসার কর্নেল নাদের আলী যিনি ১৯৭১ সালে এখানে ছিলেন এবং গণহত্যা করে ও দেখে সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলেন। লিখেছেন, তাকে আদেশ দেয়া হয়েছিল "মুজিবের জেলায় [হোম ডিস্ট্রিকট] যত বেজন্মাকে পাওয়া যায় তাদের হত্যা করো এবং কোন হিন্দু যেন বাদ না যায়।" এ ধরনের আদেশ যখন দেয়া হয় তখন পাকিস্তানী সৈন্যরা কি পরিমাণ হত্যা করতে পারে তা অনুমেয়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে *ন্যাশনাল জিওগ্রাফির* সংখ্যার সঙ্গে একমত। যখন ঐ সংখ্যা দেয়া হয় তখন দেশটি সবে স্বাধীন হয়েছে, মানুষের স্মৃতি দুর্বল হয়ে যায়নি। সে সংখ্যা গ্রহণীয়। আজ থেকে বছর ১৫ আগে আমি স্বরূপকাঠির এক গ্রামে গিয়েছিলাম। বরিশালের বাসা থেকে টেম্পোয় স্বরূপকাঠির বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে বাসে করে স্বরূপকাঠি। তারপর হেঁটে প্রায় মাইলখানেক ভেতরে

এক খালের তীরে গ্রামে পৌঁছলাম। সেই গ্রামে মূলত হিন্দু চাষীরা বসবাস করেন। তারা জানালেন, ১৯৭১ সালে পাকিরা সেখানে এসেও মানুষ হত্যা করেছে। এত অভ্যন্তরে ঢুকে যদি পাকিরা হত্যা করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গাই হত্যাযজ্ঞ চলেছে। এ ছাড়া, বেশি হত্যা করা হয়েছে রেলওয়ে ব্রিজ বা খাল/নদীর ওপর ব্রিজ বা নদী তীরে। এসব জায়গায় মানুষ মেরে পানিতে ফেলে দিলে ঝামেলা চুকে যায়। চিহ্ন থাকে না। চিহ্ন না থাকলে হিসাবও থাকে না। অন্যখানে হত্যা করলে গণকবর দিতে হয়, ঝামেলা। সবখানে যে গণকবর দেয়া হয়েছে তা নয়। গণহত্যার ছবি দেখলে তা বোঝা যায়। আরেকটি বিষয় আমাদের খেয়াল থাকে না, বিভিন্ন জেলায় অন্য জেলার মানুষজন ছিল। তাদের হত্যার পর তাদের আত্মীয়স্বজনরা জানতেও পারেনি। এসব লাশ ও সংখ্যা থেকে হারিয়ে গেছে। এতো গেল পাকিস্তানী হার্মাদদের হত্যার কথা। এর সঙ্গে বাঙালি হারামজাদা যেমন রাজাকার, আলবদর, আলশামস, শান্তিবাহিনী, বিহারিরা যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তাতো বলা হয় না বা সেই সব সংখ্যা 'পণ্ডিত'রা যে সংখ্যা বলেন তার সঙ্গে যুক্ত হয় না। এসব হিসেব ধরলে ৩০ লক্ষ কমই বলা হবে।

এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে গিয়েছিলেন বাধ্য হয়ে। সীমান্ত অতিক্রম করার সময় এবং শরণার্থী শিবিরে কত মানুষ মারা গেছেন সে হিসাব কিন্তু গণহত্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। সে হিসাবও কিন্তু গণহত্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ রকম অনেক তথ্য উপাত্ত ৩০ লক্ষ শহীদের পক্ষে দেয়া যায় কিন্তু আমি দেব না। কারণ, এগুলো কুতর্ক। বিশেষ উদ্দেশ্যে এ সব বির্তক উত্থাপন করা হয়। বলতে পারেন তা'হলে আমি বিতর্কে যোগ দিচ্ছি কেন? না, যোগ দিতে চাইনি। কিন্তু বার্গম্যানের লেখা পড়ে অনেকে অনুরোধ করেছেন কিছু লিখতে এ কারণে যে, তা'হলে,বার্গম্যানরা একই কথা বার বার বলবে। পুরনোরা না হোক, নতুনদের অনেকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। অন্তত, তাদের যুক্তি যে উদ্দেশ্যমূলক এ বক্তব্যটি আসা উচিত।

৩

গণহত্যা নিয়ে *জনকণ্ঠে* আমি কিছুদিন আগে দীর্ঘ লেখা লিখেছি। ঐ প্রবন্ধের সব বিষয়ের অবতারণা করব না, কিছু বিষয় তুলে ধরব বর্তমান নিবন্ধে সম্পূর্ণতা দেয়ার জন্য।

কোন গণহত্যারই নির্দিষ্ট সংখ্যা কখনও নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে-সব গণহত্যার সংখ্যা দেয়া হয়েছে তার সবগুলোই আনুমানিক। এই অনুমানের ভিত্তি প্রত্যক্ষভাবে দেখা, বিভিন্ন প্রতিবেদন, অভিজ্ঞতা। যে দেশ/ জাতি গণহত্যার যে সংখ্যা নিরূপণ করে তা মোটামুটি এ কারণে মেনে নেয়া হয়।

ফতে মোল্লা যেমন লিখেছেন, সংখ্যা একেবারে সঠিক হবে এমন কথা বলা

যাবে না, মূল বিষয় হচ্ছে সংখ্যা আমরা ব্যবহার করি গণহত্যাটি বোঝার জন্য (to address the issue of genocide). তার ভাষায়, "All numbers are not absolute we do use arbitrary numbers extensively all the time in our lives."

কম্বোডিয়া থেকে রুয়ান্ডা, বা হলোকাস্ট থেকে ইন্দোনেশিয়া কোথায় চুলচেরা হিসাব দেয়া হয়েছে? সুহার্তো ইন্দোনেশিয়ায় যে গণহত্যা চালিয়েছিলেন ১৯৬৫-৬৬ সালে, তাতে অনুমান করা হয় ১০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সেটি মানা না মানা অন্য কথা, কিন্তু সুহার্তো কি পরিমাণ হত্যা করেছিলেন সেটিই মূল বিষয়। ধরা যাক, কেউ বললেন বাংলাদেশে ২৯ লক্ষ ৯০ হাজার ৫১৯ জন মারা গেছেন। তাতে কি আসে যায়?

সংখ্যার নির্দিষ্টকরণের পেছনে এক ধরনের রাজনীতি আছে। যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে নাপাম দিয়ে যে গণহত্যা চালিয়েছে সেটিকে পাশ্চাত্যের কেউ গণহত্যা বলেন না, বলেন যুদ্ধ। কারণ, যুদ্ধ বললে হত্যার দায় হ্রাস পায়। দু'পক্ষে যুদ্ধ হলে তো মারা যাবেই। কিন্তু ভিয়েতনামে কি খালি যুদ্ধ হয়েছিল? নিরীহ সিভিলিয়ানদের হত্যা করা হয়নি বছরের পর বছর? সুহার্তোর হত্যা নিয়ে কখনও কথা বলা হয় না। ঐ গণহত্যা স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার চিন্তা করা হয়েছে, কেউ এ বিষয়ে কথা বলেন না, কারণ কাজটি আমেরিকার সাহায্যে করা হয়েছে। অন্যদিকে, কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থাৎ পশ্চিমা বিশ্ব সোচ্চার কারণ, পলপট ছিলেন কম্বোডিয়ার এবং মার্কিন বিরোধী। কমিউনিস্ট শাসন যে কত খারাপ তা বোঝানোর জন্য কম্পোডিয়ার কথা বার বার আসে। বাংলাদেশে গণহত্যার ৩০ লক্ষ শহীদকে নিয়ে এতদিন কোন প্রশ্ন ওঠানো হয়নি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হলে গণহত্যার চেয়েও বিচার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বার্গম্যান বা ক্যাডমান বা অন্য কেউ। কিন্তু তা ধোপে টেকেনি। গত নির্বাচনের পর থেকেই হঠাৎ গণহত্যার বিষয়টি তোলা হচ্ছে। এখানে আরও মনে রাখা উচিত, আমেরিকা এই নির্বাচন সমর্থন করেনি। হঠাৎ গত একমাস ধরে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারেক রহমান, খালেদা জিয়া প্রশ্ন তুলছেন। গণহত্যায় যে ৩০ লক্ষ শহীদ হয় নি সে কথা খালেদা জিয়া প্রথম বলেছেন যা আগে কখনও বলেননি। এখন ডেভিড বার্গম্যান বিদেশের কাগজে এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এগুলো কি কাকতালীয়? না, এর পেছনে অন্য কোন রাজনীতি আছে। তার আগে বলা দরকার কেন বাংলাদেশের গণহত্যার বিষয়টি এতদিন চাপা পড়ে গিয়েছিল? এর একটি কারণ আমরা নিজে, অন্য কারণ, আমেরিকা, পাকিস্তান, সৌদি আরব বা চীনের মনোভঙ্গি।

৪.

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম আলোচিত বিষয় গণহত্যা। গত কয়েক দশক গণহত্যার বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। শুধু বিদেশেই নয়, স্বদেশেও। এর একটি ংকারণ, বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের নীরবতা এবং স্বদেশেও এ বিষয়ে আলোচনার অনীহা। যে কারণে, বাংলাদেশের গণহত্যায় কত মানুষ প্রাণ হারিয়ে ছিলেন সে সম্পর্কেও বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পগ্রোম বা ভিয়েতনামের মাইলাই নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা হয়েছে। বসনিয়া, হারজেগোভিনা, কম্বোডিয়া, রুয়ান্ডা প্রভৃতি দেশের গণহত্যাও ব্যাপক আলোচিত এবং সেই সব আলোচনা ও বিতর্কের ফলে গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে গণনা করা হচ্ছে এবং অপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আদালতও গঠিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে খুব বেশি একটা কেউ আলোচনা করতে চান না। এর কারণ খুঁজতে গেলে ১৯৭১ সালের পরিস্থিতি আলোচনা করতে হবে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি আমেরিকা, চীন, সৌদি আরব ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ। তারা গণহত্যাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে। স্বপ্নেও তারা ভাবেনি, লুঙ্গিপরা, থ্রি নট থ্রি সম্বল করে গরিব জীর্ণশীর্ণ মানুষগুলো জিততে পারবে। কিন্তু বাঙালিরা জিতেছিল। এই পরাজয় তাদের আত্মগরিমায় আঘাত করেছে। গণহত্যা যেহেতু অপরাধ এবং এ নিয়ে বেশি আলোচনা করলে আমেরিকা, চীন, সৌদি আরবসহ ও পাকিস্তান সমর্থনকারী দেশগুলোর ওপর গণহত্যার দায় বর্তায়। সে কারণে, গণহত্যা নিয়ে আলোচনা তারা করেনি।

অন্যদিকে, ১৯৭৫ সালে ক্ষমতা দখল করে জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের সেই গণহত্যাকারীদের ক্ষমতায় আনেন। সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে জিয়া-এরশাদ-খালেদা-নিজামী ২৫ বছরের ওপর প্রায় একাধিক্রমে বাংলাদেশ শাসন করেছে। গণহত্যা দূরে থাকুক তখন ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল।

বাংলাদেশে নির্মূল কমিটির নেতৃত্বে যখন যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়টি প্রাধান্য পেল জাতীয় রাজনীতি তখন গণহত্যা ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের বিষয়টিও নিয়ে বিতর্ক শুরু হলো। গণহত্যা বিষয়ে বলা হলো, যা আগেই বলেছি শেখ মুজিবুর রহমান তো ইংরেজী তেমন জানতেন না। ইংরেজীতে সাক্ষাতকার দিতে গিয়ে থ্রি লাখকে থ্রি মিলিয়ন বলে ফেলেছিলেন। সেই থেকে বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে চালু হয়ে গেল ত্রিশ লাখ বা থ্রি মিলিয়ন মারা গেছে। এটি কি সম্ভব? বিএনপি-জামায়াত সমর্থক 'বুদ্ধিজীবী'রা এ বিষয়টিও

বিভিন্নভাবে উস্কে দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর কথায় ত্রিশ লাখ শহীদের কথা চালু হয়নি। ত্রিশ লাখ শহীদের কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট মুখপত্র *প্রাভদায়* যার কথা অনেকে এখন ভুলে গেছেন। এরপর অস্ট্রেলিয়া বেতার থেকেও খুব সম্ভব একই কথা বলা হয়েছিল। সেই থেকে গণহত্যায় ত্রিশ লাখের কথা বলা হয়।

নারী নির্যাতন নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর নাতনি শর্মিলা বসু বিতর্ক ছড়িয়ে দেন। ১৯৭১ সালে ও তারপর পাকিস্তানীরা যা বলতেন, শর্মিলাও একই কথা বলা শুরু করেন। তিনি বলতে থাকেন এবং মস্ত বই লিখে 'প্রমাণ' করার চেষ্টা করলেন যে, বাংলাদেশে মাত্র ৩০০০ নারী ধর্ষিত হয়েছেন। এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেই অপমান। আসলে শর্মিলাদের মতো পাকিস্তানীমনাদের পাঞ্জাবী সৈনিকদের হাতে তুলে দিলে তারা বুঝতে পারত ধর্ষণ কী? ধর্ষণের অপমান আর্তি কী? ধর্ষণের যে সংখ্যা ১৯৭১ সালে বলা হতো এখন তা চার ভাগের এক ভাগে চলে এসেছে।

এভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আক্রান্ত হচ্ছে। এবং এর বিরুদ্ধে যথাযোগ্য উত্তর দেয়ার মানুষের সংখ্যাও কমে গেছে। এছাড়া আমাদের মানসিকতায় বীরত্ব বড় ব্যাপার। গণহত্যা, নির্যাতন, লাঞ্ছনা নয়। সে কারণে বলব, বাংলাদেশের গণহত্যা, নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের যে ইতিহাস ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে পরে আবার আলোচনা করব। তবে, এই মানসিকতার সূত্রপাত নিয়ে প্রথম আলোচনা করা যাক।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ইতোমধ্যে সহস্রাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর অধিকাংশই স্মৃতিকথা, দিনলিপি, যুদ্ধের বিবরণ প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের, অহঙ্কারের দিকটি যত আলোচিত হয়েছে সে মাত্রায় হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর অত্যাচার, নারী নির্যাতন, গণহত্যার দিকগুলো রয়ে গেছে উপেক্ষিত।

আসলে বাঙালি ভালবাসে বীরত্বগাথা। এর একটি কারণ বোধহয়, ক্ষুদ্র এক ব-দ্বীপে তার বসবাস। মাত্র কিছুদিন হলো বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। সে দেখেছে আশপাশে নির্যাতিত, গরিব, ক্ষুদ্র সব মানুষ। চিন্তার জগতটাই তার ছোট। তাই সাহসী কাউকে দেখলেই সে চমৎকৃত হয়। সেসব সময় বীরের কথা বলতে চায়, যদি সে বীর হয় 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল'-এর মতোও। এ যাবত প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বইপত্র দেখলে এ কথাটি আরও স্পষ্ট হবে। শুধু রণগাথা, বীরত্বের ব্যঞ্জনা। না, নির্যাতন, অত্যাচারের কথা তেমন নেই। এ ইঙ্গিতও নেই কোথাও যে, অত্যাচার ও বীরত্বও একই সূত্রে গাঁথা। মানুষ অত্যাচারিত হয়, নিপীড়িত হয়, বিদ্রোহ করে এবং তার পর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে লড়াই করে। মুক্তিযুদ্ধ কি তাই নয়? পাকিস্তানের কলোনির অধিবাসী হিসেবে

বাঙালি অপমানিত, শোষিত হয়েছে, ১৯৭১-এর শুরু থেকে অত্যাচারিত হয়েছে, তারা রুখে দাঁড়িয়েছে অপমানের প্রতিশোধ নিতে। লড়াই করছে বীরের মতো। তাই শুধু বীরত্ব যদি হয় ইতিহাসের গাথা তাহলে পটভূমিকা থাকে অস্পষ্ট, অজানা সেই বীরত্বের ব্যঞ্জনাও হারিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের গাথা কি কম রচিত হয়েছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান বা ইতিহাসে? কিন্তু বীরত্বের গাথা কতটুকু মনে রেখেছে বাঙালি? মনে রাখলেও রেখেছে খুব অস্পষ্টভাবে। স্পষ্টভাবে রাখলে তো বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী রাজাকার হতো না। 'আলবদর মাওলানা' মান্নান (প্রয়াত) বা গোলাম আযম তো ১৯৭১ সালের পর প্রকাশ্যে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারত না। কারণ, এই বীরত্বের পটভূমিকাটি সবসময় স্পষ্ট হয়নি, অনবরত বলা হয়নি এটি নতুন প্রজন্মের কাছে।

তাছাড়া বাঙালির কন্ট্রাডিকশনের আরেকটি দিক উল্লেখ্য। বাঙালি আবার কোন বীরকে বেশিদিন সহ্য করতে পারে না। প্রথম সুযোগে তাকে ধুলায় ফেলে দিতে বাঙালি কার্পণ্য করে না। এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুব কম জাতিরই আছে। কিন্তু বাঙালি যেহেতু মানুষ এবং মানুষ আর কিছু না হলেও অত্যাচার-অপমানের কথাটা মনে রাখে। বাঙালিও তাই আর কিছু না হোক অত্যাচারের কথাটা মনে রেখেছে। গ্রামেগঞ্জে ঘুরলে এ কথাটা টের পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে উপন্যাস, গল্প থেকে কবিতা, প্রবন্ধ থেকে গান, সবখানে কি বার বার ঘুরেফিরে আসে না হিটলারের সেই ক্রুর মুখ আর গুলির শব্দ। ইউরোপের শহরে-বন্দরে কি এখনও চোখে পড়ে না ফ্যাসিস্ট বা নাৎসিদের বীভৎসতার স্মারক? এর কারণ, সেখানে বীরত্বের গাথা যেমন রচিত হয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে অত্যাচারের গাথাও এবং তা বর্ণিত হয়েছে প্রবলভাবে, জোরালোভাবে, যা এখনও মর্মমূল কাঁপিয়ে দেয়। যে কারণে এখনও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নির্মিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় অসামান্য সব চলচ্চিত্র। নির্মিত হয় 'গণহত্যা' জাদুঘর। জেনেশুনে ইউরোপ সে কথা মনে রেখেছিল যে মানুষ সব ভুলতে পারে কিন্তু অত্যাচার-অপমানের কথা ভোলে না।

আমরা আবার অনেক সময় অত্যাচারকে মনে করি অপমান। আমাদের মনস্তাত্ত্বিক গড়নে এ ধরনের হীনম্মন্যতা সব-সময় ছিল এবং আছে। উদাহরণ দেয়া যাক। একজন শিক্ষককে পাঁচজন ছাত্র এসে পিটিয়ে গেল বা একজন তরুণীকে দু'জন মিলে ধর্ষণ করল, তাতে ঢি-ঢি পড়ে গেল। সমাজ এসব ঘটনাকে ব্যক্তির অপমান হিসেবে চিহ্নিত করে লুকোতে চায়। ঘটনাটি উল্টো করে দেখি না-কেন? পাঁচজন একজনকে পেটাল, যাকে পেটাল তার অপমান হয় না, বরং ভীরুতা প্রমাণিত হয় পাঁচজনের এবং সেই ভীরুতা হলো অপমান। দু'জন এক

তরুণীকে ধর্ষণ করলে তরুণীটি কেন অপমানিত হবে? অপমানিত হবে যারা তাকে রক্ষা করতে পারেনি, অর্থাৎ আশপাশের মানুষ, পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ। কারণ, তাদের ভীরুতার কারণেই তরুণীটি ধর্ষিত হয়েছে। অপমানিত হবে সে সব পরিবার, যে সব পরিবারে ধর্ষকরা বড় হয়েছে, কিন্তু মানুষ হয়নি। কারণ, সেসব পরিবার তাদের শেখায়নি সভ্য সমাজে কিভাবে বসবাস করতে হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব আর অহঙ্কারের ঘটনাপ্রবাহ আমাদের মধ্যে আত্মশ্লাঘার সঞ্চার করে নিশ্চিতভাবে কিন্তু অপমানের বা নির্যাতনের ঘটনার আবেদনও কিছুমাত্র কম নয়। বরং অপমানের ঘটনা জাতির অনুভূতিতে যে গভীর ক্ষত এবং তা যে সংহতি গড়ে তুলতে পারে, তা গৌরবের আনন্দ দিয়ে সম্ভব নাও হতে পারে। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধের অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত বা অনালোচিত বিষয়ের উপাত্ত সংগ্রহে মনোনিবেশ করা দরকার। মুক্তিযুদ্ধের কম আলোচিত দিকগুলোর একটি হচ্ছে গণহত্যা। পাকবাহিনী একাত্তরে শহর থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত অগণিত গণহত্যা চালায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব গণহত্যার শিকার নিম্নবর্ণের মানুষ যাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, তাঁরা ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের অবদানের উপযুক্ত মূল্যায়ন হয় না। ওয়াহিদুল হক 'জাহানারা ইমাম স্মারক' বক্তৃতায় যথার্থই বলেছেন যে, স্বাধীনতার চেতনার মধ্যে 'গণহত্যার চেতনা' প্রধান, "গণহত্যাকে, ত্রিশ লাখের বলিকে প্রায় চার লাখ বাঙালি নারীর সম্ভ্রম আহুতিকে ভুলতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কিছুই বাকি থাকে না। মুক্তিযুদ্ধের আদিতে আরম্ভ এই দিনে গড় দশ হাজার বাঙালি নিধনের নিরন্তর মোচ্ছব, একে ভুলিয়ে দিয়েই আরম্ভ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উৎসাধন। একমাত্র গণহত্যার চেতনাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিকষিত হেমে পরিণত করতে পারে।"

এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার তিনবার ক্ষমতায় ছিল। বিএনপি-জাতীয় পার্টি বাকি সময়। সবাই মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ করেছে। কিন্তু, মুক্তিযুদ্ধের একটি জাদুঘর তৈরির পরিকল্পনা নেয়নি সরকারীভাবে। অথচ, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা পেয়েছে সেনা জাদুঘর। আমরা এখন পর্যন্ত সর্বস্তরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আলাদাভাবে পাঠ্য করতে পারছি না। রাজনৈতিকভাবে এমন কি সরকারে থেকেও মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে সম্প্রসারিত করার যে উদ্যোগ সেটিও কখনও গ্রহণ করা হয়নি। ফলে দেশের এক-তৃতীয়াংশ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী হয়ে উঠছে। যার ফলে খালেদা জিয়া বা পাকিস্তানীরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন তুললে আমাদেরও পাল্টা বলতে হয়। অথচ কোন দেশে এসব প্রশ্ন ওঠানো হয় না। বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের রাজনৈতিক দল আছে। সুতরাং

মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা এ প্রশ্ন তুলবে তা স্বাভাবিক এবং আমাদেরও নিরন্তর জবাব দিতে হবে। এ বিষয়টিও স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু পুরো বিষয়টা যে অস্বাভাবিক তা কারও মনে হচ্ছে না।

খালেদা জিয়া বা বার্গম্যান যখন ৩০ লাখ নিয়ে প্রশ্ন করেন, তখন যারা ৩০ লাখ মেনে নিয়েছেন তাদের যুক্তিগুলো স্বাভাবিকভাবে তুলে ধরেন না। তাদের যুক্তি হলো, ৩০ লাখ সঠিক না হতে পারে। কিন্তু সংখ্যাটি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন (কমিউনিস্ট শাসনামলে) বা জাপানে (সামরিক শাসনামলে) এত মানুষ হত্যা করা হয়নি যা হয়েছে ইয়াহিয়া আমলে। আর জে রুমেল ডেথ বাই গভর্নমেন্ট নামে একটি বইয়ে লিখেছেন, বাংলাদেশে হত্যার সংখ্যা ১০ থেকে ৩০ লাখ ধরা হয়।

পাকিস্তান প্রতি ৬১ জনে ১ জন করে তারা হত্যা করেছে। প্রতি ২৫ জন বাঙালির মধ্যে ১ জন। তিনি লিখেছেন "The human death toll over only 267 days was incredible Just to give for five out of the eighteen districts some incomplete statistics published in Bangladesh newspapers or by an Inquiry Committee, the Pakistani army killed 100,000 Bengalis in Dacca, 150,000 in Khulna, 75,000 in Jessore, 95,000 in Comilla, and 100,000 in Chittagong. For eighteen districts the total in 1,247,000 killed. This was an incomplete toll, and to this day no one really knows the final toll. Some estimates of the democide [Rummel's "death by government"] are much lower-one is of 100,000 dead-but most range from 1 million to 3 million... The Pakistani army and allied paramilitary groups killed about one out of every sixty-one people in Pakistan overall; one out of every twenty-five Bengalis, Hindus, and others in East Pakistan. If the rate of killing for a all of Pakistan is annualized over the years the Yahya martial law regime was in power (March 1969 to December 1971), then this one regime was more lethal than that of the Soviet Union, China under the communists, or Japan under the military (even throughout World War II.) (Rummel. Death By Government, p. 331)

মানুষের ইতিহাসে এত কম সময়ে এত বেশি মানুষ আর কখনও হত্যা করা হয়নি। সংখ্যা কম করে দেখালেও। এই হত্যায় কোন দায়বোধ ছিল না দেখে পাকিস্তান ও তাদের সহযোগীরা হত্যায় কোন দ্বিধা করেনি। সাংবাদিক ডন কোগিনকে ঐ সময় একজন পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন বলেছিলেন, যে কাউকে যে কোন কিছুর জন্য হত্যা করতে পারি। আমরা কারো কাছে দায়বদ্ধ নই।

৫.

গত নির্বাচন যে মার্কিনী বাধা সত্ত্বেও হয়ে যাবে এটা বিএনপি-জামায়াত

নেতারা ভাবেননি। শেখ হাসিনা মার্কিন দাবি অগ্রাহ্য করতে পারবেন এটি এ দেশের রাজনীতিবিদরাও ভাবেননি। এ কারণে কোন না কোন সময় শেখ হাসিনাকে কাফফারা দিতে হতে পারে। হাতি যেমন অনেক কিছু মনে রাখে এবং সময় মতো প্রতিশোধ নেয়। মার্কিনীরাও ঠিক একই কাজ করবে। বিএনপি-জামায়াতকে ক্ষমতায় বসিয়ে যুদ্ধাপরাধ বিচার বন্ধ হবে তাদের প্রথম প্রতিশোধ।

শেখ হাসিনা নির্বাচিত হয়ে একটি কথাই বলছেন, জামায়াতকে তিনি ছাড় দেবেন না। হয়ত বিএনপিকেও। কারণ, আদর্শগতভাবে তাদের কোন পার্থক্য এখন আর নেই। বিএনপি-জামায়াত রাজনৈতিকভাবে এখন কোণঠাসা অবস্থায় আছে। তারা এবং তাদের মিত্ররা এখন তাই মুক্তিযুদ্ধের সত্যগুলোকে আক্রমণ করছে, মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করছে। তারেক বা খালেদা এ কারণেই নানা কথা বলছেন। খালেদা হঠাৎ করে কোন উদ্দেশ্য ছাড়া বলেননি, যে ত্রিশ লক্ষ নিহতের কথা বলা হয় তা নিয়ে সন্দেহ আছে। বার্গম্যানও যে এখন একথা বলছেন তার কারণ–তাদের মনে হয়েছে, এই সংখ্যা বিতর্কিত হলে, যুদ্ধাপরাধীদের গণহত্যায় জড়িত থাকার অপরাধটি লঘু হয়ে যায়। সেটিও কম কৃতিত্ব নয়। কিন্তু, একটি কথা তারা ভুলে গেছেন, ৩০ লক্ষের জায়গায় ১৩ লক্ষ হলেও সেই সংখ্যা এশিয়ার গণহত্যাগুলোর মধ্যে এক নম্বরে থাকবে। সুতরাং গণহত্যার সংখ্যা কমালেও এ থেকে রাজনৈতিক কোন সুবিধা তারা পাবেন না।

জেনোসাইড ওয়াচের সভাপতি গ্রেগরি এইচ স্ট্যানটোন লিখেছেন, গণহত্যার আটটি পর্যায় আছে। পাকিস্তানীরা যে গণহত্যা চালিয়েছে তাতে এই আটটি পর্যায়ই পরিস্ফুট। এই আট পর্যায়ের সর্বশেষটি হলো অস্বীকার করা [denial]. তার মতে, আরও গণহত্যা চালানোর ইঙ্গিত এই অস্বীকার। যারা গণহত্যা চালায়, তারা গণকবর খোঁড়ে, মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে, সাক্ষীদের ভয় দেখায়, সাক্ষ্য-প্রমাণ নষ্ট করে ফেলে। তারা যে অপরাধ করেছে তা অস্বীকার করে তার দোষ চাপায় ভিকটিমদের ওপর। "It is among the surest indicators of further genocidal massacres. The perpetrators of genocide dig up the mass graves, burn the bodies, try to cover up the evidence and intimidate the witnesses. They deny that they committed any crimes and often blame what happened on the victims."]

পাকিস্তানীরা এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। পাকিস্তানে এখনও এক ধরনের গণহত্যা চলছে। তালেবানরা যা করেছে আফগানিস্তানে এবং পাকিস্তানে তাও গণহত্যার অংশ। কারণ, তারা তাদের আদর্শের বিরোধী যে কাউকে তারা শত্রু মনে করে।

খালেদা জিয়া বা ডেভিড বার্গম্যান কখনও গণহত্যার সঙ্গে আগে জড়িত ছিলেন না, সহায়তা করেননি, এমন কী প্ররোচনাও দেননি। কিন্তু এখন গণহত্যার

সংখ্যা তুলে গণহত্যার গুরুত্ব খাটো করতে চাচ্ছেন যা 'ডিনাইয়ের' অংশ। এবং সেটি এক ধরনের রাজনৈতিক কৌশলেরই অংশ যা বিএনপি-জামায়াত, পাকিস্তান-সৌদি-মার্কিন বলয়ের কৌশলেরই অংশ। কোন কিছুই কাকতালীয় নয়। এবং এ কারণে তারা প্রচুর অর্থও ব্যয় করছেন। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একজন বিদেশী নাগরিক কেন এ দেশে বসে এ দেশের গণহত্যার সংখ্যা নিয়ে নিরন্তর প্রশ্ন তুলবেন?

খালেদা জিয়া বা বার্গম্যানের ভাগ্য তারা বাংলাদেশে বসবাস করছেন বলে পার পেয়ে যাচ্ছেন। বাঙালিরা অতীব সহিষ্ণু এবং খানিকটা বোধহীনও বটে। তাদের অপমান করলেও বোঝেন না অপমান করা হয়েছে। তাদের বোঝাতে হয় যে, তাদের অপমান করা হয়েছে। অবশ্য একবার ঠিকঠাক বোঝালে তারা আবার সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। করেছেও। সেটাই ভরসা। না হলে, একজন রাজনীতিবিদ, যিনি একটি বড় দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি মুক্তিযুদ্ধ, ৩০ লক্ষ শহীদ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং বহাল তবিয়তে থাকেন। মিডিয়া কর্মীরাও সেটি প্রশ্রয় দেয় তাকে সে বিষয়ে প্রশ্ন না করে। আসলে মিডিয়া কর্মীদের তিনি কখনও চাকরবাকরের বেশি মূল্য দেন না। তাতে তারা অখুশিও নন। বার্গম্যান একজন ব্রিটিশ নাগরিক হয়েও এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলে দিব্যি সাংবাদিক হিসেবে চাকরিবাকরি করছেন। অবশ্য যে দেশে জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করে তা নিয়ে গর্ব করে সমাজের এক অংশ ও সেই ঘটনাকে ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অংশ মনে করে, সে দেশে এসবই স্বাভাবিক। এদেশের মানুষ ক্রমেই নষ্ট থেকে নষ্টতর হচ্ছে। হয়ত এ কারণেই মহাভারতেও বলা হয়েছিল এ দেশটি পাণ্ডব বর্জিত দেশ। বার্গম্যান নয়, দুঃখ হয় ড. কামাল হোসেনের পরিবারের জন্য। স্বাধীনতার পক্ষে সবসময় তারা সোচ্চার থেকেছেন। আর আজ সেই পরিবারেরই একজন গণহত্যার সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন করছেন। পুরো পরিবারকে জনসমক্ষে, সমাজে প্রশ্নের সম্মুখীন করছেন। বাপের বেটা মনে করতাম যদি বার্গম্যান বার্লিনে বা তেল আবিবে বসে হলোকাস্ট এবং তার সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারতেন। দেখতাম। তারপর তিনি দিব্যি হেসেখেলে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারেন কিনা।

বার্গম্যান অবশ্য একটি ঠিক কথা বলেছেন। আমাদের সংস্কৃতির বুননে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে ৩০ লক্ষ শহীদ। এটাকে উপরে ফেলা কঠিন। ওহাবিরা আজ ১০০/১৫০ বছর, জামায়াতীরা দীর্ঘ ৬০/৭০ বছর মাজার জিয়ারতের ওপর ফতোয়া দিয়ে রেখেছে, তাতে কোন লাভ হয়েছে? কারণ, তা আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্গত। পহেলা বৈশাখে খালেদা-বার্গম্যানের মনোসঙ্গীরা বোমা মেরে মানুষ হত্যা করেছে। পরের বছর থেকে ১ বৈশাখ আরও জোরদার হয়েছে। কেননা তা এখন সংস্কৃতির বুননের অর্ন্তগত। তেমনি, গণহত্যা হয়নি, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা

চাননি, ১৯৭২ সালের সরকার অবৈধ এসব বলে কুলাঙ্গাররা উল্লসিত হতে পারেন, গোপনে নীল ছবি দেখার পুলক অনুভব করতে পারেন, তাতে কিছু আসে যায় না। যে যেখানে আছেন, যার যা অবস্থান তাই থাকবে।

অনেক পরিবারে, সমাজে, প্রতিটি রাষ্ট্রে কিছু কুলাঙ্গার থাকে। এই কুলাঙ্গারের সংখ্যা সভ্যতার মাপকাঠি। অন্যান্য দেশে কুলাঙ্গারের সংখ্যা কম, অনেক দেশে নেই বললেই চলে। আমাদের দেশে কুলাঙ্গারের সংখ্যা একটু বেশি এই আর কি! আর মুসলমান হিসেবে নিয়তি মেনে নিয়েছি। শুধু বার্গম্যান নয়, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সমর্থকরাও অনবধানবশত কীভাবে ইতিহাস বিকৃত করেন তার একটা উদাহরণ দিই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের নিয়ে অনেক ছবি তোলেন বিখ্যাত ভারতীয় ফটোগ্রাফার রঘুরাই। সেইসব আলোকচিত্র নিয়ে একটি বই প্রকাশ করে ভারতের নিয়োগী বুকস এবং ঢাকার ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস। এ্যালবামটির শিরোনাম- বাংলাদেশঃ দি প্রাইস অব ফ্রিডম।

বইয়ের মলাটে লেখা হয়েছে 'With the interventiom of the Indian Armed Forces in December 1971, after nine months of violence and uncertainty and a twelve day war between India and Pakistan, the independent nation of Bangladesh.' এই ধরনের বক্তব্য সাধারণত পাকিস্তান দেয়। এখানে মুক্তিযুদ্ধ নেই, মুক্তিযোদ্ধা নেই, যৌথ বাহিনী নেই, ঢাকায় আত্মসমর্পণের কথা নেই। শিক্ষিতজনরাই দেখি আজকাল এ ধরনের ভুল বেশি করছে। কী করব, নিয়তি!

২৭ এপ্রিল, ২০১৪

জামায়াতে বিশ্বাসী মানুষ প্রশাসনসহ সর্বত্রই

দুই দুইবার উপনিবেশ আর ক'টি দেশ হয়েছে? হয়েছে অনেক, তবে এ মুহূর্তে ভিয়েতনামের কথা মনে পড়ছে। আমাদের দেশ দু'শ' আড়াই শ' বছর ঔপনিবেশিক শাসনে থাকার পর স্বাধীন হয়েছি ভেবে যখন একটি পুলকিত অবস্থা তখন আবার অনেকেই বুঝতে পারেননি আরেকটি উপনিবেশে পরিণত হলো পূর্ববঙ্গ। ঐ উপনিবেশ কয়েক বছর পর থেকে সেনাশাসিত হতে থাকে যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশে আবার ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০। এরপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রণ রয়ে গেছে এখনও। উপনিবেশের বিরুদ্ধে, সেনা শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে, আন্দোলনে জয়লাভও করেছে মানুষ, কিন্তু মৌল পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। এর কারণ শাসন কাঠামো যে সব আইন বা বিধি ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি তাতে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী শাসক ও সামরিক শাসকদের জারি করা ফরমান, আইন সবই রয়ে গেছে। রাজনীতিবিদরা যখন ক্ষমতায় এসেছেন তখনও এই সব বিধিব্যবস্থার খুব একটা পরিবর্তন করেন নি।

ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের শাসন দীর্ঘায়িত করতে পেরেছে মনোজগত নিয়ন্ত্রণ করে। এবং এই নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। ব্রিটিশরা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন পাঠ্য পুস্তকে বিশেষ করে ইতিহাসে সব সময় যে বিষয়টির ওঁপর জোর দেয়া হয়েছে তা হলো প্রাক-ব্রিটিশ শাসন হলো অন্ধকার, ব্রিটিশ শাসন সে অন্ধকার দূর করেছে। পাকিস্তান একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার বীজ দৃঢ়ভাবে বপন করতে চেয়েছে। সে জন্য পাঠ্যপুস্তক সব সময় নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। এ কারণে, টেক্সট বুক বোর্ড গঠন করা হয়েছে কিন্তু সবসময় তা মন্ত্রণালয়ের আমলারা নিয়ন্ত্রণ করেছে। ওই পাঠ্যবই রচনায় বেছে নেয়া হয়েছে রক্ষণশীলদের। বাইরে দেখানো হতো শিক্ষা জগতের সঙ্গে যারা যুক্ত তারাই পাঠ্যবই রচনা করছে। কিন্তু মূলে নিয়ন্ত্রিত হতো রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা। স্বাধীন পাঠ্যপুস্তক সংস্থা পাকিস্তানে কখনও ছিল না, এখনও নেই। বাংলাদেশ অবিকল সেই মডেল গ্রহণ করে। তাই দেখি পাঠ্যপুস্তক নিয়ে কেলেঙ্কারি চলেছে এবং চলছে। শাহরিয়ার কবির একটি কথা প্রায় তার সব প্রবন্ধে লেখেন এবং বক্তৃতায় বলেন যে, এ দেশের প্রশাসনে রন্ধ্রে রন্ধ্রে

জামায়াতীরা [পড়ুন পাকিস্তানীরা] ঢুকে গেছে। এবং শাসকরা এই জামায়াতীকরণ দূরীকরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি। হ্যাঁ, জামায়াত আদর্শে বিশ্বাসী মানুষজন প্রশাসন কেন, সব খানেই আছেন। কিন্তু যখন দেখি প্রগতিশীল বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে যারা পরিচিত তারাও একই মনোভঙ্গি পোষণ করেন তখন কি বলব? আসলে ঔপনিবেশিক দীক্ষা আমাদের মগজ থেকে সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা যায় নি। এ কারণে মাঝে মাঝে বলি, আমাদের পরাণের গহীন গভীরে কোথায় যেন হেজাবি [হেফাজত+ জামায়াত+ বিএনপি] মনের এক টুকরো সযতনে লুকিয়ে রেখেছি। বিভিন্ন কার্যক্রমে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানে শাসকদের আদর্শ রাষ্ট্র গড়ার জন্য ইতিহাস বিষয় হিসেবে, বিশেষ করে নিম্ন পর্যায়ে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে ১৯৭১ সালের পর। প্রাক ১৯৭১ সালে কিন্তু ইতিহাস পাঠ্য ছিল। তাদের মনে হয়েছে যেটুকু ইতিহাস পড়ান হয়েছে তার ফলেই স্বদেশ প্রেম জেগেছে বাঙালির। সুতরাং, সে অবস্থা আর রাখা যায় না। তারা নতুন একটি বিষয় চালু করেছে তা'হলো, পাকিস্তান স্টাডিজ। অনেকটা স্যালাইনের মতো। খানিকটা পৌরনীতি, একটু অর্থনীতি, এক চিলতে ইতিহাস, সংস্কৃতি। এখানেও তা চালু ছিল। তবে নাম বদলে ইদানীং তা করা হয়েছে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়।' যে জাতীয় ইতিহাস অবশ্যপাঠ্য করা উচিত ছিল আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে তা কোন সরকার করেনি। বর্তমান সরকারও নয়। তবে একটি পার্থক্য আছে *পাকিস্তান স্টাডিজে* কোন রাখঢাক নেই। সাম্প্রদায়িক আদর্শ প্রচারে কারণ সেটিকে তারা আদর্শের ভিত্তি বা পাকিস্তানী সংস্কৃতি হিসেবে মনে করে। বাংলাদেশে খানিকটা রাখঢাক আছে।

পাকিস্তানে উচ্চমাধ্যমিক, এ ও ও লেভেলে অবশ্যপাঠ্য হলো পাকিস্তান স্টাডিজ। এ রকম একটি বইয়ের নাম *ইন্ট্রোডাকশন টু পাকিস্তান স্টাডিজ*। কলেজের দু'জন সিনিয়র অধ্যাপক [একজন রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও অপরজন ভূগোলের] বইটি লিখেছেন। পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে তারা 'পাকিস্তানী আদর্শের সংরক্ষণ' শিরোনামে লিখেছেন, পাকিস্তানী শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বিষয় হচ্ছে, পাকিস্তানী আদর্শের সংরক্ষণ যা পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি। এবং পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হবে ইসলামী আদর্শ যা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রামাণিক আদর্শ।

[The main abject of the educational system of Palistan is the preservation and protection of Pakistan ideology which was the basis of Pakistan movement. The educational system of Pakistan shauld be based on the islamic ideals which was the primary purpose of the freedom struggle] শুধু তাই নয়, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্য প্রসারিত করতে হবে।

কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী প্রকাশিত সম্মিলনী বার্তা/২-এ অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম 'মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কারিকুলাম প্রসঙ্গ ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, তা উদ্ধৃত করছি একটু দীর্ঘ হলেও তা' আমি যে মনোভঙ্গির কথা বলছি তা স্পষ্ট হবে। বাংলাদেশের শিক্ষা নীতির ৩ নম্বর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে বলা হয়েছে, "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো।" (পৃ-১) অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ শীর্ষক গবেষণার আলোকে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালার প্রথমটি হলো, "ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশপ্রেম বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি" করা।

ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে ১৮টি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর ৩ ও ৪ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে, "মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা। শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞানের ভিত রচনা তথা এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থসামাজিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার প্রতি আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে গড়ে তোলা।" জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি চূড়ান্তভাবে যে শিক্ষাক্রম অনুমোদন করেছে তার সঙ্গে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ব্যাপক ব্যবধান দেখা যাচ্ছে। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণিতে সকল ধারার জন্য আবশ্যিক বিষয় আছে ১০টি, নবম-দশম শ্রেণীতে আবশ্যিক বিষয় আছে ৭টি, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে সকল ধারার জন্য বাংলা, ইংরেজি ব্যতীত ১০০ নম্বরের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আবশ্যিক করা হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাস জানার কোন সুযোগ রাখা হয়নি। কেবল নবম-দশম শ্রেণীর মানবিক শাখার জন্য 'বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা' পত্রটি আবশ্যিক করা হয়েছে।' আমাদের দেশে পাঠ্যবইয়ে ইতিহাস বিকৃতি, সূক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন, সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবমূল্যায়নের প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়। আমাদের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদরা যেন বিষয়টিকে ভবিতব্য হিসেবেই মেনে নিয়েছেন।

এ অনীহা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কয়েকটি জেনারেশন পরিণত হয়েছে শিকড়হীন জাতিতে, মানসিকভাবে

যারা উদ্বাস্তু। যারা এ কাজটি করেছেন তারা তো অপরাধী, আমরা যারা শিক্ষাবিদ বা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের সঙ্গে জড়িত তারাও সমানভাবে অপরাধী এর জোরালো প্রতিবাদ না করার জন্য।

সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অব্যবস্থাপনা, মনোযোগহীনতা, হৃদয়হীনতা, অমানবিকতা একটু পর্যবেক্ষণ করলেই চোখে পড়ে। অত্যধিক পাঠ্যপুস্তক যা একটি শিশুর পক্ষে বহন করে ক্লাসে নেয়া অসম্ভব, জটিল ও সমন্বয়হীন কারিকুলাম, কদাকার পাঠ্যপুস্তক, ততোধিক অনুপোযোগী ভাষা, ক্লাসে প্রায় ক্ষেত্রে মনোযোগহীন ও অর্ধশিক্ষিত শিক্ষক, বোর্ডের শুধু ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি এবং মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে যোগ্যতাহীন ও যান্ত্রিক মন্ত্রী, আমলা- যাদের পছন্দ শুধুই কর্তৃত্ব ও পদে পদে বাধা সৃষ্টি- এই হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা। গত তিন দশকে কি পড়ান হয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সে বিষয়ে কিছু জানা সম্ভব নয়। কারণ বোর্ডের গ্রন্থাগারে চার দশকের পাঠ্য পুস্তকের সংগ্রহ নেই। শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রকের এ ধরনের হাল কোন সভ্য দেশে নেই এবং বোর্ডে যারা চাকরি করেন (তারাও শিক্ষক) তাদের মনমানসিকতাও এ থেকে বোঝা সম্ভব।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে 'শিক্ষিত সমাজের' একটা বড় অংশ চিন্তাধারায় রক্ষণশীল, সরল বাংলায় ডানপন্থী। প্রশাসন থেকে শিক্ষা সবখানে তাঁদেরই কর্তৃত্ব। উদারচিন্তার সমর্থকের অবস্থান প্রান্তিক। তাই বোর্ডে যখন পাঠ্যবইয়ের লেখক/সম্পাদক খোঁজা হয় তখন তাঁরা প্রথমোক্ত ধারার মানুষদেরই পছন্দ করেন। গত চার দশকের পাঠ্যবই বিশ্লেষণ করলে এ ধারণা ভুল প্রমাণ করা কষ্টকর হবে।

পাঠ্য বই-এ (এখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য বইকে বোঝান হয়েছে) সব সময় একটি প্রবণতা ছিল খণ্ডিত ইতিহাস, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ইতিহাস ও মিথ্যা ইতিহাস শেখানো চেষ্টা যা ছিল ব্রিটিশ আমলে। যেহেতু বাংলাদেশ দীর্ঘসময় ছিল ডানপন্থী বা সামরিক বাহিনী বা ডানপন্থী দলসমূহের কর্তৃত্বাধীন সেজন্য পাঠ্য বইয়ে এসব বিষয়েই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যে সমস্ত পাঠ্যবই দেখার সুযোগ হয়েছে তাতে দেখা গেছে প্রধান টার্গেট মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। ১৯৯৬ সালের পূর্বপর্যন্ত এ ধারণাই বারবার তুলে ধরা হয়েছে জিয়াউর রহমান ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন প্রধানত সেনাবাহিনী এবং যারা নিহত হয়েছিলেন তারা মুসলমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্থান ছিল প্রান্তিক। হীনম্মন্যতা, প্রতিহিংসা, অশিক্ষা একটি জাতির এলিটবর্গকে কি করে তোলে পাঠ্যবই তার উদাহরণ।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মুক্তিযুদ্ধের যথাযথ ইতিহাস

পাঠ্যবইয়ে সংযোজন করার জন্য কমিটি করে। এ কমিটির বিরুদ্ধে ডানপন্থী প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে ইনকিলাব প্রচারণা শুরু করে। অনেক ঘাতপ্রতিঘাত পেরিয়ে ঐ কমিটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে, যেখানে সবার অবদান এমনকি জিয়াউর রহমানের 'অবদান'ও উল্লিখিত হয়েছিল।

২০০১ সালে জামায়াতে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলাম প্রভাবাধীন বিএনপি ক্ষমতায় এলে প্রথমেই তারা আবার পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। তারা এবার ঠিক করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে জিয়াউর রহমান ছাড়া কারও অবদান স্বীকার করা হবে না। এ উদ্দেশ্যে পাঠ্যবইয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা অংশটুকু বদল করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ বিষয়টিকে একটি জুগাখিচুড়ি বানান হয়েছিল। ২০০১ সালে জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা এগিয়ে আনা- অর্থাৎ জিয়াউর রহমান ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

পাকিস্তানের *পাকিস্তান স্টাডিজ* বইগুলোতে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। পাকিস্তানে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে অস্বীকৃতি এবং বর্জন ইতিহাস তত্ত্বের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো ও জিয়াউল হকের সময় ইতিহাসের মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার তুঙ্গে উঠে। এসব পাঠ্যবইয়ে হিন্দু সম্প্রদায়কে সবসময় ভিলেন হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং পৃথিবীর যাবতীয় কুকর্মের জন্য ভারত ও হিন্দুদের দায়ী করা হয়েছে। এখনও পাকিস্তানের পাঠ্যবইয়ের ভিত্তি ভুট্টো-হক প্রচারিত তত্ত্ব। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা তাই স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানের পাঠ্যবইতে নেই। একইভাবে বিএনপি-জামায়াত আমলের পাঠ্যবইয়েও তা নেই।

আগে উল্লেখ করেছি, ব্রিটিশ আমলে পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হতো। স্বাধীন হলেও পরবর্তীকালে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে তা অব্যাহত আছে। 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা'য় তিনটি দেশেই যখন যে সরকার ক্ষমতায় তখন সে সরকার তার 'আদর্শ' চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে যা একধরনের অস্বীকৃতি ও বর্জন।

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সবসময় বিতর্ক হয়েছে। এই তিনটি দেশের পাঠ্যপুস্তকে একটি সাধারণ বিষয় হলো সাম্প্রদায়িকতা। যে কারণে এ অঞ্চলে শিশুরা এসব পাঠ্যপুস্তক পড়ে যখন যুবকে পরিণত হয় তখন মনের গভীরে তারা সাম্প্রদায়িকই থেকে যায়। ধর্মান্ধতা শেখানোও একটি বড় বৈশিষ্ট্য। প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- "ভারতীয় পাঠ্যপুস্তকগুলো সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিশেষত মুসলমানদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট ও পূর্ব ধারণায় পরিপূর্ণ। পাকিস্তানী পাঠ্যপুস্তকগুলোও এ থেকে আলাদা নয়। ভারত ও হিন্দুবিরোধী একটি মনোভাব তৈরিই এর প্রধান লক্ষ্য। এ

দুটো দেশের ক্ষমতাসীনরাও পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির এই প্রক্রিয়ায় ভীষণভাবে আগ্রহী। পাঠ্যপুস্তকগুলো যে, শুধু পূর্ব ধারণা নিয়ে লেখা হচ্ছে তা কিন্তু নয়। এর পিছনে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই পূর্ব ধারণার ভিত্তি হলো অজ্ঞতা। রাজনৈতিক কোন কৌশল নয়। ভারতীয় এবং পাকিস্তানী পাঠ্য পুস্তকগুলো একটি পূর্বধারণা থেকে এবং তা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য লক্ষ্য নিয়ে লেখা হচ্ছে। এই পাঠ্য পুস্তকগুলোর মাধ্যমে তরুণদের মনে ঘৃণার বীজ বপন করা হচ্ছে।"

২.

আমাদের ইতিহাসে ধর্ম একটা বড় উপাদান হিসেবে কাজ করেছে ও করছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা যে ইতিহাস পড়ে আসছি (উপমহাদেশে) তা রচিত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং তিনটি দেশেই যে রাজনীতি চলছে তাতেও ধর্ম খানিকটা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করছে। ইতিহাস আমাদের মনে এ ধারণাই সৃষ্টি করেছে যে, হিন্দু/ রাষ্ট্র বা মুসলমান/ রাষ্ট্র একে অপরের ওপর অত্যাচার করেছে। এ কারণে, ভারতে যেমন হিন্দু শাসকদের মহিমা উচ্চারিত হয়, এখানেও সেই একইভাবে মুসলমান নৃপতিদের মহিমান্বিত করা হয়। আমরা কখনও খতিয়ে দেখার চেষ্টা করিনি যে, মধ্যযুগে "রাষ্ট্র কখনও ধর্মান্তরের জন্য কোন ব্যাপক প্রচেষ্টা করেনি।" রোমিলা থাপার যথার্থই লিখেছিলেন, "ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং জাতি সমার্থক নয়।"

রোমিলা থাপার আরও লিখেছিলেন, জেমস মিলের 'ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস'-এর সবচেয়ে "তাৎপর্যপূর্ণ দিক বোধহয় তা এক হিসেবে ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার সূচনা করেছিল এবং পরে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ঐতিহাসিক সমর্থন যুগিয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মধ্যেই তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় ইতিহাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করার রীতি প্রচলন করেন। এই তিনটি অধ্যায় হলো হিন্দু সভ্যতা, মুসলমান সভ্যতা এবং ব্রিটিশ সভ্যতা (বিচিত্র হলো খ্রীস্টান সভ্যতা নয়।)" আমরা এখনও ইতিহাসের পর্ব বিভাগ করি এরই ভিত্তিতে। স্কুলে আমরা যে ইতিহাস পড়ি, তা পড়ে "মনের গভীরে অল্পদিনের মধ্যেই এমনভাবে গেড়ে বসে যে পরবর্তীকালে আমাদের ব্যক্তিচরিত্র এবং সামাজিক ব্যবহারে তার প্রতিফলন দেখা যায়।... ফলে দুটি জিনিস প্রায়ই ঘটে- প্রথমত এই সব প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই আমরা ক্ষেপে যাই, মানতে চাই না, এমন কি যদি কেউ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন তবু। দ্বিতীয়ত. ইতিহাসের শিক্ষার ফলেই কোন ব্যক্তি, জাতি, দেশ বা সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমরা কখনও অকারণে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতে শিখি বা অযথা স্তুতি-প্রশংসা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি।"

গত চার দশকের পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে আমরা এর সত্যতা খুঁজে পাব

এবং অনুধাবন করা সহজ হবে- কেন দু'টি জেনারেশনের আচরণ বিপরীতধর্মী। গত ত্রিশ বছর ধরে ইতিহাস নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে যা জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। রাজনীতির কারণে ও স্বার্থে এই দ্বন্দ্ব এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, কয়েকটি প্রজন্ম এতে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের ধারণা, ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে দেশে তাঁদের স্থান হবে না।

দেশের তিনটি দল- বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামাতে বাধ্য এবং এ প্রক্রিয়ায় ইতিহাসে চলছে সংযোজন, বিয়োজন এবং উধাওকরণ। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দু'টি দলই কম বেশি যুক্ত সংযোজন ও বিয়োজনের সঙ্গে। আওয়ামী লীগ যখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তখন বঙ্গবন্ধু ছাড়া কিছুই গুরুত্ব পায় না। বিএনপি যখন ইতিহাস পর্যালোচনা করে, তখন জিয়াউর রহমানই হয়ে ওঠেন মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক। জামায়াত এমন প্রশ্ন করেছে- গণহত্যা কী? বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে তারা জড়িত নয়। আসলে হওয়াটা উচিত ছিল মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও জনতা। স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় জড়িত তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, আওয়ামী লীগ ছাড়াও বামপন্থী ও দলহীন মানুষদের ভূমিকাও ছিল মুক্তিযুদ্ধে, যারা সম্মুখসমরে ছিলেন তারা ছাড়াও অবরুদ্ধ দেশে যারা বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করেছেন তারাও মুক্তিযোদ্ধা, জিয়াউর রহমানের অবদানও আছে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এবং ২৭ মার্চ বেতার বার্তার কারণে। কিন্তু, পাঠ্যবইয়ে কখনও সুসংহতভাবে এ সব বিষয় প্রতিফলিত হয়নি।

হরবংশ মুখিয়া আশা প্রকাশ করেন, "এখনও আমরা ইতিহাসচর্চার ধারা সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে পারব। এখন বিশেষ কোনো শাসক বা শাসক শ্রেণীর ইতিহাসমাত্র না পড়ে সমস্ত সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করব, একমাত্র তখনই আমাদের ইতিহাসচেতনা প্রকৃতই এবং যুক্তিযুক্তভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারবে।"

এ আশা বাংলাদেশে করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান আমলের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস পড়া জেনারেশন এখনও সমাজ-রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ইতিহাস আবার ব্যবহৃত হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। দু'তিন জেনারেশন পর হয়ত এ আশা করা যেতে পারে।

বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলোতে তবুও মুক্তিযুদ্ধ বা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিষয়টি খানিকটা হলেও আছে। ইংরেজী বইতে তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। একই দেশে দু' ধরনের মানসিকতার ছেলেমেয়ে গড়ে উঠছে। ইংরেজী মাধ্যমে মার্কোপোলো থেকে যিশুখ্রিস্ট, গান্ধী পর্যন্ত অনেকের অনেক কিছু জানা যাবে, জানা যাবে না বঙ্গবন্ধু বা বাংলাদেশের সম্পর্কে। এবং ইংরেজী মাধ্যমে যারা পড়াচ্ছেন

তারা এ ব্যাপারে লজ্জিতও নয়। লজ্জিত নয় মন্ত্রণালয়ও। এ বিষয়ে গবেষণা করে একজন গবেষক লিখেছেন, "যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশে যে সব শিশুর জন্ম, তাদের পাঠ্য সূচীতে যদি মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস না থাকে তবে তারা কিভাবে জানবে কোন চেতনায় বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। আর তা যদি সম্ভব না হয় তবে কোন প্রেরণায় তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নের জন্য অগ্রসর হবে।"

মাদরাসার অবস্থা আরও শোচনীয়। অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারি এ বিষয়ে পর্যালোচনা করে লিখেছেন, "এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এই যে, স্বাধীনতার এত বছর পরও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত প্রকাশিত পুস্তকে এ ধরনের ভুল তথ্য ও ব্যাখ্যা ছাত্র- ছাত্রীদের পড়তে হচ্ছে।"

আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে সেই কবে কি লেখা হয়েছিল সেটিই বলবৎ। নতুন চিন্তা, ধ্যান ধারণা কিছুই পাঠ্যপুস্তককে আলোকিত করে না। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে থাপার মন্তব্য করেছিলেন, "ইতিহাসের কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলোতে প্রায় কখনই স্থান পায় না। সুতরাং এক, এমনকি দুই পুরুষ আগে ছাত্ররা যা শিখতেন ঠিক সেই একই বিষয় ও পদ্ধতিতে এখনকার ছাত্ররা ইতিহাস চর্চা করেন।" আমাদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

গত ত্রিশ বছরে আমাদের দেশে পাঠ্যবইয়ে বিবর্তন কিভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া দুরূহ। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে এ সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। আরও আশ্চর্য যে, এ যাবৎ যে সব বই প্রকাশিত হয়েছে তার সংগ্রহও বোর্ডে নেই। এতেই স্পষ্ট, পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে এক কথায় এ্যাকাডেমিক কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি। প্রকাশিত সব বছরের পাঠ্যপুস্তকের কপি যে তাদের গ্রন্থাগারে থাকা উচিত এ বোধ তাদের অনুপস্থিত। অথচ বোর্ডের কর্মকর্তারা সবাই শিক্ষক।

আজ পর্যন্ত তারা পাঠ্যপুস্তকের একটি আর্কাইভ গড়ে তুলতে পারেননি। মন্ত্রণালয় থেকেও কখনও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়নি। পাকিস্তানেও তথ্য নষ্ট করা ফেলা হয়। আর্কাইভ হলে তথ্য সংগৃহীত থাকে। যে কারণে শিক্ষিত সমাজে অভিলেখগার বা আর্কাইভ একটি আবশ্যিক প্রতিষ্ঠান।

বিএনপি আমলে পাঠ্যবইয়ে যে বিকৃতি ছিল, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ আমলে সংক্ষিপ্ত সময়ে যতটা সম্ভব তা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় এলে রাতারাতি পাঠ্যবইয়ে সব বাদ দেয়া হয়। আমি ঐ দুই আমলের পাঠ্যবইয়ে অস্বীকৃতি ও বর্জনের বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি-

পঞ্চম শ্রেণীর আমার বইয়ে 'বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল' রচনাটি দেখা যাক-

পূর্বতন সংরক্ষণ 'গ্রেফতার হওয়ার আগে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।'

খালেদা-নিজামী সংস্করণ : '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে তারা অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু করল হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ।'

অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা বাদ।

'স্মরণীয় বরণীয় যারা' শিরোনাম বদল করে নতুন শিরোনাম দেয়া হয়েছে- 'স্মরণীয় যাঁরা, বরণীয় যাঁরা। এতে কি হেরফের হলো বোঝা গেল না। পূর্বতন সংস্করণের সঙ্গে বর্তমান সংস্করণের কোন মিল নেই। আগের সংস্করণে কারা, কেন এবং কার দ্বারা শহীদ হলেন সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ ছিল। বর্তমান সংস্করণে সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি বরং কবিত্বময় কিছু বাক্য লেখা হয়েছে-

'এমনি আরও কতজনকে হত্যা করা হয়েছিল, তার কোন ইয়ত্তা নেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদের কারও ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া গিয়েছিল, কারও তাও পাওয়া যায়নি।

এই শহীদদের রক্তে ভিজে আছে বাংলাদেশের মাটি যেমন, তাঁদের জন্য ভিজে আছে তাঁদের স্বজনদের চোখ। একটু লক্ষ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, এই শহীদেরা দলে কত ভারি, আর সারাদেশে তাঁদের কত স্বজন ছড়িয়ে আছে। ভেবে দেখলে বোঝা যাবে এই স্বজন কেবল শহীদদের সন্তান, তাদের ভাই, তাদের আপনজন নয়- দেশের জন্য যারা প্রাণ দিলেন আমরা সকলে তাদের স্বজন। তাদের বুকের ভেতর থেকে একটা প্রতিজ্ঞাই আপনা থেকে বেরিয়ে আসবে।

'আমরা তোমাদের ভুলব না।' এই চাতুর্যময় বাক্যজালের কারণ, রাজাকার আলশামস ও আলবদরদের খুন করার কথা বাদ দেয়া। পূর্বতন সংস্করণে তার উল্লেখ ছিল।

প্রাথমিক পর্যায়ে বা প্রাইমারী লেভেলে আলাদাভাবে ইতিহাস পড়ানো হয় না। তার বদলে পড়ানো হয় পরিবেশ পরিচিতি। এ পাঠ্য বই সমাজ, ভূগোল, ইতিহাস, পৌরনীতির মিশ্রণ। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পরিবেশ পরিচিতি পাঠ্য। পরিবেশ পরিচিতির ইতিহাস অংশটুকু সংশোধন বা বদল করা হয়েছিল।

২০০১ সালে তৃতীয় শ্রেণীর বইয়ে যে রচনাটি সংশোধন করা হয়েছে তার শিরোনাম 'আমাদের জাতীয় পতাকা'।

১৯৯৬/পূর্বতন সংস্করণ

'১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হয়। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বেশি আসন লাভ করে। কিন্তু জনগণের রায়কে অস্বীকার করে পাকিস্তানের সরকার আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে

দিল না। বরং বাঙালিদের কঠোরভাবে দমন করার পথ বেছে নিল।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানী সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন বঙ্গবন্ধু মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পাকবাহিনী সেই রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা দেশবাসীকে জানানোর জন্য ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে সেটি প্রচার করেন। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণা প্রচার করেন। ২৬ মার্চ থেকেই পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়। এ জন্য ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।"

সংশোধিত/খালেদা-নিজামী সংস্করণ

"১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হয়। এ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে বাঙালিরা বেশি আসন লাভ করে। কিন্তু জনগণের রায়কে অস্বীকার করে তাদেরকে সরকার গঠন করতে দেয়া হলো না। তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করার পথ বেছে নেয়া হলো।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা হাজার হাজার নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে। এতে সারাদেশ ক্ষোভ ও ঘৃণায় ফেটে পড়ে। পরের দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর থেকে শুরু হয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ। এ জন্য ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।"

১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ২৬ মার্চ। এ তথ্যগুলো বাদ দেয়ার জন্যই বর্তমান সংস্করণে এই পাঠ সংশোধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের এই বইয়ের সংস্করণে একই রচনায় উল্লেখ করা হয়েছিল মেজর জিয়া ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১৯৯৬ সালের সংস্করণে এ তথ্য সংশোধিত হয়নি। তাও সংশোধন করে জোর জবরদস্তিমূলক চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ২৬ মার্চ।

চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতিতে ১৪টি অধ্যায় আছে দুটি সংস্করণেই। এর মধ্যে বদল হয়েছে একটি অধ্যায়। দশম অধ্যায়টি। পূর্বতন সংস্করণে এ অধ্যায়ের নাম ছিল 'দুই মহান বাঙালি' আর বর্তমান সংস্করণে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথিকৃৎ।'

চতুর্থ শ্রেণীর একটি শিশু কতটা গ্রহণ করতে পারে? ধারণা ছিল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ইতিহাসটি পর্যায়ক্রমে (তা ব্যক্তির জীবনী বা বিবরণ

হতে পারে) তুলে ধরা। সে জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে দু'জনের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পরিবর্তিত, 'স্বাধীনতার পথিকৃৎ', শিরোনামটিও সুন্দর। এ অধ্যায়ে পথিকৃৎ হিসেবে দেখানো হয়েছে ৫ জনকে।

'মহান বাঙালি' ও 'স্বাধীনতার পথিকৃৎ'-এর মধ্যে তফাত আছে নিশ্চয়। ৫০ বছর ১০০ বছর ধরে পাঁচ জন পথিকৃৎ হতে পারে না। আলাদা বাংলাদেশের প্রস্তাবের কথাই যদি হয় পথিকৃৎের ভিত্তি তাহলে, ১৯৪৭-এর খ্যাত অখ্যাত অনেক রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদই এ ধরনের কথা বলেছেন। নির্দিষ্ট আলাদা রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি যদি হয় মূল বিষয় তাহলে সে দাবি তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই। পরিবর্তিত সংস্করণে স্বাধীনতার পথিকৃৎদের মহান বাঙালি বলতে চান কেউ হয়তো আপত্তি করবে না। কিন্তু, পথিকৃৎদের তালিকায় অন্যদের কথা বাদ দিই, জিয়াউর রহমানের নামটা আনা হয়েছে নিছক গায়ের জোরে। এবং এটি করতে গিয়ে আরও চারজনের জীবনী সংযুক্ত করতে হয়েছে।

বিষয়টা যে কষ্টকর তা বোঝা যায় 'অনুশীলনী' বিশ্লেষণ করে। ৩নং অনুশীলনীতে আছে 'বাম পাশের শব্দগুলোর সঙ্গে ডান পাশের শব্দগুলোর মিল কর।' সেখানে একে ফজলুল হকের সঙ্গে মিলে ঋণ সালিশী আইন, শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ৬ দফা। দুটিই বাংলাদেশের মাইলফলক। জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আছে 'বীরোত্তম' খেতাব যা অনেকেই পেয়েছেন।

৪ নং অনুশীলনীতে আছে- 'ঠিক উত্তরটির পাশে টিক চিহ্ন দাও।' এখানে লক্ষ্য করুন চারজনের অবদান- 'শেরে বাংলা একে ফজলুল হক' শেরে বাংলা 'উপাধি পান'; 'হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্ট' গঠন করেন; 'মওলানা ভাসানীর জীবনের শিক্ষা'; 'শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা পেশ করেন'; আর জেনারেল জিয়ার ক্ষেত্রে 'জিয়ার স্কুল জীবন শুরু হয়' বোঝা যাচ্ছে জিয়ার সঙ্গে পূর্বোক্ত চারজনের মতো কৃতিত্বযুক্ত করা যাচ্ছে না। কিন্তু সেটি তো বিষয় নয়, বিষয়টি হচ্ছে ইতিহাস দখলের।

'মহান দুই বাঙালি' শিরোনামের ভূমিকাটি যুক্তিযুক্ত। "আমাদের বাংলাদেশে অনেক মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা এখন এই দুই মহান বাঙালি সম্পর্কে কিছু জানব।"

স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, অনেক মহান বাঙালি আছেন। কাউকে খাটো করার ইচ্ছে নেই, এর মধ্যে বর্ষীয়ান ফজলুল হক, তাই তিনি আলোচ্য, আর আলোচ্য বঙ্গবন্ধু যেহেতু তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বাধীনতার।

দুটি জীবনীতেই তাঁদের জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে। ফজলুল হকের পেছনে খরচ করা হয়েছে ৩৮ লাইন, শেখ মুজিবের পেছনে ৬৩ লাইন।

এই অসঙ্গতি চোখে পড়ে। অনেকে বলতে পারে, ফজলুল হক ও শেখ মুজিব কি এক? এক না বিরাট পার্থক্য সে আলোচনা তুলনামূলক বা বাঙালির স্বাধীনতার নেতৃত্বের জন্য অবশ্যই শেখ মুজিবের জীবনী বড় হতে পারে কিন্তু একেবারে দ্বিগুণ নয়। কারণ, এটি শিশুপাঠ্য, নির্দিষ্ট একটি ফরম্যাট তার মেনে চলা উচিত। কিন্তু এই আতিশয্যের কারণ, আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায়। এই আতিশয্য যে ভারসাম্য নষ্ট করে, ভাল বিষয়কে দৃষ্টিকটু করে তোলে দলবাজরা তা কখনও বোঝে না। ইতিহাস নিয়ে সমস্যাটা সেখানেই তৈরি হয়।

এবার দেখা যাক 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা পথিকৃৎ' অধ্যায়টি। ভূমিকাটি আগে দেখা যাক- "বাংলাদেশে অনেক মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শেরে বাংলা ... জিয়াউর রহমান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ছিলেন অসীম সাহসী। বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের জন্য ছিল তাঁদের অপরিসীম দরদ। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁরা স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ স্থাপন করেছেন।" শেষ লাইনটি দেখুন। তাঁরা স্বাধীনতার পথিকৃৎ কিন্তু তাঁদের অবদান স্কুল, মাদ্রাসা স্থাপন। এ দুটি বিষয়ে যে বিরাট পার্থক্য তা এদের নজরে পড়েনি? পড়েছে, কিন্তু মুশকিল হলো ৭১ পূর্ব রাজনীতি যদি হয় বাংলাদেশের পটভূমি তা হলে প্রথম চার জনের কোন না কোন অবদান পাওয়া যাবে। কিন্তু, জিয়াউর রহমান তো তখন একজন লেফটেন্যান্ট বা ক্যাপ্টেন, তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী। কারণ, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ইতিহাস তো মানুষ দমনের ইতিহাস। লালনের নয়। সুতরাং, উল্লেখ করতে হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা। কিন্তু, এটিও সঠিক নয়।

৩.

বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার ক্ষেত্রে খানিকটা যদি এই পাঁচজনের মধ্যে কারও অবদান থাকে, তাহলে তা ফজলুল হকের, অন্য কারও নয়। এভাবে, পুস্তকের রচয়িতা পাঁচ লেখক (দুজন আবার ডক্টরেট উপাধিধারী) ইতিহাস বিকৃত করলেন এবং সূক্ষ্মভাবে যা আপাতদৃষ্টিতে নজর এড়িয়ে যাবে।

এবার দেখা যাক কোন পথিকৃৎের পেছনে কত লাইন খরচ হয়েছে বর্তমান সংস্করণে-

একে ফজলুল হক ৩২ লাইন

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৩৯ লাইন

আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ৩৯ লাইন

শেখ মুজিবুর রহমান ৩১ লাইন

জিয়াউর রহমান ৪৪ লাইন

ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? স্বাধীনতা যুদ্ধের বা মুক্তিযুদ্ধের একজন কমান্ডার ৪৪ লাইন আর যাঁর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলো তাঁর জন্য ৩১ লাইন। বাকি তিনজনের

ক্ষেত্রে না হয় মেনে নিলাম ভারসাম্য আছে। মিথ্যাকে যে সত্য করার জন্য একটু ভারসাম্য রাখতে হয় তাও তাদের অজানা। এমনই মূর্খ এসব ব্যক্তি।

রণেশ দাশগুপ্তের রচনা বাদ গেছে তার কারণ তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। সেটি হলো বধ্যভূমি।

রণেশ দাশগুপ্তের মাল্যদানের বিষয়, অধ্যাপক কামাল ঝালকাঠিতে যাচ্ছেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, সেখানে এক এক বধ্যভূমিতে গিয়ে তিনি মাল্যদান করলেন। গল্পের প্রথমাংশ ও শেষাংশ থেকে উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যাবে কেন এই গল্পটি বাদ দেয়া হয়েছে।

'মাল্যদান'-এর শুরুটা এ রকম-

"একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের জয়ের পর ঘরে ফিরে এলো ঘরছাড়া মানুষ। দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল এক কোটি লোক। আর দেশের ভিতরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেরিয়েছিল আরও এক কোটি। এবার সবার নিজের নিজের ঘরে ফেরার পালা। যারা ঘরে ফিরে এলো তারা দেখল, যাদের রেখে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকে নেই।

হিংস্র পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও স্থানীয় আলবদর রাজাকাররা গ্রামের পর গ্রামে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাসমেত অসংখ্য মানুষকে জড়ো করে খুন করেছিল। প্রায় প্রত্যেকটা মহকুমায় কয়েকটা করে বধ্যভূমি তৈরি হয়েছিল।"

তারপর দেখি মুক্তিযোদ্ধা কামাল চলছেন ঝালকাঠিতে। বধ্যভূমির স্মৃতি বেদীতে দুটি মালা দিলেন। কিন্তু জোরাল হাওয়া মালা দুটিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একজন ছাত্র খুঁজে পেতে দুটি মাথার খুলি নিয়ে এলো মালা দুটি চাপা দেয়ার জন্য। আশ্চর্য হয়ে অধ্যাপক কামাল বললেন-

"আশ্চর্য! যাদের মালা দেয়া হচ্ছে তাদেরই হয়ে দুজন কি তোমার হাতে উঠে এসেছে। কিন্তু এদের নিশ্চয়ই নাম ছিল। কী নাম? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি খুলি দুটো তুলে চিৎকার করে উঠলেন, 'এদের একজনের নাম যেন পারুল' আরেকজনের নাম সিতারা। পারুল আর সিতারার জন্য রইল মালা।"

"তারপর অধ্যাপক কামাল ঐ দুটি মালার খুলি দিয়েই মালা দুটি চাপা দিলেন সেই স্মৃতিফলকের ওপর। মালা দুটিকে দেখে মনে হলো, মালা গলায় পারুল আর সিতারা বেদির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। অধ্যাপক চলে এলেন মিছিলের মাথায়। কাউকে আর কিছু খুলে বললেন না। বধ্যভূমিতে যাদের প্রাণনাশ করা হয়েছিল, তাদের নিকট আত্মীয়রা দ্বিধায় পড়লেন এই খুলি নিয়ে। তার চেয়ে বরং সকলের তরফ থেকে মালা দিয়ে তাঁদের স্মৃতিপটে বাঁচিয়ে রাখা যায়।"

আগেই উল্লেখ করেছি জামায়াত বাহিনী ছিল আলবদরের স্রষ্টা। তখন সেই বাহিনীর প্রধান নিজামী শিল্পমন্ত্রী ও কর্মকর্তা মুজাহিদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রীও

হয়েছিলেন এদেশে। সেই আলবদরদের হত্যাযজ্ঞ বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে। খালেদা-নিজামী সরকারের সেটি পছন্দ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকেই তো হানাদার বাহিনী ও আলবদররা পরিণত করেছিল বধ্যভূমিতে যার নিদর্শন সর্বত্র ছড়িয়ে। সেই নিদর্শন স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলতে হলে তো সব স্মৃতিসৌধ গুঁড়িয়ে দিতে হবে। রায়েরবাজার, মিরপুর, সাভার-এর সব স্মৃতিসৌধ মিশিয়ে ফেলতে হবে ধুলোয়। সেটি কি সম্ভব? যদি সম্ভব মনে হয়, করুন, আমরা তা দেখতে চাই।

সাহিদা বেগমের সাদামাটা বিবরণের শেষের দিকে চারটি লাইন উল্লেখযোগ্য। সেগুলো হলো-

"২৬ মার্চ অল্পক্ষণের জন্য চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হলো। ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান সেই বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। বিশ্ববাসী শুনল, বাঙালি স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। শত্রুর অস্ত্রের মোকাবেলা করতে সশস্ত্র যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া জাগাল সর্বত্র। শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ।"

পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিদা বেগম ফোনে আমাকে জানিয়েছেন ১৯৯৬ সালে যখন 'চারুপাঠ' প্রকাশিত হয় তখন তাঁর লেখায় ছিল-

"২৭ শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান সেই বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে দিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা।"

সপ্তম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য *সপ্তবর্ণা* আমি সংগ্রহ করতে পারিনি তবে জানি যে সেখানে 'জাতীয় চার নেতা' নামে একটি রচনা সংকলিত হয়েছিল। ৩রা নভেম্বর ঢাকা জেলে হত্যা করা হয় তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও এম কামারুজ্জামানকে। মুক্তিযুদ্ধের এই চার নেতাকে নিয়েই রচিত হয়েছিল রচনাটি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে এই চার নেতার অবদান মুছে দেয়ার জন্য ২০০১ সংস্করণে তা বাদ দেয়া হয়।

অষ্টম শ্রেণীতে পাঠ্য সাহিত্য কণিকা সাহিত্য কণিকায় পাঁচটি জীবনী সংকলিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না তবুও 'স্বাধীনতার পথে স্মরণীয় যাঁরা' শিরোনামে পাঁচজনের জীবনী সংকলিত হয়েছে। এই পাঁচটি জীবনীর তিনটি লিখেছেন ড. সাঈদ-উর রহমান। বাকি দু'টি কাজী সিরাজউদ্দীন। চতুর্থ শ্রেণীতেও স্বাধীনতার পথিকৃৎ হিসেবে এই পাঁচজনের জীবনী সংকলিত হয়েছে। সেখানে রচয়িতার নাম ছিল না। বর্তমান সংকলনের পাঁচটি রচনা দেখে মনে হচ্ছে ঐ পাঁচটির রচয়িতাও এই দুই জন। সুতরাং, এ বিষয়ে বিস্ত ারিত আলোচনার খুব একটা অবকাশ নেই। কিন্তু যেহেতু শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের জীবনী দু'টি বিস্তৃত সে কারণে এ দু'টি রচনার ওপর

গুরুত্ব আরোপ করে আলোচনা করব।
প্রথমেই দেখা যাক কার ওপর কত লাইন ব্যয়িত হয়েছে-
আবুল কাশেম ফজলুল হক ৫০
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৩৯
আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৬৮
শেখ মুজিবুর রহমান ১০৮
জিয়াউর রহমান ১৫০
পাকিস্তানেও রাজনীতিবিদদের সব সময় খাটো করা হয়েছে সামরিক কর্তাদের বিপরীতে। এখানেও তাই করা হয়েছিল সূক্ষ্মভাবে।

পাকিস্তান আমলে 'হিন্দুয়ানি দোষে' রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল যদিও রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন না। আসলে আক্রমণটা ছিল শুদ্ধ বাংলাভাষার ওপর। ঐ সময় পাঠ্যপুস্তকে কবি নজরুলের হিন্দু শব্দ 'মহাশ্মশান' বদলে মুসলমানি 'গোরস্থান' করা হয়েছে। এটি একটি মাত্র উদাহরণ দিলাম কলেবর না বাড়ানোর জন্য।

পাকিস্তানে উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক সাদত হোসেন মান্টোর প্রেমচান্দের গল্প পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণীতে মান্টোর গল্পে ব্যবহৃত শব্দাবলি বদলানো হয়েছে। অনুচ্ছেদ বাদ দেয়া হয়েছে। বিএনপি আমলেও একই কাজ করা হয়েছে। শুনলে হয়ত আশ্চর্য হবেন এ আমলেরও [এ বিষয়ে বিস্তারিত জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে] পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যবই মাদ্রাসার ছাত্রদের উপযোগী করতে গিয়ে 'হিন্দু' শব্দ বদল, লেখক বাদ দেয়া হয়েছে। লালন শাহ্ বাদ দেয়া আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। এমনকি যে সব ছবি ছাপা হয়েছে শিশুপাঠ্য বইয়ে সে সব ছবিকে বদল করা হয়েছে হাফপ্যান্ট ফ্রকের বদলে এসেছে পায়জামা আর হিজাব।

বর্তমানে মন্ত্রণালয় যে পাঠ্যক্রম তৈরি করেছে তাতে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত থাকছে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' যাতে এক চিলতে ইতিহাস আছে। এখানে অন্তর্ভুক্ত ৬টি বিষয়ে ইতিহাস ১টি তবে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা আছে ১০০ নম্বরের। ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে আবশ্যিক বিষয়ের অন্যতম ১০০ নম্বরের ধর্মও নৈতিক শিক্ষা, ১০০ নম্বরের শারিরিক শিক্ষা ১০০ নম্বরের তথ্য ও প্রযুক্তি শিক্ষা। ইতিহাস বাদ দিই, জাতীয় ইতিহাসও ও আবশ্যিক নয়। ৯ম ও ১০ শ্রেণীর তিনটি শাখা বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিজ্ঞান শাখার জন্য বাংলাদেশও বিশ্বপরিচয় আবশ্যিক বিষয় [এখানে জাতীয় ইতিহাসের কিছু হলেও আছে।] আশ্চর্য ব্যবসা শিক্ষার জন্য বিজ্ঞান পাঠ আবশ্যিক হলেও ইতিহাস নয়।

একাদশ ও দ্বাদশ পর্যায়ে ৬টি শাখার জন্য আবশ্যিক হলো বাংলা, ইংরেজী,

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। এ পর্যায়ে ৬টি শাখা- মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসা, ইসলাম শিক্ষা, গার্হস্থ্য ও সঙ্গীত। এখানেও জাতীয় ইতিহাস পড়ার বন্দোবস্ত নেই। এর অর্থ হচ্ছে, শিশু অবস্থা থেকে জোর দেয়া হচ্ছে নৈতিক ধর্ম শিক্ষা, ইসলাম শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাসের ওপর। আর আমাদের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতারা বারবার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হতে বলছেন। সবচেয়ে দুঃখজনক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধুর কথা বলেন। জঙ্গীবাদ মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়তে বলেন। তাঁর মন্ত্রীরা তাঁর দ্বিগুণ বলেন। আর কার্যত তাঁর প্রিয় মন্ত্রী ও সচিবরা আমাদেরকে ইসলামী জঙ্গীবোধে উদ্দীপ্ত করতে চান। আলিয়া মাদ্রাসার কারিকুলাম দেখুন। হিপোক্র্যাসি কাকে বলে।

সে জন্য বলেছিলাম আমাদের সবার হৃদয়ে এতটুকুন হলেও হেজাবিরা জায়গা করে নিয়েছে। হেজাবি আদর্শ হলো আগের ঔপনিবেশিক প্রভু পাকিস্তানের আদর্শের বিস্তৃতি। আর পাকিস্তানী আদর্শের কিছুটা পাওয়া ব্রিটিশ শাসন থেকে।

২২ মে, ২০১৪

মুক্তিযুদ্ধের আর কত অবমাননা

গতকাল নয়, গত এপ্রিল থেকেই শোনা যাচ্ছিল সর্বোচ্চ শাস্তি সাঈদী পাবেন না। রাষ্ট্রপক্ষ সর্বোচ্চ শাস্তি বহাল রাখার আবেদন জানিয়েছিল। আদালতে আমরা গেছি, সে কারণে আদালত সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু, আজ বিচারকদের এটি ভেবে দেখতে অনুরোধ করব, কেন জনমানসে এ ধারণা হয়েছিল যে, সর্বোচ্চ শাস্তি সাঈদীর ক্ষেত্রে বহাল থাকবে না। সবাই বলছিলেন, যে গুজব রটেছিল সরকার-জামায়াত আঁতাতের তা প্রমাণিত হলো। কিন্তু, সরকারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই, আমরা নীতিনির্ধারকও নই। সুতরাং এ কথা আমরা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব না। আমরা যদি এটি বিশ্বাস করি তা হলে সেটি আদালত অবমাননা হয়, কারণ, এর পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকে যে, রায় সরকারপ্রভাবিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না, সরকার রায় প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে; কারণ তা হলে বিভক্ত রায় হতো না।

সাঈদীর আমৃত্যু কারাদণ্ডের পক্ষে তিনজন ছিলেন। খালাসের পক্ষে একজন এবং সর্বোচ্চ শাস্তির পক্ষে একজন। মানুষ জনের ধারণা, প্রথম তিনজন মনে করেননি, মুক্তিযুদ্ধ এখনও প্রাসঙ্গিক। আইনের ব্যাখ্যা অনেক রকম হতে পারে; কিন্তু তা বাস্তব বদলাতে পারে না। প্রয়াত প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি গোলাম আযমের নাগরিকত্বের পক্ষে রায় কেন দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, টেকনিক্যাল কারণে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ১৯৪৭ সালের সময় এবং পরে যারা বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিলেন তারা যদি এখন ফিরে এসে নাগরিকত্ব চান তা হলেতো টেকনিক্যালি আপনি তা দিতে বাধ্য এবং তাদের সহায় সম্পত্তিও। তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, তা তো ভাবিনি। আমি বললাম, ১৯৭১ সাল আপনি দেখেননি? আরও বলেছিলাম, আপনি সজ্জন, বিদ্বান, আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু অন্তিমে আপনার পরিচয় দাঁড়াবে আপনি একজন যুদ্ধাপরাধীকে নাগরিকত্ব দিয়েছিলেন। টেকনিক্যালি তার সব অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। এটি আপনি কিভাবে পারলেন? তিনি আমাকে স্নেহ করতেন, তাই ক্ষুব্ধ হননি; কিন্তু কোন উত্তর দেননি। মনে হচ্ছিল তিনি চিন্তা করছেন।

এখন যদি বলি যাঁরা সর্বোচ্চ শাস্তির পক্ষে ছিলেন না, তাঁরা টেকনিক্যালি বাস্তবতা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা মনে করেন না ১৯৭১ সালে সাঈদী যথেষ্ট অপরাধ

করেছিল। বেচারা কাদের মোল্লা! একই ধরনের অপরাধে এই বিচারকরাই তাঁকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিয়েছিলেন। একটি প্রশ্ন জাগে, সমসাময়িক অবস্থা কি রায় প্রভাবিত করে? যিনি খালাস দিয়েছেন সাঈদীকে তিনি মুক্তিযুদ্ধে আদৌ বিশ্বাস করেন বলে কেউ মনে করে না। আর যিনি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, সবাই জানে, মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে থেকে তিনি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন। ছোট দেশ, সবাই সবাইকে চেনে, জানে এবং সবার পটভূমিও কমবেশি জানা। এ কারণে রটেছিল যে, সাঈদী সর্বোচ্চ শাস্তি পাবেন না। এবং তাই প্রমাণিত হলো। আরেকটি প্রশ্ন মনে জাগছে- তা'হলো, বাকি যুদ্ধাপরাধী যাদের ট্রাইব্যুনাল ইতোমধ্যে সর্বোচ্চ শাস্তি দিয়েছে তাদের সেই রায় বহাল থাকবে কিনা। কারণ, অপরাধের ধরন তো একই। আদালত একই অপরাধের কারণে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন রকম শাস্তি তো দিতে পারে না। বিচারকরা অবশ্যই বলতে পারেন, প্রসিকিউশনের কারণে এরকম হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আইনমন্ত্রীকে প্রসিকিউশন সম্পর্কে আবারও ভাবতে হবে। সেটি নির্ভর করবে সরকার কি চান তার ওপর। কিন্তু দায়দায়িত্ব আইনমন্ত্রীকেই নিতে হবে। প্রসিকিউশনের ক্ষেত্রে রাজনীতি ও রাজনৈতিক সুবিধা মাপকাঠি হতে পারে না।

ব্যক্তিগতভাবে একজন লেখক ও শিক্ষক হিসেবে চার দশকের একজন আন্দোলনকারী হিসেবে আমি এবং আমরা বলব, এই রায় আমাদের ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ও হতাশই শুধু করেনি, ক্রুদ্ধও করেছে। এই রায়ের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। এ ক্ষেত্রে আমাদের থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে সরকার। ১৯৭৫ সালের অভিঘাত সামলাতে আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লেগেছে দুই দশক। এই রায়ের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে। গোয়েন্দা রিপোর্ট যাই হোক, নীতিনির্ধারকদের অহংবোধে অস্বীকারের প্রবণতা সত্ত্বেও বলব, এই রায় সরকারের প্রতি মানুষের আস্থাও নড়বড়ে করে দিয়েছে। হেজাবিদের আলাদা আলাদা করে দেখার যে তত্ত্ব সরকার বিশ্বাস করে বলে সবার ধারণা, তা সাময়িক সুবিধা দিতে পারে, অন্তিমে নয়। সারদা কেলেঙ্কারি আবারও প্রমাণ করেছে জামায়াত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় বিশ্বাসী। সরকারের মতো স্বল্পমেয়াদী সুবিধায় নয়। এই অভিঘাত যে কতটা মারাত্মক হবে নীতিনির্ধারকদের তা অনুধাবন করতে হয়ত খানিকটা সময় লাগবে। সরকারে যাঁরা আছেন তাঁরা যদি একটিবার ভাবেন, আওয়ামী লীগের কর্মীরাই শুধু ভোটার নয়, ভোটার হিসেবে তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ, তা হলেই যথেষ্ট।

আমরা সান্ত্বনা পেতে পারি এই ভেবে যে, সাঈদীকে যে খালাস দেয়া হয়নি, এটিই ভাগ্য। খালাস পেলে কি করতেন? সবশেষে বলব, মুক্তিযুদ্ধকে এত অবমাননা করার কি দরকার? এই রায়ের মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হলো, ইতোমধ্যে এ কে খন্দকারের বই যা প্রমাণ করেছে তা হলো–বঙ্গবন্ধু এক অনিচ্ছুক জাতিকে স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছিলেন।

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

চল্লিশ বছর এই দিনটির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম

আমি আর শাহরিয়ার কবির দাঁড়িয়েছিলাম, আদালতের সিঁড়িতে। গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানোর জন্য ভ্যানে তোলা হলো, ভ্যানের পেছনের দরজা খোলা, সেখানে একজনের বসার জায়গা। গোলাম আযমের পুত্র বসে। তারপর বন্ধ কপাট। ভেতরে শিক ধরে গোলাম আযম দাঁড়িয়ে। ঠিক এক দশক আগে, গোলাম আযমের দল জামায়াত ও তাদের বি টিম খালেদা জিয়ার বিএনপি আমাকে এবং শাহরিয়ারকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে এ রকমই একটি প্রিজন ভ্যানে করে আদালত থেকে জেলে পাঠিয়েছিল। পার্থক্য একটাই, আমাদের বিরুদ্ধে ছিল মিথ্যা মামলা। গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই বানোয়াট নয়। ভ্যান মিলিয়ে যায়, শাহরিয়ার বলে তোমার মনে আছে ১৯৭২ সালে মার্চ মাসে গোলাম আযমের বিচারের জন্য আমরা শহীদ মিনারে সভা করে রাস্তায় নেমেছিলাম। চল্লিশ বছর! চল্লিশ বছর অপেক্ষা করেছি আমি এবং আমার জেনারেশন এই দিনটির জন্য। তাই বোধহয় আদি আন্দোলনকারীদের মধ্যে আমরা দু'জনই দাঁড়িয়েছিলাম সিঁড়িতে।

এর আগে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম মানববন্ধনে। আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, গোলাম আযমকে গ্রেফতার করা হবে কীনা তা নিয়ে। যে মুহূর্তে শোনা গেল, গ্রেফতারের আদেশ হয়েছে ৩০-এর কোঠায় সব সাংবাদিক চাপা উল্লাসে ছোটাছুটি করতে লাগল। তদন্ত টিমের কিছু সদস্য, আইনজীবী, নিরাপত্তা প্রহরী সবার মুখে হাসি। জামায়াত সমর্থক কিছু আইনজীবী বিষ দৃষ্টিতে তাকালেন আমাদের দিকে। আমাদের পরের জেনারেশনও দু'যুগ ধরে অপেক্ষা করছিল এ দিনটির জন্য।

রাস্তায় শহীদ জায়া, শহীদদের সন্তান, আত্মীয়রা। সবার মনে আশঙ্কা শীর্ষ রাজাকার, গণহত্যার শীর্ষ পরিকল্পনাকারী, শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম গ্রেফতার হবে তো? কেননা সরকার তার প্রতি নমনীয়। শোনা গেছে, জামায়াত টাকা ছড়াচ্ছে। কে কোথায় টাকা খেয়ে বসে আছে কে জানে? কয়েকদিন আগে হঠাৎ গোলাম আযমের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এককভাবে যুদ্ধাপরাধকে চ্যালেঞ্জ করে বক্তব্য দেয়া। না, এবার গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়ল। সবার মুখে হাসি। তারাও অপেক্ষা করছে কয়েক যুগ। মানবতাবিরোধী ট্রাইব্যুনালের প্রতি যেন আস্থা ফিরে পেল সবাই। সরকারের প্রতিও। গোলাম আযম গ্রেফতার না হলে সরকার, ট্রাইব্যুনাল সবাই প্রশ্নবিদ্ধ হতো। কেননা, মনে হতো জাতিকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আমরা খানিকটা স্বস্তি পেয়েছি। শীর্ষ অপরাধী গোলাম আযম বাইরে থাকবে

আর মানবতাবিরোধী বিচার চলবে— পুরো ব্যাপারটা ছিল অবাস্তব। গোলাম আযম বাইরে থাকলে, জামায়াত বিএনপি ষড়যন্ত্র আরও ব্যাপকতা পেত, সাক্ষীদের হুমকি দেয়া হতো, আন্দোলনকারীদেরও। ইতোমধ্যে সে সব আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

যুদ্ধাপরাধের বিচার হবে জামায়াত নেতৃবৃন্দ তা আশা করেনি। আওয়ামী লীগ বিএনপি / জামায়াত সমব্যথী নেই কে বলবে? 'আমার দেশ' একটি সংবাদ ছেপেছে। সরকারী দলের এমপি, এমএ আউয়াল সাক্ষী দিয়ে সাঈদীকে তাজিমের সঙ্গে সালাম দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। 'আমার দেশ' নিয়ত সত্য খবর ছাপে এমন কথা কেউ বলবে না। কিন্তু যদি ঘটনাটি সত্যি হয়। যা হোক, শেখ হাসিনার কারণেই যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু হলো। এটি তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের একটি মাইলফলক।

ট্রাইব্যুনাল হওয়ার পরও জামায়াত আশা করেনি, তাদের দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ যারা শীর্ষ রাজাকার তাদের গ্রেফতার করা হবে। করা হলো। তখনই জামায়াত দেশব্যাপী বটেই বিশ্বব্যাপী প্রচারণা শুরু করল বিচারের বিরুদ্ধে। তাতে যোগ দিল বিএনপি। এখন খালেদা জিয়া ১৯৭১ সালের খুনীদের সবচেয়ে বড় সমর্থক। খালেদা, জামায়াত নেতৃবৃন্দ, গোলাম আযম, ড. কামাল হোসেন এরা যা বলেছেন, তার সারমর্ম হলো এটি কি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা? বিচার কি সুষ্ঠু হচ্ছে? আন্তর্জাতিক মানদণ্ড কি মানা হচ্ছে? ট্রানজিশনাল, হাইব্রিড কোর্ট কি হবে? ট্রুথ কমিশন কি করা যায় না? সামগ্রিকভাবে এসবই যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে চলে যায়। দৃঢ়কণ্ঠ বলা উচিত, এ আইন ১৯৭২ সালের, সংবিধানে যুক্ত যা নিয়ে ৪০ বছর কেউ কোন প্রশ্ন তোলেনি। নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের মতামত নিয়ে এই আইন করা হয়েছে। আমরা আমাদের আইন অনুযায়ী কাজ করছি। সেটা স্বচ্ছ কিনা, ঠিক হলো কিনা সেটা আমাদের ব্যাপার। ১৯৭১ সালে গোলাম আযমরা যখন ৩০ লাখ খুন করে ৬ লাখ ধর্ষণ করে তখন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, স্বচ্ছতার বিবেচনা করা হয়েছিল? আন্তর্জাতিক জুরিস্ট সংস্থা, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বা আমেরিকা কি বলেছিল খুনীদের বিচার হোক? সাদা চামড়ার কেউ কিছু বললে আমরা এত উদ্বেলিত হই কেন? এ ধরনের ভৃত্যসুলভ মনোভাব কেন আমাদের? যারা শহীদ হলেন, ধর্ষিত হলেন তাদের মানবাধিকার নেই, মানবাধিকার থাকবে খুনীদের। এসব প্রশ্ন যারা তোলে তারা সুস্থ মানুষ নন, কোন না কোন মতলব তাদের মধ্যে কাজ করছে।

জামায়াত এক বিশাল ফান্ড তৈরি করেছে বলে শুনেছি। এই টাকা খরচ করে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ভাড়াটে যোগাড় করা হচ্ছে এবং ঐ লাইনেই তাদের প্রচার চলছে। এর সর্বশেষ উদাহরণ 'সেভ গোলাম আযম' ক্যাম্পেন। এটি পরিচালনা করছে গোলাম আযমের পুত্র নুমান আযমী। মালয়েশিয়ার পিআরসি টিভি চ্যানেলে

এটি প্রচারিত হয়েছে। এর মালিক ইসলামিক পার্টি অব মালয়েশিয়া বা পিএএস। ৭ মিনিটের ক্লিপে নুমান যা মিথ্যাচার করেছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। জামায়াতী হলেই মিথ্যাচার করতে হয়। তার মিথ্যাচারের কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। ইংরেজি এই ভাষ্য অনুবাদ করেছেন অমি রহমান পিয়াল- "২০০৯ সালে বিতর্কিত এক নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকেই আওয়ামী লীগ নামের সেকুলারিস্ট এবং ইসলামবিরোধী একটি দল রাজনৈতিক নিপীড়ন চালাচ্ছে তার প্রতিপক্ষ দলগুলোর নেতাকর্মীদের ওপর। এই রাজনৈতিক ক্যাডাররা হত্যাসহ নানারকম অপকর্ম করেই যাচ্ছে।

সম্প্রতি তারা তথাকথিত আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালত খুলেছে যার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আন্তর্জাতিক বার এ্যাসোসিয়েশন, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং বেশ ক'জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী। তাঁরা এ সমালোচনা করে বলেছেন এ আদালতে অভিযুক্তের ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ নেই বরং সরকার যা চাইবে তাই হবে। তার ওপর এখন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর নেতাদের যুদ্ধাপরাধী বলে সম্বোধন করছে সরকার এবং শীর্ষ নেতৃত্বের প্রায় সবাইকে গ্রেফতার করেছে যার মধ্যে দলটির সভাপতি এবং দু'জন সহসভাপতিও রয়েছেন। সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী প্রকাশ্যেই দাবি তুলেছেন এসব নেতাকে কোন বিচার ছাড়াই ফাঁসিতে ঝোলানোর।

এই সাজানো আদালতের প্রধান বিচারপতি যিনি, তিনি একটি অবৈধ গণআদালতের প্রধান হিসেবে এই অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এখন তিনিই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান। আর আদালতের বাকি বিচারকরা হয় সরকারী দলের সদস্য নয়ত সমর্থক। অভিযুক্তদের কোন মৌলিক অধিকারই নেই যা কিনা দেশের অপরাধীরাও পেয়ে থাকে। এসবের মূল কারণ হচ্ছে সরকার মনে করে ইসলামপন্থীরা তাদের জন্য হুমকি, কারণ ওদের কারণেই বিরোধীদলীয় জোট শক্তিশালী হয়।"

মালয়েশিয়ার মুসলমানদের কাছে নুমান আর্জি জানিয়ে বলেছেন, "বাংলাদেশের মুসলমানদের রক্ষা করতে। কারণ এটি তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ।"

আমাদের ১৩ কোটি লোকেরও বেশি মুসলমান, দেশের মানুষ ইসলাম ভালবাসে। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই শাস্তি পেতে হয় বলে দেশের মানুষ ভয়ে কুঁকড়ে আছে। গোটা বিচার ব্যবস্থাই সরকারী প্রভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। পুলিশ বাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা সরকারের গুণ্ডা এবং পেশীশক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মোটের ওপর একটা আতঙ্কের জোয়ার বইছে। শত শত মানুষকে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করা হচ্ছে। আমরা এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাইছি, এই মানবাধিকার বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে

সচেতন করতে চাইছি। কারণ জনগণের বাকস্বাধীনতা বলে কিছু নেই, কোন মৌলিক অধিকার নেই। সরকারবিরোধী কিছু বললেই গ্রেফতার হতে হবে। কিছুদিন আগে একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক সরকারের সমালোচনা করে উপসম্পাদকীয় লেখার অপরাধে গ্রেফতার করে নির্মম নির্যাতন করা হয়। এই হচ্ছে আমাদের দেশের পরিস্থিতি। তাই আমরা আপনাদের সাহায্য চাইছি যাতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়, যাতে এই সহিংসতা, এই আতঙ্কজনক পরিস্থিতি বন্ধ হয় এবং ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।”

এই বিচার স্বচ্ছ, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে হতে হবে বলে নুমান জানিয়েছেন। শুধু তাই নয় ১৯৯৩ সালে হাইকোর্ট গোলাম আযমকে সব ধরনের অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে।

এই ধরনের অপপ্রচারের মূল ঘাঁটি লন্ডন। আমি আমাদের কয়েকজন রাষ্ট্রদূতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই অপপ্রচার রোধে আপনারা কী করছেন। তারা কোন জবাব দিতে পারেননি। কারণ, তাদের কাছে এ সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই। ইউরোপীয় ইউনিয়নে একটি শুনানি হবে। সরকারের কোন মাথা ব্যথা নেই। আমরা অনেকবার বলেছি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা অন্য যে-কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সেল করা হোক এসব প্রপাগান্ডা প্রতিরোধে। কয়েকদিন আগে জেনেভা থেকেও কিছু জানতে চেয়ে পাঠানো হয়েছিল চিঠি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেটি পাঠায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, স্বরাষ্ট্র পাঠায় আইজির দফতরে, আইজি দু'জন কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে ভার দেন উত্তর দেয়ার। পুরো বিষয়টিকে কেন যেন ছেলেখেলা মনে করছে সরকার।

আজ আমাদের শুনে খুব ভাল লেগেছে যে, প্রসিকিউশন সুষ্ঠুভাবে তাদের মামলা পেশ করেছে। আমরা চাই এ ধারা অব্যাহত থাকুক। প্রসিকিউশনে থাকাটা চাকরি নয়। কমিটমেন্টের ব্যাপার। তাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভৌত কাঠামোর আরও উন্নয়ন দরকার।

প্রসিকিউশনের একটি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে ফৌজদারি মামলার দিকে। কারণ, অধিকাংশেই ফৌজদারি মামলা বিশেষজ্ঞ। সেই বৃত্তে তারা আটকে আছেন। তাদের এই ঝোঁকে প্রতিপক্ষ খুবই খুশি। এককেটি মামলায় ৫০/৬০ জন সাক্ষী হাজির করা, তাদের জেরা করলে মামলা শেষ হতে বছরদশেক লাগবে। এর মধ্যে বিএনপি জামায়াত তো ক্ষমতায় আসবে। তখন কীসের মামলা! কীসের যুদ্ধাপরাধ! নুরেমবার্গে ২১ জনের বিচারে ১০ মাস লেগেছিল। প্রসিকিউশনের এ কথাটা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়। আর বাঞ্ছনীয় নয় না বুঝে মন্ত্রীদের যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে বাচাল সব কথাবার্তা বলা। এটি বিচার কাজ ব্যাহত করছে। যারা এ ধরনের কথা বলবেন, ধরে নিতে হবে তারা বিচার দীর্ঘায়িত করতে চাইছেন। জামায়াত তো

টাকা বিলোচ্ছে বলে শুনেছি যেটি আগেই বলেছি। টাকা কাদের দেয়া হবে? যারা বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করতে চায় তাদেরই।

গোলাম আযমের গ্রেফতারে আনন্দিত কিন্তু শঙ্কামুক্ত নই। এই বিচার যদি সুষ্ঠুভাবে ২০১৩ সালের মধ্যে শেষ না করা যায় তাহলে তার দায়দায়িত্ব বর্তাবে আইন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রসিকিউশন এবং সামগ্রিকভাবে সরকারের ওপর। বিচার শেষ না হলে কী হবে তা চিন্তাও করা যায় না। আমরা জানি নীতি নির্ধারক ও উল্লিখিতদের পকেটে টাকা আছে, দোরগোড়ায় পাজেরো আছে। বিচার শেষ হবে না, আমরা বিপদে পড়ব আর তারা পাজেরোতে হাওয়া হয়ে যাবেন আর আমরা আঙ্গুল চুষব তা ভুলে যান। আগুন নিয়ে খেলবেন না। হাত পুড়বে।

১২ জানুয়ারি, ২০১২

বন্যেরা বনে সুন্দর রাজাকার পাকিস্তানে

আমাদের সবার প্রিয় গুণদা, কবি নির্মলেন্দু গুণ রাতে আমাকে ফোন করলেন। টেলিভিশনে সংবাদ দেখে তাঁর কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছে। যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়ে শাহরিয়ারের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। স্বভাবসুলভ রসিকতাও করলেন। বললেন, আচ্ছা মুনতাসীর, যে সব পত্রিকার সম্পাদকরা এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাকৃত বুদ্ধিজীবীরা এবং রাত মাতানো বক্তারা (টক শো) গোলাম আযমদের স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টির জন্য লেখালেখি করছিল বলছিল তাদের কী হবে? তাদের মন তো খুব খারাপ।

সকালে উঠে বিভিন্ন পত্রিকা দেখে গুণদার কথাটা আবার মনে হলো। গোলাম আযমের কারণে যে অনেকের মন খারাপ হয়েছে তা পত্রিকার শিরোনামগুলো দেখেই বোঝা গেল। আসলে, এই দেশটা অভিশপ্ত। না হলে, গোলাম আযমদের পক্ষে সুক্ষ্মভাবে-স্থূলভাবে সাফাই গায় কীভাবে এসব লোক। ১২ তারিখের পত্রিকাগুলো দেখুন। হ্যাঁ, গোলাম আযমের গ্রেফতারের খবর আছে শিরোনামে কিন্তু বেগম জিয়ার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিও আছে সঙ্গে। অর্থাৎ খালেদা জিয়ার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারটাও গোলাম আযমের গ্রেফতারের মতো বড় খবর। একমাত্র ব্যতিক্রম 'ডেইলি স্টার' ও 'জনকণ্ঠ'। অধ্যাপক আবদুল মান্নান ফোন করে জানালেন, জনপ্রিয় এক চ্যানেলের গতরাতের আলাপচারিতার বিষয় ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার। নিরপেক্ষ নামধারী বদমাশ 'বুদ্ধিজীবী' ও (সংক্ষেপে এদেরকে 'বি.বি.'ও বলা হয়) আছে কিছু। এরা বিএনপি থেকেও ডেঞ্জারাস। বিএনপি পরিষ্কার জানিয়েছে তারা খুনীদের পক্ষে। এতে তারা লাজলজ্জা বোধ করেনি। কিন্তু এইসব নিরপেক্ষরা বলে, ৪০ বছর পর সাক্ষী সাবুদ পাওয়া যাবে কি না, আদালত চৌকো হওয়া ভালো না গোল হওয়া ভালো, পাকিস্তানিদের বিচার হলো না, গোলাম আযমদের কেন হবে ইত্যাদি। আমরা নানা আত্মীয়তা, বন্ধুতার, ভদ্রতার সূত্রে এদের সঙ্গে বাঁধা। ফলে, সমাজে তারা কল্কে পেয়ে গেছে। ঐ ক্রিমিনালরা কিন্তু প্রগতির পক্ষের মানুষজনকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেবে না। এ বিষয়গুলোর বলার সময় এসেছে। আমার বন্ধু সৈয়দ ইকবাল বলছিলেন, বিএনপির এক নেতা (প্রবাসে থাকার কারণে নাম বলতে পারেনি) বলেছিল, ক্ষমতায় গেলে ৩২নং গুড়িয়ে দেবে। এই কথা আলোচনা করছিলেন তিনি এক বন্ধুর সঙ্গে গাড়িতে যেতে যেতে। হঠাৎ ড্রাইভার বলল, ঠিকই বলেছেন নেতা।

শেখের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিতে হবে। ইকবাল বিস্মিত হয়ে বললেন, এটা কেমন কথা। ড্রাইভার বলল, আমি দল করি স্যার। বিএনপি-জামায়াত যারা করে তারা এ ধরনের মানুষ। সকালের পত্রিকায় দেখেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, সাঈদী যুদ্ধাপরাধী নয়। আমি খুব অবাক হয়েছি। আসিফ নজরুল বিএনপি করেন জানি। কিন্তু গণতদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। সেখানে সাঈদীর বিবরণও দেখেছেন তিনি। এ কথা কীভাবে তিনি বলেন? তাকে তো আমি রিজনবল মানুষ হিসেবেই জানতাম তখন মনে হলো, না ঠিকই আছে। আসিফ কেন ছাড় দেবে। জিয়াউর রহমান কী কোন ছাড় দিয়েছিলেন? খালেদা জিয়া? খুনীদের তারা হেফাজত করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খবরে পড়লাম, আসিফের অফিস কক্ষে আগুন দেয়া হয়েছে। এটি সমর্থনযোগ্য নয়, বরং নিন্দাযোগ্য। তার নিজস্ব মত থাকবে, সেটি প্রচারেরও সুযোগ থাকবে সেটি পছন্দ হোক বা না হোক। কিন্তু এর অন্য একটি দিক আছে। গোলাম আযম, সাঈদীরা গণহত্যাকারী। মানুষের এক নীরব কিন্তু বিশাল ক্রোধ আছে তাদের প্রতি, যা যুক্তির ধার ধারে না। ১৯৬৯ সালে মর্নিং নিউজ পুড়িয়ে দেয়া যেমন বা আগরতলা মামলার বিচারকের বাড়ি আক্রমণ করা। খুনীদের সমর্থক হলেও বিএনপি তা বোঝে যে কারণে, গোলাম আযম সম্পর্কে দলগতভাবে তারা কোন মন্তব্য করেনি।

এই যে নিরপেক্ষ বদমাশরা, বিএনপির বুদ্ধিজীবীরা, বিএনপির মালিকানাধীন মিডিয়াসমূহ গোলাম আযমদের স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চায় তার কারণ কী? এর প্রধান কারণ, এদের পূর্বসুরি বা পিতা/দাদারা একনিষ্ঠ মুসলিম লীগার, ডানপন্থী, জামায়াত বা জিয়ার আমলে প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম লীগ বা ডানপন্থী দল অনেকে করতে পারে কিন্তু গণহত্যা সমর্থন বা নারী ধর্ষণ সমর্থন করে কীভাবে? পাকিস্তানের প্রতি তাদের একটা ভালোবাসা আছে যা তাদের হৃদয়ে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত। আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের ঘৃণা প্রবল। কারণ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলেন। এরা মর্ষকামী। যেমন আমাদের এখানে ধরা যাক অধস্তনদের সঙ্গে যদি ভালো ব্যবহার করেন তা হলে বলবে স্যারের পার্সোনালিটি নেই। যদি বলেন, 'এই শুওর কা বাচ্চা, লেট কিউ কিয়া'। তাহলে সে সগর্বে জানাবে, আমার স্যারের পার্সোনালিটি আছে। তো পাকিস্তানিদের বুটের লাথিকে এই সব রাজনৈতিক দলের সমর্থক ও বুদ্ধিজীবীরা এখনও মনে করে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। এ ক্যাটাগরির মহিলারা পাকিস্তানিদের মধ্যে শৌর্যবীর্য খুঁজে পায় এবং পাকিস্তানিরা যে চার লাখ ধর্ষণ করেছিল এটি তারা বীরত্বের কাজ মনে করে। না হলে স্টেডিয়ামে পাকিস্তানি আফ্রিদিকে দেখলে বাঙালি তরুণী কেন পোস্টারে লেখে যে, সে তাকে বিয়ে করতে চায়। খোঁজ নিয়ে দেখবেন তার পরিবার বিএনপি বা জামায়াতভক্ত। গোলাম আযম গ্রেফতার পরবর্তী সিনড্রোম দেখে এ কথাগুলো

অতীব দুঃখের সঙ্গে লিখতে হলো। অনেকে দুঃখ পেয়েছেন, বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে নিয়ে টানাহেঁচড়া! এরা ভুলে যান গোলাম আযম কীভাবে বৃদ্ধদের খুনেরও পরিকল্পনা করেছিল। পাকিস্তান-বাংলাদেশে অনেক রাজনৈতিক নেতা জন্মেছেন কিন্তু গোলাম আযমের মতো মিথ্যাবাদী নিষ্ঠুর ঠাণ্ডা মাথার মানুষ খুব কমই জন্মেছেন। তার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় আরেকজন বাঙালি জিয়াউর রহমান। ১৯৭১-এর পর পালিয়ে গিয়ে গোলাম আযম 'পূর্ব পাকিস্তান উদ্ধার আন্দোলন' করেছেন, জিয়াউর রহমান তাঁকে ফিরিয়ে আনার পরও বাংলাদেশ বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন, গ্রেফতারের আগেও সদম্ভে বলেছেন তিনি যুদ্ধাপরাধী নন।

মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচারে প্রসিকিউশন গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ৬২টি অভিযোগ দায়ের করেছে। আদালত তার মধ্যে কয়টি আমলে নেবে তা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু গোলাম আযমের অপরাধ প্রমাণের জন্য ৫০/৬০ জন সাক্ষী হাজিরের প্রয়োজন নেই। 'ডকট্রিন অব কমান্ড রেসপনসিবিলিটি' অনুযায়ী খালি পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথিপত্র হাজিরই যথেষ্ট। এ তত্ত্ব অনুযায়ীই গোয়েবলস বা হিটলারের বিচার হয়েছিল। অজস্র সাক্ষী এনে কালক্ষেপণের কোন প্রয়োজন নেই।

গোলাম আযম কী করেছিল ১৯৭১ সালে তা অনেক পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে, হবে। কিন্তু, নতুন প্রজন্মের জ্ঞাতার্থে এবং আমাদের জেনারেশনেরও যাঁরা ভুলে গেছেন তাঁদের মনে করিয়ে দেয়ার জন্য বারবার এগুলো উল্লেখের প্রয়োজন আছে। তদন্ত কমিটি অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করেছে। তার মধ্যে একটি হলো— "সিরু দারোগাসহ ৩৮ জনকে হত্যার নির্দেশ : একাত্তরের ২১ নভেম্বর গভীর রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারাগারের ৩৮ জনকে শহরের পৈরতলা রেল ব্রিজের কাছে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। তথ্য-প্রমাণ তুলে প্রতিবেদনে বলা হয়, গোলাম আযমের লিখিত নির্দেশে একাত্তরে কুমিল্লার হোমনা থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা সিরু মিয়া দারোগা ও তার কিশোর ছেলে আনোয়ার কামালকে হত্যা করা হয়। ঘটনার বর্ণনায় বলা হয়েছে, সিরু দারোগা শুরু থেকেই যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। একাত্তরের ২৭ অক্টোবর সিরু দারোগা এবং তাঁর ছেলে আনোয়ার ট্রেনিং ক্যাম্পে যাওয়ার সময় অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েন। ২৯ অক্টোবর সিরু দারোগার স্ত্রী আনোয়ারা বেগম তাঁর চাচাশ্বশুর আবদুল মজিদ মিয়ার কাছ থেকে খবরটি জানতে পারেন এবং তিনি ঢাকায় আত্মীয় মহসীনের কাছে যান। কারণ খিলগাঁও গবর্নমেন্ট হাইস্কুলের শিক্ষক মহসীন প্রাইভেট পড়াতেন গোলাম আযমের দুই ছেলেকে। পরে মহসীনের মাধ্যমেই গোলাম আযমকে ধরেন আনোয়ারা। সব শুনে গোলাম আযম একটি চিঠি লিখে

তা খামে বন্ধ করে বলেন, 'কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট রাজাকার কমান্ডারকে এ চিঠি দিলে সিরু মিয়াদের ছেড়ে দেয়া হবে।' পরে ওই চিঠি তার ভাই ফজলু ১ নভেম্বর কুমিল্লার স্থানীয় রাজাকার কমান্ডারকে দিলে তিনি চিঠি পড়ে বলেন, 'ঈদের পরদিন ২৪ নভেম্বর কামালকে ছেড়ে দেয়া হবে। আর সিরু মিয়াকে পুলিশে যোগদানের জন্য পাঠানো হবে।' অথচ ২১ তারিখ সন্ধ্যায় তিতাসের পাড়ে সিরু মিয়া ও তার ছেলে কামালসহ ৩৮ মুক্তিযোদ্ধাকে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে মারা হয়। তবে এ বিষয়টি জানতেন না ফজলু। ঈদের পরদিন ফজলু জেলখানায় গেলে সেখানে সিরু মিয়া ও কামালের জামা-কাপড় তাঁর হাতে তুলে দিয়ে সিরু মিয়াসহ অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার কথা জানানো হয় এবং বলা হয়, ঠিক এ নির্দেশই ছিল গোলাম আযমের লেখা চিঠিতে।" *[সমকাল ১২.১.১২]*

একমাত্র শান্তি কমিটির নেতা হিসেবেই গোলাম আযম যা করেছেন তার আলোকেই কমান্ড রেসপনসিবিলিটি তত্ত্ব অনুযায়ী সংক্ষেপে তাঁর বিচার করা যায়। সিরু দারোগা বা নবীনগর গণহত্যার সাক্ষ্য প্রমাণ খোঁজার দরকার পড়ে না [তবে, এগুলোর গুরুত্ব অস্বীকার্য নয়। গোলাম আযম যে কী জিনিস তা প্রমাণে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ]।

শান্তি কমিটির নেতা গোলাম আযম সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি না এর কারণ, গত দুই দশকে তার অপকীর্তি নিয়ে বেশ কিছু বই বেরিয়েছে। দৈনিক সংগ্রামের সংবাদ সঙ্কলন হয়েছে কয়েকটি। এসব বই ও সংবাদপত্রের সঙ্কলিত খবরে গোলাম আযম নয়টি মাস কী করেছেন তার প্রতিদিনের বিবরণ দেয়া আছে। এখানে উল্লেখ্য, কয়েক খণ্ডে গোলাম আযম তার আত্মজীবনী লিখেছেন [জীবনে যা দেখলাম] সেখানে অনেক কিছুর খুঁটিনাটি বিবরণ আছে কিন্তু ১৯৭১ সালে তিনি কী করেছেন তার কোন উল্লেখ নেই।

গোলাম আযম সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামের প্রধান ছিলেন। শান্তি কমিটির নেতা ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনিই তখন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতায় অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস প্রায় প্রতিদিন তিনি মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামী লীগ, ভারতবিরোধী বক্তব্য রেখেছেন। শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস গঠনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছেন এবং গণহত্যায় তিনি প্রণোদনা যুগিয়েছেন। বস্তুত গণহত্যাকারীদের তালিকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরই গোলাম আযমের নাম আসবে।

এখানে গণহত্যার প্ররোচনা দিয়েছিলেন তিনি কীভাবে শুধু তার কয়েকটি উদাহরণ দেব। সেই ৮ এপ্রিল এক যুক্ত বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন "ভারত পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। ভারতীয় বা পাকিস্তান বিরোধী এজেন্ট বা অনুপ্রবেশকারীদের যেখানেই দেখা যাবে, সেখানেই পূর্ব পাকিস্তানের

দেশপ্রেমিকরা তাদের নির্মূল করবে।"

১৮ জুন লাহোরে তিনি বলেন, "দুষ্কৃতকারীরা এখনও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে। ত্রাস সৃষ্টি এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতি অব্যাহত রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। দুষ্কৃতকারীরা নকশালপন্থী ও বামপন্থী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে"।

লাহোরে তিনি আরও কিছু বক্তব্য দেন যেসব বক্তব্যে গণহত্যায় প্ররোচনার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১. "জনগণ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা দানে ইচ্ছুক। কিন্তু জীবননাশের জন্য দুষ্কৃতকারীরা হুমকি দেয়ায় তারা এ ব্যাপারে পূর্ণ সাহায্য দান করতে পারছে না। প্রকৃত অপরাধীকে ধরতে পারলেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ করায়ত্ত করা সম্ভব হতো।"
২. "দুষ্কৃতকারীরা এখনও পূর্ব পাকিস্তানে তৎপর রয়েছে এবং তাদের মোকাবেলা করার জন্য জণগণকে অস্ত্র দেয়া উচিত।"
৩. "দেশকে খণ্ড বিখণ্ডিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না।" কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গোলযোগ ১৮৫৭ সালে বাংলায় বিদ্রোহী আন্দোলনের চেয়ে দশগুণ বেশি শক্তিশালী ছিল।"

১৪ আগস্ট রাখঢাক না রেখে তিনি ঘোষণা করেন "... সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে কিন্তু শহীদী মৃত্যু মুসলমানদের নিকট শ্রেষ্ঠ। তিনি পাকিস্তানের দুশমনদের মহল্লায় মহল্লায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করার জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান। অধ্যাপক গোলাম আযম আরও বলেন, পাকিস্তান টিকে থাকলে আজ হোক কাল হোক বাঙালি মুসলমানরা তাদের অধিকার আদায় করতে পারবেই। কিন্তু আল্লাহ না করুন যদি পাকিস্তান না থাকে তাহলে বাঙালি মুসলমানদের মৃত্যুবরণ করতে হবে। অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর। কিন্তু দেশের মানুষের মন জয় করার ক্ষমতা সেনাবাহিনীর নেই। শান্তি কমিটির দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে জনাব আযম বলেন যে, শান্তি কমিটি গঠন করে দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা এগিয়ে আসার ফলেই যে ভারত তথাকথিত বাংলাদেশ কায়েম করেছে সে ভারত এখনও তাকে স্বীকৃতি দিতে সাহস পায়নি। পরিশেষে জনাব আযম বলেন, শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শক্রমে সরকারকে দেশের উন্নতি ও সংহতির খাতিরে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।"

তিনি আরও প্রশ্ন রেখেছিলেন, "পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চের পর যে ব্যবস্থা নিয়েছে সেটি আগে নেয়নি কেন। এখন অক্টোবরের শেষে বন্যার পানি চলে যাবার পর পরই গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে দুষ্কৃতকারীদের দমন করার কাজ শুরু

হবে। তাদের পরিপূর্ণভাবে নির্মূল করার পরই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। দুষ্কৃতকারী সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না হলে নির্বাচন অনুষ্ঠান অসুবিধা বৈকি। কারণ, দুষ্কৃতকারীদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না করা পর্যন্ত জনগণ নিরাপদ বোধ করবে না এবং প্রার্থীদেরও নিরাপত্তা সম্ভব নয়।"

তিনি তাঁর কর্মী ও অনুসারীদের বারবার বুঝিয়েছেন দুষ্কৃতকারী অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করতে হবে। এবং এ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী তাদের সব সময় সমর্থন করবে। তিনি বলেন, "বাইরের শত্রুর চেয়ে ঘরের শত্রু বেশি ক্ষতিকর। আমাদের ঘরেই এখন অসংখ্য শত্রু তৈরি হয়েছে। এই শত্রু সৃষ্টির কারণ যাই হোক সে দিকে এখন নজর দেয়ার সুযোগ নেই। এখন ঘরে আগুন লেগেছে, কাজেই আগুন নিভানোই তোমাদের প্রথম দায়িত্ব। এ ব্যাপারে সেনাবাহিনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং রাজাকাররাও তাদের পেছনে এগিয়ে এসেছে।"

বিশেষ করে শান্তি কমিটির উল্লেখ করে তিনি বলেন, "সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানের পর থেকেই কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শান্তি কমিটিগুলো স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। শান্তি কমিটি এতদিন এ ব্যাপারে যা করতে পেরেছে, মন্ত্রীগণ তার চেয়েও অধিক কাজ করতে পারে বলে আমি আশা করি।"

বাংলাদেশে গণহত্যার একজন নকশাকারী রাও ফরমান আলী এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, তাজউদ্দীন ছিলেন হিন্দু এবং তাজউদ্দীন আদৌ মুসলমান কিনা এ বিষয়েও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। গোলাম আযম ঠিক তাই বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেছিলেন, "বাংলাদেশ বাঙালিদের দ্বারা শাসিত হবে এই মতবাদ শেখ মুজিব বা শ্রী তাজউদ্দীনের। এর জন্যই তথাকথিত বাঙালি বীরেরা পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে বাংলাদেশ কায়েম করেছে।"

এখানে শান্তি কমিটির হয়ে গোলাম আযম প্রধানত কী বলেছেন তাই উদ্ধৃত করেছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে ইফতেখারুল আমিন বা আকবর আলী টাবির গ্রন্থটি দেখলেই চলবে। গোলাম আযম, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের জন্য শান্তি কমিটি, আলবদর, রাজাকার প্রভৃতি ফ্রন্টে জামায়াত কর্মীদের বেশি যোগ দিতে বলেছেন। এ কারণে এই ফ্রন্টগুলো পরিচালিত হতো জামায়াতী স্ট্র্যাটেজির অনুসারে, যে স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন করতেন জামায়াত নেতারা এবং যার প্রধান ছিলেন গোলাম আযম। এ কারণেই আমরা মনে করি, গণহত্যা, লুট, ধর্ষণ প্রভৃতিতে পাকিস্তানি বাহিনী ও তার জেনারেলরা যেমন দায়ী, গোলাম আযম ও জামায়াতে ইসলামীও তেমনভাবে দায়ী। মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ী হলে জেনারেলরা বাংলাদেশে তাদের সহযোগীদের ছেড়ে পালিয়েছিলেন। গোলাম আযমও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ফেলে পালিয়েছিলেন।

এই সামান্য সিদ্ধান্তেই গোলাম আযম বা গোলাম আযমদের চরিত্র উন্মোচিত

হয়। পাঠক, আপনার কি তখন মনে হয় না সূক্ষ্ম বা স্থূলভাবে যারা এদের সমর্থন করে বা কবি গুণের ভাষায় স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি দাবি করে তারা বিকৃত রুচি অথবা অত্যন্ত ফন্দিবাজ মানুষ। এবং শিক্ষিত লোকেরা মিডিয়া কর্মী, সম্পাদক, অধ্যাপক হয়ে যখন এসব কাজ করে তখন এদের বদমাশ বুদ্ধিজীবী ছাড়া আর কী বলার আছে। 'আমাদের সময়ে' ও 'জনকণ্ঠে' একটি ছবি দেখলাম। কিছু কিশোরী মানববন্ধন করেছে ১১ তারিখ গোলাম আযমের গ্রেফতার দাবি করে। এক কিশোরীর হাতে প্ল্যাকার্ডে একটি স্লোগান আমার ভাল লেগেছে— 'বন্যেরা বনে সুন্দর রাজাকার পাকিস্তানে'। গোলাম আযম গ্রেফতার আন্দোলনের পর আমাদের এখন একটি লক্ষ্যে আন্দোলন করা উচিত রাজাকারমুক্ত সমাজ। এ জন্য যারা খুনী রাজাকারদের সমর্থন করে তাদেরও রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা অথবা তাদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠাবার জন্য আন্দোলন করা।

১৩ জানুয়ারি, ২০১২

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

আলবদরের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার অভিজ্ঞতা

বধ্যভূমির অভিজ্ঞতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রায়েরবাজার বিলের বধ্যভূমি থেকে তিনি অবিশ্বাস্য হলেও পালিয়ে এসেছেন। কুখ্যাত আলবদর বাহিনীর জল্লাদদের হাত থেকে তিনি বেঁচে গেছেন অলৌকিকভাবে। নাম মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। বয়স ২৫ বছর। ঢাকার গ্রীনল্যান্ড মার্কেন্টাইল কোম্পানি লিমিটেডের চিফ একাউনটেন্ট্যান্ট। বদরবাহিনীর পশুরা আর সবারই মতো তাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল ঢাকার শান্তিবাগ এলাকা থেকে গত ১৪ ডিসেম্বর সকালবেলা। হাত ও চোখ বেঁধে আর সবার মতো তাকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বদর বাহিনীর এক ক্যাম্পে। সেখানে একই কক্ষে আর যারা বন্দি ছিলেন তার মধ্যে রয়েছে, সাংবাদিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক এবং আরো অনেক পেশার লোক। হিংস্র শ্বাপদের নারকীয় উল্লাসে প্রমত্ত বদরবাহিনীর জল্লাদরা নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করেছে। দেলোয়ার হোসেন নেই নৃশংস তাণ্ডবলীলার মধ্য থেকে মৃত্যুকে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পেছনে রেখে পালিয়ে এসেছেন চৌদ্দই ডিসেম্বর মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রায়েরবাজার বিলের বধ্যভূমি থেকে।

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সেই জল্লাদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার যে বিবরণ দিয়েছেন তা তারই জবানিতে নিয়ে দেয়া হলো :

'১৪ ডিসেম্বর সকাল নয়টা। শান্তিবাগে আমার বাসায় আমি শুয়েছিলাম। হঠাৎ বাইরে ভারি পায়ের শব্দ পেলাম। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন রাইফেলধারী লোক আসছে। রাস্তার দরজায় এসে তারা জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো। কর্কশ স্বরে তারা বলছিল ঘরে কে আছ? দরজা খোল।

'তারপর নানা কথাবার্তার পর তারা আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। বাসার পাশের একটি মেসের একটি ছেলেকেও তারা ধরে নিয়ে এলো। আমাদের তারা নিয়ে মালিবাগের মোড়ে দাঁড় করিয়ে একটি বাসে নিয়ে তুললো। বাসে তুলেই তারা আমার গায়ের জামা খুলে ফেললো এবং একটি কাপড় দিয়ে খুব কষে চোখ দুটি বেঁধে ফেললো। এছাড়া হাত দুটোও পেছনের দিকে নিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেললো। তারপর বাস ছেড়ে দিলো। পথে আরো কয়েক জায়গায়ও তারা বাসটি থামালো। মনে হলো আরো কিছু লোককে বাসের ভেতর ওঠানো হচ্ছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি। অনুমানে মনে হলো বাসটি মোহাম্মদপুর দ্বিতীয় রাজধানী বা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার দিকে যাচ্ছে।

এমনিভাবে ঘণ্টাখানেক চলার পর বাস এক জায়গায় এসে থামলো। তারপর আমাদেরকে হাত ধরে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ততক্ষণে কথাবার্তায় আমি টের পেয়েছি যে, আমি বদরবাহিনীর হাতে পড়েছি। আরেকজনকে সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে এলো উপর তলায়। দরজা খুলে একটি রুমের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মেঝের উপর। কিন্তু ঠিক পাকা মেঝের উপর নয়। গিয়ে পড়লাম কিছু লোকের উপর। অনেক কষ্টে সোজা হয়ে বসলাম। আমি ঠিক বুঝতে

পারছিলাম না, ঘরয়ে আর-সব লোকেরাও আমার মতো হাত ও চোখ বাঁধা কি না। শুধু বুঝতে পারলাম, ঘরে আমার মতো আরো বেশ কয়েকজন লোক রয়েছে। এদিকে কষে বাঁধার দরুন আমার চোখ ও কানে দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি যন্ত্রণা সহ্য করতে না- পেরে কাঁদতে শুরু করছি। মাথায় তখন শুধু একটি চিন্তা– কী করে এই বর্বর পশুদের হাত থেকে আমি বাঁচতে পারি। আমি কি সত্যি বাঁচতে পারবো।

আঙ্গুল কাটা : নখ উপড়ানো

আল্লাহ আল্লাহ্ বলে আমি উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলাম। ভাবছিলাম বদরবাহিনীর লোকরা তো শুনেছি মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা লাইনের ছেলে। আল্লার আহাজারিতে যদি বদর বাহিনীর লোকদের কিছু দয়া হয়। যদি দয়াপরবশ হয়ে চোখের ও হাতের বাঁধন খুলে দেয়, নিদেনপক্ষে একটু ঢিলে করে দেয়। অনেকক্ষণ কাঁদার পর কে যেন আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল। ফিসফিস করে সে বললো–সাবধান। হাত খোলা দেখলে কিন্তু আপনাকে পিটিয়েই মেরে ফেলবে। কচি কণ্ঠ। বুঝলাম অল্প বয়সী কোনো ছেলে এবং সে বদরবাহিনীর কেউ নয়। আমি তাড়াতাড়ি চোখের বাঁধন ঢিলে করে দিলাম। বাঁধন এমনিভাবে রাখলাম যাতে আবছা আবছা দেখা যায়। এর মধ্যেই দেখে নিয়েছি, যে আমার বাঁধন খুলে দিলো সে আট-নয় বছর বয়সী একটি ছেলে। তার দুহাতের চামড়া কাটা। হাত ফোলা। সারাকক্ষে শুধু রক্ত আর রক্ত। এখানে-সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে রক্তে রঞ্জিত জামা ও গেঞ্জী। আমার মতো প্রত্যেকের গায়েই গেঞ্জী। তাদের দেহের বিভিন্ন অংশে কাটছেঁড়ার দাগ, হাতের বা পায়ের আঙুল কাটা, কারো দেহে দীর্ঘ ও গভীর ক্ষত, কারো হাত-পায়ের নখ উপড়ে ফেলা হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদ

ছেলেটিই আমার হাতে আবার কাপড় জড়িয়ে বাঁধনের মতো করে দিল। আমি ভাবছিলাম আমি কী করে এই জল্লাদের হাত থেকে বাঁচব। কক্ষটিতে শুধু একটি কাচের জানালা; তবে মনে হলো বেশ মজবুত। এল টাইপের ত্রিতল অথবা চারতলা বাড়ি। বিরাট এলাকা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বাড়িটি সম্ভবত মোহাম্মদপুরের নিকটবর্তী এলাকার কোথাও হবে।

এমনিভাবে সারাদিন কেটে গেল। সন্ধ্যার দিকে বদরবাহিনী বা রাজাকারের দলের লোকজন আরো কিছু লোককে ধরে নিয়ে এল। সন্ধ্যার পর তিন-চারজন লোক আমাদের কক্ষে এল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এক এক করে সবাইকে তারা জেরা করতে শুরু করল। শুনলাম, কেউ বলছে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কেউ বলল, আমি ডাক্তার, আমি সাংবাদিক, আমি চিফ একাউন্ট্যান্ট, আমি কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালের সার্জনের ছেলে। লোকগুলোর একজন বলে উঠল–শালারা সব ইন্ডিয়ান স্পাই এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পাই। একজন আবার বলল–শালা, তুই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হয়ে এদ্দিন মন্ত্র পড়িয়েছ, আজ আমি তোমাকে পড়াব। তুমি তো গভর্নমেন্ট অফিসার, সরকারের টাকা খেয়েছ আর গাদ্দারী করেছ। এবার টের পাবে।

প্রহার আর প্রহার

জিজ্ঞাসাবাদের পর শুরু হলো প্রহার। এমনি ধুমাধুম মার দেয়া শুরু হলো যেন শ্বাস ফেলারও জো নেই। সবাই চিৎকার করে কাঁদছে। কেউ জোরে জোরে দোয়া-দরুদ পড়ছে; আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে কিন্তু পশুগুলোর সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। মারধর করে আধঘণ্টা পর লোকগুলো চলে গেল। মার খেয়ে অনেকেই অচেতন হয়ে পড়েছে। রাত তখন অনুমান দশটা। অধ্যাপক সাহেব আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন–ভাই, আপনার হাত কি খোলা? আমার হাতের বাঁধনটা একটু ঢিলে করে দেন, লুঙ্গিটা হাঁটু থেকে নিচে নামিয়ে দেন। খানিক পর কোনোক্রমে তেমনি দেয়াল ঘেঁষে বসে তিনি আচ্ছন্ন অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

মহিলার আর্তনাদ

রাত দশটা থেকে অনুমান একটা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার বদরবাহিনীর জল্লাদেরা এসে আমাদের খানিক পর পর দেখে গেল। রাত প্রায় সাড়ে ১২ টায় আমাদের উপরতলা থেকে কয়েকজন মহিলার আর্তনাদ ভেসে এল। সেই আর্তনাদের বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। মারের চোটে প্রায় সবাই অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমি জ্ঞান হারাই নি। আমি আল্লাহকে ডেকে যাচ্ছি-শেষবারের মতো। আল্লাহর কাছে আমার যদি কোনো গুনাহ হয়ে থাকে তার জন্যে পানাহ চাইছি।

রাত প্রায় একটার সময় পাশের ঘরে রাইফেলে গুলি লোড করার শব্দ এবং লোকজনের ফিসফিস করে আলাপের শব্দ শুনতে পেলাম। সারা শরীরে আমার ভয়ের হিম স্রোত চকিতে ভরে উঠল। খানিক পর একটা লোক এসে আবার আমাদের দেখে গেল। তারও খানিক পর কয়েকজন লোক আমাদের ঘরে ঢুকল। তারাই আমাদেরকে ঘরের বাইরে নিয়ে এল।

এরপর বদরবাহিনীর একেকটি পশু আমাদের দুজন দুজন করে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে আনল। তিনটি বাসে তারা আমাদের সবাইকে নিয়ে তুলল। তাদের হাবভাব, ফিসফিস করে কথাবার্তা শুনে মনে হলো– আর রক্ষা নেই। বাস ছেড়ে দিল। বাসের সবকটি জানালা ওঠান। বুঝতে পারলাম, আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বাস এসে থামল কতগুলো ঘরের পাশে। ঘরের দরজা বেশ বড়, বড় এবং কোনাকুনি লাঠি দিয়ে আটকানো। কিন্তু তারা আমাদেরকে ঘরে না ঢুকিয়ে ধরে নিয়ে চলল। কৌশলে চোখের বাঁধন আলগা রাখার সুযোগ হলো বলে দেখতে পেলাম সামনে বিরাট এক বটগাছ, তার সম্মুখে একটা বিরাট বিল, মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও পুকুরের মতো রয়েছে। বটগাছের আরো কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, ১৩০ থেকে ১৪০ জন লোককে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে একফাঁকে সুযোগ বুঝে আমি আমার পরনের লুঙ্গি হাঁটুর উপরে উঠিয়ে রেখেছি। চোখ-বাঁধা অবস্থায়ও যে আমি দেখতে পাচ্ছি তা বদরবাহিনীর লোকেরা বুঝতে পারে নি। বদরবাহিনীর লোকজনের হাবভাবে স্থির নিশ্চিত হলাম, আমাদের হত্যা করার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি তখন আমার সমগ্র চেতনা কেন্দ্রীভূত করে ভাবছি কী করে বাঁচা যায়।

আপনারা বাঙালি হয়েও আমাদের মারছেন'

দেখতে পেলাম বদরবাহিনীর পশুরা আমার সামনের লোকদের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধছে। আমাদের মতো বন্দি একজন চিৎকার করে বলে উঠলেন– আপনারা বাঙালি হয়ে আমাদের মারছেন। কোনো পাঞ্জাবী যদি মারতো তাহলেও না হয় বুঝতাম। কেন আমাদেরকে হত্যা করতে যাচ্ছেন? আমরা কী অন্যায় করেছি। ভদ্রলোকের গায়ে রাইফেলের ঘা দিয়ে বদরবাহিনীর এক জল্লাদ গর্জে উঠলো– চুপ কর শালা। কে যেন একজন বলে উঠলো–আমাকে ছেড়ে দিন' দশ হাজার টাকা দেবো। কোনো এক মহিলা চিৎকার করে বলে উঠলেন–আপনারা আমার বাপ, ভাই। আমাকে মারবেন না। চারদিকে মাতম, আহাজারি–তা বর্ণনার ভাষা আমার নেই। সামনের লোকদের দলে দলে ভাগ করে তারা সামনের ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিয়ে যাওয়া শুরু করলো। আমার সারা শরীর যেন ভয়ে জমে যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে আমি বাঁচার আশায় পালাবার সম্ভাব্য সব উপায় ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। মনে হচ্ছে– কোনো উপায় আর নেই।

বাঁচার কি কোনো উপায় নেই

আবার মনে হচ্ছে বাঁচার কি কোনে উপায় নেই? জল্লাদের একজন আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমার পেছনের লোকের গেঞ্জির সাথে আমার গেঞ্জি সে ভালো করে বেঁধে দিল। হঠাৎ সে-সময় পেছনেরও লোকটি বলে উঠলো– আজিজ ভাই, তুমি। তুমি আমাকে মারতে নিয়ে এসেছো। তুমি

থাকতে মেরে ফেলবে। আফসোস রাইফেলধারী লোকটি কোনো কথা না বলে চলে গেলো।

আলগা করা বাঁধন খুলে দৌড় দিলাম

বেয়নেট দিয়ে জল্লাদের দল তাদের হত্যালীলা শুরু করে দিয়েছে। ছুঁড়ছে গুলি। চারদিকে আর্তচিৎকার, মাঝে মাঝে জল্লাদের দলের কেউ-কেউ চিৎকার করে বলে উঠছে–শালাদের খতম করে ফেল। সব ব্যাটাদের খতম করে ফেলবো। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে আর্তচিৎকারের সাথে সাথে পৈশাচিক হাসি। এমনি নারকীয় তাণ্ডবলীলার মধ্যে আমি জীবনপণ করে চট করে আমার বাঁধন খুলে ফেললাম। আমার সম্মুখের প্রায় ত্রিশজনকে ততক্ষণে সামনের ফাঁকা মাঠের মধ্য নিয়ে খতম করে ফেলছে বদরবাহিনীর পশুরা। ত্রস্তহাতে আমি গেঞ্জির গিঁট খুলে ফেললাম। বাম হাতের দড়ির বাঁধন খুলে দড়িটা হাতের নিচে চাপা দিয়ে রাখলাম। হাত আবার পেছনে নিয়ে রাখলাম। বদরবাহিনীর এক দস্যু আমার সামনের কয়েকজন লোক নিয়ে তখন ব্যস্ত। কে যেন বলে উঠলেন–আমার কাছে তোরা দায়ী থাকবি। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। মাগো...। আমি চোখের বাঁধনের কাপড়টি সরিয়ে ফেলে খুব জোরে দৌড় দিলাম। প্রায় হাত কুড়ি যাওয়ার পর এই এই বলে হাঁক-ডাক শুনতে পেলাম। আমার তখন কোনো দিকে খেয়াল নেই। শুনতে পেলাম গুড়ম গুড়ম করে দুটি আওয়াজ। অন্ধকারে প্রায় ৪০ গজ যাওয়ার পর সামনে পড়লো কাদা। কর্দমাক্ত জায়গাটি পার হওয়ার সময় আবার গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিন্তু অন্ধকারে তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আমি কাদার মধ্যে পড়ে গেলাম। আমার গায়ে গুলি লাগে নি। উঠে আবার দৌড়ানো শুরু করলাম। খানিকদূর যাওয়ার পর পানির মধ্যে পড়ে গেলাম। প্রায় ৩ ফুট গভীর পানি। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে আমি পানি ঠেলে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলাম। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর শুকনো জায়গা পেলাম। উঠে আবার দৌড়ানো শুরু করলাম। দূর থেকে আমার দিকে টর্চের একঝলক আলো ভেসে আসলো। আবার দুটি গুলির শব্দ। সাথে সাথে আমি কাত হয়ে পড়ে গেলাম। গড়াতে গড়াতে পড়ে গেলাম আবার পানির মধ্যে। প্রাণপণে সাঁতার কেটে এগিয়ে চললাম। এরপর শুকনো বিল আর নদী পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। গায়ে শক্তি নেই। কিন্তু আমি তখন দিকভ্রান্ত। নিরাপত্তার জন্যে নদীর পাড়ে না উঠে উজানে এগিয়ে চললাম। রাতের তখন বেশী দেরী নেই। খানিক পর উঠে পড়লাম নদী থেকে। বাকি রাত কাটিয়ে দিলাম নদীর তীরে এক ঝুপড়ির মধ্যে। সকালে রোদ ওঠার পর চারধারে তাকিয়ে দেখলাম। বুঝতে পারলাম না কোথায় এসেছি। গ্রামের আভাস যেদিকে পেলাম সেদিক পানে চললাম এগিয়ে। খানিক চলার পর শুনতে পেলাম কারা যেন আমায় ডাকছে। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলাম। পরে বুঝতে পারলাম–এরা গ্রামবাসী। তাদের কাছে সব কথা বললাম। বটগাছের বিবরণ দিতে তারা বললো–ওটা হলো রায়ের বাজারের ঘাটের বটগাছ। সেখান থেকে পরে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দুদিন পর ফিরে এলাম স্বাধীন বাংলার রাজধানীতে। আমি তখনো বুঝি নি এখনো বুঝতে কষ্ট হচ্ছে যে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে আমি কি বেঁচে গেছি। আল্লাহ শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়েছেন।

দৈনিক বাংলা, ২১.১২.১৯৭১

পরিশিষ্ট ২

বরাবর
তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৮
নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলানগর, ঢাকা

সূত্র : স্মারক নং নিকস/প্র-৩/রোদ/৫(৪৪)/২০০৮/৮৬৩

বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর নিবন্ধন বিষয়ে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কর্তৃক লিখিত আপত্তি।

নিম্ন উল্লেখিত কারণসমূহের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত হওয়ার অযোগ্য, কারণ

১। যেহেতু কমিশন কোন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন না এমন কোন গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে, যাহা বাংলাদেশে সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য (প্রধানত অনুচ্ছেদ, ৭, ১০, ১১, ১৪, ১১৯, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৬৫, ৯৪, ১০১-১১২, এবং ১১৪-১১৭) সেহেতু কমিশন এমন কোন সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে না রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের যে সার্টিফিকেট আইন দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে না ও বাতিল হিসেবে গণ্য হইবে; কারণ সংবিধানের ৭(২) এবং ২৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২। কমিশন যেহেতু একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, ইহা এমন কোন কাজে যুক্ত হইবে না যাহা বাংলাদেশের প্রচলিত আইন যথা ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ২০ ধারা লঙ্ঘনের প্ররোচনার সামিল। নিবন্ধনের আইন কমিশনকে এমন কোন ক্ষমতা প্রদান করে নাই যাহাতে দেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘনকারী এমন কোন সংগঠনকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের সার্টিফিকেট প্রদান করিতে পারে। ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত আছে যে 'অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইন প্রাধান্য পাইবে'। অর্থাৎ নিবন্ধনকরণের আইনের প্রয়োগ এবং ইহার অধীনে সার্টিফিকেট প্রদান বাংলাদেশে বিদ্যমান ও প্রচলিত বিশেষ ক্ষমতা আইনের সাপেক্ষেই মাত্র, উহার উর্ধ্বে নয়। তাই কমিশন এমন কোন কাজে লিপ্ত হইবেন না যাহা বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২০ ধারা লঙ্ঘনে ও প্ররোচনার সামিল। যাহা গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধও বটে। তাই কমিশন কখনও ইহার ক্ষমতা (Mandate) বর্হিভূত কাজে বা গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধের কাজে লিপ্ত হইবেন না এবং হইতেও পারে না।

৩। কমিশনের সুপারিশেই বর্তমান সরকার ১৯৭২ সনের গণপ্রনিধিত্ব আদেশ অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে সংশোধন করিয়াছেন এবং সেখানে সংযোজনের মাধ্যমে 90C(1) তে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের যোগ্যতার বিষয়ে ৪টি শর্ত যুক্ত করিয়াছেন। উহাতে উল্লেখ আছে যে উক্ত শর্তের ১টি লঙ্ঘিত হইলে কোন দল নিবন্ধনের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে। নিবন্ধনপ্রার্থী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেবল মাত্র একটি নয়, 90C(1) এর ৪টি শর্তই লঙ্ঘন করেছে। যথা-

(ক) 90C(1)(a) এর পরিপন্থী কারণ এই দলের গঠনতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অসামঞ্জস্য ও সাংঘর্ষিক বিধায় রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পাওয়ার অযোগ্য। উপরে

উল্লেখিত ১ নং প্যারা, সংযোজিত লিখিত বিস্তারিত আপত্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য।

(খ) 90C(1)(b) অনুযায়ী কোন নারী এবং কোন অমুসলিম এই দলের প্রধান, কেন্দ্রীয় কমিটি বা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে কোন অংশ গ্রহণ বা সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে বারিত। সুতরাং দলের সকল সদস্য তাহাদের গঠনতান্ত্রিক আইন, বিধি ও নিয়মের সমান নয় অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রেই লিঙ্গ ও ধর্মভিত্তিক বৈষম্য বিদ্যমান। বিধায় জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পাওয়ার অযোগ্য।

(গ) 90C(1)(c) অনুযায়ী নিবন্ধনপ্রার্থী এই দলটি বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীয়িক সম্প্রীতি অর্থাৎ সার্বজনীন ধর্মীয় অসাম্প্রদায়িক অনুভূতির প্রতি হুমকিও বটে এবং তাহাদের এক ধরনের হুমকি ও কর্মকান্ড যদি প্রতিহত না করা হয় তা হলে রাষ্ট্রের সীমানা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হইবে বিধায় জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পাওয়ার অযোগ্য।

(ঘ) 90C(1)(d) অনুযায়ী প্রার্থীর স্বীকৃত মতেই নিজেদের দায়েরকৃত রীট পিটিশন ===৭৯২/২০০৮ তে নিজেরাই স্বীকার করেছেন তাহাদের দলের জন্ম হয়েছে ভারতে অতএব বাংলাদেশের সীমানার বাহিরে তাহাদের অনুরূপ, অনুকূল এবং শাখা জন্মলগ্ন থেকেই বিদ্যমান। বিধায় এই সংগঠন রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধন পাওয়ার অযোগ্য।

জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান ও বিগত গঠনতন্ত্রের ধারা, সাবধারা-১ ও ৫ রাষ্ট্রের সংবিধান সম্মত বিচার ব্যবস্থা, প্রক্রিয়া, সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা অস্বীকার করে বিধায় রাষ্ট্রের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর চেয়ে মৌলিক অনুচ্ছেদ ৭, ৬৫ এবং ৯৪-এর সাথে কেবল অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সরাসরি সাংঘর্ষিকও বটে। যাহা ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২০ ধারায় একটি গুরুতর অপরাধও। জামায়াতের সাথে সাথে নিষিদ্ধ ইসলামী জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জেহাদের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে নতুন লেবাসে সুসজ্জিত করে আরেকটি ইসলামিক দল ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি' (আইডিপি) যে খসড়া গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে নিবন্ধন চেয়েছে সেটাও তাদের গঠনতন্ত্রের ধারা ১০(খ) সংবিধানের ৭, ৬৫ ও ৯৪ অনুচ্ছেদ এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আইডিপি-র গঠনতন্ত্রের ধারা ৯(ঘ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর হুমকি স্বরূপ যা RPO-90c(c)- এর পরিপন্থী বিধায় নিবন্ধনের অযোগ্য এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী গুরুতর দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ। এবং নিবন্ধন পাওয়ার অযোগ্য।

যুদ্ধাপরাধীদের দল বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীকে নিবন্ধন দেয়া যাবে না। কেননা পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তির রাজনীতি করার অধিকার থাকে না। যেহেতু জামায়াত বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতাকারী, যেহেতু তারা এদেশের প্রতি কখনো আনুগত্য প্রকাশ করেনি, উপরন্তু পদে পদে তাদের গঠনতন্ত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান লঙ্ঘন করে চলেছে-আর এ কারণেই জামায়াতে ইসলামীকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন দেয়া আইন ও সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জাতির আস্থা আর ভরসার স্থল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন সংবিধান লঙ্ঘনের এই দায় কখনো নেবে না।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নিবন্ধনপ্রার্থীতার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন বরাবর সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি সহ বিস্তারিত লিখিত আপত্তি–

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বা 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' যে নাম হোক এদের উদ্দেশ্য, কর্মকাণ্ড কখনোই বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সংবিধানকে সমর্থন করেনি। জামায়াতে যুদ্ধাপরাধী, মানবতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি দল। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী শক্তি। এরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় পতাকা, সংবিধান কিছুই মানে না। ৩৭ বছর পরও তারা বলছে দেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই, স্বাধীনতাবিরোধী নেই; এমনকি তাদের কেউ কেউ বলতে দ্বিধা করছে না '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধই হয়নি, হয়েছিল গৃহযুদ্ধ। এসব কারণে দেশের স্বাধীনতাকামী মুক্ত মনের ও চেতনার প্রতিটি মানুষ মনে করে জামায়াতেসহ অপরাপর ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন পাওয়ার অযোগ্য।

মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস ঘটনা এবং সংখ্যার হিসেবে সর্বাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসররা সরকারি হিসেবে ৩০ লক্ষ নিরীহ, নিরস্ত্র, শান্তিকামী মানুষকে হত্যা করেছে, ২ লক্ষ নারীর উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে, দেশের কলকারখানা, রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট ধ্বংস করেছে, গৃহে অগ্নিসংযোগ করেছে, নির্বিচারে লুটতরাজ করেছে এবং দেশত্যাগে বাধ্য করেছে ১ কোটি বিপন্ন মানুষকে। প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ তাদের দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে কয়েক কোটি মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কখনও এত ভয়াবহ যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করতে পারতো না, যদি না তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতো জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামের নেতাকর্মীরা। এই গণহত্যায় যে দলটি সুপরিকল্পিত ও সংগঠিতভাবে প্রথম দিকে পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীকে নৈতিক শক্তি যুগিয়ে, সহায়ক বাহিনী গঠন করে, মিটিং, মিছিল, সমাবেশ করে এবং পত্রিকায় অনবরত মিথ্যা লিখে প্ররোচনা করে-সে রাজনৈতিক দলটি হচ্ছে গোলাম আযম ও মতিউর রহমান নিজামীদের নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামী, যারা কেবলমাত্র নিবন্ধন পেতে তাদের খোল পাল্টে নাম রেখেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামকালে জামায়াত নেতারা যে কী অপরাধ করেছে তার সাক্ষী রয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। ২৫ মার্চ '৭১ কুখ্যাত পাকিস্তানী জেনারেল খুনী টিক্কা খান যে গণহত্যা আরম্ভ করেছিল সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে তার বিরুদ্ধে নিন্দা ও ধিক্কারের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। ঘাতক টিক্কা-নিজামীদের হাত শক্তিশালী করার জন্য ৪ এপ্রিল জামায়াতের তৎকালীন আমীর গোলাম আযম তার সঙ্গে দেখা করে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন (*পূর্বদেশ* ৫ এপ্রিল ১৯৭১)।

পাকিস্তানের বর্বর ঘাতক বাহিনীকে সাহায্য করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে '৭১-এর ১০ এপ্রিল গোলাম আযমরা শান্তি কমিটি গঠন করেন। এই শান্তি কমিটি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিহত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করা। কমিটির প্রথম বৈঠকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংসতম নরমেধযজ্ঞ পরিচালনার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনগণকে আখ্যায়িত করা হয় ইসলামবিরোধী একাত্তরের দালাল হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে গোলাম আযমদের কাছে পাকিস্তান,

জামায়াতে ইসলামী ও ইসলাম একই অর্থ বহন করে। যে কারণে তাদের কাছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যেমন ইসলামবিরোধী কাজ, জামায়াতে ইসলামীর বিরোধীতাও ইসলামবিরোধী কাজ। এভাবেই জামায়াত শান্তির ধর্ম ইসলামকে সব সময় খুনী, সন্ত্রাসী বোমাবাজ ও ধর্ষকের ধর্মে পরিণত করতে চেয়েছে।

১২ এপ্রিল ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি কমিটি মিছিলে গোলাম আযম নেতৃত্ব দেন এবং মিছিল শেষে গোলাম আযম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। (*দৈনিক সংগ্রাম*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১)

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে আসছে তাদের আন্দোলনের শুরু থেকে। এখনও সেই যৌক্তিক দাবিতে জামায়াতকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন না দেয়ার দাবি জানানো হচ্ছে। কেননা, ১৯৭১-এ জামায়াত যে যুদ্ধাপরাধ করেছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে এখনও তাদের সেই তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে সে দায়েই তারা এদেশে রাজনীতি করার কোন অধিকার পেতে পারে না।

'৭১-এ জামায়াতে ইসলামীর বর্বরতার আরেকটি নৃশংস উদ্যোগ হচ্ছে হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর কায়দায় আলবদর, আলশামস বাহিনী গঠন, বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন এবং জামায়াতের ঘাতকদের দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের হত্যা। বর্তমানে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের উদ্যোগে ও তাদের তৎকালীন ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত এই বাহিনীর নেতাদের প্রধান কাজ ছিল পাকিস্তানী জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে বৈঠক করে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করা। একই সঙ্গে স্বাধীনতাকামী বাঙালীদের খুঁজে বের করে হত্যা করা, হিন্দুদের বলপূর্বক মুসলমান বানানো, সেমিনার ও প্রচারপত্রের মাধমে পাকিস্তানী ও জামায়াতী চিন্তাধারা প্রচার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্রভাবে মোকাবেলা করা ছিল আলবদর বাহিনীর নৃশংস তৎপরতার উল্লেখযোগ্য দিক। মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, কামারুজ্জামান, মীর কাশেম আলী প্রমুখ তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই ঘাতক বাহিনী পাকিস্তানী বাহিনীর পরাজয় বরণের প্রাক্কালে এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের যে পৈশাচিক বর্বরতায় হত্যা করেছে বিশ্বের ইতিহাসে তার নজির পাওয়া যাবে না। দেশের প্রখাত লেখক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, ক্রীড়াবিদ ও সমাজকর্মীসহ বিভিন্ন পেশার শত শত বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য দায়ী এই আলবদর বাহিনী। ১৪ সেপ্টেম্বর '৭১ 'আলবদর' শিরোনামে এক নিবন্ধে জামায়াতীদের মুখপত্র 'সংগ্রাম' লিখেছিল, 'আলবদর একটি নাম! একটি বিস্ময়। আলবদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আলবদর সেখানেই।

'৭১-এর ৭ নভেম্বর 'বদর দিবস' উদযাপন করতে গিয়ে ঢাকার বায়তুল মোকাররমের প্রাঙ্গণে ইসলামী ছাত্র সংঘের এক সমাবেশ আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ চার দফা ঘোষণা প্রচার করেন। এই ঘোষণায় বলা হয়, '....যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্তানের নাম মুছে না যাবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেবো না। ...আগামীকাল থেকে হিন্দু লেখকদের কোন বই অথবা হিন্দুদের দালালী করে লেখা পুস্তকাদি লাইব্রেরীতে কেউ স্থান দিতে পারবেন না, বিক্রি বা প্রচার করতে পারবেন না। যদি কেউ করেন তবে পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকরা জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেবে। পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী 'বদর দিবসের শপথ' হিসেবে ঘোষণা করেন-ক) ভারতের আক্রমণ রুখে দাঁড়াবো। খ) দুষ্কৃতকারীদের খতম করবো, গ) ইসলামী সমাজ কায়েম করবো।' *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ নভেম্বর ১৯৭১)

আলবদর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মতিউর রহমান নিজামী ১৪ নভেম্বর *দৈনিক সংগ্রাম*-এ লিখেছেন- 'সেদিন আর খুব দূরে নয় যেদিন আলবদরের তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।' বদর বাহিনীর অপর দুই প্রধান নেতা আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ এবং মীর কাশেম আলী ২৩ নভেম্বর এক বিবৃতিতে সৈনিক হিসেবে প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার জন্য সদস্যদের প্রতি

আহবান জানিয়েছেন। এই বিষয়ে প্রকাশিত তাদের এক প্রচারপত্রে বলা হয়-'মনে রাখবেন আপনারা পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্যই কেবল যুদ্ধ করছেন না। এ যুদ্ধে ইসলামের, নমরুদের হাত থেকে মাতৃ ভূমিকে রক্ষার জন্য আমাদের আমীরের (গোলাম আযমের) নির্দেশ পালন করুন।' জামায়াতে ইসলামী যুদ্ধাপরাধীদের দল। আন্তর্জাতিক আইন এবং দেশীয় আইনে যুদ্ধাপরাধী। আর যুদ্ধাপরাধীদের কথা উঠলে জামায়াত এবং তাদের আশ্রয়দাতারা সব সময় যে সব কথা বলে এর বিরোধীতা করে তা হচ্ছে-১) জামায়াত কখনও যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল না, ২) বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোন সুযোগ নেই, ৩) ৩৭ বছর ধরে যেহেতু কোনো সরকার তাদের বিচার করেনি এবং ৪) কেউ তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা করেনি।

তাদের এসব কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং নির্জলা মিথ্যা ছাড়া যে আর কিছু নয়-জামায়াত ইসলামীর মুখপত্র '৭১-এর *দৈনিক 'সংগ্রাম'* ও অন্যান্য পত্রিকা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বঙ্গবন্ধুর সরকার কখনও যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করেনি। বরং তাদের বিচারের জন্য তখন একাধিক আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, এমনকি সংবিধান পর্যন্ত সংশোধন করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ২৪ জানুয়ারি '৭২ 'দালাল আইন (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল)' আদেশ জারি করেন। এরপর এই আদেশ ৬ ফেব্রুয়ারি, ১ জুন ও ২৯ আগস্ট '৭২ তারিখে তিন দফা সংশোধনীর পর চূড়ান্ত হয়। দালাল আইনের আওতায় ৩৭ হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিভিন্ন আদালতে তাদের বিচার আরম্ভ হয়।

সরকারি চাকুরিতে কর্মরতদের কেউ দালালী ও যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল কি না তা যাচাই করার জন্য সরকার ১৩ জুন ১৯৭২ তারিখে আরেকটি আদেশ জারি করে, যা তখন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের সহযোগীদের বিচারের জন্য ২০ জুলাই ১৯৭৩ তারিখে জাতীয় সংসদে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩' পাশ করা হয় এবং সংবিধানের প্রথম সংশোধনী হিসেবে এটি ৪৭(৩) অনুচ্ছেদে সংযোজিত হয়।

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর দালাল আইনে আটক যে সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই তাদের জন্য সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। তবে সাধারণ ক্ষমার প্রেসনোটে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-'ধর্ষণ, খুন, খুনের চেষ্টা, ঘরবাড়ি অথবা জাহাজ-অগ্নিসংযোগের দায়ে দণ্ডিত ও অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রদর্শন প্রযোজ্য হইবে না।' সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর দালাল আইনে আটক ৩৭ হাজারের অধিক ব্যক্তির ভেতর প্রায় ২৬ হাজার ছাড়া পেয়েছিল। তারপরও ১১ হাজারের বেশি ব্যক্তি এ সকল অপরাধের দায়ে কারাগারে আটক ছিল এবং তাদের বিচার কাযক্রম অব্যাহত ছিল। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে '৭৫-এর ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম বন্ধ করে দেন।

জিয়াউর রহমান দালাল আইন বাতিল করলেও এই আইন বাতিল করেন নি। 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট ১৯৭৩' অনুযায়ী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যার সাথে জড়িত পাকিস্তানীদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস-এর সদস্যদের বিচার এখনও করা সম্ভব। এই আইনে কীভাবে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে, কারা ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও আইনজীবী হবেন, ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা এবং এই ট্রাইব্যুনাল কত ধরনের যুদ্ধাপরাধ তথা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার করতে পারবে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত বলা আছে। এই আইন প্রণয়নের জন্য তখন বাংলাদেশের সংবিধানও সংশোধন করতে হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ২৫ জুলাই জাতীয় সংসদে সংবিধানের প্রথম সংশোধনী [৪৭(৩)] গৃহীত হয়। এতে বলা হয়-"এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোর্পদ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী

বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।" সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটি এখনও বলবৎ রয়েছে।।

বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দায়িত্ব ছিল সরকারের। কিন্তু এই দায়িত্ব স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার উদ্যোগ নিয়েও করতে পারেনি, আর তারপরের সরকারগুলো কোন উদ্যোগই নেয়নি এ দায়িত্ব পালনের। তবে, দেশের আপামর জনসাধারণ তাদের বিচারের পক্ষে। তার একটি উদাহরণ ১৯৯২ সালে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত গণআদালতে লক্ষ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণ। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক পরিসরেও এখন '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উঠছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ জানে যুদ্ধাপরাধী কারা। দেশের আপামর জনসাধারণের মতো নির্বাচন কমিশনও জনে যুদ্ধাপরাধী কারা, কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত হয়েছে এবং কোন কোন রাজনৈতিক দল দেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছে।

বর্তমান নির্বাচন কমিশন শুরু থেকেই বলে এসেছে যুদ্ধাপরাধীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য। কিন্তু কারা যুদ্ধাপরাধী তাদের সরকারীভাবে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা কেউ গ্রহণ করে নি। ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণে নির্বাচন কমিশনের আইন-এ যদি যুদ্ধাপরাধী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পায় তা হলে চিহ্ন যুদ্ধাপরাদীদের যুদ্ধাপরাধের দায় থেকে মুক্ত করার অপচেষ্টার দায় নির্বাচন কমিশনের ওপরও বর্তাবে। আর স্বাধীনতার বিরোধীতাকারীদের এই দেশে রাজনীতি করার নৈতিক অধিকারই থাকে না। স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন কমিশনের কাছে নিবন্ধন পাবার১

জন্য তার গঠনতন্ত্রে কিছু পরিবর্তন এনে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধর কথা আনলেও এই পরিবর্তন আদর্শিক নয়, কেবলই কাগজে কলমে, তার প্রমাণ অতি সম্প্রতি জানিয়েছে জামায়াত। যেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একাত্তরে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপটের একটি বড় বিজয় ১৯৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন আর তাতে নৈতাকামী বাঙালির ভোটের বিজয়। ঐ নির্বাচন নিয়ে এক বিন্দু বিতর্ক নেই। আর সেই সত্য কথাটিই আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছিলেন।

'গত ২৮ অক্টোবর জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে এক বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ টি এম শামসুল হুদা বলেছিলেন, 'বর্তমান নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য হলো অবাদ, ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা এবং আগামী সংসদে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আমরা ১৯৭০ সালের মতো একটি নির্বাচন করতে চাই, যে নির্বাচন নিয়ে কোনো প্রশ্ন হবে না।' (*প্রথম আলো,* ৩১ অক্টোবর ২০০৮)

আর তার পরই ঐতিহাসিক '৭০-এর নির্বাচনকে গত ৩০ অক্টোবর জামায়াতের নেতারা কলঙ্কিত করতে চেষ্টা করেছেন, তাদের বক্তব্যে।

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে-১৯৭০ সালের নির্বাচনকে 'একতরফা নির্বাচন' আখ্যা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম দলটির সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। ১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে বলেছেন, সেই নির্বাচন যারা দেখেছেন তাদের সবাই জানেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচন আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ভোটকেন্দ্রে ঢুকতেই দেয়নি এবং নির্বাচনে ব্যাপকভাবে জাল ভোট পড়েছিল। বলতে গেলে সেই নির্বাচন ছিল একতরফা।

'১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন নিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সেই নির্বাচনে জামায়াত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) কোনো আসন পায়নি। নির্বাচনে জয়লাভের পরও তখন আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী। এ ঘটনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন আরও বেগবান হয় এবং তার সূত্রে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয় বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। জামায়াত মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে পশ্চিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ নেয়। তারা রাজাকার, আলবদর, আল-শামস, শান্তি কমিটি প্রভৃতি গঠন করে গণহত্যা চালায়। দলটির দুজন কেন্দ্রীয় নেতা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে গঠিত মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এবং স্বাধীনতার পর দালালির অভিযোগে তাঁদের বিচারও হয়।

'নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য জামায়াত সম্প্রতি তাদের দলের গঠনতন্ত্রে সংশোধনী আনে।...

'সমালোচকেরা জামায়াতের এই গঠনতন্ত্র সংশোধনকে নিবন্ধন পেতে আদর্শিক নয়, কাগজে পরিবর্তন বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।' (*প্রথম আলো*, ৩১ অক্টোবর ২০০৮)

এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সংবিধান, ঐহিত্য ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের বিরোধী একটি সংগঠন হিসেবে এখনও কাজ করছে। এ জন্য নির্বাচন কমিশনের উচিৎ জামায়াতে ইসলামীকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন না করা এবং সরকারের কাছে যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা প্রকাশের দাবি জানানো।

২.

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অস্বীকার লঙ্ঘন, যুদ্ধাপরাধ, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যহীনতা এবং উপযুক্ত ঐতিহাসিক পটভূমি ছাড়াও বিদ্যমান সংবিধান, বিশেষ আইন, দণ্ডবিধি, জরুরী আইন ও ১৯৭২ সালের গণ প্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিধির আওতায় ও নির্বাচন কমিশন জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধন দিতে পারে না।

১. বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(১), ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৯, ২৩, ২৪ এবং ৩৮ অনুযায়ী নিবন্ধন প্রার্থী 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' নিবন্ধন যোগ্য নয়, যেহেতু

ক) ৭(১) দফায় বলা আছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা কার্যকর হবে, কিন্তু তর্কিত নিবন্ধনপ্রার্থীর গঠনতন্ত্রে উল্লেখ এই যে রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অর্থাৎ সকল ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কার্যকর করতে হবে;

খ) ১০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই;

গ) ১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'প্রজাতন্ত্র হবে এমন একটি গণতন্ত্র যেখানে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের' অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে নিশ্চিত করার বিষয়টি নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই;

ঘ) ১৩ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট মালিকানার নীতির সাথে নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব ও ভিন্নতা আছে;

ঙ) ১৪ অনুচ্ছেদে ধর্মনির্বিশেষে কৃষক, শ্রমিক ও অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান করা নিশ্চিত থাকলেও নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্রে তার কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত;

চ) ১৯ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত থাকলেও নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্রে সমতা নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় নি;

ছ) ২৩ অনুচ্ছেদে 'জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' নিশ্চিত করা হলেও নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্রে একটি মাত্র ধর্মাবলম্বীর সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে;

জ) ২৪ অনুচ্ছেদে জাতীয় স্মৃতি নির্দেশক তাবৎ বস্তু বা স্থানকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দেয়া থাকলেও নিবন্ধনপ্রার্থীর গঠনতন্ত্রের সেমত সংস্কৃতি রক্ষার কোনোই নিশ্চয়তা নেই; বরং

ঝ) ৩৮ অনুচ্ছেদের প্রদত্ত সংগঠনের স্বাধীনতা আইনের দ্বারা অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা অ্যাকট সীমিত করায় নিবন্ধন প্রার্থীর সংগঠনের নাম ধর্মীয় নামযুক্ত হওয়ায়, উক্ত অ্যাকটের ২০(১) ধারা অনুযায়ী নিবন্ধনপ্রার্থী নিবন্ধন যোগ্য নয়।

১৯৭২ সালের গণপ্রতিধিত্ব আদেশ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ (২০০৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) অনুযায়ী

১. ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইন (১৯৭৪ সনের ১৪নং আইন) The Special power Act 1974 (An Act No. XIV of 1974) ইংরেজী ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সন থেকে কার্যকরী)-এর Section-20 prohibition of formation of certain asso ciations or unions-

1) No person shall form, or be member or otherwise take part in the activities of any

communal or other association or union, which in the name or on the basis of any religion has for its objcct. or pursues, a Political purpose.

2 নং-৪২ (মুঃপ্রঃ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ০৪ ভাদ্র ১৪১৫ মোতাবেক ১৯ আগস্ট, ২০০০ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত ও প্রকাশিত ২০০৮ সনের ৪২ অধ্যাদেশ Representation of the people order. 1972-(Rcgistration of Political Parties with the Commission) Article 90A-For the purpose of this Order, at political party willing to participate in election under their order shall be registered with the commission subject to the condition laid down I Artical 90B.

Artide : 90C(I)-A political party shall not be qualified for registration under this chapter, if

a) the objectives laid down in its constitution are contrary to the

Constitution of the peoples Republic of Bangladesh; or

b) any discrimination regarding religion, race, caste, language or sex is apparent in its constitution; or

c) by name flag, symbol or any other activity it threatens to destroy communal harmony or leads the country to disintegration, or

d) there is any provision in its constitution for the establishment or operation of any office. branch or committee outside the territory of Bangladesh.

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের উপরোক্ত চারটি শর্তের কোনটিই নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্র আদৌ পূরণ করে না, অথচ যে কোন একটি শর্তের অপলাপেই কোনো সংগঠন নিবন্ধনের চূড়ান্ত অযোগ্য, যথা,

৯০সি(১)(এ) ধারার লঙ্ঘন যেহেতু নিবন্ধনপ্রার্থীর গঠনতন্ত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ৭, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৯, ২৩, ২৪ তৃতীয় ভাগের ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৬৫ অনুচ্ছেদের ও চতুর্থভাগের ৬৫ অনুচ্ছেদের সাথে অসামঞ্জস্য।

৯০সি(১)(বি) ধারার লঙ্ঘন-যেহেতু নিবন্ধনপ্রার্থীর গঠনতন্ত্রে কোনো ধারাই সাম্প্রদায়িক কিংবা ধর্মীয় শৃঙ্খলার নিশ্চিত করে না, বরং সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার উস্কানি ও প্ররোচনা দেয়।

৯০সি(১)(সি) ধারার লঙ্ঘন-যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নিবন্ধনপ্রার্থী ২০০৮ সালের ৬৭৯২ নং যে রিট পিটিশন দায়ের করেছে সেখানে স্বীকার করেছে যে ভারতে নিবন্ধনপ্রার্থী দলটির জন্ম হয়েছিল এবং তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সংগঠনটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ও একে অপরের সহায়ক অর্থাৎ জন্মলগ্ন থেকে সংগঠনটির শাখা ও কার্যক্রম বাংলাদেশের সীমানার বাইরে বিদ্যমান আছে।

৩. সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদির ১৪ ক্রম অনুযায়ী তর্কিত নিবন্ধন প্রার্থীর মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম*-এ প্রকাশিত আত্মস্বীকৃত প্রতিবেদনগুলি বা সাক্ষ্য আইনে আদালত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য অকাট্য প্রমাণ বিধায় নিবন্ধনপ্রার্থী জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ দণ্ডবিধির ১২০ক ধারা অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ করায় নিবন্ধনপ্রাথী নিবন্ধন যোগ্য নয়।

যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতকে নিবন্ধন দেয়া যাবে না। কেননা পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তির রাজনীতি করার অধিকার থাকে না যেহেতু জামায়াত বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতাকারী, যেহেতু তারা এদেশের প্রতি কখনোই আনুগত্য প্রকাশ করেনি, উপরন্তু পদে পদে আমাদের গঠিত সংবিধান লংঘন করে চলেছে-আর এ কারণেই জামায়াতে ইসলামীকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন দেয়া হলে আইন ও সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জাতির আস্থা আর ভরসার স্থল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন সংবিধান লঙ্ঘনের এই দায় কখনো নেবে না।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

নির্ঘণ্ট